শিল্পের শব্দার্থ সন্ধান

কমল আইচ





করুণা প্রকাশনী ॥ কলকাতা ৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ : ২০০০

প্রচ্ছদের গ্রাফিক্স : অরবিন্দ পাল

করুণা প্রকাশনীর পক্ষে ১৮এ টেমার লেন কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে
বামাচরণ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত, বর্ণসংস্থাপনে রেজ ডট কম
৪৪/১এ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৭০০ ০০৯
এবং শিবদুর্গা প্রেস, ৩০ শিবনারায়ণ দাস লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৬ থেকে কর্তৃক মুদ্রিত।

বাবা-মায়ের স্মৃতিতে

মু খ ব ন্ধ

সমার্থশব্দকোশ যাকে ইংরেজিতে বলে থিসোরাস বাংলায় বিশেষ পাওয়া যায় না। সাধারণত ধরে নেওয়া হয় এটি একটি ভিন্ন ধরনের অভিধান। অভিধানের সঙ্গে এর চরিত্রগত পার্থক্য আছে। অজানা শব্দের অর্থের বদলে জানা অর্থ, বিষয় বা ভাবকে পরিস্ফুট করতে, সেই শব্দের আনুষঙ্গিক, সমশ্রেণিভুক্ত এবং সমবর্গীয় শব্দকে এই অভিধানে একত্র করা হয়েছে। শিল্পকলার এই রকম থিসোরাস বাংলায় নেই বললেই চলে। শিল্পকলা সম্পর্কে এরকম থিসোরাস ইংরেজিতেও কম পাওয়া যায়। ইংরেজিতে যেসব থিসোরাস আছে তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজি ভাষার যাবৎ শব্দকে অঙ্কের নিয়মে বেঁধে ফেলা। ফলে শুধু সমার্থক নয় বিপরীত শব্দের একটি ভাণ্ডারও এখানে গড়ে ওঠে। ভারতীয় শিল্পকলায় উপনিবেশিক প্রভাব অনস্বীকার্য। ইংরেজি শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে শিল্প, শিল্পী ও কারিগর দুটি শ্রেণিগত অবস্থানের ফলে বিপরীত মেরুতে স্থান পায়। ক্রমশ এই ভিন্ন সংজ্ঞাগুলি আমাদের নিজস্ব অভিধায় স্থানও করে নেয়। শিল্পকলার ক্ষেত্রে তত্ত্ব ও তথ্যগত আলোচনা অপরিহার্য। একান্ত ও নিজস্ব আঙ্গিক বিকাশের পথে ভারতীয় শিল্পীরা দেশে-বিদেশে বহু তত্ত্ব ও তথ্যকে আহরণ করেছেন যা সাধারণ বাংলা অভিধান বা শব্দকোশে পাওয়া যায় না। বাংলায় শিল্পের পরিভাষা সৃজনের ওপর জোর দিলেও এই বই শিল্পী, সমালোচক ও দর্শকের কাছে পৌঁছে দেবে শিল্প আলোচনার আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট।

শ্রী কমল আইচ নিজে শুধু শিল্পী নন, তিনি শিল্পের একজন শিক্ষকও তাই তাঁর দায়িত্বও বিরাট। এই বইটি সেই দায়িত্ব পালনের একটি সচেতন প্রচেষ্টা। মনে হয় বাঙালি শিল্পীরা শুধু নন, শিল্প-সমালোচক, দর্শক ও সেই প্রজন্ম যাঁদের কাছে বিশ্বায়ন এনে দিয়েছে নানা প্রশ্ন তার কিছুটা উত্তর এই বইটি জোগাবে।

রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায়
(প্রাক্তন অধ্যাপিকা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)



আলেক্সিই রদকভ : সেই নিরক্ষর একজন অন্ধমানুষের মতন যার জন্য চারদিকে অপেক্ষা করছে দুর্ভাগ্য ও ব্যর্থতা।
পোস্টার। ১৯২০। রাশিয়া

লেখকের কথা

এই বইটি শিল্পকলার পরিভাষাগত তথ্য ও আলোচনার সংকলন। সাধারণ ও আগ্রহী পাঠকদের জন্যই এই বইয়ের পরিকল্পনা। বাংলা ভাষায় বিভিন্ন বিষয়ের পরিভাষা সংক্রান্ত বইয়ের অভাব আছে। আর শিল্পকলার পরিভাষা নিয়ে বাংলায় কোনো পূর্ণাঙ্গ বই কার্যত নেই-ই। শিল্পকলার কোনো একটি বিষয় সম্পর্কে ধারণা করতে মোটা মোটা বই ঘেঁটে ফেলতে হয়। অথচ বাংলায় শিল্পকলা চর্চা ও আলোচনার ঐতিহ্য সুপ্রাচীন এবং এর পরিধি ক্রমশই বাড়ছে যেখানে দেশবিদেশের শিল্পের ইতিহাস ও শিল্পের নানা তত্ত্বের উল্লেখ স্বাভাবিক। লোকআঙ্গিক থেকে শুরু করে ধ্রুপদি শিল্প, তার পদ্ধতি প্রকরণের উদ্ভাবন, করণকৌশল, বিজ্ঞান ও তাদের ব্যবহার এবং প্রায়োগিক দিক সবকিছুই অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও অনিবার্য। শিল্পকলার ক্ষেত্রে তত্ত্ব, আঙ্গিক ও প্রয়োগের ধারা কখনোই গণ্ডিবদ্ধ থাকে না। ফলে সামগ্রিকভাবে শিল্পকলার চর্চা ও আলোচনার তথ্য ও তত্ত্বগত বিষয়গুলি প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে। বিশেষকরে বর্তমান কালে তত্ত্ব ও তথ্য ছাড়া শিল্পকলার মৌলিক চর্চা ও বিকাশ একেবারেই অসম্ভব। তাই শিল্পের বিভিন্ন বিষয়ের তথ্যতালাশ জরুরি। তাছাড়া সৃজনের নানা ধারার মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক গড়ে তোলার কারণেও বিভিন্ন বিভাগীয় তথ্যভাণ্ডার থাকা প্রয়োজন। এই প্রয়োজনবোধ থেকেই খানিকটা দুঃসাহসকে সম্বল করে এই কাজের প্রয়াস।

এই বইয়ে শিল্পকলার নানা বিষয়ের ক্ষেত্রে দেশি-বিদেশি শব্দের বহুল প্রচলিত ও ব্যবহৃত জনপ্রিয় রূপটিকেই গ্রহণ করা হয়েছে। সেসব পরিভাষার বাংলা প্রতিশব্দকে গ্রহণ করা হয়নি। কেবলমাত্র বিদেশি বিভিন্ন শব্দের ক্ষেত্রে ইংরেজি বানান দেওয়া হয়েছে উচ্চারণের বিভ্রান্তি এড়ানোর জন্য। এইসব শব্দ ও তার ব্যাখ্যাকে সাজানো হয়েছে বাংলা বর্ণমালার ক্রমঅনুসারে। সেইকারণে আলাদা কোনো সূচি ব্যবহার করা হয়নি। ফাইনআর্ট বা ললিতকলা এবং তার সঙ্গে সম্পর্কিত নানা বিষয় তথা পদ্ধতি, প্রকরণ, বিভিন্ন আঙ্গিক, নানা দেশ ও কালের অসংখ্য শিল্প আন্দোলন, শিল্প ও শিল্পী গোষ্ঠী, নন্দনতত্ত্ব ইত্যাদি হল এই বইয়ের উপজীব্য। অবশ্য বাণিজ্যিক কলা বা কমার্শিয়াল আর্ট, ভাস্কর্য এবং সাহিত্য বিষয়ক দুটো একটা শব্দও এতে স্থান পেয়েছে। সেইসঙ্গে আছে বাংলায় প্রকাশিত শিল্পকলা বিষয়ক বই ও প্রবন্ধের একটি দীর্ঘ তালিকা। এ ধরনের কোনো বইতে আপ-টু-ডেট তথ্য সংকলন করা কঠিন। কারণ প্রতিদিন তথ্যের নবায়ন ঘটে। শব্দ সংগ্রহের ব্যাপারেও একই ব্যাপার। তাই অন্তর্ভুক্ত শব্দের বাইরে প্রয়োজনীয় ও ব্যবহার্য অসংখ্য শব্দ বাদ রয়েই গেছে। পরবর্তী সংস্করণগুলিতে তা অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা থাকবে। এইসব পরিভাষাগুলির তথ্য ও ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে সাধারণভাবে গৃহীত ও স্বীকৃত

মতগুলিকে গ্রহণ করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও যদি কোনো তথ্যগত ঘাটতি ও ব্যাখ্যার দুর্বলতাজনিত ত্রুটি ঘটে থাকে তার দায় সম্পূর্ণই এই লেখকের।

তবু লেখকের একক প্রচেষ্টায় এরকম একটি বইয়ের প্রকাশ যে সম্ভব হল স্বাভাবিকভাবেই তার পিছনে অনেক মানুষের অবদান রয়েছে। এই বই লেখায় প্রথম উৎসাহ দেন শ্রদ্ধেয় শচীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। শচীনদা দেখা হলেই কাজ শেষ করতে তাড়া দিয়েছেন। তার পরেই শ্রদ্ধেয় বামাচরণ মুখোপাধ্যায়। যিনি আন্তরিকভাবে এরকম বড়ো একটি বই প্রকাশনার দায়িত্ব হাতে তুলে নিয়েছেন। বামাবাবুর পুত্র তথা আমার বন্ধু কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায় ধৈর্য না হারিয়ে নানা কাজ সামলে দিয়েছেন। কম্পোজিং থেকে শুরু করে প্রুফ দেখা, পাতা সাজানো ইত্যাদি খুঁটিনাটি নানা ব্যাপারে সাহায্য করেছেন কৃষ্ণেন্দু। সেই সঙ্গে উল্লেখ করব রেজ ডট কম-এর সুমন ও সুমিত এবং অন্যান্য বন্ধুদের কথা। আমার ব্যক্তিগত সমস্যার কারণে উদ্ভূত পরিস্থিতিকে এঁরা মানিয়ে নিয়ে সহযোগিতা করেছেন। আরও যাঁদের সাহায্য পেয়েছি তার মধ্যে অন্যতম হল আমার বন্ধু ও সংস্কৃতি আন্দোলনের অন্যতম সহকর্মী অনিরুদ্ধ মৈত্র। অনিরুদ্ধ এখানে ব্যবহৃত ফরাসি ভাষার অসংখ্য শব্দকে সংশোধন করে দেওয়ার পাশাপাশি আরও নানাভাবে সাহায্য করেছেন। সর্বোপরি শিল্পকলা ও ইতিহাসের বিশিষ্ট গবেষক অধ্যাপিকা শ্রীমতী রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায় মুখবন্ধ লিখে দিয়ে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। এতসবের পরেও বইটি প্রকাশে বেশ বিলম্ব হল একেবারেই ব্যক্তিগত কারণে। এখন শিল্প অনুসন্ধিৎসু পাঠকের যদি প্রয়োজনে লাগে তবেই এই বইয়ের সার্থকতা। শেষ বিচারের ভার তাই পাঠকেরই হাতে।

কমল আইচ
ললিতকলা বিভাগ (দিবা)
দি ইন্ডিয়ান কলেজ অব আর্টস
অ্যান্ড ড্রাফটসম্যানশিপ
কলকাতা ৭০০০৭৪



অ

অঁপাকেতাজ (Empaquetage)

শব্দটি ফরাসি যা ইংরেজিতে wrapping বা packaging। শব্দ থেকে। এটি একটি শিল্প আঙ্গিক। বুলগেরিয়ান শিল্পী ক্রিস্তো জাভাশেফ - এর কাজের সঙ্গে এই আঙ্গিক সম্পর্কিত।



নং ১ ক্রিস্তো জাভাশেফ এবং জঁ কোলো র‍্যাপড কোস্ট, লিটল বে। অস্ট্রেলিয়া। ১৯৬৯। রঙিন ছবি নং ২০১ পৃ. ৩৭৭

আচ্ছাদন করার জিনিসপত্রে এই শিল্পকলা তৈরি। যেমন বিশাল কোনো বাড়ি বা সমুদ্রতটকে ঢেকে ফেলা। ক্রিস্তোর প্রথম আচ্ছাদিত বস্তু তৈরি হয় ১৯৫৮-তে।

অক্ট্যাভো (Octavo)

বইয়ের পাতার মাপ। এই মাপ অনুযায়ী একটি কাগজকে এমনভাবে ভাঁজ করা হয় যাতে কাগজটি ৮টা পাতায় অর্থাৎ ১৬টি পৃষ্ঠায় ভাগ হয়। এভাবে ভাঁজ করলে একটি ডিমাই সাইজের পাতার মাপ দাঁড়ায় ৫.৭৫ × ৯ ইঞ্চি।

অজন্তা

বর্তমান মহারাষ্ট্র রাজ্যের অন্তর্গত উত্তর-পশ্চিম দাক্ষিণাত্যে অবস্থিত বৌদ্ধ গুহাশ্রেণি। এগুলি নির্মিত হয়েছিল খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে খ্রিস্টীয় অষ্টম শতাব্দীর মধ্যে। পাথর কেটে এইসব গুহা নির্মিত হয়েছিল। দু-ধরনের গুহা আছে এখানে। এক হল বৌদ্ধ বিহার বা মনাস্ট্রি। এগুলি স্তম্ভ সহযোগে তৈরি আয়তাকার গুহা। চারদিকের দেয়ালে ঘিরে আছে ছোটো ছোটো কক্ষ। অন্যটি হল চৈত্য বা প্রার্থনা ঘর।



নং ২ অজন্তা শ্যামা জাতকের রেখাচিত্র। আাকশন ড্রয়িং। ১০নং গুহা।

এটি লম্বা হলঘর, দুধারে সারিবদ্ধ স্তম্ভ বা পিলার এবং ছাদটা গম্বুজাকৃতি। ঘরের মাথার দিকে একটি অর্ধগোলাকৃতি স্তূপ। এই স্তূপের চারপাশে ঘুরে উপাসনা হত। খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী পর্যন্ত হীনযানদের সময়ে বেশ কিছু গুহা কাটা হয়েছিল। তারপর কয়েক শতাব্দী পরে মহাযান পর্বে আরও কিছু গুহা নির্মাণ করা হয়। এই সময়ে গুহাগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভাস্কর্য দিয়ে সাজানো হয়েছিল। এইসব ভাস্কর্যের শৈলী গুপ্তরীতির। তবে অজন্তার খ্যাতি ও গুরুত্ব হল তার ফ্রেস্কো পেন্টিং-এর জন্য। এই সব ফ্রেস্কো প্রধানত জাতকের গল্পকে বর্ণনা করার জন্য আঁকা হয়েছিল। অসংখ্য বৃহদাকারের ফ্রেস্কোমালা যা আজও টিকে আছে তার কিছু খ্রিস্টপূর্ব প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে করা হলেও বেশিরভাগই গুপ্তযুগে আঁকা। অজন্তার গুহার মোটা সংখ্যা হল ত্রিশ। এর মধ্যে ১৭ সংখ্যক গুহাটিই চিত্রকলায় সবচেয়ে বেশি সমৃদ্ধ। অন্তার ছবি কালজয়ী হয়ে টিকে থাকার প্রধান কারণ হল এর অঙ্কনশৈলীর পদ্ধতি। এর পাশাপাশি এও বলা যায় যে প্রাচীন শিল্প শাস্ত্র তথা ভারতশিল্পের ষড়ঙ্গ শাস্ত্রকে মেনেও অজন্তার শিল্প তার নিজের বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল।

অজন্তার চিত্ররীতি হল গল্প বলা বা narrative style মাধ্যম। হিসাবে অনুসৃত হয়েছে মুরাল বা ফ্রেস্কোর বুয়োন এবং সেক্কো উভয় পদ্ধতিই। এমনকি অল্পস্বল্প টেম্পারাও ব্যবহার করা হয়েছে। দেয়াল তৈরি করা হয়েছে কাদা, গোবর, পাথরের গুঁড়ো বিশেষ করে আগ্নেয়গিরির পাথরের গুঁড়ো বা তুষ


নং ৩ বোধিসত্ত্ব পদ্মপাণি। অজন্তা ১ নং গুহা।

মিশিয়ে। প্রথম অস্তর তৈরি করার পর পাতলা করে শামুকের চুনের প্রলেপ লাগিয়ে ছবি আঁকা হয়েছে। কখনো-কখনো ভিজে অবস্থায় বুয়োন ফ্রেস্কো অথবা শুকিয়ে নিয়ে ফ্রেস্কো সেক্কো করা হয়েছে। ছবির মূল রেখা আঁকা হয়েছে গেরিমাটির থেকে তৈরি লাল রং দিয়ে। অজন্তার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এই রেখা বা আউটলাইন। অজন্তার অন্ধকার গুহায় এই অমূল্য ছবির সম্ভার কীভাবে আঁকা হয়েছে এই প্রশ্নের সম্ভাব্য ব্যাখ্যা পণ্ডিতগণ দিয়েছেন। তাঁরা মনে করেন উজ্জ্বল ধাতুর তৈরি একরকম আয়নার সাহায্যে বাইরের আলো ভেতরে ফেলে তবেই এইসব ছবি আঁকা সম্ভব হয়েছে।

অটোডেস্ট্রাকটিভ আর্ট (Autodestructive art)
১৯৬০ ও ১৯৭০-এর দশকে পাশ্চাত্যে এক ধরনের শিল্পকলা চালু হয়েছিল যার পরিকল্পনা এমনভাবে করা হত যে সেই শিল্পকর্ম নিজে নিজেই ভেঙে পড়তে বা ধ্বংস হয়ে যেতে পারত।

ছবি নং ১৪৫ পৃ. ৩৪৫

অটোনিয়ান (Ottonian)
৯১৯ - ১০২৪ খ্রিস্টাব্দে জার্মানিতে অটোনিয়ান সম্রাটগণ এবং তাঁদের উত্তরসূরীদের শাসনকালে বিদ্যমান শিল্প ও স্থাপত্যকলা। এই শৈলী এর পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী দুই শৈলী যথাক্রমে ক্যারোলিনজিয়ান এবং রোমানেস্ক শৈলীর সমন্বয়।

ছবি নং ২৪৬ পৃ. ৩৪৬

অটোম্যাটিজম (Automatism)

যুক্তিগ্রাহ্য নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই পেন্সিল বা তুলি চালনা এবং এভাবে তুলি চালিয়ে অবচেতন মনের ভাবাবেগকে তুলে

ছবিনং ৪. উইলেম ডি কুনিন : ডোর টু দি রিভার। ১৯৬০। ক্যানভাসের ওপর তেল রং।



আনা। এ ধরনের ধারণার প্রথম উপস্থাপনা ঘটান সুরিয়ালিস্ট শিল্পী সালভাদোর দালি, অঁদ্রে ম্যাসোঁ প্রমুখরা। পরে অ্যাবস্ট্র্যাক্ট এক্সপ্রেশনিস্টদের হাতে এই রীতি আরও বিকশিত হয়। অটোম্যাটিজমের মধ্যে কখনো-কখনো স্বপ্নময়তাও লক্ষণীয়।

অটোম্যান (Ottoman)

১৩২৬ থেকে ১৯২২ সাল পর্যন্ত সুলতানি শাসনের অবসান পর্যন্ত প্রচলিত মুসলমান তুর্কি শিল্প ও স্থাপত্যকলা। ১৩২৬ সালে বারসা দখল নিয়ে অরথান১ অটোম্যান রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেন।

ছবিনং ১৫১ পৃ ৩৪৮

অতিকল্পিত, অতিসজ্জিত

বারোক দেখুন।

অনুকরণ বা অনুকৃতি

ইংরেজি পরিভাষা ইমিটেশন। নন্দনতাত্ত্বিক শব্দ হিসাবে প্লেটোর রচনায় প্রথম পাওয়া যায়। প্লেটোর মতানুযায়ী যে কোনো শিল্পই হল অনুকরণ। আবার অনুকৃত সত্য এবং বিরাজিত সত্যের মধ্যে পার্থক্য অনিবার্য বলেই অনুকৃত মূল থেকে আলাদা। অ্যারিস্টটল শব্দটিতে আরেকটি মাত্রা যুক্ত

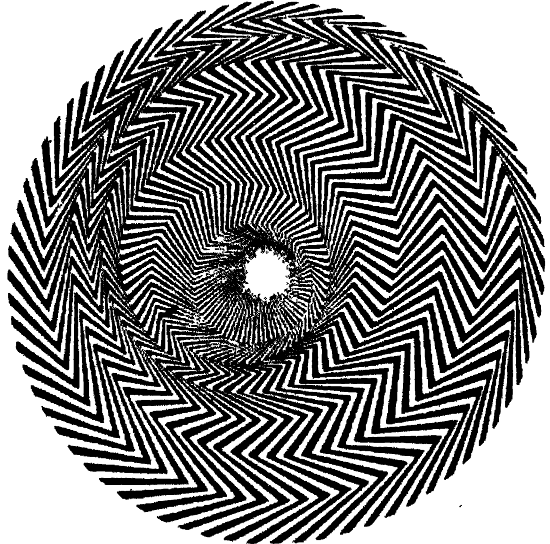
করেছেন। তিনি বলেছেন শিল্পের সাধারণ ধর্মই হল অনুকরণ। আবার অনুকরণের ধর্ম হল বিশেষের মধ্যে বিদ্যমান সাধারণের সম্ভাবনাকে ব্যক্ত করা। অনুকরণ প্রসঙ্গে নন্দলাল বসু বলেছেন—ছবির তিনটি ধরনের একটি হল— অনুকরণ। কোনো বস্তুর প্রতিচিত্রণের যান্ত্রিক ব্যবস্থা যখন ছিল না তখন বস্তুর ছবি এঁকে শিল্পীরা ওই বস্তুটির ভ্রম সৃষ্টির চেষ্টা করতেন। প্রতিচিত্রণের যান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু হবার পর শিল্পীরা ওই ধরনের চর্চা থেকে সরে আসেন। তবে এটা ঠিক যে প্রকৃতির সৃষ্টিশীল অনুকরণের মধ্যেই সৌন্দর্য সৃষ্টির অন্যতম শর্ত নিহিত।

অণুচিত্র

মিনিয়েচার দেখুন।

অপ আর্ট (Op art)

আসলে 'অপটিক্যাল আর্টে'র সংক্ষিপ্ত রূপ। এটি ১৯৬০ নাগাদ উদ্ভূত এক বিমূর্তবাদী শিল্পান্দোলন। অক্ষিপটকে উদ্দীপ্ত করতে পারে এমন সব অপটিক্যাল এফেক্টের আবিষ্কারের সঙ্গে এই শিল্পকলা সংশ্লিষ্ট। এর মুখ্য উপাদান (elements) হল নানা ধরনের সাদাকালো বা রঙিন জ্যামিতিক নকশা। মূলত চিত্রশিল্প হলেও কিছু ভাস্কর্যও এ নিয়ে হয়েছে। অপ আর্টের নকশায় নানারকম ডোরা, চৌখোপি, গোল, রেখা বা উৎকেন্দ্রিক বৃত্তে জোরালো রং বা কখনো- কখনো পূরক রং এমন ভাবে ব্যবহার করা হয় যাতে মনে হয় নকশাটি ঘুরে ঘরে বেড়াচ্ছে বা কাঁপছে। এই শিল্পকলার বিখ্যাত শিল্পীরা হলেন ব্রিজেট রিলে, সোলো, ভিক্টর ভ্যাসেরিলি, ল্যারি পুনস প্রমুখ। এই



নং ৫. ব্রিজেট রিলে : ব্রেজ১। ১৯৬২। ৪৩x৪৩ সেমি।

রীতির কাজের সূত্রপাত ফিউচারিস্ট শিল্পী বালার 'বর্ণালি ব্যাখ্যা' বা বাউহাউস শিল্পীদের পরীক্ষামূলক কিছু কাজের মধ্যে।

অপটিক্যাল কারেকশন (Optical correction) — স্থাপত্য নির্মাণের কোনো একটি অঙ্গ যেমন স্তম্ভ বা কলামের এন্টাসিসের আকৃতিতে সামান্য পার্থক্য অথবা জানলা বা দরজার ওপরের অংশ তথা লিনটেল-এ সামান্য উর্ধ্বমুখী বক্রতার আপাত স্ফীত অংশ যেভাবে সংশোধন করা হয়।

অপটিক্যাল মিক্সচার (Optical mixture) — বিশুদ্ধ মূল বর্ণগুলিকে (primary colours) ছোটো ছোটো দাগে গায়ে গায়ে লাগিয়ে এমন ভাবে ব্যবহার করা হয় যা দেখে মনে হয় তারা পরস্পব মিলে গিয়ে আনুষঙ্গিক বর্ণ বা সেকেন্ডারি কালার তৈরি করেছে। এই ধরনের ফলাফলকে ইম্প্রেশনিস্টরা ব্যবহার করতেন এবং শিল্পী সুরার (Seurat) তত্ত্বাবধানে নব্য ইম্প্রেশনিস্টরা আরও বিজ্ঞানসম্মতভাবে এই রীতিকে ব্যবহার করেছেন।

অফ স্ট্রেচার (Off stretcher) — ফ্রেমে না খাটানো ক্যানভাস বা কাপড়ে অথবা কখনো-কখনো অনিয়মিত আকারের চিত্রপটে আঁকা সাধারণভাবে বিমূর্ত ছবি। ১৯৭০-এ আমেরিকা এবং ইউরোপে এই ধরনের কাজ দেখা গিয়েছিল।

অবজেকটিভ অ্যাবস্ট্র্যাকশনিস্টস (Objective abstractionits) — ব্রিটিশ শিল্পী গোষ্ঠী। ১৮৩৪ সালে লন্ডনে এঁরা যুক্তভাবে প্রদর্শনী করেন। এই গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন গ্রাহাম বেল, রডরিগো ময়নিহান, সেরি রিচার্ড, ভিকটর পাসমোর, ইভন হিচেনস প্রমুখ। এই গোষ্ঠীর শিল্পীদের কাজে ভিন্নতা ছিল। যেমন হিচেনস, রিচার্ড প্রমুখের ছবির ধরন ছিল আধাবিমূর্ত আবার ময়নিহানের ছবির ধরন ছিল সম্পূর্ণ অসাদৃশ্যবাদী (non representational)। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই শিল্পীরা ঐক্যবদ্ধভাবে সমকালীন বিশ্ব চিত্রকলা জগতে জ্যামিতিক শৈলীর আধিপত্যকে খারিজ করে দিয়েছিলেন।

অবভার্স (Obverse) — কোনো মুদ্রা বা মেডেে

অবয়ববাদ — স্ট্রাকচারালিজ্‌ম দেখুন।

অবিনির্মাণ — ডিকনস্ট্রাকশন দেখুন।

অভিব্যক্তিবাদ — এক্সপ্রেশনিজ্‌ম দেখুন।

অমরাবতী

মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের বৌদ্ধ সংস্কৃতির একটি মহাঅঞ্চল। ঊনবিংশ শতাব্দী নাগাদ এটি সম্পূর্ণ অবলুপ্ত হয়। এখান থেকে প্রাপ্ত বহু গুরুত্বপূর্ণ ভাস্কর্য লন্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়ামে এবং চেন্নাইয়ের সরকারি সংগ্রহালয়ে রাখা আছে। এছাড়া এই সব ভাস্কর্যের রক্ষা পাওয়া আনুষঙ্গিক অনেক কাজ প্রতিবেশী বৌদ্ধ অঞ্চল নাগার্জুনকোন্ডায় দেখতে পাওয়া যায় যা ত্রয়োদশ

নং ৬. অমরাবতীর মহাস্তূপ। ১৫০-২০০ খ্রিস্টাব্দ। মার্বেল। উচ্চতা ৬ ফুট ২ ইঞ্চি।



শতাব্দীর ভাস্কর্যে অন্ধ্র স্কুলের যে বিকাশ ঘটেছিল তার প্রমাণ দেয়। অন্ধ্র ভাস্কর্য আদিম স্থূলাকৃতির বৌদ্ধ ভাস্কর্যের থেকে অনেক উন্নত ছিল। অন্ধ্র স্কুলের আর-একটি বৈশিষ্ট্য হল অনুপাত অনুযায়ী মানুষের দেহের উপস্থাপনা এইসব ভাস্কর্য প্রকৃত অর্থেই বর্ণনামূলক এবং এর রিলিফে যে সুবিন্যস্ত ভিড়ের দৃশ্য দেখা যায় তা ভারতীয় ভাস্কর্যে প্রথম।

অয়েল পেন্ট (Oil paint)

ড্রায়িং অয়েলের সঙ্গে রঞ্জকের গুঁড়ো মিশিয়ে তৈরি রং। তেল রং ব্যবহার করে বহু ধরনের এফেক্ট বা ফলাফল সৃষ্টি করা যায়। মিনার মতো মসৃণতা থেকে শুরু করে প্রচণ্ড খসখসে ইমপ্যাস্টো ইত্যাদি নানান এফেক্ট সৃষ্টি করা যায় বলে অন্ত রেনেসাঁ থেকে অদ্যাবধি ইউরোপ সহ অনেক দেশে তেল রংই সবচেয়ে প্রভাবশালী মাধ্যম। তেল রঙের উদ্ভবকাল নির্দিষ্ট

করে বলা যায় না। তবে দ্বাদশ শতাব্দীতে রঙের প্রাথমিক ভিত্তি এবং বার্নিশ হিসাবে তেল ব্যবহার করা হত। জন ভ্যান আইক সহ নেদারল্যান্ডের শিল্পীরা পঞ্চদশ শতাব্দীতে টেম্পোরার ওপর গ্লেজিং করার মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করতে গিয়ে তেল রঙের উদ্ভাবন করে ছিলেন এবং একথাও ঠিক যে ষোড়শ শতকে নিজগুণেই মাধ্যম হিসাবে তেল রং প্রতিষ্ঠা পায়। উনবিংশ শতাব্দীতে থেকে তেল রং বাণিজ্যিক ভাবে প্রস্তুত হয়ে ধাতব টিউবে ভরে বিপণন হতে শুরু করে। এর ফলে শিল্পীদের কাজের ক্ষেত্রে গতি বেড়ে যায়। নতুন প্রক্রিয়ায় তৈরি তেল রঙের বৈশিষ্ট্যও বেড়েছে বহুরকম।

তেল রঙে বাইন্ডার হিসাবে ব্যবহার করা হয় উদ্ভিজ্জ তেল। সবচেয়ে বেশি ব্যবহার হয় লিনসিড বা তিসির তেল। কখনো-কখনো তিসির তেলের সাথে মিশিয়ে বা শুধুমাত্র পোস্তর তেলও ব্যবহার করা হয়। পিগমেন্ট বা রঞ্জকের বৈশিষ্ট্যের ওপর তেলের পরিমাণের তারতম্য নির্ভর করে। তুলি চালনার উপযোগী করতে কোনো পিগমেন্টে বেশি তেল লাগে কোনো পিগমেন্টে কম তেল লাগে। এর ফলে বিভিন্ন রঙের শুষ্ক হবার সময়েরও তারতম্য ঘটে। ধীরে শুকায় এমন সব রঙে আলাদা করে দ্রুত শুষ্ককারক উপাদান মেশানো হয়। এই সব পিগমেন্ট, বাইন্ডার, ড্রায়ার প্রভৃতির পাশাপাশি চটচটে রং-কে মাখনের মতো নমনীয় করার জন্যেও কিছু পদার্থ বা প্লাস্টিসাইজার ব্যবহার করা হয়। তেল রঙের ধর্ম হল, তেল রং বাষ্পীভূত হয়ে শুষ্ক হয় না। তেল রং শুষ্ক হয় অক্সিজেনের সঙ্গে মিশে বা জারিত হয়ে। ফলত তেল রং শুষ্ক হলে যে ফিল্ম তৈরি হয় তার সঙ্গে খুব নমনীয় অ্যাক্রিলিক রঙেরই তুলনা করা যায়। তেল রং পাতলা পর্দার মতো করে ব্যবহার করা যায়, মোটা অমসৃণ করে ব্যবহার করা যায় বা দুয়ের মাঝামাঝি যে কোনো রকম অস্তর (layer) করে ব্যবহার করা যায়। তেল রং ধীরে শুষ্ক হয় বলে তেল রঙের একটা বর্ণের সঙ্গে আরেকটি বর্ণ মেশানোও যায় ভালো করে। তেল রঙের আলো প্রতিরোধী ক্ষমতা (lightfastness) অনেক বেশি এবং সহজে বিবর্ণ হয়ে যায় না। শুকনো হবার আগে পরে এর টোনাল ভ্যালু প্রায় একই থাকে।

তেল রঙের ধীরে ধীরে শুষ্ক হওয়াটা অনেক শিল্পীর কাছে পছন্দসই আবার অনেকের কাছে বিরক্তিকর। কেন-না একটি প্রলেপ শুকনো হতে প্রায় একদিন লেগে যায়, ফলে দ্বিতীয়

লেপনের জন্য পরের দিন অবধি অপেক্ষা করতে হয়। চূড়ান্ত ভাবে শুকাতে এবং বার্নিশ করতে মাসাধিক কাল লেগে যায়। তেল রঙের ছবিতে চিড় ধরা এড়াতে ঊর্ধ্বস্তরে তেল ব্যবহারের সঠিক নিয়ম মেনে চলা উচিত। বেশি তেল মেশানো বর্ণাস্তরের ওপর কম তেল মেশানো অনমনীয় বর্ণাস্তর ব্যবহার করা উচিত নয়। রঙের সঙ্গে বেশি পরিমাণে শুষ্ককারক (drier) মেশানো অনুচিত।

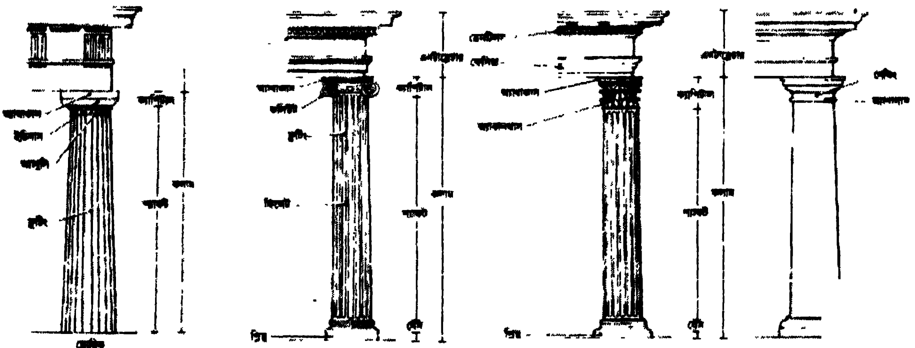
মাধ্যম হিসাবে রঙে তেলের ব্যবহারের পূর্ব ইতিহাস থাকলেও তেল রঙের মূল কৌশলটি আবিষ্কার করেছিলেন, ফ্লেমিশ শিল্পী জন ভ্যান আইক। ১৪২০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ তিনি দেখেন তার একটি এগ টেম্পারার ছবি সূর্যের আলায় বিশ্লিষ্ট হয়ে গেছে। তখন তিনি ছায়ায় শুকোতে পারে এমন একটি তেলের খোঁজে পরীক্ষানিরীক্ষা চালান। তিনি ব্রুগেস হোয়াইট নামে এক ধরনের টারপেনটাইনের সঙ্গে তিসি বা বাদাম তেল মিশিয়ে নতুন এক ফর্মুলা তৈরি করে টেম্পারায় বার্নিশ হিসাবে ব্যবহার করেন। পরে সরাসরি এই মিশ্রণকে পিগমেন্টের সঙ্গে মিশিয়ে তেলরং তৈরি করেন। দেখা গেল এই রং শুধু ছায়াতেই শুকোয় তা নয়, এতে গ্লেজিংও করা যায় খুব ভালো। রঙের অন্তর্বর্ণস্তর যেমন উজ্জ্বল থাকে তেমনি বজায় থাকে পিগমেন্টের নিজস্ব বর্ণঔজ্জ্বল্য। এরপর ভ্যান আইকের একজন অনুগামী অ্যানতোনেল্লো দা মেসিনা ভেনিসে তেল রং ব্যবহারের প্রসার ঘটান এবং জিয়োভান্নি বেল্লিনি ভ্যান আইকের মতো তেল রঙের পৃষ্ঠতলের সৌন্দর্য এবং রঙের দ্যুতি সৃষ্টিতে সাফল্যলাভ করেন। তবে বেল্লিনির একজন ছাত্র টিশিয়ান এই নতুন মাধ্যমকে পূর্ণাঙ্গরূপে ব্যবহারের প্রয়াসে সফল হন। টিশিয়ানের বৈশিষ্ট্য ছিল তিনি প্রথমে পাতলা করে মনোক্রোমে রং চাপিয়ে নিয়ে তার ওপর পুরু করে হালকা এবং অসচ্ছ রং চাপাতেন। সেই স্বচ্ছ গ্লেজিং সমগ্র ছবিতে উজ্জ্বল দ্যুতিময়তা দান করত। ছবির উজ্জ্বলতা, নকশার সাবলীলতা এবং টোনের গভীরতা ছিল ধ্রুপদি কৌশলের শ্রেষ্ঠত্বের প্রতীক স্বরূপ। এরপর আসেন রুবেনস্। তিনি সাদা জমিতে সামান্য পাতলা ধূসর ওয়াশ লাগিয়ে তার ওপর টোন চাপাতেন অথবা গোল্ডেন আম্বার বা উজ্জ্বল বাদামি রঙের রৈখিক নকশার ওপরে শীতল অনচ্ছ রঙের হাফটোন ব্যবহার করতেন। যার তলায় কিছু অন্তর্স্তরও

দেখা যেত। রুবেনসের প্রভাব ছিল ভেলাসকেজ এবং রেমব্রাঁর ওপর। যদিও এই দুই শিল্পীই তাঁদের ছবিতে নিজস্ব মাত্রা যোগ করে বিশিষ্টতা অর্জন করেছিলেন। রেমব্রাঁর ছবিতে আলোর মৌলিক ব্যবহার সাধারণ দর্শকের চোখ এড়ায় না। পরবর্তীকালে আরও দুজন শিল্পী একটু স্বাধীনভাবেই রুবেনস্-এর রীতিতে কাজ করেছেন। এঁরা হলেন ইংরেজ শিল্পী গেইনসবোরা এবং স্পানিশ শিল্পী গোইয়া। এইভাবে ক্রমশ নানা বিষয় বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে তেল রঙের কৌশলী প্রয়োগের ধারাবাহিক উত্তরণের পর্বে আসে ইমপ্রেশনিজ্‌ম। যেখানে রঙের প্রয়োগের পেছনে চালিকা শক্তি হয়ে দাঁড়ায় পদার্থ বিজ্ঞানের আলোসংক্রান্ত আবিষ্কার। এই রীতির মুখ্য স্থপিত ছিলেন মনে, সেজান, পিসারো প্রমুখ। যেখানে রঙের টোন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভেঙে নতুন এক অঙ্গভাষা সৃষ্টি করে। একই পথ ধরে আসে আরও আধুনিক পর্ব। যেখানে, বিশেষ করে জ্যাকসন পোলকের মতো শিল্পীরা ছিটিয়ে ছড়িয়ে রং লাগানোর কায়দা ব্যবহার করলেন 'ড্রিপ পেন্টিং'-এ। এই ধারা নিরন্তর বহমান। আর এর মধ্য দিয়েই সমৃদ্ধ হয়েছে তেল রঙের নানা আঙ্গিক কৌশল।

অর্ডারস অব আর্কিটেকচার (Orders of architecture)

প্রাচীন স্থাপত্যের নানা ধরনকে শ্রেণিভুক্ত করার জন্য রোমান স্থাপত্য-ইতিহাসবিদ ভিট্রুভিয়াস এই পদ্ধতির উদ্ভাবন করেন। তিনি তাঁর এই পদ্ধতির জন্য ভিত্তি (Base), স্তম্ভমূল (Plinth), স্তম্ভশীর্ষ (capital) এবং স্তম্ভশীর্ষোপরিভাগ (Entablature) সহ তিন ধরনের আদর্শ স্তম্ভকে ভিত্তি করেন।

এর মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন হল ডোরিক প্রণালী য। দেখতে

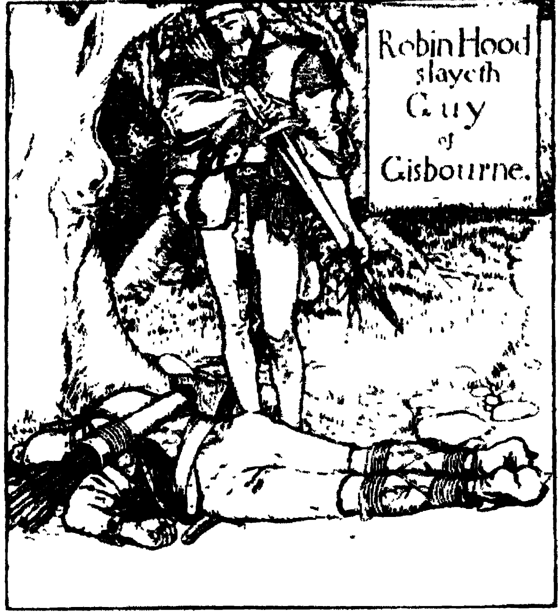


খুব সরল এবং বলিষ্ঠ। এই স্তম্ভ বাঁশির মতো খাঁজকাটা। গ্রিক ডোরিক স্তম্ভের কোনো ভিত্তি নেই। কিন্তু রোমান ডোরিকের ভিত্তি আছে। ডোরিক স্তম্ভের শীর্ষাগ্র চ্যাপটা। আয়োনিক স্তম্ভের গড়ন রোগাটে। শীর্ষাগ্রে দুটো সমান কুণ্ডলীকৃত অংশ আছে। করিন্থিয়ান প্রণালীর স্তম্ভের শীর্ষাগ্রের নকশায় থাকে ঝুড়ির মধ্যে বিকশিত পল্লব। টাসকান হল সরল সোজা।

অর্থগোনাল (Orthogonal) — সমান্তরাল পরিপ্রেক্ষিত বা প্যারালাল পারস্পেকটিভের ক্ষেত্রে বাস্তবিকভাবে যে রেখাগুলি পিকচার প্লেন বা চিত্রতলের সঙ্গে সমকোণী কিন্তু মনে হবে যেন সেগুলি পরিপ্রেক্ষিতের নিয়মানুযায়ী ভ্যানিশিং পয়েন্টে মিলিত হবে।

অরফিজ্‌ম,অরফিক কিউবিজ্‌ম (Orphism, Orphic Cubism) — ১৯১৩ সালে ফরাসি সাহিত্যিক ও সমালোচক গিয়োম আপোলিনেয়র এক ধরনের প্রায় বিমূর্ত শিল্প রীতিকে বর্ণনা করতে গিয়ে অরফিজ্‌ম শব্দটির অবতারণা করেন। কিউবিজ্‌মের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত এই শিল্প এর নিজস্ব ধরনের তার একান্ত স্বাধীন বাস্তবতা গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছিল। আপোলিনেয়রের দৃষ্টিতে রবার্ট ডিলনি ছিলেন এই ধারার প্রধান প্রতিনিধি। ডিলনি নিজেই এই তকমা গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু পরে আলোর গতিবিধি বিশ্লেষণের ওপর ভিত্তি করে নতুন এক ধরনের বিমূর্ত বা আধা বিমূর্ত শিল্পশৈলীর সৃষ্টি করেন। তাই বলা যায় এই শৈলী ইম্প্রেশনিজ্‌মের উত্তরধারা।

অলংকরণ — লিখিত কোনো বিষয়ের সঙ্গে ব্যবহৃত যে কোনো রকমের ছবি বা নকশা যা উপস্থাপিত বিষয়টিকে বুঝতে বা ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করে তাই হল অলংকরণ বা ইংরেজিতে ইলাস্ট্রেশন। অন্যদিকে অলংকরণ মুদ্রণের সৌন্দর্য বৃদ্ধির প্রয়োজনেও ব্যবহার করা হয়। অলংকরণের ইতিহাস বহু প্রাচীন। তবু একথা বলা যায় যে আধুনিক মুদ্রণ ব্যবস্থা পত্তনের পরই এই শিল্পের ব্যাপক চর্চা শুরু হয়। এবং তা হয়েছিল ইউরোপে প্রায় পনেরোশো খ্রিস্টাব্দ নাগাদ। ভারতবর্ষে ছাপাখানা শুরু হয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে ব্রিটিশদের উদ্যোগে। অলংকরণের করণকৌশলও তাই ব্রিটিশদের কাছ থেকে নেওয়া। প্রথম অলংকৃত বাংলা বই 'অন্নদামঙ্গল'। গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের এই বইতে কাঠ খোদাই পদ্ধতিতে ছবি আঁকেন রামচন্দ্র রায়। অলংকরণের পথিকৃৎ তিনিই। দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের 'ঠাকুরমার ঝুলি' বইতে লেখক নিজেই ছবি এঁকেছিলেন। গ্রন্থ চিত্রণের ক্ষেত্রে এই ছবিগুলি প্রথম সার্থক অলংকরণ। এর



নং ৭. পাইল : রবিন হুডের বইয়ের অলংকরণ। ১৮৮৩।

পর উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর হাত ধরে বাংলা গ্রন্থ চিত্রণ বা অলংকরণ এগিয়ে গেছে বহুদূর। পরবর্তীকালে সুকুমার রায়, নন্দলাল, অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ প্রমুখ দিকপাল শিল্পীরা নিজস্ব অলংকরণধারা গড়ে তুলেছিলেন। এঁদের মধ্যে নন্দলালের ছবিতে বিশুদ্ধ দেশজ ধারা বিশেষ করে তাঁর 'সহজ পাঠের' লিনোকাটের অলংকরণে গ্রন্থচিত্রণ নতুন মাত্রা পায়। এঁদের পর বহু কৃতী ও বিশিষ্ট শিল্পী অলংকরণ শিল্পকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁদের মধ্যে আছেন পূর্ণ চক্রবর্তী, সূর্য রায়, শৈল চক্রবর্তী, সত্যজিৎ রায়, ও. সি. গাঙ্গুলি, সমীর সরকার প্রমুখ।

বিষয়বস্তুকে অনুসরণ করে অলংকরণ সৃষ্টির ধারার বাইরে বিষয় নিরপেক্ষ বা বিমূর্ত ছবিও অলংকরণের কাজে ব্যবহৃত হয়েছে। পাশ্চাত্যে এর দৃষ্টান্ত দেখা গেছে অনেক। ইউরোপে অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে অলংকরণ শিল্পীদের চাহিদা ছিল ব্যাপক। আলোকচিত্র গুরুত্ব পাবার পর হস্তকৃত অলংকরণশিল্পীদের প্রয়োজনীয়তা হ্রাস পেতে থাকে।

অলটারপিস (Alterpiece)

খ্রিস্টান চার্চের বেদিমূলের ওপরে বা পিছনে সাজানো ভক্তিমূলক শিল্পকর্ম। এসব কোনো ধর্মগ্রন্থ থেকে নেওয়া ঘটনা কিংবা কোনো মহান ব্যক্তির বাণীর চিত্রণ বা ভাস্কর্যরূপও হতে পারে। কোনো কোনো অলটারপিস একাধিক দৃশ্য সংবলিত হয়ে



নং ৮. লুকাস মোজার . দ্য টিফেনবর্ন অলটারপিস। ১৪৩১। পাবিশ চার্চ। ৩০০X২০০ সেমি.।

কবজা দিয়ে আটকানো থাকে যাতে প্রয়োজনে সরিয়ে ফেলা যায় এবং বিশেষ দিনে আবার তা প্রদর্শন করা যায়।

অ্যাকশন
(Action)

শব্দটির প্রচলন হয় ১৯৬০ সাল নাগাদ। ঠাসা বা শিথিল কাঠামোর কোনো দৃশ্য অথবা শারীরিক গতিবিধির সমন্বয়, ধ্বনি, নানারকম দ্রব্যের ব্যবহার। সময় ও কালের পারস্পরিক ক্রিয়া ইত্যাদি বর্ণনার ক্ষেত্রে শব্দটি ব্যবহার করা হয়। তবে এসব আবশ্যিক ভাবে একটি নির্দিষ্ট ফ্রেমেই বিন্যস্ত হতে হবে এমনটা নয়। শিল্পকর্মে এর উপস্থাপনা সরাসরিও ঘটতে পারে অথবা তথ্য প্রমাণের মাধ্যমেও ঘটতে পারে। 'অ্যাকশন' ঘটনাবলির একটি পর্যায় কিন্তু ঠিক নাটকীয় নয়।

অ্যাকশন পেন্টিং
(Action painting)

এ ধরনের ছবিতে শিল্পীর শারীরিক ক্রিয়াকলাপ বাহ্যিকভাবেই ফুটে ওঠে। জ্যাকসন পোলক বা উইলেম ডি কুনিনের ছবি দেখে দর্শক সহজেই ধারণা করতে পারবেন যে শিল্পী ক্যানভাসে এলোপাতাড়ি ব্রাশ চালিয়েছেন অথবা ক্যানভাসের চারপাশে ঘুরে ঘুরে রং ছুঁড়েছেন বা রঙের ফোঁটা ফেলেছেন। কিছু কিছু ক্ষেত্রে একটি বড়ো ক্যানভাসকে মেঝেতে পেতে শিল্পী তার চার ধার ধরে হেঁটে অথবা ক্যানভাসের ওপর চড়ে উদ্দাম ভাবে রং ব্যবহার করেছেন। বিশিষ্ট আমেরিকান শিল্প সমালোচক হ্যারাল্ড রোজেনবার্গ ১৯৫০ সালে এই পরিভাষাটি তৈরি করেন। প্রাথমিকভাবে শুধুমাত্র জ্যাকসন পোলকের রং-ছিটানো

ছবি নং ১৪৭ পৃ. ৩৪৬

কৌশলে আঁকা ছবিকে (drip painting) বোঝাতেই পরিভাষাটির ব্যবহার করেছিলেন তিনি। পরিভাষাটি ফরাসি শিল্পী জর্জ ম্যাথুর ছবির ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা হয়েছিল। ১৯৪৭ সাল থেকেই ম্যাথু স্বতন্ত্রভাবেই এই ধরনের বিমূর্ত, গীতিধর্মী, দ্রুতিময় শৈলীর, ক্যালিগ্রাফির চিহ্ন সম্পন্ন সীমানাহীন কম্পোজিশন এঁকেছিলেন। আবার অ্যাকশন পেন্টিংকে অনেক সময় 'অ্যাবস্ট্র্যাক্ট এক্সপ্রেশনিজ্‌ম' এর সমার্থক শব্দ হিসাবেও ধরা হয়।

অ্যাকসিডেন্টাল কালার (Accidental colour) — জোরালো রং লাগানো পটে বর্ণ ঔজ্জ্বল্যের ফলে সৃষ্ট দৃষ্টি ভ্রম নিয়ে সাদা বা নিরপেক্ষ কোনো রঙের দিকে চোখ রাখলে বঙের পাশে কোনো একটি কমপ্লিমেন্টারি বা পূরক রং হঠাৎ হঠাৎ চোখে ভেসে উঠবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, কেউ উজ্জ্বল কমলা রঙের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর পাশে সবুজ রঙের পোচ দেখতে পাবে।

অ্যাকসিডেন্টাল পয়েন্ট (Accidental point) — পারসপেক্টিভের অতিরিক্ত যে সব ভ্যানিশিং পয়েন্ট হরাইজন লাইনে অবস্থান করে না তাদের বলে অ্যাকসিডেন্টাল পয়েন্টস।

অ্যাকসিডেন্টাল লাইট (Accidental light) — ছবিতে সূর্যালোক বাদে অন্যান্য আলোক উৎসকে বলে অ্যাকসিডেন্টাল লাইট। যেমন মোমবাতি, বিজলি বাতির আলো।

অ্যাক্সিস (Axis) — একটি অট্টালিকার প্রবেশ মুখ, ভিত্তি নকশা বা ফিগারের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত কাল্পনিক সরল রেখা। এই কাল্পনিক রেখার দু-পাশের অংশগুলি এমন ভাবে থাকতে হবে যাতে ভারসাম্যের আভাস পাওয়া যায়।

অ্যাকোয়াটিন্ট (Aquatint) — বিশেষ ধরনের ধাতু তক্ষণ পদ্ধতি। ধাতুর পাত বিশেষ করে দস্তার বা তামার পাতে সচ্ছিদ্র বা রন্ধ্রকূপ সম্পন্ন (Porous) রজনের প্রলেপ লাগিয়ে বিন্দুবৎ এফেক্ট বা গুণ তৈরি করা এই পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য। তক্ষণের সাধারণ নিয়মানুযায়ী ছবির যে সব অংশ সম্পূর্ণ সাদা রাখতে হবে ধাতুর পাতের সেই সেই জায়গা বার্নিশ দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। তার আগে রজনের গুঁড়ো ছড়িয়ে দিয়ে তাপ দিয়ে সেই গুঁড়োকে প্লেটের সঙ্গে আটকে নিতে হবে। তারপর অ্যাসিডে ডুবিয়ে অ্যাসিড দিয়ে ধাতুর পাতকে খাওয়াতে (bite) হবে। অতঃপর রেজিন পরিষ্কার করে রং মাখিয়ে ছাপ নিতে হবে। চাহিদা মতো এফেক্ট

সৃষ্টি করতে কয়েকবার এই প্রক্রিয়া পুনরাবৃত্তি করতে হবে। ওয়াটার কালারের মতো টোনাল এফেক্ট তৈরি হয় বলে একে বলে অ্যাকোয়াটিন্ট। এই মাধ্যমে পাশ্চাত্যের শিল্পী গোইয়া, পিকাসো অনন্য সব শিল্প সৃষ্টি করেছেন।

অ্যাক্রিলিক (Acrylic) বিশেষভাবে শক্ত এবং স্থায়ী একরকম পেট্রোলিয়ামজাত রাসায়নিক অণু। একে বলে পলিমার। এর উৎপাদিত পণ্য হল— অ্যাক্রিলিক শিট যথা প্লেক্সিগ্লাস এবং লুসাইট, অ্যাক্রিলিক তন্তু যেমন অরলন, অ্যাক্রিলিক রং এবং আঠা। অ্যাক্রিলিক নিয়ে প্রথম গবেষণা হয় ১৮৮০ সালে এবং ১৯০১ সালে যথাক্রমে সুইস রসায়নবিদ জর্জ ডব্লু এ কাহ্লবাউস এবং জার্মান রসায়নবিদ অটো রোম-এর দ্বারা।

অ্যাক্রিলিক জেসো (Acrylic gesso) ঘন ক্রিম দিয়ে গোলা সাদা পদার্থ যা অ্যাক্রিলিক রং বা অন্যান্য রঙের গ্রাউন্ড বা ভিত্তি হিসাবে ব্যবহার করা হয়। আপাত সাদৃশ্য থাকলেও অ্যাক্রিলিক রং এবং অ্যাক্রিলিক জেসো এক জিনিস নয়। শুকনো অ্যাক্রিলিক জেসো অ্যাক্রিলিক রঙের তুলনায় অনেক বেশি ছিদ্রবহুল এবং অমসৃণ।

অ্যাক্রিলিক বার্নিশ (Acrylic vernish) অ্যাক্রিলিক রঙে আঁকা ছবির সুরক্ষার জন্য ধুলোবালি ময়লা আটকাতে জন্য বা আর্দ্রতা থেকে ছবিকে মুক্ত রাখার জন্য ব্যবহার করা এক ধরনের তরল। এটা লাগিয়ে ছবির শারীরিক ক্ষতি রোধ করা যায়। তুলি দিয়ে বা স্প্রে করে এই বার্নিশ লাগানো যায়। এই বার্নিশ অপসারণযোগ্য। কোনোভাবেই এই পদার্থ বর্ণস্তরের ক্ষতি করে না। এর আস্তরণ ছিদ্রবহুল নয় বলে ধুলো আটকাতে পারে। বর্তমানে কয়েক ধরনের অ্যাক্রিলিক বার্নিশ অতি বেগুনি রশ্মিকেও প্রতিহত করতে সক্ষম।

অ্যাক্রিলিক মিডিয়াম (Acrylic medium) তরল কিংবা চাটনি সদৃশ এক ধরনের পদার্থ। এর দ্বারা অ্যাক্রিলিক রঙের ঘনত্ব এবং চকচক করার মাত্রা পরিবর্তন করা হয়। অ্যাক্রিলিক মিডিয়ামের রাসায়নিক ভিত্তি অ্যাক্রিলিক রঙের মতনই। তাই এটা নির্ভাবনায় অ্যাক্রিলিক রঙের সাথে মেশানো যায়। কেউ কেউ অনেক সময় অ্যাক্রিলিক মিডিয়ামকে ছবির ওপরে বার্নিশের মতো করে ব্যবহার করেন সুরক্ষার উপায় হিসাবে। কিন্তু এটা যথাযথ নয়। কেন-না এই পদার্থ রঙের স্থায়ী উপাদান, একে তুলে ফেলা যায় না।

অ্যাক্রিলিক পেন্ট (Acrylic paint) কৃত্রিম রাসায়নিক পদ্ধতিতে তৈরি রং। এর মূল তিনটি উপাদান হল— পিগমেন্ট বা রঞ্জক, জল এবং সিন্থেটিক

রেজিন যা বাইন্ডার বা আঠার কাজ করে। আরও কিছু উপাদান এর সঙ্গে থাকে যেমন প্লাস্টিসাইজার যা রঙের ফলাফলকে (effect) উন্নত করে। টিউবে যে অ্যাক্রিলিক রং পাওয়া যায় তা ঘন মাখনের মতো। কিন্তু জার বা ক্যানে থাকা রঙের তারল্য বেশি। অ্যাক্রিলিক রঙের অগ্রগতি ঘটার ক্ষেত্রে প্রয়োজনের দিকটি ছিল অন্যতম একটি বড়ো শর্ত। বিশেষ করে ১৯২০ সাল নাগাদ মেক্সিকোতে কর্মরত মুরাল ও ফ্রেস্কো চিত্রের শিল্পীরা এমন কিছু রঙের খোঁজে ছিলেন যা একদিক থেকে দ্রুত কাজ করার উপযুক্ত এবং যেকোনো আবহাওয়ার টিকে থাকতে সক্ষম। অ্যাক্রিলিক রং ব্যবহারকারী শিল্পীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম হল জোসে ক্লেমেন্ট অরোজকো, দিয়েগো রিভেরা এবং ডেভিড সিকেরাস। বিশেষ করে ১৯৩০-এর দশকে সিকেরাস আমেরিকান আর্টিস্ট মেক্সিকোর কংগ্রেসে প্রতিনিধিত্ব করতে গিয়ে কাগজে আঁকা পরীক্ষামূলক একটা নমুনা পেশ করেন। এরই অব্যবহিত পরেই ১৯৩৬ সালে সিকেরাস একটি পরীক্ষাধর্মী কর্মশালার আয়োজন করেন যেখানে শিল্পীরা নতুন অ্যাক্রিলিক মাধ্যম নিয়ে চর্চা করেছিলেন। ১৯৫০ সালের মধ্যেই আমেরিকাতে অ্যাক্রিলিক রং বাজারে বিক্রি হতে শুরু করে এবং বেশ কিছু শিল্পী এই রং ব্যাপকভাবে ব্যবহার করতে আরম্ভ করেন। তার মধ্যে আছেন জ্যাকসন পোলক, কেনেথ নোল্যান্ড প্রমুখ। ১৯৬০-এর মধ্যে ব্রিটেনেও অ্যাক্রিলিক মিলতে আরম্ভ করে এবং বিশিষ্ট শিল্পীরাও ব্যবহার শুরু করেন। যেমন ডেভিড হ্যকনি, পিটার ব্লেক প্রমুখ।

অ্যাক্রোম্যাটিক (Achromatic)
কালো, ধূসর এবং সাদার মিশ্রণে উৎপন্ন আভা সহ যে কোনো রঙের ঈষৎ আভা। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়— গাঢ় নীল রংকে বলা হয় ক্রোম্যাটিক কালার। কিন্তু সেই নীল রঙের সঙ্গে সাদা বা কালো মিশিয়ে যদি রঙের তীব্রতা বা গাঢ়ত্ব কমিয়ে বা দুর্বল করে দেওয়া হয় তাহলে রঙের সেই হ্রস্বতাকে বলা হবে অ্যাক্রোম্যাটিক।

অ্যাচিমেনিয়ান আর্ট (Acheamenian art)
পারস্য মালভূমি এবং জর্গোস পর্বতের নোমাডিক অ্যাচিমেনিয়ান উপজাতিদের চিত্রকলা। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর আগে তারা অনেক আকর্ষণীয় শিল্পদ্রব্য তৈরি করেছিলেন। এই শিল্পকলায় অনেক সময় ইজিপ্ট ও মেসোপটেমিয়ার ঐতিহ্যানুগ প্রভাব লক্ষ করা যায়।

ছবি নং ১৪৮ পৃ. ৩৪৭

অ্যাজটেক আর্ট (Aztec art)

মেক্সিকোর অ্যাজটেক জনগণের শিল্পকলা হল অ্যাজটেক আর্ট। বিশেষ করে বর্তমান মেক্সিকো শহরের পাশে ১৩২৫ খ্রিস্টাব্দে অ্যাজটেকের রাজধানী শহর টেনোকটিটল্যান এর প্রতিষ্ঠার পর থেকে ১৫২১ খ্রিস্টাব্দে স্প্যানিশদের বিজয়ে এই শহর ধ্বংস হওয়ার আগের সময়কালের শিল্পকলা। ওই সময়ে অ্যাজটেকরা মেক্সিকোর একটা বড়ো অংশের দখল লাভ করে। সে সব স্থানে বিরলভাবে বিদ্যমান কিছু ভিত্তিচিত্রের অবশেষ ছিল। যার মধ্যে যোদ্ধা বা দেবতাদের শিকার করা, ভাস্কর্য, লো রিলিফ বা নতোন্নতভাস্কর্য, রাউন্ড বা পূর্ণ ভাস্কর্য ইত্যাদি শিল্পকর্মে অ্যাজটেকদের চরম উৎকর্ষের স্বাক্ষর পাওয়া যায়। সেই সঙ্গে সুবিশাল পিরামিড এবং প্রধান দেবতাদের উদ্দেশ্যে নিবেদিত মন্দিরগুলোতে তাঁদের ধর্মীয় বিশ্বাস এবং বিশেষ করে মানুষের আত্মোৎসর্গের কথা বারে বারে প্রকাশ পেয়েছে।



নং ৯ অ্যাটজেক প্রস্তর মূর্তি : 'মাথা'। ১২০০-৬০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ। মেক্সিকো। বেসাল্ট পাথর।

অ্যাজটেকরা সাধারণভাবে বড়ো শিল্পী ছিলেন না শিল্পের বড়ো সংগঠক ছিলেন। মহান শিল্পী ডুরার-এর একটি মন্তব্য থেকে তাঁদের শিল্প সম্পদ সম্বন্ধে ধারণা করা যায়। অ্যাজটেক সম্রাট মন্টেজুমা রোম সম্রাট পঞ্চম চার্লসকে যে উপহার পাঠিয়েছিলেন সে সম্পর্কে ডুরার বলেছেন—'নতুন সোনার দেশ থেকে সম্রাটের জন্য যে জিনিস আনা হয়েছিল তা আমিও দেখেছি...কিন্তু সারা জীবনে আমি এমন কোনো জিনিস দেখিনি যা ওই সব জিনিসের মতো আমার হৃদয়কে নাড়া দিয়েছে।'

অ্যাটমসফেরিক পারস্পেকটিভ (Atmospheric perspective) — এরিয়াল পারস্পেকক্টিভ দেখুন।

অ্যাডভান্সিং কালার (Advancing colour) — অতি সংপৃক্ত উষ্ণ রং যেমন লাল, কমলা, হলুদ ইত্যাদি। অন্য রঙের পাশে দেখলে মনে হয় যেন চিত্রতলের সামনে ভেসে আছে। রঙের এই ভেসে ওঠাকে বলে অ্যাডভান্সিং কালার।

অ্যাডহেসিভ (Adhesive) — একটি তলের সাথে অন্য একটি তলকে আটকে রাখতে যে পদার্থ ব্যবহার করা হয়। সোজা কথায় অ্যাডহেসিভ হল আঠা। বহু শত বছর ধরে জৈব ও অজৈব উভয় ধরনের অ্যাডহেসিভ ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এ সবের মধ্যে কিছু কিছু অ্যাডহেসিভ শিল্পীদের উপকরণের ক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। আজকাল অবশ্য প্রাকৃতিক আঠার জায়গায় স্থান করে নিয়েছে অনেক ধরনের কৃত্রিম উপায়ে তৈরি সিনথেটিক অ্যাডহেসিভ। পরিচিত অ্যাডহেসিভগুলোর মধ্যে ভেজিটেবল গ্লু, অ্যানিম্যাল গ্লু বা সিরিশ আঠা, গঁদের আঠা বা গাম অ্যারাবিক যা অ্যাকসিয়া সেনেগাল বা বাবলা গাছের কষ দিয়ে তৈরি, তেঁতুল বিচির আঠা, সিনথেটিক রেসিন অ্যাডহেসিভ ইত্যাদি।

অ্যাডিটিভ কালার (Additive colour) — বিভিন্ন বর্ণের আলোক রশ্মিকে মিশিয়ে তৈরি নতুন একটি বর্ণ। অ্যাডিটিভ কালারে মূলবর্ণ তিনটি। লাল, নীল ও সবুজ। এই তিনটে রঙের রশ্মি সমান মাত্রায় মিশে সাদা রং তৈরি করে। লাল ও সবুজ মিশে তৈরি হয় হলুদ। লাল ও নীল মিশে তৈরি হয় ম্যাজেন্টা বা বেগুনি। আর নীল ও সবুজ মিশে হয় সায়ান বা ফিকে নীল। এ ধরনের বর্ণমিশ্রণ টেলিভিশনের পর্দায় ঘটে। এই তিনটে বর্ণের মাত্রার তারতম্য ঘটিয়ে সব ধরনের রং তৈরি করা যায়। অবশ্যই অ্যাডিটিভ রঙের এই বৈশিষ্ট্য পিগমেন্ট বা রঞ্জকের মিশ্রণের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়।

অ্যানামরফোসিস (Anamorphosis) — সোজাসুজি দেখলে যদি কোনো ছবিকে বিকৃত বলে মনে হয় অথচ সেই ছবিকে কোনো একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে অথবা বাঁকানো আয়নায় পড়া প্রতিচ্ছবিতে তার সঠিক ও প্রকৃত আকারটি পরিস্ফুট হয় তা হল অ্যানামরফোসিস। অ্যানামরফোসিস-এর সুবিদিত উদাহরণ হল হোলবাইনের আঁকা 'দি ফ্রেঞ্চ অ্যাম্বাসাডার' ছবিটি। ছবির নীচের দিকে একটা লম্বাটে বস্তু আছে যা সোজাসুজি দেখে বোঝার উপায় নেই।

ছবি নং ১৫০ পৃ. ৩৪৮

কিন্তু নীচের বাঁ দিকটা যদি একটু কাত করে চোখ বরাবর তুলে ধরা যায় তাহলে দেখা যাবে যে ওটা একটা মাথার খুলি।

অ্যানালগাস কালার
(Analogus colour)

বর্ণচক্র বা কালার হুইলে পাশাপাশি অবস্থিত রং গুলিকে বলে অ্যানালগাস কালার বা সাদৃশ্যযুক্ত বর্ণ।

অ্যানিম্যাল বা প্রোটিন গ্লু
(Animal or Protin glue)

পশুর চামড়া, হাড় ইত্যাদি থেকে প্রাপ্ত কলাজেন নামক পদার্থ থেকে প্রস্তুত আঠা। উপাদান বিশেষে এবং নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার প্রাপ্ত আঠা স্বচ্ছ বা কালচে হয়। এই কালচে আঠাকে সাধারণভাবে বলা হয় অ্যানিম্যাল গ্লু যা ক্যানভাস প্রাইমিং-এর ভিত্তি হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

অ্যান্টি-আর্ট
(Anti-art)

মার্সেল দুসঁপ-এর হাতে ১৯১৪ সাল নাগাদ পরিভাষাটি রূপ পায়। শিল্পকলার প্রকৃতিগত পূর্ব ধারণাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে দুসঁপ কোনো কাজের শিল্পগত চরিত্র বর্ণনা করতে গিয়ে এই পরিভাষাটির প্রচলন করেন। দুসঁপের ভঙ্গিই বলা যেতে পারে অ্যান্টি-আর্টের প্রতীকস্বরূপ। এই পরিপ্রেক্ষিতেই দুসঁপ মোনালিসার অনুকৃতিতে গোঁফ এঁকে দেন। লক্ষ করার বিষয়



নং ১০. দুসঁপ : L.H.O.O.Q. 1919। রঙিন প্রতিলিপির ওপর জল রং। ১৯.৭X১২.৪ সেমি।

হল এই কাজ করেছেন এমন একজন শিল্পী যিনি ইতোমধ্যেই শিল্পী হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছেন। প্রথম অ্যান্টি-আর্ট মুভমেন্ট হল দাদা।



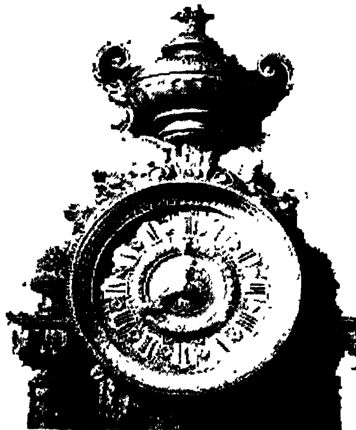
নং ১১. অ্যান্টিক : প্রাচ্য বৈশিষ্ট্যের গ্রিক ভাস্কর্য। মসোলাস। মার্বেল। উচ্চতা ৯ ফুট।

অ্যান্টিক (Antique)

হাজার হাজার বছর বা তার বেশি সময়ের শিল্পগত বা ইতিহাসগত বৈশিষ্ট্য আছে এমন বস্তু। বাংলা পরিভাষা পুরাবস্তু।

অ্যাপ্লায়েড আর্ট (Applied art)

এই শিল্পকলা অপরিহার্যভাবেই উপযোগিতামূলক ও ব্যবহারিক। কিন্তু একই সঙ্গে এর নকশাও এমনভাবে করা



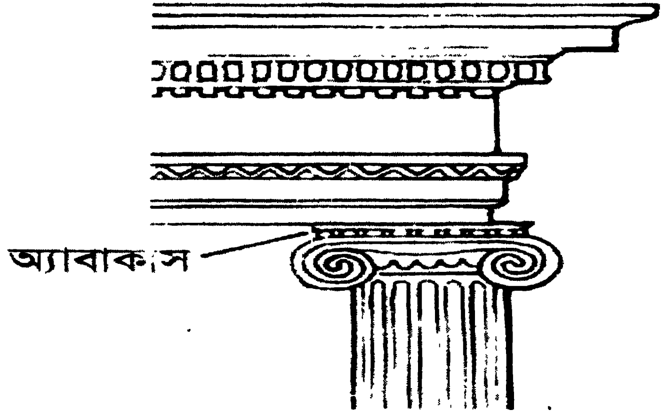
নং ১২. অলংকৃত ঘড়ি। প্রায়োগিক কলার নমুনা। অলংকরণের সঙ্গে কলকবজার কোনো সম্পর্ক নেই।

হয় যাতে তা নান্দনিকভাবেও তৃপ্তিদায়ক। যেমন, আসবাবপত্র, ধাতুর জিনিসপত্র, ঘড়ি, জামাকাপড়, টাইপোগ্রাফি প্রভৃতি জিনিসপত্রের নকশার বৈচিত্র্য উপযোগিতার পাশাপাশি পরিবেশের সৌন্দর্যও বাড়ায়।

অ্যাপ্লিক (Applique) — ব্যাপক অর্থে একটি তলের ওপর কোনো কিছুকে সৌন্দর্যপূর্ণ ভাবে ব্যবহার করা। কোনো একটি উপকরণ থেকে একটি নকশাকে কেটে নিয়ে সেইরকমই একটি তল বা অন্য আর একটি তলের ওপর লাগানো। সাধারণভাবে এই জাতীয় নকশা কাপড় কেটে সেলাই করে, এমব্রয়ডারি করে অথবা আঠা দিয়ে সেঁটে তৈরি করা হয়। লেপ, স্কার্ট, টেবিলের ঢাকনা ইত্যাদিতে এর ব্যবহার দেখা যায়।

অ্যাবাকা ফাইবার (Abaca fibre) — কলাগাছের সমগোত্রীয় অ্যাবাকা গাছ থেকে তৈরি শক্ত তন্তু। একে কলাতন্তুও বলা হয়। স্কাল্পচার বা কোলাজ তৈরিতে লাগে এমন হ্যান্ডমেড পেপার প্রস্তুত করতে অনেক শিল্পী এই তন্তু ব্যবহার করেছেন।

অ্যাবাকাস (Abacus) — স্থাপত্যের শীর্ষাংশের (capital) অগ্রভাগ।



অ্যাবস্ট্র্যাক্ট আর্ট (Abstract art) — স্বল্প বা সম্পূর্ণ বিমূর্ত বা নির্বস্তুক শিল্পকলা যার মধ্যে চেনা বস্তুজগৎ বা বাস্তবতা বেশিরভাগ অথবা সম্পূর্ণভাবে অনুপস্থিত থাকে। এই শিল্পরীতির ছবিতে বাস্তবে দৃষ্ট অবয়ব নকশায় রূপান্তরিত হয়। যার মধ্যে দর্শক উৎসের সঙ্গে সম্পর্কহীন কোনো স্বাধীন অর্থও স্থাপন করতে পারেন।

অ্যাবস্ট্র্যাক্ট ইলিউশনিজ্‌ম (Abstract illussionism) — শব্দটি প্রথম ব্যবহৃত হয় ১৯৬৭ সালে। ১৯৬০-এর শেষের দিকে এবং ১৯৭০-এ আমেরিকান শিল্পকলায় এক ধরনের

ঝোঁক দেখা যায়। সাধারণত ভাস্করদের শিল্পকর্মের অন্তর্গত কাজগুলো মাটিতে পেতে রাখা থাকে। ঠিক তেমনিই এই ধরনের ছবিতে বিভিন্ন জিনিসপত্র, আকৃতি, তুলির টানটোনগুলিও এমন কৌশলে আঁকা হয়, যে দেখে মনে হবে তা যেন চিত্রপটের ওপর ভেসে বেড়াচ্ছে। জ্যাক ল্যাম্বার্কের 'স্টার ওয়ার্স' এরকমই একটি শিল্পকর্ম।

ছবি নং ১৪৯ পৃ. ৩৪৭

অ্যাবস্ট্র্যাক্ট এক্সপ্রেশনিজ্‌ম (Abstract expressionism)

অমূর্ত বা নির্বস্তুক অভিব্যক্তিবাদ। শিল্পকলার এই ধারার মতবাদের উদ্ভব আমেরিকায় ১৯৪০-এর শেষ পর্বে এবং এই ধারা সক্রিয় ছিল ১৯৫০ পর্যন্ত। এই মতবাদ অনুযায়ী বিষয়বস্তুকে চিত্রায়িত করার পরিবর্তে বস্তুর ভাবাবেগের প্রকাশের ওপর জোর দেওয়া হয়। এই শিল্পরীতি অবশ্যই সুরিয়ালিজ্‌ম বা অধিবাস্তববাদীধারা থেকে নেওয়া ধারণার মিশ্রণ। সুরিয়ালিজ্‌মের অগ্রগণ্য শিল্পীদের অনেকেই দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের সময়ে আমেরিকায় নির্বাসনে ছিলেন। এই ধারা প্রবর্তনের ক্ষেত্রে তাঁদের অবদান অনেকখানি। একটু কঠোর ভাবে বলতে গেলে এই রীতি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদকে প্রশ্রয় দেওয়ার মার্কিনি দৃষ্টিভঙ্গি এবং বিশেষ করে ঐতিহ্য থেকে শিল্পকে মুক্ত করার প্রবণতা। অমূর্ত অভিব্যক্তিবাদী শিল্প যেমন সম্পূর্ণ বিমূর্ত ছিল না তেমনি পুরোপুরি প্রকাশবাদীও ছিল না। এই ধারার অধিবাস্তববাদীরীতির কৌশলানুগ স্বয়ংক্রিয় বা অনিয়ন্ত্রিত পেন্সিল বা তুলি চালনার মাধ্যমে ছবি ফুটিয়ে তোলা এই আঙ্গিকের বৈশিষ্ট্য। একই সঙ্গে এই আঙ্গিকের শিল্পীরা ঘনকবাদী ধারণার অগভীর চিত্রপট নিয়েও পরীক্ষানিরীক্ষা করেছেন। তথাপি এই রীতিকে শনাক্ত করার মতো বিশেষ কোনো রূপ নেই, শুধুমাত্র শিল্পসৃষ্টির সাধারণ অভিমুখ ছাড়া। তবে আদর্শ অ্যাবস্ট্র্যাক্ট এক্সপ্রেশনিস্ট চিত্রের মধ্যে দুটো ধরন লক্ষ করা যায়। এক. ক্যালিগ্রাফিক— মুক্ত এবং দ্রুততার সঙ্গে তুলি বা কালি কলম ব্যবহার করে সমগ্র চিত্রপটকে ভরাট করা। দুই. আইকনিক— যার মধ্যে কেন্দ্রীয়ভাবে একটি ফর্মের প্রাধান্য দেখা যায়। জ্যাকসন পোলক, ফ্রাঞ্জ ক্লাঁ প্রমুখের ছবি মূলত ক্যালিগ্রাফিক অন্যদিকে বারনেট, নিউম্যান, মার্ক রোথসের ছবি আইকনিক।

অ্যাবস্ট্র্যাকশন ক্রিয়েশন (Abstraction creation)

বিমূর্তবাদী শিল্পীদের একটি বড়ো সংগঠন। ১৯৩১ সালে প্যারিসে এটি গঠিত হয়। এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ফ্রান্স এবং

আরো অনেক দেশের ভাস্কর ও চিত্রশিল্পী। অধিবাস্তববাদী শিল্পের উত্থানের প্রতিক্রিয়ায় এবং কনস্ট্রাক্টিভিস্ট ও জ্যামিতিক শিল্প আন্দোলনের অনুপ্রেরণায় অগাস্তি হারবিন এবং জর্জে ভ্যান্টনগারলুর নেতৃত্বে এর প্রতিষ্ঠা।

অ্যাবোজো (Abbozzo) ছবির একরঙা অন্তর্স্তর। ছবির খসড়া। এর ভিত্তিতেই মূল ছবিতে রং চাপানো হয়।

অ্যালকিড পেন্ট (Alkyd paint) তেল রঙের মতো এক ধরনের রং কিন্তু লক্ষণীয়ভাবে তাড়াতাড়ি শুকোয়। এতে যে বাইন্ডার ব্যবহার করা হয় তা এক ধরনের পরিবর্তিত তৈলাক্ত অ্যালকিড রজন। এটা উদ্ভিজ আঠা থেকে প্রাপ্ত প্রাকৃতিক রজনের মতো নয়। অ্যালকিড তৈরি হয় অ্যালকোহল এবং অ্যাসিডের সংমিশ্রণে। পরে এর সঙ্গে তিসির তেল মিশিয়ে অ্যালকিড পেন্ট-এর বাইন্ডার তৈরি হয়। শিল্পে ব্যবহারের উৎকৃষ্ট রং হিসাবে দীর্ঘদিন ধরে স্বীকৃত। এই রং টারপেনটাইনে দ্রবীভূত হয়।

অ্যালবুমেন প্রিন্ট (Albumen print) ডিমের সাদা অংশ অর্থাৎ অ্যালবুমেন এবং নুনের প্রলেপ লাগানো কাগজের ওপর করা ফোটোগ্রাফিক প্রিন্ট। ব্যবহারের আগে সিলভার নাইট্রেট দ্রবনের দ্বারা সংবেদনশীল করে নেওয়া হয়। নিইপে সেন্ট ভিক্ট ফ্রান্সে ১৮৫৩ সালে এই পদ্ধতির প্রথম প্রচলন করেন। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত এই পদ্ধতি জনপ্রিয় ছিল।

অ্যালা প্রাইমা পেন্টিং (Alla prima painting) ইতালীয় শব্দ 'অ্যাতওয়াল্স' থেকে এসেছে। একটি মাত্র বর্ণ প্রলেপে ছবি আকার পদ্ধতি। সাধারণত এই পদ্ধতিতে সাদা চিত্রপটে কোনো অন্তর্স্তর ছাড়া গ্লেজিং বা রিটাচিং না করে এই পদ্ধতিতে ছবি আঁকা হয়।

অ্যালিগরি (Allegory) কথাটির বাংলা প্রতিশব্দ হল রূপক। সাহিত্যে বা শিল্পে আপাত উপস্থাপিত বিষয় বা দৃশ্যের আড়ালে থাকা অন্য একটি বিষয় বা অর্থের অস্তিত্ব।

ছবি নং ১৫২ পৃ. ৩৪৯

অ্যাসিটেট (Acetate) পাতলা শক্তিশালী, নমনীয় এবং স্বচ্ছ পর্দা। নানান কাজে ব্যবহার করা হয়। যেমন ছবি জড়ো করে রাখার সময় দুটো ছবির মাঝখানে এই পর্দা রাখা হয় একটা ছবি থেকে আর একটা ছবিকে পৃথক করতে। জল রঙের ছবি বাঁধাতে দেওয়ার আগে পর্যন্ত এই পর্দা দিয়ে মুড়ে রাখা হয়।

অ্যাসেন্ডার (Assender)

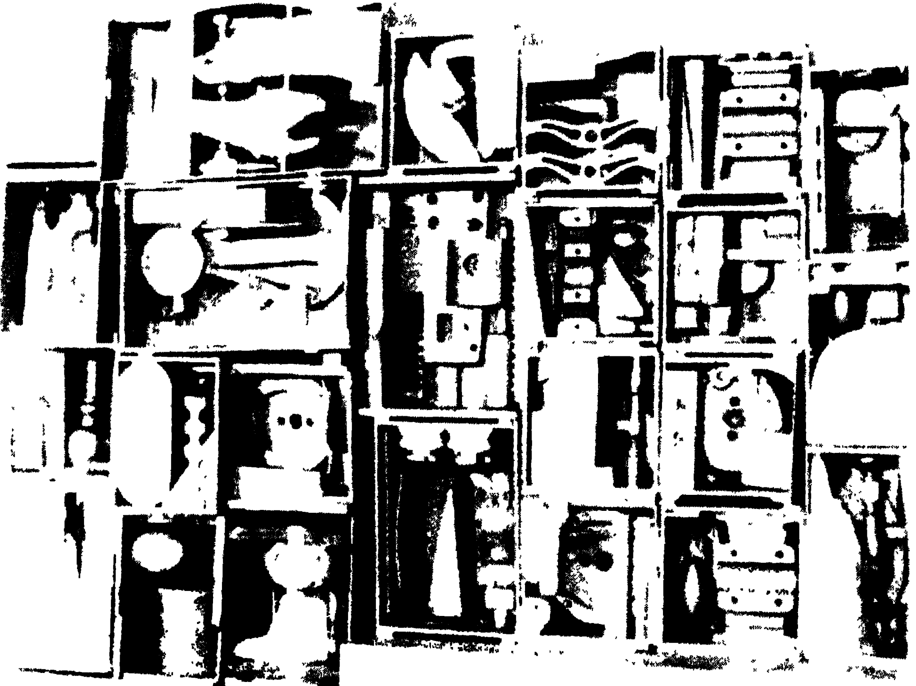
বাংলা বা ইংরেজি হরফের মূল উচ্চতার (ব/x) উপরের সব রকম টান বা আঁচড়কে বলে অ্যাসেন্ডার।

f t উ ঠ

অ্যাসেমব্লেজ (Assemblage)

কোনো একটা তল বা পটে ত্রিমাত্রিক বস্তু যেমন মোটা কাগজ, কাঠ, কাপড়, কাচ, খোলা, ধাতু, প্লাস্টিক, তার ইত্যাদি ব্যবহার করে তৈরি শিল্পকর্ম। এই কৌশলের উৎপত্তি কোলাজ থেকে। সাধারণভাবে অ্যাসেমব্লেজে কাগজের বদলে গ্রহণযোগ্যভাবে পুরু কোনো জিনিসই ব্যবহার করা হয়। অন্যদিকে কোলাজের ক্ষেত্রে সাধারণত ব্যবহার করা হয় পাতলা ও ফ্ল্যাট পেপার। এই রীতির শিল্পকর্ম জনপ্রিয়তা লাভ করে ১৯৫০-এর শেষ দিকে দাদাবাদের পুনরুজ্জীবনের সাথে।

নং ১৩. নেভেলসন : রয়াল টাইড। V। ১৯৬০। অ্যাসেমব্লেজ।





আ

আইকন (Icon)

সাধারণভাবে প্যানেলের ওপর আঁকা সাধু কিংবা ধর্মীয় চরিত্রের মূর্তি। শব্দটির উৎপত্তি গ্রিক eikon থেকে। অর্থ হল সাদৃশ্য। শব্দটি বাইজেনটাইন চার্চের যেসব মূর্তি আছে তার ক্ষেত্রে এবং পরবর্তীকালে গোঁড়া গ্রিক চার্চ ও রাশিয়ান চার্চের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এসব মূর্তিগুলোকে খুব পবিত্র বলে মনে করা হত এবং চিত্রিত ব্যক্তির সাথে সহজেই যোগাযোগ করা যাবে ভেবে এই ছবি আঁকা হত। কখনো-কখনো এসব প্রতিকৃতির চোখ এমনভাবে প্রসারিত করে আঁকা থাকত যেন পূজারিদের সম্মোহন করতে চায়। প্রতিকৃতিগুলির আকার ও মাধ্যমের মধ্যে তারতম্য থাকলেও এর আঙ্গিক এবং মানদণ্ডের ক্ষেত্রে চার্চের নির্দেশ ছিল খুব কড়া। এই কাজ খুব বড়ো



নং ১৪. ভার্জিন অব দি ভ্লাদিমির। ১১২৫ খ্রিস্টাব্দ। প্যানেলের ওপর এনকস্টিক।

হত না এবং প্যানেলের ওপর আঁকা হত। ষষ্ঠ শতাব্দীর খ্রিস্টানদের অট্টালিকার দেয়াল, সিলিং, মেঝে, ধর্মীয় স্থানগুলি এই ধরনের চিত্রে ভরতি থাকত। অষ্টম শতাব্দীতে এর বিরুদ্ধে একটা প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় এবং অনেক মূর্তি ভেঙে ফেলা হয়। 'আইকনক্লাস্ট' অর্থাৎ মূর্তিভঙ্গকারীরা বিশ্বাস করতেন আইকনে প্রকৃত উপাসনার চেয়ে পুতুলপুজোই বেশি, মানবাকৃতির মূর্তি আধ্যাত্মিকতাকে ফুটিয়ে তুলতে পারে না। এখনও রাশিয়া এবং গ্রিসে আইকন আঁকা হয়।

আইকনোগ্রাফি (Iconography) — প্রতিকৃতির রূপ নির্ণয় ও চর্চা। বিষয়বস্তুর প্রণালিবদ্ধ অনুসন্ধান, যেমনটা শৈলীর বিপরীত তাও আইনোগ্রাফি।

আইকনোলজি (Iconology) — সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের বিস্তৃত চর্চায় আলোকিত বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যা।

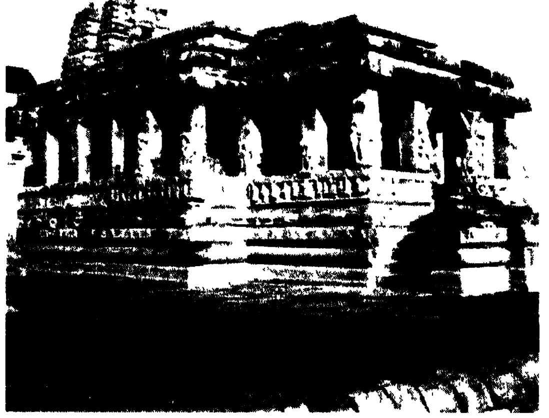
আই ক্যাচার (Eye catcher) — যখন একটি পার্ক বা বিস্তৃত বাগানের দৃশ্যের সমাপ্তি বা ছেদ ঘটাবার জন্য একটি অলংকৃত বাড়িকে ব্যবহার করা হয় সেই বাড়িটিকে বলে আই ক্যাচার।

আইডিয়াল (Ideal) — প্রকৃতিতে একই ধরনের বা একই শ্রেণিভুক্ত স্বতন্ত্র যে সব রূপ বা আকার আছে তার চরম উৎকর্ষকে একটি মাত্র রূপ বা আকারের মধ্যে শৈল্পিকভাবে ঐক্যবদ্ধ করা। আইডিয়াল বা আদর্শের উদ্দেশ্য হল কোনো কিছুকে যেমন ভাবে দেখা যেতে পারে তার চেয়েও বেশি নিখুঁত বা পূর্ণাঙ্গ করা। অবশ্যই সেই পূর্ণাঙ্গতা শিল্পীর নিজস্ব ধারণা অনুযায়ী। এই প্রবণতার মূল নিহিত ছিল রেনেসাঁসের নিও প্লেটোনিজ্‌মের মধ্যে এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইউরোপের শিল্পীদের ওপর সবচেয়ে বেশি প্রভাব সৃষ্টি করেছিল।

আই লেভেল (Eye level) — একটি কাল্পনিক অনুভূমিক রেখা যা দর্শকের চোখ বরাবর অতিক্রম করে যায়। রৈখিক বা সমান্তরাল পারস্পেকটিভে এই রেখাই হল শিল্পী বা অঙ্কিত বস্তুর অবস্থানের নির্দেশ। অর্থাৎ অঙ্কিত বস্তু যদি আই লেভেলের ওপরে থাকে তবে অপসৃত রেখাগুলি নিম্নমুখী হয় আর যদি নীচে থাকে তাহলে অপসৃত রেখাগুলি ঊর্ধ্বমুখী হয়।

আইহোল — প্রাক চালুক্য যুগের শিল্পের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হল আইহোল দুর্গা মন্দির। দক্ষিণভারতের বিজাপুর অঞ্চলে এই মন্দির অবস্থিত। চালুক্য বংশের প্রতিষ্ঠাতা প্রথম পুলকেশী।

নং ১৫. আইহোল : দুর্গামন্দির। চালুক্য আমল। ৫৫০ খ্রিস্টাব্দ।



আইহোলের দুর্গামন্দির গুপ্তযুগের মন্দিরগুলির থেকে আলাদা। একটিমাত্র মন্দির যা টিকে আছে সেটি অনেকটা গুহামন্দিরের মতো। মন্দিরের প্রান্তভাগ অর্ধগোলাকৃতি। মন্দিরের চারদিকে স্তম্ভের ওপর আছে ঘোরানো খোলা বারান্দা। বারান্দার ওপরের ছাদ সমতল। মন্দিরের ভেতরে কয়েকটি মূর্তি খোদাই করা আছে। গর্ভগৃহের সমতল ছাদের ওপর আছে একটি স্বল্পোন্নত শিখর। কার্নিসগুলি গোলাকৃতি এবং অলংকরণহীন।

আউটলাইন (Outline)

শব্দটির বাংলা পরিভাষা খসড়া। সীমারেখাও বলা হয়। ড্রয়িং-এ যে কাল্পনিক রেখাগুলি আলোছায়া, অভ্যন্তরীণ আদল



নং ১৬. লিয়োনার্দো দা ভিঞ্চি : ড্রয়িং। দি ভার্জিন অ্যান্ড চাইল্ড উইথ এ ক্যাট। ১৪৭৮ - ৮১ খ্রিস্টাব্দ।

বা রং বাদ দিয়ে শুধু বস্তু বা দেহের সীমানা নির্দেশ করে তাই হল আউটলাইন।

আকাদেমি (Academy)

পেশাদার প্রতিষ্ঠানে যুক্ত শিল্পী অথবা পণ্ডিতদের সমিতি। শব্দটি এবং এর ধারণার উৎস গ্রিক সংস্কৃতিতে। যেমন অ্যাথেনসের কাছে ৩৮৭ খ্রিস্ট পূর্বাব্দে প্রতিষ্ঠিত দার্শনিক স্কুল প্লেটোর আকাদেমি। প্রথম সরকারি ভাবে স্থাপিত আর্ট আকাদেমি হল Accademia del disengo। ১৫৬৩ খ্রিস্টাব্দে ফ্লোরেন্সে ভ্যাসেরি ডি. মেদিচি এবং মাইকেলাঞ্জেলো এক সঙ্গে মিলে এই আকাদেমি স্থাপন করেন। এটা ছিল মধ্যযুগীয় গিল্ড ব্যবস্থার বিরুদ্ধে একটা বিদ্রোহ। আকাদেমির লক্ষ্য ছিল চিত্রকর ও ভাস্করদের সামগ্রিকভাবে শিল্পতত্ত্ব এবং উচ্চশিক্ষার মধ্য দিয়ে করণকৌশলগতভাবে দক্ষ এবং উন্নত পেশাদার করে গড়ে তোলা। এই লক্ষ্যেই অষ্টাদশ শতাব্দী নাগাদ আকাদেমির পরিচালকরা ধ্রুপদিমানানুগ এক পূর্ণাঙ্গ শিল্প শিক্ষাক্রম প্রবর্তন করতে প্রয়াসী হন। পৃথিবীর বহুদেশে ছোটো বড়ো বহু আকাদেমি স্থাপিত হয়েছে। ১৭৬৮ সালে লন্ডনে রয়াল আকাদেমি অব আর্টস স্থাপিত হয়। এটা ব্যতিক্রমীভাবে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ মুক্ত ছিল। সেই সঙ্গে এতে ছিল আপাতমুক্ত বার্ষিক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা। আমেরিকায় আমেরিকান আকাদেমি অব ফাইন আর্টস প্রতিষ্ঠা হয় ১৮০২ সালে। তবে জন টার্নবুল এর খেয়ালি এবং রক্ষণশীল একনায়কত্বের বিরুদ্ধে তরুণ চিত্রকররা পদত্যাগ করে ১৮২৬ সালে ন্যাশনাল আকাদেমি অব ডিজাইন স্থাপন করেন। কলকাতায় প্রথম আকাদেমি গড়ে ওঠে 'ইন্ডিয়ান আকাদেমি অব আর্ট' ১৯২০-তে। হেমেন্দ্রনাথ মজুমদার, ভবানী লাহা, ধীরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী, অতুল বসু প্রমুখদের উদ্যোগে বিডন স্ট্রিটে। তবে এই সংস্থা নামেই আকাদেমি ছিল। এরপর সর্বভারতীয় ভিত্তিতে চিত্রকলা, ভাস্কর্য ইত্যাদি শিল্পকর্ম সৃষ্টিতে উৎসাহ ও প্রেরণা দিতে কলকাতার বিশিষ্ট মানুষদের পৃষ্ঠপোষকতায় ও প্রত্যক্ষ উদ্যোগে গড়ে ওঠে 'ইন্ডিয়ান আকাদেমি অব ফাইন আর্টস' ১৯৩৩ সালের ১৫ আগস্ট। এই উদ্যোগে যুক্ত ছিলেন স্যার ডেভিড এজরা, মহারাজা প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর, শিল্পপতি রাজেন্দ্রনাথ মিত্র প্রমুখ। সংস্থার নামের সঙ্গে 'ইন্ডিয়ান' শব্দটি থাকাতে বোম্বাইতে প্রবল আপত্তি ওঠে। আপত্তির কারণ এটি সর্বভারতীয় সংস্থা নয় তাই 'ইন্ডিয়ান' শব্দটি থাকতে পারবে না। বোম্বাই-এর

আপত্তিতে দিল্লি থেকে ভাইসরয় লর্ড উইলিংডন মধ্যস্থতা করে 'ইন্ডিয়ান' শব্দ বাদ দেওয়ার ব্যবস্থা করেন এবং নাম হয় 'আকাদেমি অব ফাইন আর্টস্।' বহু বিখ্যাত মানুষ এবং শিল্পী এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তখন ঠিকানা ছিল ২৭ নং চৌরঙ্গি রোড, ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম। ক্যাথিড্রাল রোডের বাড়িটির উদ্বোধন হয় ১৯৬০ সালের ১১ সেপ্টেম্বর নন্দলাল বসুর প্রদর্শনীর মধ্য দিয়ে। আকাদেমির নিজস্ব বাড়ি ও গ্যালারি গড়ে তোলার পেছনে যাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম ও উদ্যোগ ছিল তিনি হলেন বিশিষ্ট শিল্পরসিক প্রয়াতা লেডি রানু মুখার্জি।

আকাদেমিক আর্ট (Academic art) ছবি নং ১৫৩ পৃ ৩৪৯

১৭০০ - ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে ইউরোপে বিকশিত আকাদেমি-গুলির নির্দেশ অনুযায়ী সৃষ্ট শিল্পকলা।

আকাদেমি ফিগার (Academy figure)

আকাদেমি নির্দেশিত ঘরানা অনুযায়ী আঁকা পুরুষ বা নারীর নগ্ন মূর্তি। সাধারণভাবে এটা আকাদেমির ছাত্রদের ফিগার



নং ১৭. অ্যান্টনি ওয়াটো হাত ও পায়ের চিত্রানুশীলন। ১৭১৫। লাল ও কালো চক।

ড্রয়িং-এর অনুশীলন। এই ফিগারগুলি হত পূর্ণাবয়বের অর্ধেকের একটু ছোটো এবং বীরের ভঙ্গিমায় আঁকা।

আগলি রিয়ালিজম্ (Ugly realism)

১৯৭০-এ-বার্লিন এ কর্মরত কিছু শিল্পীর সৃষ্ট কাজ। এটা আবশ্যিকভাবেই ১৯২০-র Neue Sachlichkeit (New objectivity)-এর পুনরুজ্জীবন। যুদ্ধোত্তর যুগের এই শৈলী ছিল চরম সাদৃশ্যবাদী। এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন জোহনেস গ্রুটেৎসকে, ম্যাথিয়াম কিপেল, উলফ্‌গ্যাঙ পেট্রিক প্রমুখরা। ছবি নং ১৫৪ পৃ. ৩৫০

আঙ্গিক

ফর্ম দেখুন।

আতলিয়ে (Atelier)

শিল্পীর কর্মশালা বা ইংরেজি স্টুডিয়োর ফরাসি পরিভাষা: 'আতলিয়ে লিবারস' নামে প্রথা বহির্ভূত কিছু আকাদেমি গড়ে

উঠেছিল উনবিংশ শতাব্দীতে। যেখানে মডেলের (দেহাঙ্কনের জন্য মানুষ) ব্যবস্থা করা হলেও শিক্ষাদানের কোনো ব্যবস্থা ছিল না। কোনো কোনো আতলিয়েতে অনেক শিল্পী এসে মিলিত হতেন। যেমন গ্লেরসে-র আতালিয়েতে তরুণ চিত্রকর মনে, রেনোয়া, সিসলি এসে মিলিত হতেন।

আধুনিকতা

মডার্নিজ্‌ম দেখুন।

আন্ডার গ্লেজ
(Under glaze)

চিনেমাটির জিনিসে জেল্লা করার আগে যে অলংকরণ করা হয়, যা জেল্লা (glaze) পোড়াবার পর স্থায়ী হয়ে যায়।

আন্ডার পেন্টিং
(Under painting)

লেয়িং ইন দেখুন।

আপার কেস
(Upper case)

টাইপোগ্রাফির ক্ষেত্রে বড়ো হরফগুলি যা ছোটো হরফের ঠিক বিপরীত এরকম হরফগুলি হল আপার কেস। এক ধরনের কাঠের খোপে এই হরফ সাজিয়ে রাখা হয়।

আবু সিম্বাল
(Abu simbel)

নতুন ইজিপ্ট রাজ্য, নিম্ন নুবিয়ার একটি স্থান। রামেসিস-এর জন্য পাহাড়ের ঢাল কেটে তৈরি প্রকাণ্ড দুটি মন্দির। খ্রিস্টপূর্ব ১৩০৪- ১২৩৭-এ এটি নির্মিত। ১৯৬৭ সালে সেচের কাজের প্রয়োজনে নীলনদে উঁচু করে বাঁধ নির্মাণ হলে জলের উচ্চতা বৃদ্ধি পায়। ফলে মন্দিরের অনেকটা অংশ জলের তলায় চলে যায়। তখন মন্দিরকে টুকরো টুকরো কেটে পাশের একটি উঁচু জায়গায় সেই টুকরোগুলিকে পর্যায়ক্রমিক ভাবে সাজিয়ে মন্দিরকে পুনর্গঠিত করা হয়। এইভাবে কেটে কেটে পুনর্গঠিত করার জন্য মন্দিরটি একটি নতুন বৈশিষ্ট্য লাভ

নং ১৮. আবুসিম্বাল মন্দিরের একটি প্রবেশ মুখ।



করেছে। আবু সিম্বালের ছোটো মন্দিরটির প্রবেশ পথে রাজারানির ৬টি দাঁড়ানো মূর্তি আছে।

আর্কিটাইপ
(Archetype)

বাংলায় 'আদিরূপ'। 'প্রত্নপ্রতিমা'ও বলা হয়ে থাকে। যখন কোনো প্রতীক বা আদর্শ চরিত্র শিল্পে, সাহিত্যে, সংস্কৃতিতে বারে বারে গুরুত্বের সঙ্গে ব্যবহার হয় তখন তা যেন মানবিক অভিজ্ঞতার মূল হিসাবে প্রতিষ্ঠা পেয়ে যায়। এই বিশেষ প্রতীক বা চরিত্রই আর্কিটাইপ।

আর্চ
(Arch)

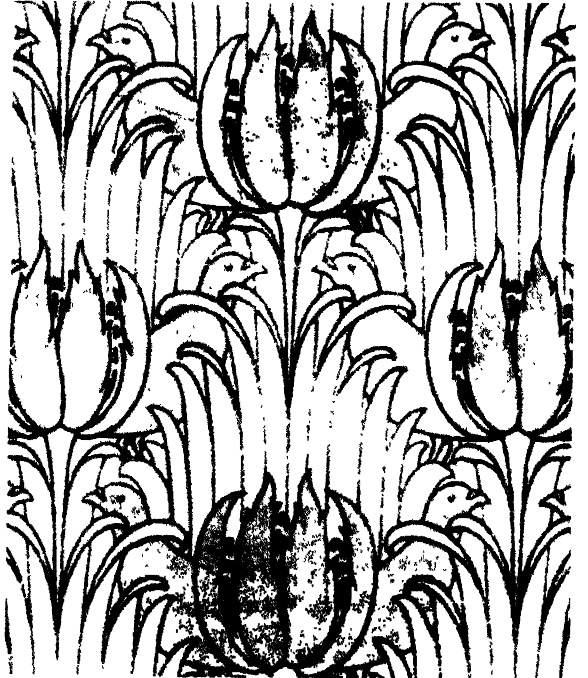
কোনো প্রবেশ মুখের প্রসারণ এবং তার ওপরের অংশ, ছাদ ইত্যাদির ভারকে ঠেলে রাখার একটি স্থাপত্যগত কৌশল।



নং ১৯. কলাড সাইমনের আর্চ। ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দ। সিরিয়া।

সাধারণত এটি বাঁকানো কাঠামো যেমন উল্টো 'U' বা 'V' আকারের হয়। প্রকৃত আর্চের বৈশিষ্ট্য হল আর্চের দৃঢ়তা সৃষ্টি হয় ভার বা ওজন বহনের মধ্য দিয়ে অর্থাৎ যে ওজনকে আর্চ বহন করে সেটাই আর্চের দৃঢ়তার উৎস। বিভিন্ন রকমের আর্চ হল— বাস্কেট আর্চ, চ্যানেল আর্চ, হর্সশো আর্চ, স্টিলটেড আর্চ, সেগমেন্টাল আর্চ ইত্যাদি।

আর্ট অ্যান্ড ক্রাফ্ট মুভমেন্টস (Art and craft movements) কারিগরি উন্নয়ন ও ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন সংস্কার আন্দোলন। ১৮৮২ সালে ইংল্যান্ডে আর্টস অ্যান্ড ক্রাফ্টস এক্সিবিশন সোসাইটি প্রতিষ্ঠার পর এই নামকরণ হয়। ক্রমবর্ধমান শিল্পায়নের বিপুল উৎপাদনের ফলে উদ্ভুত পরিস্থিতিতে সমস্যাক্রান্ত হস্তশিল্পীদের নির্মিত দ্রব্যের পুনর্মূল্যায়ন করাই এর অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। জন রাস্কিন এবং বিশিষ্ট স্থপতি অগাস্টাস পুগিন এই আন্দোলনের একটা ভিত্তি গঠন করেন। এর পর এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন উইলিয়ম মরিস যিনি মধ্যযুগীয় গিল্ড প্রথার পুনরুজ্জীবন চাইতেন। এর সঙ্গে যুক্ত শিল্পী ও কারিগররা নানা শৈলীতে কাজ করলেও সাধারণভাবে ব্যবহার্য ও সজ্জার দ্রব্যই বানাতেন। এই আন্দোলন বাউহাউসের ওপরেও কিছুটা প্রভাব ফেলেছিল।



নং ২০. চার্লর্স ভোসে · ওয়াল পেপার। টিউলিপ অ্যান্ড বার্ড। ১৮৯৬।

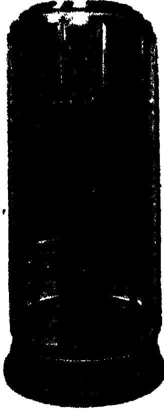
আর্ট অ্যাপ্রিসিয়েশন (Art appreciation)

শিল্পগুণ বিচার দেখুন।

আর্টওয়ার্ক (Artwork)

আঁকা, ফোটোগ্রাফ এবং টাইপ করা বিষয় বা বিবরণ অথবা এই তিনটের সম্মিলিত রূপ এমনভাবে তৈরি করা হয় যা মুদ্রণ বা অন্য কোনোরকম প্রতিলিপিকরণের কাজে ব্যবহার করা যায় তা আর্টওয়ার্ক বলে পরিচিত। তবে এই পরিভাষা মূলত ছাপাখানা এবং বিজ্ঞাপন সংস্থায় চলে। ব্যাপক অর্থে শিল্পীকৃত যে কোনো ছবিকেই আর্টওয়ার্ক বলা হয়।

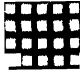
আর্ট ডেকো (Art deco)



নং ২১. ডিসপ্লে ক্যাবিনেট : পল ফলোট। ১৯২৫-এ প্যারিসে প্রদর্শিত। কালো কাঠের ওপর হাতির দাঁতের খচিত নকশা।

১৯২৫ সালে প্যারিসে মহাপ্রদর্শনী 'Exposition Internationale des Arts Decoratifs et Industriels Modernes' অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রদর্শনীতে সজ্জামূলক শিল্পরীতির ওপর জোর দেওয়া হয়েছিল। এসবের মধ্যে ছিল রৈখিক, মসৃণ নকশার প্রাধান্য যাতে আধুনিক প্রযুক্তির প্রতিফলন ঘটেছিল। এই শিল্পশৈলীর নাম আর্ট ডেকো। প্রসঙ্গত অপর একটি শিল্পরীতি আর্ট ন্যুভোর উল্লেখ করা যায়। আর্ট ন্যুভোতে গুরুত্ব পেয়েছিল বিলাসদ্রব্যের ব্যবহার যেমন ব্রোঞ্জ, হাতির দাঁত, মূল্যবান চামড়া ইত্যাদি দিয়ে তৈরি জিনিস। অন্যদিকে 'আর্ট ডেকোর' ক্ষেত্রগুলি ছিল আসবাবপত্র, স্থাপত্য, আলংকারিক শিল্প।

আর্ট ন্যুভো (Art nouveau)



সজ্জাধর্মী এক শৈলী। ১৮৯০ থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত নকশার (design) সমস্ত ক্ষেত্রকে প্রভাবিত করেছিল। এই সময়ের বহু নকশাকার ও স্থপতির কথাই ছিল যুগোপযোগী 'নতুন শৈলী' সৃষ্টি কর। আর্ট ন্যুভো বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নামেও পরিচিত ছিল। যেমন জার্মানিতে 'ফুসেনস্টাইল', স্পেনে 'মদার্নিস্তা', অস্ট্রিয়াতে 'সেজেশনস্টাইল', ইতালিতে, 'স্তাইল লিবার্তি' ইত্যাদি। আর্ট ন্যুভোর প্রধান গুরুত্ব হল যে এই রীতি উনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাসবাদকে বাতিল করে দিয়েছিল। আর্ট ন্যুভোকে প্রতীকবাদ ও চারুকারু আন্দোলনের সম্মিলিত একটি ধারা বলা যেতে পারে। এই শৈলীর উপজীব্য বিষয়ের মধ্যে আছে সাবলিল ছন্দের ঢেউ খেলানো রেখা, মৎসকন্যা, সাপ, ময়ূর, লম্বা ঢেউখেলানো চুলের নারী ইত্যাদি। যদিও আর্ট ন্যুভোর মুখ্য প্রকাশ ঘটে স্থাপত্যকলা এবং ব্যবহারিক কলায় তথাপি বহু ভাস্কর ও চিত্রশিল্পী এর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন।



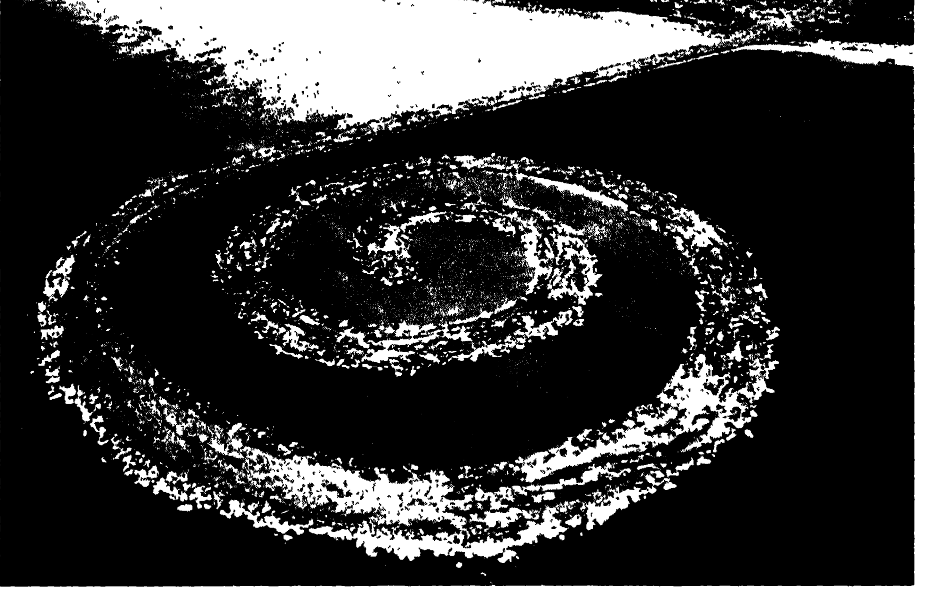
নং ২২. চার্লস রেনি ম্যাকিনটোশ : চেয়ার। ১৯০২।

আর্ট ফর আর্টস সেক (Art for arts sake)

কলাকৈবল্যবাদ। উনবিংশ শতাব্দীর নন্দনতাত্ত্বিক ব্যাখ্যার মূল কথা। এই ধারণার প্রবক্তা ছিলেন বোদলেয়ার এবং গোতিয়ে। বোদলেয়ারের ওপর লেখা এক নিবন্ধে ইংরেজ কবি সুইনবার্ন এই শব্দগুচ্ছ প্রথম ব্যবহার করেন।

আর্থ আর্ট (Earth Art)

১৯৬০ থেকে পরিভাষাটি চালু হয়েছে। প্রদর্শনীগৃহের ভেতরে বা মুক্ত অঙ্গনে তুষার, পাথর, ঘেসোজমি বা মাটির মতো



নং ২৩. স্মিথসন : স্পাইরাল জেটি। ১৯৭০। সল্টলেক, উটা। লম্বায় ৫০০ মিটার। কালো বেসাল্ট পাথর, চুনাপাথর, মাটি এবং লাল এলগি দিয়ে নির্মিত।

কোনো প্রাকৃতিক উপাদান দিয়ে তৈরি কোনো ভাস্কর্যকে বোঝাতে এই শব্দটি ব্যবহার করা হয়।

আর্থ কালার (Earth Colour)

আক্ষরিক ভাবে যে সমস্ত রঞ্জক মাটি হিসেবে বা খনি থেকে সংগ্রহ করে রং তৈরি করা হয় তা আর্থকালার বলে পরিচিত। সাধারণভাবে এইসব রং হল ধাতব অক্সাইড যেমন বাদামি, হলুদ, গেরিমাটি ইত্যাদি। এগুলো রাসায়নিক ভাবেও স্থায়ী এবং সেই কারণে বহুদিন পর্যন্ত এই রং অপরিবর্তিত থাকে।

আর্দেন ওয়্যার (Earthen ware)

ছবি নং ১৫৫ পৃ. ৩৫০

বাংলায় মৃৎপাত্র। আসলে এইসব জিনিসপত্র মাটি দিয়ে তৈরি করে কমবেশি ৭০০° সেলসিয়াসে পুড়িয়ে নেওয়া হয়। এতে গ্লেজ প্রক্রিয়াকরণ না করলে এর গায়ের রন্ধ্রকূপ (Porous) বজায় থাকে।

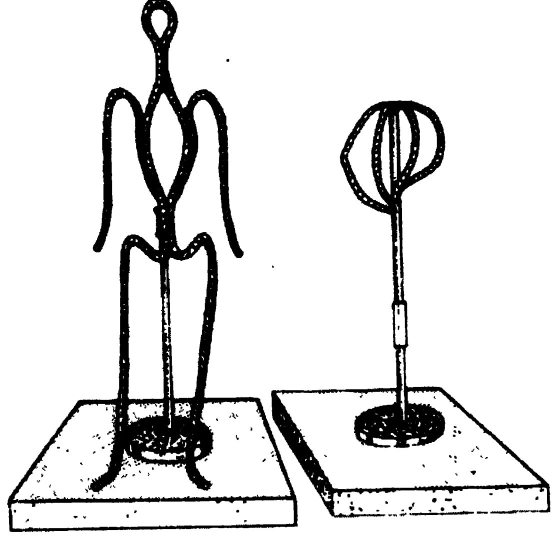
আভঁ গার্দ (Avant-garde)

ফরাসি এই পরিভাষার অর্থ অগ্রদূত। অর্থাৎ যাঁরা এগিয়ে আছে। আভঁ গার্দ প্রথাসিদ্ধ নয় এমন শিল্প অথবা তা নতুন

এবং পরীক্ষানিরীক্ষাধর্মী। একদা এই শব্দটি দ্বারা চালবাজি বা কিছু একটা করে শোরগোল তোলার প্রবণতাকেও বোঝানো হত।

আর্মেচার (Armature)

ভাস্কর্যের অভ্যন্তরীণ অবলম্বন। সাধারণভাবে ধাতুর তৈরি কঙ্কালবৎ কাঠামোকার্য। প্লাস্টার, মাটি, মোম সহ অন্যান্য নরম



উপাদান যা নিজেকে অবলম্বন দিতে অসমর্থ তাদের ক্ষেত্রে আর্মেচার জরুরি। এছাড়া জানলার জন্য তৈরি লোহার ফ্রেম যাতে স্টেনগ্লাস ধরে রাখা হয় তাকেও আর্মেচার বলে।

আরলি ইংলিশ (Early English)

ইংলিশ গথিক স্থাপত্যের আদি ধরন। এর আদর্শ হল গরাদ ছাড়া সরু এবং সূচাগ্র জানলা। এই শৈলীর আবির্ভাব ক্যান্টারবারি ক্যাথিড্রালের সংগীতগৃহের নির্মাণের মধ্যে। যার শুরু হয়েছিল ১১৭৪ খ্রিস্টাব্দে। প্রায় একশো বছর পরে উর্ধ্বাংশ সজ্জিত এক নতুন শৈলী দ্বারা আরলি ইংলিশ রীতি অপসৃত হয়।

ছবি নং ১৫৬ পৃ. ৩৫১

আলতামিরা (Altamira)

উত্তর স্পেনের একটি স্থান। ১৮৭৯ সালে এখানে প্রথম প্রাগৈতিহাসিক গুহাচিত্র আবিষ্কৃত হয়। প্রথম দিকে এটা জালিয়াতি ভেবে বাতিল হয়ে যায়। শেষে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে এই ধারণা ভুল প্রমাণিত হয় এবং আবিষ্কৃত গুহাচিত্র আসল বলেই স্বীকৃত হয়। প্রায় ১৩ হাজার খ্রিস্ট পূর্বাব্দে আঁকা এই চিত্রাবলিতে নানা জীবজন্তুর ছবি আছে। যার মধ্যে আছে একটি আহত বাইসনের অসামান্য ছবি। বাস্তবরীতিতে অঙ্কিত

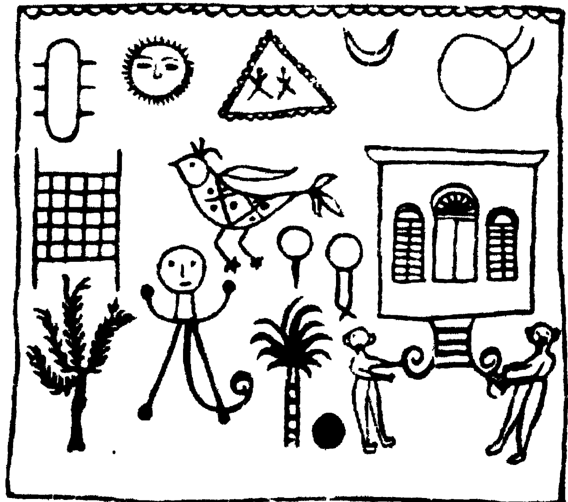


নং ২৪. আলতামিরার গুহাচিত্র। ১৩০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ। স্পেন।

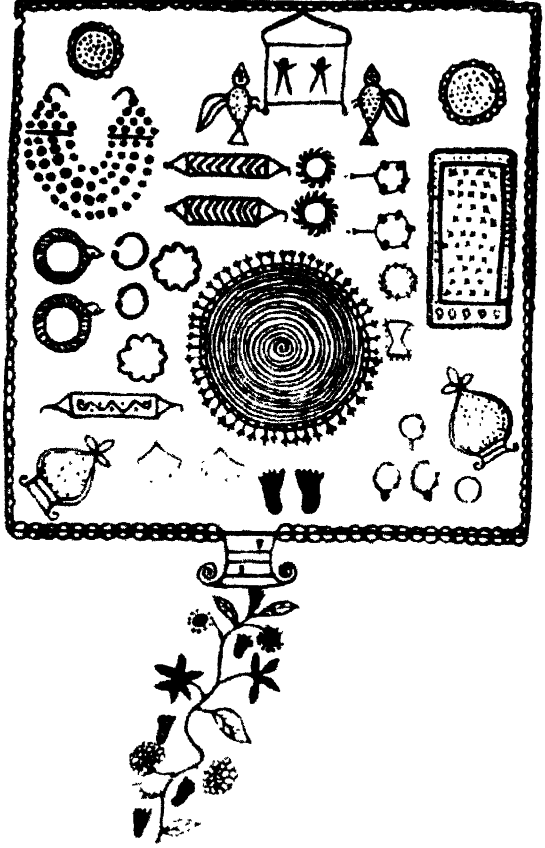
এই ছবিগুলির সাথে একমাত্র ফ্রান্সের লাসকোর গুহাচিত্রের তুলনা চলে।

আলপনা

পুজা-পার্বণ, উৎসব-অনুষ্ঠান, নানারকম আচার উপলক্ষ্যে ঘরের মেঝে বা উঠোনে আঁকা নকশা। দেয়ালেও আঁকা হয়। সাধারণভাবে মেয়েলি শিল্পকর্ম। তবে পুরুষরাও আঁকে। 'আলপনা আঁকা' বলা হয় না, বলা হয় 'আলপনা দেওয়া'।



নং ২৫. সেঁজুতির ব্রতর আলপনা।



নং ২৬. লক্ষ্মীর ব্রতর আলপনা।

মুখ্যত হিন্দু সংস্কৃতি থেকে উদ্ভুত হলেও এই শিল্পকলা এখন কার্যত ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র লাভ করেছে। উপকরণ হিসাবে এর জন্য আতপ চাল বেটে গুঁড়ো করে জলে ভিজিয়ে সাদা রং তৈরি করা হয়। একে 'পিটুলি' বলে। সাধারণভাবে আলপনা সাদা রঙে আঁকা হলেও আলপনায় রঙের ব্যবহারও দেখা যায়।

আজকের আলপনা যাই হোক না কেন এর ভ্রূণ ছিল আদিম গুহাচিত্রে 'জাদু' করার ছবিতে। এই সব ছবিতে এমন অনেক সংকেত বা প্রতীক ব্যবহার করা হয়েছে যার মধ্যে আজকের আলপনার বহু মোটিফ লুকিয়ে আছে। যদিও আলপনার প্রচলিত বহু চিহ্নের মূল তাৎপর্য আজ হারিয়ে গেছে। আসলে আলপনার চিহ্নগুলো আঁকা হত একটি বিশ্বাস থেকে। যেন বিশেষ চিহ্ন বা প্রতীক আঁকলে বিশেষ ধরনের প্রত্যাশা পূর্ণ হবে। সেই কারণেই হাতের ছাপ, পায়ের ছাপ,

ফুল, সূর্য,পান, কড়ি, মাছ ইত্যাদির চিত্র যা আলপনায় ব্যবহৃত হয় নানা ধরনের তাৎপর্য পূর্ণ। আলপনাকে বাংলার একান্ত সাংস্কৃতিক লক্ষণ বলে মনে করা হলেও একথা ঠিক যে আমাদের দেশের বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন নামে আলপনা প্রচলিত আছে। যেমন মহারাষ্ট্রে ও উত্তর প্রদেশের কিছু জায়গায় এর নাম রঙ্গোলি, বিহারে অরিপন, ওড়িষায় ঝঙ্গতী, মধ্যভারতে মণ্ডন,হিমাচল-হরিয়ানায় লিখনুয়া, গুজরাটে সাখিরা, অন্ধ্রে মুঙ্গলি, তামিলনাড়ু-কেরলে কোলম। সাধারণভাবে আলপনাকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। ব্রত কথার আলপনা, বৃত্তাকার আলপনা ও ফুল লতা। এছাড়াও আলপনার বর্গীকরণ করতে গিয়ে কেউ কেউ আলপনাকে দুইভাগে ভাগ করেছেন। যেমন কামনাত্মক এবং নান্দনিক। স্বভাবতই এই দুই ধরনের আলপনার ভিত্তি হল যথাক্রমে আচার এবং আনন্দানুষ্ঠান। ফলে এই সব আল্পনায় উপজীব্য মোটিফ বা প্রতীকও ভিন্ন চরিত্রধর্মী। একটিতে মোটিফের ব্যবহারের পিছনে থাকে 'জাদু বিশ্বাস' অন্যটিতে নিছক সৌন্দর্য সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা।



ই

ইউনিক্যাল (Unical)

হাতের লেখা বা ক্যালিগ্রাফির একটি ধরন। যার প্রচলন হয়েছিল খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতাব্দী। পঞ্চম থেকে সপ্তম শতাব্দীতে ইউরোপীয় পাণ্ডুলিপিতে ইউনিক্যালের বহুল ব্যবহার হয়েছিল। ইউনিক্যালের হরফের ছাঁদ ছিল রোমান বড়ো হাতের অক্ষরের মতো তবে হরফের কোনাগুলি তীক্ষ্ম ও সুচারু।

ইউস্টোন রোড স্কুল (Euston Road School)

১৯৩৭ সালে উইলিয়াম কোল্ড স্ট্রিম-এর দ্বারা প্রাথমিকভাবে চিত্রকলার স্কুল হিসাবে প্রতিষ্ঠিত এক সমিতি। উইলিয়াম কোল্ড স্ট্রিম শিল্পকলায় চরম আধুনিক ঝোঁকের বিরোধিতা করতে চেয়েছিলেন। লন্ডনের ইউস্টোন রোডে এই স্কুলটি অবস্থিত ছিল বলেই এই নাম। ১৯৩৯ সালে এই গোষ্ঠী আনুষ্ঠানিক ভাবে বন্ধ হয়ে যায়। অন্যান্য চিত্রকরদের সঙ্গে এই গোষ্ঠীর সদস্য ছিলেন ভিক্টর পাসমোর, রডরিগে ময়নিহান।

নং ২৭. উইলিয়ম কোল্ডস্ট্রিম : শ্রীমতী উইনিফ্রেড বাঙ্গারের প্রতিকৃতি। ১৯৩৬-৩৭ খ্রিস্টাব্দ।



এঁদের শিল্পকর্ম ছিল অবয়বধর্মী এবং বর্ণদমিত। ব্রাশিং এর কাজও ছিল পরিচ্ছন্ন। অগ্রণী ব্রিটিশ ইম্প্রেশনিস্ট চিত্রকর সিকার্ট এবং ক্যামডেন টাউন গোষ্ঠীর কাছে এঁরা খুবই ঋণী।

ইঙ্ক
(Ink)

বাংলা কালি। কোনো রঙিন পদার্থের তরল বা আধা তরল অবস্থার কোনো একটি রূপ যা লেখা, আঁকা বা ছাপার কাজে লাগে প্রায় হাজার বছর আগের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন কালি তৈরি হত ভুষাকালি অর্থাৎ খুব মিহি অঙ্গার দিয়ে। এই অঙ্গার ছিল জৈব পদার্থ পুড়িয়ে প্রাপ্ত কার্বন। আধুনিক কালি তৈরি হয় নানা রকম রঙিন পদার্থ, কার্বন সহ প্রাণী ও উদ্ভিদের রস বা নির্যাস এবং বিশেষভাবে তৈরি রাসায়নিক দিয়ে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কালি তৈরির জন্য নানারকম মাধ্যম ব্যবহার হচ্ছে যার মধ্যে পিগমেন্ট বা রঙিন পদার্থ গোলা যায়। ইচ্ছে অনুযায়ী অর্থাৎ পেন ইত্যাদিতে ব্যবহারের জন্য কালিতে জল, গাম, গ্লু, তেল বা বিশেষ ধরনের পদার্থ মেশানো হয়। যেমন লেখার সরঞ্জামে ব্যবহারের কালি খুবই তরল আবার উডকাট লিনো কাটে ব্যবহারের কালি তুলনামূলক ভাবে ঘন এবং লেইয়ের মতো। আবার লিথোগ্রাফে ব্যবহারের কালি এমন তৈলাক্তভাবে

তৈরি করা হয় যাতে সেই কালি একমাত্র তৈলাক্ত তলেই লাগতে পারে, কোনো জলসিক্ততলে লাগে না। আবার সংবাদপত্র বই বা অন্য ধরনের ছাপার জন্য রয়েছে বিশেষ ফর্মুলায় তৈরি বহু রকমের কালি।

ইকোলজিক্যাল আর্ট (Ecological art)

প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এই শিল্পের আবির্ভাব ১৯৬৮ সালে। এই শিল্প হল স্বাভাবিক প্রাকৃতিক শক্তিসমূহ



নং ২৮. নেক চাঁদ : চণ্ডীগড়ের রক গার্ডেনের দ্বিতীয় পর্যায়ে 'জড়ো হওয়া গ্রামবাসী'। ১৯৫৫-৫৬। সিমেন্ট। ব্রোকেন টাইলস।

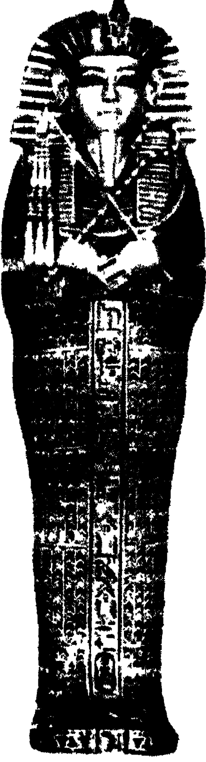
এবং আবর্তনশীল জৈবিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে কথোপকথন এবং সেই শক্তি ও প্রক্রিয়া কীভাবে কাজ করে তা ব্যাপকভাবে প্রদর্শন করতে আগ্রহী এক শিল্প। হানস্ হ্যাকি, অ্যালেন সনফিস্ট সহ এই রীতির শিল্পীর ১৯৭৭ সালে নিউইয়র্কের লা গার্ডিয়া প্লাজাতে 'টাইম ল্যান্ডস্কেপ' নামে একটি ভাস্কর্যমূলক পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলেন। এই প্রচেষ্টার দ্বারা বোঝানো হয়েছিল যে শহরাঞ্চলের প্রাকৃতিক বন সরে গেছে।

ইজিপশিয়ান আর্ট (Egyptian art)



নং ২৯. নেফারটিটি। ইজিপ্ট। চুনাপাথরের রঙিনমূর্তি। আরমানা যুগ। খ্রিস্টপূর্ব ১৩৭৯-১৩৬৬

প্রায় তিন হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দে ইজিপ্ট ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সময়কাল থেকে ত্রিশ খ্রিস্টপূর্বাব্দে টলেমি রাজবংশের শেষ শাসনকাল পর্যন্ত ইজিপ্টবাসীদের শিল্পকলা। মুখ্যত সমাধিক্ষেত্রের টোম্ব আর্ট বা মাস্তাবাস-এ এর বিকাশ। এই শিল্পকলার বৈশিষ্ট্য হল এটা বর্ণনামূলক এবং জাদু বিশ্বাসী। ইজিপ্টের অধিবাসীরা বিশ্বাস করতেন যে অমরত্বের পথের বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্যে মৃত্যু অনিবার্য একটি বাধা মাত্র। গোটা ইজিপ্টের ইতিহাস দেখলে বোঝা যাবে যে সেই মানুষটিই কার্যত অমরত্ব লাভ করেছেন যিনি মৃত্যুর পর সমাধিতে নিজের নাম খোদাই করার পাশাপাশি তাঁর প্রাণহীন দেহটিকে সংরক্ষণ করে রাখার ব্যবস্থা



নং ৩০. সোনার তৈরি তুতানখামুনের মমির ঢাকনা খ্রিস্টপূর্ব ১৩৪০। উচ্চতা ১৮৫ সেমি। মিশর।

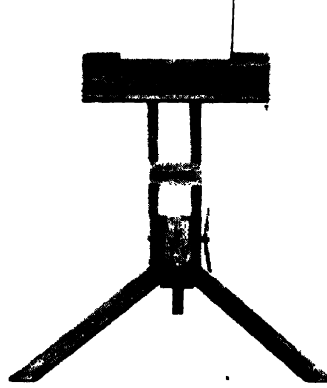
করতে পেরেছেন। আনুপাতিক কিছু নিয়ম সহ অত্যাবশ্যক কিছু বিষয় নিশ্চিতভাবেই মৃত ব্যক্তির থাকতে হত। প্রতিকৃতি প্রধান হলেও ইজিপ্টের প্রাচীন এই শিল্পকলা থেকে জীবজন্তু, লতাপাতা, ফুল ইত্যাদি একেবারে বাদ যায়নি। বরং অনেক মাস্টারপিস দেখা গেছে যার মধ্যে চিত্রায়িত হয়েছে প্রকৃতির অবিশ্বাস্য রকম সুন্দর রূপ। যদিও রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অনেক আগেই ইজিপশিয়ান আর্টের উদ্ভব। তখন হাতির দাঁতের কাজ, গ্লেজড় স্টিটাইট এবং চকচকে মাটির জিনিসের আবির্ভাব ঘটেছে। রং করা চিনেমাটির পাত্রও তৈরি হচ্ছে। রেখাবদ্ধ ফ্ল্যাট কালার দিয়ে সমাধি ক্ষেত্র চিত্রণের কাজ শুরু হয়েছে, সঙ্গে কিছু লো রিলিফের কাজও। প্রথম প্রথম রাজবংশের আমল থেকে ইজিপশিয়ানদের ঐতিহ্যবাহী মূল্যবান অলংকার শিল্পেরও চরম কারিগরি দক্ষতা এবং উৎকর্ষ প্রকাশ পায়। পুরোনো রাজ্য বা ওল্ড কিংডমের মেমফিস শহরের শিল্পকলা খুবই জমকালো ছিল। এই সময় নতোন্নত চিত্র, অবলম্বনহীন ভাস্কর্য সহ বৃহৎ ভাস্কর্যের সূত্রপাত হয়। মধ্য রাজ্য বা মিডল্ কিংডমে অতি অভিজাত চিত্ররীতির আবির্ভাব ঘটে। কোনো রকম রিলিফ ভিত্তি ছাড়াই এই চিত্র আঁকা হত। নতুন রাজ্যে বিশেষ করে থিবস রাজধানী হবার পরে তা মুখ্য শিল্পকলাকেন্দ্র হিসাবে গড়ে ওঠে। এই সময় শিল্পীরা বেশি স্বাধীনতা নিয়ে মানব শরীর সহ বর্ণনামূলক দৃশ্যচিত্র আঁকতে থাকেন। এই অগ্রগতি অষ্টাদশ রাজবংশের সময়ে সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছায়। উনিশতম রাজবংশ তথা রামেসিস ২-এর সময় ইজিপশিয়ান শিল্পকলার মাত্রা ব্যাপকতা লাভ করে যার অন্যতম উদাহরণ আবু সিম্বাল।

ইজিয়ান আর্ট
(Aegean art)

ইজিয়ান সাগরীয় অঞ্চলের প্রচলিত প্রাচীন কিছু সংস্কৃতিজাত শিল্প যার মধ্যে ছিল সাইক্ল্যাডিক, মিমন এবং মাইসেনিয়ান সভ্যতা। খ্রিস্টপূর্ব ৩০০০-১৪০০ পর্যন্ত ইজিয়ান আর্ট প্রচলিত ছিল।

ইজেল
(Easel)

শিল্পীর আঁকার সুবিধার জন্য উপযুক্ত অবস্থানে চিত্রপটকে ধরে রাখার কোনো কাঠামো। বেশিরভাগ ইজেলই ওপর নীচ করে অল্পবিস্তর খাড়া অবস্থায় চিত্রপট বা স্ট্রেচারকে ধরে রাখে। কিন্তু কিছু নিয়ন্ত্রণশীল ইজেল যেমন ফ্রেঞ্চ ইজেল বা বক্স ইজেল এমনভাবে তৈরি যাতে চিত্রপটকে লম্ব বা অনুভূমিক



তথা যেকোনো ভাবে রাখার ব্যবস্থা করা যায়। নানান আকারের ইজেল পাওয়া যায়।

ইজেল পিকচার (Easel picture) একটি মাঝারি আকারের ছবি যেমনটা ইজেলের ওপরে রেখে আঁকা সম্ভব। এ ধরনের ছবি কখনো-কখনো ইজেলের ওপরে রেখেই প্রদর্শন করা হয়।

ইজেল পেন্টিং (Easel painting) যে সব চিত্রকর্ম, প্যানেল, কাগজ, ক্যানভাস বা অন্য কোনো নড়নশীল তলে আঁকা হয় অর্থাৎ যে তল দেয়ালের ঠিক বিপরীত এবং নিশ্চল নয় সেই ধরনের তলে আঁকা ছবিকে বলা হয় ইজেল পেন্টিং। ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত দেয়াল চিত্র বা মুরাল পেন্টিং ছিল সাধারণভাবে প্রচলিত আঙ্গিক। ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে ইজেল পেন্টিং জনপ্রিয় হয়।

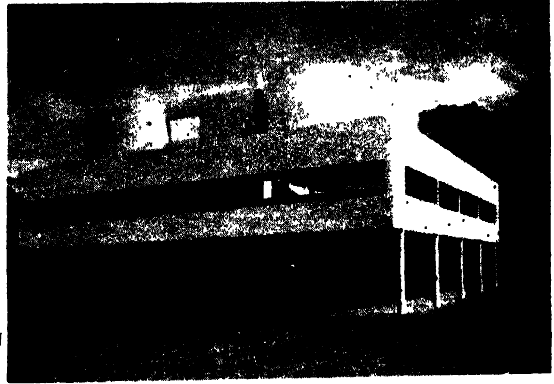
ইটালিক (Italic) ১. দক্ষিণ ইতালির কলোনি, এট্রুস্কান এবং রোমান সভ্যতা বাদে খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী পর্যন্ত বাকি ইতালির প্রাচীন সভ্যতা। ২. পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইতালীয় মানবতাবাদীরা প্রথম এক ধরনের হেলানো হস্তাক্ষর ব্যবহার করেন যা ইটালিক নামে পরিচিত। ৩. এই রীতির ওপর ভিত্তি করে তৈরি হরফের ছাঁদ।

ইনটালিয়ো (Intaglio)

১. এটি একটি ছাপার পদ্ধতি। রিলিফ প্রিন্টিং-এর ঠিক বিপরীত। এই পদ্ধতিতে কোনো ধাতব পাত যথা তামা বা দস্তার প্লেটের উপরিতলে বুরিন বা কুঁদোবার তীক্ষ্ণ যন্ত্র দিয়ে খোদাই করে অথবা অ্যাসিড দিয়ে ক্ষয় করে কোনো ইমেজ বা ছবি তৈরি করা হয়। এরপর প্লেটটিতে কালি ঢেলে দিয়ে প্লেটের উপরিতল চেঁছে পরিষ্কার করে ফেলা হয়। কিন্তু খোদাই করা অংশে কালি থেকে যায়। এরপর একটি ঈষৎ ভিজে কাগজ ওই কালি লাগানো ধাতব প্লেটটির ওপর রেখে এমনভাবে চাপ দেওয়া হয় যাতে কাগজের পৃষ্ঠদেশ ধাতব প্লেটের খোদাই করা অংশের কালির সংস্পর্শে আসে এবং কাগজে ওই ছবিটির ছাপ ওঠে। অর্থাৎ এই পদ্ধতিতে মুদ্রণ তলের কালির অংশ থাকে খাদে আর কালিহীন অংশ উন্নত অবস্থায় থাকে। ২. পাথর বা অন্য কোনো বস্তুর পৃষ্ঠে খোদাই করা কোনো বিষয়।

ইন্টারন্যাশনাল স্টাইল (Inernational Style)

নামটি উদ্ভাবন করেন স্থাপত্য ঐতিহাসিক হেনরি রাসেল হিচকক এবং স্থপতি ফিলিপ জনসন। ১৯২০ থেকে ১৯৩০-



নং ৩১. ল্য করবুস্যিয়ের : স্যাভয় হাউজ। পোয়াসি স্যুর সেন। ১৯৩০-৩১।

এর মধ্যবর্তী সময়ের ইউরোপে আভঁ গার্দ স্থাপত্যের চরিত্রায়ন করতে গিয়ে তাঁরা এই শব্দযুগল ব্যবহার করেন। তাঁদের মানদণ্ড ছিল একটা যুক্তি সঙ্গত পরিকল্পনা দিয়ে কৌণিক প্রতিসাম্যের চেষ্টাকে অপসারণ করা। এই পরিকল্পনা তাঁরা বাড়ির অভ্যন্তর থেকে শুরু করে প্রবেশমুখ পর্যন্ত প্রয়োগ করেছিলেন। এই রীতি সমস্ত নিয়ম বহির্ভূত সজ্জাকে বাদ দিয়েছিল।

ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন (Industrial Design)

কলে প্রস্তুত দ্রব্যাদির ব্যবহারিক গুণমান এবং নান্দনিক মূল্য বজায় রাখতে পরিকল্পিত ও উপযুক্ত নকশা। উনবিংশ

শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে এই প্রচেষ্টা শুরু হয়। লক্ষ্য হল উৎকর্ষ ও নান্দনিকতার সার্থক মিলন ঘটানো।

ইন্ডিপেন্ডেন্ট গ্রুপ (Independent Group)
ব্রিটিশ শিল্পী, স্থাপতি এবং শিল্প সমালোচকদের একটি গোষ্ঠী। এঁদের অন্যতম ছিলেন রিচার্ড হ্যামিলটন এবং এডুয়াডো পাওলোজ্জি। এঁরা ১৯৫০-এর মাঝে এবং শেষের দিকে লন্ডনের ইনস্টিটিউট অব কনটেমপোরারি আর্ট-এ আলোচনার জন্য মিলিত হয়েছিলেন। এই গোষ্ঠীই ব্রিটিশ পপ আর্টের জনক।

ইন্ডিভিজুয়ালিস্টস (Individualists)
চিনা শিল্পীগণ, যাঁরা সপ্তদশ খ্রিস্টাব্দে মিং সাম্রাজ্যের পতনের পর মাংচু শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ প্রাতিষ্ঠানিক ধারা থেকে নিজেদের সরিয়ে নিয়ে তাঁদের নিজেদের মতো করে ছবি এঁকেছিলেন।

ইন্ডিয়ান আর্ট কলেজ (Indian Art College)
আসলে দি ইন্ডিয়ান কলেজ অব আর্টস অ্যান্ড ড্রাফটস্-ম্যানশিপ। ১৮৯৩ সালে ভারতীয় শিল্প সমিতির পক্ষ থেকে



নং ৩২. ইন্ডিয়ান আর্ট কলেজের নতুন ভবন। ২০০৫।

প্রখ্যাত আলোকচিত্রী শ্রী মন্মথনাথ চক্রবর্তী ২৪০ নং বৌবাজার স্ট্রিটের একটি বাড়িতে মাত্র ৩ জন ছাত্র নিয়ে একটি আর্ট স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। উপনিবেশিক ভারতবর্ষে তার আগে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে অনেকগুলি শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছিল। সে সময় ই. ভি. হ্যাভল নামে এক ইংরেজ কলাবিদ সরকারি আর্ট স্কুলের দায়িত্বে নিযুক্ত হন। তিনি সরকারি আর্ট স্কুলে সে সময় প্রচলিত পাশ্চাত্যরীতির পরিবর্তে ভারতীয় রীতিতে শিল্প শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। এতে তৎকালীন ছাত্রদের মধ্যে বেশ একটু প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। এর বিপরীতে মন্মথনাথ ইন্ডিয়ান আর্ট স্কুলে পাশ্চাত্য রীতিতে শিল্পশিক্ষার ব্যবস্থা করেন। পরে এর সঙ্গে ড্রাফটসম্যানশিপও শেখানোর

ব্যবস্থা হয় বৃত্তিমূলক শিক্ষার লক্ষ্যে। বহু কৃতি শিল্পী এখান থেকে তৈরি হন। পরবর্তীকালে স্কুলটি ১৩৯ লেনিন সরণিতে স্থানান্তরিত হয়। ১৯৬৬ সালে এই স্কুলটি কলেজের মর্যাদায় উত্তীর্ণ হয় এবং রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে আসে। ১৯৮৪ সালে কলেজের বাড়িটি জরাজীর্ণ হয়ে পড়লে দুর্ঘটনা এড়াতে দমদমের একটি অস্থায়ী বাড়িতে উঠে আসে। ১৯৯৬ সালে এখানে ডিগ্রি পাঠক্রম চালু হয় এবং স্থানীয় প্রশাসন তথা দক্ষিণ দমদম পৌরসভার প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় এবং অসংখ্য শিল্পানুরাগী মানুষের সাহায্যে কলেজের নিজস্ব ভবন তৈরি হয়। ২০০৫ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রী জ্যোতি বসু নতুন ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন করেন। বহু কৃতী ছাত্র এবং বিশিষ্ট শিল্পী এই কলেজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে অতুল বসু, সতীশ চন্দ্র সিংহ, সোমনাথ হোর, গোবর্ধন আশ, কালীকিঙ্কর ঘোষ দস্তিদার, সুধীর মৈত্র, বিকাশ ভট্টাচার্য, গোপাল সান্যাল, সুহাস রায়, বিজন চৌধুরী প্রমুখ অগ্রগণ্য।

ইনলে (Inlay)

কোনো বস্তুর অপরিসর প্রবেশ মুখ থেকে অন্য একটি বস্তু ঢুকিয়ে বা সেই বস্তুর গায়ে কোনো বস্তুকে চেপে বসিয়ে বস্তুর পৃষ্ঠদেশ অলংকরণ করা বা ডিজাইন তৈরি করা। এ ধরনের নকশাকে বলে খচিত শিল্প। কাঠ, ধাতু বা কলাইয়ে ইনলে খুবই পরিচিত নকশা।

ইনসায়্লেশন (Insufflation)

পোর্সিলেন-এ কারুকাজের চিনা পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে একটি টিউব দিয়ে গুঁড়ো রং ফুঁ দিয়ে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। টিউবের শেষে একটা মিহি কাপড় বাঁধা থাকে। যাতে রঙের গুঁড়ো সমানভাবে ছড়াতে পারে।

ইনস্টলেশন (Installation)

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে যেসব উল্লেখযোগ্য চিত্র লক্ষণ দেখা গেছে তার মধ্যে অন্যতম হল ইনস্টলেশন আর্ট। অবশ্য এই শিল্পরীতির ঐতিহাসিক বিচার এবং যথার্থ সংজ্ঞা এখনও নির্ণীত হয়নি। তৎসত্ত্বেও ইনস্টলেশনকে বলা যেতে পারে শিল্পকলার জগতের সর্বশেষ ব্যাপকতম শিল্পরীতি। এ ব্যাপারে শিল্পতাত্ত্বিকদের ব্যাখ্যা থেকে যা জানা যায় তা হল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে যন্ত্র সভ্যতার নানা জটিল অগ্রগতি, যুদ্ধের ধ্বংসাত্মক দিক, মূল্যবোধ ও সমাজ জীবনের নানা আদর্শের বিলুপ্তি সব মিলিয়ে অবিশ্বাস ও অমানবিকতার

বাতাবরণের উদ্ভব হয়েছিল। এর পাশাপাশি সমাজতান্ত্রিক ও বামপন্থী ভাবধারা সহ নানা রাজনৈতিক সামাজিক আন্দোলনের প্রসার ঘটেছে। আত্মপ্রকাশ ঘটেছে সমাজতান্ত্রিক চিন্তার প্রতি সহানুভূতিশীল নাস্তিবাদী শিল্পান্দোলন দাদাবাদের। লেনিন প্রথাবিরোধী শিল্পাদর্শের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন তেমনি তাঁর সতীর্থ লুনাচারিস্কিরও সমর্থন ছিল সুরিয়ালিজ্‌মের প্রতি। বিশ্বযুদ্ধের সময়ের শরণার্থী শিল্পীরা ধ্রুপদি আদর্শ এবং প্রতিষ্ঠিত ধারণা সহ নন্দনতাত্ত্বিক সৌন্দর্যের বিরোধিতা করেছিলেন। এরকমই একজন দাদাবাদী কুর্ট শ্বিটার্স জার্মানির হ্যানোভারে কুড়িয়ে পাওয়া আবর্জনা ও কাগজ দিয়ে একটি গোটা বাড়ি ভর্তি করে তাকে শিল্পসৃষ্টি বলে বর্ণনা করে নাম দিয়েছিলেন—'মার্জবাউ'। অর্থাৎ দেখানো হল যে আবর্জনাও শিল্পের উপকরণ হতে পারে। এই 'মার্জবাউ'কে বলা যেতে পারে ইনস্টলেশনের আদিরূপ। ইউরোপীয় সংস্কৃতিতে যুদ্ধের অভিজ্ঞতা থেকে সমস্ত স্থায়িত্বের প্রতি, গ্যালারি আর্টের প্রতি অবিশ্বাসের মধ্য দিয়েই ইনস্টলেশনের উদ্ভব। জার্মান শিল্পী জোসেফ বিউইস একটি ঘরের মেঝেতে এবং টেবিলে বোতল রোলার ইত্যাদি সাজিয়ে নাম দিয়েছিলেন 'রুম ইনস্টলেশন'। আবার ১৯৭০-এ আমেরিকার রবার্ট স্মিথসন সল্টলেকে কালো ব্যাসাল্ট, চুনা পাথর, মাটি, লাল শ্যাওলা ফেলে দেড়

নং ৩৩. বারবা ক্রুগার-এর ইনস্টলেশন : আনটাইটেলড। ১৯৯১।



হাজার ফুট দীর্ঘ কুণ্ডলী আকৃতির রূপ তৈরি করে নাম দিয়েছিলেন 'স্পাইরাল জেটি'। সেটি হ্রদের জলে মিলিয়ে যায়। কিংবা ইউরোপ থেকে আমেরিকায় শরণার্থী হিসাবে আগত জাভাশেফ ক্রিস্তো ১৯৭৬-নর্থ ক্যারোলিনায় ১৮ ফুট চওড়া নাইলন শিট দিয়ে দু-সপ্তাহের জন্য চিনের প্রাচীরের মতো আঁকাবাঁকা চল্লিশ মাইল লম্বা দেয়াল তৈরি করেন। অস্থায়িত্ব এবং উপকরণের চমক ইনস্টলেশনের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয়। তাই বলা যায় ইনস্টলেশন হল নানা ধরনের এবং আপাত সম্পর্কহীন নানা বস্তুর অস্থায়ী বিন্যাসের মধ্যে শিল্প প্রয়াস। আরও বলা যেতে পারে যে ইনস্টলেশন শিল্পের প্রচলিত এবং শিল্পের প্রাতিষ্ঠানিক রক্ষণশীলতায় আঘাত করেছে, শিল্প রচনার ক্ষেত্রে উপকরণের সীমানা ভেঙে দিয়েছে।

ইমপোস্ট (Impost) — পিলার বা স্তম্ভের ওপর অনুভূমিক ভাবে থাকা স্লাব বা মোটা ফলক অথবা ইটের গাঁথনি। এখান থেকেই আর্চ বা খিলান বাঁকতে শুরু করে।

ইমপ্যাস্টো (Impasto) — ১. রং চাপানোর একটি পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে পুরু করে রং চাপিয়ে এক ধরনের অমসৃণ বুনোট (Texture) তৈরি করা হয়। তুলি বা পেন্টিং নাইফ দিয়ে এরকম রং চাপানো যায়। তেল রং এবং অ্যাক্রিলিক রঙের ক্ষেত্রে প্রায়ই ইমপ্যাস্টো পদ্ধতির ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়।

২. চিনে মাটির জিনিসপত্রের গায়ে নতোন্নত বা লো রিলিফের যে কাজ থাকে তাও ইমপ্যাস্টো। এগুলো সাধারণভাবে কলাই বা চিনেমাটির মিহি গুঁড়োকে জলে গুলে তা দিয়ে করা হয়।

ইমালশন (Emulsion) — একটি তরলের মধ্যে আর একটি তরলের অতি ক্ষুদ্র কণিকাকার রূপের মিশ্রণ। যেমন হোমোজেনাইজড দুধের ক্ষেত্রে স্নেহপদার্থের অতি ক্ষুদ্র কণার সাথে জলীয় দ্রবণের মিশ্রণ। শিল্পীরা যে এগটেম্পারা এবং কেসিন ব্যবহার করেন তা এক ধরনের ইমালশন। ফটোগ্রাফিক প্লেটে যে আলোকসংবেদী সিলভার ব্রোমাইড মাখানো থাকে এক ধরনের ইমালশন তাও।

ইম্প্রিম্যাচুরা (Imprimatura) — এক ধরনের প্রাইমারি কোট বা প্রাথমিক বর্ণলেপন। ছবি আঁকার আগে ক্যানভাস বা প্যানেলের সাদা পৃষ্ঠদেশকে একটু টোন ডাউন বা মার্জিত করার জন্য 'ওয়াশ' বা কোনো রঙের পাতলা 'গ্লেজ' লাগানো। কোনো কোনো শিল্পী উষ্ণ রঙের টোন ব্যবহার করলেও সাধারণভাবে এটা সবুজ, ধূসর রঙের

হয়। এই মিডল টোন আঠা, রেজিন বা অন্য মাধ্যমের সঙ্গে মিশিয়েও ব্যবহার করা হয়।

ইম্প্রেশন (Impression)

ছাপা বা খোদাই কাজের একটি প্রতিলিপি অর্থাৎ একটি কাগজ যার মধ্যে ছবি বা ডিজাইনটির ছাপ নেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে মুদ্রণ ফলকের সাহায্যে কাগজে ছাপ নেওয়ার প্রক্রিয়কেও বোঝায়।

ইম্প্রেশনিজ্‌ম (Impressionism)

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ফ্রান্সে এক নতুন শিল্প আন্দোলনের জন্ম হয়। ১৮৭৪ সালে ফ্রান্সের একদল শিল্পী 'সোসাইটি অব পেন্টার্স অ্যান্ড এনগ্রেভারস' নাম দিয়ে যে প্রদর্শনী করেন সেখানে ইম্প্রেশন : সানরাইজ নামে ক্লদ মনের আঁকা একটি ছবি ছিল। তাই দেখে একজন ফরাসি শিল্প সমালোচক এই নাম দেন। পরে ইম্প্রেশন শব্দটি একটি সামগ্রিক রীতি তথা আন্দোলনের নাম হয়ে যায়। এই ভাবধারার ভিত্তি ছিল সমকালীন পদার্থ বিদ্যায় আলোর ধর্ম নিয়ে গবেষণার ফলাফল। আলোর এই বিজ্ঞানকে ব্যবহার করে এই গোষ্ঠীর শিল্পীরা ছবিতে রং ও টোনকে সঠিক ভাবে প্রদর্শনের জন্য প্রয়াসী হন। সমকালীন সামাজিক ও বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি ইম্প্রেশনিজ্‌মের পূর্ব শর্ত হিসাবে কাজ করেছিল। তখনকার নিও ক্লাসিক এবং রোমান্টিক অনুসন্ধান প্রতিষ্ঠানিক সালোঁর বিদ্যমান আকাদেমিক রীতির শিল্প চর্চার সঙ্গে যুক্ত হয়। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য পর্বে ফোটোগ্রাফির আবিষ্কার অর্থাৎ বাস্তবতার প্রতিচিত্রণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে উদ্ভবের ফলে এই চর্চা সংকটের সম্মুখীন হয়। সেই পরিস্থিতিতে কিছু শিল্পী শিল্পের নতুন ভাষার সন্ধানে মন দেন, যে ভাষা একদিকে হবে অভিনব এবং অন্যদিকে যান্ত্রিকভাবে চিত্র নির্মাণের ক্রমবর্ধমান ক্রিয়াকলাপেরও জবাব দেবে। এভাবেই ইম্প্রেশনিস্ট শিল্পীরা এক বিজ্ঞানানুগ চিত্রাঙ্কণ রীতি অবলম্বন করলেন। এই রীতি অনুযায়ী কোনো বস্তুর চলমান বা ধাবমান ছায়া বা ইমেজ আলোকবাহিত হয়ে যেভাবে শিল্পীর চোখে পড়ে শিল্পী সেই ছায়া বা ইমেজকেই বিশুদ্ধ রঙের ছোঁয়ায় ক্যানভাসে স্থানান্তর করেন। ইম্প্রেশনিস্ট শিল্পীরা ছোটোছোটো দাগে বিভক্ত বিশুদ্ধ রং এবং অসীম সম্ভাবনাময় কমপ্লিমেন্টারি কালারের ব্যবহার করে, কিয়রাসকিউরো বা আবছায়ার প্রয়োগ ঘটিয়ে, ছবিতে আলোর অনুপস্থিতিকে কালো দিয়ে বোঝানোর প্রচলিত কায়দা বাতিল করে দিয়ে সম সময়ের অগ্রগতির উচ্চতায় উন্নীত

ছবি নং ২০৩ পৃ. ৩৭৮

করেছিলেন। তাঁরা ছবিতে রঙিন ছায়ার সূত্রপাত ঘটিয়েছিলেন। এই ধারার মুখ্য শিল্পীরা ছিলেন ক্লদ মনে,পল সেজান, এগার দেগা, রেনোয়ার, ক্যামিলে, পিসারো, অ্যালফ্রেড সিসলি প্রমুখ। মানে ইম্প্রেশনিস্ট শিল্পীদের সাথে একত্রে প্রদর্শনী না করলেও তাদের ওপর মানের জোরালো প্রভাব ছিল। এই শিল্পীরা ইম্প্রোশনিজ্‌মের শরিক হলেও তাদের দায়বদ্ধতা ও সম্পর্কের মধ্যে ভিন্নতা ছিল। লক্ষ করার বিষয় হল ইম্প্রেশনিজ্‌মের লক্ষণ ও ফলাফলগুলির বিশুদ্ধ ব্যবহার ঘটেছে ল্যান্ডস্কেপে। সেই কারণে ঘরের বাইরের ছবিই ইম্প্রেশনিজ্‌মের আদর্শ। কিন্তু দেগা এই মত সমর্থন করতেন না। ইম্প্রেশনিজ্‌মের পূর্বসূরী ছিলেন টার্নার, কনস্টেবল এবং বারবিজোন স্কুলের শিল্পীরা। প্রথম দিকে ইম্প্রেশনিস্ট শিল্পীরা নানা উপহাস এবং আক্রমণের লক্ষ্য হয়েছিলেন তাঁদের ছবিতে চড়া রং এবং ফিনিশিং-এর 'অভাবের' জন্য। ১৮৭৬ সালের জনৈক সমালোচক ইম্প্রেশনিস্ট শিল্পীদের 'উন্মাদ' আখ্যা দিয়ে বলেছিলেন—'কাউকে জোর করে মিস্টার পিসারোকে বলতে হবে যে গাছের রং কখনও বেগুনি হয় না কিংবা আকাশের রং বিশুদ্ধ মাখনের মতো নয়। পৃথিবীর কোনো কিছুই পিসারোর ছবির মতন দেখতে নয়।' ফ্রান্সের বাইরেও অনেক দেশের শিল্পীদের ছবিতে ইম্প্রেশনিস্ট রীতি লক্ষ করা যায়। যেমন ইংল্যান্ডের স্টিয়ার এবং আমেরিকায় হ্যাসাম প্রমুখ। বুদ্ধিদীপ্ত বিষয়ের অভাব এই রীতির ছবির একটি ত্রুটি বলে কেউ কেউ মনে করেন।

ইলেকট্রাম (Electrum) — প্রাকৃতিক ভাবে সৃষ্ট সোনা ও রূপার সংকর। প্রাচীন সভ্যতা বিশেষ করে পারস্য এবং প্রাচীন ইজিপ্টে মূল্যবান জিনিসপত্র এবং মুদ্রা তৈরি করতেও কখনো-কখনো ব্যবহার করা হত।

ইলেকট্রোটাইপ (Electrotype) — চিরাচরিত ঢালাই পদ্ধতির বদলে ছাঁচে তড়িৎবিশ্লেষণ এবং ধাতু লেপন পাত্রের সাহায্যে ধাতব বস্তুর পুনরুৎপাদন। এই পদ্ধতিতে সূক্ষ্ম কারুকাজেরও নিখুঁত পুনরুৎপাদন সম্ভব। ১৮৩৬ সালে এই পদ্ধতির আবিষ্কার হলেও এটা পূর্ণতা পায় ১৮৪০ সালে জি. আর. এলকিংটনের অধীনে।

ইলেকট্রোপ্লেটিং (Electroplating) — তড়িৎ বিশ্লেষ করে কোনো ধাতুর ওপর ধাতু লেপনের জন্য রুপোর পাতলা স্তর সহযোগে নিকেলের আস্তরণ ফেলার প্রক্রিয়া। ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে জি. আর. এলকিংটন এই প্রক্রিয়ার পেটেন্ট করেন।

ইলোরা

সারা ভারতবর্ষে আজ পর্যন্ত প্রায় বারোশোরও বেশি গুহামন্দির আবিষ্কৃত হয়েছে। এর মধ্যে নয়শোর বেশি বৌদ্ধ মন্দির।



নং ৩৪. ইলোরা · কৈলাশনাথ মন্দির। ৫৫৭ - ৯০ খ্রিস্টাব্দ। রাষ্ট্রকূট।

একশোর কিছু কম হিন্দু গুহামন্দির এবং বাকিগুলি জৈন মন্দির। ইলোরা বা এলোরা হল এরকমই এক গুহা মন্দির। উৎকর্ষের দিক দিয়ে যার স্থান মধ্যযুগের অপর শিল্পের নিদর্শন অজন্তার পরেই। এর অবস্থান হল প্রাক্তন নিজাম রাজর তথা মহারাষ্ট্রের ঔরঙ্গাবাদ জেলার ২৮ কিলোমিটার উত্তরে। ইলোরা গ্রামে প্রায় ৩৪টি গুহা আবিষ্কৃত হয়েছে। ইলোরা স্থাপত্য এবং মন্দির নির্মাণ শুরু হয় অজন্তার দ্বিতীয় পর্বের সময়ে। প্রায় তিনশো বছর ধরে এখানে মন্দির নির্মাণ ও স্থাপত্যকলার বিকাশ ঘটে। এসব মন্দিরের মধ্যে বৌদ্ধ, জৈন, হিন্দু সব ধরনের মন্দিরই



নং ৩৫. ইলোরা : হস্তিচর্ম নিয়ে শিবের নৃত্য। ৫৮০-৬৮২ খ্রিস্টাব্দ।

আছে। তবে ইলোরার বৌদ্ধ মন্দিরের স্থাপত্যে ও শিল্পকলা উৎকর্ষের দিক দিয়ে 'অজন্তার সমকক্ষ নয়।

ইলোরায় বৌদ্ধ স্থাপত্য ও ভাস্কর্য তৈরি হবার পর রাষ্ট্রকূট যুগে ব্রাহ্মণ্য আধিপত্য বিস্তারের সময় অর্থাৎ সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতে শিব ও বিষ্ণুর মন্দির সহ বহু শিব ও বিষ্ণু মূর্তি তৈরি হয়। ইলোরার সবচেয়ে প্রসিদ্ধ মন্দির হল হিন্দুদের কৈলাশ মন্দির। ভারতীয় স্থাপত্যেও কৈলাশ মন্দির একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। ২৮৭ ফুট লম্বা এবং ১৬০ চওড়া এই মন্দিরশিখর মাটি থেকে প্রায় ১০০ ফুট উঁচু এবং সম্পূর্ণ পাহাড়ের পাথর কেটে তৈরি। শিল্প ঐতিহাসিক ফার্গুসনের মতে এরই কারুকৃতি স্বর্ণ শিল্পীদের সূক্ষ্ম কারুকাজের সঙ্গে তুলনীয়। কৈলাশ মন্দির ব্রাহ্মণ্যরীতিতে নির্মিত হলেও এর ওপর বৌদ্ধ শিল্পের প্রভাব লক্ষ করা যায়।

ইস্টার সেপালকার (Easter Sepulchre)

খোদাই কর্ম শোভিত যিশুর সমাধি এবং পুনরুত্থান স্থল। গির্জাতে এটা স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে প্রদর্শিত থাকে।

কখনো-কখনো যে কুলুঙ্গিতে যিশুর কবর প্রদর্শিত থাকে তাকেও ইস্টার সেপালকার বলে। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এর নমুনা দেখা গেছে।

ইসথেটিকস (Aesthetics)

শিল্পে সৌন্দর্যের দর্শন। শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন জার্মান দার্শনিক বৌমগার্টেন (১৭১৪-৬২) পরে কান্ট এই তত্ত্ব গ্রহণ করেন তাঁর 'থিয়োরি অফ ইসথেটিজ্‌মে'। শব্দটির বাংলা পরিভাষা হিসেবে 'নন্দনতত্ত্ব' কথাটি ব্যবহৃত হয়। অতীতে প্লেটো, অ্যারিস্টটল, হিউম প্রমুখ দার্শনিকেরা সৌন্দর্যকে ভাববাদী ও বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করেছেন। তবে আধুনিক কালে শিল্প, সত্য ও সমাজের সঙ্গে সৌন্দর্যের সম্পর্কই নন্দনতত্ত্বের বিচার্য বিষয়।

ইসথেটিসিজ্‌ম (Aestheticism)

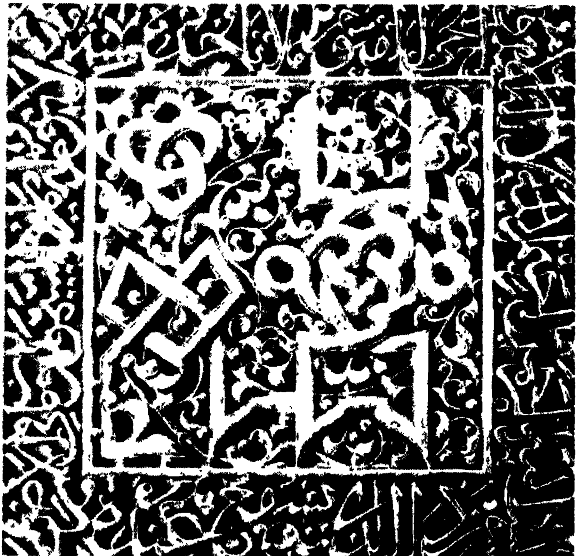
উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগের শিল্প আন্দোলন। এই মতবাদ অনুযায়ী শিল্পের সৌন্দর্য তার নিজস্ব যুক্তির ওপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ শিল্প হল শিল্পের জন্য, যেখানে সমাজ বা নৈতিক প্রয়োজনের কোনো প্রশ্ন নেই। 'আর্ট ফর আর্টস সেক'— কথাটি অনেকেই ব্যবহার করেছিলেন। যেমন দার্শনিক ভিকতোর কুজ্যাঁ ১৮১৮ সালে প্যারিসের সরবোর্নে এক ভাষণে উক্তিটি ব্যবহার করেন। উনবিংশ শতাব্দীতে এই মতবাদকে সূত্রবদ্ধ করেন দার্শনিক কান্ট। এই মতবাদ নিয়ে বিস্তর চর্চা হয়েছিল। এই মতবাদকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন রাস্কিন, মরিস এবং টলস্টয়। এঁরা বলতেন জীবনের সেবা ও সহায়তা করাই

ছবি নং ১৫৮ পৃ. ৩৫২

শিল্পের কাজ কিন্তু ইসথেটিজ্‌মের প্রবক্তারা মনে করতেন শিল্প ও সৌন্দর্যের সঙ্গে নৈতিকতার কোনো সম্পর্ক নেই। এ ব্যাপারে একটি চরম গল্প আছে যে স্বৈরতন্ত্রী মুসলিনি একবার নিরস্ত্র মানুষের মধ্যে বোমা বিস্ফোরণের সৌন্দর্য বর্ণনা করেছিলেন। ইসথেটিসজ্‌মের আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন ইংরেজ ও ফরাসি লেখকেরা। প্রথমে ফ্রান্সে গোতিয়ে ও বোদলেয়র এবং শেষে ইংল্যান্ডে ওয়াল্টার পিটার ও অস্কার ওয়াইল্ড। এটা চরম পরিণতিতে পৌঁছায় ১৮৭৭ সালে লন্ডনে গ্রসভেনর গ্যালারি চালু হবার পর। শিল্পী হুইসলার এবং ব্রুনে জোনস এই গ্যালারির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন।

ইসলামিক আর্ট (Islamic art)

সম্পূর্ণ ইসলাম ধর্ম প্রভাবিত শিল্পকলা। এই শিল্পকলার মৌলিক উপাদান হল অলংকরণ। খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে প্রবর্তিত মুসলিম ধর্মকে ভিত্তি করে, দক্ষ উদ্ভাবনা এবং উৎকর্ষের সঙ্গে এই শিল্পকলার বিস্তৃতি ঘটেছে। ৬৩২ খ্রিস্টাব্দে হজরত মহম্মদের মৃত্যুর পর উমায়িয়াদ পরিবার ইসলামিক সাম্রাজ্যের শাসক হয় এবং ইসলামিক সভ্যতার পত্তন ঘটে। ভূমধ্যসাগরীয় বিশ্ব অর্থাৎ উত্তর দিকে আরব অঞ্চল থেকে বাইজেনটাইন সাম্রাজ্য এবং পশ্চিমদিকে উত্তর আমেরিকা এবং স্পেন এই সভ্যতার অধীনে আসে। যার মধ্যে ছিল ইজিপ্ট, সিরিয়া, পারস্য এবং মেসোপটেমিয়া প্রভৃতি। আব্বাসিদ পরিবারের রাজত্বকালে এই সব অঞ্চলের কারিগরেরা তাঁদের



নং ৩৬. ইসলামিক শিল্প : কাঠের [illegible] ওপর ক্যালিগ্রাফিক কারুকার্য। ত্রয়োদশ শতাব্দী। তুরস্ক।

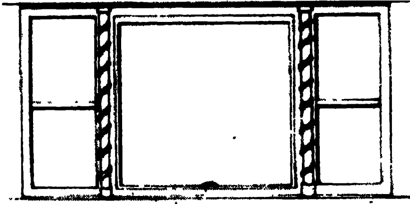
দক্ষতার সম্মিলন ঘটিয়েছিলেন তাঁরা তাঁদের নিজ নিজ ও জাতীয় শৈলীর শ্রেষ্ঠ দিকগুলিকে ব্যবহার করেই নতুন এক স্থাপত্য রীতি তৈরি করেছিলেন। এই নতুন রাজত্বের সময়ে সৃজন ও মেধার উল্লেখযোগ্য মোটিফের মতো ইসলামি আর্টের সুনির্দিষ্ট নানা রূপ এই সময়েই প্রকাশ পেতে শুরু করে এবং এইসব শিল্পকৃতি আরও অনেক কিছুর মতো পরবর্তীকালে রেনেসাঁসের আর্টকেও প্রভাবিত করেছিল। মুসলমান কারিগরেরা স্থাপত্যে চরম উৎকর্ষ লাভ করেছিলেন এবং এই সব ডিজাইন বা নকশা কাজে লাগিয়ে স্থাপত্য কাঠামোর সৌন্দর্য বাড়িয়ে তোলেন যার অপূর্ব দৃষ্টান্ত হল মসজিদ। এমনকি বাণিজ্যপথ ধরে চিন থেকে চিনেমাটির নানা জিনিসপত্র পারস্যে আসত। তার প্রভাবে ঐতিহ্যবাহী অত্যুৎকৃষ্ট চিনেমাটির শিল্পও গড়ে উঠেছিল। এছাড়াও আরও অনেক দেশের সংস্কৃতি ইসলামিক আর্টের অগ্রগতির ওপর প্রভাব ফেলেছিল। তার মধ্যে প্রধান হল মেসোপটেমিয়া, পারস্য, মুঘল, তুর্কি এবং ইজিপ্টের সংস্কৃতি। সাতশো খ্রিস্টাব্দে ইসলামি শিল্পকলা উত্তর ভারতেও গড়ে উঠেছিল। মুঘল আমলে এই মুসলিম শিল্প উৎকর্ষের শীর্ষবিন্দু স্পর্শ করে। এর সুবিদিত নমুনা হল তাজমহল। পঞ্চদশ এবং ষোড়শ শতাব্দীতে ইসলামি দুনিয়ায় অধিকাংশই অটোমান তুর্কদের অধীনে আসে যার মধ্যে ছিল গ্রিস, মেসোপটেমিয়া, বলকান, ইজিপ্ট,সিরিয়া এবং উত্তর আফ্রিকার বড় অংশ। এই সব দেশের শিক্ষিত শাকদের আগ্রহ ও উৎসাহে ইসলামি শিল্পকলার প্রসার ঘটে ফলে এই সময়কাল হল ইসলামি শিল্পকলার শ্রেষ্ঠ যুগ। মূর্তি নির্মাণের ব্যাপারে মুসলমান ধর্মে কিছু বিধিনিষেধ আছে। যদিও কোরানে মনুষ্যমূর্তি চিত্রণ নিষিদ্ধ করার ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট কিছু লেখা নেই। তবে পঞ্চম অধ্যায় থেকে এরকম মনে হতে পারে যে, মনুষ্য মূর্তি চিত্রণ অনুচিত। সম্ভবত এরকম ধারণা করে মনুষ্য মূর্তি চিত্রণ নিষিদ্ধ করার বিষয়টি প্রথম থেকেই ইসলামি প্রথায় প্রতিষ্ঠা পেয়ে যায়। ফলে ইসলামি শিল্পকলার সব শাখায় জোরালো আলংকরিক উপাদানের উপস্থিতি কিন্তু প্রাণীদেহের বিশেষ করে মানুষের ছবি বিরল। পঞ্চদশ শতাব্দীতে বিভিন্ন শৈলীর মিশ্রণের মধ্য দিয়ে পারসি শৈলীর এক স্বতন্ত্র রূপ গড়ে ওঠে। জানা গেছে ষোড়শ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন বাইজাদ এবং তার ছাত্ররা, যাঁরা তাব্রিজ-এর ধর্মগুরু ও পণ্ডিত শাহ তাহমাস্প-এর জন্য ছবি এঁকেছিলেন।



উ

উইন্ডো (Window)

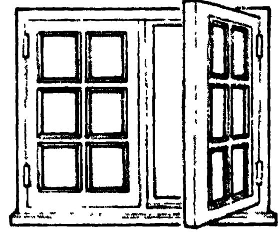
বাংলা পরিভাষায় জানলা। সাধারণভাবে ঘরের অংশ। প্রধানত আলো ও বাতাসের প্রবেশপথ। কিন্তু কার্যকারিতার বাইরে এর একটি নান্দনিক দিকও আছে। অতীতকাল থেকেই স্থাপত্যে উইন্ডোকে সৌন্দর্য সৃষ্টির কাজে ব্যবহার করা হয়েছে। নানা



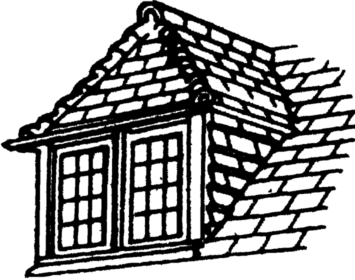
শিকাগো উইন্ডো



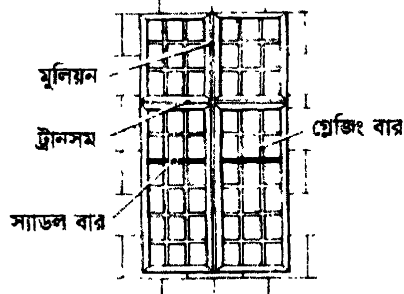
ল্যান্সেট উইন্ডো



কেসমেন্ট উইন্ডো



ডরমার উইন্ডো





ওরিয়াল উইন্ডো

ধরনের উইন্ডো তৈরি হয়েছে। যেমন বো উইন্ডো। এটি গঠনগত (Structural) ভাবে আধা গোলাকৃতি এবং এক তলায় মাটি ছুঁয়ে সামনের দিকে বের হয়ে থাকে। কখনো-কখনো ওপরের তলাগুলি পর্যন্তও প্রসারিত হয়। আবার কেসমেন্ট উইন্ডো লম্বভাবে দুটো ভাগে ভাগ করা থাকে। এর পাল্লা পুরোটাই খোলে। শিকাগোর মোড় ঘোরানো স্টাইলের আদর্শ জানলা হল শিকাগো উইন্ডো। এই জানলার দুটি স্তম্ভের মাঝখানে চওড়া স্থায়ী পাল্লা। দু-পাশের স্তম্ভ দুটির পাশে সরু ঘোরানো কাচের পাল্লা। এছাড়াও যেমন গথিক স্থাপত্যে

ব্যবহৃত ল্যান্সেট উইন্ডো। এটি লম্বা এবং সরু আর মাথায় আর্চ থাকে। আবার ডরমার উইন্ডো ঢালু ছাদ বা চালের ওপরে থাকে। এই উইন্ডোর নিজের মাথাতেও ছাদ থাকে। ওরিয়াল উইন্ডো হল ঝোলানো জানলা। সামনে ও দু-পাশে থাকে ঘোরানো পাল্লা। ভারতীয় স্থাপত্যে আর একরকম জানলা দেখতে পাওয়া যায়। ছোটো গোলাকার গোরুর চোখের মতো। বাংলায় যাকে বলে গবাক্ষ। অজন্তার গুহায় আলো হাওয়া প্রবেশের জন্য এরকম জানলার ব্যবহার আছে।

উকিয়ো-ই (Ukiyo-e)

জাপানি এই পরিভাষার অর্থ হল ভাসমান জগতের ছবি। সপ্তদশ শতাব্দী থেকে উনবিংশ শতাব্দীর জনপ্রিয় এই শিল্প জাপানের এডো অর্থাৎ পূর্বতন টোকিয়োর নিষিদ্ধ পল্লি ইয়োশিয়ারা এবং গিশাস ও কাবুকির অভিনেতাদের জীবন নিয়ে আশ্চর্য রূপ দেখিয়েছে। উকিয়ো-ই শিল্পীরা লোককথা, কিংবদন্তি, ঐতিহাসিক মহাকাব্যের দৃশ্য সহ নিসর্গও এঁকেছেন। এই ধারার অগ্রগণ্য শিল্পী হলেন উতামারো, হারুনোবু,



নং ৩৭. কিয়োনাগা : 'চেরিব্লসম'। ১৭৮৭-৮৮। জাপান।

হিরোসিগে, হোকুশাই, কাইজেট সুডো, কিয়োনাগা, কোরিউসাই, শারাকু প্রমুখ। এঁদের ছাপাই ছবি উনবিংশ শতাব্দীর ফরাসি শিল্পীদের বেশ প্রভাবিত করেছিল।

উজ্জয়িনী

মধ্যপ্রদেশের জেলা এবং জেলা সদর। প্রাচীন অবন্তীর রাজধানী ছিল উজ্জয়িনী। এখানে ভাস্কর্য সম্বলিত বেশ কয়েকটি মন্দির রয়েছে। উজ্জয়িনীতে একসময় রাজস্থানী চিত্রেরও চর্চা হত।

উড এনগ্রেভিং (Wood engraving)

একটি রিলিফ প্রিন্টিং পদ্ধতি। শক্ত কাঠের ব্লকের সমতল চওড়া অংশকে মসৃণ করে নিয়ে তার ওপর বুরিন বা নরুণ জাতীয় যন্ত্র দিয়ে কোনো নকশা বা ছবিকে খোদাই করা হয়। এর জন্য গাছের গুঁড়ি তথা লগকে আড়াআড়ি ভাবে চিরে ফালি করে ব্লক তৈরি করে নেওয়া হয়। চেরি কাঠ এ কাজের জন্য খুবই উপযুক্ত। উডকাটের মতো এরও উৎকীর্ণ অংশের ছাপ সাদা হয়। কাঠের আঁশগুলি আড়াআড়িভাবে থাকায় বুরিন দিয়ে কাটতে কোনো বাধা থাকে না। এনগ্রেভিং-এ সরু রেখাগুলিকে এমন ঘন এবং সারিবদ্ধভাবে কাটা হয় যাতে



নং ৩৮. প্রথম ইউরোপীয় কাঠ খোদাই। ১৪২৩ খ্রিস্টাব্দ।

নং ৩৯. বিউইক · উড এনগ্রেভিং। ১৮২৩।



ছবিতে টোনের তারতম্যকে মসৃণ ভাবে উপস্থাপিত করা যায়। সাদা কালো ছাড়া রঙিন ছাপ নেওয়ার ক্ষেত্রে অনেক সময় একাধিক ব্লক ব্যবহার করা হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে ইংল্যান্ডে উডকাট থেকে উড এনগ্রেভিং পদ্ধতির এই কৌশল উদ্ভাবন করেন থমাস বেউইক। তার এই মাধ্যম পুঁথি চিত্রণের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়।

কলকাতায় উড এনগ্রেভিং-এর সৃষ্টি মুখ্যত বইয়ে ছবি ছাপার জন্য। অষ্টাদশ শতাব্দীর কলকাতার যে ক'জন এনগ্রেভার ছিলেন তাঁদের প্রায় সবাই ছিলেন বিদেশি। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় উত্তর কলকাতায় বটতলা অঞ্চলে উডকাট প্রিন্টের প্রসার ঘটে। যেসব বাঙালি চিত্রকর বা খোদাই শিল্পীর নাম পাওয়া যায় তার মধ্যে গুপিচরণ স্বর্ণকার, নেত্যলাল দত্ত, রামধন স্বর্ণকার, হীরালাল কর্মকার, পঞ্চানন কর্মকার প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। বিংশ শতাব্দীর কলকাতায় উড এনগ্রেভিং-এ চরম দক্ষতা দেখিয়েছেন এরকম শিল্পীদের মধ্যে রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, হরেন্দ্রনাথ দাস সোমনাথ হোর-এর নাম উল্লেখযোগ্য। প্রগতি আদর্শে বিশ্বাসী শিল্পী সোমনাথ হোরের উড এনগ্রেভিং তেভাগা আন্দোলনের উল্লেখযোগ্য দলিল।

উডকাট (Woodcut)

কাঠের ফলক বা ব্লকে ড্রয়িং করে নিয়ে সেই ছবি বা নকশা ধরে প্রয়োজন মতো কাঠ খোদাই করে ফেলা হয়। তারপর বাকি উঁচু অংশে কালি লাগিয়ে কাগজ বা ওই ধরনের কোনো তলে উৎকীর্ণ নকশা বা ছবির একটা উলটো ছাপ তোলা হয়। এই কাজের জন্য মিহি আঁশ যুক্ত কাঠ যেমন চেরি বা পাইন কাঠ উপযুক্ত। কখনো-কখনো কাঠের ব্লকের মসৃণ তলের

ওপর গালা পালিশ করে নেওয়া হয়। তাতে উৎকীর্ণ রেখাগুলি ও খোদাইকাজ অনেক তীক্ষ্ণ ও নিখুঁত হয়। কোনো কোনো শিল্পী নরম কাঠের আঁশের অমসৃণতা রেখেই খোদাই করে ছাপ তোলেন তাতে একটা বুনোট তৈরি হয়। এইভাবে কাজ করতেন মুংখ্। আজকাল শিল্পীরা নানা ধরনের কাটার দিয়ে ইচ্ছেমতো কাঠের সারফেস খোদাই করে নানা ধরনের বুনোট তৈরি করেন। নকশা বা ছবি কাটা হয়ে যাবার পর একটা ব্রেয়ার (রাবারের রোলার) দিয়ে একটু চটচটে ধরনের কালি লাগানো হয় তারপর কাগজ চাপিয়ে প্রেস যন্ত্রে বা চামচ দিয়ে ঘষে ঘষে ছাপ তোলা হয়। এ ব্যাপারে জাপানি রাইস পেপারে ভালো ফল পাওয়া যায়।

কাঠ খোদাইয়ের এই পদ্ধতি প্রথম প্রচলন হয় চিন দেশে পঞ্চম শতাব্দীতে। অনেকেই মনে করেন মার্কো পোলো এই পদ্ধতি ইউরোপে নিয়ে গিয়েছিলেন। আলবার্ট ডুরার, পল গগাঁ, রকওয়েল প্রমুখরা পাশ্চাত্যে এবং প্রাচ্যে তথা জাপানে হোকুশাই,হিরোশিগে প্রমুখরা উডকাটে অসামান্য দক্ষতা দেখিয়েছেন। উল্লেখ করার মতো ব্যাপার হল যে উডকাট

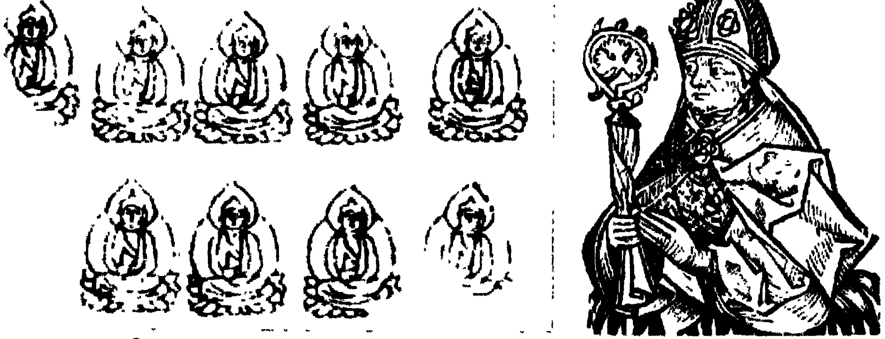


নং ৪০ ইয়ান হান : 'হোয়েন এনিমি কাম'। ১৯৪৩। উডকাট।

চিন দেশে জন্ম লাভ করলেও আধুনিক কালে চিন দেশে যে উডকাট চর্চা তা কিন্তু প্রথাসিদ্ধ চৈনিক উডকাট নয় বরং তা ইউরোপ থেকে এসেছে। এমনটি বলেছেন লুসুন। ১৯৩০-এ চিনদেশে সাম্যবাদী ভাবধারার কাঠ খোদাই আন্দোলন গড়ে উঠেছিল যা সাউদার্ন উডকাট মুভমেন্ট নামে খ্যাত। কাঠ খোদাই শিল্পীদের দুটো সংগঠনও গড়ে উঠেছিল। 'হ্যাংচাউ উডকাট সোসাইটি' এবং 'ওয়ান-এইট ক্লাব'। এঁদের মধ্যে ইয়ে ফু, ইয়াং চিয়া-চ্যাং, লি হুয়াও উল্লেখযোগ্য।

উডব্লক প্রিন্ট (Woodblock print)

আলাদা আলাদা কাঠের ফলক বা ব্লকের সাহায্যে ছাপা একধরনের উডকাট। প্রতিটি ব্লক আলাদা আলাদা রং থাকে



নং ৪১. (ওপরে) রানি শোতকু মুদ্রিত বুদ্ধধর্মীয় শ্লোকের একটি পাতার ছবি। (ডানদিকে) ওরিজিনাল উডব্লক প্রিন্ট। ১৪৯৩ খ্রিস্টাব্দে।

এবং পাশাপাশি ছেপে নকশাটি সম্পূর্ণ করা হয়। রঙের বৈচিত্র্য বাড়ানোর জন্য কখনো-কখনো একটি রঙের ওপর আর একটি রঙের ব্লকের ছাপ নেওয়া হয়। এর সবচেয়ে ভালো উদাহরণ হল উকিয়ো-ই প্রিন্ট। উডব্লক প্রিন্টের প্রাচীনতম নমুনা হল জাপানি মহারানি শোতোকু মুদ্রিত বৌদ্ধ শ্লোক সম্বলিত হ্যান্ডবিল। এটা ছাপা হয়েছিল প্রায় ৭৭০ খ্রিস্টাব্দে। পৃথিবীতে মহারানিব জীবনকালকে নিশ্চিত করতে বাঁশকাগজে এই শ্লোকগাথা ছাপানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন।

উদয়গিরি

মধ্য প্রদেশের ইসাগড় জেলার বেতোয়া এবং বেত নদীর মধ্যে অবস্থিত একটি পাহাড়। এখানে গুহামন্দির নির্মিত হয় খ্রিস্টিয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে। উদয়গিরিতে ২০টি গুহা আছে। এখানে ৫ সংখ্যক গুহায় পৌরাণিক বরাহ অবতারের বিশাল মূর্তি রয়েছে। এছাড়াও ৬ সংখ্যক গুহার দুটি দ্বারপালের মূর্তি, বিষ্ণু মূর্তি, মহিষমর্দিনী আর গণেশ মূর্তি উল্লেখযোগ্য। এসব ভাস্কর্য গুপ্ত যুগে নির্মিত হয়েছিল।

উদয়গিরি-খণ্ডগিরি

উড়িশার রাজধানী ভুবনেশ্বরের লাগোয়া মোটাদানার বেলে-পাথরের দুটি ছোটো টিলা। টিলাদুটির মাঝখানে রয়েছে একটি সংকীর্ণ গিরিবর্ত্ম যা টিলা দুটোকে পৃথক করেছে। প্রাচীন ভ.রতীয় স্থাপত্য-ভাস্কর্যের ইতিহাসে এই টিলা দুটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ। উদয়গিরিতে আছে পাহাড় কেটে তৈরি করা ১৯টি মুখ্য গুহা। আর খণ্ডগিরিতে আছে একই রকম ৯টি গুহা। এ সব গুহায় থাকতেন জৈন সন্ন্যাসীরা। এ সব গুহা তৈরি হয়েছিল খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে। এর মধ্যে হস্তিগুহাটি বয়সের দিক দিয়ে প্রাচীনতম। এসব গুহার বাইরে নানা শিলালেখ রয়েছে। গণেশ গুহার সামনের আঙিনার ওপরে অবলম্বনহীন দুটি হাতি মূর্তি ছাড়া বাকি সবকিছু বিভিন্ন রকমের রিলিফ। বেশিরভাগই লো রিলিফ। অল্পকিছু হাই রিলিফ। ভারহুত, সাঁচি, বুদ্ধগয়ার মতো এখানকার রিলিফের কাহিনি বর্ণনা ভিত্তিক। তবে এই কাহিনির আখ্যান পরিচিত নয় বরং অজ্ঞাত। রিলিফে দেবদেবী, অপ্সরা নানান ধরনের ও স্তরের মানুষ, পশুপাখি, জিনিসপত্র, অস্ত্রশস্ত্র, অলঙ্কার সহ বিভিন্ন রকম দৃশ্যকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এর একটি বৈশিষ্ট্য হল যে ভাস্কর্যগুলি চিত্রধর্মী অর্থাৎ রিলিফগুলি ফ্ল্যাট এবং সীমরেখা

নং ৪২. উদয়গিরি : (নীচে) বরাহঅবতার বিষ্ণু। (পাশে) বৈশিষ্ট্য ও প্রকরণ সহ বিষ্ণু মূর্তি। ৪০১-২ খ্রিস্টাব্দ। উচ্চতা ১২ ফুট ৮ ইঞ্চি। গুপ্তযুগ।





প্রধান। অন্য বৈশিষ্ট্য হল এই রিলিফ ইউনিপ্লেনিমেট্রিক কম্পোজিশন রীতির। এই রীতির বৈশিষ্ট্য হল এর শিল্পকর্মে দূরের বস্তু বা সারি পেছনের দিকে থাকে এবং ছোটো হয় বটে কিন্তু এতে সামনের সারি বা বস্তু পেছনের কোনো কিছুকে আড়াল করে না। উদয়গিরি-খণ্ডগিরিতে কিছু ফ্রেস্কোও করা হয়েছিল। মৌর্য পরবর্তী যুগে পূর্ব ভারতের লোকশিল্পীরা পাথর খোদাই করতে গিয়ে এই ধরনের শৈলীর প্রবর্তন করেছিলেন। কেউ কেউ অবশ্য একে শৃঙ্গশৈলী বলে অভিহিত করেছেন।

উভ্‌র (Oeuvre)

ফরাসি এই পরিভাষাটি দিয়ে কোনো একজন শিল্পীর সমগ্র কর্মকে বোঝানো হয়। এর থেকেই এসেছে উভ্‌র ক্যাটালগ কথাটি। একজন শিল্পীর সমগ্র সৃষ্টির একটি নথি বা রেকর্ড।



এ

এক্সপ্রেশনিজ্‌ম (Expressionism)

পেন্টিং ও গ্রাফিক আর্টের এক প্রবণতা যা শিল্পে কোনো বস্তু বা বিষয়ের আক্ষরিক বর্ণনাকে অস্পষ্ট করে এবং পরিবর্তে সেই বস্তু বা বিষয়ের প্রতি শিল্পীর প্রতিক্রিয়াকে উপস্থাপন করার চেষ্টা করে। মাতিসের কথায়—'রচনা বা কম্পোজিশন হল নানা উপাদানকে আলংকারিক কায়দায় বিন্যস্ত শিল্পের মধ্য দিয়ে শিল্পীর নিজের অনুভূতিকে প্রকাশ করার ক্ষমতা।' বার্লিন আভঁ গার্দ 'ডার স্ট্রাম' এর প্রকাশক হারওয়ার্থ ওয়ালডেন-এর হাতে পরিভাষাটি জনপ্রিয়তা পায়। এর লক্ষ্য ছিল ইম্প্রেশনিজ্‌মের বিরোধিতা করার জন্য সমস্ত আধুনিক শিল্পকলাকে বৈশিষ্ট্য দান করা। ইম্প্রেশনিস্টরা কোনো বিষয়কে যেমন দেখতেন তেমনভাবেই দেখাতে চেষ্টা করতেন। এডভার্ড মুংখ, ভিনসেন্ট ভ্যানগঘ, পল গগাঁ প্রমুখরা তাঁদের উজ্জ্বল রং ও স্মৃতিজাগরুক রেখা ও আকৃতির ব্যবহারের মধ্য দিয়ে বিংশ শতাব্দীর এক্সপ্রেশনিজ্‌ম তথা অভিব্যক্তিবাদের ভিত নির্মাণ করেন।

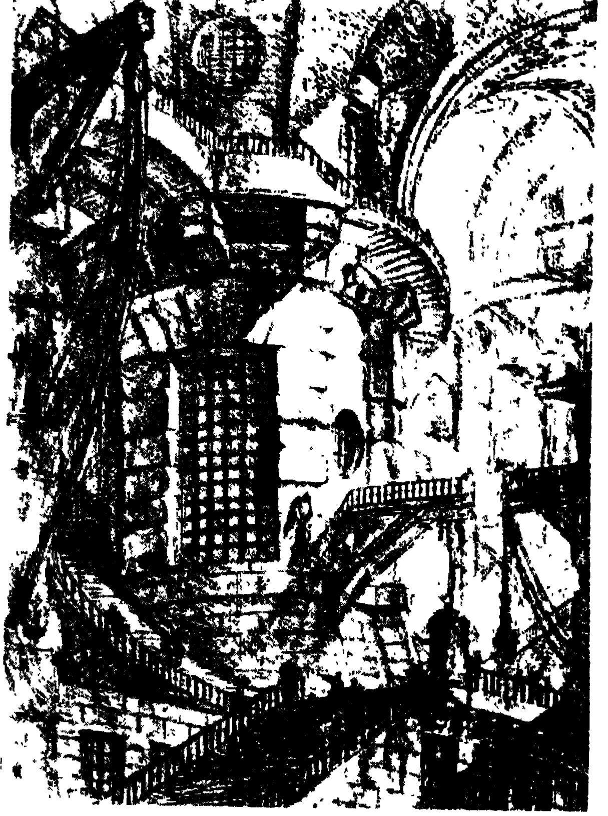
এক্সপ্রেশনিজ্‌ম শব্দটা দু-ভাবে ব্যবহৃত হয়। ব্যাপক অর্থে শিল্পে আবেগ প্রকাশের প্রবণতা পূর্ণ যে কোনো শিল্পকেই এক্সপ্রেশনিজ্‌ম বলে। আর সংকীর্ণ অর্থে নিজস্ব ঢঙে এই

ছবি নং ১৫৭ পৃ. ৩৫১

ধরনের প্রবণতাসম্পন্ন কোনো ব্যক্তি বা কোনো গোষ্ঠীর শিল্প। জার্মানির এরকম দুটো অন্যতম মুখ্য শিল্পীগোষ্ঠী ছিল—'দি ব্রিজ' এবং 'দি ব্লু রাইডার' গোষ্ঠী। ব্রিজ গোষ্ঠীতে ছিলেন আরনেস্ট লুডইগ ক্রিচনার এবং এমিল নোলডে। এঁদের ছবির বৈশিষ্ট হল উগ্রভাবের খাঁজকাটা রেখা, কর্কশ রং, ভিড় এসবের সাহায্যে ছবিতে তুলে ধরা হত ক্ষোভ, বিরক্তি এবং আধুনিক জীবনের কদর্যতাকে তাঁরা যেভাবে দেখতেন। ১৯০৬ সালে জার্মানির ড্রেসডেনে প্রথম প্রদর্শনীতে 'জার্মান এক্সপ্রেশনিজ্‌মের' সূত্রপাত ঘটে। এটা ভেঙে যায় ১৯১৩ সালে। অন্যদিকে মিউনিখে ১৯১১ সালে 'দি ব্লু রাইডার' গোষ্ঠী গঠিত হয়। এই গোষ্ঠী টিকে ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত অর্থাৎ ১৯১৩ সাল পর্যন্ত। এই গোষ্ঠীর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ক্যান্ডিন্‌স্কির একটা ছবির জন্যই গোষ্ঠীর এই নাম হয়। অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন পল ক্লি, ফ্রাঞ্জ থার্ক, আগস্ট ম্যাকি। তাঁদেরও লক্ষ্য ছিল প্রকাশমুখী রং, রেখা, আকৃতি, ছবির ধরন ছিল অবর্ণনামূলক। তবু পূর্বসূরীদের ছবির ক্রুদ্ধতা তাঁদের ছবিতে ছিল না। তাঁদের ছবি ছিল অনেক বেশি কাব্যময়।

এচিং (Etching)

এটি একটি ইনটালিয়ো ছাপার প্রক্রিয়া। এতে ধাতুর পাতে অ্যাসিড প্রতিরোধক প্রলেপ মাখিয়ে নেওয়া হয় এবং কখনও তার সঙ্গে বি-ওয়াক্সও মেশানো হয়। এই রকম প্রলেপ লাগানো একটি ধাতুর পাতের ওপর আঁচড় কেটে ছবি বা নকশা আঁকা হয়। আঁচড় কাটলে নকশার অংশে ধাতু বেরিয়ে পড়ে। এই অবস্থায় প্লেটটি অ্যাসিডে ডোবানো হয় এবং পাতের বেরিয়ে পড়া অংশ অ্যাসিড ক্ষয় করে বা 'বাইট' করে। ফলে পাতের ওপর নকশাটির একটা হালকা খাঁজ বা খাদ তৈরি হয়। এরপর পাতটিতে কালি মাখিয়ে পাতের উপরিতল এমনভাবে পরিষ্কার করে নেওয়া হয় যাতে খাঁজের মধ্যে কালি থেকে যায়। শেষে একটি ঈষৎ ভিজে কাগজকে প্লেটের ওপর রেখে জোরে চাপ দিয়ে খাঁজের মধ্যে থাকা কালির ছাপ কাগজে তুলে আনা হয়। এচিং বা তক্ষণে নানা ধরনের কাজ হয়। ধাতুর পাত হিসাবে তামা, দস্তা, আবার কখনো-কখনো অ্যালুমিনিয়াম বা ম্যাগনেসিয়াম ব্যবহার করা হয়। এইসব ধাতুর সঙ্গে অ্যাসিডের বিক্রিয়া ভিন্নভিন্ন রকম হয়। অ্যাসিড



নং ৪৩ জি বি পিরানেসির এচিং দা প্রিজন। একাদশ শতাব্দী।

হিসাবে সাধারণত নাইট্রিক এবং হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ব্যবহৃত হয়। অ্যাসিডের শক্তি এবং ক্ষয় করানোর সময়ের ওপর নকশার খাঁজের গভীরতার মাত্রা নির্ভর করে। ছাপযন্ত্রের চাপের পরিমাপ, কালি ও কাগজের ওপরেও ছবির গুণাগুণ নির্ভর করে। সাধারণভাবে ধাতুর পাতে অ্যাসিডরোধী আস্তরণ লাগিয়ে সরাসরি আঁচড়ে কেটে নকশা তৈরি করে একবার অ্যাসিডে খাইয়ে তারপর ছাপ নেওয়াই বেশি প্রচলিত। কিন্তু বহু শিল্পী চূড়ান্ত ছাপ নেওয়ার আগে পর্যন্ত নানা অন্তবর্তী তক্ষণ কার্য চালান ছবিতে চাহিদা মতো বিশেষ ফলাফল পাবার জন্য।

এট্রুস্কান আর্ট (Etruscan Art)

এট্রুস্কানদের শিল্পকলা। প্রাচীন নথি অনুযায়ী এট্রুস্কানরা ছিলেন ইতালির তাইবার এবং অর্নো নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল বা মোটামুটিভাবে আধুনিক টাসকানির অধিবাসী। এর প্রাচীন নাম ছিল এট্রুরিয়া। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে এট্রুস্কানরা ক্ষমতার

নং ৪৪. পক্ষীরাজ ঘোড়া। রঙিন টেরাকোটা। ৩ ফুট ৫ ইঞ্চি x ৪ ফুট। ইতালি।



শীর্ষে উঠেছিল। কিন্তু খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর শেষে এট্রুরিয়া রোমানদের অধিকারে আসে এবং এট্রুস্কান শিল্প রোমানদের শিল্প সংস্কৃতিতে মিশে যায়। শিল্পের বিভিন্ন স্থানে খনন করে এট্রুস্কানদের টিকে থাকা যেসব নমুনা পাওয়া গেছে তাতে পরিষ্কার যে এই শিল্প প্রাথমিকভাবে দক্ষিণ ইতালিতে বসবাসকারী গ্রিকদের কাছ থেকে ধার করা হলেও এট্রুস্কানদের হাতে শিল্প এমন বৈশিষ্ট্য লাভ করেছিল যা সম্পূর্ণতই তাঁদের নিজস্ব রীতির। ধাতুর কাজের অসামান্য কিছু নমুনা পাওয়া গেছে যার মধ্যে 'ক্যাপিটোলাইন উলফ' বিখ্যাত। যখন আঞ্চলিক ভাবে পাথর পাওয়া যেত তখন পাথরের ভাস্কর্য তৈরি হত। কিন্তু তাঁদের ভাস্কর্যের মুখ্য উপাদান ছিল রং করা পোড়া মাটি। রোমের ভিলা গিউলিতে এট্রুস্কান সমাধিভাস্কর্যের চমৎকার নমুনা আছে। অন্যদিকে টারকিনিয়া ও অন্যান্য স্থানে আছে এট্রুস্কান সমাধিচিত্রকলার নমুনা। এসব চিত্রকলার বলিষ্ঠ ও ছন্দময় রেখার নান্দনিক গুণ গ্রিক ভাসচিত্রের সমকক্ষ।

এনকসটিক টাইল্‌স (Encaustic tiles)

মাটি বা চিনেমাটির তৈরি এই টালি বিভিন্ন রঙের ইনলে (খচিত নকশা) সহ গ্লেজ করে পোড়ানো হয়। মধ্যযুগে এই পদ্ধতির ব্যাপক ব্যবহার হত। পরে ভিক্টোরিয়ানরা এর পুনরুজ্জীবন ঘটায়।

এনকসটিক পেন্টিং (Encaustic painting)

গরম মোম দিয়ে ছবি তৈরির একটি পদ্ধতি। প্রাচীনকালে গ্রিস এবং ইজিপ্টে এই মাধ্যমে ছবি আঁকা হত। রোমান

ঐতিহাসিক প্লিনির রচনায় এবং খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীর বিভিন্ন লেখায় এ তথ্য পাওয়া যায়। এই শিল্প হারিয়ে গিয়েছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে আবার এর পুনরুজ্জীবন ঘটে এবং বহুদিন ধরে জনপ্রিয় মাধ্যম হিসাবে চালু ছিল। বিংশ শতাব্দীর আগে ইলেকট্রিক হিটার আসা পর্যন্ত এর যন্ত্রপাতি বিশেষ করে রং ও চিত্রপটকে গরম করা খুবই ঝামেলার কাজ ছিল। এনকস্টিক পেন্টিং-এর জন্য লাগে রঙের খুব মিহি গুঁড়ো, মৌচাকের সাদা গরম মোম এবং রজন। এই তিনটি উপাদানকে সাধারণভাবে মেশালেই এনকস্টিকের রং তৈরি হয়। তবে অনেক শিল্পী এর সঙ্গে অন্য কিছু উপাদান মিশিয়েও পরীক্ষানিরীক্ষা করেছেন। এর জন্য যে প্যানেলটি ব্যবহার করা সেটি বিদ্যুতের সাহায্যে বা অন্য কোনোভাবে গরম করা হয়। তারপর রং ঢেলে বা হগ হেয়ারের শক্ত ব্রাশ বা পেন্টিং নাইফ দিয়ে রং ব্যবহার



নং ৪৫. কাঠের প্যানেলের ওপর এনকস্টিক। একটি ফায়ুম প্রতিকৃতি। দ্বিতীয় খ্রিস্টাব্দে এধরনের প্রতিকৃতি নারীদের মমিতে লাগানো হত।

করা হয়। পাতলা মোটা সব রকমভাবেই এই রং লাগানো যায়। কোনো কোনো শিল্পী আবার এই রঙের সাহায্যে লো-রিলিফের মতো যে চিত্রতল তৈরি করা যায় তা পছন্দ করেন। আঁকা শেষ হয়ে গেলে ছবিটি সাবধানে এবং সর্বত্র সমানভাবে গরম করতে হবে যতক্ষণ না পর্যন্ত বর্ণতল মসৃণ এবং উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। এই প্রক্রিয়াটির জন্যেই এই পদ্ধতির নাম 'এনকস্টিক'। এর উৎস গ্রিক শব্দ থেকে যার অর্থ অন্তর্দাহ। এইভাবে তাপ দিলে রং যেমন সর্বত্র সমান একটি লেয়ারে পরিণত হয় তেমনি চিত্রপটের সঙ্গেও আটকে যায়। অন্য সব মিডিয়ামের মতো এনকস্টিকও স্থায়ী মাধ্যম। অন্য সব রঙের মতো আঁচড়ালে বা মোচড়ালে এই রঙেরও ক্ষতি হতে পারে। আবার সাধারণ তাপে কিছু না হলেও ১৭০ ডিগ্রির বেশি তাপে এতে মিশ্রিত মোম গলে যেতে পারে।

এনগ্রেভিং (Engraving)

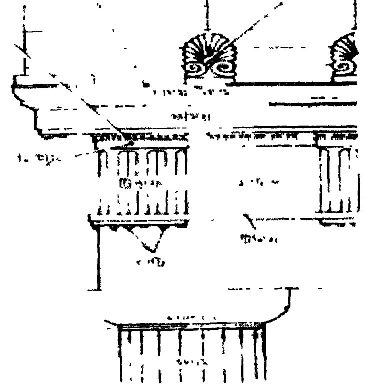
এই পরিভাষাটিতে একটি কাঠ বা ধাতুর ফলক বা ব্লকে কোনো নকশা খোদাই বা উৎকীর্ণ করা এবং সেই নকশা থেকে ছাপ নেওয়া উভয়কেই বোঝায়। যদিও উডকাট, এচিং, ড্রাইপয়েন্ট ইত্যাদি শব্দ নির্দিষ্টভাবে ছাপচিত্রণ, মেটাল এনগ্রেভিং, উড এনগ্রেভিং ইত্যাদির ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। উড এনগ্রেভিং হল রিলিফ পদ্ধতি। যাতে কাঠের ব্লকের ওপর আঁকা নকশার অপ্রয়োজনীয় বা নেতিবাচক অংশ কেটে তুলে ফেলা হয় শুধু উঁচু হয়ে থাকা নকশাটা পড়ে থাকে। এর ব্লকও তৈরি হয় কাঠের আঁশকে আড়াআড়ি ভাবে রেখে কাটা গুঁড়ি থেকে। এর পর নকশা কাটা তলটিতে কালি লাগিয়ে ছাপ



নং ৪৬. ড্যুরা : মেলানকলিয়া। ১৫১৪। এনগ্রেভিং। ২৩.৮ X ১৬.৮ সেমি।

নেওয়া হয়। মেটাল এনগ্রেভিং-এ একটি মসৃণ ধাতব পাতের ওপর তীক্ষ্ণ রেখায় নকশা কাটা হয় নিড্‌ল দিয়ে। সাধারণত তামা ও দস্তার পাতে এই নকশা কাটা হয়। ফলে নকশাটি ধাতব পাতের পৃষ্ঠতল থেকে নিচুতে অর্থাৎ খাতের মধ্যে থাকে। সেই খাতে বা খাঁজে কালি ভরতি করে পাতের উপরিতলটি পরিষ্কার করে নেওয়া হয়। তারপর ঈষৎ ভিজে কাগজকে কালি লাগানো পাতের ওপর রেখে জোরে চাপ দিয়ে খাত বা খাঁজের কালি কাগজে উঠিয়ে আনা হয়। মেটাল এনগ্রেভিং বা ধাতুতক্ষণ ছিল ষোড়শ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রতিলিপি ছাপার প্রধান পদ্ধতি।

এনটাব্লেচার (Entablature) — স্থাপত্যের উর্ধ্বাংশের অন্যতম ক্রমবিভাগ। এর তিনটে স্তর। প্রথমটা হল আর্কিট্রেভ। মধ্যাংশ হল ফ্রিজ এবং সর্বোপরি করনিস।



এনটারটিটি কুনস্ট (Entartete Kunst) — ১৯৩৭ সালে মিউনিখে অনুষ্ঠিত একটি প্রদর্শনীর শিরোনাম এটি। এই প্রদর্শনীতে নাৎসিদের দ্বারা বাতিল করা সব ধরনের আভঁ গার্দ শিল্প স্থান পেয়েছিল। এর মধ্যে এক্সপ্রেশনিস্টদের ছবি ছিল চোখে পড়ার মতো।

এনভায়রনমেন্টাল আর্ট (Environmental art) — আধুনিক এক ধরনের শিল্পকলা যার মধ্য দিয়ে নিছক কোনো বস্তুর বদলে গোটা পরিবেশকে দর্শকের সামনে উপস্থাপিত করা হয়। এতে দৃশ্য-ধ্বনি সহযোগে অনেক ছবি ও ভাস্কর্যের ব্যবহারও থাকে। উদ্দেশ্য হল দর্শকের চেতনার সঙ্গে সম্পর্ক ঘটান। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দর্শকও যার অংশ হয়। এই

নং ৪৭. রবার্ট স্মিথসন : স্পাইরাল হিল। ১৯৭১। এমেন।



শিল্পের দুজন অগ্রগণ্য বিশিষ্ট শিল্পী হলেন কিয়েনহোলস এবং ওলডেনবার্গ। এর উদ্ভব কাল ১৯৫০।

এনামেল
(Enamel)

তুলনামূলকভাবে নরম কাচ। বালি, লেড অক্সাইড এবং সোডা বা পটাসিয়াম কার্বোনেট তথা পটাশকে উচ্চতাপে আগুনে পুড়িয়ে তৈরি করা হয়। এই সব উপাদানগুলি একসঙ্গে গলে গিয়ে তৈরি হয় ফ্লাক্স অথবা ফনডাস্ট। গলিত ফ্লাক্সের সঙ্গে নানান ধাতব অক্সাইড মিশিয়ে বহু ধরনের সুন্দর সুন্দর রং তৈরি করা যায়। আবার মূল উপাদানগুলির পরিমাণের তারতম্য ঘটিয়ে এবং আরও কিছু উপাদান মিশিয়ে এনামেলকে স্বচ্ছ, অনচ্ছ অথবা ওপেক অর্থাৎ সম্পূর্ণ অসচ্ছও করা যায়। পোড়াবার পর ঠান্ডা হলে এনামেলকে হয় ভেঙে কুচি করা হয় অথবা গুঁড়িয়ে দানা করা হয়। এই দানা গহনা প্রস্তুতকারক এবং শিল্পীরা ব্যবহার করেন। শিল্পীরা সাধারণত ভাঙা এনামেলকে পিষে গুঁড়ো করে সেই গুঁড়ো জলে ধুয়ে নেন, কেন-না এর মধ্যে ভেজাল অন্য কোনো দানা থাকতে পারে। এই এনামেল পাউডার জলে ভিজিয়ে সোনা, রুপা ইত্যাদি ধাতুর তৈরি বস্তুর ওপর লাগিয়ে সাধারণ তাপে শুকিয়ে নেওয়া হয়। তারপর ওই বস্তুটিকে উচ্চতাপে পোড়ানো হয় যতক্ষণ না পর্যন্ত এনামেল গুঁড়ো গলে গিয়ে ধাতুর সঙ্গে মিশে যায়। ঠান্ডা হলে চুনি বা ওই জাতীয় পাথর বা সিলিকা দিয়ে ঘষে বস্তুটিকে ঠিকঠাক আকার দেওয়া হয় এবং মসৃণ করা হয়। এই প্রক্রিয়ায় বস্তুটি ম্যাট ফিনিশ হয়ে যায়। গ্লস করতে হলে আবার বস্তুটিকে কিছুক্ষণের জন্য ভাটিতে চাপাতে হবে। কোনো তলে এনামেল করার বেশ কিছু প্রচলিত পদ্ধতি আছে। যেমন—

বেস-তাই (Basse-Taillc) : বস্তুর গায়ে আলো ছায়ার ক্রমন্বয়ী ফলাফল তৈরির কৌশল। বস্তুর গায়ে খোদাই করার

যন্ত্র দিয়ে রিলিফে ছোটো খোপ কাটতে হয়। এই খোপগুলি পছন্দ মতো রঙের অনচ্ছ এনামেল দিয়ে ভরতি করতে হয়। ধাতব তলের কাছাকাছি যে এনামেল তা ফিকে হয় আর যেখানে যেখানে খোদাই করা অংশ গভীর সেখানে এনামেল কালচে হয়। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইতালি ও ফ্রান্সে স্বাধীনভাবেই এই কৌশলের উদ্ভব হয়।

ক্লোয়াজন (Cloisonne) : ধাতব তলের ওপর তার জুড়ে বা এনামেলের লেয়ারের সঙ্গে তাপ দিয়ে আটকে ছোটো ছোটো খোপ তৈরি করা হয়। এই খোপগুলি আলাদা করে নির্দিষ্ট রঙের ঈষৎ ভিজে পাউডার দিয়ে ভরতি করা হয়। সাধারণভাবে সোনা, রুপা বা তার ব্যবহার করা হয়। খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে ভারতে এবং তার কিছু পরে গ্রিসে এই পদ্ধতি ব্যবহারের সন্ধান পাওয়া গেছে। খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে বাইজেনটাইনরা এই পদ্ধতিকে যথাযথ রূপ দিয়েছিল।

কামেয়ো (Camaieu) : এক ধরনের গ্রিসাইল এনামেল। প্রথমে ধাতব তলে কালো এনামেল পেস্ট দিয়ে ঢেকে তার ওপর সাদা এনামেল লেয়ার চাপানো হয়। নকশার সীমারেখা স্বভাবতই নিচু হয় (intaglio) অর্থাৎ প্রথমে লাগানো কালো এনামেল নীচুতে থেকে খোদাইয়ের মতো ফলাফল তৈরি করে।

পেন্টেড এনামেল (Painted Enamel) : কোনো তার বা শির ছাড়া ঈষৎ ভিজে এনামেল তামার তৈরি কোনো তলে লাগানো হয়। একটি রং শুকিয়ে নিয়ে তবেই তার পাশের রং-টি লাগাতে হয়। এই ধরনের এনামেলের মধ্যে অনেক রকমফের দেখা যায়। অবশ্যই তা শিল্পীর পছন্দ অনুযায়ী তৈরি।

এনামেল কালার (Enamel colours) তেলে বা তৈলাক্ত মাধ্যমে ধাতব পিগমেন্ট এবং কাচের পাউডার মিশিয়ে সেই মিশ্রণ কোনো চকচকে এবং ফিনিশ করা সিরামিক বা কাচের বস্তুর ওপর লাগিয়ে, প্রারম্ভিক তাপমাত্রার চেয়ে কম তাপমাত্রায় ফের পুড়িয়ে সেই রং-কে গলিয়ে নেওয়া। সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে চিনা পোরসিলেনে এনামেল কালার দিয়ে অলংকরণ করা হত। এর নামও হত অলংকরণে ব্যবহৃত প্রধান বর্ণটির নামে। এসব রঙের মধ্যে ফ্যামিলে ভার্ট, ফ্যামিলে রোজ প্রভৃতি ছিল খুবই প্রচলিত।

এনামেল পেন্ট (Enamel paint) যে সব রং শুকিয়ে কঠিন হয়ে যায় এবং এর চকচকে ফিনিশ হয় তাই হল এনামেল পেন্ট। এসব রঙে নানা ধরনের বাইন্ডার

এবং অন্যান্য উপাদান ব্যবহার করা হয়। সাধারণত এনামেল পেন্ট বাণিজ্যিক ও গৃহস্থালির কাজেই ব্যবহার করা হয়।

এ/পি (A/P)
ইংরেজিতে 'আর্টিস্ট প্রুফ'। একটি আখ্যা। ছাপাই ছবির মার্জিনে লেখা থাকে। যার দ্বারা বোঝানো হয় ছাপটি শিল্পীর নিজের হাতে করা। শব্দটির উৎস ফরাসি 'epreve d' artiste' থেকে। সাধারণত এই প্রিন্টগুলি শিল্পীর নিজের কাছে থাকা প্রথম দিকের ছাপা। এ ধরনের প্রিন্টের সংখ্যা নির্দিষ্ট নয় কিন্তু মূল সংস্করণ থেকে অনেক বেশি দামে এই প্রিন্ট বিক্রি হয়।

এম্পায়ার স্টাইল (Empire style)
নেপোলিয়নের রাজত্বকালের (১৭৯৫-১৮১৫) স্থাপত্য, গৃহসজ্জা, পোশাক ইত্যাদির একটি শৈলী। ১৮৩০ সাল পর্যন্ত এই শৈলী চালু ছিল। সাবেক রোম সাম্রাজ্যের আবহকে পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টায় নেপোলিয়ন ধ্রুপদি স্তম্ভ এবং গ্রিক প্রতীক সমূহের ব্যবহার এবং রোমান স্থাপত্য সহ অর্থের দম্ভ দেখানোর জন্য অতিসজ্জিত দামি কাঠের আসবাবপত্র পোশাক এবং নারীবসন বানাতে উৎসাহ দিতেন। এগুলো ছিল ক্ল্যাসিকাল রীতির প্রায় অক্ষম অনুকরণ।

এমপ্যাথি (Empathy)
এক কথায় শিল্প কার্যের সঙ্গে দর্শকের নিজের সৃষ্ট আবেগের বন্ধন অর্থাৎ সমানুভূতি। এমপ্যাথি প্রসঙ্গে হার্বার্ট রিডের আলোচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রিড এ-প্রসঙ্গে থিয়োরি অফ Einfühlung-এর কথা বলেছেন। Theory of Einfühlung হল সবচেয়ে সফল তত্ত্ব যার মধ্যে নান্দনিক উপলব্ধির তাৎক্ষণিক চরিত্র স্বীকৃতি পেয়েছে। এই Einfühlung শব্দটি ভাষান্তর হয়ে empathy হয়েছে। এই এমপ্যাথি শব্দটির সঙ্গে Sympathy-র সাদৃশ্য আছে। সিমপ্যাথি হল কারও উপলব্ধির সঙ্গী হওয়া আর এমপ্যাথি হল অন্যের উপলব্ধি নিজের মধ্যে স্থাপন করা। অর্থাৎ যখন আমরা সহানুভূতি প্রকাশ করি তখন আসলে আমরা অন্যের উপলব্ধি বা অনুভূতির প্রতি আমাদেব প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করি। কিন্তু যখন আমরা কোনো শিল্পকর্ম নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করি তখন আমরা ওই শিল্পকর্মের রূপের মধ্যে নিজেদের স্থাপন করি এবং শিল্পকর্মে যা আমরা দেখছি, যে মাত্রা আমরা অধিকার করছি তার দ্বারা আমাদের উপলব্ধি নির্ধারিত হয়। কোনো শিল্পকর্ম পর্যবেক্ষণ করার জন্য এমন অভিজ্ঞতা জরুরি নয়। আমরা স্বাভাবিকভাবেই দৃষ্ট বিষয় নিজেদের মধ্যে উপলব্ধি

করতে পারি কিন্তু এভাবে সাধারণীকরণ করলে সিমপ্যাথি আর এমপ্যাথির মধ্যে কোনো স্পষ্ট পার্থক্য থাকে না। রিড একটি জাপানি উডকাট প্রিন্টের উদাহরণ দিয়েছেন। হোকুসাই-এর করা 'দি গ্রেট ওয়েভ' ছবিতে সমুদ্রে বিপন্ন নৌকোর যাত্রীদের বিপদ দেখে আমাদের সহানুভূতি জাগে কিন্তু যখন প্রিন্টের শিল্পকর্মকে নিয়ে আমরা গভীরভাবে চিন্তা করি তখন বিশাল ঢেউয়ের উন্মত্ততা আমাদের অনুভূতিকে শুষে নেয়। আমরাও যেন উথালপাতাল ঢেউয়ের মধ্যে ঢুকে যাই। ঢেউয়ের প্রলয়ঙ্করী রূপকে অনুভব করতে থাকি আমাদের পায়ের নীচে। তখন আমাদের অনুভূতি আর বিপন্ন যাত্রীদের অনুভূতি এক হয়ে যায়।

এমবসিং (Embossing) অলংকরণের এই পদ্ধতিতে চিত্রতল রিলিফের মতো উঠে থাকে। কোনো উপকরণ বা সাধারণত কাগজকে কোনো ছাঁচের মধ্যে জোর করে ঢুকিয়ে এমবসিং করা হয়। সাধারণভাবে এমবসিং মেশিনে করা হলেও শিল্পীরা কখনো-কখনো হাতেও এমবসিং করেন। সেক্ষেত্রে প্লাস্টার দিয়ে ছাঁচ তৈরি করে শুকিয়ে শক্ত করে তার মধ্যে ড্যাম্প পেপার রেখে চাপ দিয়ে ছাঁচ তোলা হয় এবং ছাঁচ উঠে এলে কাগজকে শুকোতে দিতে হয়।

এমব্রয়ডারি (Embroidery) কাপড়ে সুতো দিয়ে সেলাই করে তৈরি করা নানা ধরনের নকশা বা প্যাটার্ন।

এমব্লেম (Emblem) একটি নকশা রূপ সাধারণভাবে যৌগিক নকশা। এর একটি প্রতীকী অর্থ থাকবে। ভিন্নভিন্ন আদর্শের এরকম আলাদা আলাদা মুদ্রিত এমব্লেমের, সংগ্রহ ষোড়শ এবং সপ্তদশ



নং ৪৮ এমব্লেম : থমাস হাওয়ার্ড স্মারক নকশা। যশের প্রতীক পিরামিডের সঙ্গে একজন দেবদূত কলম বহন করছে।

শতাব্দীতে জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। এই সংগ্রহ শিল্পীদের আকর গ্রন্থ হিসেবে ব্যবহৃত হত। এরকম একটি সুবিদিত ইংরেজি গ্রন্থ হল জিয়োফ্রে হুইটনির 'এ চয়েস অফ এমব্লেমস' (১৫৮৬)।

এমব্লেমা (Emblema)

মোজাইকে তৈরি এক নকশা যা পরে একটি প্যাটার্নের খসখসে মোজাইকের মেঝেতে বসানো হয়।

আরও একটি বিষয় বোঝাতেও শব্দটি ব্যবহৃত হয়। সপ্তদশ শতাব্দীর স্টিললাইফ পেন্টিং এবং ডাচ জঁর দৃশ্যে যে ক্রিয়া, প্রতীকী বস্তু ও রূপকের ব্যবহার আছে তা বোঝাতেও এই পরিভাষাটি ব্যবহার করা হয়। যেমন একজন মহিলা ফুলের গন্ধ শুঁকছে সে ক্ষেত্রে এটা ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের রূপক হতে পারে। এমনিভাবে পাঁচটা ইন্দ্রিয়ের রূপকের একটা ধারাবাহিক আঁকা যেতে পারে। 'ভ্যানিটাস' নামে এক ধরনের স্টিল লাইফ আছে যা এরকম বহু প্রতীকে ভরা।

এয়ারব্রাশ (Airbrush)

সূক্ষ্মভাবে নিয়ন্ত্রণযোগ্য রং ছোড়ার ছোটো যন্ত্র বা ছবি আঁকার একটি হাতিয়ার। ১৮৯৩ সালে এই যন্ত্রটি আবিষ্কার করেন চার্লস বার্ডিক। এই যন্ত্রের সূচিমুখ থেকে উচ্চচাপে থাকা বাতাসের বলের সাহায্যে রং-কে ফোয়ারার মতো নির্গত হতে দেওয়া হয় ফলে রং সূক্ষ্ম কণায় ভেঙে যায়। এয়ারব্রাশের সাহায্যে চিত্রপটে মসৃণ ও সুষমভাবে ফিনিশিং মতো রং লাগানো সম্ভব হয়। এই পদ্ধতি প্রথম দিকে গ্রাফিক ও কমার্শিয়াল আর্টে ব্যবহার করা হত। কিন্তু পরে ফাইন আর্টেও এই যন্ত্রের ব্যবহার শুরু হয় বিশেষ করে পপ আর্ট এবং অতিবাস্তববাদী (Super realism) শিল্পীদের দ্বারা। এয়ারব্রাশ দেখতে অনেকটা পেনের মতো ধরতেও হয় পেনের মতো। এর নজ্‌লের একটু আগে ওপর দিকে থাকে ছোটো একটা বাটি যার সঙ্গে নজ্‌লের যোগ থাকে। এই বাটিতে থাকে পাতলা করে গোলা রং। রঙের বাটির একটু আগে থাকে চাবি বা ট্রিগার। আর ট্রিগারের ঠিক নীচে থাকে বাতাস অর্থাৎ এয়ারের প্রবেশ পথ। যা একটা লম্বা পাইপের সাহায্যে উচ্চচাপের বাতাস তৈরির যন্ত্র বা কম্প্রেসারের সঙ্গে যুক্ত থাকে। ট্রিগার টিপলে নজ্‌লের মুখ থেকে বের হওয়া বাতাসের প্রবল টানে বাটির রং বেরিয়ে আসে এবং সূক্ষ্ম কণায় ভেঙে তা ছড়িয়ে পড়ে। এয়ারব্রাশ ছাড়াও একই পদ্ধতিতে স্প্রে করার যন্ত্র পাওয়া যায়। এটা বড়ো আকারের এবং বন্দুকের

মতো করে ধরতে হয় বলে এর নাম স্প্রে গান। এর রঙের বাটিটিও অনেক বড়ো। অনেক বড়ো জায়গায় রং লাগাতে এই যন্ত্র কার্যকরী। এর দ্বারা সূক্ষ্ম কাজ করা যায় না। স্প্রে গান দিয়ে বেশ ঘন রংও স্প্রে করা যায়।

এরিয়াল পারস্পেকটিভ (Aerial perspective)

বায়ুমণ্ডলের দূষণ ও অপরিচ্ছন্নতার কারণে কোনো বস্তুকে আমরা যেভাবে দেখি ও ছবিতে অনুকরণ করি তাই হল এরিয়াল পারস্পেকটিভ। আমরা যখন দূরের কোনো বস্তুকে দেখি তখন আমাদের চোখ ও বস্তুটির মাঝখানে যে বাতাসের স্তর থাকে তার মধ্যে অনেক ঝুল, ধুলো, জলীয়বাষ্প ইত্যাদি নানা অপমিশ্রণ থাকে। এই সব অপমিশ্রণ আমাদের দেখাকে দু-ভাবে প্রভাবিত করে। প্রথমত তা বস্তুর থেকে আগত আলোকরশ্মির পথে বাধা সৃষ্টি করে এবং দ্বিতীয়ত কিছু বড়ো তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলো যেমন লাল এবং কিছু ছোটো তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলো যেমন নীল এইসব অপমিশ্রণ দ্বারা শোষিত হয়। এই দুই ক্রিয়ার ফলে দূরের বস্তু বা দৃশ্যকে আমরা অপেক্ষাকৃত অস্পষ্ট ও হালকা দেখি। এই কারণে আমাদের চোখে দূরের বস্তু নীলাভ, বেগুনি আভা সম্পন্ন মনে হয়।

এলিফ্যান্টা গুহা

বম্বে অর্থাৎ আজকের মুম্বাই-এর কাছে একটি দ্বীপ যা 'ঘেরা দ্বীপ' বা 'ঘেরা পুরী' নামে পরিচিত। এই দ্বীপে পাঁচটি গুহা



নং ৪৯. এলিফ্যান্টা গুহার শিব মূর্তি। ৫৩৫-৫৫ খ্রিস্টাব্দ।

এবং মন্দির আছে। একটি মন্দিরের সামনে অতিকায় একটি হাতির মূর্তি ছিল। এই হাতির মূর্তি দেখেই পর্তুগিজরা নাম দেন এলিফ্যান্টা এবং তা থেকে এলিফ্যান্টা গুহা। ১৮৬৪ সালে হাতির মূর্তি অপসারণ করতে গিয়ে তা ভেঙে যায়। যদিও এর একটা অংশ মুম্বাইয়ের ভিক্টোরিয়া গার্ডেনে স্থাপিত হয়েছে। পাঁচটি গুহার মধ্যে এলিফ্যান্টা গুহাই বেশি প্রসিদ্ধ। ঐতিহাসিকদের মতে এই গুহার নির্মাণকাল খ্রিস্টীয় অষ্টম শতাব্দী। এলিফ্যান্টার প্রধান গুহায় পাথরের তৈরি উনিশ ফুট উঁচু মহেশের মনোলিথিক মূর্তি আছে। এই মূর্তির তিনটি মাথা। এছাড়াও শিবের নানা কাহিনি-বর্ণন ভাস্কর্যও এখানে ইতস্তত ছড়িয়ে আছে। তবে এসব মূর্তির অনেকটাই ধ্বংস প্রাপ্ত। এলিফ্যান্টা গুহায় একসময় চুনের অস্তর ছিল। এই তথ্য লিপিবদ্ধ করেছেন ডেকুটো নামে একজন বিদেশি পরিব্রাজক।

এলিভেশন (Elevation) একটি বিল্ডিং এর সম্মুখভাগের ড্রয়িং, বিল্ডিংটির কেন্দ্রের দিকে তাকালে যেভাবে চোখে পড়ে অথবা একটি বিল্ডিং এর যে-কোনো একটি দিকের উল্লম্ব মুখভাগ।

এলিমেন্টারিজ্‌ম (Elementarism) নিও প্লাস্টিসিজ্‌মের উত্তরাধিকারী যেসব ডাচ শিল্পী 'দি স্টাইল' (De stijl)-এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাঁরা এই রীতির প্রবর্তক। ১৯২৬ সালে 'দি স্টাইল' (De Stijl) ম্যাগাজিনে প্রকাশিত ইস্তেহারে থিও ভ্যান ডসবার্গ এই নতুন ধারার আন্দোলনের ঘোষণা করেন। আঙ্গিকের দিক থেকে এই শৈলীও সমকোণী উপাদানে গঠিত। কিন্তু এতে বাড়তি হিসাবে ঝুঁকেপড়া চতুষ্কোণী তলকে ব্যবহার করা হয়েছিল।



ও

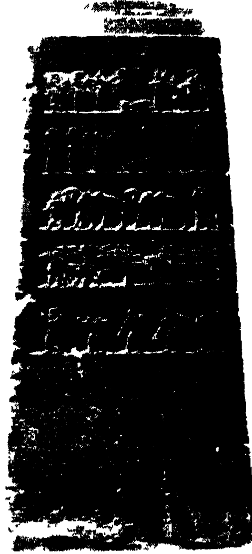
(Odalisque) প্রাচ্যের হারেমের মহিলা ক্রীতদাস। আংগ্রে, দেলাক্রোয়া, মাতিস প্রমুখ ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর শিল্পীরা এই ক্রীতদাসীদের ইন্দ্রিয়পরায়ণ নগ্নিকা বা অর্ধনগ্নিকা রীতি হিসেবে তাঁদের শিল্পের বিষয়ভুক্ত করেছিলেন। কখনো-সখনো এই ছবিতে প্রাচ্যরীতির সাজও ব্যবহার করা হত।

। নং ১৫৯ পৃ. ৩৫৩

ওপাস সেকটাইল (Opus sectile)
মার্বেল বা অন্যান্য দ্রব্যে করা এক ধরনের ইনলে। বাইজেনটাইন, রোমান বা ইসলামিক বিল্ডিং এর মেঝেতে এই ইনলে বা খচিত নকশা ব্যবহার করা হত। ব্যবহৃত পদার্থের বেশ বড়ো টুকরো নকশার ধরন (Pattern) অনুযায়ী কেটে বসানো হত। এই পদ্ধতি মোজাইকের বিপরীত যাতে টুকরোগুলি খুব ছোটো আকারের হয় এবং নকশার ফলাফল নির্ভর করে একমাত্র আলংকারিক বিভাজনের ওপর।

ওপেন ফর্ম (Open form)
একটি ভাস্কর্যের কোনো অংশ যখন আকর্ষণীয়ভাবে অভিক্ষিপ্ত বা প্রসারিত থাকে তাকে বলে ওপেন ফর্ম।

ওবেলিস্ক (Obelisk)
একদিক সরু চতুষ্কোণ পাথরের চাঁই। এটা থাকে পিরামিডের শীর্ষে। ওবেলিস্ক একেবারেই প্রাচীন ইজিপ্টের আলংকারিক সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয় যা স্মৃতিসৌধ হিসাবে ব্যবহৃত হত।



নং ৫০. কালো ওবেলিস্ক। আসিরিয়ান রাজা শাল সেনেজার স্থাপিত। ৮৪৪-৮২৪ খ্রিস্টপূর্বাব্দ।

ওভারগ্লেজ (Overglaze)
সিরামিক্সের ওপরে কলাই বা এনামেলের অলংকরণ। এটা প্রথমে গ্লেজের ওপরে করা হয় এবং দ্বিতীয়বার কম তাপমাত্রায় পুড়িয়ে এক নকশাকে স্থায়ী করা হয়।

ওমেগা ওয়ার্কশপ (Omega Workshop)
শিল্পী ও সমালোচক রজার ফ্রাই ১৯১৩ সালে লন্ডনে এই ওয়ার্কশপ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর নিজের তত্ত্বাবধানে আলংকারিক শিল্পকলা তৈরির কাজে তরুণ শিল্পীদের নিয়মিতভাবে কাজে লাগাতে তিনি এই প্রয়াস করেন। ডিজাইন তৈরির চেয়েও এই কাজের সম্পর্ক সারফেস ডেকরেশনের সঙ্গেই বেশি ছিল

এবং সেসময়ে উৎপাদিত বিভিন্ন বস্তুর বৈশিষ্ট্যকে বজায় রেখেই তা করা হত। এই ওয়ার্কশপে ফ্রাই তৎকালীন সেরা ইংরেজ শিল্পীদের কাজে লাগিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন ডানকান গ্র্যান্ট, ভ্যানিসা বেল, ওয়াইন্ডহ্যাম লিউইস, গদিয়ার-ব্রজেস্‌কা। তাঁরা ফভ এবং কিউবিস্ট মতবাদকে ইনটিরিয়র ডেকরেশনের কাজে ব্যবহারের চেষ্টা করেছিলেন। ফ্রাই-এর অভিপ্রায় ছিল উপযোগিতাহীন ভাবপূর্ণ ডিজাইন তৈরি করা। শিল্পকর্মগুলিতে আদর্শগতকারণে শিল্পীর নাম থাকত না। থাকত শুধু গ্রিক হরফ ওমেগা ছাপ, যাতে ভবিষ্যৎ ক্রেতারা কোনো বিশেষ নামের দ্বারা প্রভাবিত না হন। অল্পদিনের মধ্যেই লিউইসের সঙ্গে ফ্রাই-এর বিবাদ হয় এবং এই ওয়ার্কশপ আর্থিক ভাবে সাফল্য না পাওয়ার ফলে ১৯২০-তেই ওয়ার্কশপ বন্ধ যায়।

ওয়াটারকালার (Watercolour)

এই রং পিগমেন্ট, বাইন্ডার এবং আরও কিছু উপাদান মিশিয়ে তৈরি। বাইন্ডার হিসাবে থাকে গাম অ্যারাবিক বা গঁদের আঠা। আবার শুষ্কতা কমাতে বা আদ্রতা বাড়াতে, তুলি চালনা সহজ করতে এবং শক্ত দলা পাকানো এড়াতে প্লাস্টিসাইজার হিসাবে ব্যবহার করা হয় গ্লিসারিন। এছাড়াও রঙের নমনীয়তা বাড়াতে চিনি, কিছু আদ্রতাকারক উপাদান, সংরক্ষণকর বস্তু এবং জল মেশানো হয়।

জলরং বাষ্পীভূত হয়ে শুষ্ক হয়, তেল রঙের মতো কোনো রাসায়নিক পরিবর্তন এক্ষেত্রে ঘটে না। শুকিয়ে যাবার পর ফের জলে গুলে তুলে ফেলা যায়। ওয়াটার- কালারের বর্ণ প্রলেপ খুব পাতলা হবার ফলে এর ভেতর থেকে চিত্রতল অর্থাৎ কাগজকে দেখা যায়। এছাড়াও অনেক সময় হাল্কাভাবে যেসব রঙে ভল থাকে কিংবা রং পাতলা করতে জল লাগে, সেসব রংকেও ওয়াটারকালার বলা হয়। তবে এটা বিভ্রান্তিকর। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিশেষ করে স্থানচিত্রে রং ব্যবহার সময় জল রং খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং ব্রিটিশ ল্যান্ডস্কেপ শিল্পীদের হাতে জল রঙের ব্যবহার চরম উৎকর্ষ লাভ করে। সাদা কাগজের ওপর জলরঙের স্বচ্ছ ও পাতলা কোটিং দিয়ে যে চালে ছবি আঁকা হয় তাকে ফরাসি পরিভাষায় বলা হয় 'অ্যাকোয়ারেলা'। গোড়ার দিকের জলরঙের ছবি তথা যেমন টার্নার, সার্জেন্ট, হোমার প্রমুখের কাজে প্রচুর অস্বচ্ছ কোটিং করা জায়গা থাকত।

ছবি নং ২১৭ পৃ. ৩৮৬

ওয়াল্ডারার্স (The Wanderers)

রাশিয়াতে ভ্রাম্যমান প্রদর্শনীর জন্য গঠিত এক সমিতির সঙ্গে যুক্ত শিল্পীদের নাম ছিল দি ওয়াল্ডারার্স। সেন্টপিটার্সবার্গের ইম্পিরিয়াল আকাদেমি অব আর্টসের কঠোর অনুশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে আকাদেমি থেকে পদত্যাগ করে ক্র্যামস্কোয় এবং আরো কয়েকজন পদত্যাগী শিল্পী ১৮৭০ সালে দি ওয়াল্ডারার্স প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ঘটনাক্রমে তৎকালীন রাশিয়ার অগ্রগণ্য শিল্পীদের গরিষ্ঠ অংশই ছিলেন এই সমিতির সঙ্গে। যাঁদের অন্যতম ছিলেন রেপিন এবং পেরভ। যাঁরা শিল্পকলা সংক্রান্ত লক্ষ্যের বাইরে থেকেই সাধারণ নীতির ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলেন। তাঁদের ছবির আদর্শ ছিল সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা। গরিব মানুষের দুঃখ দুর্দশা দূর করার লড়াইয়ের স্বার্থে, তাদের লড়াইতে উৎসাহ দিতে এই শিল্পীরা ছবি আঁকতেন। এভাবে সমাজের স্বার্থবাহী করে তোলার কাজে তাঁরা চিত্রকলাকে ব্যবহার করতে চাইতেন। এইসব চিত্র নিয়ে এই গোষ্ঠীর শিল্পীরা শহরে শহরে ঘুরে প্রদর্শনী করতেন। ওয়াল্ডারার্স গোষ্ঠী এইভাবে তাঁদের শিল্পকলাকে যত ব্যাপক মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পেরেছিলেন তা এঁদের আগে রাশিয়াতে দেখা যায়নি। যদিও ১৯২৩ সালের পরে এই প্রচেষ্টা প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে টিকে থাকেনি। এক সময় আভঁ গার্দদের থেকে আক্রমণ আসে এই সোসাইটির বিরুদ্ধে।

ওয়ার্ম কালার (Warm Colour)

লম্বা তরঙ্গ দৈর্ঘ সম্পন্ন আলো যা বর্ণালির শেষে থাকে। যেমন হলুদ, লাল ইত্যাদি। আরও একটি কারণ এর পেছনে আছে। আগুনের দৃশ্যত রং লাল কিংবা হলুদ। এর থেকেও এই অ্যাখ্যা হতে পারে। এখন অবশ্য কালার থার্মোমিটার দিয়ে উষ্ণতা মেপে ওয়ার্ম কালার নির্ধারণ করা সম্ভব হয়েছে।

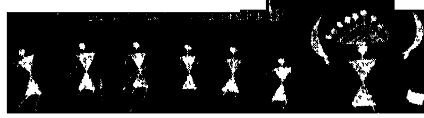
ওয়ারলি চিত্রকলা

মহারাষ্ট্রের দাহানু তালুকের আদিবাসী ওয়ারলিদের শিল্পকলা। ওয়ারলিরা সাধারণভাবে তাঁদের গৃহদেবতাকে কেন্দ্র করেই নিজেদের জীবনের, গ্রাম সমাজের কর্মকাণ্ডের ছবি আঁকে। ওয়ারলি সমাজের রীতি অনুযায়ী এঁদের চিত্রকলা আঁকার উপলক্ষ্য হল প্রধান দুটি উৎসব—'হোলি' ও 'দেওয়ালি'। এছাড়াও গৃহদেবতা বা গ্রামদেবতার আশীর্বাদ পাওয়ার মতো কিছু বিশেষ উপলক্ষ্য থাকে। যখন-তখন ছবি আঁকা চলে না। এই আদিবাসী ওয়ারলি চিত্রকলার শিল্পীও হওয়ার কথা 'সুহাসিনী' মেয়েদের অর্থাৎ যে 'বিবাহিত মেয়ের স্বামী জীবিত' তাঁর। এই চিত্রকলার রীতিগত গ্রাউন্ড হিসাবে ব্যবহৃত হয়

নং ৫১. ওয়ারলি চিত্রকলা। শিল্পী সদাশিব।









কুটিরের দেয়াল। সরু কঞ্চি দিয়ে তৈরি দেয়ালের দু-দিকে গোবর লেপা হয় এবং তার ওপর লাগানো হয় স্থানীয় লাল মাটির মোটা প্রলেপ। চিত্রকলার মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করা হয় চালের গুঁড়ো জল দিয়ে গুলে তৈরি সাদা রং। ছবির লাইন টানা হয় কাঠি দিয়ে। বিয়ে উপলক্ষ্যে কুটিরের ভেতরে যে ছোটো বেড়া থাকে তাতে ছবি আঁকা হয়। একদিনের মধ্যে পুরো দেওয়ালে একটি চালচিত্র শেষ করতে হবে। সন্ধ্যেবেলায় বিয়ে হবে। ভগত বা পুরোহিত এসে ছবি উপযুক্ত হয়েছে কিনা, গৃহদেবতার প্রতিষ্ঠা হয়েছে কিনা এসব যাচাই করে তবে সম্মতি দেবেন। ছবির বিষয় বস্তু হল—একটি চৌকোণের মধ্যে খুবই বিমূর্ত গৃহদেবতা। তারপরে ওয়ারলিদের জীবনযাত্রার নানা দৃশ্য। যেন হায়ারোগ্লিফিকস্। কোনো কিছুই বাদ পড়ে না। এই শৈলী ওয়ারলিদের একেবারে নিজস্ব। এই সব ছবি স্থায়ী নয়। মুছে ফেলে অন্য কোনো উপলক্ষ্যে নতুন ভাবে আঁকা হয় অনেকটা বাংলার আলপনার মতো। এই চিত্রকলার আঙ্গিকও বেশ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। অত্যন্ত সহজ সরল আতিশয্যহীন

রেখার মধ্যে এই ছবির প্রাণ। কোনো পূর্বপরিকল্পনা বা লেআউট ছাড়াই ছবি আঁকা হয়। মাত্র দুটি ত্রিকোণ দিয়ে সৃষ্ট মনুষ্যাকৃতি যাকে ওয়ারলি চিত্রকলার 'ট্রেডমার্ক' বলা যায় তা সত্যিই অভিনব। আবার ভঙ্গিমাপূর্ণ হাত-পা সবই আঁকা হয় সরু লাইন দিয়ে যা খুব পরিপক্কতা ছাড়া করা অসম্ভব। ছবির সর্বত্র বাস্তব জীবনের রূপায়ণ থাকলেও অঙ্কনশৈলী বা রীতিতে তথাকথিত বাস্তবতা নেই। তা একধরনের প্যাটার্নকে ব্যবহার করে তৈরি নকশা। অবশ্য এঁদের ছবিতে এখন 'পরিবর্তন'ও এসেছে। চিত্রপট হিসাবে এঁরা কেউ কেউ দেয়ালের পরিবর্তে মোটা হ্যান্ডমেড জাতীয় কাগজে গোবরজলের পাতলা প্রলেপ লাগিয়ে শুকিয়ে সাদা পোস্টার কালার দিয়ে ছবি আঁকছেন এবং পুরুষরাও এই ছবি আঁকছেন। যেমন জীব্যা সোমা মাশে। দুই ছেলেকে নিয়ে ছবি আঁকছেন। ইনি বহির্বিশ্বেও পরিচিত।

ওয়ার্ল্ড অব আর্ট গ্রুপ (World of Art Group)

একদল রাশিয়ান শিল্পীর দ্বারা ১৮৮৯ সালে সেন্টপিটার্সবার্গে এই গোষ্ঠীব পত্তন হয়েছিল। এঁরা এঁদের পূর্বসূরী ওয়ান্ডারার গোষ্ঠী এবং প্রচলিত আকাদেমি স্কুল উভয়েরই বিরোধিতা করেছিলেন। এসবের পরিবর্তে এঁরা 'আট ফর আর্টস সেক' নীতির প্রস্তাব করেছিলেন। এঁদের মধ্যে শিল্পী ছাড়াও লেখক এবং গায়করাও ছিলেন। এই শিল্পীরা ইউরোপীয় ভাবধারার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ছিলেন। 'মির ইসকুস্তভা' নামে একটি পত্রিকাও এঁরা প্রকাশ করতেন। এই পত্রিকার সম্পাদনা করতেন দিয়েঘিলেভ। এঁদের মুখপত্রে বিদেশী শিল্পীদের ছবিও ছাপা হত। দিয়েঘিলেভ-এর ব্যালে নৃত্য 'রসা' একটি উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। এই গোষ্ঠীর প্রায় সকল সদস্যই এতে সাহায্য করেছেন। অন্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা হলেন বেনোইস, বাকসট্ প্রমুখ।

ওয়াশিংটন কালার পেন্টার (Washington colour painter)

আমেরিকার ওয়াশিংটন শহরে ১৯৫০ এবং ১৯৬০ সালে ওয়াশিংটন কালার পেন্টার শিরোনামে চিত্রপ্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয় গ্যালারি অফ মডার্ন আর্টে। ক্রমশ এই প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণকারী শিল্পীরা সকলেই এই আখ্যায় পরিচিত হন। এর সঙ্গে যুক্ত শিল্পীরা সাধারণ ভাবে মনে করতেন যে রং নিজেই একটি বস্তু। এই ধারণা তাঁরা প্রকাশ করেছিলেন অনির্দিষ্ট মাপের প্রাইমারহীন ক্যানভাসে অ্যাক্রিলিক রং ব্যবহার করে। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য শিল্পীরা হলেন কেনেথ নোল্যান্ড, জেনে ডেভিস এবং মরিস লুই প্রমুখ।

ওরিগামি (Origami)

কাগজ ভাঁজ করে করে শিল্পসম্মত ডিজাইন তৈরি করার জাপানি কারুশিল্প। জাপানে সাহিত্য সংক্রান্ত এক গুরুত্বপূর্ণ



নং ৫২. জাপানি কাগজ ভাঁজের শিল্প : ওরিগামি।

কমিটি ওরিগামির অসংখ্য প্রথাগত প্রাথমিক ভাঁজ বিশদে বর্ণনা করেছেন। কয়েকজন ওরিগামি শিল্পী যেমন ইয়োশিকাওয়া আকিরা অসংখ্য সব জটিল ভাঁজের অবিশ্বাস্য উদ্ভাবন ঘটিয়েছেন। এসবের মধ্যে এমন ওরিগামিও আছে যেগুলির কোনো কোনো অংশ নড়াচড়া করতে সক্ষম। ইয়োশিকাওয়া ওরিগামি নিয়ে বেশ কিছু বই লিখেছেন।

ওরিজিনাল (Original)

যে শিল্পকর্ম শিল্পীর নিজের হাতে করা অন্য কারো দ্বারা অনুকৃত নয়। অনেক সময় কোনো কোনো শিল্পী আঙ্গিকের ক্ষেত্রে হুবহু দেখতে বহু সংখ্যক শিল্প কর্ম তৈরি করেন এবং এই শিল্পকর্ম নিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়। যামিনী রায়ের কোনো কোনো ছবির ক্ষেত্রে এরকম সমস্যার কথা অনেক সমালোচক উল্লেখ করেছেন।

ওরিয়েন্টাল আর্ট (Oriental Art)

এশীয় দেশগুলির শিল্পকলা বিশেষ করে চিন-ভারত-জাপানের শিল্প। প্রথাসিদ্ধ ওরিয়েন্টাল তথা প্রাচ্য শিল্পে রেখা এবং সজীব তুলির টানের ওপর জোর দেওয়া হয়। পাশ্চাত্য শিল্পীরা যেসব উপাদানের ওপর বেশি নির্ভর করেন যেমন পারস্পেকটিভ, শেডিং এবং শিল্পীর আত্মবৈশিষ্ট্য এসব বিষয়কে প্রাচ্যের শিল্পীরা কম গুরুত্ব দেন। প্রাচ্যের শিল্পকলার একটি বৈশিষ্ট্য হল এই শিল্প আজীবন শিক্ষা ও অনুশীলন অর্থাৎ সাধনার ওপর জোর দেয়। যা পাশ্চাত্যের শিল্পকলার ক্ষেত্রে সর্বদা বিদ্যমান নয়। সাধারণ মানের কিছু হাতিয়ার এবং মনোক্রোম বা রঙিন কালি ইত্যাদি দিয়ে প্রাচ্যের শিল্পীরা তুলির টানে সৃষ্ট শক্তিশালী রেখার ব্যবহারে নিজেদের বিষয়কে সর্বদা ব্যক্ত

করার চেষ্টা করতেন। তবে একথাও ঠিক যে উনবিংশ শতাব্দী থেকে ওরিয়েন্টাল ও ওয়েস্টার্ন শিল্পীরা পারস্পরিক ভাবে করণকৌশল এবং ভাবনার এমন আদান ঘটিয়েছেন যে ওরিয়েন্টাল ও ওয়েস্টার্ন শিল্পকলার সংজ্ঞা নির্ধারণ করা খুবই কঠিন হয়ে পড়েছে।

ওরিয়েন্টেশন (Orentation)

কোনো অট্টালিকার সম্মুখভাগের সঙ্গে দিক নির্ণায়ক যন্ত্র কম্পাসের নির্দেশ বিন্দুর সম্পর্ক। বিশেষ করে পশ্চিম ইউরোপের গির্জার প্লান যাতে প্রধান অক্ষ সাধারণত পূর্ব-পশ্চিম ভাবে থাকে। প্রধান প্রবেশ পথ থাকে পশ্চিমে এবং বেদি থাকে পূর্বে।

ওল্ড মাস্টার (Old Master)

১৮০০ সালের আগের ছবির অতি উচ্চমানের নির্মিতিকে বলা হয় ওল্ড মাস্টার। আগে ওল্ড মাস্টার বলতে ১৭০০ সালের পূর্বে কৃত ছবিকে বোঝাত।



নং ৫৩. বোত্তিচেল্লি · পিয়েতা। ১৪৯০-১৫০০ খ্রিস্টাব্দ। প্যানেলের ওপর তেল রং (১১০ X ২০৭ সেমি) মিউনিখ।

ওলিয়োগ্রাফ (Oleograph)

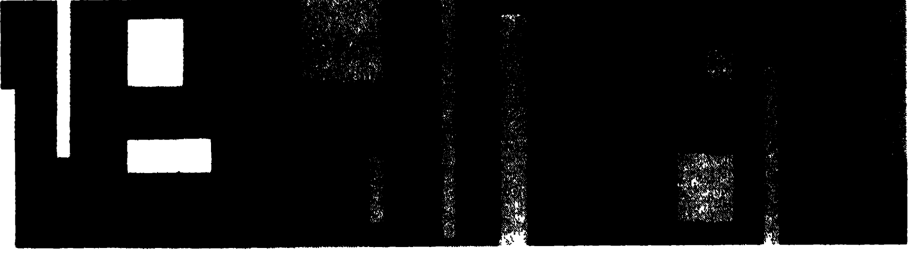
ফোটোগ্রাফির সাহায্যে লিথোগ্রাফিক পদ্ধতিতে কাপড় বা কোনো বুনন তলে ছাপা ছবি। এভাবে ছাপা ছবিতে তেল রঙের আভাস আনার চেষ্টা করা হয়।



ক

কনক্রিট আর্ট (Concrete art)

এই পরিভাষাটির প্রচলন হয় ১৯২০-র মাঝামাঝি। 'অ্যাবস্ট্র্যাক্ট আর্ট' এর সংস্রব মুক্ত এক শিল্প প্রবণতার সংজ্ঞা বোঝাতে শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছিল। এই শিল্পরীতি অনুযায়ী শিল্প



নং ৫৪. ম্যাক্স বিল : রিদ্‌ম ইন স্কোয়ার ১৯৪৩। ক্যানভাসের ওপর তেল রং ৩০ X ১২০ সেমি।

সম্পূর্ণ যুক্তি নির্ভর, বস্তুগতভাবে নিয়ন্ত্রিত, বিজ্ঞানের সাহায্যে এবং এমনকি কখনো-কখনো গাণিতিক পদ্ধতি কাজে লাগিয়ে সৃষ্ট। এই রীতির শিল্প বলতে বোঝায় আকারহীন এবং অসাদৃশ্যমূলক প্রণালীর ছবি। এই শিল্পে রেখা, রং, জ্যামিতিক আকৃতি এবং সারফেস স্ট্রাকচার প্রভৃতি বাস্তব ধারণাকে মূর্ত করার হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হয় না। বরং কনক্রিট বলতে যা বোঝায় তাহল সতর্কভাবে পরিকল্পিত চিত্র নির্মাণ। সুতরাং এই শিল্পকে কোনো বিষয়বোধের প্রকাশ হিসেবে দেখা যাবে না। এই ছবিকে দেখতে হবে একটি নির্দিষ্ট যুক্তির বিশুদ্ধ দৃশ্যরূপ হিসাবে। ১৯২৪ সালে ডসবার্গ প্রথম কংক্রিট আর্টকে সূত্রায়িত করেন। ১৯৩০ সালে 'কনক্রিট আর্ট' গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠার সময় এবং এঁদের ইস্তাহার রচনার সময়েও ডসবার্গ গুরুত্বপূর্ণ ভূমকা পালন করেন। লক্ষণীয় বিষয় হল বিভিন্ন শিল্প আঙ্গিকের অনুগামী শিল্পীদের এই গোষ্ঠীর সদস্য হিসাবে স্বীকার করা হত। যেমন কনস্ট্রাক্টিভিজ্‌ম, দি স্টাইল, বাউহাউস, দি সার্কেল এট ক্যারি (The circle et carré) ইত্যাদি।

কনটি (Conte)

ড্রয়িং-এর কাজে ব্যবহৃত চকের মতো রঙের কাঠি। কনটি আসলে সিনথেটিক চকের ব্র্যান্ড নেম বা ট্রেড নেম। এই রঙের বা ক্রেয়নের বিশেষত্ব হল এটা গাঢ় এবং খরখরে নয়। আবার প্যাস্টেল বা তেলখড়ির মতো ভঙ্গুরও নয়। কনটির কালার রেঞ্জ মোটামুটি ব্ল্যাক, হোয়াইট, ব্রাউন, আম্বার,গ্রে, সিপিয়া, স্যাঙ্গুইন (রক্তবর্ণ) অরেঞ্জ ইত্যাদি।

কনটিনিউয়াস রিপ্রেজেন্টেশন (Continious Representation)

প্রাচীন এবং মধ্যযুগের ইউরোপীয় শিল্পকলার একটি কৌশল যা আপাতভাবে একটানা পশ্চাৎপটের বিরুদ্ধে পাশাপাশিভাবে উপস্থাপিত কোনো বর্ণনামূলক ছবির সাহায্যে ভেতরের ধারাবাহিক কাহিনির রূপায়ণ। কখনো-কখনো ভুল করে একে কোলোন স্কুলের সাইমালটেনিয়াস রিপ্রেজেন্টেশন বলে অভিহিত করা হয়।

কন্ট্যুর (Contour)

কোনো আকৃতির সীমারেখা। যাতে ওই বস্তুর সঠিক আকারটা বোঝা যায়। এই ড্রয়িং-এ বস্তুর আকৃতির ভেতরের কোনো ডিটেল থাকে না। অনেক সময় অনুশীলন করতে গিয়ে চিত্র তল থেকে হাত না তুলে, একটানা রেখা দিয়ে কোনো বিষয়ের দ্রুত ড্রয়িং করা হয়। এভাবে কন্ট্যুরের মোটা রেখার সাহায্যে শিল্পী কোনো বস্তু বা বিষয়ের ত্রিমাত্রিক চেহারাটা বোঝাতে সক্ষম হন।

কনটেন্ট (Content)

বাংলা প্রতিশব্দে শিল্পকর্মের বিষয়। তাত্ত্বিকভাবে বিষয় আঙ্গিক ও শৈলী থেকে আলাদা। কিন্তু তাত্ত্বিক আলোচনার সাহায্যে বিষয় ও আঙ্গিকের মধ্যে পার্থক্য করা গেলেও প্রয়োগের ক্ষেত্রে এই দুইয়ের মধ্যে প্রভেদ ঘটানো যায় না। বিষয় বা কনটেন্টের সঙ্গে ফর্ম বা রূপের সঙ্গে একটা সম্পর্ক থেকেই যায়। কেন-না বিষয়ের রূপায়ণ আঙ্গিকের মধ্য দিয়েই ঘটে।

কনত্রাপোস্তো (Contraposto)

ইতালীয় এই পরিভাষাটির অর্থ হল বিপরীতভাবে রাখা। এই শৈলীতে মনুষ্য শরীরকে এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়, মোচড় দেওয়া হয় যাতে নিতম্ব, কাঁধ, মাথা, ভিন্নভিন্ন মুখে বাঁক নেয়। অর্থাৎ মাথা থেকে পা পর্যন্ত শরীরের বিভিন্ন অংশ একটি উল্লম্ব কেন্দ্রীয় অক্ষের ওপর তেরচাভাবে থেকে ভারসাম্য রক্ষা করে। ক্ল্যাসিকাল গ্রিক ভাস্কর্যের ভঙ্গিমার কাঠিন্য (stffness) এড়াবার জন্য এই শৈলীর প্রবর্তন হয়। এর আগে ভাস্কর্যকে দু-পায়ে সমান ভর দিয়ে দাঁড়া করানো হত। কিন্তু নতুন শৈলীতে একটি পা স্বাভাবিক ভাবে শিথিল অবস্থায় রাখা হল। রেনেসাঁসের সময়ে ইতালীয় ভাস্কররা বিশেষ করে ভেরোচ্ছিও, দোনাতেল্লো, মাইকেলাঞ্জেলো প্রমুখরা এই কায়দাকে নতুনভাবে ব্যবহার করে এর নাম দেন কনত্রাপোস্তো। ষোড়শ শতাব্দীতে ম্যানারিজ্‌মের প্রভাবে কনত্রাপোস্তো চরম পর্যায়ে পৌছায়।



নং ৫৫. কনত্রাপোস্তো : গিয়ান দা বোলোনার ম্যানারিস্ট রীতি।

কনয়েস্যরশিপ (Connoisseurship)

বাংলায় রসপাণ্ডিত্য অর্থাৎ শিল্পকলার রস আস্বাদন ক্ষমতার অধিকার। শিল্পকলার ঐতিহাসিক বার্নার্ড বেরেনসন শব্দটিকে পরিভাষারূপ দান করেন। অতিরিক্ত সাক্ষপ্রমাণ ছাড়াই কোনো শিল্পকর্মের কাল, নান্দনিক গুণাগুণ এবং বিচারকের দেখা সাদৃশ্যযুক্ত অন্যকোনো কাজের সঙ্গে শিল্পকর্মটির সম্পর্ক নির্ধারণ করার ক্ষমতা বোঝাতে পরিভাষাটি ব্যবহার করেন তিনি।

কনসোল (Console)

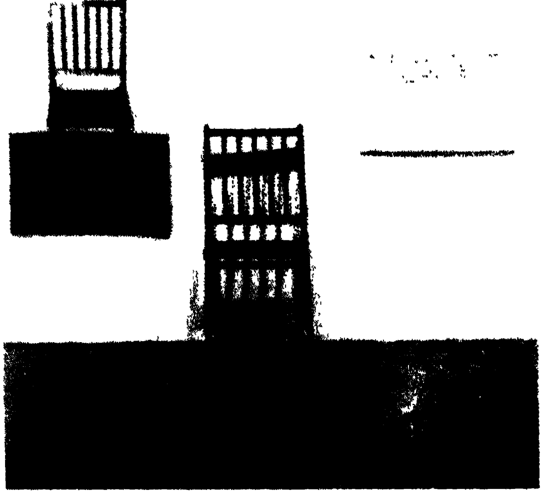
প্রাচীন স্থাপত্যে ব্যবহৃত এক জাতীয় আলংকারিক ব্রাকেট। যা লম্বায় তার প্রোজেকশনের চেয়ে বড়ো। দুটো উলটো কুণ্ডলী আকৃতি ব্যবহার করে এটি এমনভাবে তৈরি যে দেখতে অনেকটা ইংরেজি 'এস' অক্ষরটির মতো। আবার মার্বেল পাথরের টপ যুক্ত তাক বা তাকের মতো টেবিল যার খুব কারুকার্যময় ব্রাকেট বা তাদৃশ পায়া আছে তাও কনসোল নামে পরিচিত।

কনসেপচুয়াল আর্ট (Conceptual art)

শিল্পকর্মে কারিগরি দক্ষতার চেয়ে বড়ো বিষয় হল আইডিয়া বা ধারণা। একথা প্রথম ঘোষণা করেছিলেন মার্সেল দুসঁপ। ১৯৬০-এ যে সব শিল্প আন্দোলনের উদ্ভব ঘটেছিল যেমন 'বডি আর্ট', 'পারফর্ম্যান্স আর্ট', 'ল্যান্ড আর্ট', 'মিনিমাল আর্ট' তারাও শিল্পের প্রকৃতি নিয়ে প্রশ্ন তোলার মধ্য দিয়ে শিল্পের ক্ষেত্রকে প্রসারিত করার চেষ্টা করেছিল। এসবের পথ ধরে নতুন কিছু দৃষ্টিভঙ্গি উঠে এসেছিল। তার মধ্যে অন্যতম হল শিল্পের অস্তিত্ব ধারণাতেই বিরাজ করবে তারজন্য বাস্তব চেহারা জরুরি নয় এই মত। এইরকমভাবে কনসেপচুয়াল আর্টও ছিল বস্তুত শিল্পের প্রকৃতির ভেতরে এক দার্শনিক অনুসন্ধান। কনসেপচুয়াল আর্টের ক্ষেত্রে যে সূত্রগুলিকে অনুসরণ করা হয় তা হল শিল্প মৌলিক ধারণার মধ্যেই বিদ্যমান, তার কোনো বাহ্যিক চেহারা দেওয়ার দরকার নেই। ভাষাই হল শিল্পের মূল উপাদান এবং শিল্প ও শিল্পতত্ত্বের মধ্যের বাধা ভেঙে গেছে। শিল্পের নিজের প্রকৃতির মধ্যে অনুসন্ধানই শৈল্পিক কাজকর্ম হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং শিল্পের ফলাফল বা রূপায়ণকে, শিল্পী যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন শুধুমাত্র তার মধ্যবর্তী একটা হাতেকলমের প্রদর্শন বলে গণ্য করতে হবে। সুতরাং এই ধারার শিল্পরীতির শিল্পীদের সর্বাগ্রে দরকার হল

নং ৫৬ জন বল্ডেসরি : আর্ট হিস্ট্রি। ১৯৭২।

নং ৫৭. জোশেফ কসুথ . ওয়ান অ্যান্ড থ্রি চেয়ারস। ১৯১৯।



তথ্যের। বস্তুত শব্দটি চালু করেন আমেরিকান শিল্পী ও ভাস্কর লেউইট। ১৯৬৭ সালে একটি রচনায় তিনি লেখেন 'কনসেপচুয়াল আর্টে আইডিয়া বা কনসেপ্টই হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।...সমস্ত পরিকল্পনা এবং সিদ্ধান্ত নিতে হবে সবার আগে এবং রূপায়ণের কাজটা নেহাতই করার জন্য করা। আইডিয়াই হল শিল্প তৈরির যন্ত্র।' এই রীতির শিল্পীদের মধ্যে লরেন্স ওয়েইনার, লেউইট, জোসেফ কসুথ, ব্রসনমেন অগ্রগণ্য। কসুথের 'ওয়ান অ্যান্ড থ্রি চেয়ার' এর একটি দৃষ্টান্তমূলক কাজ। এই উপস্থাপনায় একটি চেয়ার, সেই চেয়ারটির একটি ফোটোগ্রাফ এবং চেয়ারের অভিধানিক বর্ণনা মুদ্রিত একটি কাগজকে পাশাপাশি ব্যবহার করা হয়েছে। এই ধারার সঙ্গে যুক্ত শিল্পীদের অনেকে 'মিনিমালিস্ট' নামেও পরিচিত।

কনস্ট্রাক্টিভিজ্‌ম (Constructivism)

১৯১৭ থেকে ১৯২০ সালের মধ্যে প্রবর্তিত একটি রাশিয়ান শিল্প আন্দোলন। আঙ্গিকগত দিক থেকে এই শিল্প হল একজাতীয় কাঠামো যাকে বলা যায় 'কনস্ট্রাকশন'। ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে এটা মডেলিংও নয় বা কার্ভিংও নয়। বরং জোড়াতাড়া দিয়ে তৈরি একটা স্ট্রাকচার বা নির্মাণ। সাধারণভাবে বিমূর্তধর্মী এই নির্মাণে ব্যবহার করা হয় শিল্পকারখানার নানা দ্রব্য যেমন ধাতু, প্লাস্টিক, তার ইত্যাদি।

১৯১৪ সাল নাগাদ রাশিয়াতে প্রখ্যাত শিল্পী কাশিমির মালেভিচ যেমন 'সুপ্রিম্যাটিজ্‌ম' নামে বিশেষ এক শিল্পধারার

নং ৫৮. অ্যাডলফ স্ট্র্যাকভ : ৮ মাচ, উইমেনস ইমানসিপেশন ডে। ১৯২০। পোস্টার।



প্রকাশ ঘটান তেমনি আর এক বিশিষ্ট শিল্পী ভ্লাদিমির তাৎলিন 'কনস্ট্রাক্টিভিস্ট' আন্দোলনের উদ্দীপনা তৈরি করেন। প্রথম দিকে তাৎলিনরা নিজেদেরকে প্রোডাক্টিভিস্ট (Productivist) বলতেন এবং পরবর্তী ছয় বছরের মধ্যেই সুপ্রিম্যাটিজম্‌কে হটিয়ে দিয়ে তা 'কনস্ট্রাক্টিভিজ্‌ম' নামে রাশিয়ার মুখ্য শৈলী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

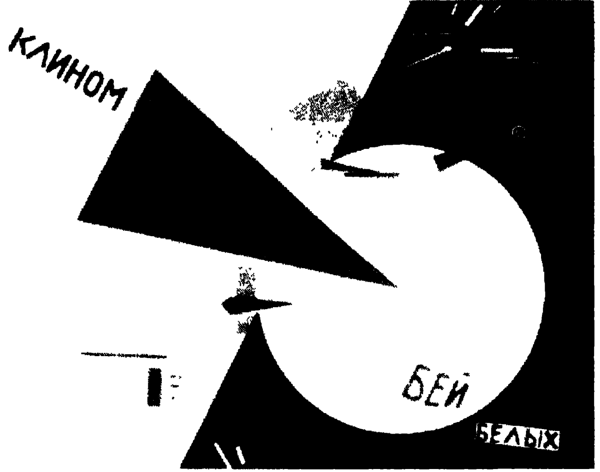
সুপ্রিম্যাটিজ্‌ম এবং কনস্ট্রাক্টিভিজ্‌ম উভয়ই কিউবিজ্‌ম এবং ফিউচারিজ্‌মের ধারণার কাছাকাছি। সুপ্রিম্যাটিজম্‌ এবং কনস্ট্রাক্টিভিজ্‌ম উভয় ধারার শিল্পকর্মে ব্যবহৃত দৃশ্য উপাদানের মধ্যে নির্দিষ্ট কিছু মিল থাকলেও মালেভিচ এবং তাৎলিনের মধ্যে শিল্পের ভূমিকার প্রশ্নে মতপার্থক্য ছিল। মালেভিচ বিশ্বাস করতেন শিল্পের কোনো সামাজিক ও রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা থাকতে পারে না। তা পৃথক ধরনের কাজকর্ম। অন্যদিকে তাৎলিন মনে করতেন শিল্পের একটা সামাজিক ভূমিকা আছে এবং তা অবশ্যই থাকা উচিত। এই ধারণাকে

ভিত্তি করে ঘটনাক্রমে রাশিয়ার কনস্ট্রাক্টিভিস্টরা বিভক্ত হয়ে পড়েন। এমনিতেই ১৯২০-র দশকে অনেক রক্ষণশীল সমালোচক মনে করতেন আধুনিক শিল্প হল নৈরাজ্যময়, আর নৈরাজ্য মানেই কমিউনিজম। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে, নিউ ইয়র্ক টাইমস-এর ১৯২১ সালের ৩ এপ্রিল সংখ্যায় এই বিষয়ে একটি নিবন্ধ পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল। যেখানে বলা হয়েছিল সাহিত্যের মতো শিল্পেও লালেরা (কমিউনিস্ট) কিউবিস্ট এবং ফিউচারিস্ট ও তাঁদের বদ জ্ঞাতিভাইয়েরা 'তাঁদের বলশেভিক পদ্ধতির দ্বারা শিল্প ও সাহিত্যের সমস্ত স্বীকৃত মানকে ধ্বংস করবে নয়তো নষ্ট করবে।' এটা সত্য যে অন্তত দাভিদের সময় থেকে শিল্পীরা, বামপন্থীরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ও সামাজিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার দ্বারা প্রণোদিত প্রতিটি বিশুদ্ধ আঙ্গিক ব্যবহার করেছেন। কিন্তু আধুনিক



নং ৫৯. ভ্লাদিমির তাৎলিন : মনুমেন্ট অব দি থার্ড ইন্টারন্যাশনাল; ১৯১৯।

নং ৬০. এল. লিসিট্‌স্কি : বিট দ্য হোয়াইট উইথ দ্য রেড। ১৯১৯।



কনস্ট্রাক্টিভিজ্‌ম-ই হল প্রথম আন্দোলন যে আদ্যন্ত মার্কসবাদী আদর্শ বা বৈপ্লবিক কমিউনিস্ট শিল্পকে প্রকাশ করেছিল।

১৯১৭ সালের মধ্যেই এই আন্দোলনে তাৎলিনের সঙ্গে আরও কিছু শিল্পী যোগ দেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন ন্যম গাবো এবং তাঁর ভাই ন্যম নিমিয়া পেভস্‌নার এবং অন্তান পেভস্‌নার, সস্ত্রীক আলেকজান্ডার রোদচেঙ্কো এবং বারবারা স্তেপানোভা প্রমুখ। তাঁরা নিজেদেরকে বললেন প্রোডাক্টিভিস্ট এবং পদার্থের সহজাতগুণ যথা রং, রূপ ইত্যাদির অনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে আধুনিক প্রযুক্তিযুগের মর্মবাণীকে ধরতে চাইলেন। এই সময়ে অর্থাৎ ১৯১৭-তে রাশিয়ার বলশেভিক বিপ্লব তাঁদের কাছে বিরাট এক সুযোগ নিয়ে এসেছিল। সমাজতান্ত্রিক প্রোডাক্টিভিস্টরা নতুন রাষ্ট্রের রাজনৈতিক নেতৃত্বের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধভাবে নতুন সমাজের সৃষ্টির কাজে সাগ্রহে যুক্ত হলেন এবং তাঁরা বিজ্ঞানী, কারিগর এবং শ্রমিকদের পাশাপাশি একসঙ্গে কাজ করার মধ্যে বেশ আনন্দ পেয়েছিলেন। নতুন রাষ্ট্রও বিপ্লবের সমর্থক শিল্পীদের পেয়ে খুশি হয়েছিলেন। এই সময় বিশেষ করে তাৎলিন আবেগপূর্ণ উদ্যম নিয়ে সাড়া দিয়েছিলেন এবং তাঁর তৈরি 'তৃতীয় আন্তর্জাতিকের স্মারক স্তম্ভ' শিল্পী ও রাজনীতিকগণের যৌথ দৃষ্টিভঙ্গিকে মূর্ত করেছিল। ১৯১৯ সালে রিভলিউশনারি ডিপার্টমেন্ট অব ফাইন আর্টস এই স্তম্ভের বরাত দেয়। প্রকৃত অর্থে এটা ছিল ১৯২১ সালে মস্কোতে অনুষ্ঠিত তৃতীয় আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট

কংগ্রেসের বাড়ির একটা মডেল। মডেলটি ছিল একটি দুঃসাহসিক কাল্পনিক নকশা। এই বাড়ি তৈরি হয় নি। কেন-না প্রযুক্তির দিক থেকে পিছিয়ে থাকা তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের মতো দেশে এটা করা সম্ভব ছিল না। তথাপি এই খসড়া রূপকাঠামোটি সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজবাদের স্বপ্ন ও এবং শিল্পী ও প্রযুক্তিবিদদের সম্মিলিত ভাবে সমাজগঠনের ভূমিকার প্রতীক হিসাবে মাথা উঁচু করে দৃঢ়তার সঙ্গে আজও দাঁড়িয়ে আছে।

বিপ্লবোত্তর সোভিয়েত ইউনিয়নের নতুন সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শিল্পী ও শিল্পের ভূমিকা কী হবে তা নিয়ে দীর্ঘ বিতর্ক হয়েছে। তাৎলিন টাওয়ার, যা ছিল উপযোগিতাবাদের লক্ষ্যে বিশুদ্ধ শিল্প আঙ্গিকের যথা চিত্রকলা, ভাস্কর্য ও স্থাপত্যের সম্মিলন তা সক্রিয় সামাজিক অংশগ্রহণের বিষয়কেই সূচিত করেছিল। এতে অনেক প্রোডাক্টিভিস্ট খুশি হননি। তাঁরা বিশেষ করে গাবো এবং পোভস্‌নার ১৯২০ সালে আলাদা হয়ে 'রিয়ালিস্টিক ম্যানিফেস্টো' প্রকাশের সাথে সাথে মস্কোতে একটি খোলা প্রদর্শনীয় আয়োজন করেন। যার মধ্য দিয়ে তাঁরা নতুন অ্যাবস্ট্র্যাক্ট কনস্ট্রাকটিভিটিজ্‌মে 'পঞ্চসূত্র' প্রয়োগ করেন। তাঁরা রং, রেখা, বস্তু, আয়তন এবং 'প্রকৃত' শিল্প কারখানার দ্রব্যের বর্ণনামূলক ব্যবহারের দাবিকে পরিত্যাগ করেন। তাঁদের ঘোষণার অধিকাংশই নির্বিরোধী হলেও. শিল্পের অবশ্যই একটা সামাজিক ও রাজনৈতিক মাত্রা থাকতে হবে— তাৎলিনের এই মত মেনে নিতে পারেননি। ফলে প্রোডাক্টিভিস্টদের দু-পক্ষের মধ্যে একটা মতাদর্শগত সংঘাত ঘটল। দু-পক্ষই নিজেদের যথার্থ কনস্ট্রাক্টিভিস্ট বলে পরিচয় দিতে লাগলেন। গাবো তাৎলিনের 'মনুমেন্ট অব থার্ড ইন্টারন্যাশনাল'কে বিশুদ্ধ কনস্ট্রাক্টিভিজ্‌ম হয়নি বলে বাতিল করে দিয়ে যন্ত্রের নকল হিসাবে বর্ণনা করলেন। অন্যদিকে তাৎলিন, রোদচেঙ্কো, স্তেপানোভা প্রমুখরা 'প্রোগ্রাম অব দি প্রোডাক্টিভিস্ট গ্রুপ' প্রকাশ করে শিল্প কারিগরদের 'সংঘটিত শিল্পে'র প্রতি তাঁদের দায়বদ্ধতাকে পুনরায় নিশ্চিত করলেন। ১৯২৩-এ 'বিশুদ্ধ শিল্পের' প্রবক্তা গাবো, পেভস্‌নার প্রমুখ রাশিয়া ত্যাগ করলেন এবং ইউরোপে গিয়ে তাঁরা ইউরোপিয়ান বা ইন্টারন্যাশনাল কনস্ট্রাক্টিভিজ্‌মের প্রতিষ্ঠা করলেন। একটা সময় পর্যন্ত কনস্ট্রাক্টিভিজ্‌ম সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ায় unofficial শৈলী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল।

কনস্ট্রাক্টিভিস্ট শিল্পীরা বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের স্বাক্ষর রেখেছেন। যেমন এল লিসিট্‌স্কির ছবি। তাঁর ১৯২০ সালে আঁকা ছবি 'বিট দ্য হোয়াইটস উইথ দ্য রেড ওয়েজ' হল একটি প্রাচীরপত্র। এতে ব্যবহৃত সহজ সরল আকৃতিগুলি বিপ্লবী রাশিয়ায় বিবাদমান দুটো শক্তির মধ্যেকার সংঘর্ষকে সহজেই তুলে ধরেছিল। কিংবা লিসিট্‌স্কির 'দি স্টোরি অব টু স্কোয়ারস' বাচ্চাদের বইয়ের জন্য আঁকা চিত্র ধারাবাহিক। বাচ্চাদের বইয়ের জন্য হলেও এতে চিত্র পরিসরকে (space) কাজে লাগিয়ে জ্যামিতিক আকার ব্যবহার করে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রূপ (form) সৃষ্টি করেছিলেন যার মধ্যে কনস্ট্রাক্টিভিস্ট ধারণা স্পষ্টতই প্রতিফলিত।

কনস্ট্রাক্টিভিস্টদের মধ্যে আদর্শগত মত পার্থক্য যাই ঘটুক না কেন বিমূর্ত জ্যামিতিকরূপের দৃশ্যভাষার জগতে কনস্ট্রাক্টিভিস্টরা ব্যাপক প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়েছিলেন। একইভাবে 'শিল্পের জন্য শিল্প' এবং 'জীবনের জন্য শিল্প' এই বিতর্কও কনস্ট্রাক্টিভিস্টদের শিল্পকলার ইতিহাসে চিরস্থায়ী একটা জায়গা দিয়েছে।

কপটিক আর্ট (Coptic Art)

ইজিপ্টের ক্রিশ্চান কপ্টদের শিল্পকলা। এঁরা প্রাচীন ক্রিশ্চান শৈল্পিক ধারার একটি রীতিকে সৃষ্টি করেছিলেন। প্রাথমিকভাবে আলেক্সান্দ্রিয়ার হেলেনীয় শিল্পকে ভিত্তি করে নীল নদের



নং ৬১. কপটিক টেক্সটাইল : অজ্ঞাতনামা। ১০৫০ খ্রিস্টাব্দ। লিনেন। ১৮ X ১৭ সেমি।

উপত্যকায় খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে এই শিল্পের অগ্রগতি ঘটেছিল। ৬৪০ খ্রিস্টাব্দে আরব বিজয়ের আগে পর্যন্ত এই শিল্পকলা বিদ্যমান ছিল। এর বেশিরভাগ ছিল পাথর ও কাঠ খোদাই এবং দেয়াল চিত্র। অধিকাংশ কাজই খাটো ও মোটা, ঘিঞ্জি ও জবরজং ধরনের। এতে ব্যবহৃত মানুষ, প্রাণী ও উদ্ভিদ স্পষ্টতই ফ্ল্যাট। এই শিল্পকলায় ডিটেল কম এবং অল্প কিছু মোটিফের ব্যবহার আছে।

কপিং (Copying)

কোনো কাজের বা শিল্পকর্মের প্রতিলিপিকরণ। কপিং শিল্প শিক্ষালাভের বহু প্রাচীন একটি পদ্ধতি। অনেক শিক্ষার্থী তাঁদের শ্রদ্ধেয় শিক্ষকের শিল্পকর্ম কপি করে তাঁদের শিক্ষাগুরুর করণকৌশল, ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও উপকরণ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করে। ক্লাসরুমে শিক্ষকের হাতেকলমে দেখানো কাজের প্রতিলিপিকরণ করা শিক্ষা ও চর্চার গতি বাড়ানোর একটি চমৎকার পদ্ধতি বলেই অনেক শিল্পশিক্ষক কপি করাকে উৎসাহ দেন আবার কেউ কেউ তা মানেন না। তবে কপিং-এর ক্ষেত্রে নৈতিকতা বজায় রাখা এবং তা শুধু শিক্ষার কাজেই ব্যবহার করা উচিত। সেই শিল্পকর্মকে কপি করে মুনাফা লাভের মতো অনৈতিক কাজ করা উচিত নয়। অন্যের কাজ নকল করে নিজের নামে বা আসল বলে চালানো উচিত নয়। কপির তলায় কোন শিল্পীর শিল্পকর্মের কপি তা উল্লেখ করা উচিত। এমনকি কোনো শিল্পকর্মের ক্ষেত্রে যদি কোনো ফোটোগ্রাফ ব্যবহার করা হয় তাহলেও সেই আলোকচিত্রীর কাছে ঋণ স্বীকার করা উচিত। তবে পরিবর্তনের মাত্রা যদি ছবিটিকে একটি নতুন বৈশিষ্ট দান করে তাহলে তাকে কপি বলা কতদুর সংগত এই নিয়েও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নও রয়েছে।

কপিরাইট (Copyright)

সাহিত্য এবং যেকোনো রকমের শিল্পকর্ম প্রকাশ প্রতিলিপিকরণ বা বিক্রির একান্ত আইনি অধিকার। কপিরাইট শিল্পী ও সাহিত্যিককে তাঁর শিল্পকর্ম বা সাহিত্যকর্মের অনধিকার বা অবৈধ প্রকাশ বা বিক্রির হাত থেকে রক্ষা করে বা সুরক্ষা দেয়। ১৭১০ সালে প্রাচীন ইংরেজি বিধি অনুযায়ী এই সুরক্ষা রাষ্ট্রীয় পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু ১৮৮৬ সালে এ ব্যাপারে এক আন্তর্জাতিক চুক্তির ফলে রাষ্ট্রের সীমানার বাইরেও এই বিধি বলবৎ হয়। ১৯৭৮ সাল থেকে এই স্বত্বের সময়সীমা নির্ধারিত হয় লেখক বা শিল্পীর মৃত্যুর পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত। কপিরাইটের প্রতীক হিসাবে '©' একটি গোলের মধ্যে

ইংরেজি 'সি' হরফটি ব্যবহার করা হয়। এ ব্যাপারে ভিন্নভিন্ন দেশে অতিরিক্ত কিছু বিধি রয়েছে। আমেরিকাতে এই অধিকার স্রষ্টার মৃত্যুর পর ৭০ বছর পর্যন্ত। যেসব রচনাকে ভাড়ায় দেওয়া হয়েছে তার জন্য এই সময়সীমা প্রকাশের দিন থেকে সর্বোচ্চ ৯৫ বছর অথবা রচনার দিন থেকে ১২০ বছর। কপিরাইট বা স্বত্বের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক চুক্তি হল 'বার্ন কনভেনশন'। ১৯৮৮ সালে আমেরিকা সহ অনেক দেশ এই কনভেনশনে যোগ দেয়। আমেরিকাতে ১৯৯৮ সালে 'The Digital Millennium Copyright Act' গৃহীত হয়। এর মধ্যদিয়ে সৃষ্টির ডিজিটাল রূপের ওপরেও স্বত্বাধিকারীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতে এই সীমা ৬০ বছর। ১৯৯১ সালে রবীন্দ্রনাথের রচনার সত্ত্ব-সীমা বাড়াতে গিয়ে ৫০ থেকে ৬০ বছর করা হয়েছে।

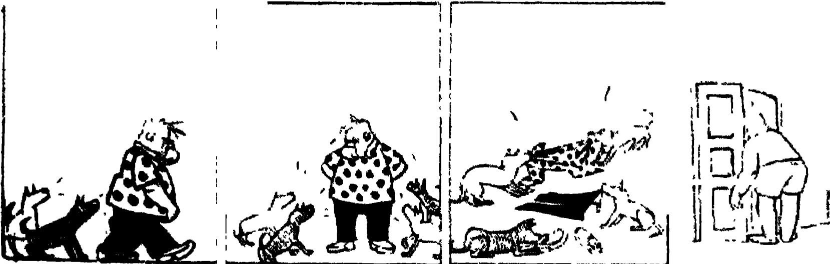
কমার্শিয়াল আর্ট (Commercial art)

যে শিল্পকলা শিল্পের খাতিরে নান্দনিক উদ্দেশ্যে তৈরি হয় না বরং কোনো কিছু বিপণনের জন্য বা বিশেষ করে বিজ্ঞাপন এবং প্রযুক্তিগত বর্ণনার লক্ষ্যে তৈরি হয় তা কমার্শিয়াল আর্ট। যদিও কমার্শিয়াল আর্ট এবং ফাইন আর্টের মধ্যে তফাৎ ক্রমশই কমে আসছে পপ আর্টের উদ্ভবের পর থেকে। পপ আর্ট ছবিতে বাণিজ্যিক বস্তুর নানা রূপ তথা পণ্যের ব্যবহার করছে ভোগবাদী উপাদানকে মিশিয়ে।

কমিক (Comic)

ছবির সাহায্যে গল্প বলার একটি রূপ। কমিকের মূল বৈশিষ্ট্য হল এর পাঠ ও ছবির মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া। এখানে ছবির ধারাবাহিকতার মধ্যে বস্তু বা ফিগারের অবস্থান নির্দিষ্ট। এতে অ্যাকশনকে উপস্থাপিত করা হয়। কমিকের নিজস্ব ভাষা তৈরি জন্য এর গ্রাফিক ও সাহিত্যগত উপাদানসমূহকে শৈলীবদ্ধ করা হয়। সংবাদপত্রের কমিকস্ট্রিপ থেকে কমিক বই সহ বিভিন্ন ধরনের কমিক আছে। আধুনিক

নং ৬২. কাফী খাঁ : খুড়ো চরিত্র নিয়ে কার্টুন। মডার্নিজম'।



কমিকস্ট্রিপের জনক হলেন রোডলফে টফার এবং উইলহেম বাস্থ। তবে আজকের যে কমিকস্ট্রিপ তার উদ্ভব আমেরিকাতে ১৮৯৬ সালে রিচার্ড আউটকাল্ট এবং রুডলফ ড্রিকস-এর যথাক্রমে 'ইয়েলো কিড' ও 'কাটজেনজামার কিড' এর সাথে।

তাঁদের হাস্যরসাত্মক সহজ ভঙ্গি মানুষ সুলভ চেহারার জন্তুজানোয়ারের গল্প ১৯১০ সালে একটানা চলেছিল । যেমন বার্কসের 'ডোনাল্ড ডাক'। ফস্টারের 'টারজান' হল নতুন প্রজন্মের প্রথম বীরসুলভ চেহারার 'সরাসরি' অ্যাডভেঞ্চার কমিক। যার সব শেষ রূপ হল সুপারম্যান। আমেরিকাতে প্রচুর কমিকস্ট্রিপ তৈরি হলেও ইউরোপেও ইদানিং পাল্লা দিয়ে উন্নত প্রযুক্তি ও মেধা ব্যবহার করে অনেক কমিকস্ট্রিপ তৈরি হচ্ছে। অনেক শিল্পীই কমিকের প্রতি উৎসাহ দেখিয়েছেন। ১৯০৬ সালে ফেনিংগারের 'কিন্ডার কিড', পিকাসো 'ফ্র্যাঙ্কোস ড্রিম অ্যান্ড লাই ১৯৩৭' নামে একগুচ্ছ এচিং-এ গল্প বলার এই রূপকে কাজে লাগিয়েছিলেন। এছাড়াও যেমন পপ আর্টের শিল্পী ওয়রহল-এর 'ডিক ট্রেসি' (১৯৬০), লিখটেনস্টাইনের 'হোপলেস' (১৯৬৩), জর্জ রোসি অর্থাৎ শিল্পী হার্জ এর নাম কে আর না জানে—তাঁর বিখ্যাত কমিক চরিত্র 'টিনটিন'। আমাদের দেশীয় কমিকস্ট্রিপের 'অমর চিত্র কথা' অন্যতম জনপ্রিয় কাজ। তাছাড়া বাংলার কমিক স্ট্রিপের ক্ষেত্রে কাফি খাঁ বা পিসি এল এর শিয়ালপণ্ডিত, নারায়ণ দেবনাথের বাটুল দি গ্রেট, ময়ূখ চৌধুরী প্রমুখদের কাজ উল্লেখযোগ্য।

কম্পিউটার আর্ট (Computer art)

কম্পিউটারকে যন্ত্র বা হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে যে শিল্প তৈরি করা হয় তাকে বলা যায় কম্পিউটার আর্ট। যদিও এর সঙ্গে আরও কিছু যন্ত্র বা উপকরণ লাগে যেমন ক্যামেরা, স্ক্যানার বা বিশ্লেষক, প্রিন্টার বা মুদ্রণযন্ত্র ইত্যাদি। একটা ইমেজ বা ছবিকে কম্পিউটারে ঢুকিয়ে বিভিন্ন সফটওয়্যার বা কম্পিউটার প্রক্রিয়ায় তাকে নানান মাত্রা দিয়ে পরিবর্তন করে কম্পিউটারের পর্দায় নতুন একটা ইমেজ বা রূপ সৃষ্টি করা হয় তারপর ইঙ্কজেট বা অন্য কোনো কম্পিউটার মুদ্রণ কৌশলে কাগজে বা ক্যানভাসে একটা ছাপ নিয়ে এই ছবি তৈরি হয়। স্বভাবতই কম্পিউটার হল একটা নতুন মাধ্যম। যেখানে আঙুলের সাহায্যে তুলি দিয়ে রং লাগিয়ে ক্যানভাসে বা কাগজে ছবি আঁকার বদলে কম্পিউটারের কি বোর্ডে আঙুল চালিয়ে অর্থাৎ

নং ৬৩. জেফ্রি শা : দ্য লেজিব্‌ল সিটি (ম্যানহাটন)। ১৯৮৯।





ফিঙ্গারিং করে এবং মাউসের বোতাম টিপে পর্দায় বা স্ক্রিনে 'আলো রং' দিয়ে ছবি আঁকা হয়। অন্তত তিন রকমভাবে কম্পিউটারে ছবি তৈরি করা যায়। এক. বিশেষ ধরনের ক্যামেরা দিয়ে বা ডিজিটাল ক্যামেরায় ছবি তুলে যান্ত্রিক উপায়ে সেই ছবি কম্পিউটারে ঢুকিয়ে বা স্ক্যানারে কোনো ছবি স্ক্যান করে নিয়ে। দুই. কোনো ডিস্কেট বা সিডি থেকে কম্পিউটারে কোনো ইমেজ ঢুকিয়ে। তিন. নির্দিষ্ট কোনো ইমেজ ছাড়াই কম্পিউটারের পর্দায় বিশেষ সফটওয়্যারের সাহায্যে ছবি বা ইমেজ তৈরি করে নিয়ে। এরপর কম্পিউটার-আর্টিস্ট বা শিল্পী সেই ইমেজকে নানাভাবে পরিবর্তন, বিবর্ধন, সংযোজন, বিয়োজন ইত্যাদি অসংখ্য প্রক্রিয়া ও পদ্ধতির সাহায্যে নতুন একটি ইমেজে পরিণত করে কম্পিউটার পরিচালিত প্রিন্টারের মাধ্যমে সেই ইমেজটির একটা প্রতিলিপি মুদ্রণ করেন। এক্ষেত্রে

পেনসিল, প্যাস্টেল, ব্রাশ, প্যালেট ইত্যাদির অনুভূতি এনে দেয় 'কি-বোর্ড', মাউস এই সব কম্পিউটারের অঙ্গ। একদিন হয়তো আসবে যখন কম্পিউটারের স্ক্রিনের ছবিতে রং লাগানোর আগে প্যালেটে ইলেকট্রনিক পেন্ট মেশানো যাবে। এই প্রসঙ্গটা ফিল মেট্সজার বলেছেন সুন্দর করে। তিনি বলেছেন, এর মধ্য দিয়ে সত্যিই হয়তো হারিয়ে যাবে টারপেনটাইনের গন্ধটা।

একটা দার্শনিক প্রশ্নও উঠছে—কম্পিউটারের ছবিকে কি ওরিজিনাল বলা যাবে? তার উত্তরও আসছে এইভাবে যে, তেল রং গৃহীত হয়েছিল ৫০০ বছর আগে, অ্যাক্রিলিক রং ৫০ বছর আগে গ্রহণ করা হয়েছে সেইরকম এই নতুন কম্পিউটার মাধ্যমও একদিন ঠিক গ্রহণীয় হবে।

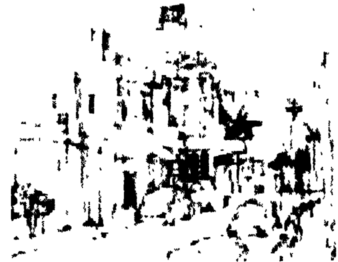
কম্পো (Compo)

নানা ধরনের প্লাস্টার মিশ্রণের সাধারণ বা জেনেরিক নাম। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে ইংল্যান্ডে স্টাক্কোর বিকল্প হিসাবে তৈরি হয়। এদের বেশির ভাগের মধ্যেই থাকতে জিপসাম এবং আঠা। এগুলি আগুন নিরোধক এবং ক্র্যাক করার সম্ভাবনা থাকত না। শক্তও হয়ে যেত খুব দ্রুত এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই রং করা যেত। এছাড়াও ওই একই সময়ে হোয়াইটিং, রেজিন ও আঠার এক ধরনের মিশ্রণ তৈরি হল যা সাধারণত আসবাবপত্রের ওপর আলংকারিক মডেল তৈরির কাজে লাগত। বিল্ডিং-এর কাজে ব্যবহৃত সিমেন্ট-লাইম মর্টারকেও কম্পো বলে।

কম্পোজিশন (Composition)

কম্পোজিশন এবং ডিজাইনকে অনেক সময় একে অপরের পরিবর্তে ব্যবহার করা হলেও কম্পোজিশন আর ডিজাইন এর অর্থের মধ্যে সামান্য তফাৎ আছে। কেন-না কম্পোজিশন হল শিল্পকর্মে উপস্থাপিত সামগ্রিক বিষয়বস্তু অন্যদিকে ডিজাইন মানে শিল্পকর্মের উপাদানসমূহের বিন্যাস। তাই কম্পোজিশন

নং ৬৪. কম্পোজিশনের প্রধান শর্ত ভিশুয়াল গ্রুপিং।



শব্দটি ডিজাইনের চেয়ে অনেক বেশি ব্যাপক অর্থসম্পন্ন। সাধারণভাবে শিল্পকর্মের সব কিছুই কম্পোজিশনের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু ডিজাইনের মূল কথা হল খসড়া অথবা পরিকল্পনা।

কমপ্লিমেন্টারি কালার (Complementary Colour)
বর্ণচক্রে পরস্পরের বিপরীত দিকের রং যেমন লাল এবং সবুজ, নীল এবং কমলা, বেগুনি এবং হলুদ ইত্যাদি। এই রকম দুটো কমপ্লিমেন্টারি রং প্রয়োজন মতো অনুপাতে মিশে গ্রে বা ধূসর শ্রেণি তৈরি করে। আবার পূর্ণ মাত্রায় মিশে তৈরি হয় ডার্ক গ্রে বা ব্রাউন।

কম্বাইন পেন্টিং (Combine painting)
দ্বিমাত্রিক চিত্রতলে অঙ্কিত কমপোজিশনে ফোটোগ্রাফি সহ ত্রিমাত্রিক বস্তু ইত্যাদি যেমন 'ওবজে ক্রভে' প্রভৃতি যুক্ত করে যে ছবি তৈরি করা হয়। কখনো যুক্ত করা বস্তুতে রং লাগিয়ে দেওয়া হয় আবার কখনো তা স্বাভাবিক অবস্থায়ও রেখে দেওয়া হয়। এই শৈলীকে কোলাজ পদ্ধতির একটু বর্ধিত রূপ বলা যেতে পারে। এর উদ্ভাবক আমেরিকান শিল্পী রবার্ট রসখেনবার্গ। দাদা, কোলাজ, মন্তাজ ইত্যাদির সঙ্গে মিল থাকলেও তফাতের দিক হল কম্বাইন পেন্টিং-এ বড়ো আকারের বস্তু ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন রসখেনবার্গের 'ব্ল্যাকমার্কেট' (১৯৬১)। গিঁট পাকানো দড়ির কোলাজ আর কাঠের তাকের সম্মিলনে তৈরি কম্বাইন পেন্টিং। রসখেনবার্গ তাঁর ছবিতে মরা প্রাণীর শুকনো দেহ, এমনকি সচল রেডিয়োকেও ব্যবহার করেছেন। এই কম্বাইন পেন্টিং আর এনভায়রনমেন্টাল আর্টের মধ্যে তফাৎ খুবই সামান্য।

ছবি নং ১৬০ পৃ. ৩৫৩

কলমকারি (Kalamkari)
কাঠের ব্লক দিয়ে হাতে কাপড় ছাপার পদ্ধতি ভারতে খুবই পরিচিত। এই ছাপার জন্য কাঠ খোদাই করে ব্লক তৈরি করেন বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত কারপেনটাররা। তারপর যেভাবে স্ট্যাম্প প্যাড থেকে কালি লাগিয়ে রবার স্ট্যাম্প লাগানো হয় তেমনিভাবে এই ব্লক থেকে কাপড় ছাপা হয়। এই পদ্ধতি



নং ৬৫. কলমকারি প্রিন্ট · অন্ধ্র।

কাজে লাগিয়ে অন্ধ্রপ্রদেশে কলমকারি ছাপা শৈলী সৃষ্টি হয়েছে। এইরকম কাঠের ব্লকের সাহায্যে কাপড়ে প্রথমে লাল ও কালো অংশ ছেপে নেওয়া হয়। তারপর এই কালো ও লাল ছাপা অংশগুলি তুলির সাহায্যে গলানো মোম দিয়ে সাবধানে ঢেকে দেওয়া হয়। এই তুলিকে বলে 'কলম'। এবার কাপড়টিকে ঠান্ডা নীল রং (ডাই)-এ ডোবানো হয়। কাপড়ের মোমে ঢাকা অংশে স্বাভাবিক কারণেই রং ধরে না। এরপর কাপড়টি শুকিয়ে নিয়ে গরম জলে দিয়ে মোম ছাড়িয়ে নেওয়া হয় এবং আবার শুকিয়ে সরাসরি হলুদ এবং সবুজ রং লাগানো হয়। শেষে সাবান জলে ধুয়ে ব্যবহারের উপযোগী করা হয়। এই ছাপার কাজে ব্যবহৃত সব রংই তৈরি করা হয় গাছের শিকড়-পাতা-কুঁড়ি-ফুল থেকে। কলমকারি ছাপার সবচেয়ে জনপ্রিয় বিষয় হল মহাভারতের নানা দৃশ্য।

কলাভবন

শান্তিনিকেতনে (বোলপুর) বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯১১ সালে। রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছাই ছিল ভারতীয় সংগীত ও চিত্রকলাশিক্ষা হবে বিশ্বভারতীর প্রধান অঙ্গ। এর চারটি বিভাগ ছিল। এক. ভাষা, সাহিত্য, দর্শন, সমাজবিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয় পঠন পাঠন ও গবেষণার জন্য উত্তর বিভাগ; দুই. বিদ্যালয় হল পূর্ববিভাগ; তিন. কলা ও সংগীত চর্চার কেন্দ্র কলাভবন এবং চার. নারীবিভাগ। আটকোনা কাঠের বাড়ি দ্বারিক-এর ওপর দোতলা তৈরি করে সেখানেই কলাভবন প্রতিষ্ঠা করা হয়। কলাভবন প্রতিষ্ঠার আগে কলকাতায় রবীন্দ্রনাথ গৃহবিদ্যালয়ে কলাবিদ্যা শেখানোর ব্যবস্থা করেছিলেন। এখানে শিক্ষক ছিলেন মুকুল দে, সুরেন কর এবং মূর্তিকলার জন্য কাশীনাথ দেবল। এই উদ্যোগের নাম ছিল বিচিত্রা সভা বা বিচিত্রা ক্লাব। লালবাড়ির দোতলা হয়ে ওঠে সভাগৃহ ও কলাভবন। দু-বছরের মধ্যে এই বিচিত্রা ও কলাভবন ভেঙে দেন রবীন্দ্রনাথ, কারণ এখানে কলাবিষয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রত্যাশা পূরণ হয়নি। ১৯১৯ সালে বিশ্বভারতী প্রকাশিত প্রসপেকটাসে বলাই ছিল 'The system of examination will have no place whatever in the Visva-Bharati, nor is there any conferring of Degree'. অর্থাৎ বিশ্বভারতীতে পরীক্ষা ব্যবস্থা থাকবে না। কোনো ডিগ্রি দেওয়া হবে না।

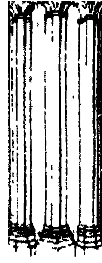
১৯২৯ সাল পর্যন্ত ছাত্রীরা শুধুমাত্র নন্দলাল বসুর কাছে শিখত। ছাত্ররা পছন্দ মতো শিক্ষকের কাছে শিখতে পারত।

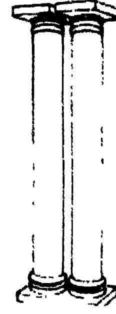
প্রত্যেক ছাত্রের কাছে একটা খাতা থাকত যেখানে শিক্ষকরা ছাত্রদের কাজের ওপর মন্তব্য লিখতেন। সেই মন্তব্যের ভিত্তিতে এবং প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণই ছিল ছাত্রদের অগ্রগতির মাপকাঠি। ১৯৫৩ সাল থেকে বিশ্বভারতীতে প্রথম পরীক্ষা গ্রহণ শুরু হয়।

শুরুতে কলাভবনে ছাত্র ছিলেন কলকাতা থেকে আগত তিনজন অর্ধেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, হীরাচাঁদ দুগার, কৃষ্ণকিশোর ঘোষ ও শান্তিনিকেতনের বীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মা। এর মধ্যে প্রথম তিনজন অসিতকুমার হালদারের সঙ্গে এসেছিলেন। তখন শিক্ষকও ছিলেন তিনজন। নন্দলাল বসু, সুরেন্দ্রনাথ কর এবং অসিতকুমার হালদার। এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথ অসিতকুমারকেই কলাভবন সংগঠনের দায়িত্ব দিয়েছিলেন।

১৯২০ সালে ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিল্পকলার থিয়োরিতে ডক্টরেট কুমারী স্টেলা ক্রামরিশ আর্ট ক্রিটিসিজমের অধ্যাপক রূপে কলাভবনে যোগ দিয়েছিলেন যদিও অল্পদিনের মধ্যেই তিনি কলাভবন ছেড়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন। ১৯২২ সালে কলাভবন দ্বারিক থেকে শিশুভবনে চলে আসে। কলাভবনের নিজস্ব গৃহ 'নন্দন' নির্মাণ শেষ হয় ১৯২৮-এ। ১৯২৯-এ কলাভবন নন্দনে উঠে আসে। 'নন্দন' নামটি রবীন্দ্রনাথেরই দেওয়া। ১৯৪৯-এর জানুয়ারিতে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের একটি কমিটি ড. রাধাকৃষ্ণনের নেতৃত্বে বিশ্বভারতী পরিদর্শনে আসেন। ১৯৫১-তে এটি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়। শুরু হয়েছিল স্টুডিয়ো হিসাবে যা ছিল বস্তুত ঔপনিবেশিক শিল্প শিক্ষার দেশীয় প্রত্যুত্তর (শিল্পশিক্ষা ও ঔপনিবেশিক ভারত : শোভন সোম)। অবশ্য শেষ পর্যন্ত কলাভবনেও ডিগ্রি ডিপ্লোমা দেওয়া শুরু হয়।

কলাম (Column) স্থাপত্যে ব্যবহৃত সোজা ও স্বাধীনভাবে দাঁড়িয়ে থাকা ভারবাহী অঙ্গ। স্থাপত্যের বিন্যাস অনুযায়ী নির্মিত স্তম্ভ সাধারণভাবে গোলাকার পরিধিসম্পন্ন। কলামের তিনটি ভাগ—পাদদেশ বা বেস, মধ্যাংশ এবং ওপরে শীর্ষদেশ বা ক্যাপিটাল। কলামের ওপর এনটাব্লেচার সহ ছাদের ভার ন্যস্ত থাকে। ইজিয়ান উপসাগরে নসস্ এবং মাইসিনের ধ্বংসাবশেষে যে কলাম পাওয়া গেছে সেগুলি উলটানো গাছের কাণ্ডের মতো মাথার দিকটা মোটা গোড়ার দিকটা সরু। পরে গ্রিক স্থপতিরা এই রূপটাকে ঠিক উলটে দিয়ে স্তম্ভ বানালেন। অর্থাৎ মাথার







দিকটা সরু এবং পাদদেশটা মোটা রাখা হল। ধীরে ধীরে স্তম্ভের নানা পরিবর্তনও ঘটল। বেশ কয়েক রকমের স্তম্ভ আছে। যেমন কাপল্‌ড কলাম— একজোড়া স্তম্ভ গায়ে গায়ে দাঁড় করিয়ে তৈরি। কম্পাউন্ড পায়ার— এক সারি স্তম্ভ মিলে তৈরি এবং এনটাব্লেচার বা আর্চ বহন করে। এনটাসিস— বেশ উঁচু, পেটের দিকের বেড়টা একটু বেশি এবং মাথার দিকের ব্যাস গোড়ার থেকে কম। সলোমনিকা— পাকানো দড়ির মতন। ভারতীয় স্থাপত্যেও এই জাতীয় কিছু ভাগ দেখা যায়।

কাইনেটিক আর্ট (Kinetic Art)

সত্যিকারের গতি বা চলন অথবা গতি বা চলনের বিভ্রমকে কাজে লাগিয়ে তৈরি শিল্পকলা। এই গতি অনেক সময়ই যান্ত্রিক উপায়ে অর্থাৎ মোটরের সাহায্যে বা জলের ধারা কিংবা বায়ু প্রবাহকে কাজে লাগিয়ে তৈরি করা হয়। ১৯০০ সালে আদিপর্বে শিল্পকারখানার দ্রব্যাদি ব্যবহার করে কনস্ট্রাকটিভিস্টরা কিছু কাইনেটিক আর্ট তৈরি করেছিলেন। তাই বলা যেতে পারে কাইনেটিক আর্টের উৎস কনস্ট্রাক্টিভিজ্‌ম। কাইনেটিক আর্টের ভিত্তিসূত্র হল সময়, পরিবর্তন এবং বিশৃঙ্খলা। ১৯২০ সালে ফরাসি শিল্পী মার্সেল দুসঁপ একগুচ্ছ চলমান ভাস্কর্য তৈরি করেছিলেন ঘূর্ণমান রিং এবং চাকতি ব্যবহার করে। ১৯৩০ সালে আলেক্সান্ডার ক্যাল্ডার প্রথম একসারি ভাস্কর্য তৈরি করেছিলেন দুসঁপ যাকে বলেছিলেন 'মোবাইলস'। এই নামটিই স্থায়ী হয়। কাইনেটিক আর্টে দুটো মূল ধারা বৈশিষ্ট্য লাভ করেছে। এক. কনস্ট্রাক্টিভিস্ট, দুই, দাদাবাদী। প্রথমোক্তরা গতিসমূহের দৃশ্য ও তার নমুনাগুলিকে সুসম্বদ্ধ করেছে। আর দাদাবাদীরা আত্মবিনাশকারী যন্ত্র তৈরি করেছেন। যেমন জঁ ত্যাঁজলির 'হোমেজ টু নিউইয়র্ক'।

ছবি নং ১৬১ পৃ. ৩৫৪

কাউন্টারচেঞ্জ প্যাটার্ন (Counterchange Pattern) অভিন্নভাবে গ্রথিত বা আলিঙ্গনাবদ্ধ উপাদান সাজিয়ে তৈরি প্যাটার্ন বা নকশা যার স্বাতন্ত্র রং অথবা বুননের মধ্যে।

কাউন্টার-প্রুফ (Counter-proof) মূল ছবিটিকে ভিজিয়ে প্রেসের সাহায্যে মুখোমুখিভাবে নতুন একটি কাগজে তৈরি প্রতিলিপি। এর ফলে মূল ছবিটির প্রতিবিম্ব তৈরি হয়।

কাংড়া পেন্টিং (Kangra Painting) চলতি কথায় পাহাড়ি চিত্রকলার এক রীতি। মুঘল যুগে পারসি শিল্পের মিশ্রণে যে অণুচিত্রের আঙ্গিক তৈরি হয়েছিল তারই একটি ধারা। কাংড়া শিল্পকলার নৈপুণ্য এমন উচ্চতায় পৌঁছেছিল যে অন্যান্য পাহাড়ি চিত্রকলার সব বৈশিষ্ট্য ঢাকা পড়ে যায়। কাংড়ার শিল্প অবশ্যই দরবারি পেশাদার শিল্পীদের সৃষ্টি অনামি কারিগরের সৃষ্ট নয়। কাংড়ার চিত্রকলার মুখ্য বিষয় কৃষ্ণলীলা-বৃত্তান্ত। কাংড়ার আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল এই চিত্রকলা রাজস্থানী চিত্রের আলংকারিক রীতির বিপরীতধর্মী অর্থাৎ বেশ রিয়ালিস্টিক। একই সঙ্গে রাজস্থানী অর্থাৎ



নং ৬৬ কাংড়া চিত্র প্রণয় ঝড়। সংসার চাঁদের আমল। ১৭৭৫ - ১৮২৩।

রাজপুত চিত্র যদি ম্যাসকুলাইন টাইপ হয় তাহলে কাংড়া অবশ্যই ফেমিনাইন টাইপ। কাংড়া চিত্রে ব্যবহৃত নিসর্গ কাংড়া উপত্যকারই মানসচিত্র।

কাংড়ার চিত্রকলার সময়কাল অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যপর্ব থেকে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত হলেও এর সবচেয়ে উন্নতি লক্ষিত হয় কাংড়ার রাজা সংসার চাঁদের সময়ে। সংসার চাঁদ নিজের দরবারে বহু প্রতিভাবান শিল্পীকে এনে রেখেছিলেন। কাংড়ার শিল্প তার আত্মীয় রাজ্য গুলেরের কাছেও ঋণী। কাংড়ার ছবিকে যদি তিনটে যুগে ভাগ করা যায় তাহলে দেখা যাবে প্রথম যুগের ছবিতে গাছপালার নকশা ইম্প্রেশনিস্ট কায়দার। মানুষের ছবিতে রেখার স্বল্পতা, চোখের ওপরের পাতা সোজা, রং কোমল, ছাই বা অ্যাশ, মভ, ব্রাউন, অলিভ গ্রিন। এর পরের যুগের ছবির রংও কোমল তবে একটু জমকালো। মানুষের চলাফেরার ভঙ্গি আগের যুগের চেয়ে ধীর ও সংযত আর লাবণ্যময়। তার পরের অর্থাৎ সংসারচাঁদের রাজত্বকালের ছবি যেমন চিত্রধর্মী তেমনি গীতিকাব্যময়। নারী দেহ বিনম্র, তন্বী, চোখ টানা টানা এবং বাঁকানো। মেহেন্দি করা আঙুল। জ্বলজ্বল করা রং গ্লেজিং-এর এফেক্টসম্পন্ন। আর ছবিতে কাংড়া উপত্যকার গাছপালা মজার রূপ নিয়ে হাজির হয়েছে। কাংড়া চিত্র থেকে শিল্পীদের নাম জানার বিশেষ উপায় নেই। যে দু-এক জনের নাম জানা গেছে তাঁরা হলেন কিষণলাল, ফাত্তু, সজ্‌নু। এর মধ্যে সজ্‌নু গুর্খাদের আক্রমণের পর সম্ভবত মাণ্ডিতে চলে যান। উপর্যুপরি গুর্খা আক্রমণের পর কাংড়ার শিল্পীরা বিভিন্ন রাজ্যে ছড়িয়ে পড়েন।

কাঠ খোদাই

উড এনগ্রেভিং দেখুন।

কাতালগ রেইজোনে (Catalogue raisonne)

একজন শিল্পীর শিল্পকর্মের টীকা সহকারে পূর্ণাঙ্গ ক্যাটালগ বা তালিকা। সাধারণভাবে এতে প্রতিটি কাজের উৎস এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য থাকে। সেই সঙ্গে শিল্পীর মৃত্যুর পরে প্রকাশিত কিছু অপ্রামাণ্য কাজের তালিকাও থাকে এতে।

কানো স্কুল (Kano School)

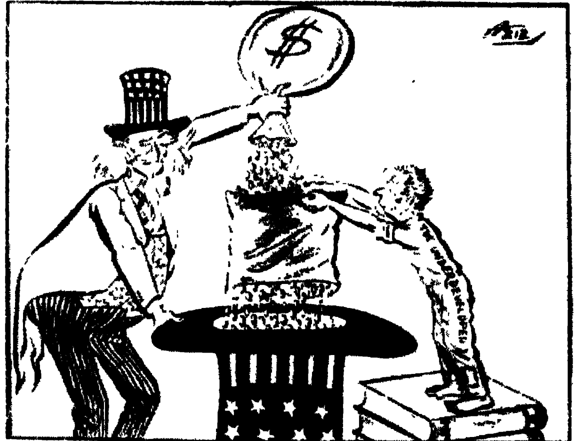
জাপানের চিত্রকলার এক বংশানুক্রমিক ঘরানা। মিউরোমাচি যুগে (১৩৯২-১৫৭৩) কানো মাসোনোবু এই ঘরানার প্রতিষ্ঠা করেন। উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত এই ঘরানা প্রচলিত ছিল। কানো ঘরানার শিল্পীরা জাপানের দেশীয় আলংকারিক রীতি


নং ৬৭. কানো স্কুল। কানো মোটোনোবু : খঞ্জনা, পাইনগাছ এবং ঝরনা। কাগজের ওপর কালি ও রং। ১৮০ x ১৮০ সেমি।

এবং চিনা কালিচিত্র উভয় পদ্ধতিতেই কাজ

কার্টুন (Cartoon)

শব্দটি সাধারণভাবে ব্যবহার করা হয় শিল্পকলার প্রাথমিক এবং পুরো আকারের অনুশীলনমূলক ড্রয়িং বা খসড়া বোঝাতে। ডিটেল সহ এই ড্রয়িংটি কাগজের ওপর এমনভাবে করা হয় যা থেকে কোনো ফ্রেস্কো বা ইজেল পেন্টিং-এর গ্রাউন্ডে এই আউটলাইন ট্রানস্‌ফার করা যায় এবং মূল শিল্পকর্মটি নির্মাণ করতে সুবিধা হয়। এই রকম একটি কার্টুন হল লিওনার্দো দা ভিঞ্চির প্রস্তাবিত 'ভার্জিন অ্যান্ড চাইল্ড উইথ সেন্ট অ্যানে অ্যান্ড ইনফ্যান্ট সেন্ট জন' ছবির জন্য পূর্ণ আকারের ড্রয়িংটি। ফ্রেস্কোর জন্য তৈরি কার্টুনকে অনেক সময় ছোটো ছোটো টুকরো করে নেওয়া হয় প্রতিদিনের কাজের মতো করে। এর সাহায্যে ফ্রেশ প্লাস্টারের ওপর কাগজ রেখে সূচের চাপে বা ফুটো দিয়ে রং ফেলে নকশাটি ট্রানস্‌ফার করা যায়। তবে আজকাল ব্যঙ্গ বা কৌতুকের উদ্দেশ্যে অঙ্কিত ছবিই কার্টুন


নং ৬৮. এম.এ.আজিজ। পাকিস্তান। 'মার্কিন সাহায্য'। ১৯৬৬। আরও ছবি নং ২০০ পৃ. ৩৭৬

হিসাবে পরিচিত। এর উৎপত্তি সম্ভবত ব্যারির নিউ হাউসেস অফ পার্লামেন্টের সজ্জার জন্য ১৮৪৩ সালে প্রদর্শিত বিতর্কিত ছবি থেকে।

কার্ডবোর্ড (Cardboard) — সেলুলোজ ফাইবার বা উড পাল্প থেকে তৈরি বিভিন্ন থিকনেস-এর রকমারি কাগজের সাধারণ নাম। দু-ধরনের কার্ডবোর্ড আছে—সাধারণ কার্ডবোর্ড এবং আর্চাইভাল কার্ডবোর্ড। সাধারণ কার্ডবোর্ড একটু নিম্নমানের গ্রে বা ব্রাউন রঙের হয়। এই কার্ডবোর্ড অম্লধর্মী, এই বোর্ড কোনো স্থায়ী শিল্পকর্ম বা ছবি করার উপযোগী নয়। এই কার্ডবোর্ড জল রং, প্যাস্টেল, বা অন্য কোনো কাগজের ওপর আঁকা ছবির পেছনে ব্যবহার করা উচিত নয়। এই কাগজ সাধারণভাবে প্যাকিং বাক্স তৈরিতে লাগে। সাধারণ কার্ডবোর্ডের অম্লত্ব দূরীকরণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আর্চাইভাল কার্ডবোর্ড তৈরি করা হয়। বেশিরভাগ কার্ডবোর্ড জলীয় বাষ্প শোষণ করে ফুলে যায় বা আলগা হয়ে যায়।

কার্পেট পেজ (Carpet page) — পুরো পাতা জোড়া অ্যাবস্ট্র্যাক্ট প্যাটার্নের নকশা। কখনো-কখনো ধর্মীয় সংকেতের ব্যবহার যুক্ত। বাইবেলের নতুন নিয়মের পুস্তক চতুষ্টয়ের প্রতিটির প্রথমে রীতিবদ্ধ প্রতিকৃতির উলটো দিকে এই ধরনের প্যাটার্নকে রাখা হয়। অষ্টম ও নবম শতাব্দীর হিবার্নোনোর্স স্কুলের ইলিউমিনেটেড ম্যানাস্ক্রিপ্ট (পাণ্ডুলিপি অলংকরণ) অনুযায়ী এই প্যাটার্ন করা হত।

কার্বন ব্ল্যাক (Carbon black) — বহু রকমের খাঁটি বা প্রায় খাঁটি কার্বন বা অঙ্গারের যে-কোনো একটি ঘন কালো মিহি গুঁড়ো। এর কালো করার ক্ষমতাও চমৎকার। বেশিরভাগ কার্বনই হল ঝুল বা হাইড্রোকার্বনের অংশত দহন থেকে তৈরি। কার্বন ব্ল্যাক দিয়ে ইন্ডিয়ান ইঙ্ক সহ বহু রকমের কালি ও কিছু রং তৈরি করা হয়। কার্বন ব্ল্যাক অটোমোবাইল টায়ার তৈরিরও মুখ্য উপাদান। জ্বালানি এবং প্রক্রিয়া অনুযায়ী প্রস্তুত ঝুল থেকে তৈরি কার্বন ব্ল্যাক গাঢ় কালো থেকে নীলচে কালো পর্যন্ত হয়। কার্বন ব্ল্যাকের একটি রূপ হল ভুসা কালি। যা তেল পোড়ানোর সময় নির্গত ধোঁয়াকে জমিয়ে তৈরি হয়।

কারসিভ (Cursive) — প্রবহমান (flowing) শৈলীর ক্যালিগ্রাফির যে-কোনো একটি রূপ যাতে হরফগুলি আলাদা না থেকে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত থাকে। এই ধরনকে অনুসরণ করে তৈরি কোনো টাইপফেসকেও কারসিভ বলা হয়।

কালার (Colour)

সাধারণভাবে হিউর সমার্থক কোনো বিষয়ের রং যেমন লাল, নীল, হলুদ, সবুজ ইত্যাদি বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু শব্দ বা টার্ম হিসাবে কালার সত্যিই হিউর চেয়ে আরো বেশি কিছুকে বোঝায় যেমন রঙের ধর্ম অর্থাৎ 'হিউ', সংপৃক্তি বা স্যাচুরেশন, মূল্য বা ভ্যালু আর তাপমাত্রা বা টেম্পারেচার এইসব কিছু মিলে হল কালার।

হিউ—কোনো রঙের নির্দিষ্ট পরিচয় যেমন লাল, নীল, কমলা, বেগুনি ইত্যাদি। শিল্পীদের ব্যবহারের জন্য অনেক সংখ্যায় হিউ-র পিগমেন্ট আছে। যত সংখ্যক রংই পাওয়া যাক না কেন কার্যত হিউর শেষ নেই। একটি রঙের মিশ্রণ যদি অন্যটির থেকে সামান্য তফাৎ হয় তাহলেই একটা নতুন 'হিউ' পাওয়া যাবে।

স্যাচুরেশন বা সংপৃক্তি শব্দটি পরিমাপ করা কঠিন। এটা হল কোনো নির্দিষ্ট রঙের বা হিউর বিশুদ্ধতা বা দীপ্তির মাত্রা। যেমন কোবল্ট ব্লু রঙের টিউব থেকে রং নিয়ে যদি তার সঙ্গে একটু ক্রিমসন মেশানো যায় তাহলে কোবল্ট ব্লুর স্যাচুরেশন কমবে। কোবল্ট ব্লু একটু দুর্বল হয়ে যাবে। আবার যদি তার সঙ্গে একটু সাদা মেশানো যায় তাহলে কোবল্ট ব্লু ম্যারম্যারে হয়ে যাবে। দুটো মিশ্রণের স্যাচুরেশন টিউবে থাকা রঙের চেয়ে কম।

ভ্যালু বা মূল্য হল কোনো একটি নির্দিষ্ট অংশে রঙের উজ্জ্বলতা অনুজ্জ্বলতা। এটি সবচেয়ে ভালো বোঝা যাবে যদি একটি রঙিন ছবির সাদাকালো ফোটোগ্রাফ নেওয়া যায়। ওই ফোটোগ্রাফটিতে সাদা ও বিভিন্ন মাত্রার গ্রে বা কালো দেখতে পাওয়া যাবে। এই নানা ধরনের 'হিউ'গুলি যে বিভিন্ন মাত্রার গ্রে বা ব্ল্যাকে পরিবর্তিত হয় তা হয় হিউগুলির ভ্যালু অনুযায়ী।

টেম্পারেচার বা উষ্ণতা হল নির্দিষ্ট রঙের আপেক্ষিক তাপমাত্রা। লাল থেকে শুরু করে কমলা হলুদ ব্রাউন এই হিউশ্রেণি উষ্ণ আবার নীল সবুজ হিউশ্রেণি শীতল। যদিও এই উষ্ণতা এবং শীতলতার মধ্যে মাত্রাগত পার্থক্য আছে। যেমন ইয়েলো অকারের উষ্ণতা লেমন ইয়েলোর চেয়ে একটু বেশি মাত্রার। একইভাবে ভিরিডিয়ান গ্রিন-এর শীতলতা অলিভ গ্রিনের চেয়ে একটু বেশি।

ছবি নং ২০৫, ২০৬ পৃ. ৩৭৯

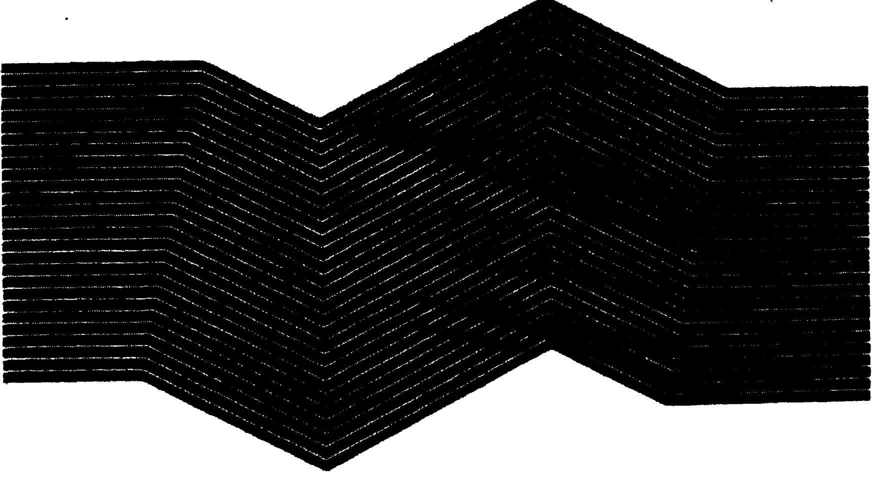
কালার টেম্পারেচার (Colour temperature)

রঙের তাপমাত্রা। আলোক উৎস থেকে নির্গত আলোর রঙের কেলভিন ডিগ্রি অনুযায়ী পরিমাপ। এই পরিমাপ

অনুযায়ী টাংস্টেন আলোর মাত্রা ২৭০০ ডিগ্রি কেলভিন (২৭০০°কে) যা দিনের আলোর মাত্রা ৬৫০০ ডিগ্রি কেলভিন এর চেয়ে বেশি হলুদ।

কালারফিল্ড পেন্টিং (Colourfield Painting)

কিছু অ্যাবস্ট্র্যাক্ট এক্সপ্রেশনিস্ট শিল্পীর ছবির শৈলীর ক্ষেত্রে এই শব্দটি ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ এটা অ্যাবস্ট্র্যাক্ট



নং ৬৯. ফ্রাঙ্ক স্টেলা : ননসা পাসা ন্যাডা। ১৯৬৪।

এক্সপ্রেনিজ্‌মের একটা রূপ। ১৯৬০-এ এই শৈলী স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং এখনও পর্যন্ত এই শৈলী বিদ্যমান। এই ধারার শিল্পীরা ভাবগত অভিব্যক্তি, সামাজিক বিষয় এবং বোধগম্য চিত্রকল্পের বদলে রঙের আবহ সৃষ্টিতে উৎসাহী। এই জাতীয় ছবির কম্পোজিশনের মধ্য দিয়ে শিল্পীরা বলতে চান যে রঙের ক্ষেত্র ক্যানভাস ছাড়িয়ে অনন্তময় বিস্তৃত। কিছু কালারফিল্ড পেন্টিং-এ ব্যবহৃত আকৃতি সমূহ তীক্ষ্ণ প্রান্তবিশিষ্ট ও জ্যামিতিক এবং আকার ও চিত্রতলের গুরুত্ব সমান। আবার কিছু পেন্টিং-এ ব্যবহৃত আকারগুলির প্রান্ত কোমল ও অস্পষ্ট। এতে Stain বা Soak করে তার মধ্যে আবহমণ্ডলীয় ফল তৈরি করা হয়। এই ধারার উল্লেখযোগ্য বিদেশি শিল্পীদের মধ্যে আছেন বার্নেট নিউম্যান, মার্ক রোথকো, অ্যাড রেনহার্ডট সেইসঙ্গে মরিস লুই, কেনেথ নোল্যান্ড প্রমুখ।

কালার‍্যান্ট (Colorant)

এটি সাম্প্রতিক কালে ব্যবহৃত একটি বর্ণ পরিভাষা। যে-সব পদার্থ দিয়ে রং তৈরি হয় বা অন্য পদার্থকে রঙিন করে তা। এই ভাবে দেখলে পিগমেন্ট বা রঞ্জককে বলা যাবে কালার‍্যান্ট। কিন্তু পিগমেন্ট হল কালার‍্যান্টের একটি ধরন। আরেকটি হল ডাই।

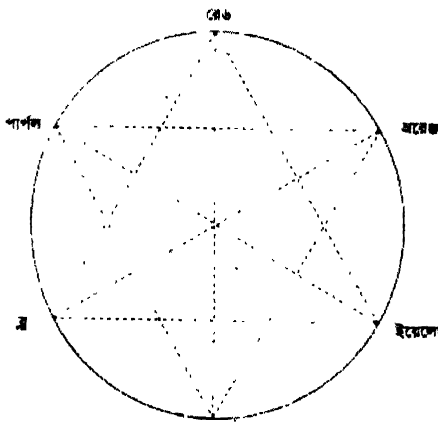
কালার ইউনিটি (Colour Unity)

ছবিতে দর্শনতৃপ্তি সৃষ্টি করতে পারে এমন প্রধান রংগুলি বা বর্ণ পরিবারের ব্যবহার তথা সামগ্রিক বর্ণ পরিকল্পনা।

কালার হুইল (Colour wheel)

একটি চক্রে মধ্যে বিভিন্ন রংকে সাজিয়ে একটি রঙের সঙ্গে আরেকটি রঙের অনুক্রমিক সম্পর্ক দেখানোর একটা রীতিগত পন্থা। এই ক্ষেত্রে লাল, নীল ও হলুদ রংকে একটি চক্রের বা বৃত্তের মধ্যে সমান দূরত্বে রাখা হয়। এই তিনটে রংকে বলা হয় প্রাথমিক রং বা প্রাইমারি কালার। দুটো করে প্রাথমিক রং মিলে দ্বিতীয় আরেক সেট রং তৈরি করে যাদের বলা হয় সেকেন্ডারি কালার। এরা হল কমলা, সবুজ এবং বেগুনি। এভাবে তৃতীয়বার পাশাপাশি থাকা দুটো করে রং মিশে টার্শারি কালার সেট তৈরি হয়। এভাবে কমলা আর লাল মিলে তৈরি হয় লালচে কমলা। কালার হুইল থেকে যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি বোঝা যায় তা হল কালার হুইলে প্রতিটি রঙের উলটো দিকে যে রংটি থাকে তা সেই রংটির কমপ্লিমেন্ট অর্থাৎ উলটোদিকের রংগুলি কমপ্লিমেন্টারি কালার। এইভাবে হলুদের কমপ্লিমেন্ট হল বেগুনি, সবুজের কমপ্লিমেন্ট হল লাল, নীলের কমপ্লিমেন্ট হল কমলা। অর্থাৎ সবুজ, কমলা, বেগুনি হল কমপ্লিমেন্টারি কালার। যেহেতু কমপ্লিমেন্টারি রংগুলি পরস্পরের বিপরীত দিকে থাকে তাই এই রংগুলি একে অপরের বিপরীত অর্থাৎ কনট্রাস্ট। তাহলে হলুদের বিপরীত হল বেগুনি, লালের বিপরীত হল সবুজ, এবং নীলের বিপরীত হল কমলা। আবার পাশাপাশি অবস্থানকারী রংগুলি সমন্বয়ী বা সদৃশ। কমপ্লিমেন্টারি রংগুলির আবার কিছু মজার গুণ আছে। দুটো কমপ্লিমেন্টারি কালার মিশিয়ে দারুণ সব গ্রে কালার তৈরি করা যায়। যেমন

ছবি নং ২০৭, ২০৮ পৃ. ৩৮০





সঠিক অনুপাতে লাল এবং সবুজ, নীল এবং কমলা অথবা হলুদ এবং বেগুনি মেশালে সুন্দর গ্রে কালার তৈরি হয়। অবশ্য সব সময় কমপ্লিমেন্টারি মিশিয়ে তৈরি গ্রে খুব উৎসাহব্যঞ্জক হয় তা নয়, অনেক সময় তা মাটির রং ধারণ করে। আবার মূল রঙের সঙ্গে কমপ্লিমেন্টারি রং মিশিয়ে মূল রঙের উজ্জ্বলতা কমানো যায়। যেমন ব্রাইট কোনো রেডের সঙ্গে একটু সবুজ মিশিয়ে দিলে লালের উজ্জ্বলতা কমে যাবে বা লাল রংটা dull হয়ে যাবে। তৃতীয় আর একটি কৌতূহলোদ্দীপক বিষয় হল একটি রঙের পাশে তার কমপ্লিমেন্টারি রং ব্যবহার করে দুটো রংকেই বেশি প্রাণবন্ত করে তোলা যায়। যেমন হলুদের চারপাশে যদি হালকা ভায়োলেটের প্যাচ লাগানো যায় তাহলে ভায়োলেট এবং হলুদ দুটোই আরও দীপ্ত হয়ে ওঠে।

কালীঘাট পেন্টিং

কলকাতার কালীঘাট অঞ্চলে প্রাথমিকভাবে কালীমন্দিরকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা এই লোকআঙ্গিকের শিল্পকলার উদ্ভবকাল সঠিকভাবে নির্ণীত না হলেও সাধারণভাবে ধরা হয়



নং ৭০. মাছ মুখে বিড়াল। কালীঘাট পট। ১৮৯০।
আরও ছবি নং ১৬২ প. ৩৫৪

কালীঘাট পেন্টিং শৈলীর উদ্ভব ঘটেছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায়। কালীঘাট মন্দির অঞ্চলে মূর্তি নির্মাণ নিষিদ্ধ থাকায় শিল্পীরা ছবি আঁকতেন। সেসব ছবি মূলত কালী ও অন্যান্য দেবদেবীর। দর্শনার্থীরা পুজো দিতে এসে পটে আঁকা দেবদেবীর ছবি কিনে নিয়ে যেতেন। সমকালীন বাঙালি বুদ্ধিজীবী ও পণ্ডিতগণের অনেকে কালীঘাটের পটচিত্রকে নিম্নমানের বলে আখ্যা দিলেও কালীঘাটের শিল্পীরা এমন এক চিত্রভাষা ও আঙ্গিকের সৃষ্টি করেছিলেন যা একান্তই কলকাতা তথা বাংলার নিজস্ব এবং অবশ্যই 'আধুনিক' শিল্পকলার লক্ষণাক্রান্ত। প্রথম দিকে এই শিল্পীরা কালীঘাটে থাকতেন না। তাঁরা আসতেন মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম ও চব্বিশ পরগনা (বর্তমান দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা) থেকে। তারপর ধীরেধীরে তাঁরা এই অঞ্চলে বসতি করেন। আদিতে কালীঘাটের ছবি ঘন রঙে আঁকা হত। কিন্তু পরে ঘন রঙের বদলে স্বচ্ছ জল রঙের ব্যবহার চালু হয়। বাংলার পটের রীতিগত ঐতিহ্য পালটে যায় কালীঘাটের পটে। রেখার প্রাধান্য থাকলেও ছবিতে ত্রিমাত্রিক আভাস আনার চেষ্টা হয়। সে সময় বিদেশি শিল্পীরাও কালীঘাটে এসে কাজ করেছেন। ফলে কালীঘাটের ছবিতে স্বচ্ছ জল রঙের প্রভাব পড়াটা অস্বাভাবিক নয়। দেখা গেছে এক সময় শিল্পীরা হাতে তৈরি দেশি কাগজের পরিবর্তে কলে তৈরি বিদেশি কাগজে দেশজ রঙের বদলে বিদেশে তৈরি রাসায়নিক রঙে ছবি আঁকতে শুরু করেন। ইংরেজদের প্রভাব বৃদ্ধির ফলে যেসব সামাজিক পরিবর্তন সূচিত হতে শুরু করে তা কালীঘাটের শিল্পীদের মধ্যেও নানা পরিবর্তন ঘটায়। তাঁরা দেবদেবী ছাড়াও নানা সামাজিক ঘটনাবলি নিয়ে ছবি আঁকতে শুরু করেন। এই কারণে সমাজদর্পণ হিসাবেও কালীঘাটের ছবিকে উপস্থিত করা যায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর কলকাতায় বহমান জীবনের দুই ধারা সাহেব পাড়া ও দেশি পাড়া উভয় পাড়ার অধিবাসীদের বিলাসব্যসনই বিষয় হয়ে উঠেছে কালীঘাটের পটে। সাহেব বিবি, হাতির পিঠে সাহেবের বাঘ শিকার, ঘোড় দৌড় এসমস্ত সাহেবি কালচারের পাশাপাশি তখনতার উচ্চবিত্ত বাঙালির বাবু কালচারে যে নৈতিক স্খলন ঘটেছিল তাও কালীঘাটের ছবির লক্ষ্য হয়ে উঠেছিল। বারবণিতাদের বিষয়ও বাদ যায়নি। গোলাপসুন্দরী নামে এক বারবণিতার ছবি, নবীন এলোকেশীর সাড়া ফেলা কাহিনির ব্যঙ্গচিত্রও উঠে এসেছে কালীঘাট পেন্টিং-এ। ব্যঙ্গ চিত্রের সাহায্যে নীতি শিক্ষা দেওয়া বা ধর্মীয়

চিত্রায়নের মধ্য দিয়ে পুণ্যার্জনই নয় কালীঘাটের শৈলীর রূপাদর্শ সৌন্দর্যবোধের মধ্য দিয়ে আনন্দ উপভোগের দিকেও টেনে নেয় সাবলিল ভাবে। এরই নমুনা হল জোড়া পায়রা। মাছ মুখে বিড়াল, হাতের মুঠোয় ধরা গলদাচিংড়ি। তখন সস্তা ছাপার ছবির যুগ আসেনি। পটের ছবির কদর ছিল তাই বাজার ছিল। তবে একসময় কালীঘাটে আগত দর্শনার্থীরা বেশি দাম দিয়ে জড়ানো পট কিনতে চাইত না। তাই কালীঘাটের শিল্পীরা চৌকো পট আঁকতে শুরু করে। তারপরে বিদেশি মুদ্রণ ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে কালীঘাটের পট শিল্প সংকটের মুখে পড়ে। বিদেশি শিল্পীদের আঁকা ছবির দামের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় হেরে যায়। ইউরোপীয় প্রভাবকে স্বীকার করে অন্যরা টিকে গেলেও, হেরে যায় কালীঘাটের ছবি। তবু এই অসংখ্য নাম না জানা চিত্রকরদের মধ্যে যাঁরা উজ্জ্বল ছিলেন তাঁরা হলেন নীলমণি দাস, বলরাম দাস, গোপাল দাস, পরাণ দাস, বলাই বৈরাগী, খ্যাপা কানাই, বাটকৃষ্ণ পাল, নিবারণ চন্দ্র ঘোষ, কালীচরণ ঘোষ প্রমুখ। ১৯২০ থেকে ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এই শিল্পরীতির অবলুপ্তি ঘটে।

কাস্ট শ্যাডো (Cast shadow) আলো-কে বাধাদানের ফলে যে ছায়ার সৃষ্টি হয় তা হল কাস্ট শ্যাডো। সূর্যের আলোয় বা কোনো আলোক উৎসের কাছে যদি একটি কাপ রাখা যায় দেখা যাবে কাপে বাধার পেয়ে কাপের পাশে একটা ছায়া সৃষ্টি হয়েছে। এই ছায়াটা কাস্ট শ্যাডো। কিন্তু আলোর ঠিক বিপরীত দিকে কাপের গায়ে যে ছায়া দেখা যাবে তা আলোর অনুপস্থিতির জন্য ঘটেছে। এই বিশেষ ধরনের ছায়াকে শেডিং বা মডেলিং বলা হয়।

কাস্টিং বা ঢালাই (Casting) ছাঁচের মধ্যে তরল বা আধা তরল পদার্থ বিশেষ করে গলানো ধাতু, প্লাস্টার গোলা ঢেলে কোনো বস্তু বা শিল্পকর্ম তৈরির প্রক্রিয়া। কখনো-কখনো কাগজের মণ্ড ছাঁচে ঢেলেও কাগজের ছাঁচ তোলা হয়। মূর্তি বানানোর পাশাপাশি এভাবে গহনাও তৈরি করা হয়। কিন্তু এই পদ্ধতি ধাতুকে পুড়িয়ে ছাঁচে পিটিয়ে ছাপ তোলার ঠিক বিপরীত। আমাদের দেশের ডোকরা যেমন এক ধরনের কাস্টিং পদ্ধতি যা ইউরোপে সর পেরদু (cire pardue) নামে পরিচিত।

কিউনিফর্ম (Cuneiform) পেরেক বা কীলকের মতো আকার ব্যবহার করে লেখার একটি রূপ। ল্যাটিন শব্দ cuneus মানে পেরেক বা কীল।

নং ৭১. বাউন্ডারি স্টোনের ওপরে খোদিত কিউনিফর্ম লিপি। ব্যাবিলনিয়া। ১১২০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ।



নরম মাটির ফলকের ওপর পেরেক বা কীলকাকার বস্তু চেপে ছাপ দিয়ে কিউনিফর্ম লেখা হত। সম্ভবত দক্ষিণ মেসোপটেমিয়ায় সুমেরীয়রা এই লিপি উদ্ভাবন করেন। মধ্যপ্রাচ্যের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে কিউনিফর্ম লিপির ব্যবহার ছড়িয়ে পড়ে ৩০০০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দ থেকে খ্রিস্টীয় প্রথম শতকের কাছাকাছি সময় পর্যন্ত। গোড়ার দিকের কিউনিফর্ম লিপিতে সত্যিকারের বস্তুকে বোঝানোর জন্য চিত্রলেখ বা পিকটোগ্রাফ ব্যবহার করা হত। ধীরে ধীরে শৈলীবদ্ধ রূপের সাহায্যে পিকটোগ্রাফ প্রতিস্থাপিত হয়। এবং পরবর্তীকালে সেই কীলকাকার চিহ্নগুলি অর্থহীন নকশায় পরিণত হয়।

কিউবিজ্‌ম
(Cubism)

১৯০৭-এর কাছাকাছি প্যারিসে চিত্রকলা, ভাস্কর্য এবং অংশত স্থাপত্যের এই নতুন শৈলীর সূত্রপাত ঘটে। কিউবিজ্‌ম বা ঘনকবাদ বিংশ শতাব্দীর আদি পর্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আভঁ গার্দ আন্দোলন। ১৯০৮-এ ব্যক্তি শিল্পীদের এক প্রদর্শনীর জন্য বিশিষ্ট শিল্পী ব্রাক সাতটি ছবি জমা দেন। এর মধ্যে পাঁচটি ছবিই বিচারকরা বাতিল করে দেন। এই বিচারকদের অন্যতম ছিলেন প্রখ্যাত শিল্পী মাতিস। তিনি ব্রাকের ওই ছবিগুলি নিয়ে তাচ্ছিল্যপূর্ণ মন্তব্য করে নাকি বলেছিলেন যে পুরো ছবিতে কতগুলো ছোটো ঘনক তৈরি করা হয়েছে। মাতিসের এই মন্তব্যকে ধরে শিল্প সমালোচক লুই ভোজেল এই রীতির নামকরণ করেন কিউবিজ্‌ম বা ঘনকবাদ। বস্তুত কিউবিজ্‌ম

ছবি নং ২১৯ পৃ. ৩৮৭

শব্দটা একটু বিভ্রান্তিকর, বা বলা যেতে পারে এই নামকরণ যথাযথ ছিল না। কেন-না প্রথম কয়েক বছর শব্দটির অর্থানুযায়ী ঘনক সদৃশ প্রয়োগ লক্ষ করা গেলেও পরবর্তীকালে কিউবিস্ট রীতির আন্দোলনের সাথে বহু শিল্পী যুক্ত হন এবং দ্রুত এই রীতি নানান পর্বে বিকশিত হয়। সে সব ছবিকে আর শুধু ঘনক দিয়ে ব্যাখ্যা করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। তবে কিউবিস্টরা এই নামটা গ্রহণ করে কিউবিজ্‌ম নামের অধীনেই প্রদর্শনী করেন।

কিউবিজ্‌মের সরাসরি উদ্ভাবক পিকাসো এবং ব্রাক হলেও অন্যান্য আন্দোলনের মতো এই আন্দোলনেরও কিছু পূর্বসূরী ছিলেন। তাঁরা হলেন পোস্টইম্প্রেশনিস্ট শিল্পী সেজান সেই সঙ্গে সুরা এবং খানিকটা পরোক্ষভাবে হলেও ভ্যানগঘ এবং গগাঁ। কেন-না ভ্যানগঘের উজ্জ্বল ও স্পষ্ট রং আর গগাঁর ফ্ল্যাট কালার প্যাটার্ন দেখে উদ্বুদ্ধ হয়ে একদল তরুণ চিত্রকর 'ফভস' বা 'বন্যপশু' নামে এক গোষ্ঠী গঠন করেন। ফভিজ্‌ম ছিল অ্যাকাডেমিক আর্টের অনড় বাস্তববাদের বিরুদ্ধে এক বিদ্রোহ। এই মানসিকতাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যায় কিউবিজ্‌ম। পিকাসো বলেছিলেন একটি মাথায় চোখ মুখ নাক যেখানেই সাজানো থাক না কেন মাথা মাথাই থাকে। এই ধারণাকেই পিকাসো পরবর্তীকালে কিউবিজ্‌ম-এর ক্ষেত্রে কাজে লাগান। কিউবিজ্‌মের নানা ভাগ নিয়ে অনেকগুলি পর্ব আছে। যেমন অ্যানালিটিক, হারমেটিক, সিনথেটিক ইত্যাদি। কোনো কোনো সমালোচক আবার অ্যানালিটিক পর্বের কাজকে বলেন প্রি-কিউবিস্ট বা প্রোটো-কিউবিস্ট।

কিউবিস্ট আন্দোলনের উদ্ভব সরাসরি পিকাসোর ছবি 'দেমোয়াজেল' থেকে। অ্যানালিটিক্যাল কিউবিজ্‌মের শুরু এখান থেকেই। এখানে অ্যানালিটিক্যাল কথার অর্থ হল টুকরো করা বা ভেঙে ফেলা। নতুনভাবে প্রাকৃতিক আকারগুলিকে রূপ দান করা বা ইচ্ছামতো রূপ ও রঙে ভেঙে ফেলা। এইভাবে দেখলে দেমোয়াজেল পর্যন্ত কিউবিস্ট রীতি তুলনামূলক ভাবে বাস্তবানুগ। কিন্তু ধীরে ধীরে কিউবিজ্‌মের অগ্রগতির সাথে সাথে বাস্তবানুগ উপস্থাপনা ক্রমশ অস্পষ্ট হয়ে যেতে থাকল। পিকাসো এবং ব্রাক যৌথভাবেই কিউবিজ্‌মের চর্চা শুরু করেছিলেন। বহুমুখী পরিপ্রেক্ষিত-এর সাহায্যে তাঁরা

ছবি নং ১৯৬ পৃ. ৩৭৪

কোনো বস্তুর সত্যকে খুঁজে পেতে অসীম সম্ভাবনাময় দৃষ্টির

সামনে চিত্রতলকে উন্মুক্ত করে দিলেন। একটি মাত্র দৃষ্টিকোণ থেকে বস্তুর উপস্থাপনার বদলে একটি ঘনবস্তুকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে বস্তুর প্রতিটি অংশকে ধরে ধরে উপস্থাপিত করা হল। এভাবেই গড়ে উঠল অ্যানালিটিক্যাল কিউবিজ্‌ম। বস্তুর চেহারার আরও এক ধরনের শৈলীবদ্ধ পরিবর্তন করা হয় ফ্যাসিট কিউবিজ্‌মে। আকারগুলিকে ছোটোছোটো পাতলাপাতলা টুকরো তলে ভেঙে ফেলে ফের জোড়া দেওয়া হয়। এই সময় থেকে পিকাসো আর ব্রাক পরস্পরের ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিসাবে কাজ করেছিলেন পরবর্তী পাঁচ ছয় বছর ধরে। এই সহযোগিতা কিউবিস্ট চিন্তা ও কাজের ক্ষেত্রে চরম সন্ধিক্ষণ সৃষ্টি করেছিল। পিকাসো এবং ব্রাক ১৯০৯ সালের পর বাৎসরিক সালোঁ বা গ্রুপ শোতে আর অংশ নেননি কিন্তু সেই সব প্রদর্শনীর মধ্য দিয়েই কিউবিজ্‌ম গণপরিচিতি লাভ করেছিল। অ্যানালিটিক্যাল কিউবিজ্‌মের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কাজ হল পিকাসোর 'সিটেড উম্যান', ব্রাকের 'স্টিল লাইফ (ভলস্)' জুয়াঁ গ্রি-র 'স্টিললাইফ' ইত্যাদি। অ্যানালিটিক্যাল কিউবিজ্‌ম কিন্তু বস্তুকে ভেঙে ফেলার মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছিল সেখানে সিনথেটিক কিউবিজ্‌মের বিষয় ও ভাবনা হিসাবে ছিল কিছু সত্যিকারের বস্তুকে নিয়ে এবং তাদের সাহায্যে ও ভিত্তিতে কোনো ছবিকে গড়ে তোলা। অর্থাৎ সিনথেটিক কিউবিজ্‌ম কোনো ছবির শুরুর বৈশিষ্ট্য ধরার বদলে বরং স্বাধীন আকৃতি ও তলকে সংগঠিত করেছিল। পিকাসোর 'দি ভায়োলিন' এই পর্বের ছবি। চিত্র ছাড়াও ভাস্কর্য-স্থাপত্যেও কিউবিজ্‌মের প্রভাব লক্ষ্য করা গেছে। পিকাসো এবং ব্রাক ছাড়াও লিপচিতস্ প্রমুখের কনস্ট্রাকশন, কোলাজ এই পর্বের উল্লেখযোগ্য উদাহরণ।

ছবি নং ২২০ পৃ. ৩৮৭

কিচেন সিঙ্ক স্কুল (Kitchen Sink School)

ব্রিটিশ শিল্পকলায় সমাজ বাস্তবতার ঝোঁক বর্ণনার জন্য ব্রিটিশ শিল্প সমালোচক ডেভিড সিলভেস্টার এই শব্দটি উদ্ভাবন করেন। নাট্যকার অসবোর্ণের 'লুক ব্যাক ইন অ্যাঙ্গার'(১৯৫৬) -এর সাফল্যের পর ব্রিটিশ নাট্যকার, যাঁরা রাগী যুবক বলে পরিচিত তাঁদের কাজের ধারা বোঝাতেও এই শব্দটি ব্যবহার করা হয়। এই কাজের মধ্যে সেই সময়ে বিদ্যমান মধ্যবিত্ত শ্রেণির রীতিনীতির ও শ্রমজীবী শ্রেণির রীতিনীতি ও মূল্যবোধের

নং ৭২. কিচেন সিঙ্ক স্কুল। জন ব্র্যাটবি : দ্য ক্যাব ইউজ ডোর। ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দ।



বৈপরীত্যকে দেখানো হয়েছিল। এর বিষয়বস্তু যে পপ আর্টের মতো তা বারবার বোঝা গিয়েছিল। এই পন্থার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন জন ব্র্যাটবি, ডেরিক গ্রিভস্, জ্যাক স্মিথ প্রমুখ শিল্পী।

কিট-ক্যাট (Kit-cat)

প্রমাণ সাইজের ক্যানভাসের একটি মাপ। যার আকার ৩৬ × ২৮ ইঞ্চি। হুইগ কিট-ক্যাট ক্লাবের সদস্যদের প্রতিকৃতি আঁকার ক্ষেত্রে স্যার গডফ্রে নেলারের পছন্দ ছিল এই মাপের ক্যানভাস। কিট-ক্যাট ক্লাবের সদস্যরা সমবেত হতেন পাই-হাউসে। এই পাই হাউসের রক্ষী ক্রিস্টোফারের থেকে কিট-ক্যাট নামটি গ্রহণ করা হয়। যথাযথভাবে বলতে গেলে কিট-ক্যাট পোর্ট্রেটে থাকত মাথা, কাঁধ এবং একটি হাত।

কিয়স্ক (Kiosk)

ছোটো প্যাভিলিয়ন। সাধারণভাবে চারটে খুঁটির ওপর একটি ছাদ বা শামিয়ানা।

কিয়ারসকিউরো (Chiaroscuro)

ইতালীয় শব্দ কিয়ারো অর্থ আলো আর ওসকিউরো অর্থ অন্ধকার। এই দুইয়ে মিলে পরিভাষাটির উদ্ভব। কোনো একটি বস্তু বা ফিগারের বিভিন্ন অংশে নানান মাত্রার আলো ও ছায়া প্রয়োগ করে বস্তু বা ফিগারটির আদল, রূপ, ঘনত্ব ফুটিয়ে তোলার কৌশল। এই কৌশলের সূত্রপাত ঘটে ইউরোপীয় রেনেসাঁসের সময় লিওনার্দো দা ভিঞ্চি এবং আরও কয়েকজনের

হাতে। এই পদ্ধতি টেম্পারার মতো দ্রুত শুষ্কশীল বর্ণ মাধ্যমের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা অসুবিধাজনক। তাই এই কৌশলের প্রকৃত রূপায়ণ ঘটে তেলরং মাধ্যমের প্রবর্তনের পর। আলো ও ছায়ার সঠিক ভারসাম্য সহ স্পষ্ট বৈপরীত্যমূলক অংশের সাহায্যে ছবিতে বিশ্বাসযোগ্য রিলিফ ফলাফল সৃষ্টি করা যায়। কিয়ারসকিউরো বেশির ভাগ প্রাচ্য ও ইজিপ্টীয় ফ্ল্যাট ফর্মের বিপরীত গুণ প্রকাশ করে। সপ্তদশ শতাব্দীতে ইতালিতে ক্যারাভাজ্জিও, হলান্ডে রেমব্রাঁ, লরেইনে জর্জ দ্য লা ত্যুর প্রমুখের হাতে কিয়ারসকিউরোর চরম বিকাশ ঘটে।

কিয়ারসকিউরো উডকাট (Chiaroscuro woodcut)

এই পরিভাষাটি আলোছায়া বিশিষ্ট বহু টোনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হত। এই কৌশলের উদ্ভব হয়েছিল ষোড়শ শতাব্দীতে। উডকাটের এই পদ্ধতিতে একটির বেশি কাঠের ব্লক ব্যবহার করা হত। ধারাবাহিক ভাবে প্রতিটি টোনের জন্য আলাদা আলাদা কাঠের ব্লক কেটে নেওয়া হত। যেমন সবচেয়ে ডার্ক রঙের জন্য একটি ব্লক। তারপরের টোনের জন্য আরেকটি ব্লক। এরপর পর্যায়ক্রমে সর্বনিম্ন ডার্ক থেকে সর্বোচ্চ ডার্ক টোনের কালি লাগিয়ে পরপর প্রিন্ট নেওয়া হত। এক্ষেত্রে রেজিস্ট্রেশনের দিকে লক্ষ রাখতে হয় যাতে কাগজটি তার নির্দিষ্ট অবস্থান সরে না যায়। উগো ডা কার্পি আদিপর্বের কিয়ারসকিউরো উডকাটের একজন সার্থক রূপকার।

কীর্তিমুখ

ভারতীয় স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের একটি বিষয়। খ্রিস্টাব্দের সূচনা থেকে ভারতশিল্পে বহুলভাবে প্রযুক্ত এই রূপকল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল নিষ্প্রাণ মুখোশ সদৃশ, তিনটে শৃঙ্গযুক্ত সিংহের মুখ, জ্বলন্ত দৃষ্টি, কম্পিত নাক, দৃশ্যত ভয়ঙ্কর এই রূপকল্পটি পশ্চিমভারতে ও পূর্বভারতে যথাক্রমে গ্রাসমুখ এবং রাহুর মুখের মালা নামে পরিচিত। আঞ্চলিক এই নাম দুটি থেকে অনুমিত হয় সে কীর্তিমুখ হল বস্তুত রাহুর মুখের আলংকারিক রূপায়ণ।

কীর্তিমুখের পেছনে কিছু পৌরাণিক উপখ্যান রয়েছে। যেমন মৎস্যপুরাণ মতে রাহুর বাহন হল সিংহ। আবার বৃহৎসংহিতা অনুসারে রাহু সিংহিকার পুত্র যিনি কশ্যপ মুনির অভিশাপে যমের মতো নির্দয়। সম্ভবত এই অনুষঙ্গে রাহু সিংহ মুখ। অন্যদিকে সিংহ সৌরমণ্ডলের প্রাণী, প্রাণশক্তির প্রতীক। ঋগ্‌বেদে অগ্নিকে ত্রিধাতু-শৃঙ্গ বর্ণনায় তিনশৃঙ্গের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। ত্রিকালের প্রতীক হল এই তিনটে শৃঙ্গ। ঋগ্‌বেদের

অহি-বৃত্তের ভাবনা অনুযায়ী সম্ভবত কীর্তিমুখের ভগ্ন-হনু গড়া হয়েছে। অহি-বৃত্ত স্বরাজ্য, সম্পদ এবং বৈভব দাতা। আর একটি পৌরাণিক উপখ্যান হল, সমুদ্র মন্থনে উত্থিত অমৃত বিতরণের সময় রাহু দেবতার ছদ্মবেশ ধারণ করে অমৃত পান করেন কিন্তু চন্দ্র ও সূর্য ছদ্মবেশের আড়ালেই রাহুকে অসুর বলে সনাক্ত করেন এবং বিষ্ণুর চক্রে তাঁর শিরোচ্ছেদ হয়। অথচ অমৃত পানের ফলে রাহুর দেহহীন মাথাই অমরত্ব লাভ করে এবং চন্দ্র-সূর্যকে গ্রাস করে এবং উগরে দেয়। কিন্তু অসুর শব্দের অর্থ হল প্রাণদাতা বায়ু। এই পরিপ্রেক্ষিতে রাহু সর্বোচ্চ চেতনা। এই কারণে হিন্দু মন্দিরে সর্বোচ্চ স্তরে কীর্তিমুখের অবস্থান। এর ওপরে আর কোনো ভাস্কর্য বসে না। কিন্তু এর মুখ থেকে প্রসারিত হয় লতাপাতার জটিল বিন্যাস যার নীচে থাকে প্রাণীজগতের বিপুল শৈল্পিক রূপ। কীর্তিমুখের একটি প্রাচীন নিদর্শন দেখা যায় তক্ষশীলার একটি নিদর্শনে। এছাড়াও অমরাবতীতে খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীর একটি ফলকের নাগ উষ্ণীষে, মথুরার একটি শিবমূর্তির মুকুটে, বুদ্ধগয়ার রেলিং-এ এবং আরও বহু স্থানের প্রাচীন স্থাপত্যে ও ভাস্কর্যে কীর্তিমুখের নিদর্শন পাওয়া গেছে।

কুটুম কাটাম

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর কৃত অণুভাস্কর্য। কুটুম কাটামের এই ভাস্কর্যপ্রতিম শিল্পরীতি একান্তই অবনীন্দ্রনাথের উদ্ভাবন। কুটুম কাটাম অনুভাস্কর্য সৃষ্টির পূর্বশর্ত সম্ভবত নিহিত ছিল তাঁর 'আরব্যরজনী'র সৃজনের সময়কালে। তখন থেকেই তাঁর ছবি ক্রমশ হয়ে উঠছিল নির্মাণধর্মী এবং দর্শনেন্দ্রিয়গ্রাহ্য। কুটুম কাটামে এসে তা যেন পূর্ণতা পেল। ফরাসি ভাষায় একটা শব্দ আছে 'ওবজে ক্রভে'। কোনো খুঁজে পাওয়া বস্তুকে সামান্য পালটে বা একটুও না পালটে, তাকে শিল্পকর্ম হিসাবে হাজির করা, কখনো-কখনো অন্য শিল্পকর্মের সঙ্গে জুড়েও তা করা হয়। এও যেন অনেকটা সেই রকম। অবনীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন—'এ চোখ সব সময় থাকে না। রোজ তো বাগানের রাস্তায় চলি, চোখে কিছু পড়ে না। কিন্তু যেদিন খেলনা গড়বার জন্য কাঠ খুঁজতে বের হই—টুপ টাপ চোখে পড়ে যায় সব কিছু; —তুলে আনি।' কুটুম কাটাম-এ কাটামের উৎস কাঠাম বা কাঠামো। এরকম কাঠাম বনে বাগানে নিজে নিজেই তৈরি হয়। শুধু তাকে চয়ন করে আনা। এসবের মধ্যে গাছের পচা ভাঙা ডাল, শিকড়, ছাল, বাঁশ, কাঠ ইত্যাদির টুকরো তালের আঁটি। এসবকে সামান্য এদিক-ওদিক করেই তৈরি হয়েছিল



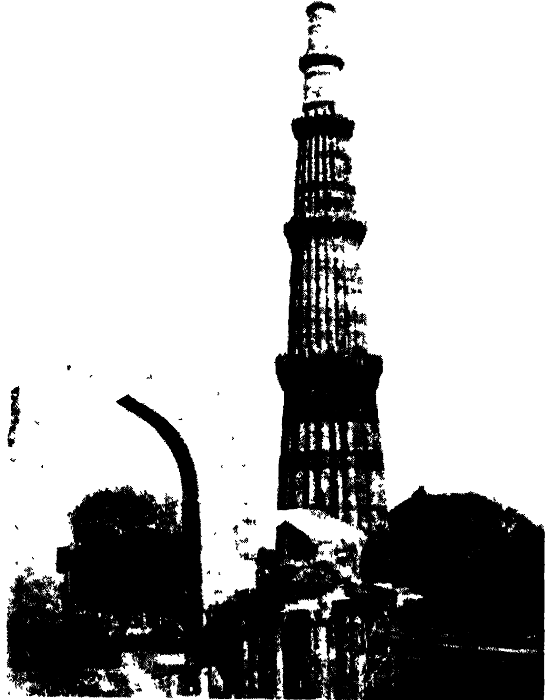
নং ৭৩. অবনীন্দ্রনাথের কুটুম কাটাম।

কুটুম কাটাম। পুতুলের সঙ্গে মিল থাকলেও ঠিক পুতুল নয়। 'পুতুলের সঙ্গে এর ঢের তফাৎ।' কেন-না এরা খেলার জিনিস নয়। 'এরা কুটুম কাটাম'। শিল্পের দিক থেকে অবনীন্দ্রনাথ এদের বলেছেন 'বন্ধু শিল্প'।

এই কুটুম কাটাম তৈরির পেছনে মূল বিষয়টি হল একটি কোনো আকারের মধ্যে কল্পনার রূপটিকে খুঁজে নেওয়া অথবা কতগুলি আকৃতিকে জুড়ে কল্পনার আদলকে ধরতে চাওয়া। প্রথম ক্ষেত্রে পেয়ে যাওয়া আকৃতিকে চেনা অবয়বের মতন করে সাজিয়ে রাখলেই হল। ইউরোপের কনস্ট্রাক্টিভিস্টদের করা ভাস্কর্যের সঙ্গে এর যেন কোথায় একটা মিল আছে। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথের কুটুম কাটামের রূপকের গভীরতা অনেক বেশি। এই ভাবে খুঁজে এনে অবনীন্দ্রনাথ একটি মরা গাছের ডালকে এমন ভাবে সাজিয়ে রাখলেন যে দেখলে মনে হবে কুমির রোদ পোহাচ্ছে, বা ঘোড়া ছুটছে কিংবা বামন বুড়ো ছুটে চলেছে। রানি চন্দের সংকলিত কুটুম কাটাম বইয়ে এরকম অনেক 'কুটুম কাটাম' অণুভাস্কর্যের ছবি ও বিবরণ আছে।

কুত্‌বমিনার

দিল্লিতে অবস্থিত পাথরের তৈরি অনন্য সাধারণ মিনার। ১৯১২ সালে কুত্‌বউদ্দিন দিল্লির 'রায় পিথোরা' দুর্গ জয়



নং ৭৪. কুতবমিনার।

করে যেখানে নিজের রাজধানী স্থাপন করেন। এই দুর্গচত্বরে কুত্বউদ্দিন প্রথমে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। একে বলা হয় 'কুওওতুল ইসলাম' অর্থাৎ ইসলামের ক্ষমতা। এটাই মুসলমান অধিকারের পর হিন্দু ভাতের প্রথম স্যারাসেনিক স্থাপত্য কীর্তি। মসজিদে প্রথিত একটি ফলক থেকে জানা যায় এই মন্দির নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় পাথর সংগৃহীত হয়েছিল ওই অঞ্চলের সাতাশটি হিন্দু ও জৈন মন্দির ধ্বংস করে। এই কুওওতুল ইসলাম মসজিদ সংলগ্ন মুয়াজ্জিন মিনারটির নাম কুত্বমিনার।

কুতব্মিনারের প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং গুরুত্ব কিন্তু এর উচ্চতা বা বিশালতা নয়। এটি হল ইন্দো-ইসলামি স্থাপত্যের প্রথম নিদর্শন। প্রাক ব্রিটিশ যুগের ভারতীয় স্থাপত্যরীতিকে দুটি মূল ভাগে ভাগ করা যায়। প্রাচীন হিন্দু যুগ এবং ইন্দো ইসলামি যুগ। এই দুই যগের সন্ধিক্ষণের ভারতীয় সংস্কৃতির এক ঐতিহাসিক দিকচিহ্ন হল কুত্বমিনার। সমগ্র কুত্বমিনার প্রকল্পের স্থানে স্থানে হিন্দু-ইসলামি স্থাপত্য রীতির মিশ্ররূপ লক্ষ করা যায়। তার কারণ এতে ব্যবহৃত বহু অংশই হিন্দু মন্দির বা স্থাপত্য থেকে সংগৃহীত।

কুত্ব চত্বরের বিভিন্ন অংশের অগ্রগতি ঘটেছে পর্যায়ক্রমে। এর পেছনে আছে চারজন সুলতানের অবদান। কুত্বউদ্দিন আইবক, তাঁর উত্তরাধিকারী সামসুদ্দিন ইলতুতমিস, আলাউদ্দিন খিলজি, এবং ফিরোজশাহ তুঘলক। কুত্বমিনারে ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছিলেন কুত্বউদ্দিন আইবক। কিন্তু প্রথম তলার গাঁথনি শেষ হতেই তিনি মারা যান। মিনারটি সমাপ্ত করেন তাঁর জামাতা তথা উত্তরাধিকারী ইলতুতমিস। কুত্বের উচ্চতা হল ৭২.৬ মিটার। ভূতলে এর ব্যাস ১৪.৩২ মিটার এবং শীর্ষদেশে ২.৭৫ মিটার। এতে সিঁড়ি আছে ৩৭৯টি। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় তলের প্রতিটি ভূমি নকশায় চব্বিশটি করে পলকাটা। একতলার পলগুলি পর্যায়ক্রমে একটি গোল এবং একটি কোণবিশিষ্ট। দ্বিতলে প্রত্যেকটি পল গোলাকার ত্রিতলের পলগুলি কোণবিশিষ্ট। চতুর্থ পঞ্চম তলে কী ছিল তা জানার উপায় নেই। কারণ বজ্রাঘাতে ভেঙে যাওয়ার পরে ফিরোজশাহ তুঘলক তা মার্বেল পাথরে বাঁধিয়ে দেন। মিনারের মুকুটের সর্বোচ্চ অংশের রূপও অজ্ঞাত কেন-না বজ্রপাতে সেটি ভেঙে গেছে।

ইসলাম রীতি অনুসারে মুয়াজ্জিন মিনার মসজিদ একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ যা আজানের ধ্বনি দিতে লাগে। কিন্তু কুত্‌বের আকার আয়তন এই রীতির সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য নয়।

১২৯৬ খ্রিস্টাব্দে ক্ষমতায় বসে আলাউদ্দিন খিলজি কুত্‌ব চত্বরে আরও বড়ো একটি মিনার নির্মাণে প্রয়াসী হয়েছিলেন। যার উচ্চতা কুত্‌বের দ্বিগুণ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ২৪.৫ মিটার গাঁথুনি হবার পরই আলাউদ্দিন প্রয়াত হন। কিন্তু পরবর্তী আর কোনো সুলতান অসমাপ্ত এই 'আলাই' মিনারে একটি ইটও গাঁথেননি। এটা একটা বিস্ময়কর ঘটনা। পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ মিনার হল কুত্‌বমিনার। মুজতবা আলীর ভাষায় 'কুত্‌বের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আর কোনো মিনার কখনও মাথা খাড়া করেনি।'

কুল কালার (Cool Colour)
বর্ণালির শেষ দিকে অবস্থান করা ছোটো তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলো যথা নীল, সবুজ বা এদের সঙ্গে সাজুয্যপূর্ণ রং যেমন নীলচে সবুজ, নীলচে বেগুনি ইত্যাদি। এই রংগুলি শীতলতার অনুভূতি দেয়। আরও একটা কারণ হল এই সব রং ঠান্ডা বস্তু যেমন জল বরফের রঙের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ।

কুলিস (Coulisses)
কোনো ছবির বিশেষ করে ল্যান্ডস্কেপ পেন্টিং-এর দু-পাশে হাজির করা কিছু উপাদান, যাতে দর্শকের দৃষ্টিকে ছবির কেন্দ্রীয় বিষয়ের দিকে ঠেলে দেওয়া যায়।

কেনোটাফ (Cenotaph)
এর উৎপত্তি গ্রিক থেকে। গ্রিক ভাষাতে 'কেনোস' শব্দের অর্থ হল খালি এবং 'টাফোস' শব্দ হল সমাধি। একইভাবে কেনোটাফ হল এক বা একদল মানুষের নিখোঁজ হয়ে যাওয়া বা মৃত্যুকে মনে রেখে স্থাপিত স্মারক স্তম্ভ। গোড়ার দিকে এটা সামরিক বাহিনীর মানুষজনদের জন্য তৈরি হলেও এখন অসামরিক ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেও কেনোটাফ নির্মাণ করা হয়।

কেভ আর্ট (Cave Art)
পুরোনো পাথরের যুগ বা প্যালিয়োলিথিক যুগে পাহাড়ের গুহায় পাথরের গায়ে আঁকা ছবি, ড্রয়িং বা মূর্তি। ১৮৭৯ সালে স্পেনের আলতামিরায় এ ধরনের গুহাচিত্র প্রথম চিহ্নিত করা হয়।

ছবি নং ১৬৩ পৃ. ৩৫৫

কেলটিক আর্ট (Celtic Art)
মধ্য ও উত্তর ইউরোপের অধিবাসীদের শিল্পকলা। খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দী থেকে মধ্যযুগের আদি পর্ব পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এই শিল্পকলা। এই পেগান-কেল্টরা খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে ইউরোপে ছড়িয়ে পড়েছিল। তাঁরা অভিনব সব



নং ৭৫. কেল্টিক আর্ট : পাথর খোদাই। খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দী

ধাতুর জিনিসপত্র তৈরি করেছিলেন। হরেকরকম পাত্র, গহনা ইত্যাদিকে তাঁরা নানা রকম জ্যামিতিক, প্যাঁচলো নকশা, শৈলীবদ্ধ পশুর অবয়ব, অলঙ্কৃত মনুষ্য মূর্তি দিয়েও অলংকৃত করতেন। গ্রিস, ইতালি এবং প্রাচ্যের নানা উৎস থেকে তাঁরা এই সব মোটিফ গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা মুখ্যত সোনা এবং ব্রোঞ্জ-এর ওপর 'ইনলে' এবং 'রিপোজি' কৌশলে অলংকরণ করতেন। ফ্রান্স থেকে নেওয়া ব্রোঞ্জের সুরার বোতল পশুমূর্তি আর প্রবাল দিয়ে উৎকীর্ণ করতেন। সম্ভবত খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে তৈরি রুপোর তৈরি বিরাট কড়াইয়ের মতো পাত্রের গায়ে দৃশ্যবর্ণনা, শ্মশ্রুমণ্ডিত শিরস্ত্রাণ ও অন্যান্য অলংকার পরিহিত বড়ো মাথা ইত্যাদির অসামান্য সব নমুনা পাওয়া গেছে। কেল্টিকরা যখন উত্তর ইউরোপে ছড়িয়ে পড়তে পড়তে ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের কাছে এসে পড়ে তখন শিল্পকলার সামান্য অবনতি হয়। তাঁদের ফিগারেটিভ কাজের মধ্যেও আলংকারিক প্রবণতার প্রাধান্য বজায় ছিল। উদাহরণ হিসাবে সপ্তম শতাব্দীর মধ্যপর্বের 'দি অ্যাথলন ক্রুসিফিক্শন' উল্লেখ্য। আয়ারল্যান্ড-এর উত্তরে ব্রিটেনে স্থাপিত মঠগুলিতে পাণ্ডুলিপি অলংকরণের অসামান্য আঙ্গিকের উদ্ভাবন খ্রিস্টান যুগের শ্রেষ্ঠ সাফল্য। এই সময়ের 'বুক অব ডুরো'র রঙিন সর্পিল জ্যামিতিক প্যাটার্ন, বাঁধাই, মনুষ্য অবয়বের পরিকল্পনা সব মিলিয়ে এটা ছিল অলংকরণের শিল্প। সর্বোপরি মিশনারিদের কাজকর্মের মধ্য দিয়ে এই শিল্প উত্তর ইংল্যান্ড সহ গোটা মহাদেশে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে কেল্টিক শিল্পের উদ্ভাবন হল পেগান অলংকৃতি সহ অবলম্বনহীন পাথরের তৈরি 'ক্রশ'।

কেসমেট (Casemate) দুর্গের মোটা দেয়ালের মধ্যে তৈরি খিলানাকৃতি কুঠুরি। যার বাইরের দিকে দেয়ালে পাল্লা আটকানোর জন্য খাঁজ কাটা থাকে।

কেসমেন্ট (Casement) ১. উল্লম্বভাবে কবজা দিয়ে আটকানো জানলার ফ্রেম যাতে পুরো উচ্চতা পর্যন্ত খোলা যায়। ২. অন্তিমগথিক স্থাপত্যে ব্যবহৃত জানলা বা দরজার ফ্রেমের পাশের কাঠের অংশ হিসাবে গঠিত ফাঁকা চওড়া ছাঁচ।

কেসিন পেন্ট (Casein paint) এটি একটি অস্বচ্ছ, জলে গোলা যায় এমন রং, অনেকটা গুয়াসের মতো কিন্তু বাইন্ডার হিসাবে এই রঙে গাঁদের আঠার বদলে দই থেকে তৈরি কেসিন বা ননি ব্যবহার করা হয়। শত শত বছর ধরে শক্তিশালী বাইন্ডার হিসাবে কেসিন ব্যবহৃত

হলেও টিউব রঙে কেসিনকে গ্রহণ করা হয় ১৯৩০-এ। জলে গোলা রং হিসাবে অ্যাক্রিলিক বা গুয়াশ বেশি জনপ্রিয় হলেও বহু আলংকারিক এবং শিল্পী এখনও কেসিন পেন্ট ব্যবহার করেন। কেসিন জল দিয়ে পাতলা করা যায় এবং পরিষ্কার করা যায়। কেসিন পেন্ট ওয়াশের মতো বা ভারী অথবা ইম্প্যাস্টোর মতো চাপানো যায় তবে খুব বেশি মোটা নয়। কারণ বেশি মোটা হলে চিড় ধরতে পারে। শুকাবার পর নরম কাপড় দিয়ে ঘষে চকচকে করা যায়। ওয়াটার কালার পেপার, ইলাস্ট্রেশন বোর্ড বা তৈলাক্ত নয় এমন যে কোনো তলেই কেসিন রং ব্যবহার করা যায়। অনমনীয় ধারক বা support ই কেসিন এর জন্য উপযুক্ত। কেউ কেউ ক্যানভাসের ওপর অ্যাক্রিলিক জেসো মাখিয়েও কাজ করেন তবে ক্যানভাস খুব ভালোভাবে এঁটে নিতে হবে। এর জন্য প্রয়োজনীয় তুলি প্যালেট ইত্যাদি গুয়াশেরই মতো। কেসিন পেন্টের ওপর বার্নিশও লাগানো চলে।

কোণারক

উড়িষ্যার সমুদ্রোপকুলবর্তী একটি স্থান। এখানে সূর্যমন্দির নামে ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন রয়েছে। আইন-ই-আকবরিতে দেওয়া আবুল ফজলের তথ্য অনুযায়ী অনন্তবর্মা চোড়গঙ্গের পুত্র প্রথম নরসিংহদেব ৮৬০ খ্রিস্টাব্দে এই মন্দিরের নির্মাণ শেষ করেন। আবার একটি তাম্রশাসন থেকে জানা যায় নরসিহ দেব রাজত্ব করেছিলেন ১২৩৮ থেকে ১২৬৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। সুতরাং ঐতিহাসিক তথ্য বেশ অস্পষ্ট।

কোণারকের সূর্য মন্দিরের প্রাঙ্গণের বিস্তৃতি ৮৭৫ × ৫৪০ ফুট। মন্দির নির্মিত হয়ে সাদা বেলে পাথরে আর মূর্তি ও অলংঙ্করণের বেশিরভাগই নির্মিত হয়েছে ক্লোরাইট পাথরে। আবুল ফজলের বর্ণনা থেকে জানা যায় মন্দির প্রাঙ্গণকে বেষ্টন করে যে-প্রাকার আছে তার তিন দিকে তিনটি প্রবেশ দ্বার ছিল। পূর্ব দক্ষিণ ও উত্তর দিকের প্রবেশ দ্বারে যথাক্রমে পাথরের হাতি, অশ্বারোহী এবং গজসিংহ মূর্তি স্থাপিত ছিল। প্রাকারের প্রধান মন্দিরকে ধরে ২৯টি দেবালয় ছিল। তা আজ আর নেই। মূল মন্দিরটি সূর্যের দিকে মুখ করা। মন্দিরের প্রশস্ত প্রাচীরের দুই প্রান্ত খন্ডলাইট পাথর দিয়ে তৈরি। মাঝখানের অংশ মাকরা পাথর দিয়ে ভরাট করা। আর দেবালয়ে প্রবেশ পথের কাঠামো বিগ্রহের বেদী ও পার্শ্বদেবতার মূর্তি ইত্যাদি তৈরি মুগনি পাথর দিয়ে।

নং ৭৬. কোণারকের সূর্য মন্দির।
১২৪০ খ্রিস্টাব্দ।



সূর্য মন্দিরের প্রধান অংশ তিনটি। বড়ো দেউল, জগমোহন ও নাটমন্দির। অক্ষ একটি হলেও দুটি বেদীর একটিতে যথাক্রমে বড়ো দেউল এবং জগমোহন এবং অন্য বেদীতে নাটমন্দির স্থাপিত ফলে মন্দিরটি দুটি অঙ্গে বিভক্ত। দুটি অঙ্গের মাঝখানের খোলা চাতালে একটি অরুণ স্তম্ভ ছিল। এই স্তম্ভটিকে মারাঠা অভিযাত্রীরা পুরীর জগন্নাথের মন্দিরের প্রধান প্রবেশ দ্বারের সামনে স্থাপন করেন। জগমোহনটিই বর্তমানে সূর্য মন্দিরের প্রধান দ্রষ্টব্য প্রত্নবস্তু। সামগ্রিকভাবে মন্দিরটি একটি রথাকৃতি। রথের চাকারও কয়েকটি মাত্র অক্ষত আছে। চাকাগুলির ব্যাস নয় ফুট এবং সাড়ে নয় ফুট। উড়িষ্যার অন্যান্য জগমোহনগুলির মতো এর ভিত্তি নকশা ও ছাদ একই পরিকল্পনাজাত হলেও কোণারকের জগমোহনে একটু আলাদা বৈশিষ্ট্য যুক্ত হয়েছে এর ঊর্ধ্বভাগে ভ্রমণের উদ্দেশ্যে যে সংকীর্ণ পথ রাখা হয়েছে তার জন্য। দু-পাশের প্রাচীরগুলিতে অলংকৃত মূর্তিগুলির বেশিরভাগই দেবদাসী ও মিথুনমূর্তি। কুমারস্বামীর অভিমত হল কোণারকের ক্ষেত্রে ভাস্কর ও স্থপতি যৌথভাবে দেবালয়ের যে পরিকল্পনা করেছেন তা ভারতের অন্য কোথাও দেখা যায়নি। আবার ভিনসেন্ট স্মিথের বক্তব্য অনুযায়ী সূর্য মন্দির নির্মাণের পর উড়িষ্যায় উড্র স্থাপত্যের আর কোনো উল্লেখযোগ্য মন্দির স্থাপিত হয়নি। সম্ভবত এই ভাস্কর ও স্থাপতিদের অবসর দিয়ে দেওয়া হয়েছিল। 'দি হিস্ট্রি অব পুরী' গ্রন্থে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী সূর্য মন্দিরের প্রধান স্থপতির নাম ছিল 'শিবাই সাঁতরা'। ভারতের অন্যান্য পাথরে তৈরি মন্দিরের মতো কোণারকের মন্দিরেও নির্মাণ কাজে কোনো মশলা ব্যবহার করা হয়নি।

এক্ষেত্রে গতানুগতিক পদ্ধতির সাথে কারিগরি বুদ্ধি কাজে লাগানো হয়েছিল আর এই প্রায়োগিক কারণেই সূর্য মন্দির দ্রুত বিনষ্ট হয়েছিল বলে পণ্ডিতগণ মনে করেন। সূর্য মন্দিরের বিন্যস্ত পাথরকে সুদৃঢ় রাখতে তৃতীয় বন্ধনীর মতো লোহার গোজ ব্যবহার করা হয়েছিল। যা সমুদ্রের লোনা বাতাস লেগে মরচে ধরে নষ্ট হয়ে যাবার ফলে পাথর আলগা হয়ে ধ্বংস ত্বরান্বিত হয়েছিল। কিছু তামার গোজও ব্যবহার করা হয়েছিল। তবে সর্বত্র তা সম্ভব হয় নি। আশেপাশে ছিদ্রযুক্ত স্থানচ্যুত পাথর এখনও দেখা যায়। অবশ্য লোহার গোজ ব্যবহারের একটি কারণ নির্দেশ করে বিষাণস্বরূপ বলেছেন যে মন্দিরের ওপর একুশ ফুট সাড়ে দশ ইঞ্চি লম্বা চুম্বক পাথরের একটি কলসি ছিল। যাকে বলা হত 'কুম্ভ পাথর'। পাথরের মধ্যেকার লোহার গোজগুলিকে কুম্ভ পাথরের কেন্দ্রাভিমুখী আকর্ষণের ফলে মন্দিরের ভারসাম্য বজায় থাকত। তবে কুম্ভ পাথরের প্রসঙ্গটি স্থাপত্য কৌশলের ক্ষেত্রে কতখানি বাস্তবসম্মত তা বলা সম্ভব না হলেও এটির অস্তিত্ব অন্য একটি কারণে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তা হল এর প্রবল আকর্ষণী শক্তির জন্য বহিঃশত্রুরা জলযান নিয়ে মন্দিরের কাছে আসতে সাহস করত না। কামশাস্ত্রভিত্তিক অসংখ্য মিথুন ভাস্কর্য কোণারকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তবে এসব মূর্তির বহু সংখ্যক উন্নত মানের নয়।

কোবরা (Cobra)

১৯৪৮ সালে প্যারিসে প্রতিষ্ঠিত স্ক্যান্ডিনেভিয়া এবং নেদারল্যান্ডের একদল শিল্পীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি গোষ্ঠী। COBRA নামটি এসেছিল সদস্য শিল্পীদের নিজ নিজ দেশের রাজধানীর নামের গোড়ার অক্ষরগুলি সাজিয়ে। যেমন কোপেনহেগেনের Co, ব্রাসেলসের Br, এবং আমস্টারডামের A। এই গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত শিল্পীরা ছিলেন ডাচম্যান অ্যাপেল, বেলজিয়ান করনেইল, ডেন জর্ন, অ্যালিচিন্‌স্কি, অ্যাটলন, কনস্ট্যান্ট প্রমুখ। এঁদের প্রধান লক্ষ্য ছিল বৌদ্ধিক এবং আঙ্গিকের কবল মুক্ত স্পষ্টবোধক শিল্প সৃষ্টি করা। কোবরা যেন অনেকাংশেই আমেরিকান অ্যাকশন পেন্টিং-এর ইউরোপীয় প্রত্যুত্তর। এঁদের সঙ্গে ফ্রান্সের ইনফর্মাল আর্টের কিংবা জার্মানির নিও এক্সপ্রেশনিজ্‌মের মিল ছিল। কোবরা শিল্পীরা তাঁদের ছবিতে ব্যবহৃত নানা উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন লোকশিল্প, শিশুচিত্র, আদিম কালের জাদু, জাপানি ল্যান্ডস্কেপ, রোমান্টিক রূপক থেকে। অনিয়ন্ত্রিত তুলি চালনা, সাংকেতিক

ছবি নং ১৬৪ পৃ. ৩৫৫

রূপের ব্যবহার তাঁদের ছবিকে নির্দিষ্ট চরিত্র দান করেছিল। কোবরার শিল্পে যুদ্ধোত্তর ইউরোপের মেজাজের প্রতিফলন ঘটেছিল। সেইসঙ্গে কোবরার শিল্পীদের আত্মপ্রকাশ ছিল স্বতঃস্ফূর্ত এবং এর রং শু আঙ্গিকও ছিল সাহসী।

কোম্পানি স্কুল (Company school)

১৭৫৭ সালে বাংলার নবাব সিরাজদ্দৌলাকে সশস্ত্র জালিয়াতি করে হারিয়ে পলাশি দখল করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। ১৭৬৫ সালে দিল্লির কাছ থেকে বাংলা বিহারের দেওয়ানি আদায় করে এ অঞ্চলে রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। ফলে নতুন এক যুগ সন্ধিক্ষণ তৈরি হয়ে যায়। সে সময় ভারতে আঞ্চলিক শিল্প বৈশিষ্ট্যগুলির পাশাপাশি মুঘল যুগে বিকশিত স্কুলগুলি বিদ্যমান ছিল। এরকম একটা সময়ে যখন ব্রিটিশরা রাজনৈতিক ক্ষমতা কায়েম করছে তখন স্বভাবতই মুর্শিদাবাদের শিল্পীরা ব্রিটিশদের পৃষ্ঠপোষকতার মুখাপেক্ষী হলেন। অন্যদিকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তথা ব্রিটিশদের সাথে ইউরোপীয় চিত্রকলাও এদেশে আসে। প্রথম দিকে ব্রিটিশরা এদেশীয় শিল্পীদের তাঁদের ইচ্ছে মতো ছবি আঁকিয়ে নেবার চেষ্টা চালায়। কিন্তু ব্রিটিশ শিল্পীরা এদেশে এলে ইউরোপীয় রীতির প্রভাবে এবং ব্রিটিশদের পৃষ্ঠপোষকতার খাতিরে এদেশীয় শিল্পীরাও পাশ্চাত্যের মতো স্বচ্ছ জলরঙের ছবি আঁকা শিখে নিতে থাকেন। এদেশে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাজকর্ম যে কটি কেন্দ্র থেকে পরিচালিত হত তা হল মাদ্রাজ (চেন্নাই), তাঞ্জাভর, দিল্লি, লক্ষ্ণৌ, পাটনা ও কলকাতা। এই সময় ব্রিটিশ ও ভারতীয় রীতির সংমিশ্রণে গড়ে উঠল কোম্পানি চিত্রকলার এক নতুন ধারা। যার আত্মপ্রকাশ ঘটে মাদ্রাজে। এবং অল্প কিছুদিনের মধ্যে এই রীতি পূর্ব ভারতেও দেখা দেয়।

কিছুকিছু ব্যতিক্রম বাদ দিলে নতুন শৈলীর শিল্পীরা পৃষ্ঠপোষক তথা ব্রিটিশদের জন্যই ছবি আঁকতেন। গাছপালা, ফুল, পাখি, জীবজন্তু, এদেশের মানুষ, তাঁদের পোশাক, আচারানুষ্ঠান, উৎসব, সংস্কৃতি, দেবদেবী; ধর্ম, সহ হাটবাজার এমনকি প্রাকৃতিক দৃশ্য পর্যন্ত শিল্পীরা আঁকতেন। আসলে এসবই ছিল জীবন্ত দলিল। এসব ছবির বেশিরভাগেরই নান্দনিক মূল্য নিশ্চিতভাবেই কম ছিল। ১৭৬০-৯০ সালে অনেক উচ্চপদস্থ ব্রিটিশ যেমন স্যার এলাইজা ইম্পে, লেডি

ছবি নং ২২২ পৃ. ৩৮৮ ইম্পে, শ্রীমতী এডোয়ার্ড হুইলর, ন্যাথানিয়েল মিড্‌লটনরা

দেশি চিত্রকরদের নিয়োগ করে এদেশের নানান জিনিস আঁকিয়ে বিরাট বিরাট অ্যালবাম তৈরি করান। দেশি শিল্পীদের ইউরোপীয় রীতিতে জলরঙের ছবি আঁকার তত্ত্বধনা করতেন ইংরেজ শিল্পীরাই। দেশি শিল্পীদের স্বচ্ছ জলরঙের টেকনিক তাঁরাই সযত্নে শিখিয়ে নিয়েছিলেন। ১৮৩১ – ৩২ সালে টাউন হলে পরপর দুটো প্রদর্শনী হয় 'ব্রাশ ক্লাবের' ব্যবস্থাপনায়। অংশগ্রহণকারী শিল্পীদের মধ্যে এদেশে কর্মরত ইংরেজ শিল্পী যথা টিলি কেটল, জোফানি, ড্যানিয়েল, ডয়েলি, রিচি ও হেম প্রমুখরাও ছিলেন। ১৭৭৪ সালে শ্রীমতী ইম্পে তিনজন দেশি শিল্পীকে নিয়োগ করেছিলেন। তাঁরা হলেন— জৈমুদ্দিন, ভবানী দাস ও রামদাস। এঁরা আসলে পাটনা কলমের শিল্পী ছিলেন। কলকাতার দুজন শিল্পীর নাম করা যেতে পারে তাঁরা হলেন ই. সি. দাশ এবং শেখ মুহম্মদ আমির। কোম্পানি শৈলীর শিল্পীরা ক্রমশ সারা ভারতেই ছড়িয়ে পড়েছিলেন। কোম্পানি শৈলীর চিত্রকরেরা পরবর্তীকালে মুদ্রণ পদ্ধতির উন্নতির ফলে নতুন এক সংকটের সম্মুখীন হন যা তাদের চিত্র চর্চাকে অবলুপ্তির দিকে ঠেলে দেয়।

কোর শ্যাডো (Core Shadow)

গোলকাকার কোনো বস্তুর ওপর আলোছায়াকে বর্ণনা করার জন্য এই শব্দটা ব্যবহার করা হয় আরও তিনটে শব্দের সঙ্গে যেমন লাইট, হাফটোন এবং ডার্ক। লাইট অর্থাৎ আলোক উৎসের দিকে বস্তুটির যে অংশ মুখ করে থাকে। হাফটোন বস্তুর অতিআলোকিত অংশ থেকে অন্ধকারতম অংশ পর্যন্ত হালকা ছায়া যুক্ত অংশ। কোর শ্যাডো মানে হল অন্ধকারতম অংশের নিবিড় ছায়া এবং প্রতিফলিত আলো বা রিফ্লেক্টেড লাইট অর্থাৎ আলোক উৎসের বিপরীত দিকে থাকা বস্তুর গায়ের অন্ধকারতম অংশে আপতিত কোনো প্রতিফলিত আলো। যদি কখনও প্রতিফলিত আলো না থাকে তাহলে অবিচ্ছিন্ন ভাবে বস্তুটির ঘোরানো তলজুড়ে কোর শ্যাডোই অবস্থান করে। অনেক সময় এই ছায়াকে ক্রেস্ট শ্যাডোও বলা হয়।

কোরিন স্কুল (Korin School)

জাপানি আলংকারিক শিল্পকলার ঘরানা। ওগাতা কোরিনের মৃত্যুর পর এই ঘরানার নামকরণ হয় কোরিন স্কুল। বস্তুত চিনা প্রভাবমুক্ত একটি আন্দোলন হিসাবে এই ঘরানার প্রবর্তন করেন শিল্পী হোনামি কোয়েটসু এবং নোনোমুরা সোতাতসু। এই ঘরানার সৃষ্ট কাজ প্রকৃতিগতভাবে মূল্যবান রং এবং বলিষ্ঠ ও অভাবনীয় প্যাটার্নে সমৃদ্ধ।



কোরিয়ান আর্ট (Korean Art)

নং ৭৭. ওপরের ছবি : কোরিয়ান আর্ট। কিম তু-রিয়াং : অটাম ল্যান্ডস্কেপ। সপ্তদশ শতাব্দী। কাগজের ওপর কালি ও রং। ৮ X ১৮৪ সেমি।

কোরিয়ান শিল্পকলায় অনেকাংশে চিন দেশের শিল্পকলার প্রভাব সম্বলিত মিশ্ররীতি দেখা যায়। এসবের মধ্যে হাং রাজবংশীয় কালই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আদিপর্বের মুখ্য কাজ চতুর্থ থেকে সপ্তম শতব্দীর কোগুরিয়োর সমাধিক্ষেত্রের মুরাল, দক্ষিণপশ্চিম পিকচি রাজ্যের বৌদ্ধ ভাস্কর্য। এই ধারা জাপানি ভাস্কর্যকেও প্রভাবিত করেছিল। এছাড়া অষ্টম শতাব্দীর মধ্যপর্বের সংযুক্ত কোরিয়ায় টাং প্রভাব আধিপত্যের বৌদ্ধ ভাস্কর্য ও রিলিফের চমৎকার নিদর্শন পাওয়া যায়। কোরিয়ার শিল্পকলাতে চৈনিক দর্শন, শিল্পতত্ত্ব নানাভাবে প্রেরণা জুগিয়েছে। যেমন কুনফুসীয়বাদ কোরীয় শিল্পীদের ঐতিহ্য একরঙা নিসর্গ অঙ্কনশৈলীকে (ওয়েন-জেন) উজ্জীবিত করেছিল। আবার চিনা শিল্পসূত্রাবলি, পটারি আর্ট কোরীয় শিল্পকলাকে বিষয়বস্তুর জোগান দিয়েছিল। যার মধ্যে ছিল সং ফ্যান্টাসি নিসর্গ চিত্রের বিষয়। চোং সোন কোরীয় নিসর্গ দৃশ্য নির্মাণ করতে শুরু করেন। শিক্ষিত শিল্পীরা বাঁশ, অর্কিড, পামফুল ফোটা বা চন্দ্রমল্লিকার মাধুর্যময় ক্যালিগ্রাফির অনুশীলন করেছিলেন। প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিকৃতি অঙ্কন বেশ একঘেয়ে হলেও তাতে দক্ষতা ছিল।

কোলাজ (Collage)

কোলাজ কথাটার সৃষ্টি হয়েছে ফরাসি শব্দ Coller থেকে যার অর্থ আঠা দিয়ে সাঁটানো। বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় অর্থাৎ ১৯০৭-এ বোধহয় সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ শিল্পান্দোলন কিউবিজ্‌মের আবির্ভাব ঘটে পিকাসো, ব্রাক এবং জুঁয়া গ্রি-র হাতে। যা শিল্পকলার সামগ্রিক ক্ষেত্রে বিরাট আলোড়ন তুলে সমগ্র দৃশ্য জগৎকে নতুন ভাবে দেখতে শেখায়। এই সময় ১৯১২ সালে পিকাসো 'Still life with chair-caning' নামে একটি ছোটো ছবি এঁকেছিলেন। ছবিটিতে আঁকা একটি বেতের চেয়ারের সিটের জায়গায় বেতের নকশা ছাপা অয়েলক্লথের টুকরো কেটে আঠা দিয়ে সেঁটে দেন। কিউবিজ্‌মের ইতিহাসকারদের মতে এই ছবিই হল প্রথম কোলাজ। আর

ছবি নং ২২৮ পৃ. ৩৮৯

এই চিত্রতলে রং ছাড়াও অন্য কোনো উপাদানের ব্যবহার চিত্রপট ও নির্মাণ সংক্রান্ত ধারণায় বিরাট পরিবর্তন ঘটিয়ে দিল। ব্রাকও এই সময়ে Compoteir et verre নামে একটি ছবির পশ্চাৎপটে রঙের পরিবর্তে কাঠ ছাপের ওয়ালপেপার-এর টুকরো কেটে সরাসরি ক্যানভাসে সেঁটে দেন। এটাই হল প্রথম পাপিয়ে কোলি। একটি কথোপকথনের মধ্যে ব্রাক বলেছিলেন যে সংবাদপত্র পাঠরত একটি লোকের ছবি আঁকার সময় সংবাদপত্রের হুবহু নকল না করে যদি সংবাদপত্রের টুকরো কেটে বসিয়ে দেওয়া যায় তাহলে ছবি অনেক সংক্ষেপ ও সহজ হতে পারে। কোলাজের স্রষ্টাদের মনে আরও উদ্দেশ্য ছিল বুদ্ধিভিত্তিক কিউবিজ্‌মের সঙ্গে বাহ্যিক বাস্তবের সম্পর্ক ছিন্ন না করা। তাই পিকাসো একটি পোর্ট্রেটের কোটে সত্যিকারের বোতাম এঁটে দিয়েছিলেন এবং অন্য একটি ছবিতে আসল গোঁফ লাগিয়ে দিয়েছিলেন। এভাবেই রীতিগত চিত্রপটে আমূল পরিবর্তন সাধিত হল। প্রচলিত ধারণা ভেঙে গেল। বলা যেতে পারে যে তেল রঙের বিরুদ্ধে এক জেহাদ ঘোষিত হল। এর মধ্য দিয়ে আরও একটি চিত্রধারার সৃষ্টি হল তার নাম assemblage। এই সময়ের আরেক মহান শিল্পী মাতিস রঙিন কাগজ কেটে ক্যানভাসে সেঁটে বড়ো বড়ো কম্পোজিশন তৈরি করেছিলেন তবে এই ছবি পিকাসো-ব্রাক কৃত কোলাজ থেকে আলাদা। কেন-না মাতিসের লক্ষ্য ছিল চিত্রপটে রঙিন কাগজের মূর্ত বা বিমূর্ত আকৃতি সাজিয়ে তাদের মধ্যে সমন্বয়পূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলা। কোলাজ পদ্ধতি দাদাবাদী এবং সুরিয়ালিস্ট পন্থীরাও ব্যবহার করেছিলেন। কোলাজের পদ্ধতি হল কোনো চিত্রতলে প্রধানত দ্বিমাত্রিক বিভিন্ন বস্তু, মুখ্যত কাগজকে আঠা দিয়ে সেঁটে একটি নকশা তৈরি করা। কাপড়, প্লাস্টিক, ধাতুপাত— এসবও ব্যবহার করা হয়। আমাদের দেশে বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় এবং পরে পরিতোষ সেন, সতীশ গুজরাল, বিকাশ ভট্টাচার্য প্রমুখরা কোলাজ নিয়ে কাজ করেছেন।

কোলোগ্রাফ (Collograph)

এই প্রিন্টে কালি এবং টেক্সচার দুটোই থাকে। শিল্পীদের এক একজনের টেকনিক এক একরকম হলেও সাধারণভাবে নানা ধরনের পদার্থ দিয়ে একটি ত্রিমাত্রিক তল তৈরি করে নিয়ে সেই ত্রিমাত্রিক তলে কালি লাগানো হয় এবং কোনো কোনো অংশের কালি চেঁছে তুলে নেওয়া হয়। কিন্তু ঢালু অংশে কালি

থেকে যায়। নির্বাচিত কিছু অংশে রঙিন কালিও ব্যবহার করা হয়। এরপর এই প্লেটটিকে একটি এচিং প্রেসের তলায় রেখে খুব জোরে চেপে কাগজে ছাপ তোলা হয়। এতে একই সঙ্গে প্লেটের ঢালু অংশে থাকা কালির ছাপ কাগজে উঠে আসার পাশাপাশি অমসৃণও অসম তলেরও ছাপ পড়ে যাতে টেক্সচারও তৈরি হয়ে যায়।

কোলোটাইপ (Collotype) — গোড়ার দিক ব্যবহৃত ফোটোমেকানিক্যাল মুদ্রণ পদ্ধতি। এতে জিলেটিন প্লেট ব্যবহার করা হত। ১৮৬০ সালে ব্রিটেনে এই পদ্ধতি প্রবর্তিত হয়। এই পদ্ধতিতে একটি প্লেটে আলোকসংবেদী জিলেটিনের প্রলেপ লাগিয়ে তার ওপর একটি ফোটোগ্রাফিক নেগেটিভকে রাখা হয়। নেগেটিভের মধ্য থেকে আলো প্রলেপিত প্লেটে এসে পড়ে এবং আতিবাহিত আলোর পরিমাণ অনুযায়ী জিলেটিন শক্ত হয়ে যায়। সেই শক্ত হয়ে যাওয়া অংশে কিছু নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার পরে প্রতিটি অংশে যে পরিমাণ আলো অতিবাহিত হয়েছিল সেই অনুপাতে কালি ধরে। এই প্লেটটি থেকে হাজার কয়েক কপি পর্যন্ত ছবি ছাপানো যায়।

কোলোন স্কুল (Cologne School) — চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দীতে কোলোনকে ঘিরে বিভিন্ন শৈলীতে চর্চারত কিছু শিল্পীর শিল্পকর্মের সাধারণ রীতিকে কোলোন স্কুল নাম দেওয়া হয়েছিল উনবিংশ শতাব্দীতে। এই শিল্পকলা বাস্তববাদী হলেও সমকালীন নেদারল্যান্ডীয় উচ্চতায় পৌঁছাতে পারেনি। যদিও অনেক কোলোন শিল্পী এইসব দেশে প্রশিক্ষণ পেয়েছিলেন।

ক্যাটাকোম্ব (Catacomb) — মাটির নিচের সমাধিক্ষেত্র যার সঙ্গে যুক্ত থাকে গ্যালারি এবং শবাধার রাখার কুলুঙ্গি যুক্ত ঘর বা ভাণ্ডার।

ক্যাথারসিস (Catharsis) — একটি গ্রিক শব্দ। ধর্মীয় এবং চিকিৎসাশাস্ত্রগত উভয় ক্ষেত্রেই এর ব্যবহার সুপ্রাচীন। কিন্তু শব্দটি অ্যারিস্টটল তাঁর পোয়েটিক্স গ্রন্থে ব্যবহার করার পর বহুমাত্রায় বিতর্কিত হয়ে ওঠে। শব্দটির হুবহু ভাষান্তর করা কঠিন। অ্যারিস্টটল তাঁর পোয়েটিক্স গ্রন্থে ট্র্যাজেডির উদ্দেশ্য ও উপযোগিতা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শব্দটিকে ব্যবহার করেছেন। ট্র্যাজেডির উপযোগিতা কথাটি নিয়ে বিস্তর বিতণ্ডা হয়েছে। প্রচলিত অর্থে যা বলা হয় তা হল ট্র্যাজেডি ভাবাবেগ শোধন করে বা মনশুদ্ধি করে তাই ট্র্যাজেডির নৈতিক উপযোগিতা অবশ্যস্বীকৃত। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে জেকব বার্নেস নতুন একটি দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে শব্দটির ব্যাখ্যা করে

বলেন যে এটি চিকিৎসা বিজ্ঞানের একটি পরিভাষা যার অর্থ মোক্ষণ বা পার্গেশন। দেহের ওপর ওষুধের ক্রিয়ার মতো মনের ওপর ট্র্যাজেডির ক্রিয়া বোঝাতেই শব্দটি ব্যবহৃত। মিল্টনের ধারণাও অনেকটা এই রকম ছিল। আসলে অ্যারিস্টটল তাঁর পলিটিক্স গ্রন্থে সংগীতের যে প্রসঙ্গে ক্যাথারাসিসকে ব্যবহার করেছিলেন বার্নেস সেই অর্থেই বোঝাতে চেয়েছেন যে ক্যাথারসিস হল 'emotional relief'। আবার একথাও ঠিক যে ট্র্যাজেডিতে করুণা ও ভয়ের মোক্ষণ এবং দিব্যাবেগের মোক্ষণে সাদৃশ্য থাকলেও ব্যাপার একই নয়। আবেগ-শান্তি তথা মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপারই শুধু নয় ক্যাথারসিসের সঙ্গে শিল্পতত্ত্বের একটা গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। ক্যাথারসিস নিয়ে বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে কিছুটা অ্যারিস্টটলের নিজের জন্যেও। কেন-না পলিটিক্স গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়ে তিনি বলেছেন এক ধরনের সংগীত মানুষের মনের আবেগের প্রাবল্য দূর করে মনের স্বাভাবিক ভারসাম্য ফিরিয়ে আনে। এর ফলে মানুষ এক অনাবিল আনন্দ পায়। তিনি আরও বললেন পলিটিক্স গ্রন্থে ক্যাথারসিস নিয়ে সাধারণ ভাবে আলোচনা করলেও পোয়েটিক্স গ্রন্থে এ নিয়ে বিশেষভাবে আলোচনা করবেন। কিন্তু পলিটিক্স গ্রন্থে দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ক্যাথারসিসের ব্যাখ্যা পোয়েটিক্স গ্রন্থে অনুপস্থিত থাকায় সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে।

এখনও পর্যন্ত পণ্ডিতগণের নানা ব্যাখ্যা ও অ্যারিস্টটলের ইঙ্গিত থেকে ক্যাথারসিস সম্পর্কে যা ধারণা করা যায় হল ভীতি এবং সহানুভূতি থেকেই ট্র্যাজেডির আনন্দ সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে ট্র্যাজেডির নায়কের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। কারণ নায়ক চরিত্রকে আমরা সবসময়ই কাছের মানুষ ভাবি। সেই নায়কের জীবনের বিপর্যয় আমাদের মনে ভয় জাগায়। নায়কের সংগ্রামে মহিমা প্রকাশিত হয়। নায়কের প্রতি আমরা সহানুভূতিশীল হয়ে পড়ি। ঠিক এখানেই অ্যারিস্টটলের ট্র্যাজেডির সংজ্ঞা কার্যকর। কারণ অ্যারিস্টটলের মত অনুযায়ী ট্র্যাজেডির ঘটনাবলি থেকে দর্শকের মনে করুণা ও ভয় সৃষ্টি হবে এবং ক্যাথারসিস তথা ভাব মোক্ষণের মধ্য দিয়ে শেষ হবে যা দর্শকের মনে এক অনাবিল আনন্দ সৃষ্টি করবে।

ক্যান্টন এনামেল (Canton enamel) তামার ওপর চকচকে করার চিনা এনামেল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে চিন থেকে এই পদ্ধতি ইউরোপে আসে। এর আদি ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায় 'ফ্যামিলে রোজ' প্যালেটে।

ক্যান্টন স্কুল
(Canton School)

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ এবং উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় ইউরোপীয় পৃষ্ঠপোষকদের জন্য ইউরোপীয় ঢঙেই আঁকা চিনা শিল্পীদের অনুসৃত শৈলী। এর বিষয়বস্তুর সঙ্গে ভারতীয় 'কোম্পানি শৈলীর' সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। এই চিত্রকলায় নানা ধরনের ব্যবসা, পেশা যেমন চা বাগানের দৃশ্য, চিনামাটির দ্রব্য তৈরির দৃশ্য, গাছপালার ছবিও থাকত।

ক্যানন প্রোপরশন
(Canon proportion)

শিল্পকলায় বিশেষত ভাস্কর্যে মনুষ্য এবং পশু দেহের নানা অংশের অনুপাত যেমন মাথা ও ধড়ের মধ্যে সম্পর্ক স্থির করার এক গাণিতিক সূত্র। এই রকম অনুপাতের ব্যবহার শুরু হয়েছিল খুবই প্রাচীনকালে। প্রাচীন ইজিপ্টীয়রাই এর জনক। খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর গ্রিক ভাস্কররাও এই সূত্র জানতেন। দা ভিঞ্চির ড্রয়িং 'ভিট্রুভিয়ান' ম্যান এই ক্যানন প্রোপরশন সূত্রানুযায়ী অঙ্কিত।

ক্যানভাস
(Canvas)

ক্যানভাস হল কাপড় যা প্রধানত তেল এবং অ্যাক্রিলিক রঙের সাপোর্ট হিসাবে ব্যবহৃত হয়। শতশত বছর ধরে তুলো, লিনেন এবং কয়েক প্রকার শণ দিয়ে এই কাপড় বোনা হচ্ছে। যদিও তুলোর চেয়ে অনেক দামি, লিনেন অনেক শক্ত এবং এর বুনন তলও আকর্ষণীয়। বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে নানা ধরনের সিনথেটিক ফাইবার যেমন নাইলন, পলিয়েস্টার, অ্যাক্রিলিক, ফাইবার গ্লাসও ব্যবহৃত হয়েছে। এসবের স্থায়িত্বের শতাব্দী উত্তীর্ণ কোনো পরীক্ষা না হলেও এসব ফাইবারের রেকর্ড এখনও পর্যন্ত ভালো। সিনথেটিক ফাইবার প্রাকৃতিক ফাইবারের মতো শিথিল হয়ে যায় না এবং পচে যায় না। ক্যানভাস প্রাইমার ছাড়া এবং প্রাইমার লাগানো দু-ভাবেই পাওয়া যায়। প্রাইমারও আবার এক কোট এবং দু-কোট দু-রকমই পাওয়া যায়। সিঙ্গল কোট ক্যানভাস একটু নমনীয় এবং এর টেক্সচারও স্পষ্ট থাকে। ইঙ্কজেট প্রিন্টিং এর উপযোগী ক্যানভাসও পাওয়া যায়—যার নাম জিক্লে।

ক্যানভাস স্টোরেজ
(Canvas Storage)

ক্যানভাস কোরা হোক অথবা কোটিং করা হোক তা অবাধ হাওয়া চলাচল করতে পারে এরকম জায়গাতেই রাখা উচিত। তবে দেখতে হবে সেখানে যেন অতিরিক্ত জলীয়বাষ্প না থাকে। কোরা বা র-ক্যানভাস নির্ভাবনায় গুটিয়ে রাখা যেতে পারে। কিন্তু সংরক্ষক বা কনজারভেটররা বলছেন যে রং করা ক্যানভাস গুটিয়ে রাখার সময় রং লাগানো তলটি বাইরের

দিককরে রাখা উচিত। নইলে বর্ণস্তরে ফাটল ধরতে পারে। তবে গোটানোর বদলে রং করা ক্যানভাস স্ট্রেচ করা অবস্থায় খাড়া রাখাই ভালো এবং এক্ষেত্রে দুটো ক্যানভাসের মধ্যে সিলিকন শিট দিয়ে রাখা উচিত যাতে দুটো ক্যানভাস পরস্পরের গায়ে না লাগতে পারে।

ক্যানিফোরা (Canephora) — ঝুড়ি মাথায় ক্যারিয়াটিড বা নারী মূর্তি যা স্তম্ভ শীর্ষের (Capital) ভূমিকা পালন করে। অথবা ঝুড়ি মাথায় যে কোনো রিলিফ বা নিরালম্ব ভাস্কর্য।

ক্যানোপি (Canopy) — স্থাপত্যে ছোটো বের হয়ে থাকা কাঠামো, কখনো-সখনো কুলুঙ্গির ওপরেও থাকে। এছাড়া সাধাররভাবে কাপড়ের তৈরি আচ্ছাদন বা চাদোয়া যা বিছানা বা সিংহাসনের মাথার ওপরে থাকে।

ক্যানোপিক ভাস (Canopic Vase) — মানুষ বা জন্তুর মুখের আদলে তৈরি ঢাকনা দেওয়া ভাস। এই ভাস প্রথম তৈরি করেন প্রাচীন ইজিপ্টীয়রা মৃতের ওষুধ মাখানো নাড়িভুঁড়ি রাখার জন্য। পরে অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই ভাসের অনুকরণে আলংকারিক বস্তু হিসাবে উন্নত ধরনের মৃৎপাত্র তৈরি করা হয়।



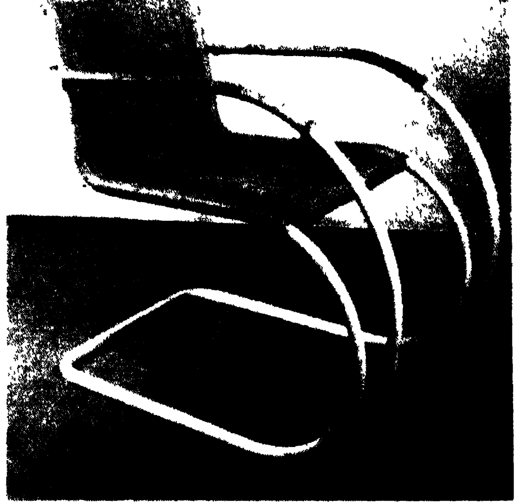
নং ৭৮. ক্যানোপিক ভাস। একটিতে মানুষের মাথা। অন্যটিতে দেবতা আনুবিসের শিয়াল-মাথা। একবিংশ রাজবংশ। ১০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ।

ক্যান্টিলিভার (Cantilever) — একটি অভিক্ষিপ্ত অর্থাৎ বের হয়ে থাকা বিম বা কড়ি যার মাথার দিকে ভরের সাহায্যে একটা ঠেকনা আটকে রাখা হয়। সেই কারণে বিমটির ঠেকনাহীন বাকি অংশ তার ভার বহন করতে পারে। অবশ্য এখন কারিগরি কৌশল কাজে লাগিয়ে ঠেকনা ছাড়াই ক্যান্টিলিভার তৈরি করা হয়। সেক্ষেত্রে জমির

সমান্তরাল ভারবাহী অঙ্গটির এক প্রান্ত সুস্থিত থাকে এবং অন্য প্রান্তটি থাকে নিরলম্ব অবস্থায়।

ক্যান্টিলিভার চেয়ার (Cantilever chair)

ক্যান্টিলিভার সূত্রকে ব্যবহার করে তৈরি চেয়ার। ধাতব টিউব বা বাঁকানো কাঠে তৈরি ইউ আকৃতির কাঠামোর ওপর এর বসার আসনটা থাকে। ক্যান্টিলিভার চেয়ারের দারুণ দারুণ

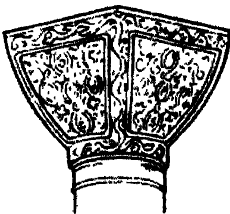


নং ৭৯. মিজ ভান ডের রোহে . চেয়ার। ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দ।

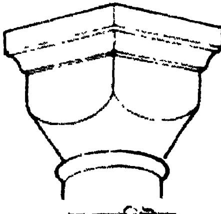
সব নমুনা তৈরি করেন মার্ট স্ট্যাস, মার্সেল ব্রেউয়ার এবং মাইস ভ্যান ডার বোহে। তবে আসবাবপত্রে ক্যান্টিলিভারের প্রথম প্রয়োগ কে করেছিলেন তা নিয়ে মতভেদ আছে।

ক্যাপিটাল (Capital)

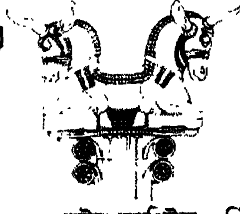
কলাম বা স্তম্ভের শীর্ষ বা মুকুট। ক্যাপিটাল একটা বেড়-এর যোগান দেয় বলে স্থাপত্যের ঊর্ধ্বাংশের বিন্যাস তথা এনটাব্লেচার-এর যোগ্য ধারক হিসাবে কাজ করতে পারে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের স্থাপত্যে নানা ধরনের স্তম্ভশীর্ষ বা ক্যাপিটাল দেখতে পাওয়া যায়। যেমন গ্রিক স্থাপত্যবিন্যাসে বাস্কেট ক্যাপিটাল, কুশন ক্যাপিটাল, প্রোটোম ক্যাপিটাল,



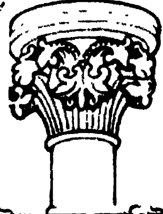
বাস্কেট ক্যাপিটাল



কুশন ক্যাপিটাল



প্রোটোম ক্যাপিটাল



স্টিফ-লিফ ক্যাপিটাল

স্টিফ-লিফ ক্যাপিটাল ইত্যাদি। এতটা নির্দিষ্ট নামে না থাকলেও উদয়গিরি, খণ্ডগিরি, মৌর্য, টিগাওয়া, সাঁচী প্রভৃতি স্থানের প্রাচীন স্থাপত্যে ব্যবহৃত ক্যাপিটাল বা মুকুটগুলির সঙ্গে পাশ্চাত্যের ক্যাপিটালগুলির সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়।

ক্যাপ্রিসিয়ো (Capriccio) — কাল্পনিক এবং আসল এই দুয়ের সম্মিলনে তৈরি নিসর্গ বা স্থাপত্যের কোনো দৃশ্যের পেন্টিং বা গ্রাফিক চিত্র। এই ধরন বা জঁর পেন্টিং অষ্টাদশ শতাব্দীর ভেনিসে খুবই জনপ্রিয় ছিল।

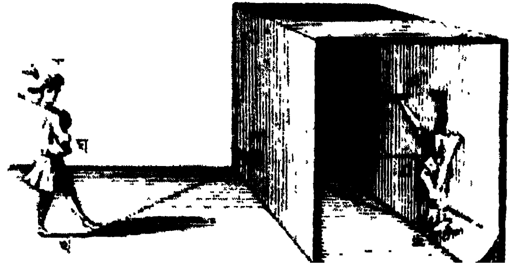
ক্যাবিনেট পিকচার (Cabinet picture) — নিখুঁতভাবে ফিনিশ করা, মূল্যবান সামগ্রীর মতো গুণমান-সম্পন্ন ছোটো ছবি, যা সুবিধামতো খুব কাছ থেকে পরীক্ষা করা যায়। শব্দটির উৎপত্তি ক্যাবিনেট অফ কিউরিয়োসিটিস থেকে। যার মধ্যে এসব ধরনের জিনিস সাজানো থাকে।

ক্যাবিনেট ফোটোগ্রাফ (Cabinet photograph) — সাড়ে ৬ ফুট × সাড়ে ৪ ফুট বা সাড়ে ১৬ × সাড়ে ১১ সেমি. সাইজে মাউন্ট করা সাড়ে ৫ × ৪ ইঞ্চি অর্থাৎ ১৪ × ১০ সেমি. সাইজের প্রতিকৃতি আলোকচিত্র।

ক্যাব্রিয়োল লেগ (Cabriole leg) — খোদাই করে তৈরি আসবাবপত্রের পায়া। শব্দটির প্রকৃত অর্থ ছাগলের পা। সম্ভবত ছাগলের পায়ের মতো দেখতে বলেই এই নাম। এর গোড়ার দিকটা খুরের মতো, গদার মতো, অথবা থাবার মতোও হতে পারে।

ক্যাম্প (Camp) — নাটুকে এবং সমকামী এই শব্দটি আধুনিক শিল্পকলা অভিধানে গ্রহণ করা হয়েছে বিদ্রূপাত্মক ভাবে একধরনের শহুরে ফুলবাবু সমাজের সংস্কৃতিকে বোঝাতে।

ক্যামেরা অব্‌সকিউরা (Camera obscure) — শব্দটির উৎস ল্যাটিন 'ডার্ক চেম্বার' থেকে। একটি বাক্স, ভেতরটা কালো রং করা এবং একদিকে একটি ছোটো ফুটো থাকে। ফুটোর উল্টো দিকের দেয়ালে বাইরের দৃশ্যের উলটো প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে। কখনো-কখনো বাক্স এত বড়ো হয় যে



নং ৮০. ক্যামেরা অবসকিউরা। এনগ্রেভিং। ১৮৩৫।

শিল্পী স্বয়ং তার মধ্যে ঢুকে যায়। ভেতরে কাগজের ওপর প্রতিচ্ছবি ফেলে শিল্পী তা ট্রেস করতে পারেন। এরকম ক্যামেরার কথা বহু বছর আগে অ্যারিস্টটল বলেছিলেন। লিওনার্দো দা ভিঞ্চি তাঁর রচনায় এ নিয়ে লিখেছেন। ষোড়শ এবং সপ্তদশ শতাব্দীতে শিল্পীরা এরকম পোর্টেবল ক্যামেরা ব্যবহার করেছেন। সাধারণভাবে তাতে পিনহোলের জায়গায় একটা উত্তল লেন্স লাগানো হত। লেন্স ব্যবহারের বিষয়টি ফরাসি বিজ্ঞানী নিপ্‌সে এবং শিল্পী ডগেরার কাজের ভিত্তিতে আবিষ্কৃত হয় যাতে দেয়ালে প্রক্ষিপ্ত প্রতিচ্ছবিটিকে আলোক সংবেদী রাসায়নিক পদার্থ মাখানো কাগজের সাহায্যে ধরা যায়। এই ভাবেই ক্যামেরার জন্ম হয়েছিল।

ক্যামেরা লুসিডা (Camera Lucida) — এই ল্যাটিন শব্দটির অর্থ 'লাইট রুম'। কাচের প্রিজমকে ব্যবহার করে ১৮০৭ সালে এর আবিষ্কার হয়। কোনো বস্তুকে নিখুঁতভাবে আঁকার জন্য ক্যামেরা লুসিডার সাহায্য নেওয়া হত। তবে যন্ত্রটি খুব কার্যকারী ছিল না।

ক্যারিকেচার (Caricature) — কোনো বিষয়ের বিশেষ করে মানুষের চেহারা বা গঠনের কিছু বৈশিষ্ট্যকে বিকৃত বা বড়ো করে অতিরঞ্জিত ভাবে আঁকা একধরনের ছবি বা ব্যঙ্গচিত্র। বিষয়কে নিয়ে ব্যঙ্গ- বিদ্রূপ করার উদ্দেশ্যে রাজনৈতিক বিষয় ও ব্যক্তিত্বকে নিয়েও ক্যারিকেচার করা হয়। ইতালীয় শব্দ 'ক্যারিকেচার' সম্ভবত ১৯৫০-এ 'ক্যারাচ্চি' নামে ইতালীয় ভাতৃত্রয়ের কোনো একজনের হাতে এর উৎপত্তি।

ক্যারোলিনজিয়ান আর্ট (Carolingian art) — শার্লামেন-এর সময়কার শিল্পকলা। শার্লামেন বেশিরভাগ খ্রিস্টধর্ম অধ্যুষিত ইউরোপকে রোম সাম্রাজ্যের অধীনে এনে একটি সত্তায় পরিণত করেছিলেন। ক্যারোলিনজিয়ান নামটি এসেছে ল্যাটিন শার্লামেন বা কারোলাম ম্যাগনাস অর্থাৎ শার্ল দ্য গ্রেট থেকে। সম্রাট শার্লামেন এবং তাঁর উত্তরসূরীরা খ্রিস্টীয় অষ্টম থেকে দশম শতাব্দীর মধ্যে ব্রিটেন ও স্পেন বাদে পশ্চিম ইউরোপে শিল্পকলা এবং শিক্ষায় প্রাচীন গ্রিক ও রোমান ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবন ঘটিয়েছিলেন। যা বর্বরদের আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। রাজদরবারে একেবারে আকস্মিকভাবে ধ্রুপদি ও বাস্তববাদী শিল্পকলার আবির্ভাব এটাই প্রমাণ করে দেয় যে সম্রাট বাইজেনটাইন শিল্পীদের জোগাড় করেছিলেন।

ছবি নং ১৬৫ পৃ. ৩৫৬

ক্যারোলিনজিয়ান যুগে প্রাচীন খ্রিশ্চান ব্যাসিলিকার পুনরাবির্ভাব ঘটেছিল। প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ব্রোঞ্জ ঢালাইয়ের কারখানা, পাণ্ডুলিপির কপি ও অলংকরণের জন্য পাণ্ডুলিপি লিখনাগার তৈরি করা হয়েছিল। এই সময়কালকে ক্যারোলিনজিয়ান রেনেসাঁস বলা হয়।

ক্যালকাটা গ্রুপ (Calcutta group)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে বাংলা তথা ভারতের শিল্প সংস্কৃতির বিশেষ প্রেক্ষাপটে ১৯৪৩ সালে এই শিল্পীগোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠা। আট জন সদস্যের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এই গোষ্ঠীর শিল্পীরা মিলিত হতেন ৫ এস. আর. দাস রোডে সুভো ঠাকুরের স্টুডিয়োতে। প্রতিষ্ঠাতা শিল্পীরা ছিলেন সুভো ঠাকুর, রথীন মৈত্র, প্রদোষ দাশগুপ্ত, পরিতোষ সেন, নীরদ মজুমদার, গোপাল ঘোষ, টি. সি. কমলা (দাশগুপ্ত) এবং প্রাণকৃষ্ণ পাল। সে সময় সদ্য বিলেত ফেরত প্রদোষ দাশগুপ্তের পরামর্শ মতো লন্ডনের আঙ্গিকবাদী শিল্পীগোষ্ঠী 'লন্ডন গ্রুপের' অনুসরণে এই গোষ্ঠীর নাম হয় ক্যালকাটা গ্রুপ। এই গোষ্ঠীর উৎসাহদাতাদের মধ্যে ছিলেন বহু শ্বেতাঙ্গ সেনা আধিকারিক, বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী ও কমিউনিস্ট তাত্ত্বিক, এমনকি তৎকালীন বাংলার গভর্নর অস্ট্রেলিয়ার আর. জি. কেসি র স্ত্রী মে. কেসি। মে. কেসি নিজেও শিল্পী ছিলেন এবং তিনি আরউইনের কাছে ক্যালকাটা গ্রুপের খবর শুনে এস. আর দাস রোডের স্টুডিয়োতে গ্রুপের সদস্যদের ছবি দেখতে যান ১৯৪৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে। ১৯৪৫ সালের ২ ফেব্রুয়ারি এই গোষ্ঠীর প্রথম ঘরোয়া প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয় এঁদের নিজস্ব স্টুডিয়োতে। ওই বছরেরই মার্চ মাসে শ্রীমতী কেসির সহায়তায় এবং শ্বেতাঙ্গ আধিকারিকদের অবসর বিনোদনের জন্য স্থাপিত 'সার্ভিসেস আর্ট ক্লাবের' উদ্যোগে প্রথম প্রকাশ্য প্রদর্শনী হয় গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলে। ক্যালকাটা গ্রুপের প্রতিষ্ঠার সময়ে ইউরোপীয় আধুনিক চিত্রকলার সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় লাভ করেছিলেন একমাত্র প্রদোষ দাশগুপ্ত। বাকি সদস্যদের মধ্যে ইউরোপীয় আধুনিক শিল্পকলার ধারণা এসেছিল দেশি বিদেশি বন্ধু এবং রসিকগণের কাছ থেকে। গ্রুপে সমবেত শিল্পীদের মধ্যে শিক্ষার ধারা ও শৈলীর ভিন্নতা ছিল। যেমন রথীন মৈত্রের ছিল পাশ্চাত্যের অকাদেমিক বাস্তবধর্মী ছবি আঁকার পাঠ তেমনি নীরদ মজুমদার ও প্রাণকৃষ্ণ পালের ছিল নব্যবঙ্গীয় চিত্রশৈলী, আবার গোপাল ঘোষ,

পরিতোষ সেন, টি. সি. কমলা (দাশগুপ্ত) প্রমুখেরা মাদ্রাজে দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর কাছে উভয় ধারাতেই প্রশিক্ষিত, অন্যদিকে সুভো ঠাকুর ছিলেন স্বশিক্ষিত শিল্পী।

ক্যালকাটা গ্রুপ টিকে ছিল মাত্র দশ বছর। তাঁদের প্রথম প্রদর্শনী হয় ১৯৪৩ সালে আর শেষ প্রদর্শনী হয় দিল্লিতে ১৯৫৩ সালে। ক্যালকাটা গ্রুপের শিল্পীরা কোনো মৌলিক আদর্শ বা নির্দিষ্ট শিল্পতত্ত্বকে সামনে রেখে গোষ্ঠীবদ্ধ হননি। যদিও অন্যতম মুখ্য সংগঠক প্রদোষ দাশগুপ্তর 'স্মৃতিকথা শিল্পকথা' গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, তাঁরা ঘোষণা করেছিলেন আর্টের উদ্দেশ্য হবে আন্তর্জাতিক নির্ভরতামূলক দেওয়া নেওয়ার মধ্যে দিয়ে, ভারতের বাইরের জগৎ শিল্পের আঙ্গিকগত পরিভাষার নতুন নতুন আবিষ্কারের ফলে যেভাবে এগিয়ে গেছে, ভারতের শিল্পকলার জগতের সেই ফাঁক জরুরি ভাবে পূরণ করা। স্বভাবতই ক্যালকাটা গ্রুপের আন্দোলনে আঙ্গিকগত দিকটিই ছিল মুখ্য ব্যাপার। কেন-না গ্রুপের শিল্পীরা এই অনুভবেই একাত্ম হয়েছিলেন যে আকাদেমিক রীতির জড়ত্ব এবং নব্যবঙ্গীয় শৈলীর অতীতচারিতাকে ভেঙে ফেলা দরকার বাংলা তথা ভারতের শিল্পকলার স্বাভাবিক বিকাশের স্বার্থে। কিন্তু তাঁদের এই আঙ্গিকবাদী চর্চার পাশাপাশি তাঁদের ছবিতে শিল্পের ভাষায় দেবদেবী পুরাণের পরিবর্তে মানুষের চরিত্রগত বৃত্তিও ব্যক্ত হয়েছে। এছাড়াও তাঁদের মধ্যে এমন কিছু শিল্পী ছিলেন যাঁদের সঙ্গে ফ্যাসিবিরোধী লেখক শিল্পী সংঘ এবং কমিউনিস্ট পার্টির সাংগঠনিক যোগসূত্র ছিল। সম্ভবত এই দুই কারণের জন্য তৎকালীন অনেক কমিউনিস্ট বুদ্ধিজীবী সহ কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃবৃন্দ এই গোষ্ঠীর মধ্যে 'সাম্যবাদী আগ্রহ' তথা প্রগতিশীলতার ছাপ দেখতে পেয়েছিলেন। কিন্তু ঘটনা হল এই শিল্পীদের ছবিতে মানুষের কথা এলেও আঙ্গিকের অন্বেষণই ছিল প্রধান কথা। তৎসত্ত্বেও একথা ঠিক যে ক্যালকাটা গ্রুপ সমকালীন ভারতের শিল্পচর্চায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গেছে। যেমন ক্যালকাটা গ্রুপের অনুপ্রেরণাতেই ১৯৪৬ সালে কাশ্মীর গ্রুপ গড়ে ওঠে, ১৯৪৮ সালে গড়ে ওঠে বোম্বাইয়ের আধুনিকপন্থী শিল্পীদের দল—বোম্বে প্রোগ্রেসিভ গ্রুপ, দিল্লি শিল্পীচক্র এবং মাদ্রাজ প্রোগ্রেসিভ গ্রুপ। সেই সঙ্গে যে গুরুত্বপূর্ণ কাজ ক্যালকাটা গ্রুপ করেছিল তা হল সমকালীনতার শর্তে শিল্পরচনার ভিত্তিকে তৈরি করে ভারতের শিল্পকলার আধুনিকতায় উত্তরণের দিকে বলিষ্ঠ প্রয়াস।

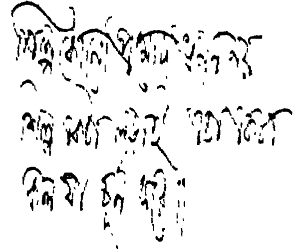
ক্যালকাটা পেন্টার্স (Calcutta Painters)

১৯৬০ সালে সোসাইটি অফ কনটেম্পোরারি আর্টিস্টস তৈরি হলে কলকাতার শিল্পচর্চার জগতে একটা নতুন মাত্রা যুক্ত হয়। তার চার বছর বাদে ১৯৬৪ সালে সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা কয়েকজন শিল্পী সোসাইটি ছেড়ে নতুন কয়েকজন শিল্পীর সাথে যুক্ত হয়ে আর একটি সংগঠন গড়ে তোলেন যার নাম ক্যালকাটা পেন্টার্স। ক্যালকাটা পেন্টার্স-এর প্রথম দুটো প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছিল দিল্লিতে। পরে ১৯৬৫ সালে এই দলের কলকাতা-প্রদর্শনী উপলক্ষ্যে তাঁরা যে ঘোষণাপত্র প্রকাশ করেছিলেন তা পড়লেই বোঝা যায় যে সংশ্লিষ্ট শিল্পীরা সমকালীন ভারতবর্ষের পরিস্থিতি সম্পর্কে খুবই সচেতন ছিলেন এবং শিল্পকলাকে তার বাইরে রাখতে চান নি—'Confronted with this dark picture of our country, this exhibition, what does it mean at all? Who for? What for? But that is where ties the crux of the matter.' ('এরকম একটি অন্ধকারের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমাদের আজকের এই প্রদর্শনী। কোনো কি অর্থ আছে এর? কার জন্য, কেন এই প্রদর্শনী? ...এই প্রশ্নের মধ্যেই রয়েছে দ্বান্দ্বিকতা।' ভাষান্তর : মৃণাল ঘোষ।) এই ঘোষণা পত্রে স্বাক্ষর করেছিলেন রবীন মণ্ডল, গোপাল সান্যাল, রঞ্জন রুদ্র, বিজন চৌধুরী, নিখিল বিশ্বাস ও প্রকাশ কর্মকার। এই গোষ্ঠীর দলগত কর্মকাণ্ড অনেক দিন বন্ধ থাকার পর ১৯৯০ তে সংগঠনের ২৫ বছর উপলক্ষ্যে একটি বড়ো প্রদর্শনী হয় কলকাতার বিড়লা আকাদেমিতে। প্রদর্শনীর স্মারকপত্রে দলের ৩২ জন সদস্যের নামের তালিকাও প্রকাশ করা হয়েছিল যার মধ্যে বেশ কয়েকজন তখন প্রয়াত। সদস্যদের মধ্যে ছিলেন প্রভাস সেন (প্রয়াত), বিমল দাশগুপ্ত, অহিভূষণ মালিক (প্রয়াত), বিপিন গোস্বামী (প্রয়াত), যোগেন চৌধুরী, ধীরাজ চৌধুরী, বিমল ব্যানার্জী, শুভাপ্রসন্ন, ওয়াসিম কাপুর, রেবন্ত গোস্বামী, গোপাল সান্যাল (প্রয়াত), বিজন চৌধুরি, রবীন মণ্ডল, প্রকাশ কর্মকার, ইশা মহম্মদ প্রমুখ।

ক্যালিগ্রাফি (Calligraphy)

গ্রিক অর্থে সুন্দর লেখা। যে কোনো ভাষার শৈল্পিক, শৈলীবদ্ধ সুন্দর লেখাকেই বলে ক্যালিগ্রাফি। ইজিপ্টীয় উৎকীর্ণ হায়ারোগ্লিফিক কিংবা সুমেরীয় বাণমুখী লিপির প্রতীক সহ চিন ও জাপানের তুলি-প্রতীককে ক্যালিগ্রাফির আদি রূপ বলা

Art is not a
pleasure trip,
its a battle,
its a mill
that grinds



যেতে পারে। এই রূপকে ভিত্তি করে আধুনিক ছাপার হরফের নকশা তৈরি করা হয়েছে যা ক্যালিগ্রাফিক টাইপ নামে পরিচিত। এছাড়া ড্রয়িং এবং পেন্টিং-এ আলংকারিক রীতির রেখা এবং দাগকেও ক্যালিগ্রাফি বলা হয়।

ক্যালিগ্রাফিক পেন্টিং (Calligraphic Painting) সাধারণভাবে আধুনিক নির্বস্তুক চিত্রকলা। ১৯৪০ উত্তর কালের এই শিল্পকলার আঙ্গিকে জোর দেওয়া হয় তুলির সাহায্যে লেখন সদৃশ গুণ আরোপের ওপর। একইভাবে চিন ও জাপানের কালিচিত্র, যা একই তুলি দিয়ে লেখার মতন স্ট্রোকের সাহায্যে তৈরি তাও ক্যালিগ্রাফিক পেন্টিং নামে পরিচিত।

ছবি নং ১৬৬ পৃ. ৩৫৬

ক্যালোটাইপ (Calotype) প্রচ্ছন্ন প্রতিকৃতি আবিষ্কারকে কাজে লাগিয়ে কাগজের ওপর করা যায় এরকম নেগেটিভ ও পজেটিভ ফোটোগ্রাফিক প্রক্রিয়ার প্রাচীনতম পদ্ধতি।

ক্রেয়ন (Crayon) সাধারণ কথায় কাঠি আকারের যে কোনো ড্রয়িং মেটিরিয়াল-কেই ক্রেয়ন বলা হয়ে থাকে। ক্রেয়ন তিন ধরনের। লিথোগ্রাফিক ক্রেয়ন, কন্টি ক্রেয়ন এবং ওয়াক্স বা চিলড্রেনস ক্রেয়ন। লিথোগ্রাফিক ক্রেয়ন স্টিক এবং পেন্সিল দু-ধরনেরই পাওয়া যায়। এর কাঠিন্যের শ্রেণি আছে। লিথোগ্রাফিক ক্রেয়নের মূল উপাদান হল ল্যাম্প ব্ল্যাক পিগমেন্ট এবং মোম। লিথো পাথরের ওপর ড্রয়িং-এর কাজে এই ক্রেয়ন ব্যবহৃত হয়। কন্টি ক্রেয়ন রীতিগত ভাবে এক সারি রঙে তৈরি হয় যেমন কালো, সাদা এবং লালচে বাদামি শ্রেণি। যে কোনো শুষ্ক তলে ড্রয়িং করার উপযুক্ত হল কন্টি। আর ওয়াক্স বা চিলড্রেনস ক্রেয়ন মূলত মোম এবং পিগমেন্ট দিয়ে তৈরি।

ক্রেয়ন ম্যানার (Crayon Manner) চক দিয়ে এঁকে ছাপ তোলার উপযোগী একটি এনগ্রেভিং কৌশল। ১৭৫০ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সে এই পদ্ধতির আবিষ্কার হয়

এবং পরে ইংল্যান্ডে ব্যাপক ভাবে ব্যবহৃত হয়। কাগজের ওপর চকের দানাদার ফলাফল সৃষ্টি করতে এর জন্য খাঁজকাটা চাকা বা রলেট্স জাতীয় কোনো যন্ত্র ব্যবহার করা হয়।

ক্রেস্ট শ্যাডো (Crest Shadow) — কোর শ্যাডো দেখুন।

ক্রোমা (Chroma) — রঙের ক্ষেত্রে উজ্জ্বলতার মাত্রা। অর্থাৎ রং এবং সংপৃক্তির সমন্বয়।

ক্রোমোলিথোগ্রাফি (Chromolithography) — বহু রঙা লিথোগ্রাফি। প্রতিটি রঙের জন্য আলাদা আলাদা পাথর ব্যবহার করে ছাপা।

ক্লাঞ্চ (Clunch) — শক্ত ধরনের খড়ির বর্গীয় নাম। কখনো-কখনো বাড়ি তৈরির কাজে লাগলেও গৃহ অভ্যন্তরস্থ খোদাই কাজের জন্য বেশি উপযুক্ত।

ক্লিসে-ভের (Cliche-verre) — ফোটোগ্রাফিক প্রিন্ট নেওয়ার একটি পদ্ধতি। কাচের প্লেটের ওপর রং বা অ্যালবুমেন জাতীয় ইমালশানের প্রলেপ লাগিয়ে সেই প্রলেপের ওপর আঁচড় কেটে নকশা তৈরি করা হয়। এই কাচের প্লেটকে নেগেটিভ হিসাবে ব্যবহার করে আলোক সংবেদী কাগজের ওপর প্রিন্ট নেওয়া হয়। এই পদ্ধতিতে যেসব শিল্পী কাজ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ফরাসি শিল্পী কামিই কোরো উল্লেখযোগ্য।

ক্লে (Clay) — মাটি যা নমনীয় এবং ভিজালে আঠালো হয়। তাপ দিলে পাকাপাকি ভাবে শক্ত হয়। নানা ধরনের মাটির প্রধান উপাদান হিসাবে আছে অ্যালুমিনিয়াম এবং খনিজ সিলিকেট যা আবহাওয়ার পরিবর্তনের ফলে পাথর থেকে তৈরি। কিছু মাটি আছে যেমন চিনা মাটি বা কেয়োলিন সিরামিকস্ তৈরির কাজে লাগানো হয়। পাইপ ক্লে অনেকটা কেয়োলিনের মতো তবে এতে বালির ভাগ একটু বেশি। পটারস ক্লে বা চাকের মাটিতে পাইপ ক্লে-র চাইতে বালির ভাগ একটু কম। ইট তৈরির জন্য মাটির সাথে একটু মোটা বালি মিশিয়ে নিতে হয়। মাটি শুকিয়ে গেলে ভেঙে যায়। তাই মাটি দিয়ে ভাস্কর্য বানালে তা অবশ্যই পুড়িয়ে নিতে হবে।

ক্লোয়াজোনিস্‌ম্ (Cloisonnism) — পোস্টইম্প্রেশনিস্ট শৈলীর একটি বৈশিষ্ট্য। এমিলে বেরনরে এই শৈলীর প্রকাশ ঘটান। এই শৈলীর ছবিতে 'ক্লোয়াজোনে' এনামেল রীতির অনুকরণে বিশুদ্ধ বা ফ্ল্যাট কালারকে জোরালো

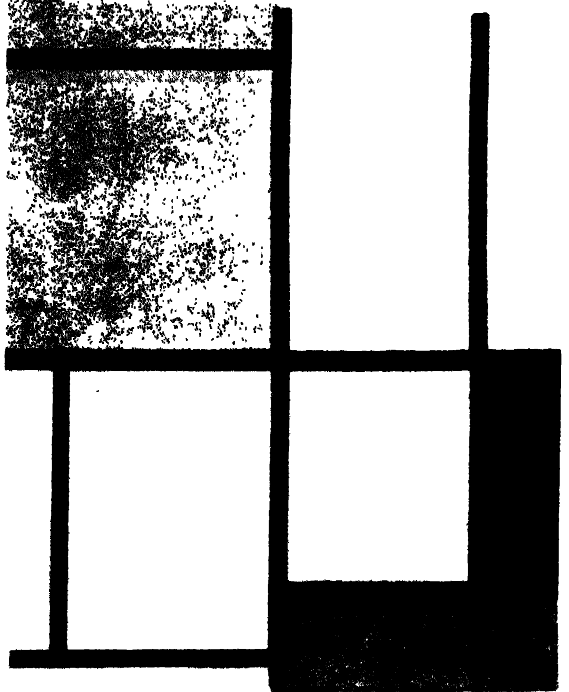
নীল বা কালো আউটলাইন দিয়ে গণ্ডিবদ্ধ করা হয়। এই শৈলীর অপর একজন গুরুত্বপূর্ণ শিল্পী ছিলেন জর্জ আঁরি রুও।

ক্ল্যাসিকাল (Classical)

সোজাসুজি বললে প্রাচীন যুগের গ্রিক এবং রোমান শিল্প ও ভাস্কর্য। বিশেষ করে খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম ও চতুর্থ শতাব্দীর গ্রিক শিল্পকর্ম এবং তার বিশ্বাসযোগ্য রোমান অনুকৃতি। আর একটু নির্দিষ্ট বললে রোমান ও গ্রিক শিল্পরূপ অনুসৃত শিল্প ও ভাস্কর্য। প্রাচীন গ্রিক ও রোমান স্থাপত্যের কিছু শৈলী বা ক্রম ছিল। যেমন স্তম্ভ থাকত পেডেস্টাল বা পাদপীঠের ওপর। স্তম্ভশীর্ষের ওপর যে অংশ থাকত তা হল এনটাব্লেচার। আবার এনটাব্লেচার তিন অংশে বিভক্ত। আর্চিট্রেভ, ফ্রিজ এবং কার্নিস। স্তম্ভ বা কলামের ওপরে স্তম্ভশীর্ষ বা ক্যাপিটাল। ক্ল্যাসিকাল ক্যাপিটালের তিনটি সাধারণ শৈলী হল ডোরিক, করিন্থিয়ান, আয়নিক। এছাড়াও আরও দুটি অপেক্ষাকৃত গৌণ শৈলী আছে তা হল টাসকান এবং কম্পোজিট।

ক্ল্যাসিকাল অ্যাবস্ট্র্যাকশন (Classical Abstraction)

স্পষ্ট জ্যামিতিক আকার দিয়ে গঠিত যে কোনো বিমূর্ত ধরনের কম্পোজিশন যা আপাতভাবে নিয়ন্ত্রণ, ভারসাম্য, শৃঙ্খলা ইত্যাদি ক্ল্যাসিকাল সূত্রগুলি মেনে তৈরি। এর আদর্শ উদাহরণ হল পিয়েত মন্দ্রিয়ান এবং নিকলসনের ছবি।



নং ৮১. মন্দ্রিয়ান : কম্পোজিশন। ১৯২১। ক্যানভাসের ওপর তেল রং।



খ

খাজুরাহো
(Khajuraho)

ভারতের মধ্যাঞ্চলে খ্রিস্টীয় দশম শতাব্দীতে রাজত্বকারী চান্দেল বংশের রাজধানী ছিল খাজুরাহো। এই সময়ই খাজুরাহোর মন্দিরগুলি নির্মিত হয়েছিল। বহু মন্দির এখানে নির্মিত হলেও বেশিরভাগই ধ্বংস হয়ে গেছে। মাত্র কুড়িটি মন্দির অটুট আছে। এখানে চৌষট্টি যোগিনী মন্দির, লাল গেয়ান মন্দির, কন্দর্য মহাদেব মন্দির, লক্ষ্মণ মন্দির, মাতঙ্গেশ্বর মন্দির, জগদম্বী মন্দির, রামচন্দ্র মন্দির, বিশ্বনাথ মন্দির, ব্রহ্মা মন্দির প্রভৃতি হিন্দু মন্দিরের পাশাপাশি বৌদ্ধ ও জৈনদের মন্দির যথাক্রমে ঘণ্টাই মন্দির এবং আদিনাথ, শান্তিনাথ, পার্শ্বনাথ



নং ৮২. মিথুন মূর্তি। চিত্রগুপ্ত মন্দিব। খাজুবাহো। ১১০০-১৩৮০ খ্রিস্টাব্দ।

মন্দির আছে। বিভিন্ন সময়ে এই সব মন্দির নির্মাণ করেছিলেন যশোবর্মণ, ধাঙ্গদেব, বিদ্যাধর, হর্ষদেব, কৃতিবর্মণ প্রমুখ রাজারা।

মধ্যভারতের এই মন্দিরগুলির সঙ্গে উড়িষ্যার একরেখ দেউল মন্দিরের ভাবগত সাদৃশ্য থাকলেও খাজুরাহোর এই মন্দিরের নির্মাণ পদ্ধতির বিন্যাস সম্পূর্ণ আলাদা। খাজুরাহোর মন্দির উঁচু ভিতের ওপর স্থাপিত। কোণার্কের মন্দিরের ভিতও উঁচু কিন্তু মন্দিরের চারপাশে পরিক্রমণ করা যায় না কিন্তু খাজুরাহোতে পরিক্রমণ পথ আছে। এই মন্দিরের নাটমন্দির, জগমোহন ও গর্ভগৃহ একটি অখণ্ড স্থাপত্য হিসাবে নির্মিত হয়েছে। মন্দিরগুলির ভিত্তি বাদে সমস্ত অংশের সর্বত্র নানান ধরনের মূর্তি, জীবজন্তু, ফুলপাতা প্রভৃতি দিয়ে সাজানো। ভাস্কর্যগুলি প্রায় ত্রিমাত্রিক। মন্দিরের গায়ে এত ভাস্কর্য ব্যবহৃত হয়েছে যেন ভাস্কর্য প্রদর্শনের জন্যই মন্দিরগুলি নির্মিত হয়েছে। কন্দর্য মহাদেব মন্দির খাজুরাহোর প্রধান মন্দির। এর মূল মন্দির বা গর্ভ মন্দির চূড়াকে ঘিরে থাকা পাঁচটি শিখরযুক্ত মন্দির মূল মন্দিরের শ্রীবৃদ্ধি করেছে। গর্ভগৃহে স্থাপিত আছে মর্মর পাথরের শিবমূর্তি। মন্দিরের ভিতরে ও বাইরে সর্বত্র কারুকার্যময় এবং রসসংযুক্ত মূর্তির বিস্ময়কর ব্যবহার চোখের ক্লান্তি দূর করে। এখানকার অন্যান্য মন্দিরের চাইতে অনেক বেশি পরিমাণে মিথুন মূর্তি ব্যবহৃত হয়েছে কন্দর্য মহাদেব মন্দিরে। ঘন্টাই মন্দির বৌদ্ধ মন্দির হলেও এখানকার মূর্তির উপস্থাপনার মধ্যে অস্পষ্টতা থাকার কারণে মন্দির বৌদ্ধ, জৈন না হিন্দু তা নিয়ে বিভ্রান্তি আছে। কেন না জেমস ফার্গুসন এই মন্দিরকে জৈন মন্দির বলে অভিহিত করেছেন আবার মূর্তিটিকে বলেছেন বৌদ্ধমূর্তি। কিন্তু স্থানীয় মানুষ এই মূর্তিকে কালভৈরব মূর্তিরূপে পুজো করেন।

খেমের আর্ট (Khmer Art)

খেমের সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়েছিল ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীর মধ্যে। ফুনান এবং আরও উত্তরের চেন লা সাম্রাজ্য মিশে গিয়ে। পরবর্তীকালে যা আঙ্কোর নামে পরিচিত হয়। এই সময়কার যা কিছু অগ্রগতি বিশেষ করে ইটের তৈরি পবিত্র উঁচু অট্টালিকা ইত্যাদি ভারতীয় রীতিতে নির্মিত। আঙ্কোর যুগে খেমের আর্ট তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য লাভ করে শ্রেষ্ঠত্বে উন্নীত হয়েছিল। এর ভিত্তি ছিল প্রাক আঙ্কোর রূপের মধ্যে। ধর্মীয় রাজনৈতিক ধারণার ওপর এই শিল্প গড়ে উঠেছিল। সম্ভবত অন্যান্য ভারতীয় রীতি অনুসারী দেশের মতোই খেমের অঞ্চলেও শিখর



নং ৮৩. বোরবুদুরের রিলিফ ভাস্কর্য। খেমের আর্ট। একদাশ শতাব্দী।

মন্দিরের নিখুঁত প্রকাশ ঘটেছিল। খেমের তথা কম্বোডিয়ার এই শিল্পকলাকে দু-ভাগে ভাগ করা যায়। সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত যা ভারতীয় মন্দির স্থাপত্যরীতি সদৃশ এবং নবম শতাব্দী পরবর্তী ক্ল্যাসিকাল বা ধ্রুপদি খেমের শিল্প। কেন-না এই সময়েই খেমের শিল্প ভারতীয় শিল্পকে আত্মস্থ করে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য লাভ করে। রাজা প্রথম ইন্দ্রবর্মণের সময় থেকে খেমের শিল্পকলার পূর্ণ বিকাশ ঘটতে শুরু করে। ঐতিহ্যগত পরম্পরাভাবে রাজার মধ্যে মহাজাগতিক ঝরণা, জগতের কেন্দ্র এবং স্বর্গীয় আবাস ইতাদি নানা কল্পনা ছিল। এই সময় উঁচু ধাপে তৈরি পাথরের পিরামিড তৈরি শুরু হয়। পরবর্তী প্রতিটি রাজার রাজত্বকালে নতুন সংযোজনের ফলে বড়ো হতে হতে শেষ পর্যন্ত তৈরি হয়েছে সূর্যবর্মণ দুই-এর সমাধি এবং শিখর মন্দির আঙ্কোর ভাট। এই মন্দিরের অনন্য সাধারণ পরিকল্পনা, গঠনগত ভারসাম্য, সুন্দর স্তম্ভ সজ্জিত উদ্যানপথ এবং এব অলংকরণ এই মন্দিরকে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্থাপত্যের মর্যাদা দিয়েছে। এই মন্দিরের ভিতরে ঘিরে থাকা দুটো কেন্দ্রবদ্ধ দেয়ালের ভিতরেরটাতে ব্রাহ্মণ্যবাদ ভিত্তিক পুরাকাহিনি এবং সৈন্যবাহিনী নিয়ে রাজার বিজয় মিছিলের রিলিফের কাজ আছে। রাজন্য ও সাধারণের জন্য নির্মিত একতলা বাড়ি খেমের সভ্যতার অন্যতম বিস্ময়। এক্ষেত্রে আঙ্কোরের কাছে বানতেই স্রাই মন্দিরের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এই মন্দিরে ভারতীয় মূর্তিবাদী বিষয়ের নিখুঁত জ্ঞান এবং অলংকরণের বিচিত্র বিষয় এখানে ফুটে উঠেছে। বান্‌তেই স্রাই-এর শিল্পী বাফুন রীতিতে কাজ করেছেন। আঙ্কোরের শেষ পর্যায়ের স্থাপত্যে বৌদ্ধ রাজা জয়বর্মণ সপ্তম-এর আধিপত্য ছিল। তিনি বেয়ন মন্দির সহ বিশাল

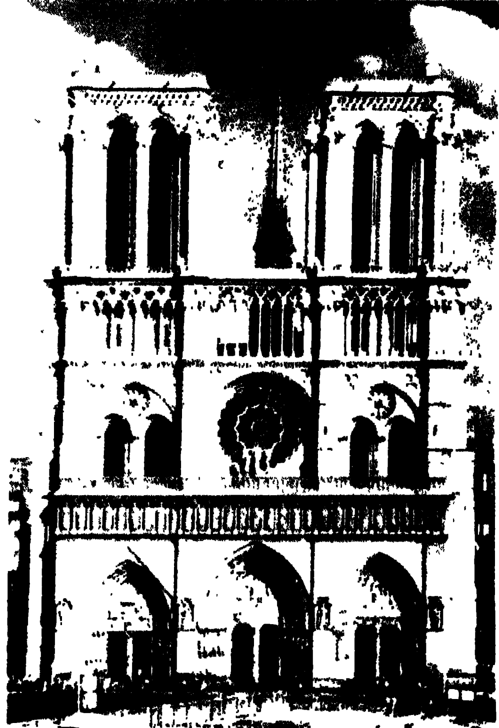
বিশাল মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। যা খেমের স্থাপত্য রীতির শীর্ষপর্যায়। এই মন্দিরের ৫৪টি অট্টালিকার প্রতিটির চার পাশে জয়বর্মণ সপ্তম-এর স্মিত হাস্যমুখ, বোধিসত্ত্ব লোকেশ্বর-এর প্রতিকৃতি সজ্জিত। রাজা এবং ঈশ্বর সর্বত্র বিরাজমান-এই ধারণা থেকেই এটা করা হয়েছিল। বেয়ন হল হিন্দু তত্ত্বানুসারী স্বর্গীয় মন্দির এবং বৌদ্ধ স্তূপের প্রতীকের সম্মিলন। আঙ্কোর ভাটের রিলিফের বিষয় হল রামায়ণের দৃশ্য। এর শিল্পগুণ বেয়ন মন্দিরের থেকে উন্নত বলে কুমারস্বামীর অভিমত। আঙ্কোর ভাটের স্থপতি ছিলেন সূর্যবর্মণের গুরু পণ্ডিত দিবাকর।



গ

গথিক আর্ট (Gothic Art)

ইউরোপে রেনেসাঁসের সময় মধ্যযুগের আর্টকে বিদ্রুপ করতে গথিক শব্দটা ব্যবহার করা হত। তখন ক্ল্যাসিকাল মান



নং ৮৪. প্যারিসের বিখ্যাত নোতরদাম গির্জার পশ্চিমমুখ।

থেকে সামান্য বিচ্যুতিকেও বর্বরতার লক্ষণ হিসাবে মনে করা হত। কিন্তু এখন গথিক আর্ট বলতে সুনির্দিষ্টভাবে ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীর শিল্পকলাকে বোঝানো হয়। উৎসগত ভাবে যা ফরাসি শৈলী হিসাবে পরিচিত। গথিক শৈলীর সবচেয়ে জোরালো ব্যবহার হয়েছিল স্থাপত্যে। যার প্রথম প্রবর্তন ঘটে ফ্রান্সের মহা ক্যাথিড্রালগুলিতে। গথিকের ঠিক পূর্ববর্তী পর্বে রেমানেস্ক শৈলীর বৈশিষ্ট্য ছিল যে, এর ছাদ ও দেয়ালের মিলিত বিশাল ভার ধরে রাখার জন্য বৃহদায়তনের পাথরের দেয়াল ব্যবহার করা হত। কিন্তু গথিক স্থাপত্যে নতুন এক ধরনের ইমারতি রূপ প্রবর্তন করা হল। যার ফলে দেয়াল পাতলা করে তৈরি করা সম্ভব হল। কারণ এই সময় ভার বহনের জন্য কিছুটা পরপর ব্যবহার করা হল এক দেয়াল থেকে আরেক দেয়ালে ঝুঁকে থাকা পাথরের তৈরি একরকম স্তম্ভ বা পায়ার্স যার নাম ফ্লাইং বাট্রেস। বাট্রেসের মধ্যবর্তী দেয়াল মোটা করার দরকার হল না এবং বড়ো জানলাও লাগানো সম্ভব হল। এই সব জানলায় বিচিত্র নকশার স্টেইন্ড গ্লাস লাগিয়ে দেওয়া হল। এই অপেক্ষাকৃত লঘুভার স্থাপত্যের সিলিংকে আরও উঁচু এবং আরও সুসজ্জিত করা হল। গথিক যুগে ভাস্কর্যও জড়তা,

আনুষ্ঠানিকতা, সাধাসিধা ফিগারেটিভ রূপ ছেড়ে ক্রমশ আরও বাস্তবানুগ, ভঙ্গিবিশিষ্ট নির্দিষ্ট ও ব্যক্তিভিত্তিক চেহারা পেতে শুরু করল। একই ভাবে ফুল, পাতা, জন্তুজানোয়ারও নির্দিষ্ট রূপ পেল। এই সময় ফিগারগুলো দেয়াল থেকে আলাদা হয়ে পাদপীঠ-এর ওপর স্থাপিত হল। এই সব ভাস্কর্যের বেশিরভাগই ক্যাথিড্রালের বিল্ডিং-এর সঙ্গে সম্পর্ক রেখেই তৈরি। মধ্যযুগের গথিককে একটি আন্তর্জাতিক শৈলী বলা হলেও ইউরোপের বিভিন্ন অংশে এই শৈলীকে ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য অনুযায়ী ব্যবহার করা হয়েছে। এইভাবে দেখলে ট্রাসবার্গের ভাস্কর্য ছিল ফরাসি ও জার্মান বৈশিষ্ট্যের মিশ্রণ। জার্মানির সামগ্রিক গথিক ভাস্কর্য ফ্রান্সের তুলনায় অনেক বেশি মাত্রায় নাটকীয় এবং প্রকৃতিবাদী। বামবার্গ ক্যাথিড্রালের ভাস্কর্যে এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায় যা সম্ভবত রেইমসের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। স্পেনের গথিক ক্যাথিড্রাল বার্গোস, লিয়োন এবং টোলেডোতে ফরাসি শৈলী অনুসরণ করা হয়েছিল। স্পেনে ভাস্কর্যকে রং করার যতটা প্রচলন ছিল ততটা অন্য কোনো দেশে হত না। ব্রিটেনের সরল এবং সংযমী গথিক স্থাপত্য রীতি ফ্রান্সের থেকে স্পষ্টতই আলাদা। ব্রিটেনের নিজস্ব গথিক শৈলীর প্রথম প্রকাশ ঘটে ক্যান্টারবারি ক্যাথিড্রালে দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ পর্বে। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ওয়েস্ট মিনিস্টার অ্যাবি এবং সালিসবারি ক্যাথিড্রালের পরিকল্পনা ছিল ব্যতিক্রমীভাবে সুন্দর এবং যুগের ধারামণ্ডিত। ইতালিতে গথিক শৈলী কখনোই আন্তরিকভাবে গৃহীত হয়নি।

অন্যদিকে গথিক পেন্টিং অধিকাংশই হারিয়ে গেছে। টিকে আছে একমাত্র পাণ্ডুলিপি অলংকরণ (Illumination)। তবে এতে ধ্রুপদি গ্রিক ও রোমান রীতির হিউম্যান ফিগার ব্যবহার করা হলেও বাস্তবসম্মত কায়দায় মুখ, হাত, ভঙ্গি ইত্যাদি আঁকা হয়েছে। কাঠের তলে এগ টেম্পারায় ছবিও আঁকা হয়েছে।

গথিক রিভাইভাল (Gothic revival)

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত ইংল্যান্ড এবং আমেরিকায় ব্যাপকভাবে গথিক স্থাপত্যের পুনরুজ্জীবন ঘটে। ইংল্যান্ডে গথিক রূপের নবজন্ম ঘটে ছেলেখেলার মতো করে এমনকি ঠাট্টার মানসিকতা নিয়ে। যেমন টুইকেনহামের কাছে স্ট্রবেরি হিলে হোরাস ওয়ালপোল নিজের ভিলাকে নিজেই 'খেলনা বাড়ি' বলে বর্ণনা করেছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিক থেকে বেশ আন্তরিকতার সঙ্গে

এই শৈলীর প্রয়োগ হতে শুরু করে। ঘটনাক্রমে শুধুমাত্র গির্জাই নয় অন্যান্য সরকারি ও বেসরকারি সব ধরনের বাড়িতেই এই শৈলীর ব্যবহার করা হয়েছিল। এই পর্যায়কে নিওগথিকও বলা হয়।

গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুল (Government Art School) গভর্নমেন্ট স্কুল অফ আর্ট অ্যান্ড ক্রাফ্‌ট। উনবিংশ শতাব্দীর ঔপনিবেশিক ভারতে এর প্রতিষ্ঠা। কলকাতায় দ্বিতীয় শিল্প বিদ্যালয় স্কুল অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্ট স্থাপিত হয় ১৮৫৪-তে। প্রথম শিল্প বিদ্যালয় মেকানিক্স ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা হয় ১৮৩৯-এ। ১৮৫৪ সালের ২ মার্চ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ইঞ্জিনিয়ার কর্নেল ই. গুডউইন কলকাতায় বেথুন সোসাইটি আয়োজিত একটি সভায় পঠিত এক প্রবন্ধে তরুণদের মধ্যে ব্যবহারিক শিল্প শিক্ষার প্রয়োজনে শিল্প বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব করলে 'সোসাইটি ফর দি প্রমোশন অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্ট' গঠিত হয়। এই সোসাইটির উদ্যোগেই পাইকপাড়ার রাজাদের গরানহাটার বাড়িতে অর্থাৎ বর্তমান বিডন স্কোয়ার বা রবীন্দ্রকাননের চিৎপুর রোডে স্থাপিত হয় 'দি ক্যালকাটা স্কুল অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্ট'। এই বিদ্যালয়ের পাঠ্য তালিকায় ছিল মডেল, অবজেক্ট ও নেচার স্টাডি, আর্কিটেকচারাল ড্রয়িং, এচিং, উড এনগ্রেভিং, লিথোগ্রাফি, পটারি, মোল্ডিং, ফোটোগ্রাফি ইত্যাদি। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলায় বেশির ভাগ মানুষই ভোগ্যপণ্যের সঙ্গে ছবি আঁকার গুণগত পার্থক্য, আর্ট এবং ইন্ডাস্ট্রি কী তা বুঝতেন না। এই রকম একটা পরিস্থিতিতে সদস্য ও শুভানুধ্যায়ীদের চাঁদায় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হল। কিন্তু ক্রমে ওই সীমিত আয়ে খরচ চালানো অসম্ভব হয়ে পড়লে পরিচালন সমিতি বিদ্যালয় অধিগ্রহণ করার জন্য সরকারের কাছে আবেদন জানান। সরকার তখন একজন যোগ্য ব্যক্তিকে অধ্যক্ষ করার অন্যতম শর্তে শিল্প বিদ্যালয়কে অধিগ্রহণে সম্মত হন। এই পরিপ্রেক্ষিতে সাউথ কেনসিংটন স্কুল অফ ডিজাইনের সুপারিন্টেন্ডেন্ট ডক্টর রেডগ্রেভ এর মনোনীত প্রার্থী হেনরি হোভার লক ১৮৬৪ সালের ২১ জুন ক্যালকাটা স্কুল অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্টের সুপারিন্টেন্ডেন্ট পদে যোগ দেন। অতঃপর বিদ্যালয়টি সরকারিভাবে অধিগৃহীত হয় এবং সোসাইটির হাত থেকে এর পরিচালনভার চলে যায় সরকারের অধীনে। বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য সরকাব একটি উপদেষ্টা পর্ষদ গঠন করেন। ১৮৬৫ সালে বিদ্যালয়টি সরকারিভাবে অধিগৃহীত

হলে স্কুল অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্টের বদলে নতুন নাম হয় গর্ভনমেন্ট স্কুল অফ আর্ট। স্কুলটিও উঠে আসে ১৬৬ নং বৌবাজার স্ট্রিটের বাড়িতে। লক সুষ্ঠু পঠনপাঠনের উদ্দেশ্যে শিক্ষণীয় বিষয়গুলিকে কয়েকটি ক্রমিক পর্বে বিন্যস্ত করেন। যেমন—বুনিয়াদি রেখাঙ্কন, উচ্চতর মুক্ত অঙ্কন, আলোছায়া সমন্বিত মুক্ত অঙ্কন। যন্ত্রের সাহায্যে জ্যামিতিক রূপ অঙ্কন, রং দিয়ে অঙ্কন (প্রাথমিক স্তর), রং দিয়ে অঙ্কন (উচ্চতর স্তর), মাটির মূর্তিকলা, বুনিয়াদি নকশা, কারিগরি নকশা, লিথোগ্রাফি, কাঠ খোদাই, আলোকচিত্র। লক প্রবর্তিত এই পদ্ধতি হল আকাদেমিক রীতি। এই সময়ের দুজন বিশিষ্ট ছাত্র শিল্পী হলেন অন্নদাপ্রসাদ বাগচী এবং শ্যামাচরণ শ্রীমানী। লকের পর স্কুলের অধ্যক্ষ হন জবিন্স। জবিন্সের সময় ১৮৯৩ সালে স্কুল ও তার গ্যালারি উঠে আসে চৌরঙ্গি রোডের বর্তমান বাড়িতে। ১৮৯৬ সালে আরনেস্ট বেনফিল্ড হ্যাভেল অধ্যক্ষ পদে যোগ দেন এই পর্যন্ত প্রায় চার দশক শিল্প শিক্ষার আদর্শ ছিল ইউরোপীয় শিল্পরীতি পদ্ধতি। হ্যাভেল ভারতীয় শিল্পকলার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তিনি মনে করতেন ভারতের মতন দেশে ইউরোপীয় শিল্পরীতির শিক্ষাধারায় শিল্পকলার প্রসার ঘটবে না। তিনি যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নিয়ে ভিক্টোরীয় আকাদেমিক শিল্প পদ্ধতির বদলে প্রাচ্যদেশীয় কলা শিল্পের আদর্শের শিল্প শিক্ষা রীতি প্রবর্তন করেন। হ্যাভেল সমগ্র শিল্পশিক্ষাকে কারুশিল্প এবং চারুশিল্প এই দুই ভাগে ভাগ করলেন। এর ফলে ছাত্রদের মধ্যে চরম অসন্তোষও দেখা যায়। বহু ছাত্র স্কুল ছেড়ে চলে যায়। ১৯০৫ সালের ১৫ আগস্ট স্কুলের উপাধ্যক্ষের পদে যোগদান করেন শ্রী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পরে তিনি অস্থায়ী অধ্যক্ষ হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে পার্সি ব্রাউন অধ্যক্ষ পদে যোগ দেন। ব্রাউনের পর স্থায়ী অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন মুকুল দে। মুকুল দের পরে অধ্যক্ষ হন রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। ১৯৫২-তে আর্ট স্কুলকে কলেজে রূপান্তরিত করা হয়। নাম হয় গভর্নমেন্ট কলেজ অফ আর্ট অ্যান্ড ক্রাফ্‌ট। ১৯৮৪ সালে এখানে ডিগ্রি কোর্স প্রবর্তিত হয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে। আর ১৯৯৯- তে চালু হয় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি কোর্স।

গাড়োয়াল স্কুল বর্তমানে উত্তরখণ্ডের একটি অংশ। সদর শহর শ্রীনগর। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই গাড়োয়াল রাজ্যে গড়ে ওঠা একটি বিশিষ্ট শিল্প ঘরানা গাড়োয়াল স্কুল নামে পরিচিত। গাড়োয়াল

চিত্রকলার সঙ্গে মুঘল চিত্রকলার সম্পর্ক আছে। তার কারণ ১৬৫৮ সালে একজন মুঘল রাজপুত্র পালিয়ে গাড়োয়ালে আসেন এবং গাড়োয়াল রাজার আশ্রয় পান। তবে তিনি বড়ো মাপের শিল্পী ছিলেন না। ১৭৭১ সালে মোলারাম নামে একজন শিল্পীর নাম পাওয়া যায়। কেউ কেউ তাঁকে বড়োমাপের শিল্পী বলেছেন আবার অনেকে তাঁকে সাধারণ মানের শিল্পী বলেছেন। যেমন আর্চার বলেছেন মোলারামের নামে যে সব ছবি পাওয়া যায় তার কোনোটাই মোলারামের আঁকা নয়। সাধারণভাবে রাজপুত চিত্রকলাকে দুটো ভাগ করা হয়। রাজস্থানী ও পাহাড়ি। এই পাহাড়ি চিত্রকলারই একটি ভাগ হল গাড়োয়াল চিত্র। স্বভাবতই কাংড়া, গুলের, বাশোলি, চাম্বা প্রভৃতি পাহাড়ি রাজ্যগুলির চিত্ররীতি পরস্পর সম্পর্ক যুক্ত। ১৮১৬ সালে গাড়োয়ালের রাজা হন সুদর্শন শাহ। তিনি কাংড়ার মেয়ে বিয়ে করেন। সেই সময় তাঁর দরবারে উতু শা নামে একজন বিখ্যাত শিল্পী আসেন। কাংড়ারও বেশ কয়েকজন শিল্পী এসে তাঁর দরবারে ছবি আঁকেন। সুদর্শন নিজে চিত্রকলার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ১৭৭৫ সালের পর গাড়োয়ালে যে সব ছবি আঁকা হয় তার প্রথম দিকের ছবিতে গুলেরের প্রভাব থাকলেও বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন দেখা যায়। যেমন মুখের আদলের বদল এবং তুলনামূলক জোরালো রং, কড়া নীল রঙের সঙ্গে লাল ও সবুজ রঙের ব্যবহার, ফিগারগুলি ছকবদ্ধ হয়, আকাশ হয় ঘন নীল রঙের। আবার ১৮৩০ সাল থেকে গাড়োয়াল চিত্রকলা অনেকটাই কাংড়া রীতির সঙ্গে মিলেমিশে যায়।

গান্ধার শিল্প

খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে অশোকের সাম্রাজ্য ভেঙে অনেকগুলি আঞ্চলিক রাজ্য গঠিত হয়। সেই সঙ্গে বুদ্ধধর্ম চর্চারও বহু গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র গড়ে ওঠে। উত্তর পশ্চিমে গান্ধার রাজ্য তার অন্যতম। পারসিক বিজয়ের পর গান্ধারের ভাগ্য বর্তমান আফগানিস্তান ও তাজাকিস্তান অঞ্চলের অন্তর্গত ব্যাকট্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। ব্যাকট্রিয়া ছিল একটি কসমোপলিটন অঞ্চল। এখানে পারসি, গ্রিক, শক, পহ্লব প্রভৃতি জাতির বসবাস ছিল। মৌর্যদের পতনের পর আলেক্সান্দারের উত্তরাধিকারী কিছুদিন এই অঞ্চল শাসন করেছিলেন। ইন্দো-গ্রিক রাজা মেনেন্দার সম্ভবত বৌদ্ধধর্মী ছিলেন। আলেক্সান্দারের সঙ্গে এশিয়া মাইনর দিয়ে ইরান থেকে


নং ৮৫ বোধিসত্ত্ব। গান্ধার স্কুল। খ্রিস্টীয় শতাব্দী। ৩ ফুট ১১ ইঞ্চি।

মধ্য এশিয়া হয়ে ইন্দো-গ্রিক রাজাদের রাজত্বকালে হেলেনীয় শিল্প গান্ধারে এসে পৌঁছায়। খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীতে তক্ষশীলাতে কুষাণদের আবির্ভাব ঘটে। কুষাণরা ছিলেন চিনের উত্তর পশ্চিম সীমান্তের ইউ. চি. জাতির শাখা। কুষাণদের প্রথম দলপতি কদফিসেস গান্ধার জয় করেন। কনিষ্কের রাজত্বকালে কুষাণ সাম্রাজ্য চরম উন্নতি লাভ করে। কনিষ্ক বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন। এই সময় বৌদ্ধ ধর্ম দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায়। সংস্কারপন্থীরা ছিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ তাঁরা মহাযান বলে পরিচিত হন। বাকিরা হীনযান। মহাযানরা বুদ্ধের মূর্তি পুজো সমর্থন করেন। সম্ভবত এর ফলশ্রুতিতে ভারতে প্রথম বুদ্ধ মূর্তি নির্মিত হয় গান্ধার শিল্পে। কুমারস্বামী ও ফুশেরের অভিমত হল গান্ধার বুদ্ধমূর্তির কল্পনা এসেছে গ্রিক অ্যাপোলো মূর্তি থেকে। তবে তা সরাসরি নয় অর্থাৎ কোনো গ্রিক শিল্পী এসে তৈরি করেননি। এই অঞ্চলে সেইসময় বিদ্যমান শিল্পরীতির মধ্যেই এর উদ্ভব। তবে একথা বলা যায় ইন্দোসিথিয়ান অভিজাতদের ঔপনিবেশিক ধ্যানধারণা গান্ধার শিল্পকে নিয়ন্ত্রিত করেছিল। গান্ধার বুদ্ধমূর্তির অবয়ব সুস্বাস্থ্যবান যুবকের শরীর। অর্ধনিমীলিত চোখ, নাকের ডগায় দৃষ্টিনিবদ্ধ। কোনো মূর্তিতে গোঁফ আছে। কাঁধের দুই দিকের কাপড় আছে। যা মথুরা মূর্তিতে নেই। মথুরা মূর্তিতে কাঁধের একদিকে কাপড়। গান্ধার শিল্পে কঙ্কালসার বুদ্ধমূর্তি পাওয়া গেছে। অর্থাৎ তপস্যায় বুকের পাঁজর বেরিয়ে গেছে। চোখ কোটরে ঢুকে গেছে। কিন্তু বুদ্ধকে এভাবে দেখানো ভারতীয় ধারণার সঙ্গে খাপ খায় না। পণ্ডিতি বিতর্ক থাকলেও একথা অনেকেই মনে করেন যে, সমকালীন মথুরা ভাস্কর্যের বুদ্ধপ্রতিকৃতিকলার ক্ষেত্রেও গান্ধার শিল্পের অবদান আছে। কেন-না বোধিসত্ত্বের মূর্তির সৃষ্টি যে-যক্ষের ধারণা থেকে তা গান্ধার রাজ্যে অনেক আগে থেকেই প্রচলিত ছিল। কুষাণ ভাস্কররা মুদ্রার শৈলীকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলেন। গান্ধার শিল্প ভারতীয় মূর্তি কলায় নিখুঁত অ্যানাটমিক্যাল বৈশিষ্ট্যের প্রয়োগ ঘটিয়েছিল।

গাম (Gum)

একরকম আঠালো পদার্থ যা বিভিন্ন উদ্ভিদ থেকে পাওয়া যায়। গাম জলে গলে যায়। আঠা এবং রঙের বাইন্ডার হিসাবে গাম ব্যবহার করা হয়। যেমন জল রঙে বাইন্ডার হিসাবে গাম অ্যারাবিক ব্যবহার করা হয়। গাম অ্যারাবিক হল অ্যাকেশা বা বাবলা গাছের আঠা। আবার প্যাস্টেলে যে বাইন্ডার ব্যবহার

করা হয় তা এশিয়া এবং ইউরোপে জন্মায় এরকম একজাতীয় উদ্ভিদ ট্র্যাগাকান্থ থেকে প্রাপ্ত আঠা।

গাম অ্যারাবিক (Gum arabic)

গাম দেখুন।

গিল্ড (Guild)

মধ্যযুগে শিল্পী, কারিগর, মিস্ত্রি প্রমুখদের সমিতি বা সমবায়। এ ধরনের সমিতি বা সমবায় গঠিত হত সম্পূর্ণ যাযকতন্ত্রের ভিত্তিতে। শিল্পকলা বা কারিগরি বিদ্যা শিক্ষার জন্য ইচ্ছুকদের এখানে শিক্ষানবিশি করতে হত। শিক্ষানবিশি শেষ হলে এখানে জুটত শ্রমিক বা জার্নিমেনের কাজ। তারপর সব শেষে স্বাধীনভাবে কাজ করার জন্য শিল্পী বা কারিগর বৃত্তি লাভ করা যেত। বস্তুত আকাদেমি স্থাপিত হবার আগে পর্যন্ত এই গিল্ডই ছিল আদি আর্ট স্কুল। বৃত্তি লাভ করার পরেই একমাত্র স্বাধীন পেশায় কেউ নিজেকে নিযুক্ত করতে পারতেন। যদিও সেক্ষেত্রেও গিল্ডের নিয়মকানুন মেনেই তা করতে হত। ঊনবিংশ শতাব্দীতে একটু শিথিল ভাবে গিল্ড ব্যবস্থার পুনরুজ্জীবন ঘটানোর প্রচেষ্টা হয়েছিল আর্টস অ্যান্ড ক্রাফট্স মুভমেন্ট-এর নামে। যা পরবর্তীকালে আর্ট ন্যুভো নামে আখ্যায়িত হয়।

গুজরাটি চিত্রকলা

ভারতের চিত্রকলার ইতিহাসে গুজরাটি চিত্রকলার স্থান অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ। অজন্তা-বাঘের যুগ এবং পরবর্তী রাজপুত-মুঘল ও ডেকানি যুগের মধ্যবর্তী পর্যায়ের চিত্ররীতির সন্ধান হল এই গুজরাটি চিত্রকলা। তবে গোড়ার দিকের এই চিত্রকলার নিদর্শন বিশেষ কিছু নেই। যা পাওয়া যায় তাহল জৈনপুঁথির অন্তর্গত অণুচিত্র। এইজন্য গুজরাটি চিত্রকলা বলতে অনেকসময়ই জৈন ধর্মীয় চিত্রকলার রেওয়াজ ছিল। তবে একই রীতিতে বৈষ্ণবধর্ম বিষয়ক ছবি পাওয়ায় এখন আর নিছক জৈন চিত্রকলা বলা হয় না। গুজরাটি ছবিকে পশ্চিম-ভারতীয় চিত্রকলা বলে অবহিত করার প্রবণতাও লক্ষ করা যায়। কিন্তু পশ্চিম ভারতীয় অনেক রীতি থেকে গুজরাটি রীতি স্পষ্টতই আলাদা।

গুজরাটি রীতির ছবির প্রধান রূপ হল অণুচিত্র। তা হল বাংলা, উড়িষ্যা, নেপালের মতোই হাতেলেখা পুঁথিতে অলংকরণ বা চিত্রণ। বিষয়বস্তু এবং শৈলীও ধারাবাহিক সূত্রে প্রাপ্ত। বাংলাদেশেরই মতো পুঁথির পাতায় চৌকো


নং ৮৬. মাণ্ডু কল্পসূত্রের পাতা। ১৪৩৯ খ্রিস্টাব্দ।

চৌকো জায়গা ছেড়ে দিয়ে পুঁথি লেখা হত। পরে শিল্পীরা ওই ছেড়ে যাওয়া জায়গাগুলিতে ছবি আঁকতেন। কুমারস্বামীর মতে গুজরাটি চিত্র তুলনামূলক বিচারে পূর্বদেশের তুলনায় উঁচু স্তরের। অবশ্য দীর্ঘকালের চর্চার মধ্য দিয়েই এই কৃতিত্ব অর্জিত হয়েছিল।

গুজরাটের এই পুঁথিচিত্রণ মূলত জৈনশাস্ত্র ভিত্তিক। মহাবীর এবং অন্যান্য জৈন তীর্থঙ্করদের জীবনচরিতকে বলা হয় 'কল্পসূত্র'। কল্পসূত্রই এইসব চিত্রের বিষয়। লেখক এবং চিত্রকর আলাদা আলাদা ব্যক্তি ছিলেন। অনেক সময়েই চিত্রকর ছবির মূল বক্তব্য বা ছবির পরিচয় নীচে লিখে রাখতেন। ছবির সঙ্গে লেখার প্রায় কোনো সম্পর্ক নেই। এটা বিশেষভাবে প্রযোজ্য 'কালিকাচার্য কথা' নামে একটি তালপাতায় পুঁথির ক্ষেত্রে। এটি একটি গুজরাটি কাব্যপুঁথি। এর বিষয় হল জৈনসন্ন্যাসী কালিকা এবং দুষ্ট রাজা গর্দভিল্লার কাহিনি ও তার চিত্রণ। তালপাতায় লেখা একটিমাত্র 'কল্পসূত্র' পাওয়া গেছে আনুমানিক ১২৩৭ খ্রিস্টাব্দে লেখা।

কল্পসূত্র হিসাবে এটাই সবচেয়ে প্রাচীন নমুনা। বাকি সব কল্পসূত্র কাগজে লেখা। কাগজের পুঁথিগুলির ছবিগুলি দক্ষ হাতের মনে হলেও তা মানের দিক থেকে উঁচু নয়। এর মধ্যে কিছু ছবি আছে যা পাতার কোনায় আঁকা মূল চিত্রের স্কেচ। এই স্কেচ খুবই ছোটো যা একটি আঙুলের নখ পরিমাণ-আকারের। স্বভাবতই অসম্ভব যত্ন ও পরিশ্রম করে আঁকা। এইসব ছবিতে বিভিন্ন দৃশ্যের বর্ণনা এবং অসংখ্য ধরনের পরিবেশের প্রাচুর্যময় উপস্থাপনা বিস্ময়কর। সমসাময়িক সমাজজীবনের প্রতিফলনও ঘটেছে এই সমস্ত চিত্রগুলিতে। 'বসন্তবিলাস' নামে একটি জৈনকাব্য পাওয়া গেছে। যা ১৪১৫ খ্রিস্টাব্দে আমেদাবাদে রচিত। 'বসন্তবিলাস' অন্যান্য গুজরাটি পুঁথি থেকে আলাদা। এটা অনেকটা বাংলাদেশের জড়ানো পট বা Scroll-এর মতো। লম্বায় ৩৫ ফুট ৬ ইঞ্চি এবং চওড়ায় ৯ ইঞ্চি। তুলট কাগজে আঁকা ৭৯টি ছবি দিয়ে সাজানো। এর বিষয়ের মূল লক্ষ্য হল বসন্ত ঋতুর গৌরব ও সৌন্দর্য বর্ণনা।

গুজরাটি ছবিতে মানুষের শরীরের কাঠামোর উপস্থাপন, রীতি একটু অন্যরকম। মুখের ভঙ্গি 'ফ্রন্টালিটি' কিন্তু দৃশ্যমান 'থ্রি কোয়ার্টার' বা তিন চতুর্থাংশ। যাতে ওপাশের চোখ এমনকি নাকও মুখের ক্ষেত্র থেকে বাইরে বেরিয়ে থাকে। অষ্টাদশ শতাব্দীর ইলোরার চিত্রেও এরকম নাক ও চোখের অঙ্কন দেখা যায়। আবার এর সঙ্গে মিশরীয় এবং আসিরীয় রীতির সাদৃশ্যকেও উপেক্ষা করা যায় না। বাণিজ্যিক সূত্রে এই রীতির ধারণা ভারতে এলেও আসতে পারে। কেন-না তিব্বতীয় ঐতিহাসিক লামা তারানাথ যে ধরনের শিল্পরীতিকে প্রাচীন পশ্চিমী রীতি বা ওয়েস্টার্ন স্কুল বলে উল্লেখ করেছেন এটা সম্ভবত তারই শাখা। যাকে বলা যায় ইলোরার পারমার গোষ্ঠীর সময়কার আঁকা প্রাচীন চিত্রের উত্তরপর্ব।

গুজরাটি চিত্রে গাছ আঁকা হয়েছে সাধারণভাবে বরফির মতো করে। কলা এবং আম গাছ বাদে সব গাছই বেশ অগোছালো ও আড়ষ্টভাবে অঙ্কিত। অজন্তা ও ইলোরার ছবি ছাড়া অন্যান্য ভারতীয় ছবিতে এই ধরনের গাছপালা দেখা যায়। গুজরাটি ছবিতে পুরুষদের পোশাক হল সাধারণভাবে লম্বা অথবা খাটো ধুতি, কাঁধ উড়নি, মাথায় রত্নখচিত নানা

ধরনের পাগড়ি, মেয়েদের চুলে বা খোঁপায় ফুলই বেশি। ছবিতে মেয়েদের পাজামা, ওড়না তখনও আসেনি। বরং তাঁদের পোশাক অজন্তারই মতো। এই সময়ের বৈষ্ণব ধর্ম প্রভাবিত ছবিতেও এই রীতি দেখা যায়।

গুজরাটি শিল্পীরা তালপাতায় ছবি আঁকার সময় প্রথমে সিঁদুর রঙের প্রলেপ লাগাতেন। তার ওপর মোটা তুলিতে রঙের বর্তন দিয়ে মূর্তির অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মডেলিং করে নিতেন। এর পরে আউটলাইন দিতেন। কখনো-সখনো ওয়াশ পদ্ধতিও ব্যবহার করা হত মডেলিং করার জন্য। তালপাতার ওপর সূক্ষ্ম তুলি চালনার পরিচয় গুজরাটি চিত্রে দেখা যায় না। সিঁদুর রং ছাড়াও হলুদ, নীল, সাদা, সবুজ, সোনালি রংও ব্যবহার করা হয়েছে ব্যাপকভাবে। গুজরাটি ছবির ফিগারগুলির পায়ে, ঠোঁটে লাক্ষার প্রলেপ দেখা যায়।

গুজরাটি চিত্রের মূল উৎস হল জৈন ধর্মাচার। বৌদ্ধ শিল্পের আদি উৎস তাই। সেখানে কঠোর ধর্মীয় নিয়ন্ত্রণ সত্ত্বেও নানা ভাব, ভঙ্গি, মুদ্রা, প্রাকৃতিক দৃশ্য ব্যবহারের মধ্য দিয়ে নতুন নতুন আঙ্গিকের উদ্ভাবন করতে বৌদ্ধ শিল্পীরা সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু এই দিক দিয়ে গুজরাটি শিল্পে কোনো নতুন আঙ্গিকের উদ্ভব ঘটেনি। গুজরাটি চিত্রের অন্যতম দুর্বলতা হল পরিপ্রেক্ষিত ব্যবহারের অভাব। ফলে ছবির সব কিছু একই 'লেভেল'-এ থাকে। এর পেছনে ছিল—একজনের দেহ বা দেহাঙ্গ অন্য কোনো মূর্তির দ্বারা ঢাকা পড়বে না—এই নির্দেশ। এছাড়াও 'বিষ্ণুধর্মোত্তরম' গ্রন্থের নির্দেশ 'সম্মুখত্বম্ অথ-ঐতেষাম্ চিত্রে যত্নাদ্ বিবর্জয়েৎ' (৩/৪৫/৩০) মেনে শিল্পীরা ছবি আকতেন। এই নির্দেশ অনুযায়ী মুখ আঁকতে হবে ফ্রন্টালিটি মেনে। এর ফলে প্রোফাইলেও সম্মুখবর্তিতা সম্পন্ন চোখ ব্যবহার করা হয়েছে। এসব সত্ত্বেও গুজরাটি চিত্রকলায় সহজ সরল ও সতেজ রেখায় সৃষ্ট অকপট ভাব সকল শিল্পরসিকের প্রশংসা লাভ করেছে।

গুতাই গ্রুপ
(Gutai Art Association)

১৯৫৪ সালে ওসাকাতে প্রবর্তিত জাপানি আভঁ গার্দ শিল্প আন্দোলন। এর পত্তন ঘটান জিরো ইয়োশিহারা। অন্যান্য সদস্যরা ছিলেন কাজুও শিরাগা, সদমাসা মোটোনাগা, সাবুরো মুরাকামি, শোজো শোজো শিমামোটো, ইয়াসুই সুমি, এবং অতসুকো তনাকা। এঁরা মূলত প্রদর্শনবাদী। নানা উপস্থাপনার

পাশাপাশি বিভিন্ন দ্রব্য নিয়েও এঁরা পরীক্ষানিরীক্ষা করেছেন। এছাড়াও আমেরিকান অ্যাকশন পেন্টিং-এর ধাঁচে শিল্প উপস্থাপনা, অপ আর্ট, পপ আর্ট নিয়ে কাজের মধ্য দিয়ে ইউরোপীয় আভঁ গার্দদেব সাথে এঁদের সম্পর্ক স্থাপিত হয়। যার ফলশ্রুতিতে ইউরোপেও বেশ কয়েকটি প্রদর্শনীতে এঁরা অংশ নেন। ১৯৭২ সালে ইয়োশিহারার মৃত্যুর পর এই গোষ্ঠী ভেঙে যায়।

গুপ্তযুগের শিল্প

৩২০ খ্রিস্টাব্দে বিহারে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পত্তন হয়। অখ্যাত এবং আভিজাত্যহীন উৎস থেকে উঠে এলেও ঘটনাক্রমে গুপ্তরা সমগ্র উত্তর-মধ্য ভারতে তাদের আধিপত্য বিস্তার করে। সেইসঙ্গে তাঁরা ভারতীয় শিল্পকলাকে ধ্রুপদি স্তরে উন্নীত করে। প্রাচীন মৌর্য শাসনকে ছাপিয়ে তাঁরা পাটলিপুত্রে তাঁদের রাজধানী স্থাপন করে। গুপ্তযুগকে পণ্ডিতগণ শিল্পকলা, সাহিত্য, সংস্কৃতির স্বর্ণযুগ বলে অবিহিত করে থাকেন। গুপ্ত যুগের সমৃদ্ধির শীর্ষাবস্থা আসে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের আমলে। এই সময়ে মহাকবি কালিদাসের আবির্ভাব। এই চন্দ্রগুপ্তর কিংবদন্তিতে নাম হল বিক্রমাদিত্য। যার নবরত্নসভায় অনেক মহাকবি ও পণ্ডিতগণের সমাবেশ ঘটেছিল বলে প্রচলিত আছে। বিখ্যাত বৌদ্ধ গুহা অজন্তার চিত্রকলা এই সময়েই আঁকা হয়। বিখ্যাত গুপ্ত ভাস্কর্য শৈলীর যে প্রকাশ এই সময়ে ঘটে তার উৎস ছিল মথুরাতে প্রচলিত কুষাণ ভাস্কর্য শৈলীর মধ্যেই। গুপ্ত যুগে শিল্পের আদর্শ নতুন রীতির। এই সময়েই শিল্পশাস্ত্র রচিত হয়। আরও একটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ। তা হল গুপ্তযুগে আইকনোগ্রাফি বা মূর্তিশিল্পের লক্ষণ স্থায়ী রূপ লাভ করে। আগের প্রাচীন মূর্তিতে আয়তন ছিল প্রধান গুণ কিন্তু গুপ্ত ভাস্কর্যে বক্রগতির ছন্দ এসেছে এবং তা অবশ্যই উদ্ভিদের দেহ রেখা থেকে। মথুরা-গুপ্ত শৈলী সারনাথে পরিশীলিত হয়েছে ও পূর্ণতা পেয়েছে। মাটি খুঁড়ে এরকম অসাধারণ কিছু ভাস্কর্য পাওয়া গেছে যা সিক্ত বুদ্ধ নামে পরিচিত। দেখলে মনে হবে এই মূর্তি যেন জলে ডুবে আছে। সারনাথে যে উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্তি পাওয়া গেছে তা sublimityর উজ্জ্বল নিদর্শন। এই মূর্তি চুনার বেলেপাথরে তৈরি ধর্মপ্রচারক বুদ্ধ। এই মূর্তি পরবর্তীকালেব ভারত এবং বহির্ভারতের সমস্ত বৌদ্ধ শৈলীকে প্রভাবিত করেছিল এবং একই সঙ্গে ব্রাহ্মণ্যশিল্পের ওপরেও

গুরুত্বপূর্ণ এবং দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলেছিল। গুপ্তযুগে ধাতু ঢালাই করে তৈরি বুদ্ধমূর্তি পাওয়া গেছে সুলতানগঞ্জে। তামার তৈরি এই মূর্তির সারনাথের মূর্তির মিল আছে।

গুপ্তযুগের অবস্থান ছিল দুটো ধারার ছেদ বিন্দুতে। এক হল বৌদ্ধশিল্পের পূর্ণতা প্রাপ্তি এবং অন্যটা হিন্দু মন্দিরের সৃষ্টি। পেশাদার নির্মাতারা হিন্দু মন্দিরগৃহ নির্মাণের বরাত পেলেন এবং তাঁদের বৌদ্ধস্থাপত্যের জ্ঞানকে কাজে লাগানোর সুযোগ ঘটল। শুধু মাত্র চৈত্য বা গবাক্ষই নয় পাহাড় কেটে মন্দির তৈরির কৌশল অপূর্ব কিছু মন্দির খোদাই করতে উৎসাহ দিয়েছিল। সৃষ্টি হয়েছে গল্পবলা শিল্পকলা। গুপ্ত যুগের অন্যতম মনোগ্রাহী হিন্দু মন্দির এবং বরাহ অবতার মালবের উদয়গিরিতে পাহাড় কেটে নির্মিত। বরাহরূপী বিষ্ণু সমুদ্রের হাত থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করছেন। এটা সম্ভবত চন্দ্রগুপ্ত কর্তৃক পশ্চিম উপকূলে সিথিয়ান (শক) সাম্রাজ্য বিজয় নিয়ে রাজনৈতিক রূপক। কেন-না শুধু উত্তর ভারতের ওপর আধিপত্য কায়েমেরই ব্যাপার নয়, এটা তাঁদের লোভনীয় ভূমধ্যসাগরীয় ব্যবসার দ্বারও খুলে দিয়েছিল। এছাড়া দাক্ষিণাত্যে অজন্তা গুহায় বৌদ্ধবিহারের পাথরের দেয়ালে জাতকের কাহিনি অবলম্বনে অঙ্কিত ফ্রেস্কো চিত্র গুপ্তযুগ তথা ভারতীয় চিত্রকলার অপূর্ব নিদর্শন।

গুয়াশ (Gouache)

অনচ্ছ জল রং। সাধারণ জল রঙেরই মতো কিন্তু এক্ষেত্রে রঙের body তৈরি করতে রঙের সঙ্গে নিষ্ক্রিয় সাদা গুঁড়ো যেমন বেরিয়াম সালফেট মেশানো হয়। এখন অবশ্য সাদা পোস্টার কালারও মেশানো হয়। গুয়াশে বাইন্ডার হিসাবে গাম অ্যারাবিক থাকে। সেই সঙ্গে রং ব্যবহারের গুণমান বৃদ্ধির জন্য চিনি এবং গ্লিসারিন মেশানো হয়। ওয়াশ জল রঙের থেকে বেশি ঘন এবং বেশি উজ্জ্বল। পারস্য এবং ভারতে পুঁথি চিত্রণ (manuscript illumination) এবং অণুচিত্র শিল্পীরা ব্যাপকভাবে গুয়াশ ব্যবহার করতেন। শুধরে নেওয়া যায় বলে দ্রুত প্রস্তুতিমূলক খসড়া তৈরির জন্যও গুয়াশ জনপ্রিয়। ফ্রান্সে শিল্পীরা জলরং হিসাবে প্রায়ই গুয়াশ পছন্দ করতেন।

গুলের চিত্র

গুলের হল কাংড়া কলমের আদি পর্ব। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যপর্বে কাংড়া উপত্যকার গুলেরের রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায়

কিছু হিন্দু শিল্পী মুঘলরীতির প্রশিক্ষণ নেন। তাঁরা অনুভূতিময় সুন্দর এক শিল্পশৈলী গড়ে তোলেন। গুলেরের শিল্পীদের রঙে সকালের রূপ এবং রামধনু সুন্দরভাবে ধরা পড়েছে। গুলের শব্দটা এসেছে 'গোয়ালা' থেকে। যার অর্থ রাখাল। এর পূর্বতন নামও ছিল 'গোয়ালের'। পার্বত্য পাঞ্জাবের ছোটো রাজ্য ছিল এটি। এর রাজধানী ছিল হরিপুর। আজ তা লয়প্রাপ্ত। গুলেরের ছবি ছিল মূলত দরবারি চিত্রকলা। রাজা গোবর্ধনচাঁদ ছিলেন শিল্পকলার বড়ো একজন পৃষ্ঠপোষক। ছবিতে নাম থাকত না বলে গুলেরের শিল্পীদের নাম জানা কঠিন। তার তথ্য থেকে যা জানা যায় তা হল শিউ নামে এক চিত্রকরের পরিবার গুলেরে বাস করত। এঁদের অনেকেই ছবি আঁকার কাজে অন্য রাজ্যে চলে গিয়েছিলেন। শিউর এক ছেলে মানক গুলেরে গোবর্ধন চাঁদের সময়ে ছবি এঁকেছেন। গোবর্ধন চাঁদকে নিয়ে শ্রেষ্ঠ ছবিগুলি মানকেরই আঁকা।

গোল্ডেন মিন (Golden Mean)

একে গোল্ডেন সেকশনও বলা হয়। গোল্ডেন মিন হল রীতিগত আনুপাতিক হার। যাকে তত্ত্বগতভাবে ভিশুয়াল হারমোনি বা নান্দনিক সৌন্দর্য প্রকাশের গোপন কথা বলে মনে করা হয়। গোল্ডেন মিন-এ একটি গাণিতিক সমীকরণকে কাজে লাগানো হয়। এই সমীকরণ অনুযায়ী একটি রেখা বা আকৃতিকে এমন অসমান ভাগ করা হয় যাতে ছোট অংশটির সঙ্গে বড়ো অংশটির দৈর্ঘ্যের আনুপাতিক হার বড়ো অংশটির সঙ্গে গোটা অংশটির দৈর্ঘ্যের আনুপাতিক হারের সমান। এই গাণিতিক হার হল $1 : \phi$ অর্থাৎ $1 : 1.618$ কিন্তু এটা পূর্ণ সংখ্যায় প্রকাশযোগ্য নয় বলে মোটামুটি এই হারকে ধরা হয় $8 : 13$ হিসাবে। ঐতিহাসিকেরা ক্ল্যাসিকাল যুগ থেকে আজ পর্যন্ত বহু শিল্পকর্মকে চিহ্নিত করেছেন যাতে এই সূত্রের প্রয়োগ আছে। গবেষকরাও ভিশুয়াল টেস্ট নিয়ে দেখেছেন যে বেশিরভাগ মানুষই গোল্ডেন মিন অনুযায়ী সৃষ্ট ছবির মাত্রা বিভাজনে তৃপ্ত। প্রাচীন গ্রিক ও ইজিপ্টীয়রা এই সূত্র জানতেন। গোল্ডেন মিনের যদি কোনো যৌক্তিকতা থাকে তা এই যে, ভালো শিল্পী বা ডিজাইনাররা স্বাভাবিকভাবেই এই সূত্র ব্যবহার করেন। অবশ্যই যান্ত্রিক ভাবে করেন এমন নয়, গোল্ডেন মিনের অনুপাত তাদের ভালো লাগে তাই। গোল্ডেন মিনের এই অনুপাতে কোনো ছবির সামগ্রিক ডিজাইনে স্থাপত্যের একটা অংশে বা ডিজাইনের নানা ধারা উপধারায়

দেখতে পাওয়া যায় যেমন পঞ্চদশ শতাব্দীর ফ্লোরেন্সের সান্টা মারিয়া নভেলার নানা অংশে এই সূত্র বারে বারে ব্যবহার করা হয়েছে।

গোল্ডেন সেকশন (Golden Section)

গোল্ডেন মিন দেখুন।

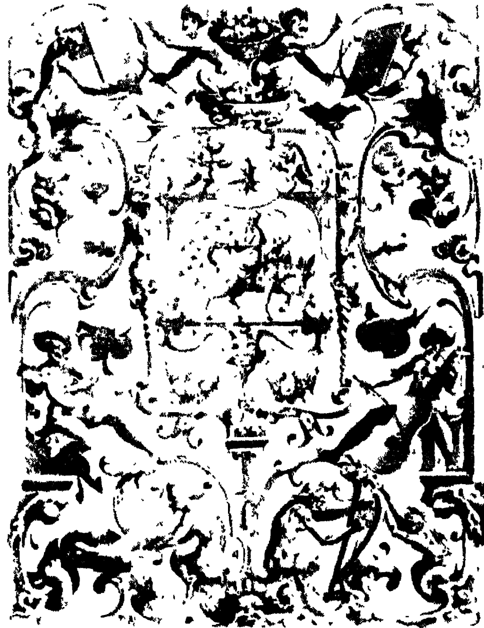
গ্যালারি (Gallery)

স্থাপত্যের ভাষায় ওপরতলায় আচ্ছাদন যুক্ত ভ্রমণ স্থান অথবা থিয়েটার বা রঙ্গমঞ্চের ওপরতলায় কমদামি আসন। কিন্তু বহুলভাবে গৃহীত অর্থ হল প্রদর্শশালা যেখানে দর্শকের জন্য শিল্পকর্ম সাজানো থাকে। পাবলিক গ্যালারি বা সর্বসাধারণের প্রদর্শশালা যা বর্তমানে শিল্পকলা দেখা বা চর্চার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্থান তার ধারণা তৈরি হয়েছিল নানা বিক্ষিপ্ত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে। প্রথমত, এমন কিছু শিল্পকর্ম আছে যার যে উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছে তার বাইরেও নিরপেক্ষ কিছু গুণ আছে। এমন অনেক মূর্তি প্রাচীন গ্রিসের ডেলফি এবং অন্য সংস্কৃতি কেন্দ্রগুলিতে জড়ো করা হয়েছিল যাদের মূল্যায়ন করতে গিয়ে বিশেষ কিছু কারণে আমরা সেই সব মূর্তিকে সৌন্দর্যবোধ বিশিষ্ট বলে স্বীকৃতি দিই। এরকম অনেক মূর্তি রোমানরা সংগ্রহ করেছিল এবং সেগুলির বহু প্রতিরূপও তৈরি হয়েছিল। ইউরোপের রেনেসাঁসের সময়ে নান্দনিক বোধের ভিত্তিতে বহু ব্যক্তিগত সংগ্রহ গড়ে উঠেছিল। একই সময়ে গির্জা এবং প্রাসাদগুলিও ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক প্রয়োজনে চিত্রকলা দিয়ে সাজানো হচ্ছিল। জনতা অনুযায়ী এই সব সংগ্রহের মধ্যে ভিন্নতা ছিল। সেই সঙ্গে একথাও মনে রাখতে হবে পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীর বিশিষ্ট বাড়িগুলি আজকের মতো ব্যক্তিগত ভাবে পারিবারিক ছিল না। সেখানে সকলের প্রবেশাধিকার থাকত। প্রায় এরকম একটি অবস্থার মধ্যে আধুনিক সংগ্রহালয়ের আদিরূপ আকার পেতে শুরু করে। নানা জায়গায় দুর্লভ বস্তুর সংগ্রহ গড়ে ওঠে। সেসবের মধ্যে ছিল ভূতাত্ত্বিক, প্রত্নতাত্ত্বিক এবং জীবনবিজ্ঞানের নানা বিরল নমুনা। তার মধ্যে কখনো-কখনো কিছু শিল্পকর্মও থাকত। যেমন ভ্রমণকারীর সংগ্রহ অথবা মানুষের দক্ষতার নিদর্শন বা সংস্কৃতির অসামান্য সব নমুনা। গ্যালারি গড়ে ওঠার পেছনে আরেকটি প্রয়োজন ছিল শিল্পকলা শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদান। এর সবচেয়ে বিখ্যাত আদিরূপ হল মেদিচি গার্ডেন। যেখানে মাইকেলাঞ্জেলো নিজে কাজ শিখেছিলেন বলে দাবি করেছিলেন।

ধারণা করা হয়েছিল যে, শিল্পীরা প্রাচীন এবং বর্তমান বিশিষ্ট শিল্পীর ছবি নকল করে কিংবা চোখে দেখে শিল্পের শৈলী এবং কৌশল শিখতে পারবে। এই একই উদ্দেশ্যই উনবিংশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডে ভিক্টোরিয়া এবং অ্যালবার্ট মিউজিয়াম গড়ে উঠেছিল। শেষ পর্যন্ত ধর্মীয় শাসনমুক্ত গির্জা মঠকে দেখেই এইসব ব্যক্তিগত সংগ্রহকে জাতীয়করণ করে গড়ে ওঠে গ্যালারি। পরে এই ধরনের গ্যালারি নির্মাণ সব সরকারেরই কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। ক্রমশ জনপ্রতিষ্ঠানগুলিও এইধরনের গ্যালারি নির্মাণ করে। যাতে মানুষ এইসব মূল্যবান সামগ্রী দেখার ও উপভোগ করার সুযোগ পান কেন-না তাঁরা ব্যক্তিগতভাবে এসব জিনিস কখনই কিনতে পারবেন না। একথা স্বীকৃত যে ছবি জাতি, ধর্ম, বর্ণ, দেশ, কালের গণ্ডি ছাড়িয়ে কথা বলতে পারে। ভারতেও স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরেই প্রতিষ্ঠা হয় ন্যাশনাল গ্যালারি অব মডার্ন আর্টের। এই গ্যালারি প্রতিষ্ঠার পরেই অমৃতা শেরগিলের শ্রেষ্ঠ কাজগুলোর সংগ্রহ স্থায়ীভাবে প্রদর্শনের ব্যবস্থা হয়। পরবর্তীকালে ভারতে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে বহু স্থায়ী সংগ্রহালয় এবং গ্যালারি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

গ্রটেস্ক (Grotesque)

এক ধরনের শৌখিন অলংকরণ বা নকশা যা একটি ফ্রেম বা প্যানেলের মধ্যে ফিগার এবং ফেস্টুনকে লতাপাতা ফুল



নং ৮৭. লুকাস কিলিয়ান : গ্রটেস্ক। নিউইস গ্রাভেসকো। নুর্খেইন। ১৬০৭।

দিয়ে যুক্ত করে তৈরি। সাধারণভাবে এই নকশা প্রতিসম বা symetrical এবং এই নকশা দিয়ে দেওয়াল বা সিলিংকে ভরাট করা হত। ইতালীয় শব্দ 'গ্রোটা' থেকে এর উৎপত্তি। যার মানে গুহা। রেনেসাঁসের শিল্পী ও স্থপতিরা মাটির নীচের ধ্বংসাবশেষ থেকে এই ধরনের অলংকরণ আবিষ্কার করেন। বিশেষ করে রোমে নিরোর 'গোল্ডেন হাউসের' সজ্জিত ঘর আবিষ্কারের পর এই শব্দটি প্রচলিত হয়। এই কায়দা সারা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়েছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীতে শিল্পী ক্রিভোল, ফিলিপিনো লিপি, ম্যান্তেইনা, সিগনোরেলি প্রমুখ এই রীতিসদৃশ পুরনো ফর্ম নিয়ে কাজ করেছেন। ষোড়শ শতাব্দীতে র‍্যাফায়েল ও তাঁর কর্মশালার সদস্যরা 'গোল্ডেন হাউস' আবিষ্কার হওয়ার পর এই শৈলী নিয়ে কাজ করতে প্রাণিত হন। তৎকালীন রোকোকো শৈলীর বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার অংশ হিসাবে গ্রটেস্ক শব্দটি কুখ্যাত বা অস্বাভাবিক অর্থে ব্যবহৃত হতে আরম্ভ করে।

গ্রাউন্ড (Ground)

গ্রাউন্ট হল পেন্টিং-এর ভিত্তি। ধারক (Support) এর ওপর কোনো একটি পদার্থের প্রলেপ লাগিয়ে গ্রাউন্ড তৈরি করা হয়। সাধারণভাবে জেসো দিয়ে এই গ্রাউন্ড তৈরি করা হয়। আরও স্পষ্ট করে বললে গ্রাউন্ড হল ধারক বা support এবং বর্ণস্তরের মধ্যে স্থায়ী বাধা। শুধু তাই নয় গ্রাউন্ড বা চিত্রপট সাপোর্টের দ্বারা রং শোষণ করাকে বাধা দেয়। এবং পাশাপাশি রাসায়নিক মিথষ্ক্রিয়া রোধ করে। সাধারণভাবে গ্রাউন্ড সাদা হয়। তবে রঙিন গ্রাউন্ডও হতে পারে তবে তা শিল্পীর পছন্দ অনুসারী। সাধারণভাবে তিন ধরনের গ্রাউন্ড বেশি প্রচলিত। অ্যাক্রিলিক জেসো, সাধারণ জেসো এবং হোয়াইট লেড পেন্ট। অ্যাক্রিলিক জেসো অ্যাক্রিলিক, গুয়াশ এবং প্যাস্টেল প্রভৃতি রঙের জন্য উপযুক্ত। সাধারণ জেসো এগ টেম্পারা এবং তেল রঙের শিল্পীদের জন্য কার্যকারী। হোয়াইট লেড পেন্ট বা যেকোনো ধরনের অয়েল প্রাইমার তেল রং এবং অ্যালকিড পেন্টের জন্য উপযুক্ত। হোয়াইট লেড পেন্ট বা অয়েল প্রাইমার ক্যানভাসে লাগিয়ে গ্রাউন্ড তৈরি করা হয়। সেক্ষেত্রে ক্যানভাসে আগে অবশ্যই কোনো একটা আঠার প্রলেপ লাগিয়ে শুকিয়ে নিতে হবে যাতে কাপড়ের আঁশ প্রাইমারের সংস্পর্শে আসতে না পারে।

এছাড়াও গ্রাউন্ড বলতে এচিং-এর প্লেটে অ্যাসিড নিরোধক আস্তরণকেও বোঝান হয়। যাতে ধাতুর পাতে অঙ্কিত নকশা

বা ছবির রেখা বা ঈপ্সিত অংশ ছাড়া অবাঞ্ছিত কোনো ক্ষয় না হয়। এই গ্রাউন্ড প্লেটটিকে সুরক্ষা দেয়। এচিং-এর ক্ষেত্রে গ্রাউন্ড হিসাবে ব্যবহার করা হয় মৌচাকের মোম, আলকাতরা জাতীয় পর্দা এবং রজন। এচিং প্লেটের ক্ষেত্রে কিছু গ্রাউন্ড আছে যা চাকা চাকা অবস্থায় পাওয়া যায়। আবার কিছু গ্রাউন্ড আছে যা তরল অবস্থায় পাওয়া যায়। ফিনিশ অবস্থায় গ্রাউন্ড লেখার কাগজের মতন পুরু হয়।

গ্রাফিক আর্ট (Graphic Art)

মুখ্যত কমার্শিয়াল আর্ট বা বাণিজ্যিক শিল্পকলা। যেমন যে কোনো ছাপা অর্থাৎ হরফ এবং ছবি, ভিশুয়াল কমিউনিকেশন, গ্রাফ ইত্যাদি। গ্রাফিক আর্ট কার্যত দুই ধরনের। ছাপাই শিল্প এবং দৃশ্যগত যোগাযোগের উপযুক্ত ডিজাইন। দৃশ্যপরিকল্পনার এই সব উপাদান সব ক্ষেত্রে ছাপার প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত নয়। যদিও এর মধ্যে একমাত্র ছাপশিল্পকে ভিত্তি করেই গ্রাফিক আর্ট বিকশিত হয়েছে।

গ্রাফিক আর্টের প্রধান বিষয় হল একটি মূল আদলের একাধিক প্রতিলিপি তৈরি করা। ছাঁচে তৈরি মাটি ও ধাতুর সিল ও পাত্রের ইতিহাস বহু প্রাচীন। এছাড়া রাজকার্য ও ব্যক্তিগত প্রয়োজনে সিলমোহরের ব্যবহার এসবই ছাপ শিল্পের আদি নমুনা। মধ্যযুগে বিদ্যা বা জ্ঞান চর্চার জন্য হাতে লেখা পুঁথির নকল করাতে হলে পৃষ্ঠপোষকগণ পেশাদার লিপিকার এবং শিল্পী নিয়োগ করতেন। ৭৭০ খ্রিস্টাব্দে জাপান সম্রাজ্ঞী শোতোকু বৌদ্ধমন্ত্রের উড ব্লকপ্রিন্ট ছোটো ছোটো প্যাগোডাগুলিতে পৌঁছে দেবার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তার প্রায় একশ বছর পরে চিনদেশের তুং হুয়াং-এর গুহায় পাওয়া।



নং ৮৮ লিনোলিয়াম খোদাইয়ের মুনশিয়ানা।

প্রথম মুদ্রিত বই 'হীরক সূত্র'। বইটিতে মুদ্রিত লেখা থেকে জানা যায় ওয়াং চেই ৮৬৮ খ্রিস্টাব্দের ১১ মে তাঁর মাতা পিতার প্রতি গভীর শ্রদ্ধায় এবং তাঁদের স্মৃতিকে অমর করে রাখতে এই বইটি ছেপে বিনামূল্যে বিতরণ করেছিলেন। কিন্তু এতেও দ্রুত প্রতিলিপিকরণ পদ্ধতির ব্যবহার সম্ভব ছিল না স্বাভাবিক ভাবেই। ১৪৫৬ খ্রিস্টাব্দে জার্মানিতে গুটেনবার্গ 'মুভেবেল টাইপ' তৈরি করেন। ফলে মুদ্রণ তথা গ্রাফিক আর্ট সহজ হয় এবং উন্নতির পথে অনেকটা এগিয়ে যায়। তারপর থেকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির নানা আবিষ্কার ও উন্নতি গ্রাফিক আর্টকে অনন্য উৎকর্ষে পৌঁছে দেয় যে ধারা আজও অব্যাহত। গ্রাফিক আর্টের আদি পর্বে বইয়ে বিভিন্ন বিষয় যথা নাম, ছবি ও নকশা ছাপার কাজে ব্যবহার করা হত খোদাই করে তৈরি কাঠের ব্লক। তারপরে পাথর এবং ধাতুর পাত খোদাই বা এচিং করে ছাপার কাজ হতে থাকে। ক্রমশ এই ধরনের ব্যবহারিক ও আলংকারিক মুদ্রণের বাইরে শিল্পীদের স্বাধীন কাজের একটি আলাদা জগৎ গড়ে ওঠে। প্রথম দিকে শিল্পীদের কাজে আলংকারিক রীতির প্রভাব থাকলেও ধীরে ধীরে তার মধ্যে সৃজনশীল প্রকাশই মুখ্য হয়ে ওঠে এবং তা শিল্পকলা চর্চার একটি মাধ্যম হিসাবে গৃহীত হয়। এখন এই বিভাগকে বলা হয় ছাপাই ছবি বা প্রিন্ট মেকিং।

ছাপাই ছবির চারটে পদ্ধতি। এক. রিলিফ প্রিন্টিং। এতে আছে উডকাট, উড এনগ্রেভিং, লিনো কাট ইত্যাদি। দুই. ইন্টালিয়ো প্রিন্টিং। এর অন্তর্ভুক্ত হল এচিং, ড্রাইপয়েন্ট, অ্যাকোয়াটিন্ট, মেজোটিন্ট ইত্যাদি। তিন. সারফেস প্রিন্টিং বা প্লেনোগ্রাফিক প্রিন্টিং। যেমন লিথোগ্রাফ, মনোপ্রিন্ট। চার. স্টেনসিল যথা সেরিগ্রাফ বা সিল্কস্ক্রিন প্রিন্টিং। বিজ্ঞান ও কারিগরি উন্নতির কারণে মুদ্রণের এই শাখার কেন্দ্রস্থল ছিল ইউরোপীয় দেশগুলি। পরে এসব আমেরিকা, এশিয়া সহ অন্যান্য মহাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। ভারতে আধুনিক ছাপাই ছবির চর্চা শুরু হয় অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে। সে সময় ড্যানিয়েল, বেইলি, চার্লস ডয়েলি, হাডসন, ফিবেক প্রমুখ বিদেশী শিল্পীদের প্রভাবে এবং মুদ্রণ শিল্পের প্রসারের মধ্য দিয়ে এর অগ্রগতি ঘটে। সেই সঙ্গে বহু ভারতীয় শিল্পীও এই কাজে দক্ষ হয়ে ওঠেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রতিষ্ঠিত সরকারি আর্ট স্কুলগুলির পাঠ্যক্রমে ছাপাই চিত্র অন্তর্ভুক্ত হয়।

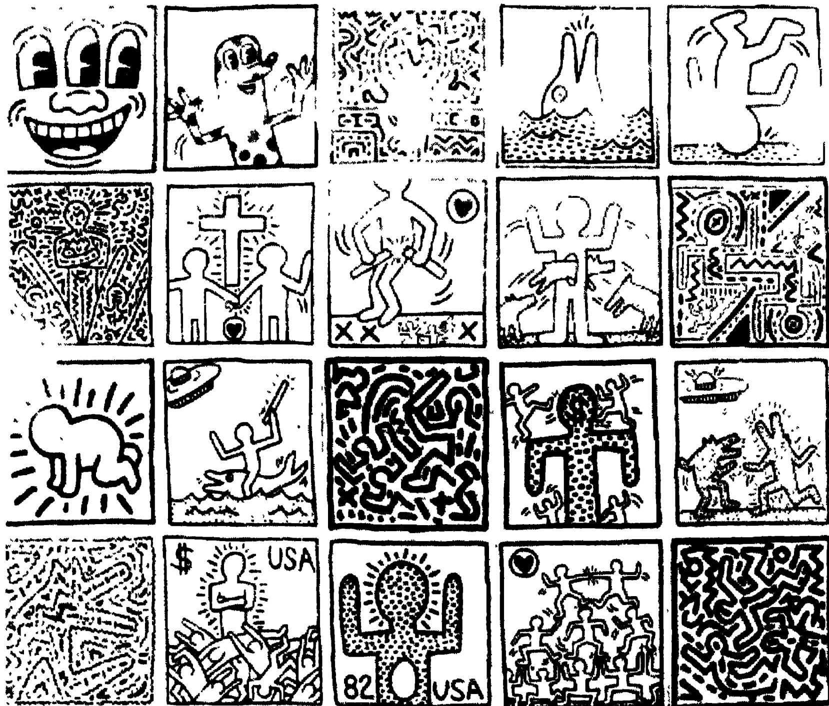
এর ফলে ছাপাই চিত্রের স্বাধীন চর্চার পরিবেশ গড়ে ওঠার সম্ভাবনা তৈরি হয়। বাংলায় ছাপাই ছবিকে মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে নন্দলাল বসুর ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

গ্রাফিতি (Graffiti)

শব্দটির উৎস ইতালীয় 'গ্রাফিতো', অর্থ আঁচড় কাটা। সাধারণভাবে প্রকাশ্য কোনো তলে বা দেয়ালে নানা ধরনের খোদাই কার্য, আঁচড় কেটে কোনো একটি আস্তরণের নীচের রং বের করে লেখা, প্রতীক, চিহ্ন বা ছবি। মধ্যযুগে এবং রেনেসাঁসের সময় এভাবে আঁচড় কেটে গিল্টি করা অথবা বহুবর্ণস্তর সম্পন্ন তলে অসংখ্য নকশা তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে গ্রাফিতি ছিল প্রায়ই অবৈধ, গোপন এবং কম বয়সিদের অপসংস্কৃতি মূলক কাজকর্ম।

বর্তমানে লিখিত গ্রাফিতির যে রূপ তা শুরু হয়েছিল আমেরিকাতে ১৯৬৮ সাল নাগাদ। এর উৎস গেটো অঞ্চলের নিম্নবর্গীয় শিল্পীদের কাজে এবং পাশাপাশি শহরে অল্পবয়সি কাজকর্মহীন যুবকদের সংস্কৃতিতে। এঁরা শহরের রাস্তাঘাটে, দেয়ালে, হোর্ডি-এ, সাবওয়েতে, বাস ট্রেনের গায়ে আঁচড় কেটে বা স্প্রে করে এক ধরনের শব্দচিহ্ন লিখে বা এঁকে রাখত।

নং ৮৯. কেইথ হ্যারিং : নিউ ইয়র্ক সিটি সাবওয়ে ড্রয়িং। ১৯৮৩। কালো বিজ্ঞাপনের স্পেসে সাদা চক।



এতে দেয়াল বা পরিবেশ নোংরা হত। তাই প্রশাসন এঁদের ধরে আটকও করত। এছাড়া চ্যাংড়া ছেলেরা তাঁদের 'হিটস' বা 'ট্যাগে' ছাপা নকশা বা নোটিশ রাখত। কখনও বা ফ্যাশন করে বা সংক্ষিপ্ত শব্দে বা সাংকেতিক নামে পরস্পরকে ডাকত। আবার এই শব্দগুলিও শহরের নানা জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে লিখে রাখত। এসবকে ব্যবহার করে তাঁরা দেয়ালে স্প্রের সাহায্যে মুরালের মতো বড়ো বড়ো ছবির ন্যায় নকশাও তৈরি করত। এসবের মধ্যে নাম লেখা না থাকলেও শৈলীর মধ্য দিয়ে তাদের চেনাও যেত। যদিও এসব শব্দ-চিহ্ন বা নকশার কোনো প্রতিবাদী উদ্দেশ্য বা কোনো অর্থব্যাঞ্জনার লক্ষ্য কোনোটাই থাকত না। সাধাণ অর্থহীন এক শিল্পরূপের সন্ধানই হয়তো উদ্দেশ্য ছিল। অথবা হয়তো বা তাঁদের উপস্থিতিকে জানান দেওয়াই ছিল আসল কথা। ১৯৭০-এর শেষভাগে বাজার এবং সংগ্রহালয়গুলি এই গ্রাফিতিকে 'অধিকার' করে। ফলে তা গ্যালারিগুলিতে জায়গা পেতে শুরু করে। জানা যায় সুইস হেরাল্ড নেগেলি এই ধরনে নামহীন কাজ প্রথম করেছিলেন এবং তিনি ধরাও পড়ে যান। বিচারে তার কারাদণ্ড হয় এবং তিনি 'স্প্রেয়ার অব জুরিখ' বলে খ্যাত হয়ে যান। পরবর্তীকালে আমেরিকা ও ফ্রান্সের শিল্পীরা গ্রাফিতির এই শিল্প আঙ্গিক ব্যবহার করে ক্যানভাসে বা বিশেষভাবে তৈরি হোর্ডিং-এ ছবি এঁকেছেন। ১৯৮০ সালের শুরুতে এই আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে। যার প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিরা ছিলেন কেথ হারিং, রবার্ট কম্বাস, স্কার্ফ, জঁ মাইকেল বাসকিয়াত, এ-ওয়ান, ফিউচুরা ২০০০, রোনি-এ কান্ট্রোন, র‍্যাসেলজি, জেমস ব্রাউন এবং ইতালির শিল্পী ফ্রানসিস্কা অ্যানিলোভা। এর রূপ ও মাধ্যমের মধ্যে নৈরাজ্যময়তা ও প্রযুক্তির মিশ্রণ লক্ষ করা যায়। কিন্তু অ্যানিলোভার মতে এই শিল্প 'ফ্রন্টিয়ার আর্ট' বা লড়াকুশিল্প এবং এর অবস্থান হল সংস্কৃতি ও প্রকৃতি এবং জনতা ও অভিজাতদের মাঝখানে তবে আমেরিকাতে যে সকল শিল্পী প্রথার বাইরে পদার্থ-মাধ্যম এবং techiques নিয়ে কাজ করে বিতর্ক সৃষ্টিতে উৎসাহ পান গ্রাফিতি আর্ট তাঁদের একটা নতুন পরিচিতি দান করেছে।

গ্রাভিয়োর (Gravure) একটি বাণিজ্যিক মুদ্রণ পদ্ধতি। এটা লেটার প্রেসের ঠিক উলটো পদ্ধতি অর্থাৎ গ্রাভিয়োরে উঠে থাকা মুদ্রণ তলের পরিবর্তে ইন্টালিয়োর মতন মুদ্রণ তল থাকে খাদে। এই খাদের

গভীরতার তারতম্যের জন্য কাগজে ছাপার সময় কালিও কম বেশি হয়। রোটোগ্রাভিয়োরে তামার সিলিন্ডার ব্যবহার করা হয়। যার পৃষ্ঠে ইমেজ এচিং করা থাকে। সিলিন্ডারটিকে কালির মধ্যে ঘুরিয়ে নেওয়ার পর ডক্টর ব্লেড নামে একটা পাত দিয়ে এর পৃষ্ঠ থেকে অতিরিক্ত কালি চেঁছে নেওয়া হয়। খাদের মধ্যে থেকে যাওয়া কালির ছাপ তোলার জন্য সিলিন্ডার এবং প্লেটের মধ্য দিয়ে কাগজকে চালান করানো হয়। এই পদ্ধতি ছবি ছাপার জন্য খুবই উৎকৃষ্ট। ছাপার পরিমাণ বেশি হলে এতে খরচ কম হয়। চিত্রকলা তথা পেন্টিং, এচিং, ফোটোগ্রাফি ইত্যাদি ছাপার কাজে শিটফেড গ্রাভিয়োর সিস্টেম খুব ভালো ফল দেয়। এতে খুবই সূক্ষ্ম ছাপার কাজ হয়। এর লাইন ১২০ থেকে ২৫০-এর মধ্যে থাকে। ২৫০ লাইন-এর ক্ষেত্রে প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে এচিং করে ৬২,৫০০ কাপ (বিন্দুর মতো গর্ত) তৈরি হয়। এই বিন্দুগুলো এত গায়ে গায়ে থাকে যে এর স্ক্রিন অস্পষ্ট হয়ে যায় এবং সেই কারণে এর ছাপার ফলাফলও হয় অন্যরকম।

গ্রিক আর্ট (Greek art)

ব্যাবিলন, মিশর, আসিরিয়ার পরে উন্নত শিল্পকলার বিকাশ ঘটেছিল গ্রিসে। স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্রকলার মহান সৃষ্টির মধ্যে নানা অভিনবত্বও রূপ পেয়েছিল গ্রিক আর্টে। গ্রিক স্থাপত্যের প্রধান উপকরণ ছিল ইট, পাথর ও কাঠ। খিলান এবং সমতল ছাদ আবিষ্কৃত না হলেও গ্রিকরা স্থাপত্যে প্রথম উন্নত উপকরণ ব্যবহার করতে শুরু করে। গ্রিক স্থাপত্যে বেশি সংখ্যায় স্তম্ভ ব্যবহার হতে দেখা যায়। গ্রিক স্থাপত্যকে দুই পর্বে ভাগ করা যায়। প্রাক হেলেনিক এবং হেলেনিক।



নং ৯০. পার্থেনান মন্দির।

প্রাক হেলেনিক পর্বটি মাইনোয়ান, মাইসেনিয় ইত্যাদি নামে চিহ্নিত। হেলেনিক পর্যায়ে ধীরে ধীরে গ্রিসের নিজস্ব শিল্পরীতি গড়ে উঠতে থাকে এবং এই পর্যায়ে দেখা যায় ডোরিক, আয়োনিক, করিন্থিয়ান এবং কম্পোজিট রীতির ভাস্কর্য। প্রথম দিকের স্থাপত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল বিশালতা এবং লালিত্যহীনতা। এই সময়ে বড় বড় পাথরের চাঁই সাজিয়ে প্রাকার বেষ্টনীর মধ্যে নগর নির্মাণ করা হত। নগরে প্রবেশের জন্য থাকত তোরণদ্বার। মাইসেনিয়ায় এরকম একটি তোরণদ্বারের দু-পাশে দুটো লাফোদ্যত সিংহ আছে যা সম্ভবত ইউরোপীয় ভাস্কর্যের প্রথম সিংহ।



নং ৯১. আনিভিসৌস অ্যাটিকা, গ্রিস : পুরুষ মূর্তি 'করোয়'। ৫৮০-৫১৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দ

হেলেনিক যুগের প্রথম দিকে মাইসেনিয়ান রীতিই অনুসৃত হয়েছিল। পরে ম্যাসিডোনিয়ানদের আধিপত্যের সময়ে ডোরিয়ান ঔপনিবেশিকরা উত্তর ও দক্ষিণ ইউরোপীয় শিল্পরীতির সঙ্গে সংযুক্ত এক নতুন শিল্পরীতির প্রবর্তন করেন। গ্রিক ভাস্কর পেরিক্লিসের সময় খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দী হল গ্রিসের স্বর্ণযুগ। সৌধ নির্মাণে ট্রবিয়েট পদ্ধতি প্রয়োগের জন্য গ্রিক স্থাপত্যে প্রচুর স্তম্ভের ব্যবহার দেখা যায়। অন্যদিকে সৌধসজ্জায় সুনিয়ন্ত্রিত ভাস্কর্যের ব্যবহার গ্রিক স্থাপত্যের আর একটি বৈশিষ্ট্য। হেলেনিক স্থাপত্য মূলত মন্দির কেন্দ্রিক। তিনটি স্তরে উন্নীত পাদপীঠের ওপর মন্দিরগুলি নির্মিত হত। কাঠের কাঠামের ওপর মার্বেল পাথরের পাটা পরপর সাজিয়ে মন্দিরের ওপর দোচালা ধরনের ছাদ নির্মাণ করা হত। দোচালা ছাদের দুই প্রান্তের ভার বহন করত দুই সারি স্তম্ভ। স্তম্ভের ওপর থাকা এনটাব্লেচার এবং ছাদের মাঝখানে বদ্ধ ত্রিভুজাকার অংশটিকে বলা হয় পেডিমেন্ট। তার ওপর ভাস্কর্য দিয়ে সাজানো ছিল সাধারণ প্রথা। ডোরিক স্থাপত্যের স্তম্ভ সাদামাটা। কোনো পাদপীঠ থাকত না। স্তম্ভের নীচের দিকের ব্যাস ওপর দিকের চেয়ে বেশি। স্তম্ভের গায়ে লম্বভাবে কুড়িটি অবতল পলকাটা হত। মাথায় থাকত নকশাহীন চৌকা অ্যাবাকাস। স্তম্ভের মাথায় কড়ি, ফ্রিজ, আর কার্নিস সহ মিলিত অংশটিকে বলা হয় এনটাব্লেচার। পার্থেনান মন্দিরটি ডোরিক রীতির একটি উজ্জ্বল নিদর্শন। এই মন্দিরের স্থপতি ছিলেন ইকটিনাস এবং ক্যালিকোটিস। আর ভাস্কর ছিলেন ফিদিয়াস। আয়োনিক স্তম্ভের উদ্ভব খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে। ডোরিকের মতো পলকাটা স্তম্ভ গোলাকার পাদপীঠে বসানো। স্তম্ভশীর্ষে দু-পাশে

দু-জোড়া কুণ্ডলী আকারের ভলিউট আয়োনিক স্তম্ভের বৈশিষ্ট্য। এর পরে আসে করিন্থিয়ান স্তম্ভ। এর দেহকাণ্ড আয়োনিকের মতোই। কিন্তু স্তম্ভমুকুট উলটানো একান্থাস পাতার সমষ্টি দিয়ে তৈরি। এই পাতার বেষ্টনী দুটি স্তরেরও হয়। গ্রিক স্থাপত্যে করিন্থিয়ান স্তম্ভের ব্যবহার অনেক কম। সামগ্রিকভাবে গ্রিক আর্ট কয়েকটি পর্বে ভাগ করে নেওয়া যায়। আর্কেইক পর্ব, ক্ল্যাসিকাল পর্ব, ক্ল্যাসিকাল উত্তরপর্ব, হেলেনিস্টিক পর্ব ইত্যাদি। খ্রিস্টপূর্ব একাদশ শতাব্দী নাগাদ মাইসেনিয়ান সংস্কৃতি ভেঙে যাবার কয়েক শতাব্দী পরে গ্রিসে সম্বদ্ধ এবং মিশ্র ধর্মীয় মতবাদ সহ জাতীয় সাংস্কৃতিক পরিচিতি তৈরি হয় যা হল হেলাস। ভূমধ্যসাগরীয় এবং ব্ল্যাক সি অঞ্চলে ব্যবসাবাণিজ্য অভিযান, কারুশিল্পের অগ্রগতি ঘটেছে। ধীরে ধীরে গ্রিক সেনা ছাউনি পত্তন এবং কার্যত উপনিবেশ গড়ে উঠেছে। আইনের ধারা বর্ধিত হয়েছে। হোমার তার কাব্য রচনা করেছেন। কিন্তু দৃশ্যকলা তেমন একটা বিকশিত হয়নি। অ্যাথেনসে কিছু ছোটো এবং মার্জিত ধরনের পটারি তৈরি হয়েছিল। অত্যন্ত সাধারণ শৈলীর এই পটারিতে ব্যবহৃত রৈখিক অলংকরণ 'প্রোটোজিয়োম্যাট্রিক' নামে পরিচিত। ক্রমশ এর থেকে পূর্ণাকারের উচ্চমানের নকশা সমৃদ্ধ 'জ্যামিতিক' ভাস তৈরি হয়। এই ভাসগুলি বিরাট আকারে এমনকি মানুষের মতো লম্বা হত। এর গায়ে সিমেট্রিক্যাল ব্যালেন্সে সারিবদ্ধ বেড়ির মতো করে, সর্পিল, জিগজাগ, ত্রিভুজ ইত্যাদি দিয়ে রৈখিক প্যাটানের নকশা আঁকা থাকত। তবে খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীতে এতে ফিগারেটিভ উপাদানের ব্যবহার শুরু হয়। প্রথম ব্যবহার হয় ঘোড়া, তারপর ছাগল, হরিণ, পাখি, কুকুর, সিংহ এবং সব শেষে মানুষ। এই সব ছবি ছিল সিলুয়েট এবং পরিকল্পিত। সে সব মানুষের মূর্তির পা হত পেশিবহুল এবং একপেশে, বুক সামনাসামনি কিন্তু মুখ একপেশে বা প্রোফাইল। নারীর স্তন হত ছোটো রেখার টানে। এই জ্যামিতিক যুগে ভাস্কর্য হত ছোটো এবং পরিকল্পিত। সেসব তৈরি হত ব্রোঞ্জে এবং টেরাকোটাতে। খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীর মধ্যপর্বে ইজিপ্টের সঙ্গে স্থাপিত সম্পর্ক পাথরের মনুমেন্টাল মূর্তি নির্মাণের মহান গ্রিক ঐতিহ্য সৃষ্টিতে নিশ্চিতভাবেই প্রাণিত করেছিল। এই সময়ের বিরাট সারিবদ্ধ মূর্তি 'কোরে' (বালিকা) এবং 'করোয়' (বালক) উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। 'করোয়' মূর্তিগুলি নগ্ন এবং

'কোরে'—বালিকাদের মূর্তিগুলি বসন পরিহিত। পুরুষ মূর্তিগুলি প্রাথমিক ভবে ইজিপশিয়ান মান অনুযায়ী হলেও নগ্নতার দিক দিয়ে তা সম্পূর্ণ গ্রিসীয়। এদের মুখেও ছিল বিখ্যাত হেঁয়ালিপূর্ণ 'আর্কেইক হাসি'। খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে আসে গ্রিক সংস্কৃতির উজ্জ্বলতম সময় যাকে বলা হয় ধ্রুপদি শতাব্দী। এই শতাব্দীতেই ছিলেন শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজেডি স্রষ্টা এইসকিলাস, সোফোক্লিস, ইউরিপিদিস, আধুনিক ইতিহাসের স্থপতি হেরোদেতস, থোকিদিদাস, নৈতিক দর্শনের প্রাণপুরুষ সোক্রেতিস, প্লেতো। পেরিক্লিসের নেতৃত্বে অ্যাথেনসে আদর্শ ধ্রুপদি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তাঁরই উদ্যোগে বিখ্যাত ভাস্কর ফিদিয়াসের সামগ্রিক নির্দেশনায় গড়ে ওঠে পার্থেনানের মন্দির। ওলিম্পিয়ার জিউসের মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ থেকে প্রাপ্ত অসাধারণ সব অংশ এবং পেডিমেন্টে করা রিলিফ ভাস্কর্য দেখে বোঝা যায় যে ক্ল্যাসিকাল শৈলীর আদি রূপ আর্কেইক রীতি থেকেই এসেছে। ক্ল্যাসিকাল যুগে শিল্পকর্মে ব্যক্তিশিল্পীদের নাম লেখা শুরু হয়েছিল। শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন ক্যালামিস, পিথাগোরাস (দার্শনিক নন), মাইরন প্রমুখ। যদিও রোমানদের অনুকৃত নকল থেকে এই সব শিল্পীদের কাজ জানা যায়। যেমন মাইরনের 'ডিসকাস থ্রোয়ার'। খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে আরও যে সব বিশিষ্ট ভাস্কর্য শিল্পীদের নাম পাওয়া যায় তাঁরা হলেন স্কোপাস, প্রাক্সিতেলস, লিসিপোস। চারশো খ্রিস্ট পূর্বাব্দের শেষ পাদে আলেক্সান্দারের মৃত্যুর পরবর্তীকালে গ্রিক আর্ট চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। অ্যাথেন্সের থেকে দূর দুরান্তরে বহু স্বতন্ত্র কেন্দ্র গড়ে ওঠে এবং গ্রিস থেকে সরে পারগামন, অ্যান্তিয়োখ, আলেক্সান্দ্রিয়া সহ বহু শহরে শিল্পচর্চা শুরু হয়। এই আলেক্সান্দ্রিয়া এবং এশিয়া মাইনরে গ্রিক প্রভাবে বিকশিত শিল্পই হেলেনিস্টিক আর্ট। এসময় শিল্পী ও ভাস্কররা অনেক স্বাধীনভাবে শিল্প সৃষ্টি করছেন। খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে প্রকৃতিবাদী বিষয়বস্তু ক্ল্যাসিকালরীতির আদর্শস্বরূপ বীরোচিত ভাস্কর্য থেকে অনেক দূরে সরে এল। সকল যুগ এবং মানসিকতার মূর্তিই ভাস্কর্যের বিষয় হয়ে উঠল। যেমন মাতাল বন্যদেবতা, বৃদ্ধ মহিলা, জেলে, একটি ছেলে পায়ের থেকে কাঁটা তুলছে যা স্পিনারিয়ো নামে পরিচিত, কৃষ্ণাঙ্গ, বর্বর, এসব কিছু ভাস্কর্যের বিষয় হয়ে উঠল। এসব মূর্তির শৈলী চূড়ান্ত বাস্তববাদী এবং এইসব ভাস্কর্যের মধ্যে এমনকি ব্যঙ্গাত্মক



নং ৯২. অ্যাথেনস অ্যাক্রোপলিস : নারী মূর্তি 'কোরে'। ৫৪০-৫৩০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ।

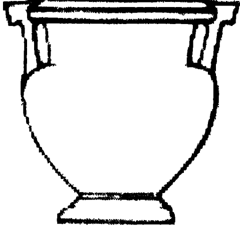
ধরন পর্যন্ত ছিল। আবার এ ধরনের মূর্তির মধ্যে ছোটো পোড়ামাটির কাজও ছিল। পলিউকতোস-এর তৈরি বিখ্যাত ভাস্কর্য 'বক্তা দেমেস্থোনিস' উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। গ্রিক শিল্পে চিত্রকলাও গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছিল। কিন্তু সেগুলি আজ আর টিঁকে নেই। পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যপর্বের শিল্পী পলিগনোতোস খুবই বিখ্যাত ছিলেন তার মুরাল চিত্রের জন্য। শিল্পী অ্যাপোলোদোর কিয়ারসকিউরোর আদি রূপ আবিষ্কার করেছিলেন। চতুর্থ শতব্দীকে ক্ল্যাসিকাল শিল্পের স্বর্ণযুগ বলে অভিহিত করা হয়। এই যুগেই ছিলেন বিখ্যাত চিত্রশিল্পী অ্যাপেলেস যিনি ম্যাসিডনের রাজা দ্বিতীয় ফিলিপ এবং তার ছেলে আলেকজান্দারের দরবারের শিল্পী ছিলেন। অ্যাপেলেসের পরেই ছিলেন নিকিয়াস।

গ্রিক শিল্পকলার আর একটি উজ্জ্বল দিক হল গ্রিক ভাসচিত্র। ৪৮০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে অ্যাথেন্সে পারসিক অভিযান ও লুণ্ঠন গ্রিসের কুম্ভকার ও ভাসচিত্রকরদের কাজে বিশেষ কোনো প্রভাব ফেলতে পারেনি। ক্ল্যাসিকাল যুগের ভাস দেখলেই বোঝা যায় যে অন্তিম আর্কেইক যুগের শিল্পের ধারাবাহিকতায় কোনো ছেদ ঘটেনি। ৪৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে হ্যাক কর্মশালাগুলিতে ব্যবহৃত ব্ল্যাক-ফিগার পদ্ধতি দ্বিতীয় শতাব্দীর নানা রং করা পাত্রের ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা হয়েছে। গ্রিক ভাসচিত্রে দু-ধরনের জমি ব্যবহার করা হত। একরকম হল ব্ল্যাক-ফিগার যার ক্ষেত্রে কালো বা ধূসর জমিতে লাল বা মেটে রং দিয়ে ফিগার আঁকা হত অন্যটি হল লাল রঙের জমিতে হালকা বা গাঢ় কালো রঙে ফিগার আঁকা হত। রেড ফিগার পদ্ধতির কৌশল উন্নত ছিল। যেমন একপেশে (profile) মুখে চোখ দেখানো হয়েছে সম্মুখ বর্তিতার মতো, কাপড়ের আঁকাবাঁকা ভাঁজ এবং আঁচল ইত্যাদির রেখা বাধামুক্ত হয়েছে। এই সময় চতুর্থ শতাব্দীর রিলিফ রেখা বাতিল হয়ে গেছে। মুক্ত অঙ্কনের প্রভাবে ডিটেলের জন্য তরল গ্লেজ ব্যবহার বেড়েছে। প্রথম দিকে তরল গ্লেজ আউট লাইনের জন্য ব্যবহার হত এবং লাল, বাদামি, সবুজ, নীল ইত্যাদি রঙের ভারী ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা হত। কিন্তু এই পদ্ধতির কিছু সীমাবদ্ধতার জন্যই মুক্ত অঙ্কনকে ছাপিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। মুক্ত অঙ্কনের বিশিষ্ট শিল্পী ছিলেন অ্যাচিলেস চিত্রকর বিশেষকরে সাদা 'লেকিথোই'-এ অনেক বেশি রং এবং ম্যাট

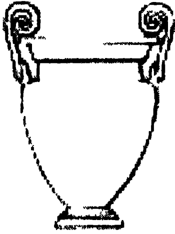
আউটলাইন ব্যবহারের জন্য তাঁর খ্যাতি ছিল।

গ্রিক ভাস (Greek vase)

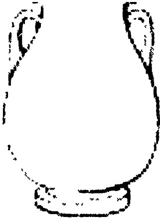
গ্রিসে খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে বিশিষ্ট ভাস্করদের মতো চিত্র শিল্পীরাও মহান শিল্প সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের শিল্পকর্ম সম্বন্ধে খুব কমই জানা গেছে। দাসোসের পলিগনোতাস পারসিক যুদ্ধের পরে অ্যাথেন্সে এবং অন্যত্র নানা ঐতিহাসিক এবং পৌরাণিক ছবি এঁকেছিলেন। প্রাচীন সেসব বর্ণনার যেটুকু আজও বেঁচে আছে তা থেকে সেই শিল্পীদের সৃজন দক্ষতা সম্পর্কে কিছুটা অনুমান করা যায়। তবে হারিয়ে যাওয়া যে নিদর্শন দেখে আমরা সে-যুগের শিল্পকীর্তি সম্বন্ধে ধারণা করতে পারি তাহল অক্ষত থাকা গ্রিক ভাসচিত্র। শ্রেষ্ঠ ভাসগুলি অসাধারণভাবে চিত্রিত। তাদের বিষয়ও এসেছে পৌরাণিক, ধর্মীয় এবং দৈনন্দিন জীবন ইত্যাদি নানা বিভাগ থেকে। পঞ্চম শতাব্দীর গোড়ার দিকে গ্রিক ভাস্কর্যের মতো ভাসচিত্রাঙ্কনেও ধাপে ধাপে শৈল্পিক বিপ্লব লক্ষ করা যায়। ভাসগুলির ভিন্ন ভিন্ন আকার ও নাম ছিল। চিত্রিত ভাসগুলিতে দু-ধরনের চিত্র বৈশিষ্ট্য ছিল। রেড-ফিগার ভাস এবং ব্ল্যাক-ফিগার ভাস। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ দুই দশকের ভাসচিত্রে নানা ভঙ্গির হিউম্যান ফিগার ব্যবহার করা হয়েছে কিন্তু তা আর্কেইক রীতির বেঢপ এবং অসঙ্গতি থেকে মুক্ত নয়। ঠিক পরের প্রজন্মের শিল্পীরা খ্রিস্টপূর্ব ৫০০-৪৮০ সালে এই অসঙ্গতি দূর করে নতুন যুগকে ধরে ফেলেন এবং সাফল্যের সঙ্গে নতুন রূপে একটি মাত্র দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্রামরত অথবা চলমান ফিগার সমূহের উপস্থাপনা ঘটান। চিত্রকর ক্লেয়োফ্রেন্দাস একটি হাইড্রিয়ার (একধরনের জলপাত্র) ওপর ট্রয়ের লুণ্ঠন দৃশ্য এঁকেছিলেন। এই চিত্রে আক্রান্তদের আতঙ্ক এবং হতাশার অভিব্যক্তি অসামান্য দক্ষতায় চিত্রিত হয়েছে। ভাস্কর ফিদিয়াস এবং পলিক্লেইতোসের সমসাময়িক চিত্রকর এচিলেসের কাছ থেকে সে-যুগের হারিয়ে যাওয়া বহু মাস্টারপিসের কথা আমরা জানতে পারি। এচিলেস ছিলেন বার্লিন চিত্রকরের ছাত্র। তিনি সাদা জমির লেকিথোই ভাস চিত্রের জন্য বিখ্যাত। এ ধরনের ভাস সমাধিতে উৎসর্গ করার জন্য ব্যবহার করা হত। এতে চিত্রিত বিষয়ও অন্ত্যেষ্টিকর্মের সঙ্গে সম্পর্কীত। এচিলেসের এই লেকিথোই ভাসচিত্রে সাদা জমির ওপরে বাদামি, কালো এবং লাল রেখা দিয়ে বিষয় চিত্রিত হয়েছে।



কলাম ক্রেটার



ভলিউট ক্রেটার



পেলিকা



লেকিথোস

গ্রিক রিভাইভাল

ইউরোপ এবং আমেরিকায় প্রবর্তিত এক ধরনের নতুন

(Greek Revival)

স্থাপত্যরীতি যা প্রকৃত গ্রিক স্থাপত্যের মডেলকে অনুসরণ করে তৈরি। গ্রিক স্থাপত্যের এই নতুন আবির্ভাব তৎকালীন ইউরোপে প্রতিষ্ঠিত পালাডিয়ান শৈলীকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দেয়। তবে প্রকৃত গ্রিক স্থাপত্যের পুনরুজ্জীবন যা ঊনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপ ও আমেরিকায় দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিল তা ১৭৯০-এর আগে ঘটেনি। ১৭৫০ সালে দু জন ব্রিটিশ শিল্পী জেমস স্টুয়ার্ট এবং নিকোলাস রিভেট গ্রিস ভ্রমণ করেন এবং তারা 'দি অ্যান্টিকুইটিস অব অ্যাথেন্স' নামে একটি বড়ো গ্রন্থ প্রকাশ করেন ১৭৬২ সালে। এই নতুন রীতি ইংল্যান্ডে চালু ছিল ১৮৪০ পর্যন্ত এবং আমেরিকাতে আরও বেশিদিন। জার্মানির স্থাপত্যের অগ্রগতিকেও এই রীতি প্রভাবিত করেছিল।

গ্রিড
(Grid)

এক সারি লম্ব এবং অনুভূমিক রেখাকে নির্দিষ্ট দূরত্বে সাজিয়ে তৈরি চৌখোপি জাল। এর সাহায্যে কোনো ফোটোগ্রাফ বা অন্য কোনো ছবিকে আকারের বিকৃতি এড়িয়ে ছোটো বা বড়ো করতে অথবা সমান মাপের প্রতিলিপি করা যায়।

গ্রুপ দ্য রশের্‌শ দা'র ভিজুয়েল
Group de Recherche d' Art Visuel (GRAV)

১৯৫১ সালে প্যারিসে লে পার্ক, ইভারাল এবং আরও কয়েকজন কাইনেটিক শিল্পীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি গোষ্ঠী সংক্ষেপে গ্রভ ((GRAV)। এই গোষ্ঠীর প্রথম যৌথ প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয় ১৯৬০-এ যেখানে প্রত্যেক সদস্য যুগ্ম প্রকল্প নির্মাণ করেছিলেন। এই গোষ্ঠীর ওপরে বিশিষ্ট হাঙ্গেরীয় কাইনেটিক শিল্পী ভাসারেলির জোরালো প্রভাব ছিল। এঁদের সংবিধানে আলোর চলনের প্রকৃতি ও প্রযুক্তিগত সমস্যা আবিষ্কার করতে দলগত অভিযানের ডাক দেওয়া হয়েছিল। একজন শিল্পী হলেন অসীম প্রতিভাধর— এই রোমান্টিক ধারণাকে তাঁরা অপসারিত করেছিলেন রিসার্চ টিম এবং দর্শককে বিজড়িত করে। আসলে এই গোষ্ঠী কাইনেটিক আর্ট থেকে শুরু করেছিল কিন্তু তা পরিবেশগত শিল্প হয়ে শেষ পর্যন্ত হ্যাপেনিং বা ঘটনা শিল্পে পর্যবসিত হয়। অন্যান্য শিল্পীরা ছিলেন হোরাসিয়ো, গার্সিয়া-রোসি, ফ্রাঁসোয়া মোরলে, ফ্রাঁসিসকো সোব্রিনো, জঁ পিয়ের ইভারাল প্রমুখ।

গ্রেকো রোমান আর্ট
(Greco roman art)

গ্রিসের পঞ্চম খ্রিস্ট পূর্বাব্দে অত্যুত্তম শিল্প সাহিত্যকর্মের ক্ষেত্রে ক্লাসিক শব্দটা ব্যবহার করা হয়। গ্রিক আর্টের এই অগ্রগতি প্রতিবেশী দেশগুলিকে পরবর্তীকালে উৎসাহ জুগিয়েছিল। ক্লাসিক উত্তর যুগে রোমানরাও গ্রিক শিল্প আদর্শে ছবি ও ভাস্কর্য সৃষ্টি করেছে। গ্রিক প্রভাবিত এই শিল্পকলা

গ্রেকো রোমান আর্ট নামে আখ্যাত।

গ্লস (Gloss) — গ্রিক এবং রোমান ভাসের গায়ে একরকম খুব মিহি ও পাতলা ক্লের জেল্লাদার আস্তরণকে গ্লস বলা হয়। আগুনে বিশেষ ভাবে পুড়িয়ে এই গুণ তৈরি করা হয়। গ্লেজের সঙ্গে একে মিলিয়ে ফেলা উচিত নয়। কারণ গ্লেজ কাচ জাতীয় পদার্থ।

গ্লাস (Glass) — বাংলায় কাচ। একটি শক্ত এবং সাধারণভাবে স্বচ্ছ পদার্থ। বালি অর্থাৎ সিলিকন ডাই অক্সাইডের সঙ্গে চুনাপাথর তথা ক্যালসিয়াম কার্বোনেট এবং সোডা ১৪০০°-১৫০০° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় গলিয়ে তারপর ঠান্ডা করে তৈরি করা হয়। নির্দিষ্ট আকার প্রাপ্ত কাচকে তাড়াতাড়ি ঠান্ডা করলে কাচ ভঙ্গুর হয়। এই ভঙ্গুরত্ব কমাতে লেহর-চুল্লিতে ধীরে ধীরে সমানভাবে ঠান্ডা করা হয়। এই পদ্ধতিকে বলে অ্যানিলিং। কাচের ব্যবহারিক প্রয়োজনানুযায়ী কাচ তৈরির পদ্ধতিও বিভিন্ন রকমের। কাচ তৈরির সময় বিভিন্ন ধাতব অক্সাইড মিশিয়ে তৈরি রঙিন কাচ বলা হয় 'স্টেন্ড গ্লাস'। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বিশেষ করে ইউরোপীয় ক্যাথিড্রালগুলিতে এই রঙিন কাচ ব্যবহার করা হয়েছিল। আবার কাচ তৈরির মিশ্রণে সিসার যৌগ মেশালে কাচের ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি পায়। এই কাচ জুয়েলারি এবং তৈজসপত্র তৈরির কাজে ব্যবহার করা হয়।

গ্লাসগো স্কুল (Glasgow school) — একই সঙ্গে দুটো স্কটিশ শিল্পী গোষ্ঠীর ভিন্ন ধারার শিল্প ঘরানা গ্লাসগো স্কুল নামে ব্যবহৃত। এর ফলে একটু বিভ্রান্তিও সৃষ্টি হয়। একটি গোষ্ঠী উইলিয়ম ইয়র্ক ম্যাগ্রেগরের নেতৃত্বে জন লেভারি, ডেভিড ক্যামেরন প্রমুখ শিল্পীদের গোষ্ঠী। যাঁরা ফ্রেঞ্চ ইম্প্রেশনিজ্‌মের আলংকারিক ধারার দ্বারা প্রভাবিত। অন্যদিকে বিশিষ্ট স্থাপতি চার্লস রেইনি ম্যাকিনটোশ-এর নেতৃত্বে সংগঠিত এক দল শিল্পী আর্ট ন্যুভো-এর যথার্থ স্কটিশ রূপ নিয়ে কাজ করেছেন।

ছবি নং ১৬৭ পৃ. ৩৫৭

গ্লিপটিক (Glyptic) — পাথর বা কঠিন পদার্থ কেটে বা খোদাই করে নির্মাণ। ভাস্কর্য নির্মাণের ক্ষেত্রে এই শব্দ ব্যবহৃত। দু-ধরনের পদার্থ দিয়ে ভাস্কর্য তৈরি হয়। এক হল গ্লিপটিক যেমন পাথর, কাঠ ইত্যাদি অন্যটি হল প্লাস্টিক যেমন মাটি, প্লাস্টার।

গ্লিসারিন (Glycerin) — অ্যালকোহল পরিবারের অন্তর্ভুক্ত একটি স্বচ্ছ ও ঘন তরল। একসময় সাবান তৈরি করতে গিয়ে উপজাত বা বাই প্রোডাক্ট

হিসাবে সৃষ্টি হত। কিন্তু এখন সিনথেটিক উপায়ে প্রস্তুত করা হয়। রং, খাবার, ওষুধ সহ বিস্ফোরক তৈরি ইত্যাদি বহুবিধ কাজে গ্লিসারিন ব্যবহার করা হয়। ছবির আঁকার জল রং এবং গুয়াশের শুষ্ক হয়ে যাওয়া রোধ করতে প্লাস্টিসাইজার হিসাবে এবং রঙে ফাট ধরা আটকাতে গ্লিসারিন করা হয়।

গ্লু (Glue)
বিভিন্ন জিনিস জোড়া দিতে আঠা হিসাবে ব্যবহার করা হয় এবং রঙে ব্যবহার করা হয় বাইন্ডার হিসাবে। প্রাচ্যে রং এবং কালির চিরাচরিত বাইন্ডার হল গ্লু। সাধারণভাবে পাওয়া যায় এমন নানারকম প্রাণী, মাছ, হাড় এবং চামড়া দিয়ে গ্লু প্রস্তুত করা হয়। গ্লু আসলে প্রাণিজ প্রোটিন যা জলের সঙ্গে মিশে শক্তিশালী আঠা তৈরি করে। মাছ থেকে তৈরি গ্লু বাদ দিলে সব গ্লু শুকিয়ে শক্ত হয়ে যায়। পরে ঠান্ডা জলে গুলে নরম করতে হয়। গ্লু জলে ফোটাতে নেই। তাহলে এর জোর কমে যায়। কটু গন্ধ যুক্ত গ্লু আসলে ত্রুটিপূর্ণ।

গ্লেজ (Glaze)
গ্লেজ হল হালকা রঙের আস্তরণের ওপর গাঢ় রঙের পাতলা স্বচ্ছ আস্তরণ। যাতে তলার বর্ণস্তরটি ওপরের বর্ণস্তরের মধ্য দিয়ে দেখা যায় যেমন কোনো একটি রঙিন সেলোফেন কাগজের মধ্য দিকে একটি ছবি যেভাবে দেখা যায়। কখনো-কখনো গ্লেজের লক্ষ্য থাকে নিয়বদ্ধভাবে ধূসর রঙের অন্তঃ বর্ণস্তরের ওপর রঙিন বর্ণস্তর লাগিয়ে ছবিকে ফুটিয়ে তোলা। অন্যান্য ক্ষেত্রে একটি রংকে সামান্য পরিবর্তন করার উদ্দেশ্যে তার ওপর অন্য রঙের গ্লেজ লাগানো হয়। আবার অনেক সময় একটি রঙের ওপর আরেকটি রঙের গ্লেজ চাপানো হয় যাতে দুটো রং যুক্ত হয়ে (পরস্পর মিশে গিয়ে নয়) তৃতীয় একটি রং তৈরি হতে পারে। যেমন শুকিয়ে যাওয়া ইয়েলো অকারের গ্রাউন্ডের ওপর যদি পাতলা করে প্রুশিয়ান ব্লু রঙের স্বচ্ছ প্রলেপ লাগানো হয় তাহলে যে রংটি তৈরি. হবে তা গ্রিনও নয় ব্লুও নয়। কাবণ গ্লেজের ক্ষেত্রে দুটো রং পরস্পর মিশে যাওয়ার সুযোগ পায় না। যদিও ইতিহাস অনুসারে গ্লেজ তেল রঙেরই একটা পদ্ধতি। তথাপি অ্যাক্রিলিক, জল রং প্রভৃতি ক্ষেত্রেও গ্লেজ পদ্ধতি ব্যবহৃত হতে পারে।

গ্লেজিং মিডিয়াম (Glazing Medium)
যে কোনো পেন্টিং মিডিয়াম যা পেন্টকে যথেষ্ট রকম পাতলা করতে পারে যাতে রংকে গ্লেজ হিসেবে ব্যবহার করা যায়। তেল রং এবং অ্যালকিড পেন্টের ক্ষেত্রে তৈরিকরা এরকম

অনেক মিডিয়াম কিনতে পাওয়া যায়। যেমন লিকুইন, বেস-এন-জেল, গ্রামবাচার, অ্যালকিড পেন্টিং মিডিয়াম, অ্যাক্রিলিক রঙের ক্ষেত্রে অ্যাক্রিলিক গ্লস মিডিয়াম ব্যবহার করা যেতে পারে আর জল রঙের ক্ষেত্রে জলই হল মিডিয়াম।

গ্লেয়ার (Glair)

অনেক সময় আলো প্রতিফলনের কারণে ছবি অতিমাত্রায় চকচক করে ফলে ছবি দেখার ক্ষেত্রে ব্যাঘাত ঘটে। এরকম ক্ষেত্রে ছবির ওপর নন গ্লেয়ার কাচ লাগানো যেতে পারে। আবার অনেক ক্ষেত্রে তেল রং বা অ্যাক্রিলিক রঙের ছবিতে বর্ণতলের দীপ্তি বেশি হওয়ার ফলে একই সমস্যা সৃষ্টি হতে দেখা যায়। সেক্ষেত্রে এই দীপ্তি বা গ্লস কমানোর জন্য কাজ করার সময় রঙের সঙ্গে ম্যাট মিডিয়াম মেশানো যেতে পারে বা ছবি শেষ হলে ম্যাট বার্নিশের প্রলেপ লাগানো যেতে পারে।

গ্লোরি (Glory)

অনেক ছবিতে বিশেষ করে দেবদেবী বা ধর্মীয় ছবিতে মূর্তির মাথার পেছনে গোলাকার যে জ্যোতির্বলয় দেখা যায় তা হল গ্লোরি। মূর্তির ক্ষেত্রে রং না থাকলেও সূর্যের আদলে গোলাকার একটা চাকতির মতো করে ব্যবহার করা হয়। একে অ্যারিয়োলা বা নিমবাসও বলে। বুদ্ধ মূর্তির মাথার পেছনে এরকম নিমবাস দেখা যায়।



ঘ

ঘট



নং ৯৩. চিত্রিত মনসা ঘট। তালেশ্বর। খুলনা। উচ্চতা ২৪ ইঞ্চি।

সাধারণভাবে পোড়া মাটির তৈরি ছোটো কলসাকৃতি জলপাত্র। প্রধানত পূজা অর্চনার কাজে বহুল ব্যবহৃত হয়। কুমোরের চাকে তৈরি। পটুয়ারা ঘটের ওপর নানা ধরনের প্রতীক সহ রঙিন নকশাও চিত্রিত করেন। মঙ্গল কামনায় স্থাপিত পল্লব শোভিত জলপূর্ণ ঘট মঙ্গলঘট নামে অভিহিত। মাটি ছাড়া পাথর খোদাই করে বা ধাতু পিটিয়েও ঘট তৈরি হয়ে থাকে। ঘটে আঁকা চিত্র দুই ধরনের। ধর্মনিরপেক্ষ ও ধর্মসংপৃক্ত। গ্রামের মেলা থেকে আনা নানা দ্রব্য যথা বিন্নির খই, কদমা, মিষ্টি ইত্যাদি নিয়ে যাওয়া এবং কুটুমবাড়িতে উপহার দেবার ঘটে যে নকশা কাটা হয় তা ধর্মনিরপেক্ষ। এসব ঘটের মধ্যে

সখের হাঁড়ি বিখ্যাত আর ধর্মসংপৃক্ত ঘটের মধ্যে আছে মনসা ঘট, লক্ষ্মী ঘট, শীতলা ঘট ইত্যাদি। এসবের মধ্যে মনসা ঘট সবচেয়ে বেশি অলংকৃত।



চ

চক (Chalk) — সাধারণভাবে নরম চুনাপাথর বা ক্যালসিয়াম কার্বোনেট। দু-ভাবে তৈরি হয়। প্রকৃতিজ চুনা পাথর থেকে অথবা কৃত্রিমভাবে তৈরি ক্যালসিয়াম কার্বোনেট থেকে। কৃত্রিম ভাবে তৈরি প্রিসিপিটেটেড চক শিল্পীদের কয়েক ধরনের রং তৈরির কাজে ব্যবহার করা হয়। এই সব রঙের মধ্যে প্রধান হল প্যাস্টেল। এছাড়াও গুয়াশ, কেসিন এসব রঙের বড়ি এবং ওপাসিটি বা অনচ্ছতা তৈরিতে লাগে। চক জিপসামের বিকল্প হিসাবে গ্রাউন্ড তৈরির কাজেও লাগানো হয়। ব্ল্যাকবোর্ড চক সাধারণভাবে সাদা হয় তবে রঙিনও চকও পাওয়া যায়।

চক্র — ভারতীয় শিল্পে সূর্যের প্রতীক হিসেবে নানা রূপে ব্যবহৃত একটি চাকতি সদৃশ আকার। এটা বিষ্ণুর অস্ত্র হিসাবে বর্ণিত হয়েছে। যেমন সুদর্শন চক্র। অধ্যাত্মিক শক্তিকে সংহত করার সংকেত হিসাবেও চক্রকে দেখানো হয়। ভারতীয় ভাস্কর্যে ও চিত্রে নানা আঙ্গিকের চক্র দেখা যায়।

চাইনিজ হোয়াইট (Chinese white) — অপেক্ষাকৃত সাদা জল রং। এতে পিগমেন্ট হিসাবে জিংক হোয়াইট তথা জিংক অক্সাইড ব্যবহার করা হয়। ছবি আঁকার সময় কোনো কারণে পেপার হোয়াইট নষ্ট হয়ে গেলে সাদা হাইলাইট পুনরুদ্ধার করতে অনেক সময়ই চাইনিজ হোয়াইট ব্যবহার করা হয়। অবশ্য এটাই সাধারণ অভ্যাস। তবে যাঁরা শুধুমাত্র স্বচ্ছ জল রং ব্যবহার করে ছবি আঁকতে চান তাঁরা চাইনিজ হোয়াইট এড়িয়ে চলেন। যদিও অপেক্ষাকৃত ছোটোছোটো অংশেই এই অনচ্ছ রং ব্যবহার ভালো হয়। কিন্তু অনেকটা জায়গা জুড়ে যদি স্বচ্ছ জল রং অনচ্ছ করে ব্যবহার করা

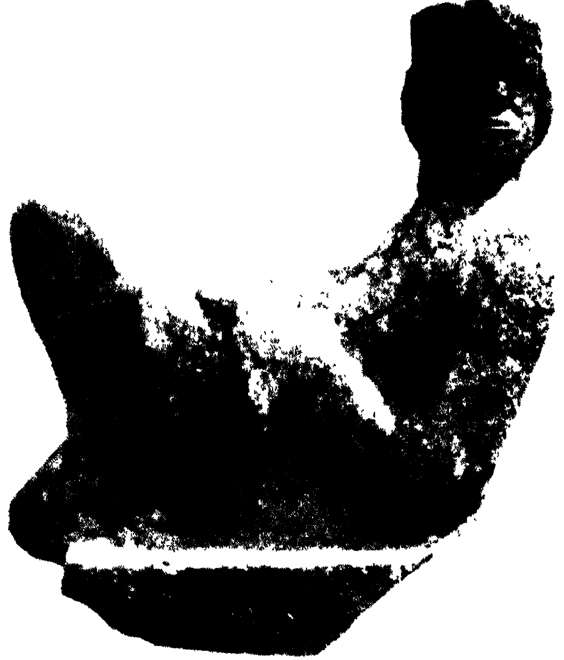
হয়ে থাকে সেখানে চাইনিজ হোয়াইটের ব্যবহার অশিষ্ট বা dirty হয়ে পড়বে।

চাইল্ড আর্ট
(Child art)

শিশু চিত্রকলা দেখুন।

চাকমুল
(Chacmool)

কাত হয়ে থাকা বিশেষ ধরনের দেবমূর্তি। এগুলি তৈরি হয়েছিল মেক্সিকোর প্রাক্ কলম্বিয়ান সংস্কৃতির টলটেক শিল্পীদের



নং ৯৪. টলটেক শিল্প : চাকমুল। দ্বাদশ শতাব্দী। চাক হল বৃষ্টির দেবতা। মেক্সিকোর উত্তরে ইউকাটান অঞ্চলে একটি স্থান চিকেন ইটশাতে একটি বেসিন ধরে আছেন।

দ্বারা। ১২০০ খ্রিস্টাব্দের এই ধরনের রিক্লাইনিং ফিগার ব্রিটিশ ভাস্কর হেনরি মুরের ওপর জোরালো প্রভাব ফেলেছিল।

চায়না মার্কার
(China marker)

ক্রেয়নজাতীয় পদার্থের সরু রড। কাগজে মোড়া থাকে অথবা পেন্সিলের মতো কাঠের মধ্যেও থাকে। এর দ্বারা দাগ টানতে সুবিধে হয়। একে গ্রিজ মার্কারও বলে।

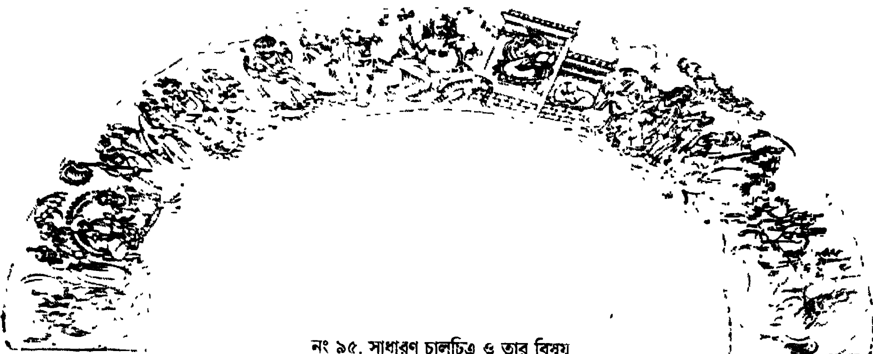
চারকোল
(Charcoal)

গাছের সরু ডাল যেমন আঙুর, উইলো, বিচ ইত্যাদির ডাল আগুনে ঝলসে তৈরি করা কার্বন বাংলায় কাঠকয়লা। গাছের ডালের প্রকৃতি, পোড়ানোর সময়সীমা এবং তাপমাত্রার ওপর চারকোলের মসৃণতা, গাঢ়ত্বের মাত্রা নির্ভর করে। যেমন উইলো চারকোল ভাইন চারকোলের চেয়ে বেশি কালো। আবার কাঠের উনান থেকে সরাসরি যে চারকোল পাওয়া যায় তা

খুব দানাদার ও পলকা। কয়েক ধরনের চারকোল কিনতে পাওয়া যায়। যেমন খণ্ডাকারে, স্টিক ও পেন্সিলের মতো আকারে। খণ্ডাকার বা চাঙ্ক চারকোল কম্প্রেসড নয়। স্টিক চারকোল কম্প্রেসড অথবা আনকম্প্রেসড দুটোই হতে পারে। চারকোল পেন্সিল কম্প্রেসড চারকোল দিয়ে তৈরি। চারকোল একটি স্থায়ী মাধ্যম এটা ফিকে হয়ে যায় না।

চারিগেরেস্ক (Churrigueresque) বারোক স্থাপত্য ও অলংকারের এক উপশৈলী। এই অতিমাত্রিক শৈলীর নামকরণ করেন বিশিষ্ট স্থপতি চারিগেরা। স্পেন, ল্যাটিন আমেরিকা, পর্তুগাল-এ এর নিদর্শন পাওয়া গেছে।

চালচিত্র সাধারণত মাটির মূর্তির পেছনে বিশেষ করে দুর্গাপ্রতিমার পশ্চাৎপটের বাঁকানো অর্ধগোলাকৃতি দ্বিমাত্রিক চিত্রিত অংশকে বলে দেবীচাল বা চালচিত্র। এই চালচিত্রের রূপকার বা লেখক হলেন কুমোর এবং অন্যজাতিভুক্ত ব্যক্তিরা। তাঁদের ভাষায় চালচিত্র আঁকা নয় 'লেখা' হয় । এই শিল্পীসম্প্রদায় সভ্যতার বর্তমান প্রক্রিয়ায় বিলীয়মান। যেহেতু এই চালচিত্র মাটির প্রতিমার কাঠামোর চালা বা দেবীচালেই আঁকা তাই প্রতিমা বিসর্জনের সঙ্গে সঙ্গে চালচিত্রেরও বিসর্জন ঘটে এবং এই আশ্চর্য সৃষ্টির সম্ভার বেশির ভাগই হারিয়ে যায়। মাটির ওপর রঙে আঁকা সাধারণ চালচিত্র ছাড়াও, পাথর, কাঠ এবং ধাতুর তৈরি কিছু চালচিত্রের নিদর্শন আছে। হলওয়েল সাহেবের বইয়ে আঁকা দুর্গা প্রতিমা এবং চিৎপুরের কাঠ খোদাইয়ের দুর্গা চিত্রে দুর্দান্ত সব চালচিত্রের নমুনা দেখা যায়। আবার ১৮২৩ সালে ছাপা চণ্ডীর পুস্তক বইয়ে মুদ্রিত 'কালকেতুর মন্দিরে দেবীর প্রকাশ' শীর্ষক ছবিতে অনামী শিল্পীর সুন্দর ও বিশদ চালচিত্রের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। কিন্তু কালকেতুর কাহিনি



নং ৯৫. সাধারণ চালচিত্র ও তার বিষয়

রচনাকাল অর্থাৎ ষোড়শ শতাব্দীতে বাংলা দেবীচালের উদ্ভব হয়নি। আদিতে চালচিত্র আজকের মতো ছিল না। এখনকার চালচিত্র চুমকি জরির আড়ালেই চাপা পড়ে যায়। কিন্তু আগে চালচিত্র লেখা হত শাস্ত্রীয় তাৎপর্য মেনে। সে সব পৌরাণিক দেব আলেখ্য অঙ্গদেবতার নামে আখ্যাত। এই সব চালচিত্র যারা আঁকতেন তাঁদের মধ্যে কালীঘাটের পটুয়ারাও অনেকে ছিলেন। কল্পিত বা অস্পষ্ট তথ্য যাই থাকুক না কেন বাংলার চালচিত্রের পরিকল্পনা বাঙালি মূর্তি শিল্পীদেরই মস্তিষ্কপ্রসূত। চাল শব্দটির অর্থ আচ্ছাদন বা ছাদ। পূর্বভারতীয় মূর্তি শিল্পের একটি বৈশিষ্ট্য হল দেবদেবীর প্রতিমার মাথার ওপর চাল বা আচ্ছাদন। বাংলাদেশে মাটির মূর্তি গড়ে পুজোর সূত্রপাত হবার সময় ভাস্কর্যের এই ধারাটি গৃহীত হয়েছিল। ক্রমশ এই ধারার বিবর্তিত রূপ চালচিত্রের কাঠামো এবং রীতি ধারণ করেছে। প্রচলিত তথ্য থেকে জানা যায় যে চালচিত্রের কাঠামো চার রকমের। বাংলা চাল, মার্কিনি চাল, মঠচৌরি চাল এবং টানাচৌরি চাল। আরও তিনরকমের চাল ছিল একসময়। উপযুক্ত কারিগরের অভাবে তা বিলুপ্ত। এগুলি হল সর্বসুন্দরী চাল, দোথাকিচাল, গির্জা চাল।

চালচিত্রের কাঠামো তৈরি হয় বাঁশ বাখারি বেঁধে দড়মা এঁটে। তার ওপর কাদা গোলা জলে কাপড় ডুবিয়ে তা টান টান করে সেঁটে শুকিয়ে নিয়ে খড়িমাটির প্রলেপ লাগিয়ে তার ওপর চিত্র আঁকা (লেখা) হয়। দেবী চালের চার রকমের মধ্যে মার্কিনি চালই বেশি প্রচলিত। মার্কিনি নাম হবার কারণ অজ্ঞাত। মার্কিনি চালের অর্ধগোলাকার অংশের দু-দিকের নীচে থাম থাকে। বাংলা চালের ধাচা চালাঘরের মতো। মঠচৌরিতে অর্ধগোলাকৃতি তিনটি খোপ এবং টানাচৌরি চালা ত্রিভূজাকৃতি তিনটি চূড়া দিয়ে গঠিত। গড়পড়তা চালের মাঝখানে থাকে শিব ও তার বাহনের ছবি এবং পাশে থাকে শিবের বাড়ি ও গণেশজননী। এই নিয়ে গঠিত কেন্দ্রীয় ছবিটির দু-পাশে থাকে যুদ্ধের দৃশ্য, রামের অভিষেক এবং কৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলা। সেই সঙ্গে ব্রহ্মা বিষ্ণু ইন্দ্র নারদ আর ছাগমুণ্ড দক্ষ। ছবির আঙ্গিক বাংলার পটচিত্রশৈলী। বেশিরভাগ চালচিত্রের জমি হালকা নীল রঙের হয়। শিল্পীরা এই বিদ্যা শেখেন মূলত উত্তরাধিকার সূত্রে। বাড়ির মহিলারাও একাজে অংশ নেন। এরকম কয়েকজন শিল্পী হলেন বর্ধমানের জামুরিয়ার ধর্মদাস

> নদীয়াচাঁদ > নিধিরাম > হাবুলাল। নদিয়ার কাছাকাছি মহেন্দ্রপাল > বিষ্ণুপদ পাল কার্তিক রাধেশ্যাম গণেশ জগবন্ধু।

চৈত্য

বৌদ্ধ ধর্মকেন্দ্রের অন্তর্গত দু-ধরনের স্থাপত্য পরিকল্পনা দেখতে পাওয়া যায় তার মধ্যে একটি হল বিহার। যেখানে বৌদ্ধ ভিক্ষু বা শ্রমণরা বাস করতেন। বিহারগুলি একতলা বা দোতলা হত এবং এতে থাকত পাথরের বিছানা ও বালিশ



নং ৯৬. চৈত্য হল। কার্লে। খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীর শেষ ও দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথম ভাগ। অন্ধ্র।

এবং আলো রাখার কুলুঙ্গি। এই বিহারগুলির সামনে থাকত স্তম্ভ ঘেরা উপসনা গৃহ। এই সমবেত উপসনাগৃহ হল চৈত্য। চৈত্য হলের শেষ মাথায় থাকত একটা স্তূপ। ইংরাজি 'U' আকৃতির চৈত্য হলকে ঘিরে থাকত দু-সারি স্তম্ভ। যার দ্বারা মূল হলের চারপাশে একটা সরু যাতায়াত পথ তৈরি হত। এই পথ ধরে স্তূপকে পরিক্রমণ করা যেত।

চিনা শিল্পকলা

চৈনিক চিত্রকলা বিশ্বের অন্যতম সমৃদ্ধশালী শিল্প। খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় ও দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে চিত্রকলার উল্লেখ পাওয়া যেতে থাকে। সে সময় থেকেই ড্রাগন ছিল চিত্রশিল্পীদের একটি প্রিয় বিষয়। ড্রাগন ছাড়া শিল্পীরা জীবজন্তুর ছবি ও পোর্ট্রেট আঁকতেন। হান রাজত্বের সময়ে অর্থাৎ খ্রিস্টপূর্ব ২০৬-২২০ খ্রিস্টাব্দে সামাজিক অগ্রগতির কারণেই শিল্পকলার বিকাশের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল। যদিও এই সময়ের চিত্রকলার নিদর্শন তেমন পাওয়া যায় না। তবে কয়েকটি চিত্রিত টালি, ফ্রেস্কো, গালাপাত্রের যেটুকু নিদর্শন পাওয়া গেছে তাতে হান শিল্পীদের আঙ্গিকগত দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। যে গতিশীল চাতুর্যপূর্ণ রেখা চৈনিক চিত্রকলার চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য

তা হানযুগ থেকেই প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। ওয়েই রাজত্বে চিনা শিল্পকলা গুরুত্বপূর্ণ পর্বে প্রবেশ করে। এই সময় কনফুসিয়াসের রাষ্ট্রকেন্দ্রিক জীবনদর্শনের প্রভাব শিথিল হয়ে পড়ে এবং মহাযান বৌদ্ধ ভাবধারা চিনদেশে প্রভাবশালী হয়ে ওঠে। সেইসূত্রে ভারতীয় শিল্প চিনে পৌছায় এবং তুন হুয়াং, ইউন ফাং ও লং মেন এই তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বৌদ্ধ শিল্পকেন্দ্র গড়ে ওঠে। তিনজন ভারতীয় বৌদ্ধ শিল্পী চিনের নানা জায়গায় এসময়ে কাজ করেছিলেন। এরা হলেন শাক্যবুদ্ধ, বুদ্ধকীর্তি, ও কুমারবোধি। এই সময়ের অন্যতম বিশিষ্ট শিল্পী কু কাই চি-র ছবি ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রাখা আছে। একাধিক দৃশ্য সম্বলিত এই ছবিটি জড়ানো রেশম কাপড়ে চিত্রিত। বিষয় হল হারেমের নারীদের প্রতি শিক্ষিকাদের উপদেশাবলি। তুং হুয়ান গুহাচিত্রের সঙ্গে এই চিত্রের শৈলী তুলনীয়। পঞ্চম শতাব্দীতে দক্ষিণ চিনের প্রতিকৃতিশিল্পী সি হো চিনা চিত্র চিত্রকলার ছটি চরিত্রলক্ষণ নির্দেশ করেন যা চিনা ঐতিহ্যের মূলকথা। এর সঙ্গে ভারতশিল্পের ষড়ঙ্গেরও একটা ভাবগত মিল লক্ষ করা যায়। এরপরে আসে তাং রাজত্বকাল। এই সময়টা চৈনিক চিত্রকলার ক্ষেত্রে স্বর্ণযুগ। কিন্তু এরও কোনো

নং ৯৭. উ পিন দ্য কামিং অব দ্য স্প্রিং। হ্যান্ড স্ক্রোলের অনুপুঙ্খ চিত্র। মিং যুগ ১৬২০ খ্রিস্টাব্দ। সামগ্রিক মাপ ৩৮ X ১৩১.৫ সেমি
আরও ছবি নং ১৬৮ পৃ. ৩৫৭



চিত্র নিদর্শন টিকে নেই। তাং শিল্পীরা নিসর্গ আঁকাতে আগ্রহী ছিলেন। এই সময়ের কয়েকজন শিল্পী হলেন লিপেন, লি সু-শুন, ওয়াং ওয়েই প্রমুখ। এরা একইসঙ্গে কবি ও চিত্রকর ছিলেন। তাং রাজত্বের শেষে চৈনিক চিত্রকলা উত্তর ও দক্ষিণ এই রীতিতে ভাগ হয়ে যায়। উত্তর চিনের শিল্পরীতি লি সু-শুঙের আদর্শকে ভিত্তি করে আর দক্ষিণ চিনের শিল্পরীতির ভিত্তি হয় কবি ও চিত্রশিল্পী ওয়াং ওয়েই-এর একরঙা নিসর্গ চিত্রের আঙ্গিক বৈশিষ্ট্য। পরবর্তীকালে সুং সম্রাটদের রাজত্বে নিসর্গচিত্রের আরও বিকাশ ঘটে। তাং সাম্রাজ্যের শেষের দিকে বৌদ্ধ ভাবধারার অবক্ষয় ঘটলে চিনা রক্ষণশীলতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। চু শি নব্য কনফুসিয়াসবাদ প্রবর্তন করেন। ক্রমশ এই মতবাদ সারা চিনে ছড়িয়ে পড়ে এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক পর্যন্ত বলা যেতে এই আদর্শই ছিল চৈনিক চিন্তার নিয়ন্ত্রক। স্বভাবতই চিত্রকলা জগতও এর বাইরে ছিল না। মিং রাজবংশের শাসনকালে চিনা নিসর্গ চিত্র আকারের দিক দিয়ে যেমন বড়ো হয়ে ওঠে তেমনি তার ডিটেলও অনেক বৃদ্ধি পায়। তাং এবং সুং যুগের চিত্রের মার্জিত সূক্ষ্ম গভীরতা হারিয়ে গিয়ে আসে প্রথাসিদ্ধ রীতিবদ্ধতা। মিং চিত্রে হিউম্যান ফিগারগুলি সংঘবদ্ধ আর অলংকরণের আতিশয্যও ব্যাপক। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীতে চিনা চিত্রকলা ইউরোপীয় সংস্পর্শে এলে কোনো কোনো শিল্পী বাস্তব জগতের অনুকরণের দিকে ঝুঁকে পড়েন। সেই সঙ্গে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। চিন বিপ্লবের পরে তার বৈচিত্র্য আরও বৃদ্ধি পায়। ১৯৮৭ সালে আমেরিকাতে চিনা শিল্পীদের তেল রঙের ছবির এক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। যার মধ্যে বেশিরভাগই ছিল আধুনিক প্রজন্মের শিল্পীদের ছবি এবং তাতে পাশ্চত্য ভাবধারাই ছিল প্রধান। বড়ো মাপের এই প্রদর্শনীতে উপস্থাপিত ১২০টি ছবি চিনের আধুনিক চিত্র প্রকৃতির দৃষ্টান্তমূলক নিদর্শন। পরবর্তীকালে বিংশ শতাব্দীর একবারে শেষে এই দৃষ্টান্ত আবার দেখা গেছে কলকাতায় ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে অনুষ্ঠিত চিনা তেল রঙের ছবিতে। এসব ছবি প্রথাসিদ্ধ রীতি থেকে সরে এসে ফোটোগ্রাফিক বাস্তবতার কাছে চলে আসার উজ্জ্বল নমুনা। বিপ্লবোত্তর চিনের আর একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত লক্ষ করা যায় ১৯৮৬ সালে প্যারিসে অনুষ্ঠিত চিনের চিত্রকলায় একটি প্রদর্শনীতে। কৃষকদের আঁকা ৮০টি ছবিতে প্রাচ্য পাশ্চাত্যের ধ্রুপদি ও লোক আঙ্গিক এবং

চিনা রীতির যে অপূর্ব সম্মেলন তার মধ্যে সমাজ প্রগতিরই পরিচয় প্রতিফলিত।

চোল

দ্রাবিড় শিল্পের একটি পর্ব হল চোল। প্রকৃত চোল স্থায়ী ছিল ৯৮৫-১২৪৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। খ্রিস্টীয় দশম শতাব্দীতে চোল তথা দক্ষিণ ভারতের অধিপতি হন রাজরাজ দেব। চোলদের ইতিহাস বহু প্রাচীন। সম্রাট অশোকের সঙ্গে চোলদের মিত্রতার সম্পর্ক ছিল। রাজরাজের সময় থেকেই চোলদের গৌরব যুগ শুরু হয়েছিল। চোলদের প্রধান রাজধানী ছিল তাঞ্জোর। পরে নতুন রাজ্য বিজয়ের সঙ্গে আরও কিছু রাজধানী শহর গড়ে তোলা হয়েছিল। চোল আমলের মন্দির স্থাপত্য দ্রাবিড় শিল্পশৈলীর একটি উজ্জ্বল অধ্যায়। প্রথম দিকের চোল মন্দিরগুলি আয়তনে ছোটো ছিল এবং গঠনরীতির সঙ্গে পল্লব শৈলীর মিল ছিল। তবে পল্লব শৈলীর শেষ পর্বের স্থাপত্যে যে জড়তা তৈরি হয়েছিল আদি পর্বের চোল মন্দির তার থেকে অনেকটাই মুক্ত ছিল। দ্রাবিড় স্থাপত্যের মহোত্তম কীর্তি স্থাপন করেন রাজরাজ চোল ও তার ছেলে রাজেন্দ্র চোল। রাজরাজেশ্বর নামে তাঁদের প্রথম মন্দির নির্মিত হয়েছিল তাঞ্জোরে। ১০০৩ সালে এই মন্দির নির্মাণ শুরু হয় এবং শেষ হয় ১০১০ সালে। দ্বিতীয় মন্দির নির্মিত হয়েছিল নতুন রাজধানী গঙ্গাইকোন্ডচোলপুরমে। সে সময়ের ভারতীয় মন্দিরগুলির মধ্যে এটিই সবচেয়ে উঁচু। চোদ্দো তলা বিশিষ্ট এই মন্দিরের শীর্ষদেশে একটি মাত্র পাথরে নির্মিত ৮০ টন ওজনের বৃহদাকার গম্বুজ সমন্বিত বিমান এই মন্দির পরিকল্পনার প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই বিমানকে বলা হয়েছে ভারতীয় স্থাপত্যের 'কষ্টিপাথর'।

দক্ষিণ ভারতে ব্রোঞ্জ শিল্প ভারতীয় শিল্পকলার জগতে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই ব্রোঞ্জ শিল্প চোল আমলেই চরম উৎকর্ষ লাভ করে। শুধু উৎকর্ষই নয় চোল আমলে ব্রোঞ্জ শিল্পের ব্যাপক প্রসারও ঘটেছিল। এর ব্যাপক চাহিদা মেটানোর জন্য ব্রোঞ্জ ভাস্করদের গ্রাম পর্যন্ত গড়ে উঠেছিল। চোল ব্রোঞ্জ মূর্তিগুলি আকারে বড়ো। শরীর অনাবৃত এবং মসৃণ। তৎকালীন শিল্পশাস্ত্রের বিধান মেনেও মূর্তিগুলির সৌন্দর্যের সাথে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের মিলন ঘটানো চোল শিল্পীদের বিস্ময়কর ক্ষমতা। এই সব মূর্তি নানাভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। চোল ভাস্কর্যে ব্যবহৃত হত 'পঞ্চলৌহ' অর্থাৎ তামা, রুপা, সোনা, পিতল ও সফেদা এই পাঁচটি ধাতুর মিশ্রণ। এই মিশ্রণে তামাই থাকত



নং ৯৮. পার্বতীরূপী সেম্বিয়ান মহাদেবী। ৯৯৮ খ্রিস্টাব্দ। ব্রোঞ্জ। উচ্চতা ৯২ সেমি.। সেম্বিয়ান মহাদেবী মন্দিরের জন্য নির্মিত।
আরও ছবি নং ১৯৮ পৃ. ৩৭৫

বেশি। Cire perdu পদ্ধতিতে মোম গলানো প্রক্রিয়ার ফাঁপা মূর্তি তৈরির পাশাপাশি নিরেট মূর্তিও তৈরি হত। এই সব মূর্তির মধ্যে শিব পার্বতী, বিষ্ণু, লক্ষ্মী, কৃষ্ণ ও রাম-এর মূর্তিই বেশি হত। কিছু বৌদ্ধ ও জৈন মূর্তিও তৈরি হয়েছিল। রাজা রানীর মূর্তিও এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। সেম্বিয়ান মাধবী মন্দিরের জন্য নির্মিত সেম্বিয়ান মাধবীর মূর্তিটি পার্বতীর ঢঙে তৈরি। একটু ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিতে দণ্ডায়মান মূর্তিটির আবরণ এতটাই আঁটোসাঁটো যে মনে হয় নিরাবরণ। তবে এই সময়ের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য মূর্তি হল শিবের নটরাজ মূর্তি। এ ধরনের প্রচুর মূর্তি চোল যুগে নির্মিত হয়েছিল। এই মূর্তিতে শিব বিশ্বের সৃষ্টি ও ধ্বংসের লীলা নৃত্যের ভঙ্গিমায়। এখানে শিবের চারহাত। জগতের প্রতীকী উপস্থাপনা ঘটেছে একটি অগ্নিখচিত বৃত্তাকৃতির মাধ্যমে। যা ভাস্কর্যটির পাদদেশে থাকা মকরের মুখ থেকে নির্গত হচ্ছে। ওপরের ডান হাতে ডমরু এবং বাঁ হাতে একটি আগুনের শিখা। যা সৃষ্টি ও প্রলয়ের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করছে। নীচের ডান হাতে অভয় মুদ্রা এবং বাম হাত হাতির শূরের মতো অর্থাৎ 'গজহস্ত'। যা বাঁ পায়ের নীচের বামনকার দৈত্যকে সূচিত করছে। এই প্রতীকী ভঙ্গি উপাসকদের কষ্ট মুক্তির প্রতিশ্রুতি। আর একটি পা সবলে বামনাকার দৈত্যকে ধ্বংসোদ্যত। ড. নীহার রঞ্জন রায় নটরাজ মূর্তির সঙ্গে সারনাথ বুদ্ধের তুলনা করেছেন। তৎকালীন শিল্পীরা শান্তি ও স্থৈর্য্যকে উপলব্ধি করেছিলেন পরিবর্তন ও অস্থিরতার মধ্যে। নটরাজ মূর্তি যেন তারই শিল্পরূপ।



ছ

ছত্রি/ছত্র ভারতীয় স্থাপত্যে ব্যবহৃত ছাতা আকৃতির এক ধরনের গম্বুজ। সাধারণভাবে ছাদের ওপর স্থাপিত অতিরিক্ত আলংকারিক উপাদান।



জ

জঁর (Genre)

ফরাসি এই শব্দটির অর্থ 'ধরন', 'রকম' ইত্যাদি। যেমন স্টিল লাইফ, ল্যান্ডস্কেপ, প্রতিকৃতি, হিস্ট্রি পেন্টিং ইত্যাদি হল এক একটি জঁর।

জঁর পেন্টিং (Genre painting)

জঁর শব্দটির নির্দিষ্ট এবং নিবিড় ব্যবহার ঘটে যে চিত্রে। এর অর্থ হল সাধারণ মানুষের সাদামাটা জীবনযাত্রার বাস্তবানুগ পেন্টিং। যে কোনোরকম ধর্মীয়, ঐতিহাসিক বা আদর্শগত ব্যবহার বর্জিত সাধারণ বিষয়ের পরিচ্ছন্ন নিবিড় উপস্থাপনা। কমেডির সমতুল বা সাধারণ নাগরিক জীবনযাত্রার চিত্রায়ন যা ইতিহাসচিত্র, মহাকাব্য বা ট্রাজেডিতে চিত্রিত মহান ব্যক্তিদের মহৎ কীর্তির বিপরীত। অগস্টাস, ভার্মিয়ার, ড্রিকহল প্রমুখের কাজ জঁর পেন্টিং-এর উদাহরণ।

জাইলোগ্রাফ (Xylograph)

উড এনগ্রেভিং-এর সমার্থক শব্দ।

জাঙ্ক আর্ট (Junk Art)

বিংশ শতাব্দীর অন্যতম এক শিল্পরীতি। নাগরিক বর্জ অর্থাৎ প্রাত্যহিক জীবনের ফেলে দেওয়া বা বাতিল জিনিসপত্র ব্যবহার করে তৈরি এই শিল্পকে আধুনিক স্টিল লাইফ বলা যেতে পারে। দাদাবাদী শিল্পী স্কুইটারস প্রথম এই ধরনের শিল্প গড়ার প্রচেষ্টা করেছিলেন। ১৯২০ সাল নাগাদ ঘনকবাদী কোলাজ নিয়ে কাজ করতে গিয়ে তাঁর এই ধরনের রূপের কথা মনে আসে। পরবর্তীকালে আমেরিকাতে ১৯৬১ সালে কমবাইন পেন্টিং করতে গিয়ে বিশিষ্ট শিল্পী রসখেনবার্গ এই ধারণার পুনরুজ্জীবন ঘটান। আবার একই ধরনের জিনিসপত্র ব্যবহার করে তৈরি হয় ক্যালিফোরনীয় ফাঙ্ক আর্ট। আমেরিকান জাঙ্ক আর্টের সমান্তরাল কাজ দেখতে পাওয়া যায় স্প্যানিশ শিল্পী অ্যান্টনি টাপিস, ইতালীয় শিল্পী আলবার্তো বারি এবং আর্টিপোভেরার শিল্পীদের ছবিতে।

জাদুপট

পটচিত্র দেখুন।

জাপানি চিত্রকলা

জাপানি শিল্পকলা প্রাচ্যের শিল্পকলার অন্যতম প্রধান অঙ্গ। জাপানি শিল্পের মুখ্য প্রকাশ ঘটেছে তার চিত্রকলায়। জাপানি চিত্রকলার বিকাশে রাজা ও অভিজাতদের অবদান অনেকখানি। সেই কারণেই জাপানের বিভিন্ন চিত্রশৈলী বিভিন্ন সময়ের রাজধানীর নামে পরিচিত। ৭০৯-৭৮৪ সালের মধ্যে জাপানের তৎকালীন রাজধানী নারাতে চিত্রশৈলীর গুরুত্বপূর্ণ বিকাশ ঘটে। যা নারাযুগের চিত্রকলা নামে খ্যাত। এই চিত্রকলায় বৌদ্ধধর্মাশ্রয়ী হরিয়ুজি ফ্রেস্কোর রচনারীতির সঙ্গে অজন্তার ফ্রেস্কোর মিল লক্ষ করা যায়। এরপরের রাজধানী কিয়োটো বা হেইয়ানে গড়ে ওঠে কিয়োটে যুগের চিত্রকলা। যার অন্যতম মুখ্য শিল্পী ছিলেন কোসে কানায়োকা। তাঁর বংশের নাম অনুযায়ী 'কোসে' কলমের সূত্রপাত হয়। কোসে কলমের শিল্পীরা চিনের তাং আমলের শিল্পাদর্শকে গ্রহণ করেছিলেন। এই যুগের শিল্পীরা নিসর্গ ও প্রতিকৃতি রচনায় খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে কামাকুরা এবং অশিকাগা যুগে জাপানি শিল্প আরো বেশি পূর্ণতা লাভ করে। এ সময়ের দুজন প্রধান শিল্পী ছিলেন তোবো সোজো এবং মিৎসুনাগা।



নং ৯৯. কিতাগাওয়া উতামারো নারীরা একটি বাচ্চাকে ভোলাচ্ছে। মধ্য এডো পর্ব। উডব্লক প্রিন্ট। ৩৬ X ২৩ সেমি।



নং ১০০. সুজুকি হারুনোবু : বাগানের বেড়ার পাশে পাখা হাতে মহিলা। রঙিন উডকাট। । বাঁ দিকের অংশ।
এডো যুগ। ১৭৬৬ - ৭০। ২৭.৪X২০.৯ সেমি.।



নং ১০১. অমিদ বুদ্ধ। কামাকুরা যুগ। ত্রয়োদশ শতাব্দী। ব্রোঞ্জ। উচ্চতা ৪২ ফুট ৬ ইঞ্চি।

এরপর তোসা মোতোমিৎসু 'তোসা' কলম প্রতিষ্ঠা করেন। এই কলম জাপানি চিত্রকলায় প্রবর্তিত নতুন ধারা। তোসা চিত্রকলার বিষয় ধর্মনিরপেক্ষ কাহিনি আশ্রিত। এরপর প্রবর্তিত হয় কানো কলমের। জাপানি চিত্রকলায় রীতিগত মাধ্যম ও উপকরণ হল সিল্ক, কাগজ এবং জল রং। তিন ধরনের চিত্রপট আছে জাপানি চিত্রকলায়। ধর্মবিষয়ক ছবি 'কাকমোনো' মখমলে জুড়ে কাঠের হাতলের সাহায্যে টাঙানো হয়। 'মাকিমোনো' মেঝেতে খুলে খুলে দেখার জন্য। আর ফ্রেমে বাঁধিয়ে দেয়ালে টাঙানোর ছবি হল 'গাকু'। জাপানি ছবির সবচেয়ে বেশি পরিচিতি ঘটেছে ছাপাই ছবি 'উকিয়ো-ই'। এই শৈলীর বিখ্যাত শিল্পী হলেন ইয়াসা মাতারেই। উকিয়ো-ই শৈলীর কাঠ খোদাই খুব জনপ্রিয়তা লাভ করে। উকিয়ো-ই শিল্পীরা স্বদেশের চেয়ে বিদেশে খ্যাতি পেয়েছেন বেশি। উকিয়োর শিল্পীদের চর্চার মধ্য দিয়েই জাপানে আধুনিক চিত্র রচনার আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে কোনো কোনো শিল্পী তেলরঙে ছবি আঁকতে শুরু করেন। কিন্তু জাপানে তৈলচিত্রের উল্লেখযোগ্য প্রসার ঘটেনি।

জিঙ্ক হোয়াইট (Zinc white)

সাদা এই পিগমেন্টের মূল উপাদান জিঙ্ক অক্সাইড। নানা মাধ্যমে জিঙ্ক হোয়াইট পাওয়া যায়। যেমন তেল রং, অ্যাক্রিলিক, অ্যালকিড পেন্ট, জল রং। এসব রঙে ব্যবহৃত জিঙ্ক হোয়াইট

চাইনিজ হোয়াইট এবং পারমানেন্ট হোয়াইট নামে পরিচিত। তেল রঙের ক্ষেত্রে লেড কার্বোনেট দিয়ে তৈরি টক্সিক রং ফ্লেক হোয়াইটের বিকল্প হিসেবে ব্যবহৃত জিঙ্ক হোয়াইট নন টক্সিক। কিন্তু জিঙ্ক হোয়াইটের ওপাসিটি কম অর্থাৎ এই রং ফ্লেক হোয়াইটের চেয়ে কম অনচ্ছ।

জিপসাম (Gypsum) — গ্রাউন্ড হিসাবে ব্যবহৃত জেসোর মূল উপাদান এই সাদা ক্যালসিয়াম সালফেট। গ্রাউন্ড ছাড়াও নানা ধরনের প্লাস্টারের কাজে ব্যবহার করা হয়। যেমন প্লাস্টার অব প্যারিস। জিপসামের একটা ধরন হল অ্যালবাস্টার। মিহি এই প্লাস্টার মূর্তি নির্মাণ এবং অলংকার তৈরির কাজে লাগে।

জিয়োমেট্রিক আর্ট (Geometric Art) — প্রাক ক্ল্যাসিকাল যুগের গ্রিক শিল্প। আনুমানিক সময়কাল খ্রিস্টপূর্ব নবম থেকে অষ্টম শতাব্দী। পটারি শিল্প ছিল গ্রিক ভাসচিত্রের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্য থেকেই বিশেষ করে এর গায়ে নানা জ্যামিতিক আকৃতির বন্ধনী, জিগজাগ রেখা সমন্বয়ে সৃষ্ট প্যাটার্ন প্রযুক্ত হয়। আদিতে এইসব প্যাটার্ন সরলধর্মী হলেও ক্রমে তা বিচিত্র শৈলীবদ্ধ রূপ ধারণ করে এবং তার মধ্যে জ্যামিতির ঢঙের হিউম্যান ও অ্যানিম্যাল ফিগারেরও প্রয়োগ ঘটে।

জিরো গ্রুপ (Zero group) — জিরো আসলে ছিল ১৯৫৮ সালে প্রকাশিত শিল্পকলা পত্রিকার নাম। পরবর্তীকালে একটি শিল্পী গোষ্ঠীর নাম হিসাবে পরিচিত হয়। পশ্চিম জার্মানির এই শিল্পীরা ছিলেন গতিবাদী শিল্পী বা কাইনেটিক আর্টিস্ট। হাইনজ্ ম্যান এবং অটো পিনে শিল্পীদ্বয়কে কেন্দ্র করে বাকি শিল্পীরা জড়ো হয়েছিলেন। গুন্টার একার নামে একজন বিশিষ্ট জার্মান কাইনেটিক শিল্পী সমস্ত ধরনের রীতিগত ইজেল পেন্টিং-এর সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেছিলেন। তিনি নতুন ভাবে শুরু করার ঘোষণা দিয়ে 'শূন্য' থেকে শুরু করেন। তাঁদের লক্ষ্য ছিল ছবিতে সরাসরি গতির প্রয়োগ সহ আলোর ব্যবহার এবং সেই সঙ্গে শিল্পীদের দ্বারা পরিবেশের মধ্যে ব্যাপকভাবে বাধা সৃষ্টি করা। প্রযুক্তির প্রতি তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি ইতিবাচক ছিল। স্বভাবতই তাঁরা আগুন, হাওয়া, জল ইত্যাদির সঙ্গে নানা ধরনের যান্ত্রিক কৌশল ব্যবহার করেছিলেন। যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে এই গোষ্ঠী যন্ত্রপ্রযুক্তির সভ্যতার সঙ্গে শিল্পীদের ইতিবাচক সম্পর্কের একটি দৃষ্টান্ত। একই সঙ্গে শিল্পের সাথে মানুষের বিচ্ছিন্নতা কমানোর উদ্যোগ নিয়েছিল

এই গোষ্ঠী। এসব সত্ত্বেও সে সময়কার অন্যান্য কাইনেটিক শিল্পী গোষ্ঠীর ঠিক বিপরীতে দাঁড়িয়ে জিরো গ্রুপ শিল্পকর্মে অযৌক্তিক বিষয়ীগত ভাবনা এবং ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যকে মূল্য দিতেন। ১৯৬৬ সালে এই গোষ্ঠী ভেঙে যায়।

জিলেটিন (Gelatin) — পশুর হাড়, চামড়া এবং অন্যান্য কোষ থেকে প্রাপ্ত একরকম প্রোটিন। খাদ্য, ওষুধ এবং ফোটোগ্রাফিক ফিল্ম তৈরির জন্য ব্যাপকভাবে জিলেটিন ব্যবহার করা হয়। শিল্প উপকরণ হিসাবে জিলেটিন ব্যবহার করা হয় জল রঙের কাগজে ও ক্যানভাসের আঠা হিসাবে। সিল্কস্ক্রিনে ফোটোগ্রাফিক স্টেনসিল তৈরির জন্য, কোলোটাইপে আলোক সংবেদী প্লেট হিসাবে, এবং শিশুদের জন্য টেম্পারা রঙের বাইন্ডার হিসেবে।

জিলেটিন প্রিন্ট (Gelatin print) — কাগজের ওপর নেওয়া ফোটোগ্রাফিক প্রিন্ট। এই ধরনের প্রিন্ট নেওয়ার জন্য কাগজে আলোক সংবেদী লবণ সম্পৃক্ত জিলেটিনের প্রলেপ লাগানো থাকে। এই প্রক্রিয়াই এখন ব্লক তৈরি ও সাদা ফোটোগ্রাফি নেওয়ার আদর্শ পদ্ধতি।

জি. এস. এম (GSM) — কাগজের থিকনেস তথা পাতলা কি মোটা তা মাপার একক। জি. এস. এম. এর পুরো কথা হল গ্রাম পার স্কোয়ার মিটার অর্থাৎ এক বর্গমিটার কাগজের ওজন।

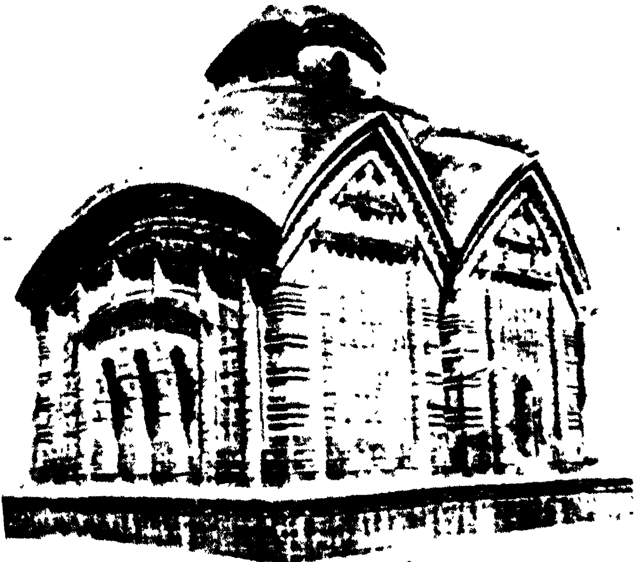
জেরোগ্রাফি (Xerography) — সাধারণ কাগজে ছবি প্রতিলিপিকরণের যান্ত্রিক পদ্ধতি। সাদাকালো এবং রঙিন দু-ধরনেরই হয়। তবু এখনও পর্যন্ত এর কয়েকটি অসুবিধে রয়েছে। তার মধ্যে প্রথম হল যে কাগজ ব্যবহার করা যায় তার মাপ নির্দিষ্ট এবং গ্রেডও স্থির। দ্বিতীয়ত ব্যবহৃত কালির আলো প্রতিরোধী ক্ষমতা ভালো নয়। এটুকু ত্রুটি ছাড়া এই যন্ত্র চমৎকার কাজ দেয়। এই প্রক্রিয়ার জন্য ব্যবহৃত যন্ত্রটি জেরক্স নামে পরিচিত।

জেসো (Gesso) — সাদা পিগমেন্ট যথা জিপসাম এবং বাইন্ডার অর্থাৎ গ্লু-র মিশ্রণ। শব্দটি জিপসামের ইটালীয় পরিভাষা থেকে এসেছে। বহু শতাব্দী ধরে বিভিন্ন মাধ্যমের ছবির গ্রাউন্ড তৈরির জন্য জেসো ব্যবহার হয়ে আসছে। উত্তর ইউরোপের বিভিন্ন দেশে জার্মানি এবং নেদারল্যান্ডে জিপসামের পরিবর্তে চক ব্যবহার করে একই রকম গ্রাউন্ড তৈরির প্রচলন ছিল। প্রাক রেনেসাঁস এবং রেনেসাঁসে টেম্পারা ছবির গ্রাউন্ডে জেসো ব্যবহার করা হত। নমনীয় পদার্থ যেমন ক্যানভাস, কাগজ ইত্যাদি জেসো

গ্রাউন্ডের জন্য উপযুক্ত নয়। সাধারণভাবে কাঠ বা হার্ডবোর্ডই জেসো ব্যবহারের উপযুক্ত তল। আজকাল জেসোর নানারকম রেডিমেড রেসিপি পাওয়া যায়। এই সব আধুনিক রেসিপিতে বডি এবং খসখসে ভাবের জন্য মিহি মার্বেল ডাস্ট, টিটিনিয়ামের সাদা পিগমেন্ট এবং সিরিশ আঠা ব্যবহার করা হয়।

জোড়বাংলা মন্দির

পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার মহকুমা শহর বিষ্ণুপুর। একদা মল্ল রাজাদের রাজধানী। মল্ল রাজাদের পাঁচশ বছরের রাজত্বে রাঢ়ের ইতিহাসে বাঁকুড়ার শিল্প ও সংস্কৃতি চরম উন্নতি লাভ করে। বিষ্ণুপুর তথা মল্লভূমের সংস্কৃতি বিকাশের সঙ্গে বৈষ্ণব ধর্মের সম্পর্ক খুবই নিবিড়। মন্দির নির্মাণ ও ভাস্কর্য সজ্জায় তা স্পষ্ট। টেরাকোটা শিল্প সমৃদ্ধ মন্দির আকীর্ণ বিষ্ণুপুরকে স্বভাবতই City of Art বলা যেতে পারে। আর এই সব মন্দিরের মধ্যে অন্যতম বিশিষ্ট হল জোড়বাংলা অর্থাৎ কালাচাঁদের মন্দির। এই মন্দিরকে বাঁকুড়ার 'তাজমহল'ও বলেছেন কেউ কেউ। বাংলার কুটির দেউল রীতিতে তৈরি হলেও জোড়বাংলার কিছু আলাদা বৈশিষ্ট্য আছে। এই মন্দিরের প্রধান প্রবেশ পথের খিলান তিনটির আকৃতি পাতার মতো নয়। এর দক্ষিণ দিকেই একমাত্র ঢাকা বারান্দা আছে। দোচালা দুটোর সংযোগস্থলে অবস্থিত চতুষ্কোণ চুড়া সৌধ ভিত্তি বেদির ওপর স্থাপিত এবং এই সৌধের মাথায় চৌচালা



নং ১০২. বিষ্ণুপুরের জোড়বাংলা মন্দির। বাঁকুড়া।

আকৃতির ছাদ যুক্ত করা হয়েছে। এই মন্দির নির্মিত হয়েছিল ১৬৫৫ খ্রিস্টাব্দে রাজা রঘুনাথ সিংহের দ্বারা। মন্দির নির্মাণের ক্ষেত্র মল্ল রাজাদের পছন্দ ছিল শিখর-মন্দির রীতি। জোড়বাংলা মন্দিরে শুধুমাত্র দেবমূর্তি স্থাপন করেই রাজারা ক্ষান্ত হননি। টেরাকোটার অজস্র ভাস্কর্য দিয়ে মন্দির সাজিয়েছেন তাঁরা। টেরাকোটার এমন বিপুল সমাবেশ আর কোথাও দেখা যায় না। জোড়বাংলা মন্দিরের দক্ষিণ দিকে কৃষ্ণলীলা আর সমান্তরালে পশ্চিমদিকে রামকথা। সেই সঙ্গে মন্দিরে আছে সাধারণ নরনারীর তালবাদ্য বাজানোর দৃশ্য। জোড়বাংলায় বাস্তব যুদ্ধের দৃশ্যের আধিক্য আছে। সাধারণ সমাজ জীবনের দৃশ্যও আছে মন্দিরের গায়ে। তার মধ্যে মাছ বিক্রি, সিঁদুর দান, প্রসাধন দৃশ্য, দাসীবৃত্তি, পশুপাখি, সাপ, রাখালবালকের গোচারণ ইত্যাদি বিচিত্র বিষয় মন্দিরটিকে অনন্য রূপ দান করেছে। টেরাকোটা রিলিফের এই শিল্পকর্ম দ্বিমাত্রিক। কিন্তু এতে মনুমেন্টাল গুণ আরোপিত হওয়ায় তা ব্যতিক্রমী মাত্রা পেয়েছে।

জ্যাক অব ডায়মন্ড (Jack of Diamond)

একটি রাশিয়ান আভঁ গার্দ শিল্পী গোষ্ঠী। রাশিয়ান ভাষায় 'বুবনোভি ভ্যালে' নামে পরিচিত। ১৯১০ সালে এই গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠা করেন বিশিষ্ট তরুণ রাশিয়ান চিত্রকর মিখাইল ল্যারিয়োনভ। এই গোষ্ঠী 'নেভ অব ডায়মন্ড' নামেও পরিচিত ছিল। এই শিল্পীরা ছিলেন প্যারিসমুখী এবং রাশিয়ান আর্ট স্কুলের বিরুদ্ধে ১৯০৯ সালে এঁরা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। ছবিতে চড়া রং ও ফর্মের নিজস্ব ধরনের সরলীকরণের মধ্য দিয়ে সৃষ্ট সারফেস প্যাটার্ন ছিল এঁদের বৈশিষ্ট্য। এই গোষ্ঠী সে সময়ের যে সব বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের নজরে এসেছিল তার মধ্যে ছিলেন এক্সটার, ভ্লাদিমির, বারলিউক প্রমুখ। ১৯১০ সালে এঁদের প্রদর্শনীতে গ্রুপের সদস্য ছাড়া বাইরের শিল্পীদের অংশ নেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। যার মধ্যে ছিলেন ক্যান্ডিন্‌স্কি, জয়েলনস্কি প্রমুখ। ল্যারিয়োনভ ছাড়াও এই গোষ্ঠীর মধ্যে ছিলেন গনচারোভা, লেনটুলভ, রবার্ট ফক, ম্যালেভিচ প্রমুখ। ১৯২২ সাল পর্যন্ত গোষ্ঠীর নামে প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। প্রদর্শনীর পর ল্যারিয়োনভ গোষ্ঠী ত্যাগ করে চলে যান। পরবর্তীকালে জ্যাক অব ডায়মন্ড গোষ্ঠী রাশিয়ান ফিউচারিজমের কেন্দ্র হয়ে ওঠে।



ট

টক্সিক
(Toxic)

কিছু শিল্পদ্রব্য আছে যা বিষাক্ত। বিশেষ করে কিছু রং আছে যা এড়িয়ে চলা উচিত অথবা খুব সতর্কতার সঙ্গে ব্যবহার করা উচিত। যেমন রঙের ক্ষেত্রে যেসব রং-এ ক্যাডমিয়াম বা লেড আছে সেসব রং সাবধানে ব্যবহার করতে হবে। এছাড়াও কিছু পদার্থ যেমন টারপেনটাইন, গ্লু এসব যাতে শরীরে শোষিত হতে না পারে তার দিকেও নজর রাখতে হবে।

টরসো
(Torso)

মাথা এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নেই এমন ভাস্কর্য মূর্তি। কোনো দুর্ঘটনায় এমনটা হতে পারে অথবা পরিকল্পিতভাবেও এমন নির্মাণ হতে পারে।



নং ১০৩. মস্তকহীন বুদ্ধে মূর্তি (টরসো)। উচ্চতা ৩০ ইঞ্চি। সারনাথ। চুনারেব বেলে পাথরে তৈরী মূর্তিটিব সম্ভাব্য নির্মাণকাল পঞ্চম শতাব্দী।

টাই অ্যান্ড ডাই
(Tie-and-dye)

বাংলা প্রচল 'বাঁধনি'। কাপড়ে নকশা তৈরির একটি পদ্ধতিগত কৌশল। এই প্রক্রিয়ায় কাপড়ের নির্দিষ্ট অংশ বা ছকে নেওয়া নকশার গতিপথে কাপড়ের অংশকে সুতো দিয়ে কষে বেঁধে রঙে বা ডাই-এ ডোবানো হয়। বাঁধনের অংশগুলিতে রং ধরে না। ফলে কাপড় নকশাদার হয়ে ওঠে।

*বাটিক দেখুন

টাউন স্কেপ (Town scape)
কোনো শহরের দৃশ্য বা দৃশ্যাংশের পেন্টিং, ড্রয়িং বা ছাপাই ছবি। অথবা হালফিলের স্থাপত্যভাষায় একটি শহর বা শহরের কোনো অংশকে এমন রূপে তৈরি করা যা প্রাকৃতিক দৃশ্যে দেখা ছবির সদৃশ।

টারপেনটাইন (Turpentine)
তেল রং গোলার জন্য ব্যবহৃত সলভেন্ট অয়েলের সুপরিচিত নাম। আসলে টারপেনটাইন হল তামাটে হলুদ রঙের ভারী ও ঝাঁঝালো তরল। বিভিন্ন উদ্ভিদের পাতলা নরম কাঠ বিশেষ করে পাইন কাঠ থেকে এই তরল পাওয়া যায়। এই অপরিশোধিত ঘন তরলকে পরিশ্রুত করলে দুটো পদার্থ পাওয়া যায়। একটি হল পাতলা টারপেনটাইনের তেল যাকে স্পিরিট অব টারপেনটাইন বলা হয় এবং শক্ত কালো রোজিন যাকে রেজিন বলে।

টারশারি কালার (Tertiary Colour)
বর্ণচক্রে একটি প্রাইমারি কালার তার পাশের সেকেন্ডারি কালারের সঙ্গে মিশে যে রং তৈরি করে তা হল টারশারি কালার। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে নীল রং (প্রাথমিক বর্ণ) সবুজের (সেকেন্ডারি) সঙ্গে মিশে যে নীলচে সবুজ তৈরি করে তা হল টারশারি কালার। অথবা হলুদ (প্রাইমারি রং) কমলা (সেকেন্ডারি) রঙের সঙ্গে মিশে যে হলুদাভ কমলা তৈরি করে তা টারশারি কালার।

টিন্ট (Tint)
কোনো রঙের হালকা শেড বা আভা। এটা তৈরি হয় রঙের সঙ্গে বেশি করে মিডিয়াম অথবা সাদা রং মিশিয়ে। সাদা রং ছাড়া যে কোনো রঙের অসংখ্য টিন্ট তৈরি করা সম্ভব।

টিনটাইপ (Tintype)
টিনের প্রলেপ লাগানো লোহার প্লেটে কৃত ছোটো ফোটোগ্রাফ। এই কাজে 'কলোডিয়ন ওয়েট প্লেট প্রসেস'-এর একটি পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। এটা নেগেটিভ ইমেজের পরিবর্তে পজিটিভ ইমেজ দেয়। এই প্লেট কাচের নেগেটিভ ও পজিটিভের চেয়ে সস্তা এবং ব্যবহার করা সহজ। প্রতিকৃতি চিত্রের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতিতে খুব দ্রুত ফল পাওয়া যায়। এক্সপোজার দেওয়ার কয়েক মিনিটের মধ্যে প্রিন্ট রেডি করা যায়। ১৮৫৩ সালে ফরাসি নাগরিক আদোলফ আলেকসন্দ্র মারতাঁ এই পদ্ধতিই উদ্ভাবন করেন। ১৮৬০ সালের পর টিনটাইপ খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল।

টিনসেল পেন্টিং (Tinsel Painting)
কাচের উলটো দিকে ছবি এঁকে তারপর একটা মোচড়ানো টিনের তবক এঁটে দিয়ে কাঁচটা ঘুরিয়ে দেখলে মনে হবে ছবিটা

নিজেই চমকাচ্ছে। এরকম ছবিকে বলে টিনসেল পেন্টিং।

টু-পয়েন্ট পারস্পেকটিভ (Two-point Perspective)
লিনিয়ার পারস্পেকটিভে কোনো বস্তু যখন এমনভাবে অবস্থান করে যে বস্তুটি থেকে প্রসারিত অনুভূমিক রেখাগুলি দুটো ভিন্ন ভ্যানিশিং পয়েন্টে এসে মিলিত হয়।

টেক্সচার (Texture)
শিল্প ও ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে পেন্টিং, স্কাল্পচার বা বিল্ডিং ইত্যাদির সারফেস বা পৃষ্ঠদেশের চরিত্র ও চেহারার মসৃণতা, বন্ধুরতা। শিল্প বা ভাস্কর্যের পৃষ্ঠদেশে বা সারফেসে এসব ধরনের গুণ আরোপ করতে নানারকম যন্ত্রের সাহায্য নিতে হয়। যেমন ভাস্কর্য বা স্থাপত্যে বাটালি বা স্ক্র্যাপার ইত্যাদির সাহায্যে খাঁজকাটা, গর্তকরা বা এবড়োখেবড়ো তল তৈরি করা হয়। আবার পেন্টিং-এ নানা ধরনের রেখা, হ্যাচিং বা ক্রসহ্যাচিং ইত্যাদির প্রয়োগ, এলোমেলো ব্রাশ চালিয়ে এক ধরনের টেক্সচার বা বুনট তৈরি করা হয়। অথবা রঙের সাথে দানাদার পদার্থ যথা মার্বেল গুঁড়ো ইত্যাদি মিশিয়েও রংকে অমসৃণ বা বুননযোগ্য করে তোলা যায়। ছাপাই ছবি বা প্রিন্ট মেকিং-এর ক্ষেত্রে ক্ষয়কারক পদার্থ দিয়ে ধাতবপাতকে অতিরিক্ত পরিমাণে খাইয়ে (Bite) বুনট তৈরি করা যায়।

টেম্পার (Temper)
কোনো কিছুকে ব্যবহারযোগ্য করে তোলা। পেন্টিং-এর ক্ষেত্রে টেম্পার হচ্ছে কোনো পদার্থকে যোগ করা। যেমন একটি মাধ্যম (medium) যোগ করে পাউডার বা অন্যান্য পদার্থকে রং হিসেবে ব্যবহারযোগ্য করে তোলা। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় পিগমেন্টের সাথে ডিমের কুসুম মেশানো।

টেম্পারা (Tempara)
ছবি আঁকার এক ধরনের রং। এতে প্রাকৃতিক ইমালশন যথা ডিমের কুসুম, কৃত্রিম ইমালশন যেমন গাম অথবা গ্লু পিগমেন্টের মাধ্যম বা ভেহিকল হিসেবে কাজ করে। ইমালশনের বিশেষত্ব হল এটা এমন দুটো তরলের অঙ্গীভূত স্থায়ী মিশ্রণ যারা পরস্পর সাধারণভাবে মেশে না। যেমন তেল ও জল। টেম্পারাতে ব্যবহৃত ইমালশন সাধারণ ভাবে জলে দ্রবীভূত অথবা তেল ও জলের মিশ্র ইমালশন। যেখানে জলের মধ্যে তেলের অতি সূক্ষ্ম কণারা ভেসে থাকে কিংবা উলটোভাবে তেলের মধ্যেও অতি সূক্ষ্ম জলকণা ভেসে থেকে ইমালশন তৈরি হতে পারে।

টেম্পারার সবচেয়ে সাধারণ রূপ হল এগ টেম্পারা। এগ টেম্পারা জলে দ্রবীভূত হয়। ডিমের কুসুম হল প্রাকৃতিক

ইমালশন। এটা জল সহযোগে পিগমেন্টের সঙ্গে মিশলে দ্রুত শুষ্কশীল এবং উন্নত ধরনের পেন্টিং-এর মাধ্যম তৈরি হয়।

এগ টেম্পারা ধীরে ধীরে ও সতর্কভাবে ছবি আঁকার সাবেকি এক মাধ্যম। এই মাধ্যম ক্যানভাসের ওপর সরাসরি মোটা করে রং চাপিয়ে আঁকার উপযুক্ত নয়। এগ টেম্পারাতে একটার ওপর আরেকটা খুব পাতলা বর্ণস্তর চাপিয়ে প্রণালীবদ্ধভাবে কাজ করতে হয়। এই রঙের চমৎকারিত্বের অন্যতম দিক সম্ভবত এই যে অনেক বেশি স্ট্রোক সুপারইম্পোজ করে চাপানো যায় এবং স্বচ্ছতা নষ্ট হয় না। বস্তুত পরবর্তী স্তরগুলিতেও প্রথম দিকের চাপানো রঙের ফলাফল বিদ্যমান থাকে।

পঞ্চদশ শতাব্দীর ইউরোপে প্যানেল পেন্টিং এবং ফ্রেস্কোতে এগ টেম্পারা খুবই সাধারণ মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হত। এছাড়াও টেম্পারা অয়েল পেন্টিং-এর অন্তস্তর হিসাবে দীর্ঘকাল ধরে ব্যবহৃত হয়েছে। বিশুদ্ধ এগ টেম্পারা ছাড়াও আরও কয়েক ধরনের টেম্পারার প্রস্তুত প্রণালী রয়েছে। এইসব প্রণালী অনুযায়ী প্রস্তুত টেম্পারা ব্যবহারেরও দীর্ঘ ইতিহাস আছে। এইসব টেম্পারাতে বিভিন্ন কারণে অতিরিক্ত উপাদান মেশানো হয়। এসবের মধ্যে আছে তেল, রেজিন, গঁদের আঠা, গ্লিসারিন এবং গ্লু। সামান্য পার্থক্য থাকলেও প্রত্যেকটি প্রণালীতেই রঙের পাতলা ফিলম্ তৈরি হয়। ডিমের কুসুম ছাড়া শুধুমাত্র গাম অ্যারাবিক দ্রবণ দিয়েও টেম্পারা করা যায়। সেক্ষেত্রে গাম অ্যারাবিক-এর সাথে তেল বা রেসিন অথবা দুই-ই মিশিয়ে ইমালশন তৈরি করতে হবে। যা মাধ্যম হিসাবে কাজ করবে। তবে এই রং এগ টেম্পারার মতো নয়। সব রকম তলে এই টেম্পারা দিয়ে কাজও করা যায় না। এই রং এগ টেম্পারার মতো কোমলও নয়, শুকিয়ে গেলে খুব শক্ত হয়ে যায়। এগ টেম্পারার মতো আঙুলের সাহায্যে আঁচড় কাটা যায় না তবে অল্প সময়ের মধ্যে ভিজে ব্রাশ দিয়ে ঘষলে রং গুলে যায়। এ ছাড়া জিলেটিন বা সিরিশ আঠা, গ্লু বা এই জাতীয় অন্য আঠাও টেম্পারার জন্য ব্যবহার করা যায়।

টেম্পারা ইমালশনের কিছু প্রণালী : ১. সাধারণভাবে ১ ভাগ ডিম, ১ ভাগ তেল (তিসি) এবং ২ ভাগ জল। যদি রেজিন মেশাতে হয় তাহলে জল দ্বিগুণ করতে হবে। সেক্ষেত্রে ২ ভাগ ডিম, ১ ভাগ তেল, ১ ভাগ রেজিন এবং ৪ ভাগ জল। এগ

টেম্পারার ক্ষেত্রে ডিমের সাদা অংশ ব্যবহার করা গেলেও বেশিরভাগ শিল্পী কুসুমই পছন্দ করেন।

টেরাকোটা (Terra-Cotta)

বাঙালির কাছে টেরাকোটা শব্দ কোনো অপরিচিত বিষয়ই নয়। বিষ্ণুপুর সহ আরও অনেক জায়গায় মন্দিরের গায়ে এই টেরাকোটার অমূল্য নিদর্শন আমরা দেখেছি। তা ছাড়া কুমোরের হাঁড়ি, কলসি ইত্যাদিও টেরাকোটার উদাহরণ। টেরাকোটা ইটালীয় শব্দ, যার অর্থ 'পোড়ামাটি'। ইংরেজিতে 'Baked earth'. প্রাচীনকাল থেকেই শিল্পে, ভাস্কর্যে, স্থাপত্যে টেরাকোটার ব্যবহার হয়ে আসছে।

এঁটেল মাটির সঙ্গে বালি, তুষ, ভুষি ইত্যাদি ভালো করে মিশিয়ে ছেনে কাদামাটি তৈরি করা হয়। তারপর নানান মূর্তি বা শিল্পদ্রব্য তৈরি করা হয়। এইসব দ্রব্য শুকিয়ে গেলে ভাটিতে কাঠের আঁচে পোড়ানো হয়। এই ভাটি তৈরি এবং তাপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কেন-না আঁচের তারতম্য হলে জিনিসপত্র ফেটে যেতে পারে। পোড়ামাটির সুন্দর লালচে বাদামি রং স্থানে স্থানে কালো হয়ে যেতে পারে। একেবারে গোড়ার দিকে হাতে টিপেই জিনিস পত্র তৈরি করা হত এবং পোড়ানো হত। পরে চাকের আবিষ্কার হলে চাকে ফেলে নানা জিনিস তৈরি হতে শুরু করে।

খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দী থেকে, গ্রিস ও গ্রিস প্রভাবিত এশিয়া ইতালি, ক্রিট প্রভৃতি দেশে টেরাকোটা ভাস্কর্যের বহুল প্রচলন হয়। মন্দিরের দেয়াল টেরাকোটার ভাস্কর্য দিয়ে সাজানো হত। রোম সাম্রাজ্যের পতনের পর ইতালিতে



নং ১০৪. বিষ্ণুপুরের মন্দিরের টেরাকোটা ভাস্কর্য।

টেরাকোটা শিল্পের অবনতি হয়। রেনেসাঁসের সময় ইতালির ফ্লোরেন্স-এর অধিবাসী দেল্লা রাব্বিয়ারা চকচকে পালিশ করা টেরাকোটা প্রবর্তন করেন এবং তা সমগ্র ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। ভারতে প্রাগৈতিহাসিক সময়েরও অনেক টেরাকোটা মূর্তি পাওয়া গেছে। তার মধ্যে কিছু ছাঁচে গড়া। আদিম ভাবসপন্ন এইসব মূর্তির মধ্যে মাতৃকা মূর্তি ও পশু মূর্তি উল্লেখযোগ্য। সম্ভবত মাধ্যমগত সীমাবদ্ধতার কারণে টেরাকোটা ভাস্কর্য কখনোই পাথরের ভাস্কর্যের সম পর্যায়ে স্থান পায়নি। উত্তর ভারতের প্রত্নতাত্ত্বিক অঞ্চল সমূহে প্রচুর টেরাকোটা পাওয়া গেছে। এ সব ছাঁচে গড়া হলেও মণ্ডন খোদাই করে তৈরি এমন টেরাকোটাও পাওয়া গেছে। প্রাক মৌর্য, মৌর্য, শুঙ্গ, কুষাণ প্রভৃতি যুগে টেরাকোটার নমুনা পাওয়া গেছে। টেরাকোটার উৎকর্ষ বিধান লক্ষ করা যায় গুপ্তযুগে। এ সময়ের টেরাকোটা ফলক পাওয়া গেছে বসরা, কোশাম, চন্দ্রকেতু গড় সহ নানা স্থানে। বাংলার পাল আমলে অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীতে বর্তমান বাংলাদেশের বগুড়া, রংপুর, কুমিল্লা, পাহাড়পুরে নির্মিত ইটের মন্দিরগাত্রে টেরাকোটার অলংকরণের নিদর্শন আছে। এই সময়ের মন্দির টেরাকোটাতে আছে লোকায়ত শিল্পের নিদর্শন। পরবর্তীকালে পাল ও সেন আমলে নির্মিত বর্ধমান, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, চব্বিশ পরগনাতে ইটের মন্দিরগুলির গায়ে যে টেরাকোটা দেখতে পাওয়া যায় তার মধ্যে আছে সূক্ষ্ম সৌন্দর্য ও পরিমার্জিত রুচির শিল্প নিদর্শন।

অন্যদিকে বাংলায় সুলতানি আমলে যেসব স্থাপত্য গড়. হয়েছিল তার গায়ে যে সব আলংকারিক টেরাকোটা ব্যবহার করা হয়েছিল তার শৈলী তৈরি হয়েছিল ইরানীয় মোটিফ ও দেশজ লোকায়ত আঙ্গিক এবং উচ্চকোটির মোটিফ আর আঙ্গিকের মিশ্রণের ফলে। মুসলিম স্থাপত্যে ব্যবহৃত আলংকারিক নকশায় মূর্তির বদলে লো রিলিফের নকশার প্রয়োগ ঘটানো হয়েছে। আর টেরাকোটার বিকাশ ঘটেছে মন্দির গাত্রের মূর্তির রচনায় বিশেষ করে রামায়ণের কাহিনি বর্ণনা কৃষ্ণলীলা এবং নানা সামাজিক দৃশ্যে। এ সব ভাস্কর্য আঙ্গিকের উপাদান সংগৃহীত হয়েছিল বাংলার পাথরের কাজ, কাঠের কাজ, মৃৎশিল্প, পটশিল্প, দক্ষিণ ভারত ও উড়িষ্যার কাঠের কাজ প্রভৃতিকে ভিত্তি করে পরীক্ষানিরীক্ষার মধ্য দিয়ে। এইভাবে সুনির্দিষ্ট শিল্পরূপের উদ্ভবের মধ্য দিয়ে

বাংলার টেরাকোটা শিল্পের বিকাশ হয় সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্য পর্ব থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত। এ সব মন্দিরে ব্যবহৃত টেরাকোটাগুলি আসলে টেরাকোটা টাইলস বা ফলক। যা সারিবদ্ধভাবে সাজিয়ে অলঙ্কৃত করা হত। এ সময়ে নির্মিত কয়েকটি মন্দির হল সীতারাম, বাহিরগড়, হুগলি (১৭০০ খ্রি:), দধিমাধব, অমরাগড়ি, হাওড়া (১৭৬৪ খ্রি:), শ্যামরায় (১৬৪৩ খ্রি:), মদনমোহন, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া (১৬৯৪ খ্রি:), নন্দলাল, হালিশহর, চব্বিশপরগনা (১৭৪৩ খ্রি:), গোপীনাথ, দাসপুর, মেদিনীপুর (১৭১৬ খ্রি:)।

টোন (Tone) — রঙের উজ্জ্বলতা বা অনুজ্জ্বলতার আপেক্ষিক পরিমাপ। অনেক সময় ভ্যালু বলা হয়। বাস্তবে যত রকমের টোন দেখতে পাওয়া যায় কোনো এক সেট পিগমেন্ট দিয়ে তাকে সম্পূর্ণভাবে ধরা যায় না। শিল্পীরা সেই কারণেই সর্বোচ্চ উজ্জ্বলতা থেকে সর্বনিম্ন উজ্জ্বলতা বোঝাতে কিছু কৌশলের আশ্রয় নেন কার্যত দৃষ্টি বিভ্রম সৃষ্টি করতে। অপেক্ষাকৃত কম উজ্জ্বল অংশের পাশে যদি খুব ডার্ক রং-এর অংশ ব্যবহার করা যায় তাহলে সেই অংশের উজ্জ্বলতা বেশি বলে মনে হবে। একইভাবে কোনো রঙের দৃশ্যগ্রাহ্যতা বা গুরুত্ব বাড়িয়ে তুলতে তার পাশে বেশি ডার্ক বা লাইট রঙের ব্যবহার করা হয়। তাছাড়া রঙের আভা বা ছায়াকেও টোন বলে। টোনাল ভ্যালুর ক্ষেত্রে রং বা হিউর চেয়েও বড়ো কথা হল রংগুলির তুলনামূলক উজ্জ্বলতা এবং অনুজ্জ্বলতা। যদি সবুজ ও লাল রঙের দুটো প্যাচকে পাশাপাশি রেখে সাদাকালো ছবি নেওয়া যায় তাহলে দেখা যাবে দুটো রঙের টোনাল ভ্যালু প্রায় একইরকম। কিয়ারসকিউরোতে এই টোনাল ভ্যালুর চূড়ান্ত বৈপরীত্য লক্ষ করা যায়।

টোনাল ভ্যালু (Tonal Value) — টোন দেখুন।

ট্যাকটাইল ভ্যালু (Tactile Value) — একটি দ্বিমাত্রিক ছবির আঙ্গিক এমনভাবে তৈরি করা হয় যা দেখে কখনো-কখনো স্পর্শানুভূতি জাগে। এইরকম অবয়ব ও অঙ্গিকগত গুণকে বলা হয় ট্যাকটাইল ভ্যালু। ট্যাকটাইল ভ্যালু সৃষ্টির মধ্য দিয়ে শিল্পী দ্বিমাত্রিক তলে ওজন, বন্ধুরতা (উঁচুনিচু) এবং বুনট (Texture) ইত্যাদি অনুভূতিকে বোঝাতে চান। শিল্প ঐতিহাসিক ও রসিক বার্নার্ড বারেনসন এই শব্দযুগল প্রথম চালু করেন।

ট্যানাগ্রা (Tanagra)

ছাঁচে ঢালাই করা টেরাকোটা মূর্তি। ১৮৭৪ সালে বোয়েশিয়ার ট্যানাগ্রাতে ওইরকম কতগুলি মূর্তির সন্ধান পাওয়ার পর এই নামকরণ হয়। এসব মূর্তি তৈরি হয়েছিল ক্ল্যাসিকাল বা হেলেনিসিটিক যুগে গ্রিস বা গ্রিক-এশিয়া মাইনরের নানা জায়গায়। মূর্তিগুলিতে বহু ধরনের বিষয় থাকলেও অভিজাত পোশাকের নারীমূর্তিই বিশেষভাবে প্রাধান্য পেয়েছে।

ট্যাপিস্ট্রি (Tapestry)

ঢাকনার কাজে ব্যবহৃত মূলত হাতে বোনা কাপড়। প্রধানত উল অথবা সিল্ক অথবা দুটো মিশিয়েই এই কাপড় বোনা হয়। বুনেই নকশা করা হয়। সাধারণত রিপিটিশন সম্পন্ন আলংকারিক নকশা এতে থাকে না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ফিগারেটিভ দৃশ্য চিত্রিত থাকে। চতুর্দশ শতাব্দী থেকেআধুনিক কাল পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে নানান জায়গায় এই শিল্পের রমরমা হয়েছিল। এইসব জায়গার মধ্যে ব্রাসেলস, প্যারিস, ইংল্যান্ডের নানা স্থান উল্লেখযোগ্য। দু-ধরনের পদ্ধতিতে ট্যাপিস্ট্রি বোনা হয়—'ব্যাসি লিসি' এবং 'হটি লিসি'। ট্যাপিস্ট্রি হল নকশাকার (designer) এবং তাঁতিদের যৌথ উদ্যোগ। ডিজাইনার মূল কাপড়টির চূড়ান্ত নকশা করেন এবং একজন দক্ষ তাঁতি তা রূপায়িত করেন। এরমধ্যে এমন কিছু বয়ন আছে যাতে পড়েন-এর সুতো পুরো বহর অবধি থাকে না। শুধুমাত্র লম্বার দিকেই রঙিন সুতোগুলো ব্যবহার করা হয় নকশার লক্ষ্য অনুযায়ী। সুতোর মিহিত্ব এবং ব্যবধানের ওপর ভিত্তি করে মোটা ও মিহি দু-ধরনের কাপড়ই বোনা হয়। র‍্যাফায়েল, রুবেনস প্রমুখের মতো দিকপাল শিল্পীরাও ট্র্যাপিস্ট্রির নকশা তৈরি করেছিলেন।

ট্র্যানজিশনাল স্টাইল (Transitional Style)

একটি শৈলীকে ব্যবহার করতে করতে নতুন আরেকটি শৈলীতে উত্তরণের সময়কালীন শিল্পশৈলী। মূলত এটা ঘটেছিল স্থাপত্যে। রোমানেস্ক এবং গথিকের মাঝখানে ইউরোপে এই ধরনের ঘটনা ঘটেছিল। আবার ইংল্যান্ডে ঘটেছিল নরম্যান এবং আরলি ইংলিশ-এর মাঝখানে। এই রীতিতে গথিক পূর্ববর্তী যুগের শৈলীর মধ্যে গথিক ডিটেলসকে ব্যবহার করা হয়েছিল।

ট্রিপটিচ (Triptych)

সাধারণভাবে তিনটি পৃথক পৃথক প্যানেলে আঁকা পাশাপাশি কবজা দিয়ে আটকানো একটি ছবি বা শিল্পকর্ম যা দরজার মতো ভাঁজ করে রাখা যায়। কখনো-কখনো তিনটে প্যানেলে আলাদা আলাদা ছবিও করা যেতে পারে।

ট্রেসিং পেপার
(Tracing Paper)

পাতলা অনচ্ছ এক ধরনের কাগজ, কোনো নকশা নকল করার জন্য ব্যবহার করা হয়। অথবা কোনো ছবির ওপর রেখে ছবিটির প্রয়োজনীয় পরিবর্তন-সংযোজনের রূপরেখা নির্ধারণ করা হয়। ট্রেসিং পেপার ঠিকমতো অনচ্ছ হওয়া দরকার এবং তা শক্তও হওয়া দরকার যাতে যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে কাজ করার সময় নিচের ছবির ক্ষতি করতে না পারে।



ড

ডমিনেন্স
(Dominance)

ডিজাইন দেখুন।

ডাই
(Dye)

এক ধরনের রঞ্জক বা কালার‍্যান্ট, কিন্তু পিগমেন্ট নয়। কেন-না ডাই তরলে দ্রবীভূত হতে পারে কিন্তু পিগমেন্ট পারে না। ডাই দিয়ে সাধারণভাবে কাপড় ছুপিয়ে রং করা যায় কারণ ডাই কোনো বস্তুকে রাঙিয়ে দিতে পারে অথবা সেই বস্তু দ্বারা বিশোষিত হতে পারে। পেন্ট হিসেবে ডাইকে সরাসরি ব্যবহার করা যায় না। সে ক্ষেত্রে কোনো খনিজ পদার্থের ওপর থিতিয়ে লেক তৈরি করে নিতে হয়। ডাই-এর আলোক প্রতিরোধী ক্ষমতা (lightfastness) খুবই কম। প্রাকৃতিক ডাই মূলত পাওয়া যায় বিভিন্ন উদ্ভিদ, প্রাণীদেহ এবং খনিজদ্রব্য থেকে। কৃত্রিম ডাই তৈরি করা হয় আলকাতরা থেকে।

আর্ট
(Direct Art)

অস্ট্রিয়ার একদল শিল্পী ১৯৬০ সাল নাগাদ এই নামে একটি গোষ্ঠী তৈরি করে কিছুদিন শিল্পচর্চা করেছিলেন। আটোমুয়েল, হারম্যান নিটশে প্রমুখ যাঁরা কয়েকজন মিলে ভিয়েনাতে ইনস্টিটিউট ফর ইমিডিয়েট আর্ট করেছিলেন, তাঁদেরই কয়েকজন ডাইরেক্ট আর্ট নামে এক ধরনের নিষ্ঠুর যৌনতা এবং আত্ম-নিপীড়নমূলক সাডো-ম্যাসোকিস্ট ভঙ্গির শিল্পচর্চায় রত হয়েছিলেন।

ডাঙ্কিস টেল
(Donkey's Tail)

রাশিয়ান আভঁ গার্দ শিল্পীদের একটি গোষ্ঠী। ১৯১১ সালে এই গোষ্ঠী গঠন করা হয়েছিল। জ্যাক অব ডায়মন্ড থেকে

যেসব শিল্পীরা বেরিয়ে এসেছিলেন তাঁদের সাথে নিয়ে এই গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠা হয়। প্যারিসে একটি কাহিনি প্রচলিত ছিল যে একজন শিল্পী গাধার ল্যাজে একটি তুলি বেঁধে ছবি এঁকেছিলেন। এই কাহিনি শুনে ল্যারিয়োনভ গোষ্ঠীর এ রকম নাম দেন। এই গোষ্ঠীর ছবির প্রথম প্রদর্শনী হয় ১৯১২ সালের ১১ মার্চ। তাদের দৃষ্টিভঙ্গির মূল কথা যা তাঁরা ঘোষণাও করেছিলেন তা ছিল, রাশিয়ান শিল্পকে পশ্চিমি নির্ভরতা থেকে মুক্ত করা। পরিবর্তে এই গোষ্ঠীর শিল্পীরা নানা ধরনের রাশিয়ান লোকচিত্রকলা এবং প্রতিকৃতি (icon) কে ব্যবহার করেছিলেন। এই গোষ্ঠীর প্রধান শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন মিখাইল ল্যারিয়োভ, নাতালিয়া গোনচারোভা, ম্যালেভিচ, তাৎলিন প্রমুখ।

ডাকের সাজ

মাটির প্রতিমার অলংকার এবং অন্যান্য অঙ্গ সজ্জার জন্য প্রস্তুত শোলার কারুকর্ম। শোলা দিয়ে এই সাজ তৈরি করেন মূলত মালাকার সম্প্রদায়। বর্ধমান এবং নদিয়া জেলার মালাকারদের তৈরি শোলার 'ডাকের সাজ' খুবই প্রসিদ্ধ। শোলা এমনিতে সাদা এবং হালকা। সেই শোলাকে কেটে নানারকম নকশাদার বস্তু, জরি, রাংতা ইত্যাদি সহযোগে প্রতিমার গহনা, পশ্চাৎপট, চালচিত্র তৈরি করা হয়।

ডান্স অব ডেথ (Dance of Death)



নং ১০৫. মৃত্যু ও সন্ন্যাসী : হোলবাইন। ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দ। উডকাট।

রূপকার্থে নাচের মিছিলের এক ধরনের উপস্থাপনা। এই ধরনের নৃত্যের ছবিতে জীবন ও মৃত্যু দু-য়েরই ব্যবহার থাকে। সাধারণভাবে অংশগ্রহণকারীদের পুরোহিত বা যাজকতান্ত্রিক নানা ঘটনার মধ্যে সন্নিবিষ্ট করা হয়। মধ্যযুগের শেষপর্বের মুরালচিত্রের একটা জনপ্রিয় বিষয় হয়ে উঠেছিল 'ডেথ অব ডান্স'। এর প্রথম দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় প্যারিসের 'হলি ইনোসেন্ট'দের সমাধিক্ষেত্রে ১৪২৪-২৫ সালে। এরপর মুদ্রণ ব্যবস্থা আবিষ্কার ও প্রচলন হলে এই বিষয় নিয়ে বহু বিশিষ্ট শিল্পী ছাপচিত্র তৈরি করেন। ১৫৩৮ সালে লিয়োনসে শিল্পী হোলবাইনের উডকাট চিত্র 'ডান্স অব ডেথ' প্রকাশিত হয়।

ডায়োরামা (Diorama)

এক ধরনের দৃশ্য বা দৃশ্যাঙ্কন। যাতে কোনো পশ্চাৎপটে একটি ফোটোগ্রাফিক বা বাস্তববাদী ধারায় অঙ্কিত দৃশ্যকে উপস্থাপিত করা হয় এবং দর্শক ও পশ্চাৎপটের মাঝখানে নানা ধরনের মূর্তি বা বস্তু সাজিয়ে রাখা হয় বাস্তবতার আবহ তৈরি করতে। মিউজিয়াম ইত্যাদিতে এই ধরনের উপস্থাপনা

দেখা যায়। কলকাতার ভারতীয় জাদুঘরে এথেনিক গ্যালারিতে এর ব্যবহার আছে। ১৮২২ সালে লুইস জ্যাকেস ম্যানডি ডগরে এবং চার্লস বোটন এই কৌশল আবিষ্কার করেন।

ডায়লুয়েন্ট
(Dialuent)

রং পাতলা করতে যে তরল মেশানো হয় তা হল ডায়লুয়েন্ট। অর্থাৎ জল রং পাতলা করার জন্য যে জল মেশানো তা হল জল রঙের ডায়লুয়েন্ট। তেমনি পোস্ত বা তিসির তেল হল তেল রঙের ডায়লুয়েন্ট। ডায়লুয়েন্ট এবং সলভেন্ট এক জিনিস নয়। কারণ সলভেন্টে কোনো পদার্থ রাসায়নিকভাবে মিশে যায়।

ডার্কেনিং অফ অয়েল পেন্ট
(Darkening of Oil Paint)

তেলরং কালো হয়ে যাওয়া দেখুন।

ডিকনস্ট্রাকশন
(Deconstruction)

বাংলায় অবিনির্মাণ। বাংলায় শব্দটি ব্যবহারের পথিকৃৎ গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক। এটি আসলে দার্শনিক এবং সাহিত্যকৃতি পাঠ ও বিশ্লেষণের একটি পদ্ধতি। যার উৎস মূলত ফরাসি চিন্তাবিদ ও দর্শনবিশারদ জাক দেরিদার রচনা ও ব্যাখ্যা। দেরিদাও তাঁর এই চিন্তাসূত্র পেয়েছিলেন কান্ট, নিটশে, হুসেল প্রমুখ দার্শনিকদের রচনা থেকে। দেরিদার এই 'ডিকনস্ট্রাকশন' পদ্ধতির আগেও সাহিত্যপাঠের নানা নির্দেশের পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন, আমেরিকার সমালোচকদের 'নিউ ক্রিটিসিজ্‌সম তত্ত্ব', রাশিয়ার চিন্তাবিদদের অবয়ববাদী তত্ত্ব, সুইস-জার্মান স্ট্রাকচারালিস্ট তত্ত্ব ইত্যাদি। তবে ১৯৬০-এর দশকের শেষ দিকে জাক দেরিদার লেখা দর্শন সংক্রান্ত নানা আকর গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। বিশেষ করে তাঁর দুটো বই, ইংরেজিতে যাদের নাম 'Structure, Sign and Play in discovery of Human Science' (১৯৬৬), 'Of grammatology' (১৯৬৭), প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যপাঠ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে 'ডিকনস্ট্রাকশন' বা অবিনির্মাণের ধারণার সূত্রপাত ঘটে। এর আগেই তথাকথিত 'উত্তর আধুনিক' সংস্কৃতির এক পরিমণ্ডল তৈরি হয়ে গিয়েছিল যখন সুইস ভাষাতাত্ত্বিক ফার্দিনান্দ সোস্যুর তাঁর স্ট্রাকচারালিজ্‌ম-এর প্রবর্তন করেছেন। স্ট্রাকচারালিজ্‌মের অনেক বিষয়কে দেরিদার অসম্পূর্ণ ও আরোপিত বলে মনে হয়েছিল। যাকে দেরিদা সীমাবদ্ধতা হিসাবে চিহ্নিত করে, তার একটা বিকল্প হিসাবে তুলে ধরলেন তাঁর অবিনির্মাণের তত্ত্বে। তাই বলা যায় কার্যত 'ডিকনস্ট্রাকশন' হল একটি অন্যতম পোস্ট স্ট্রাকচারালিস্ট অগ্রগতি।

দেরিদা মনে করেছিলেন পাশ্চাত্য দর্শন হল 'প্রাক্-গৃহীত, পূর্বকল্পিত এবং পূর্বচিন্তিত ধারণার সম্প্রসারণ'। আর প্রাক্-গৃহীত ধারণার এই সম্প্রসারণকে দেরিদা বলেছেন 'মেটাফিজিক্স অব প্রেজেন্স' বা উপস্থিতির পরাতত্ত্ব। যেখানে জগৎ সংসার, জীবন এবং Text (পাঠ)-কে প্রাক্-গৃহীত ধারণার ভিত্তিতে চিন্তা ও বিচার করা হয়। দেরিদার দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী বইয়ে যেমন Text আছে তেমনি জীবন-জগৎ-সংসার প্রতিটিতেই আছে টেকস্ট। বইয়ের মতন পৃথিবী বা জীবনের Text-ও পাঠ করা যায়। স্বভাবতই দেরিদার ভাবনা হল Text-ও তার পাঠ এবং স্ট্র্যাটেজি নিয়ে। দেরিদা যা বলতে চাইলেন তা হল বিশ্লেষককে text-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে তার বাইরে যাওয়া চলবে না। কেন-না দেরিদার মতে text এর বাইরে কিছু নেই। আর যদি কিছু থাকে তাও text ছাড়া অন্য কিছু যাকে তিনি বলেছেন পরাতত্ত্ব বা মেটাফিজিক্স। text-কে যদি 'কনস্ট্রাকশন' মনে করা হয় তাহলে প্রশ্ন ওঠে 'ডিকনস্ট্রাকশন' কেন বলা হবে? এক্ষেত্রে দেরিদীয় সমালোচনা অনুযায়ী কোনও text-ই কনস্ট্রাকশনের দিক থেকে সম্পূর্ণ নয়। text-এর 'রিপ্রেজেন্টেশন' সম্পূর্ণ হতে পারে না এবং হওয়ার দরকারও নেই। দেরিদা পাঠককে স্বাধীনভাবে ব্যাখ্যা করতে আহ্বান জানিয়েছেন। এর জন্যই অবিনির্মাণ বা ডিকনস্ট্রাকশন পদ্ধতির প্রবর্তন করেছেন দেরিদার অনুগামীরা। যা বিনাশ না-করে বিশ্লেষণ করে অবিনির্মাণ করে। এই সমালোচনা পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যগুলি হল স্ববিরোধী উপাদানের নিবিড় ব্যাখ্যা, অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ, কেন্দ্রীয় শব্দগুলির বহুস্তরী অর্থের উন্মোচন এমনকি শব্দের বুৎপত্তি অনুধাবন।

দেরিদার মতে পাশ্চাত্যের সংস্কৃতি ভাবনা 'প্রতীকী'। অর্থ বা মানের জন্য ব্যবহৃত 'চিহ্ন' বা 'শব্দ' বা 'ইশারা'-র ভেতর যুক্তি প্রচ্ছন্ন থাকে। অর্থাৎ কথকের বা লেখকের অস্তিত্ব ওই সব চিহ্ন বা শব্দে স্বীকৃত। শ্রোতা বা পাঠক কিছু শোনা বা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ওই বিষয়টির বক্তা বা লেখককে মনের মধ্যে উপস্থিত করেন। অবিনির্মাণবাদীরা প্রশ্ন তোলেন, গুহার গায়ে প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষের আঁকা হরিণ কিংবা ষাঁড় কি আদপে ষাঁড় কিংবা হরিণ 'শব্দটি'? নাকি সেই সংস্কৃতির প্রতিনিধিরূপী জানোয়ার? অবিনির্মাণবাদীদের মতে ঠুঁটো জগন্নাথ, ক-অক্ষর গোমাংস, কেঁচে গণ্ডূষ, যমের অরুচি,

খচে বোম ইত্যাদি হিন্দু অভিব্যক্তিতে অর্থের প্রকৃত রূপ কী এই প্রশ্নকে কেন্দ্র করেই স্ট্রাকচারালিস্ট মতবাদ থেকে ডিকনস্ট্রাকশন তত্ত্ব আলাদা। কেন-না স্ট্রাকচারালিজ্‌ম হল একটি পাঠকৃতি নির্ভর তত্ত্ব। যেখানে ভাষা যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে এবং বাস্তবকে জানার জন্য জরুরি এবং মীমাংসাকারী। একটি বস্তু ও তার নামের মধ্যেকার সম্পর্কটা সুস্থির এবং টেকসই। আর অবিনির্মাণবাদীদের মতানুযায়ী অব্যর্থ বা শেষ বলে কিছু হয় না। অবিনির্মাণবাদীরা শব্দকে বলেন চিহ্ন।

দেরিদার এই মতবাদ নিয়ে সমকালীন বহু উত্তর আধুনিক সমালোচক আলোচনা করেছেন। বিশিষ্ট সমালোচক এডুয়ার্ড সাইদ মনে করেন 'ডিকনস্ট্রাকশন' যে বদল ও বিকল্পের কথা বলে তা আধুনিক আখ্যানগুলিতে বহু আগেই হয়েছে। সুতরাং এইদিক থেকে দেখলে অবিনির্মাণ নতুন কোনো ব্যাপার নয়। সাইদ আরও বলেছেন যে দেরিদার ডিকনস্ট্রাকশনের অপপ্রভাব আমেরিকা ও অন্যত্রও পড়েছে। যার ফলে বর্তমানে সমালোচনা জ্ঞান, যুক্তি, বোধ-উপলব্ধির বদলে ক্রমশ যুক্তিহীন, অভিপ্রায়হীন এবং সমালোচনাহীন হয়ে উঠেছে। অনুবাদ সম্পর্কে অবিনির্মাণবাদীদের কথা হল সবচেয়ে অদ্ভুত। অনুবাদ হল মূলের অনুগামী। এই প্রতিষ্ঠিত ব্যাখ্যার বিপরীতে গিয়ে অবিনির্মাণবাদীরা বললেন, অনুবাদ নয় মূলই অনুবাদের ওপর নির্ভরশীল। অনুবাদ ছাড়া মূল পাঠের স্থায়িত্ব ও অস্তিত্ব অসম্ভব। মূল পাঠের ওপর 'অর্থ' নির্ভরশীল নয়, অনূদিত পাঠের ওপরই মূলপাঠ নির্ভরশীল তাই অর্থবোধের ক্ষেত্রে মূল পাঠের ভূমিকা গৌণ। ডিকনস্ট্রাকশনকে যারা স্থাপত্যের কাজে ব্যবহার করেছেন তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রে আছেন পোস্টমডার্ন আর্কিটেক্ট তথা বিশিষ্ট্য স্থাপত্যশিল্পী পিটার আইজেনম্যান। তাঁর সঙ্গে আরও কয়েকজন হলেন বার্নাড তাসুমি এবং জাহা হাদিদ। দেরিদার 'ডিকনস্ট্রাকশন'কে এঁরা স্থাপত্যের ক্ষেত্রে প্রয়োগ ঘটিয়ে স্থাপত্যে এক অভিনব তাত্ত্বিক বিপ্লব এনেছেন। আইজেনম্যানের মতে অতীতে স্থাপত্যে মডার্নিজ্‌ম বা তত্ত্বকে প্রয়োগই করা হয়নি। তাঁর মতে শিল্পীর কর্তব্য হল মডার্নিজ্‌মের উপলব্ধিকে স্থাপত্যে প্রয়োগ করা। কিন্তু এই ভাবনা বড়ই অদ্ভুত। আইজেনম্যান বলছেন, স্থপতি বানাবেন আশ্রয়হীন অপ্রীতিকর বসবাসবিরোধী এবং অবাঞ্ছিত বাড়ি। আর যেহেতু মানুষের

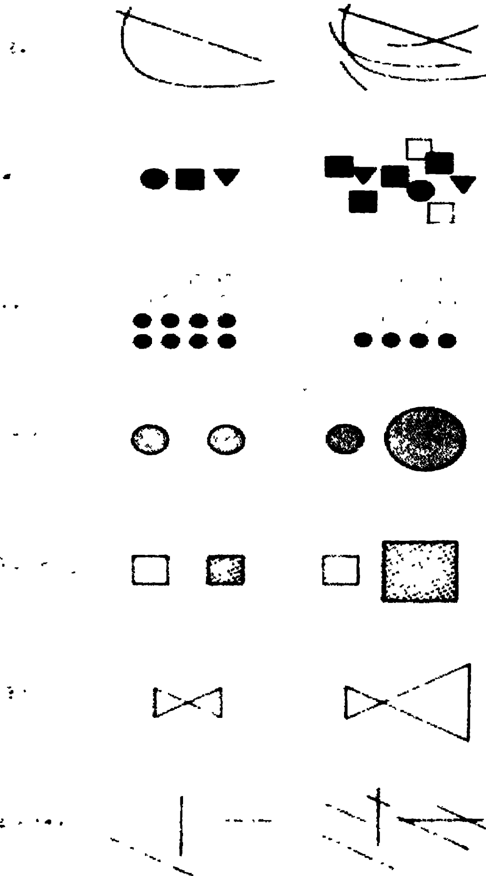
কোথাও আশ্রয় নেই, তাই বাড়িঘরকে সুন্দর আশ্রয়ের আধার ভাবা প্রতারণা এবং কুসংস্কার। ১৯৮২ সালের জুন মাসে বিনির্মাণবাদী স্থাপত্যের প্রদর্শনী হয় নিউইয়র্কের মিউজিয়াম অব মডার্ন আর্টে। টেট গ্যালারি এবং আকাদেমি গ্রুপ-এর উদ্যোগে ভিশুয়াল আর্টে বিনির্মাণবাদী প্রয়োগ নিয়েও সিম্পোজিয়াম অনুষ্ঠিত হয় এই বছরেই। পিটার আইজেনম্যানের ধারণা অনুযায়ী সুন্দর ও কদর্য আর যৌক্তিক ও যুক্তিরহিত — এ দুয়ের মধ্যবর্তী একটা পর্যায়ে অবস্থান করে ডিকনস্ট্রাকশন। বিনির্মাণবাদী স্থাপত্যের লক্ষ্য হল 'বিচ্ছিন্ন' মানুষের জন্য 'বিচ্ছিন্ন' ঘরবাড়ি বানানো। তবে সাহিত্য বা দর্শনে যত সহজে ডিকনস্ট্রাকশনের ব্যবহার করা যায় স্থাপত্যে তা করা যায় না। ফলে আইজেনম্যান বা তাসুমিরা যখন বলেন 'আবাসিক নগরের ঘরবাড়ি এমনভাবে বানাতে হবে, যাতে মনেহয় এসব দুর্ঘটনার ফল।' তখন স্বাভাবিক ভাবনার অনুক্রমে তালগোল পাকিয়ে যায়। অন্যদিকে স্থপতি তাসুমি আরও বলেন, স্থাপত্যের ডিকনস্ট্রাকশন হল মূলত 'সুপার-ইম্পোজিশন'। যেখানে বিনির্মাণবাদী চিন্তা স্থাপত্যের প্রচলিত শৃঙ্খলার নিগড় নষ্ট করে দেবে এবং তাতে ব্যবহৃত হবে সিনেমা, সাহিত্য, সমালোচনার বিভিন্ন ধারণা, তত্ত্ব ও প্রত্যয়। আবার আইজেনম্যানের তৈরি বাড়িঘরগুলো দেখলে মনে হবে মাটিতে স্থাপিত নয়, শূন্যে ঝুলে আছে। দেয়াল, ছাদ, খিলান আশ্চর্যভাবে ছাড়া ছাড়া যেন আধুনিক মানুষের মতো বিচ্ছিন্ন। কোনো কোনো বাড়ির প্রবেশ পথ অস্পষ্ট ও উদ্ভট। তাঁর অনেক স্থাপত্যই ভয় ধরিয়ে দেয়। অবশ্য বিনির্মাণবাদীদের ভাবনাচিন্তাব মধ্যে বিস্তর মতপার্থক্যও রয়েছে।

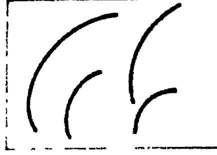
ডিজাইন (Design)

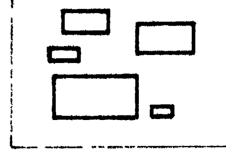
সাধারণভাবে যে-কোনো শিল্পকর্মই ডিজাইন। তবে নির্দিষ্ট ভাবে বলতে গেলে কোনো শিল্পকর্মের আয়োজন, পরিকল্পনা, খসড়া এবং নকশা সবই ডিজাইনের অঙ্গ। যে কোনো শিল্পকর্ম তা সে ছবি, ভাস্কর্য, স্থাপত্য যাই হোক না কেন কিছু Pictorial elements বা দৃশ্য উপাদান দিয়ে গঠিত। নানান ভাবে বিচারবিবেচনা করে এই সব উপাদানকে সাতটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। উপাদানগুলি হল— লাইন (রেখা), ডাইরেকশন (অভিমুখ), শেপ (আকৃতি), সাইজ (আকার) টেক্সচার (বুনট), কালার (রং) এবং ভ্যালু (গাঢ়ত্ব বা আভার তারতম্য)। এসব উপাদানগুলির সূত্রবদ্ধ প্রয়োগের মধ্য দিয়ে

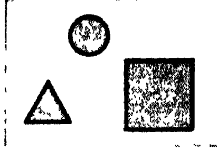
একটি নির্দিষ্ট ও পবিচ্ছন্ন ডিজাইন বা শিল্পকর্ম গড়ে ওঠে। তাই একটি পরিচ্ছন্ন দৃষ্টিনন্দন ডিজাইন গড়ে তুলতে গেলে এই সব উপাদানগুলি এবং তাদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সচেতন থাকা উচিত।

লাইন বা রেখা — কোনো একটি আকৃতির পরিসীমাকে (Contour) সাধারণভাবে রেখা দিয়ে চিহ্নিত করা হয়। রেখা বাস্তবে বিরাজ করে না। রেখা সোজা বা বাঁকা দু-ধরনেরই হয়। এছাড়াও রেখার আরও অনেকগুলি বৈশিষ্ট্য এবং গুণ আছে। রেখার সাহায্যে গতি বা ভঙ্গি বোঝানো যায়। যেমন তির্যক রেখা (diagonal) গতিশীলতাকে ব্যক্ত করে, লম্ব রেখা অধিকার বা শান্তশীলতাকে ব্যক্ত করে। শেপ বা আকৃতি— একটা নির্দিষ্ট চেহারা বা যথাযথ

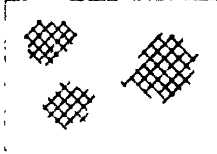


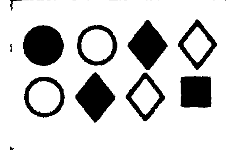

লাইন

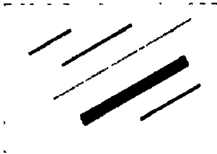

শেপ


টোন


কালার


টেক্সচার


সাইজ


ডাইরেকশন

সীমানা-সম্পন্ন ক্ষেত্র। এই আকৃতি রেখা দ্বারা, বিন্দুর সাহায্যে অথবা টোন, টেক্সচার, রং দিয়েও গঠিত হতে পারে। সাধারণভাবে শেপ বা আকৃতি চিত্রপটের সমধর্মী অর্থাৎ ফ্ল্যাট। শেপ বৃত্তাকার চৌকো, ত্রিভূজাকার, ইত্যাদি নানা ধরনের হতে পারে। সাইজ বা আকার— রেখা বা আকৃতির একটা মাপ আছে। এগুলো বড়ো হতে পারে, মাঝারি হতে পারে, ছোটোও হতে পারে। এমনকি চিত্রপটের নানা অংশ, লাইন ও শেপ এর মধ্যবর্তী পরিসরও আপেক্ষিকভাবে কমবেশি হতে পারে। ডাইরেকশন বা অভিমুখ— রেখা, আকৃতি, বা মধ্যবর্তী বিভিন্ন অংশ সমূহের নানা অভিমুখ থাকতে পারে। যেমন এসবের কোনোটা তির্যক বা কোনাকুনি, কেউ বা অনুভূমিক অর্থাৎ হরাইজন্টাল, কেউ বা লম্ব বা ঢালু ইত্যাদি। সাধারণভাবে তিন ধরনের অভিমুখ লক্ষ করা যায়। টেক্সচার বা বুনোট— একটি আকৃতি বা ক্ষেত্রের পৃষ্ঠতল নানারকম অনুভূতি সম্পন্ন হতে পারে। যেমন এবড়োখেবড়ো বা অমসৃণ, মসৃণ বা চকচকে, অনুজ্জ্বল বা ম্যাট। টেক্সচার বা বুনোট দৃষ্টিলব্ধ বা স্পর্শলব্ধ দুই-ই হতে পারে। ছবির ক্ষেত্রে দৃশ্যলব্ধ বুনোটই প্রধান। তবে স্পর্শলব্ধ

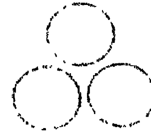
নানা ধরনের বুননতলও ছবিতে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। আবার বিশেষ পদ্ধতিতে রং বা অন্যকোনো উপাদান ব্যবহার করেও বুনোট তৈরি করা যায়। কালার বা রং— আকৃতি বা শেপ নানা রঙের হতে পারে। যেমন লাল, নীল, হলুদ, সবুজ বা মিশ্ররঙের (কালার, কালার হুইল দ্রষ্টব্য) হতে পারে। রঙের আবার চার ধরনের বৈশিষ্ট্য আছে যেমন হিউ বা বর্ণরূপ, টোন বা আভা, ইনটেনসিটি বা তীব্রতা এবং টেম্পারেচার বা উষ্ণতা। ভ্যালু বা আভার তারতম্য হল টোন। এর দ্বারা রঙের ঔজ্জ্বল্যের মাত্রা প্রকাশ পায়। অর্থাৎ রেখা বা আকৃতির রং কতখানি উজ্জ্বল বা কতখানি অনুজ্জ্বল তার আপেক্ষিক অবস্থা হল ভ্যালু। টোনের এই উজ্জ্বলতা-অনুজ্জ্বলতা মাপা হয় 'সাদা থেকে ক্রমশ কালো' এরকম একটি স্কেলের তুল্যমূল্য বিচারে। এইসব উপাদানগুলি সাধারণভাবে কিছু নিয়মকে মেনে সংগঠিত হয়ে একটি ডিজাইন বা শিল্পকর্ম তৈরি করে। এই সূত্রাবলি আলোচনার সময় একথা মনে রাখা ভালো যে ডিজাইনের এই সব

লাইন



টোন





কালার

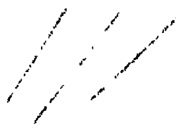
টেক্সচার

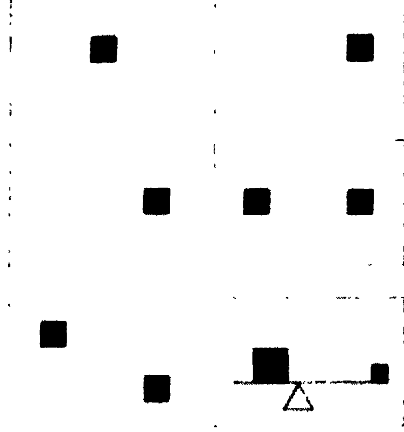




সাইজ

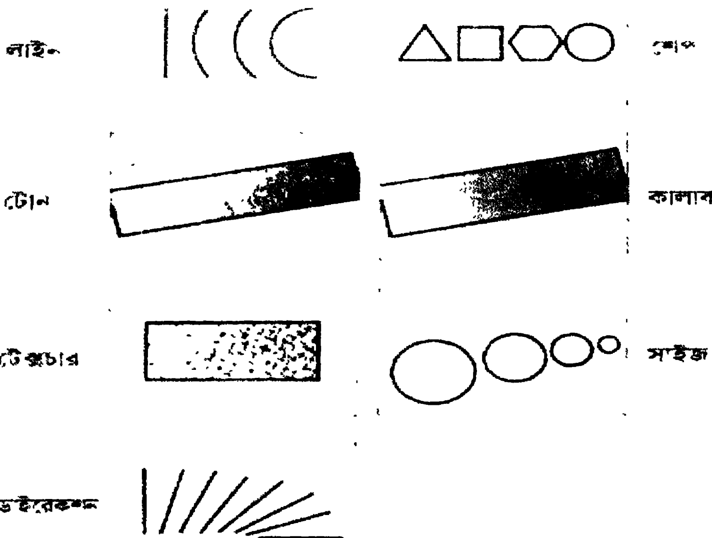
ডাইরেকশন





প্রিন্সিপ্‌ল মানলেই শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্ম তৈরি হবে এরকম নয়। কিন্তু প্রতিটি শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্ম বিচার করলে দেখা যাবে যে তার মধ্যে ডিজাইন প্রিন্সিপ্‌লগুলি মান্যতা পেয়েছে। সেইদিক থেকে এই সূত্রাবলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ডিজাইন প্রিন্সিপ্‌লকেও সাত ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন—রিপিটিশন (পুনরাবৃত্তি), অলটারনেশন (পর্যায়ানুবৃত্তি), হারমোনি (সুসংগতি), ডমিন্যান্স (প্রাধান্য), কনট্রাস্ট (বৈপরীত্য), ব্যালেন্স (ভারসাম্য), গ্রেডেশন (মাত্রা বিন্যাস)। রিপিটিশন বা পুনরাবৃত্তি— শিল্পকর্মের মধ্যে কোনো একটি বা একের বেশি উপাদানের ব্যবহারের পুনরাবৃত্তি ঘটানো এবং সেইভাবে বিষয়কে ভাবা। যেমন ধরা যাক আকাশে কোনো নীল রং ব্যবহার করা হয়েছে। পুনর্বার নীল রঙের ব্যবহার ঘটানোর জন্য পুকুরের জলে নীল রঙের ছায়া ফেলা হল। এইভাবে নীল রঙের ব্যবহারের পুনরাবৃত্তি ঘটাল। শুধু রং নয় যে-কোনো উপাদানেরই পুনরাবৃত্তি ঘটানো যেতে পারে আর এর মধ্য থেকে প্রতিধ্বনিমূলক সাদৃশ্য সৃষ্টি হয়ে শিল্পকর্ম অর্থবহ হয়ে ওঠে। অলটারনেশন বা পর্যায়ানুবৃত্তি— কোনো দুটি বা তিনটি উপাদানকে পর্যায়ক্রমে সাজিয়েও ছবি তৈরি হতে পারে। এর মধ্য দিয়ে শিল্পকর্মে একধরনের শৃঙ্খলা তৈরি করা যায় এবং আকর্ষণ বৃদ্ধি করা যায়। কনট্রাস্ট বা বৈপরীত্য— শিল্পকর্মে বৈপরীত্য বা কনট্রাস্টের উপস্থিতি আকর্ষণ তৈরি করে। সেজন্য শিল্পকর্মে বৈপরীত্য সৃষ্টি করা হয়। বৈপরীত্য নানাভাবে সৃষ্টি করা সম্ভব। যেমন ভিন্নধর্মী বা চরিত্রের উপাদান ব্যবহার করে অথবা সমচরিত্রের উপাদানের বৈশিষ্ট্যের তারতম্য

ঘটিয়ে বৈপরীত্য সৃষ্টি করা যেতে পারে। যেমন একটি ত্রিভূজাকার এবং একটা গোলাকার আকৃতিকে পাশাপাশি সাজালে যে বৈপরীত্য সৃষ্টি হয় তাহল আকৃতিগত বৈপরীত্য। আবার একটা ছোটো ত্রিভূজাকার এবং একটা বড়ো ত্রিভূজাকার আকৃতিকে পাশাপাশি সাজিয়ে বৈপরীত্য বা কনট্রাস্ট সৃষ্টি হতে পারে। সেক্ষেত্রে হবে আকারগত বৈপরীত্য। অনুরূপভাবে বর্ণগত বৈপরীত্যও হতে পারে। যেমন দুটো সমান মাপের লাল এবং সবুজ রঙের চতুর্ভুজ পাশাপাশি বসালে বৈপরীত্য সৃষ্টি হবে। ডমিন্যান্স বা প্রাধান্য বা প্রভাব— ভিন্ন ভিন্ন উপাদানের ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোনো একটি উপাদানকে একটু বেশি গুরুত্ব দিয়ে ডমিন্যান্স সৃষ্টি করা যায়। অর্থাৎ প্রতিপক্ষকে একটু ছোটো করে দিলেই এটা সম্ভব। ডমিন্যান্স দিয়ে বৈপরীত্যকে কমানো যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যদি শিল্পকর্মে একই সঙ্গে গোলাকার এবং আয়তাকার দুটি আকৃতি থাকে তখন যার প্রভাব বাড়াতে চাই তাকে একটু আকারে বড়ো করলেই এই প্রাধান্য সৃষ্টি করা যাবে। যদি একই সঙ্গে বক্ররেখা এবং সরল রেখা থাকে সেক্ষেত্রে কোনো একটাকে একটু ছোট বা রোগা করলেই অন্যটা প্রাধান্য পেয়ে যাবে। হারমোনি বা সুসংগতি— সাদৃশ্যপূর্ণ বা সম্পর্কযুক্ত উপাদানের সন্নিবেশ সুসংগতির



সৃষ্টি করে। যেমন কোনো চিত্রপটে আঁকা কলম, দোয়াত এবং বইখাতা হারমোনির আদর্শ উদাহরণ। কিন্তু যদি এরকমটা হয় যে একই চিত্রপটে টায়ার, ছুরি, টেলিস্কোপ, শ্লেট আঁকা থাকে তাহলে কোনো সুসংগতি থাকে না। ব্যালেন্স বা ভারসাম্য— উপস্থাপিত উপাদান বা আকৃতি সমূহের মধ্যে ভারসাম্যের সৃষ্টি। বিষয়টির ধারণা এসেছে তুলাদণ্ড থেকে। এর সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য হল লম্বভাবে থাকা কেন্দ্র রেখা। অর্থাৎ কেন্দ্রবিন্দুর দু-পাশের অক্ষের সমমান। এই অবস্থাকে বলা হয় Symmetrical বা 'প্রতিসম। সিমেট্রিক্যাল ব্যালেন্স আবার দু-ধরনের হতে পারে। পিয়োর সিমেট্রি এবং অ্যাপ্রক্সিমেট সিমেট্রি। দৃশ্যপটে উপাদান সমূহের ভারসাম্য সৃষ্টির বিষয়টি কিছুটা অনুমান নির্ভর এবং যুক্তিভিত্তিক। চরম প্রথাগত শিল্পকর্মে কঠোরভাবে Symmetrical balance অনুসৃত হলেও asymmetrical balance কার্যত অনেক বেশি আকর্ষণীয়। কম্পোজিশনে ডানদিকে রাখা একটি বড়ো কোনো বস্তুর বাঁ দিকে একটি ছোটো বস্তুকে পরিকল্পিতভাবে স্থাপন করে ভারসাম্য সৃষ্টি করা যায়। চিত্র-এ এবং চিত্র-বি থেকে এই ধারণাটা স্পষ্ট হবে। এছাড়াও আছে ক্রিস্টালোগ্রাফিক ব্যালেন্স এবং রেডিয়াল ব্যালেন্স। সমস্তরকম ডিজাইন এলিমেন্টকেই এইভাবে ব্যালেন্সের আওতায় আনা যায় এবং শিল্পকর্মে দৃশ্যতৃপ্তি তৈরি করা যায়। স্থাপত্যের ক্ষেত্রে সরাসরি গাণিতিক নিয়মে ব্যালেন্সের ব্যবহার করা যায় কিন্তু চিত্রে এর ব্যবহার ঘটে সাধারণত দৃশ্যগত যুক্তির মাধ্যমে। গ্রেডেশন বা মাত্রাবিন্যাস— রঙের হালকা থেকে গাঢ় বা গাঢ় থেকে হালকা আভায় যাওয়ার পর্যায়ক্রমিক ধাপ। একটা মাত্রা থেকে ভিন্নতর মাত্রায় আকস্মিক উত্তরণ নয়। সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত দিনের আলো-কে পর্যবেক্ষণ করলেই আমরা এই দৃষ্টান্ত দেখতে পারি। ছবিতে মধ্যবর্তী উজ্জ্বল্যের রং মসৃণতা সৃষ্টি করে ফলে ছবি দৃষ্টিসুখ-সম্পন্ন হয়ে ওঠে।

ডিজিটাল আর্ট (Digital Art)

কম্পিউটার আর্ট দেখুন।

ডিপটিচ (Diptych)

পাশাপাশি রেখে দেখানো দুটো অংশে করা একটি শিল্পকর্ম। কখনো-কখনো এই দুটো শিল্পকর্মকে কবজা দিয়ে জুড়ে

দেওয়া হয় নিরালম্বভাবে পর্দার বা ঘর বিভাজনের জন্য ব্যবহৃত প্যানেলের মতো। আসলে এর প্রধান ব্যবহার হয় বেদি অলংকরণের জন্য। বেশিরভাগ ডিপটিচ হল ছবি। তবে প্যানেলের ওপর খোদাই কাজ সম্বলিত কিছু ডিপটিচও তৈরি হয়।

ডিভাইস (Device) — শিল্পীর স্বাক্ষর হিসাবে ব্যবহৃত কোনো মোনোগ্রাম অর্থাৎ প্রতীক বা চিহ্ন। যেমন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতীকী স্বাক্ষর।

ডিভিশনিজ্‌ম (Divisionism) — অন্তিম ঊনবিংশ শতাব্দীর একটি শিল্পরীতি এবং ইতালীয় নিও ইম্প্রেশনিজ্‌মের অন্যনাম। এই শৈলী পয়েন্টিলিজ্‌ম নামেও পরিচিত। এই পদ্ধতি অনুযায়ী প্যালেটে রঙের সঙ্গে রং মিশিয়ে বর্ণক্রম তৈরির পরিবর্তে বিভিন্ন রঙের বিন্দু বা ফোঁটাকে পাশাপাশি বা একটার ওপর আরেকটাকে এমনভাবে সন্নিবিষ্ট করে চিত্র রচনা করা হয় যাতে বিভিন্ন রঙের বিন্দুগুলি দৃশ্যত মিশে ইপ্সিত ফলাফল তৈরি করে। এইভাবে সমগ্র ছবিটাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণাবৎ অংশে বিভক্ত করে ফেলা হয় বলে এর নাম ডিভিশনিজ্‌ম বা পয়েন্টিলিজ্‌ম। এই শৈলীর প্রাথমিক বিকাশ ঘটে লম্বার্ডি এবং পিয়েডমন্টে। তারপরে রোমে ছড়িয়ে পড়ে। উত্তরাঞ্চলীয় ডিভিশনিস্টদের দ্বিতীয় প্রজন্মের প্রসার ঘটে মিলানে। এই শৈলীর মুখ্য স্রষ্টা ছিলেন পেলিজা ডা ভোলপোডো এবং সেগানটিনি। এঁরা নিও ইম্প্রেশনিস্টদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন কিন্তু নিও ইম্প্রেশনিস্টদের কাজ এবং বিশুদ্ধ কমপ্লিমেন্টারি রং ব্যবহারের বিজ্ঞান সম্পর্কে তাঁদের জ্ঞান খুবই কম ছিল। এঁদের বিষয়বস্তুও ছিল প্রতীকবাদী ও বাস্তববাদীদের অনুরূপ এবং কখনো-কখনো সমাজ সংশ্লিষ্ট। এঁদের মধ্যে একমাত্র সেগানটিনির আন্তর্জাতিক পরিচিতি ছিল।

ছবি নং ২০৪ পৃ ৩৭৮

ডিস্টেম্পার (Distemper) — জলে গোলা একজাতীয় রং যাতে বাইন্ডার হিসাবে থাকে সাধারণ গ্লু বা কেসিন এবং ফিলার বা বডি হিসাবে থাকে চক। অতীতের শিল্প বিশেষজ্ঞরা যেমন ভ্যাসারি প্রমুখ ডিস্টেম্পার এবং টেম্পারাকে স্পষ্টভাবে আলাদা করেননি। যদিও এই রং কমস্থায়ী নয়। কারণ এটা প্লাস্টার সাপোর্টের সঙ্গে রাসায়নিক ভাবে বিক্রিয়া করে না।

ডিসেন্ডার (Descender)

ভূমিরেখার নীচে হরফের কোনো অংশ বা টান। যেমন g, y, ইত্যাদি ইংরেজি হরফ এবং ছ, হ ইত্যাদি বাংলা হরফের ওপর এবং নীচের দিকের টান।

q y ছ হ

ডেকরেটিভ আর্ট (Decovative Art)

যেসব অ্যাপ্লায়েড আর্ট গার্হস্থ্য ক্ষেত্রে বা গৃহসজ্জার জন্য ব্যবহৃত হয় যেমন আসবাবপত্র, চিনেমাটির জিনিস, কাচের জিনিস, এনামেল, কাপড় ইত্যাদিতে ব্যবহৃত শিল্প-কলাকে বলা হয় ডেকরেটিভ আর্ট বা আলংকারিক শিল্প।

ডেকাডেন্ট মুভমেন্ট (Decadent Movement)

ডেকাডেন্স শব্দটি যেকোনো সময়ের নৈতিক ও শৈল্পিক অবক্ষয়ের ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হতে পারে। এর একটা নির্দিষ্ট অর্থও আছে এবং আবশ্যিকভাবে নিন্দার্থে না হলেও অন্তিম ঊনবিংশ শতাব্দীতে ফ্রান্সে উদ্ভূত একটি শিল্পান্দোলনের নাম। সিম্বলিজ্‌ম বা প্রতীকবাদের সঙ্গে এর যোগ থাকার পাশাপাশি ডেকাডেন্ট মুভমেন্ট এই ধারণার দ্বারা পরিব্যাপ্ত হয়েছিল যে, শিল্প ও সমাজের অধোগতি ফেরানো যাবে না। ১৮৮৪ সালে ফরাসি ঔপন্যাসিক ও শিল্প সমালোচক উইসম্যান-এর



নং ১০৬. বেয়ার্ডসলি মেসালিনা রিটার্নিং ফ্রম দি বাথ। ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দ।

উপন্যাস 'আ রব্যুর' (প্রকৃতির বিরুদ্ধে) এবং ১৮৯১ সালে 'লা-বা' প্রকাশিত হয়। এসবই ছিল প্রকৃতিবাদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া। এইসব রচনায় ডেকাডেন্ট মুভমেন্ট প্রাণিত হয়েছিল। 'আ রব্যুর'-কে এই আন্দোলনের পাঠক্রম বলা যায়। ১৮৮৬ সালে 'ল্য দেকাদঁ' নামে একটি প্রত্রিকাও প্রকাশিত হয়েছিল। এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত সাহিত্যিক ও শিল্পীরা ছিলেন আব্রি বিয়োর্ডস্‌লি, অসকার ওয়াইল্ড প্রমুখ। শিল্পীদের বিভিন্ন ভূমিকা, বুর্জোয়া সমাজের প্রতি বৈরিতা, বিষাদ এবং স্বেচ্ছাচারের প্রতি রুচি, এবং প্রকৃতির চেয়ে কৃত্রিমতা শ্রেষ্ঠ— এই বিশ্বাসের প্রতি গুরুত্বদান ছিল এই আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য।

ডেকালকোম্যানিয়া (Decalcomania)

ছবি আঁকার একটি পদ্ধতি। এই পদ্ধতি অনুসারে কাগজের ওপর গুয়াশ বা অন্য কোনো অসচ্ছ রং লাগানো হয়। তারপর রং ভেজা থাকা অবস্থায় অন্য একটি তলে এই রং সহ কাগজটিকে চাপ দেওয়া হয়। ফলে নতুন কাগজ বা তলটিতে রঙের ছাপ পড়ে একটা বুনট বা টেক্সচার তৈরি হয়। এই দুটো তলের পারস্পরিক ক্রিয়ায় প্রথম কাগজটিকে তুলে আনার সময় দ্বিতীয় তলে লেগে যাওয়া রং আবার কিছুটা উঠে আসা এবং নড়েচড়ে যাওয়ায় যে-ধরনের প্যাটার্ন তৈরি হয় তা সাধারণভাবে ব্রাশওয়ার্ক থেকে সৃষ্টি করা অসম্ভব। এই প্রক্রিয়াকে শিল্পী নানাভাবে ছবি তৈরিতে কাজে লাগান। এই পদ্ধতি কাজে লাগিয়েছিলেন সুরিয়ালিস্ট শিল্পী ম্যাক্স অর্নেস্ট। ডেকালকোম্যানিয়ার সঙ্গে মনোটাইপ প্রিন্ট মেকিং-এর পদ্ধতিগত সাদৃশ্য আছে।

ডেড কালার (Dead colour)

একটি অন্তর্বর্ণস্তর। সাধারণভাবে নিষ্প্রভ বাদামি, সবুজ, গ্রে ইত্যাদি রঙের তলায় আন্ডারপেন্টিং হিসাবে ব্যবহৃত হয় এবং এর অনেকটাই ক্যানভাসে শোষিত হয়। একটা হালকা আভা থেকে যায়। মূল আভা (Tone) অনুযায়ী হালকা অথবা গাঢ় করে ডেড কালার ব্যবহার করা হয়।

ডোকরা

মোমের তৈরি আকৃতি গলিয়ে ঢালাই পদ্ধতি যার ফরাসি পরিভাষা সার পেরদু (Cire perdue) অর্থাৎ lost wax metal casting. ধাতুশিল্পের এই লোকআঙ্গিকের বিকাশ হয়েছিল বহু প্রাচীনকালে। বাংলায় এর নাম ডোকরা। প্রধানত পিতল দিয়ে ঢালাই করা হয় এবং এসব মূর্তি খুব

নং ১০৭. মীরা মুখার্জীর ভাস্কর্য। ডোকরা।

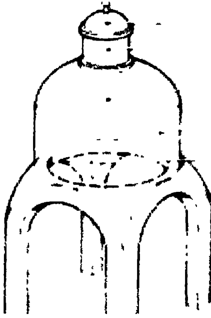


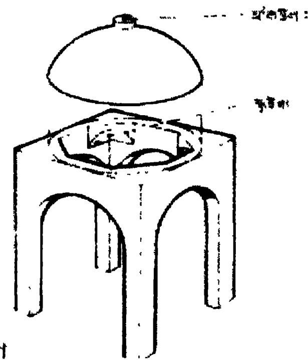
বেশি বড়োও হয় না। ডোকরা শিল্পীরা হল 'কামার' সম্প্রদায়ের মানুষ যাঁরা 'লোহার' সম্প্রদায় থেকে আলাদা এক Subcaste, আসলে বহুপ্রাচীন এক আদিবাসী সম্প্রদায়। ডোকরা শিল্পের উদ্ভব আদিবাসী সমাজে হলেও তা বহুকাল আগে থেকেই ভারতীয় নাগরিক সভ্যতায় স্থান করে নিয়েছিল। দ্বাদশ শতাব্দীতে লেখা পশ্চিম চালুক্যের রাজা সোমেশ্বর বিরচিত বিশাল এক আকরগ্রন্থ 'অভিলাষিতার্থ চিন্তামণি'র অন্তর্গত 'মানসোল্লাস শাস্ত্র' গ্রন্থে ডোকরা শিল্পের বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া গেছে (উল্লেখ— রাঢ়ের শিল্প ডোকরা : সৈয়দ বসিরুদ্দোজা, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়)। প্রখ্যাত গবেষক এইচ. এইচ. বিজলি ডোকরা নিয়ে গবেষণা গ্রন্থে ডোকরা শিল্পীদের আটভাগে ভাগ করে তার এক ভাগের নাম দিয়েছেন ডোকরা কামার। কেউ কেউ একে ঢোকরা বা ধোকরাও বলেছেন কিন্তু বিষয়টি একই। সাহিত্যসংস্কৃতির নানা নিদর্শন, উপাদান দেখে বোঝা যায় যে ডোকরা শিল্পীরা সমাজে বেশ অবহেলিত ছিলেন। এঁরা যাযাবর ধরনের সম্প্রদায় ছিলেন। ডোকরা শিল্পীদের সাক্ষ্য অনুযায়ী এঁদের প্রাচীন বাসভূমি মধ্যপ্রদেশের বাস্তার জেলা। তবে কোনো

কোনো গবেষক বলেছেন ডোকরা সম্প্রদায়ের আদিভূমি বিহারের ছোটো নাগপুর ও হাজারিবাগ অঞ্চল। পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমানের গুসকরার কাছে দরিয়াপুর ও বাঁকুড়া জেলার বিকনা গ্রামেই আধিকাংশ ডোকরা শিল্পীদের বসবাস। কারিগরি অর্থে ডোকরা হল ঢালাই! আর প্রকৃত অর্থে এটা হল 'Lost wax metal casting.' প্রাচীন কাল থেকেই দু-ধরনের ধাতু ঢালাই পদ্ধতির প্রচলন ছিল। যথা 'ঘন ঢালাই' এবং 'ফাঁপা ঢালাই'। ঘন ঢালাই অর্থ নিরেট। ডোকরার প্রযুক্তিগত সংজ্ঞা হল 'clay moulded investment casting'. ডোকরার জন্য লাগে মাটি, ধুনো, মোম, পিতল, সরষের তেল, রং, দস্তা, সিসা, পিতল গলাবার পাত্র আর ছোটোখাটো কিছু জিনিস যেমন সাঁড়াশি, ব্রাশ, সরুকাঠি ইত্যাদি। ধুনো আর সরষের তেল আগুনের তাপে গরম করে মণ্ড বানিয়ে তাতে মৌচাকের মোম একটা নির্দিষ্ট অনুপাতে ভালোভাবে মিশিয়ে পিণ্ড তৈরি করে নেওয়া হয়। এরপর বালি মেশানো মাটি দিয়ে ইচ্ছানুযায়ী একটা ছোটো মডেল তৈরি করে ভালোকরে শুকিয়ে নিয়ে তার ওপর ভালোকরে ধুনো-মোমের পিণ্ডের ঘন প্রলেপ লাগানো হয় এবং এই প্রলেপের ওপর পিণ্ডের সরু সরু তার তৈরি করে সেই তার দিয়ে নানারকম প্রয়োজনীয় সূক্ষ্ম কারুকার্য করা হয়। এই পর্বটি নিখুঁতভাবে শেষ করার পর আবার গোটা মডেলটিকে আগাগোড়া নরম মাটির প্রলেপ দিয়ে ঢেকে দিতে হয়। তবে এই প্রলেপের মাঝেমাঝে কয়েকটি ছোটো ফুটো রাখা হয় যাতে গরম করলে ভেতরের ধুনো-মোম গলে বেরিয়ে আসতে পারে। মূর্তির ওপর দিকের কোথাও একটা ছিদ্রের ওপর ফানেলের মতো করে মাটি দিয়ে মুচি বানিয়ে বসিয়ে নিতে হয়। এই মুচির মধ্যে গলানো পিতল-গলানো পিতলকে ডোকরাগণ 'ঘেরা' বলেন। তরল পিতল ছিদ্রপথে ছাঁচের ভেতর প্রবেশ করে এবং ধুনো-মোমের জায়গায় ধীরে ধীরে জমাট বাঁধে। পরে ওপরের মাটির প্রলেপ ভেঙে মূর্তিটিকে বের করে নেওয়া হয় এবং কাঁটা দিয়ে ভেতরের বালি ও মাটির ছাঁচটিকে গুঁড়োগুঁড়ো করে বের করে আনা হয়। তারপর ঘষেমেজে অ্যাসিড দিয়ে পরিষ্কার করে ঢালাই করা মূর্তিটিকে নিখুঁত ও উজ্জ্বল করা হয়। ডোকরাদের মূর্তি শিল্পকে মোটামুটি পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়। প্রাণী ও প্রাকৃতিক, দেবদেবী ও ধর্মীয়,

অলংকার, ব্যবহারিক এবং গৃহসজ্জা। বিশিষ্ট কয়েকজন ডোকরা শিল্পী হলেন— শম্ভু কর্মকার, হারাধন কর্মকার, মটর কর্মকার। মহামায় কর্মকার, আরতি কর্মকার প্রমুখ।

ডোম (Dome) — একটি গোলাকার বা উপগোলাকার বা বহুভুজ ভিত্তির ওপর স্থাপিত সমানভাবে ধনুকাকৃতি বা ওলটানো কড়াইয়ের মতো





ডোমের বিভিন্ন অংশ

ছাদ বা গম্বুজ। নানা ধরনের ডোম আছে। তার মধ্যে 'কঙ্ক' বা শাঁখ, 'ওনিয়ান বা পেঁয়াজ ডোম', 'জিয়োবেসিক ডোম' ইত্যাদি বেশি দেখতে পাওয়া যায়। ডোম বা গম্বুজের দেহের বিভিন্ন অংশের নির্দিষ্ট নাম আছে যেমন একদম শীর্ষে হল ওকিউলাস, তার নীচের অংশ কিউপোলা, কিউপোলার নিচের অংশ ল্যানটার্ন, এরপরের অংশ হল ডোম বা গম্বুজ। গম্বুজের নীচে থাকে ড্রাম এবং ড্রামের নীচে থাকে তিনকোনা বাঁকানো অংশ পেন্ডেন্টিভ।

ড্যাডো (Dado) — স্তম্ভমূলের সাধারণ কেন্দ্রীয় অংশ অথবা ভিতরের দিকের দেওয়ালের নীচের অংশ। যার ওপর দিকটা মোল্ডিং করে অথবা রঙের রেখা দিয়ে এবং নীচের দিকটা স্কার্টিং দিয়ে আলাদা করা থাকে।

ড্যামার (Damer) — ইন্দোনেশিয়ায় উৎপন্ন মোচাকৃতি এক জাতীয় গাছের থেকে নির্গত একরকম কষ। এটা শুকিয়ে খড়ের মতো রঙের ভঙ্গুর ও শক্ত এক পদার্থ হয়ে যায়। এই পদার্থটি টারপেনটাইনে গুলে যায় এবং শুকিয়ে গেলে স্বচ্ছ পাতলা ফিল্মে পরিণত হয়। ড্যামার গোলা বা দানা দুই অবস্থাতেই কিনতে পাওয়া যায়। সাধারণ মিশ্রণের ক্ষেত্রে ৫ পাউন্ড ড্যামারকে ১ গ্যালন টারপেনটাইনে গুলে নিতে হয়। ছবির ওপরে লাগানোর জন্য

৪ ভাগ ড্যামার এর সঙ্গে ১ ভাগ টারপেনটাইন মেশাতে হয়। রিটাচ বার্নিশের ক্ষেত্রে এই মিশ্রণ আরও পাতলা করে নিতে হবে।

ড্রয়িং
(Drawing)

খুব সাধারণভাবে রেখাচিত্র বা খসড়া চিত্রকে ড্রয়িং বলা হয়। কিন্তু বস্তুত ড্রয়িং শব্দটা বহুমাত্রিক। কাকে সঠিক ভাবে ড্রয়িং বলা হয় বা হবে তা নিয়ে কেতাবি বিতর্ক হতে পারে। তবে আঙ্গিকগত দিক থেকে রং এবং হালকা রেখাসমৃদ্ধ ছবিকে ড্রয়িং বলা যেতে পারে। তবে রং দিয়ে আঁকা ছবিকেও ড্রয়িং বলা হয়। অথচ ব্যবহারিক দিক থেকে ড্রয়িং হল ছবি বা ভাস্কর্যের খসড়া বা প্রাথমিক রূপ। ষোড়শ শতাব্দী থেকে দৃশ্যকলায় ড্রয়িং-এর গুরুত্ব নিয়ে বেশ বিতর্ক হয়। ড্রয়িং-এ রঙের ব্যবহারের বিরোধিতাও হয়। ফ্লোরেন্টাইন আর্ট, আংগ্রে এবং পুঁস্যার অনুগামীরা ভেনিশিয়ান, রুবেন্স, দেলাক্রোয়া প্রমুখের বিপরীতে রেখার প্রাধান্যের ওপর জোর দিতেন। অন্যদিকে চিন ও জাপানের ছবিতে ড্রয়িং ও পেন্টিং এর মধ্যে কোনো স্পষ্ট বিভেদ টানা কঠিন। কারণ এই ছবি সাধারণত কালি দিয়ে ব্রাশ ব্যবহার করে আঁকা। তেল রঙের ছবি আঁকার সময় কোনো বস্তু বা দৃশ্যের স্কেচ করা হয়ে গেলে ড্রাই ব্রাশিং-এ শুধুমাত্র আলো ও ছায়ার বিভাজন করে নেওয়াকেও ড্রয়িং বলে। তবে ড্রয়িং এখন ছবিতে একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান পেয়ে গেছে। ড্রয়িংকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

এক. তথ্যকে রেকর্ড করার কাজে ব্যবহৃত এবং আইডিয়াকে মূর্ত করার খসড়া, দুই. কোনো বস্তুর খুবই গুরুত্বপূর্ণ ডিটেল। তিন. নিখুঁতভাবে আঁকা কোনো রেখাচিত্র যা নিজেই একটি পূর্ণাঙ্গ ছবি।

ছবি নং ২১১ পৃ. ৩৮২

ড্রাই-পয়েন্ট
(Dry-Point)

সরাসরি তামা বা দস্তার পাতের ওপর শক্ত ধারালো সূঁচ বা নিড্ল দিয়ে নকশা কেটে বা এনগ্রেভ করে তারপর কালি লাগিয়ে প্রিন্ট নেওয়ার পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে অ্যাসিড দিয়ে তক্ষণ করা হয় না।

ড্রাই-ব্রাশ
(Dry-Brush)

প্রাথমিকভাবে কথাটি জলরঙের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। একটু শক্ত অর্থাৎ জল কমমেশানো এবং সামান্য রং নিয়ে কোনো বুননতলে (খসখসে) তুলি চালিয়ে ছবি আঁকার পদ্ধতি। এক্ষেত্রে রং শুধুমাত্র চিত্রপটের উঠে উঠে থাকা অংশেই লাগে। একইভাবে তেল ও অ্যাক্রিলিক রঙের

ক্ষেত্রেও এই পদ্ধতি ব্যবহার করা যায়। এধরনের বর্ণ প্রয়োগে ছবি দেখতে একটু rough বা খসখসে হয়। তবে কোনো কোনো শিল্পী ড্রাইব্রাশ পদ্ধতিতে ফোটো ফিনিশের মতো কাজও করেছেন।

ড্রাই-মাউন্টিং (Dry-mounting)

জলীয় আঠা ব্যবহার না করে দুটো তল বা কোনো কিছুকে সাঁটানো বা জোড়া দেওয়ার একটি পদ্ধতি। এই পদ্ধতি বিশেষভাবে ব্যবহার করা হয় ফোটোগ্রাফ বাঁধানোর সময় বা কোনো শক্ত পশ্চাৎপটে ছবি সাঁটানোর জন্য। এটা একটা স্থায়ী পদ্ধতি যার দ্বারা আবহাওয়া জনিত কুঞ্চন, বুদবুদ, দাগধরা দূর করা যায়। এর জন্য দুটো তলের মধ্যে বিশেষ ধরনের আঠা মাখানো কাগজ বা dry mounting tissue রেখে Dry-mounting press এর সাহায্যে চাপ দিলে তিনটে কাগজের স্যান্ডুইচ পরস্পর আটকে যাবে। তাছাড়া বিশেষ ধরনের আঠা (যেমন রাবার সলিউশন বা ওই জাতীয়) লাগিয়ে একটু শুকিয়ে নিয়ে তারপর দুটো তলকে একটার ওপর আর একটা রেখে চাপ দিয়ে আঁটিতে হবে। সতর্ক থাকতে হবে যাতে কোনো বাতাস আটকে না যায়। রোলার দিয়ে ঘষলে ভালো ফল পাওয়া যাবে। অনেক সময় প্লাস্টিক শিট বা অ্যাক্রিলিক শিট জুড়তে দুটো শিটে ক্লোরোফর্ম স্প্রে করে নেওয়া হয়। এই রাসায়নিক তলদুটিকে গলিয়ে দেয় এবং পরস্পর জোড়া লেগে যায়। থিনার দিয়েও একাজ করা যেতে পারে। অবশ্য থিনারে শিট গলছে কিনা তা দেখে নিতে হবে।

ড্রায়ার (Drier)

দ্রুত রং শুকানোর জন্য রঙে যে পদার্থ মেশানো হয় সেই সব পদার্থ বা শুষ্কীকর। তেল রঙেই এই ধরনের পদার্থ মেশানো হয় কারণ তেল রং তুলনামূলকভাবে দেরিতে শুকোয়। কিছু ড্রায়ার তেল রং তৈরির সময়ই মেশানো হয়। আবার ছবি আঁকার সময় আরও দ্রুত শুকোনোর জন্য শিল্পীও কিছুটা ড্রায়ার মিশিয়ে থাকেন। তবে সেক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত এই জন্য যে ড্রায়ার রঙের আস্তরণের ক্ষতি করে। বিশেষ করে রঙে ফাট ধরায় এবং রং-কে কালো করে দেয়। যাঁরা পুরু করে রং ব্যবহার করেন তাঁদের ছবির ওপরের রং দ্রুত শুকিয়ে যায় কিন্তু ভিতরের রং কাঁচা থেকে যায় যা পরবর্তীকালে ছবিতে নানা ধরনের সমস্যা তৈরি করে। তৎসত্ত্বেও একান্তই ড্রায়ার ব্যবহার করতে চাইলে কোবল্ট ড্রায়ার ব্যবহার করাই বেশি নিরাপদ।

ড্রায়িং অয়েল
(Drying oil)

যে-কোনো তেল যা তেল রঙে ব্যবহার করা হয় তাই হল ড্রায়িং অয়েল। এই তেলের ধর্ম হল যে তা হাওয়ায় রাখলে অক্সিজেনের সংস্পর্শে এসে এক ধরনের স্থিতিস্থাপক শক্ত ফিল্‌মে পরিণত হয়। আসলে ড্রায়িং অয়েলের প্রক্রিয়াটিতে সামগ্রিকভাবে রাসায়নিক পলিমারিভবন ঘটে ফলে লাইনোক্সিন নামে এক শক্ত পদার্থ তৈরি হয়। এই পদার্থ আর লিনসিড অয়েল দিয়ে গোলা যায় না। লিনসিড তেলের মধ্যে আবার কয়েকরকম ভ্যারাইটি আছে। যেমন কাচা বা র লিনসিড অয়েল, ফোটানো লিনডিস অয়েল, স্ট্যান্ড অয়েল ইত্যাদি। আগে রোদ্দুরে লিনসিড অয়েলকে রেখে স্ট্যান্ড অয়েল তৈরি করা হলেও এখন অক্সিজেনহীন পরিবেশে লিনসিড তেল ফুটিয়ে স্ট্যান্ড অয়েল তৈরি করা হয়। এসবের মধ্যে রিফাইন্ড লিনসিড অয়েলই ভালো। তেলের মধ্যে বাষ্প চালিয়ে এবং রাসায়নিক প্রক্রিয়াকরণ করে এই তেল পরিশ্রুত করা হয়। পপিসিড অয়েল, সানফ্লাওয়ার অয়েল শুকাতে দেরি হয় বলে এটা লিনসিডের মতো অত জনপ্রিয় নয়।

ড্রিপ পেন্টিং
(Drip Painting)

অ্যাবস্ট্র্যাক্ট এক্সপ্রেশনিস্ট শিল্পীরা যেসব পদ্ধতিতে ছবি আঁকতেন তারই অন্যতম হল ড্রিপ পেন্টিং। এই পদ্ধতিতে মেঝেতে ক্যানভাস পেতে তার ওপর ব্রাশ বা কাঠি, বোতল, ক্যান ইত্যাদির সাহায্যে ফোঁটা ফোঁটা-রং ফেলে ছবি তৈরি করা হয়। জার্মান শিল্পী ম্যাক্স আরনেস্ট-এর মতো সুরিয়ালিস্ট শিল্পী অনেক আগেই এই পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন।

ড্রেপারি
(Drapery)

চিত্রকলা-ভাস্কর্যে কাপড়ের ভাঁজ বা ঝুলানো কাপড়ের উপস্থাপনা। শিল্পীরা ড্রেপারিকে ছবিতে অর্থবহ উপাদান হিসাবে ব্যবহার করেন। যেমন ড্রেপরির ব্যবহার কোনো কম্পোজিশনে ছন্দময় গতি সৃষ্টির উপায় হিসাবে ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন ঘরানায় ড্রেপারির ব্যবহারে নির্দিষ্ট কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। তাই ছবি বোঝা এবং ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে শিল্প ঐতিহাসিকদের কাছে ড্রেপারি একটা সূত্র হিসাবে কাজ করে। ইউরোপে রেনেসাঁস যুগে শিল্পী লিওনার্দো দা ভিঞ্চি, ডুরা প্রমুখের অনবদ্য ড্রেপারি চর্চা লক্ষ করা যায়।

ছবি নং ১৬৯ পৃ. ৩৫৮

ড্রেপারি ম্যান
(Drapery man)

রেনেসাঁসের সময়ে প্রতিষ্ঠিত, নামী শিল্পীরা তাঁদের ছবিতে ড্রেপারি আঁকার জন্য স্টুডিয়ো সহায়ক হিসাবে যে কর্মী রাখতেন তাদের ড্রেপারি ম্যান বলা হত।



ঢ

ঢাকা ইনস্টিটিউট অব আর্টস

১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে ঢাকার জনসন রোডের ন্যাশনাল মেডিক্যাল স্কুলের পূর্বদিকের হাসপাতাল অংশে নীচতলায় দুটো ঘর নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ঢাকা আর্ট ইনস্টিটিউট বা 'গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্ট'। উদ্যোক্তা ছিলেন জয়নুল আবেদিন, কামরুল হাসান, সফিউদ্দিন আহমেদ, আনোয়ার উল হক. শফিকুল আমিন, ড. কুদরাত-এ- খুদা, সলিমুল্লাহ ফাহমি।

সে সময় পূর্ববাংলা মন্ত্রীসভায় অন্যতম ছিলেন হাবিবুল্লাহ বাহার। শিল্প-সাহিত্যের ব্যাপারে তাঁর উৎসাহ ছিল। সরকারি মহলে তিনিই ছিলেন একমাত্র উৎসাহী ব্যক্তি। তিনি আর্ট কলেজের দাবিকে প্রতিষ্ঠা দিতে জয়নুল সাহেবকে পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবসে একটা পোস্টার প্রদর্শনীর আয়োজন করার প্রস্তাব দেন। দু-মাসের মধ্যে একশো পোস্টার এঁকে প্রায় অসাধ্যসাধন করে এই প্রদর্শনীর উদ্‌বোধন করা হয় তখনকার গভর্নর হাউসের বাগানে। এই প্রদর্শনীর ফলে আর্ট স্কুল স্থাপনের কাজ সহজ হয়ে ওঠে। ১৯৫০ সালে নতুন বর্ষে ছাত্র ভরতির শুরুতে স্থান সংকুলান নিয়ে সমস্যা সৃষ্টি হয়। তখন ছাত্রদের মধ্যে তা নিয়ে অসন্তোষ তৈরি হয়। ছাত্ররা এইসব সমস্যা নিয়ে ধর্মঘট করে। ছাত্রদের এই আন্দোলনকে প্রচার দিতে নভেম্বর মাসে 'ক্যালকাটা গ্রুপের' মতো একটি গোষ্ঠী গড়ে তোলা হয়। যার নাম ছিল ঢাকা আর্ট গ্রুপ। ১৯৫০ সালের ১৬ জানুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ঢাকা হলের কমনরুমে অর্থাৎ লিটন হলে এই গোষ্ঠীর প্রথম প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৫২ সালে ঢাকা ইনস্টিটিউট ন্যাশনাল মেডিকেল স্কুলের বাড়ি থেকে সেগুন বাগিচায় স্থানান্তরিত হয়। পরে বর্তমান নিজস্ব ভবনের উদ্‌বোধন হয় ১৯৫৭ সালে। ১৯৬৩ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠান ঢাকা চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ের মর্যাদা লাভ করে এবং স্নাতক পাঠক্রম চালু হয়।

ঢাকা আর্ট ইনস্টিটিউটের প্রথম দিকের ছাত্র ছিলেন দেবদাস চক্রবর্তী, আসিবুল ইসলাম, বিজন চৌধুরী, সবুর আহমেদ, ইসদাদ হোসেন, হুমায়ুন মাহবুব প্রমুখ।

ঢোকরা — ডোকরার বানান ভেদ।



ত

তক্ষশীলা — পাকিস্তানের রাওয়ালপিণ্ডি শহরের কাছে একটি অতি প্রাচীন শহর। পুরাতাত্ত্বিক খননকার্য চালিয়ে এখানে খ্রিস্টপূর্ব



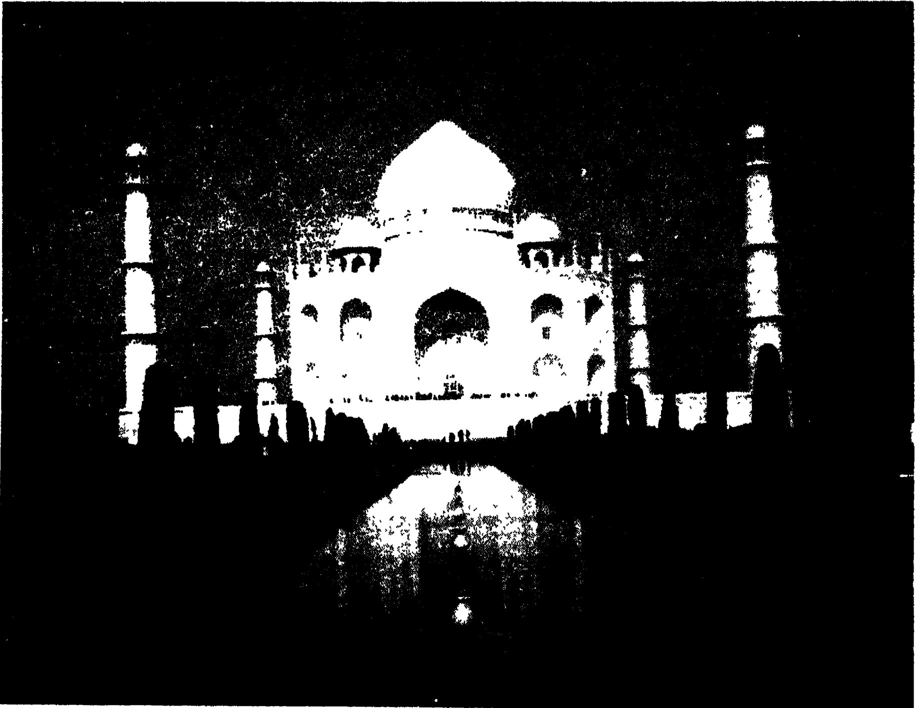
নং ১০৮ গান্ধার স্তম্ভ ভাস্কর্যের অংশ : বুদ্ধের জন্ম। কুষাণ যুগ। খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী।

সপ্তম শতাব্দীর একটি নগরের ধ্বংসস্তুপ পাওয়া গেছে। এই ধ্বংসস্তুপের মধ্য থেকে পাওয়া প্রাপ্ত বৌদ্ধমঠ, স্তুপ, ভাস্কর্য গান্ধার রীতিতে নির্মিত। আলেকজান্ডারের আগমনের সাথে গ্রিক সংস্কৃতির প্রভাবে যে গান্ধার শৈলীর উদ্ভব ঘটেছিল তার চর্চা এখানেও বহুলমাত্রায় অনুসৃত হয়েছিল। ফলত এখানে প্রাপ্ত বুদ্ধ মূর্তিতে গান্ধার শৈলীই প্রধান।

তাজমহল — মুঘল সম্রাট শাহজাহানের পত্নীর আসল নাম ছিল আরজুমন্দ বানু বেগম। কিন্তু তিনি খ্যাত ছিলেন মমতাজ মহল নামে। যার মানে প্রাসাদের আলো। এই মমতাজ মহলের স্মৃতিকে অমর করে রাখতে আগ্রায় যমুনা নদীর দক্ষিণ পাড়ে শাহজাহান এই সমাধি সৌধ নির্মাণ করান। এই স্থাপত্য

একসময় পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্যের মধ্যে গণ্য হত। যমুনার তীরে বিশেষ উপায়ে গুরুভার বহনক্ষম ভিত তৈরি করে তার ওপর ১৮.৯ ফুট উঁচু বেদি নির্মাণ করা হয়। বেদিগর্ভে মমতাজ এর মরদেহ সমাধিস্থ করা হয়। বেদির চার কোণে চারটি মিনার। মিনারের মাথায় একটি করে ছত্রী। ভূগর্ভস্থ সমাধিকক্ষের ওপরে অষ্টভূজ হল ঘরে নকল সমাধি মকবারা স্থাপিত। দুইতলে সাজানো খিলান সারির ওপর সিলিং। চারদিকে চারটি অভিন্ন মস্ত খিলান। প্রতিটির উচ্চতা ১০৮ ফুট। ১৬৩২ থেকে ৫৩ সাল পর্যন্ত প্রায় ২২ বছর ধরে ২০ হাজার শ্রমিকের পরিশ্রমে তাজমহল নির্মিত হয়েছিল। তাজমহলের প্রকৃত স্থপত্তির নাম সঠিক ভাবে জানা যায় না। কেউ বলেছেন গিরনিমো ভেরোনিয়ো নামে একজন ইতালীয় নাগরিক এর নকশা প্রস্তুত করেছিলেন। আবার ঊনবিংশ শতাব্দীর কোনো বইয়ে তাজমহলের নকশা প্রস্তুত কারক হিসাবে ওস্তাদ ইসমাইল আফান্দির নাম উল্লিখিত আছে। তবে এটা নিশ্চিত যে বহু সুদক্ষ কারিগর ও শিল্পী তাজমহল নির্মাণে হাত লাগিয়েছিলেন। রাজমিস্ত্রির পরিচালক ছিলেন আগ্রার স্থপতি মহম্মদ হানিফ। মোজাইক

নং ১০৯. তাজমহল। শাহজাহানের আমল। সমাপ্তিকাল ১৬৫৩ খ্রিস্টাব্দ।



ও ভাস্কর্য শিল্পী ছিলেন দিল্লির চিরঞ্জীলাল এবং মুলতানের বলদেও সিং। ক্যালিগ্রাফি উৎকীর্ণ করেছিলেন পারস্যের আমানৎ খাঁ সিরাজি, ওহাবখান, তুরস্কের সাত্তারখান, মুলতানের আবদুল গফফর, বাগদাদের মহম্মদ খান, সিরিয়ার রৌশন খান প্রমুখরা। অলংকার খচিত করেছিলেন মূলত দিল্লি, লাহোর, মুলতান ও কনৌজের হিন্দু পাচ্চিকার বা শিল্পীরা। তাজমহলে ব্যবহৃত শ্বেতপাথর, লাল বেলেপাথর এবং অন্যান্য পাথর এসেছিল করদরাজ্যগুলি থেকে উপঢৌকন হিসাবে। রাজকোষ থেকে দেওয়া হয়েছিল ৪৫৫ কেজিরও বেশি সোনা। খচিত রত্ন সামগ্রির মধ্যে আছে টারকুইস, হীরে, অ্যাগেট, লাপিজলাজুলি, প্রবাল, মুক্তো, নীলা, পোখরাজ, রুবি, মরকত ইত্যাদি। মুসলিম স্থাপত্যের চরম নিদর্শন তাজমহলের নিটোল গড়নই তার নান্দনিক বৈশিষ্ট্য। প্রচুর অলংকরণ থাকা সত্ত্বেও মুহূর্তের জন্যেও এই নির্মাণ ক্লান্তিকর হয়ে ওঠেনি। ১৯৮৩ সালে ইউনেসকো তাজমহলকে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ স্থান হিসাবে ঘোষণা করে। বায়ু দূষণের ফলে তাজমহলের শ্বেতপাথরের ক্ষতি এড়াতে ১৯৯০ সাল থেকে নানা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

তালপাতার চিত্র

কাগজ আবিষ্কারেরর আগে পুঁথি লেখা হত মূলত তালজাতীয় গাছের পাতায়। খ্রিস্টীয় অষ্টম শতাব্দী পালবংশের প্রতিষ্ঠার





নং ১১০. তালপাতার চিত্র। পঞ্চরক্ষা। বাংলা। ১০৫৭ খ্রিস্টাব্দ।

পর যেসব পাণ্ডুলিপি তৈরি হয়েছিল, তা সবই হয়েছিল তালপাতায়। এইসব পুঁথিতে যেসব অলংকরণ করা হয়েছিল সেসবই হল তালপাতার চিত্রের প্রাচীন নিদর্শন। তালপাতা খুবই সরু স্বভাবতই এসব চিত্রকে অণুচিত্র বা মিনিয়েচার বলাই সংগত। পালযুগের এসব চিত্রকলা বৌদ্ধধর্মীয় পুঁথি অলংকরণের জন্য চিত্রিত হলেও অনেকক্ষেত্রেই বিষয়ের সঙ্গে ছবির কোনো যোগ থাকত না। বরং বিষয় নিরপেক্ষ ছবিই আঁকা হত অনেকক্ষেত্রে। এমনকি চিত্ররচয়িতারাও সবসময় বাংলার মানুষ ছিলেন না। নেপালের শিল্পীরাও একাজ করেছেন। দু-ধরনের তালপাতা একাজে ব্যবহৃত হত। 'খড়তাল' এবং 'শ্রীতাল' বা তাড়। বাংলাদেশ সহ পূর্বাঞ্চলে এই শ্রেণির পাতা যথাক্রমে তাল এবং তেরেট নামে পরিচিত ছিল। তবে স্থায়ীত্বের কারণে তেরেটই বেশি ব্যবহৃত হয়েছে। কেন-না এই পাতা পাতলা নমনীয় হওয়ার কারণে বেশি স্থায়ী। প্রতিটি পাতায় তিনটি চিত্রিত বিষয় ফলক দেখা যায়। মাঝখানে একটি এবং দু-পাশে দুটি। চিত্রফলকগুলির সাধারণ মাপ ৬×৭ সেন্টিমিটার। চিত্রিত বিষয় আটটি অঙ্গে বিভক্ত। যথা বর্তিকা, ভূমিবন্ধন, লেখা, রেখাকর্ম, বর্ণকর্ম, বর্তনাকর্ম, লেখন বা লেখকরণ এবং দ্বিককর্ম। সাদা, হলুদ, নীল, লাল, কালো এইসব রঙে তুলি দিয়ে ছবি আঁকা হত। বিভিন্ন রকমের তুলি ও জল রং এই ছবিতে ব্যবহৃত হয়েছিল। পাল সম্রাট ধর্মপাল-দেবপাল-এর সময়ের দুজন বিখ্যাত শিল্পীর নাম জানা গেছে। বরেন্দ্রবাসী এই শিল্পীরা হলেন ধীমান এবং তার পুত্র বীতপাল। এঁদের প্রবর্তিত ধারা পূর্বভারতীয় শিল্পরীতি নামে পরিচিত। নেপালি চিত্রকরেরা পূর্বভারতীয় রীতি অনুসরণ করলেও এর গুণ অনুধাবন করতে পারেননি। নেপালি চিত্রকলায় রঙের শেডিং নেই। সম্ভবত তাঁরা শেডিং-এর কৌশল আয়ত্ব করতে পারেননি।

তাশিস্‌ম্ (Tachisme)

১৯৪০ এবং ১৯৫০-এর ইউরোপীয় শিল্পের এক বিশেষ শৈলীকে বোঝাতে এই শব্দটি ব্যবহার করা হত। এই শৈলী আমেরিকান অ্যাবস্ট্র্যাক্ট এক্সপ্রেশনিস্ট শৈলীর সমগোত্রীয়। ফরাসি শিল্প সমালোচক শার্ল এসতিয়েন যে সব অ্যাবস্ট্র্যাক্ট পেন্টিং-এ ব্লট বা স্টেইন-এর মতো করে রং চাপানো হয় তার জন্য এই শব্দটি ব্যবহার করেন। এই শিল্পীরা জ্যামিতিক

গঠনকে বাতিল তো করেনই নি বরং ক্যালিগ্রাফিক পদ্ধতি ও প্রক্রিয়াকেও এই শৈলীর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কখনো-কখনো অ্যাকশন পেন্টিং রীতিকেও ব্যবহার করেছেন। আসলে তাশিস্‌ম্‌-এর লিরিক্যাল অ্যাবস্ট্র্যাকশন এবং 'আর্ট ইনফরমেল'-এর মধ্যে ভেদরেখা টানা কঠিন। তাশিস্‌ম্‌ ইউরোপীয় অ্যাবস্ট্র্যাক্ট এক্সপ্রেশনিজ্‌মের জঁরিক নাম হয়ে উঠেছিল। শার্ল এসতিয়েন তাশিস্ট শিল্পদের একটি ন্যূনতম কর্মসূচির ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টায় ১৯৫০ থেকে Paris Salon d'October সংগঠিত করেছিলেন। একটি পত্রিকাও (Cimaise) প্রকাশ করা হয়েছিল। ১৯৫৫ সালের পর এই পরিভাষাটি অবলুপ্ত হয়ে যায় এবং শিল্পীরা 'আর্ট ইনফরমেলে'র বিশ্বে মিশে যান।

তেল রং — অয়েল কালার দেখুন।

তেল রং কালো হয়ে যাওয়া — পুরোনো হয়ে গেলে কিছু কিছু কারণে তেল রঙের ছবি কালচে হয়ে যায় বা হলদেটে হয়ে যেতে পারে। তেল রঙের মধ্যে তিসির তেল থাকে এবং ছবি আঁকার সময়ও তিসির তেল রঙের সঙ্গে মেশানো হয়। এই তিসির তেল পুরোনো হলে কালচে হয়ে যায়। তবে এই কালচে হয়ে যাওয়া নির্ভর করে তেলের গুণমান ও রঙে তেলের পরিমাণের ওপর। কোনো কোনো শিল্পী ছবি আঁকার সময় রঙে খুব বেশি মাত্রায় তেল মেশান। ফলে রঙে তেলের পরিমাণ বেড়ে যায়। এক্ষেত্রে হট-প্রেসড তিসির চেয়ে কোল্ড-প্রেসড তিসির তেল অনেক ভালো বলে মনে করা হয়। আবার রঙে যে বার্নিশ ব্যবহার করা হয় তার মধ্যে থাকে কোপাল রেজিন। এটাও রংকে লক্ষণীয়ভাবে কালচে করে দেয়। ফলে তেল রঙের ছবি কালচে বা হলদেটে হয়ে যাওয়া এড়াতে ভালো গুণমানের রং এবং কোপাল বার্নিশ ব্যবহার না করাই শ্রেয়।

তোসা স্কুল (Tosha School) — পঞ্চদশ শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত জাপানি দরবারি শিল্পরীতি। 'কানো' পরিবারের প্রতিদ্বন্দ্বী তোসা পরিবারের থেকে শব্দটি নেওয়া হয়েছে। এর সঙ্গে যুক্ত শিল্পীরা জাপানের দেশজরীতি 'ইয়ামাটো-ই' শৈলীতে ছবি আঁকতেন। এ সব ছবির সাইজ এবং বিষয়বস্তু উভয়ই ছোটো ছোটো।

নং ১১১. বেসনগরের মন্দিরের লিনটেলের ভাস্কর্য। মকরের ওপর গঙ্গাদেবী। গুপ্ত যুগ। ৫০০ খ্রিস্টাব্দ। উচ্চতা ৭৬ সেমি.।



ত্রিভঙ্গ

হিন্দু মূর্তির তরঙ্গিত ভঙ্গিমা। অনেকটা ক্ল্যাসিকাল গ্রিক ভাস্কর্যের কনট্রাপোস্তো রীতি। অমরাবতীর শিল্পীদের মূর্তি শৈলীতে ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা খুবই রমণীয়। একথাও ঠিক যে অমরাবতীর ভাস্কর্যে গ্রিক প্রভাব লক্ষ করা যায়। এটা সম্ভব এইজন্য যে বাণিজ্যের কারণে খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে গ্রিকরা দক্ষিণ ভারতে



থ

থাংকা পেন্টিং (Tanka Painting)

বৌদ্ধ ধর্মীয় একজাতীয় চিত্রকলা। যা বিশেষ করে বৌদ্ধধর্মীয় মঠগুলিতে দেখতে পাওয়া যায়। এর সঙ্গে তিব্বতীয় সংস্কৃতি ও আঙ্গিকের একটা জোরালো সম্পর্কে আছে। এই চিত্র

কাপড়ে আঁকা হয়। একে পতাকা চিত্রও বলে। এই শৈলীতে কাঠের প্যানেলে বা দেয়ালে মুরালের মতো করেও অনেক ছবি আঁকা হয়। এমনকি কাপড়ে এমব্রয়ডারি বা অ্যাপলিক করেও তৈরি করা হয়। এর উপজীব্য বিষয়ের বেশিরভাগই হল মহাযান তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্ম, জাতকের গল্প, বৌদ্ধ দেবদেবীর নানা অবতার বা রূপ, যে সম্প্রদায়ের গুম্ফা তাঁদের ধর্মগুরুর প্রতিকৃতি। ভারতের উত্তর ও উত্তর পূর্বাঞ্চলের বৌদ্ধ মঠ ও গুম্ফাগুলির দেয়ালেও এর নমুনা দেখা যাবে। এসব ছবির বেশিরভাগই চকচকে এনামেল জাতীয় রঙে আঁকা গোল্ডেন বা সিলভার রেখাবদ্ধ ও ফ্ল্যাট ধর্মী।

ছবি নং ১৭১ পৃ. ৩৫৯

থাম্বনেল স্কেচ (Thumbnail sketch)
একটি ছবির বা কম্পোজিশনের ছোটো ও রাফ ডিজাইন। এটা কম্পোজিশনে উদ্ভুত নানা সমস্যাকে বুঝতে সাহায্য করে। যেমন কম্পোজিশনে ব্যবহৃত বিভিন্ন বস্তু বা ফিগারের অবস্থান, তাদের তুলনামূলক আকার, টোনাল ভ্যালু এমনকি অনেক সময় রঙের ব্যবহার ইত্যাদির নির্ধারণ ও সমাধানে থাম্বনেল স্কেচ সহায়ক হয়। বস্তুত এই পদ্ধতির মধ্য দিয়ে কম্পোজিশনে ব্যবহৃত শৈল্পিক উপাদানগুলিকে দ্রুত বেছে নেওয়া যায় ফলে সময়ও বাঁচানো যায়।

থিনার (Thinner)
ঘন চটচটে কোনো পদার্থকে যে তরল দিয়ে নরম করা হয় বা গোলা হয়। তেল রঙের ক্ষেত্রে টারপেনটাইন বা খনিজ সুরাসার হল সাধারণ থিনার। জল রঙের ক্ষেত্রে জল, অ্যাক্রিলিক রঙের ক্ষেত্রে জল এবং অ্যাক্রিলিক মাধ্যম থিনার হিসাবে কাজ করে।

থ্রি পয়েন্ট পারস্পেকটিভ (Three-Point Perspective)
রৈখিক বা লিনিয়ার পারস্পেকটিভের ক্ষেত্রে দিকচক্রবালে বা হরাইজন লাইনে অবস্থানকারী দুটো ভ্যানিশিং পয়েন্ট-এর বাইরে অতিরিক্ত যে ভ্যানিশিং পয়েন্ট তৈরি হয়। যেটা আইলেভেলের ওপরে বা নীচে অবস্থান করে।



দরবারি শিল্প (Durbar art)
দরবারি শিল্প আসলে মুঘল ঘরানার শিল্পকলা। যা কার্যত আকবরের আমলে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময় থেকে মুঘল

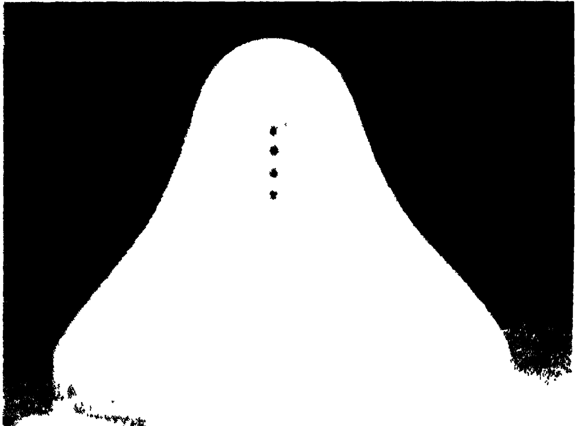
শিল্পীদের ছবিতে আলংকারিক রীতির পরিবর্তে মনুষ্য অবয়ব সহ স্থানদৃশ্য ব্যবহার হতে শুরু করে। এই রীতি আসলে একধরনের মিশ্র আঙ্গিক। মুঘল সম্রাট আকবরের ভারতীয়করণের নীতির ফলশ্রুতিতে তাঁর চিত্রকারখানায় পারস্য থেকে আগত শিল্পীদের এবং মুঘলপূর্ব যুগের ভারতীয় শিল্পীদের সম্মিলিত চর্চার ফলে যার সৃষ্টি। দরবারি শিল্প মুঘল বাজারি শিল্পকলার ঠিক বিপরীত মেরুতে অবস্থান করত। বাজারি শিল্পকলায় প্রকাশ পেত নিম্নবর্গীয় মানুষের শিল্পবোধ। উলটোদিকে দরবারি শিল্পে প্রকাশ পেত। দরবারি আদবকায়দা ও রাজকীয় জীবনযাত্রা। স্বভাবতই এই শিল্পে বাস্তবতার উপাস্থিতির প্রশ্ন নেই তবে শিল্পকলা তৈরির রাজকীয় কারখানাগুলিতে শিল্পীদের সাথে ক্রেতারা মিলিত হতেন। ক্রেতা অর্থাৎ পৃষ্ঠপোষকের ও শিল্পীদের যুগ্ম চাহিদায় শিল্পের ভাষা রচিত হবার ফলে শিল্পীদের আঙ্গিক নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা করার কিছুটা স্বাধীনতা ছিল। দরবারি চিত্রকলাকে সাধারণভাবে বলা হয় মিনিয়েচার বা অণুচিত্র। এর কারণ মুঘল চিত্রগুলি মূলত পুঁথিচিত্রণ হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। যদিও মুঘলরা আসার অনেক আগেই এধরনের পুঁথিচিত্রণ শুরু হয়েছিল। এই দরবারি চিত্রকলার জন্ম রাজদরবারে। মুঘল প্রাসাদের যে নির্দিষ্ট স্থানে শিল্পীদের কাজের জায়গা করে দেওয়া হত তাকে বলা হত কারখানা। আবার এই ছবির রং তুলি বা অন্য উপকরণের জন্য যিনি ব্যয় করতেন তাকে বলা হয পৃষ্ঠপোষক। দরবারি শিল্পীরা পৃষ্ঠপোষকদের বলতেন জিল্লইলাহি অর্থাৎ 'ভগবানের ছায়া'। হুমায়ুনের আমলে দুজন বিখ্যাত পারসিক শিল্পী ভারতবর্ষে এসেছিলেন। এঁরা হলেন আবসুদ সামাদ এবং মীর সৈয়দ আলি। মুঘল দরবারি ছবি গুয়াশ মাধ্যমে আঁকা। রং তৈরি হত পাথর গুঁড়ো করে এবং উদ্ভিজ্জ পদার্থ থেকে। প্রথম দিকে দুটো বস্তুকে আলাদা করার জন্য আলাদা দুটো রং ব্যবহার করা হত। পরে ইউরোপীয় চিত্রকলার মতন শেডিং-এর ব্যবহার চালু হলেও তার ঢং ছিল মুঘল শিল্পীদের নিজস্ব। সেইসঙ্গে গাঢ় সরু রেখা দিয়ে পার্থক্য সৃষ্টি করা হত। ১৫৮০-এ একজন পাদ্রির নেতৃত্বে একটি দল আসেন মুঘল দরবারে। তাঁরা আকবরকে কিছু শিল্পদ্রব্য ও বই উপহার দেন। আকবর সেইসব শিল্প দেখে আকৃষ্ট হয়ে দরবারি শিল্পীদের তা অনুকরণ করার আদেশ দেন।

এর পর থেকে দরবারি শিল্পে ইউরোপীয় প্রভাব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যা বোঝা যায় ছবির আঙ্গিক ও বিষয়গত উপস্থাপনা দেখে। যার মধ্যে পরিপ্রেক্ষিত এবং আলো আঁধারি (chiaroscuro) অন্যতম। এছাড়াও প্রতিকৃতি অঙ্কনেও দরবারি শিল্পের মৌলিকত্ব আছে। জাহাঙ্গিরের সময়ের বিখ্যাত শিল্পীরা ছিলেন আবুল হাসান, মনশুর, মনোহর প্রমুখ।

ছবি নং ১৬৯ পৃ. ৩৫৮

দাদা
(Dada)

১৯১৫ সালে জুরিখ শহরে যুদ্ধ ও চিরাচরিত বুর্জোয়া মূল্যবোধের বিরুদ্ধে উদ্ভূত শিল্প, সাহিত্য এবং রাজনৈতিক আন্দোলন। তবে এই আন্দোলন বা বিদ্রোহ 'শিল্পের বিরুদ্ধে শিল্পের আক্রমণ' নামেই চিহ্নিত। দাদাকে ঠিক আন্দোলন না বলে একটা দৃষ্টিভঙ্গি বললেই বোধহয় যথার্থ হয়। এটা ঠিক যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সংহারক বীভৎসতার প্রতিক্রিয়ায় এবং যুদ্ধের বিরুদ্ধে দাদাবাদের জন্ম। বিশ্বযুদ্ধের সময় সুইজারল্যান্ডের জুরিখে ক্যাবারে ভোলটেয়ার নামে এক সান্ধ্য জলসায় প্রকাশিত হয়েছিল 'দাদা' নামে সচিত্র সাহিত্যপত্রিকা। উদ্যোক্তারা ছিলেন কবি ত্রিস্তান জারা, দার্শনিক-সাহিত্যিক উগো বল, কবি ও চিকিৎসক রিচার্ড হেলসেনবেক, শিল্পী হানস আর্প, হানস রিখটার, মার্সেল দুসঁপ প্রমুখ। যুদ্ধবাজ সভ্যতার ধ্বংসাত্মক দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে, অন্তঃসারশূন্য প্রাতিষ্ঠানিকতা ও তার শিল্পের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হলেও দাদাবাদীদের আন্দোলন কার্যত নেতিবাদী



নং ১১২. মার্সেল দুসঁপ ফাউনটেন। ১৯১৭। একটি শৌচালয়ের বেসিনকে শিল্পকর্ম হিসাবে প্রদর্শনীর জন্য জমা দিয়েছিলেন। কিন্তু তা বাতিল হয়ে যায়। প্রতিবাদে দুসঁপ সংস্থার থেকে পদ ত্যাগ করেন।



নং ১১৩. পিকাবিয়া : 'আই সি এগেইন ইন মেমোরি ডিয়ার ইউডিন'। ১৯১৪। ক্যানভাসের ওপর তেল রং। আরও ছবি নং ২০২ পৃ. ৩৭৭

হয়ে পড়েছিল। যদিও দাদাবাদীদের ক্ষোভ শিল্পের চেয়েও শিল্পের অপব্যবহারের বিরুদ্ধেই বেশি ছিল। ফলে তাঁরা প্রচলিত সব শিল্পতত্ত্বই ভেঙে ফেলতে চেয়েছিলেন। দাদা নামটির একাধিক ব্যাখ্যা পাওয়া গেছে। কারও মতে হ্যাঁ হ্যাঁ অর্থাৎ জীবনের প্রতি অঙ্গীকার। আবার কারও মতে খেলার ঘোড়া (Hobloy Horse), যে ঘোড়ায় করে দাদাবাদীরা বেপরোয়া খেলায় মাতবেন। কীভাবে এই নাম বাছাই হল তা না জানাগেলেও জার্মান-ফরাসি অভিধানের একটি শব্দের ইঙ্গিত অনুযায়ী দাদা মানে অভিধানে ছুরি মারার মুহূর্তকে বোঝায়। জারা বলেছিলেন 'যা কিছুই আমরা দেখি সব মিথ্যা' (উদ্ধৃতি : বুদ্ধিজীবীর নোটবই সুধীর চক্রবর্তী সম্পাদিত) আবার আর্প বলেছেন—'১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের বিশ্বযুদ্ধের মারণলীলায় ঘৃণায় উদ্‌বেলিত আমরা জুরিখে শিল্পের কাছে নিজেদের নিবেদন করলাম। দূরে যখন কামান গর্জমান, আমরা তখন সর্বশক্তি দিয়ে গান করছি, ছবিতে রং লাগাচ্ছি, কোলাজ তৈরি করছি, কবিতা লিখছি। যুগের পাগলামি সারাবার নেশায়, স্বর্গ নরকের মধ্যে ভারসাম্য ফিরিয়ে আনতে আমরা শিল্পকে তার মৌল

ভিত্তিতে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করছিলাম, এক নতুন বিশ্ববিন্যাস খুঁজছিলাম। আমরা আবছাভাবে বুঝতে পারছিলাম যে একদিন আসবে যখন ক্ষমতা মদমত্ত গুন্ডারা মানুষের মনকে নিবীর্যতায় আচ্ছন্ন করে দেবার উদ্দেশ্যে শিল্পকে ব্যবহার করবে।' (উদ্ধৃতি : বিশ্বকোষ, ত্রয়োদশ খণ্ড)

কিন্তু প্রয়োগে আমরা দেখলাম অন্য ধরনের রূপ। আদর্শ সচেতন না হয়ে বরং প্রচলিত শিল্প সহ সব কিছুকেই অতর্কিত আক্রমণ করলেন তাঁরা। প্রতিষ্ঠিত শিল্পরূপকে কলঙ্কিত করে বসলেন এবং ব্যঙ্গ, কৌতুক দিয়ে বুর্জোয়া সমাজের নকল ভদ্রতাকে আক্রমণও করলেন। এভাবেই মোনালিসার গোঁফ এঁকে দেন দুসঁপ, অথবা ইউরিনালের বেসিনকে ফোয়ারা (Fountain) নাম দিয়ে প্রদর্শনীতে সাজিয়ে রাখেন। এর মধ্য দিয়ে দাদাবাদীদের প্রতিবাদী চরিত্রটা যেমন ফুটে ওঠে তেমনি একই সঙ্গে একথাও ঘোষিত হয়ে যায় যে 'Dada was the negation of every thing, it was the accidental and the rule, the freedom of the games, and an attemp to give some kind of order to the chaos in the world; it was art and the negation of art? (Quotation : Art of the Twentieth Century by Loredana Parmesani) ক্রমশ দাদাবাদ প্যারিস, বার্লিন, হ্যানোভার, কলোন, বার্সিলোনা প্রভৃতি বহু দেশে ছড়িয়ে পড়ে। আমেরিকায় দাদাবাদী আন্দোলনে যুক্ত শিল্পীরা ছিলেন পিকাবিয়া, ম্যান রে, এবং দুসঁপ। প্যারিসে দাদাবাদীদের কার্যকলাপ ছিল আরও বেশি খামখেয়ালিপূর্ণ কিম্ভূতকিমাকার। যেমনটি দেখা যায় পিকাবিয়ার মেসিন কনফিগারেশন-এর মধ্যে। যুদ্ধোত্তর জার্মানির অর্থনৈতিক সংকটের সময়ে দাদাবাদীরা সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে দায়বদ্ধ ভূমিকা পালন করেছিলেন। উদাহরণ স্বরূপ গ্রসটের 'স্যাভেজ ক্যারিকেচার'-এর উল্লেখ করা যায়। দাদাবাদ প্রথাগত ধারণার ভিতকে কাঁপিয়ে তার ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করার পরেও কার্যত সুরিয়ালিজ্‌মের মধ্যে বিলিন হয়ে যায়। শিল্পী রিখটারের ভাষায় 'সুরিয়ালিজ্‌ম দাদাবাদকে গ্রাস করে হজম করে ফেলে।'

দানিয়ুব স্কুল (Danube School) — ষোড়শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে দক্ষিণ জার্মানির এবং অস্ট্রিয়ার দানিউব উপত্যকায় স্বাধীনভাবে কর্মরত একদল

শিল্পীর শিল্প ঘরানা। এই সব শিল্পীদের মধ্যে চিত্রশিল্পী, ছাপচিত্র শিল্পী, ভাস্কর্য, স্থপতি সকলেই ছিলেন। তাঁদের ছবির ভিত্তি ছিল অন্তিম গথিক রীতির কল্পনাশ্রয়ী রূপান্তর। যা সমকালীন জার্মানির বিশিষ্ট শিল্পী আলব্রেখট ড্যুরার ক্লাসিসিস্‌জমের বিপরীত। এই শিল্পীরা ছবিতে উঁচু শ্যাওলা ধরা গাছ, পাহাড় ইত্যাদিকে চিত্রিত করেছিলেন। প্রকৃতির নানা অবস্থার ল্যান্ডস্কেপ চিত্র এবং কখনো-কখনো সম্পূর্ণ ফিগার ছাড়া ওই জাতীয় ল্যান্ডস্কেপ আঁকার প্রতি তাঁদের বিশেষ উৎসাহ ছিল। এই শিল্পীদের অন্যতম সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব ছিলেন অ্যালব্রেখট আলডফার, ক্রেনাখ, এল্ডার এবং হুবার।

দারুভাস্কর্য

দারুশিল্প দেখুন।

দারুশিল্প

কাঠের কাজ অর্থাৎ কাঠ দিয়ে তৈরি নানাবিধ শিল্প। কাঠের তৈরি শিল্প ভাস্কর্যের ঐতিহ্য বহু প্রাচীন। ঋগ্বেদে 'শতারিত্র' নামে একশো দাঁড় বিশিষ্ট কাঠের তৈরি নৌকার উল্লেখ আছে। গ্রিক দূত মেগস্থিনিসের বিবরণ থেকে জানা যায় খ্রিস্টপূর্ব চতুর্দশ শতাব্দীতে নির্মিত চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের কাঠের তৈরি বিশাল প্রাসাদ অপূর্ব কাঠের সব ভাস্কর্য দিয়ে সাজানো



[illegible] কাজ . কপাটে খোদিত

ছিল। পাশ্চাত্যে সহজলভ্যতার কারণে যেমন পাথর এবং ধাতুর কাজ বেশি হয়েছে তেমনি ভারতীয় শিল্পীদের কাছে কাঠই ছিল বেশি পছন্দের। কিন্তু ভারতের বিশেষ আবহাওয়াজনিত আদ্রতা ও উষ্ণতার জন্য এবং বন্যা, অগ্নিকাণ্ড ইত্যাদির ফলে কাঠের তৈরি বহু নিদর্শনই অবলুপ্ত হয়েছে।

ভারতের দারুশিল্প বা কাঠের কাজে তিন ধরনের রীতির সংমিশ্রণ লক্ষ করা যায়। তা হল প্রাচীন হিন্দুরীতি, ইসলামীয় রীতি এবং শিখ রীতি। পিঁজরার কাজ বা Lattice work ভারতীয় দারু শিল্পের উন্নত রুচির পরিচায়ক। কিন্তু আগ্রাসী ইউরোপীয় সংস্কৃতির চাপে এই রীতির অবনমন ঘটেছে। ভারতীয় ক্লাসিক বা ধ্রুপদি দারুশিল্পের প্রভাব উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের দরজা জানলা তৈরি ও তার পরিকল্পনার মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। পাঞ্জাব স্থাপত্যে যে বোখর্চা (Balcony), তিলি (Panel), এবং গম্বুজ (Dome) দেখতে পাওয়া যায় তার দক্ষতা বিস্ময়কর। কাশ্মীরের দারু স্থাপত্যে একসময় ব্যাপকভাবে পিঁজরার ব্যবহার হত। এই পিঁজরা ইরানের সমগোত্রীয়। কাশ্মীরের মার্তণ্ড মন্দিরে, অবন্তীপুরের স্থাপত্যে গ্রিক ডোরিক রীতির প্রভাব জোরালো। দক্ষিণ ভারতের দারুশিল্পে হিন্দু মন্দিরের কৌশল অনুসৃত চালুক্য শৈলীই মুখ্য ধারা।

বাংলায় এই সব দারুভাস্কর্যের শিল্পীরা ছিলেন এদেশের সূত্রধর সম্প্রদায়ের মানুষ। সুতো ধরে মাপজোক করে কাজ করতে হত বলেই সামাজিকভাবে নামকরণ হয় 'সূত্রধর'। চার ধরনের কাজের দক্ষতা অর্জনের মধ্য দিয়ে এই সূত্রধরেরা কেউ হয়েছিলেন কাষ্ঠকার, ভাস্কর, মৃত্তিকার এবং চিত্রকর।

বাংলার কাঠের কাজের মধ্যে যেসব বৈশিষ্ট্য দেখতে পাওয়া যায় তার মধ্যে আছে মণ্ডপ ও বাসগৃহ, রথ স্থাপত্য, মূর্তিবিগ্রহ, দরজা ও কপাট অলংকরণ। এছাড়াও কাঠের নানা শিল্প যেমন বৃষকাষ্ঠ, সিংহাসন, পুতুল, পুতুলনাচের পুতুল, মুখোশ, পালকি, চণ্ডীমণ্ডপের স্থাপত্য নির্মিতির পাশাপাশি এর খুঁটি কড়িবরগাগুলির ওপর নানারকম কারুকার্য উৎকীর্ণ করা হত। শুঁড়ো অর্থাৎ কার্নিসের ব্রাকেটে খোদাই করা হত নানারকম ফিগার। হুগলি জেলার আঁটপুরে ১৬৮৩ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত একটা চণ্ডীমণ্ডপ মণ্ডপস্থাপত্য ও

ভাস্কর্যের উৎকৃষ্ট উদাহরণ। ঠিক তেমনি বসতবাড়ি বা বাসগৃহতেও দারুশিল্পের চমৎকার ব্যবহার আছে। এইসব মন্দির ও বাসগৃহের দরজা ও কপাট অলংকরণ বাংলার কাষ্ঠশিল্পের অনবদ্য সৃষ্টি। প্রবেশ মুখের আকার ও আয়তন অনুযায়ীই দরজা বা কপাট তৈরি হত। এই সব দরজার ফলকে লো রিলিফে খোদাই করে ফুল, লতাপাতা, পাখি, মানুষের নানারকম ফিগার তৈরি করা হত। এইসব কাঠের মধ্যে বেশির ভাগই ছিল শিশু, গামার, পিয়াশাল। এছাড়াও চাঁপা, কাঁঠাল এসব কাঠও ব্যবহার করা হত। বাংলার দারুশিল্পের আরেকটি নিদর্শন হল রথস্থাপত্য ও ভাস্কর্য। মাহেশ, মহিষাদল, কৃষ্ণনগরের রাজবাড়ির রথ উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। রথ নির্মাণে মন্দিরস্থাপত্যের রীতিই ব্যবহৃত হয়েছে। বাংলায় একধরনের কাঠের পুতুল তৈরি হয় যা দেখতে মমির মতো বলে অনেকে মমি পুতুল বলেন। আবার একসময় এই পুতুল কালীঘাটে পাওয়া যেত বলে একে কালীঘাটের পুতুলও বলা হয়। আমড়া, জিয়োল, ছাতিম, শ্যাওড়া প্রভৃতি কাঠে তিনকোনা বা অর্ধগোলাকৃতি সামান্য খোদাই করে ফিগার তৈরি করে তারপর রং দিয়ে টানাটানা চোখ মুখ আঁকা হয়। এই পুতুলগুলি খেলনা হিসাবে বিক্রি হলেও এতে এক ধরনের টিপিক্যালিটি আছে যা বাংলার নিজস্ব।

দিলওয়ারা মন্দির

রাজস্থানের আবু পর্বতের ওপর দিলওয়ারা নামের গ্রামে অবস্থিত জৈনদের মন্দির। গ্রামের নাম অনুসারে এই নাম। এই মন্দির-ভাস্কর্য বিশ্বের অন্যতম বিস্ময় বললে কম বলা



নং ১১৫. বিমল ভশাহি মন্দিরের মার্বেল ভাস্কর্য। ১০৩২ খ্রিস্টাব্দ। আবু পর্বত। রাজস্থান।

হয়। এখানে শ্বেতাম্বর জৈনদের পাঁচটি মন্দির আছে। এগুলি হল বিমল ভশাহি, লুনা ভশাহি. পিথলহার, পরেশনাথ এবং মহাবীর স্বামী। এই পাঁচের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হল বিমল শা এবং লুনা শা। সমস্ত মন্দিরগুলিই সাদা মার্বেলে তৈরি। মণ্ডপের দ্বার, স্তম্ভ, কুলুঙ্গি, ভেতরের দিকের ছাদ (সিলিং), সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কারুকার্যে শোভিত। ভারতের আর কোনো মন্দিরে এমন সূক্ষ্ম কারু কাজ দেখা যায় না। মানুষের হাতে গোলাকার শিলিং-এর সিমেট্রিক্যাল কম্পোজিশনের এমন নিখুঁত নির্মিতি বিস্ময়কর। কেউ কেউ বলেন, এরকম সূক্ষ্ম কারুকার্য হাতুড়ি বাটালি দিয়ে করা সম্ভব নয়। কিংবদন্তি আছে এইসব নকশা মার্বেল চেঁছে করা হয়েছে এবং যে কারিগর মার্বেল চেঁছে যত ধুলো তৈরি করতে পেরেছেন তার মজুরিও হয়েছে সেই অনুযায়ী।

বিমল ভশাহি মন্দির তৈরি করেছিলেন গুজরাটের সোলাঙ্কি শাসক ভিম দেব ১ এর মন্ত্রী ও সৈন্যাধ্যক্ষ বিমল শাহ। ১৪ বছর ধরে ১৫০০ কারিগর এবং ১২০০ মজুর মিলে ১০০২ সালে ১৮.৫৩ মিলিয়ান টাকা ব্যয়ে এই মন্দির নির্মিত হয়। বিখ্যাত স্থপতি কীর্তিধর এই মন্দিরের নির্মাণ কার্য সম্পাদন করেন। মন্দিরের জন্য ব্যবহৃত পাথর আনা হয়েছিল চোদ্দো মাইল দূর থেকে হাতির পিঠে করে। লুনা ভশাহি মন্দির তৈরি করেছিলেন গুজরাটের সোলাঙ্কি রাজা ভীম দেব-এর দুই ভাই তথা সোলাঙ্কি রাজার মন্ত্রী তেজপাল ও বাস্তুপাল।



ন

নকশা

সাধারণভাবে যে কোনো ছবি। কিন্তু ক্ষেত্র অনুযায়ী অর্থ পালটে যায়। 'শীতের র‍্যাপার নকশা কাটা' বললে বোঝায় যে, শীতবস্ত্রের গায়ে অলংকরণ করা। অলংকরণের এই রূপ নানা মাধ্যমে নানা তলে বা নানান জিনিসে হতে পারে। নকশা অঙ্কিত, খচিত (inlay), খোদাই করা, মুদ্রিত, সেলাই করা, বোনা, অ্যাপ্লিক, মোজাইক ইত্যাদি বিভিন্ন রকমের হতে পারে। ফুল, লতাপাতা, জীবজন্তু, পশুপাখি

সহ নানা ফিগার ব্যবহার করে তৈরি হতে পারে। আবার কোনো পেন্টিংও নকশা হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে। রেখা দিয়ে, রং দিয়ে সবরকমভাবেই নকশা হতে পারে।

নকশি কাঁথা

কাঁথা শব্দটির উৎপত্তি সংস্কৃত 'কন্থা' থেকে। আদিতে অর্থ ছিল জীর্ণ বস্ত্রখণ্ড। কিন্তু পরে নানা বিবর্তনের মধ্যে অর্থ অনেক পালটে গেছে। কিন্তু মূলসূত্র অক্ষত রয়ে গেছে। কাঁথা শব্দের একাধিক অর্থ আছে। যেমন শিশুর শয্যার উপকরণ। জীর্ণ কাপড় দিয়ে তৈরি হয় বলে তা আক্ষরিক ভাবেই কাঁথা। কিন্তু বিশেষ সৌখিন চাদর বা ঢাকা হিসাবে যে কাঁথার ব্যবহার হয় তা নকশি কাঁথা বলে পরিচিত। নকশি কাঁথা বাংলার একান্ত শিল্প ঘরানা। পূর্ব ও দক্ষিণ বাংলাতেই নকশি কাঁথার ব্যবহার বেশি হয়। পুরানো পরিত্যক্ত পাতলা কাপড়কে উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করে



নং ১১৬. দস্তবখান টেবিল ম্যাট। খাতা ফোঁড়। শেরপুর।

পল্লি বাংলার মেয়েরাই এই কাঁথা তৈরি করে। নকশি কাঁথা নিছক শিল্পকর্মই নয়। নিতান্ত অবহেলার জিনিস পরিত্যাজ্য ছেঁড়া কাপড়কে কাজে লাগিয়ে এমন শিল্প সৃষ্টি বাঙালি নারীদের মহান বৈশিষ্ট্যও। শুধু তাই নয় নকশি কাঁথার ভেতর প্রতিফলিত হয় নারীর জীবন, মন, সংস্কার, ঐতিহ্য, পল্লী প্রকৃতির নানা কথা। নারীর বিশ্রাম অবসরও নকশি কাঁথা সৃষ্টির সঙ্গে মিশে থাকে। জানা যায় যে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর নাকি সিলেটে এমন একটি কাঁথার সন্ধান পেয়েছিলেন যেখানে একটি মেয়ে বিয়ে থেকে শুরু করে সারা জীবনের ঘটনা একটি কাঁথার ওপর নিপুণভাবে সেলাই করেছিল। আবার দীনেশ চন্দ্র সেনের কাছ থেকে এমন বহু দৃষ্টান্তের জানা যায় যে, একটি কাঁথা শেষ করতে কয়েক পুরুষ লেগে যায় তবু শেষ হয় না। মা যে কাঁথা সেলাই করতে শুরু করেছিলেন নিজের জীবনে তা শেষ করতে পারেননি তাঁর মেয়ে সারাজীবন ধরে তা শেষ করেছে। কাঁথা তৈরির সময় হল বর্ষাকাল। বর্ষার কারণে বাইরে বেরোনোর উপায় থাকে না। দুপুরের খাওয়া দাওয়ার পরে নিশ্চিন্তে কাঁথা সেলাই করতে লেগে যায় মেয়েরা। কাঁথাতে যেমন জীর্ণ পরিত্যক্ত কাপড় ব্যবহার করা হয় তেমনি সুতোও নেওয়া হয় কাপড়ের পাড় থেকে। অবশ্য নতুন সুতোও ব্যবহার করা হয়। লাল, হলুদ, সাদা, কালো সুতোই বেশি ব্যবহার করা হয়। অন্য রংও বাদ যায় না। কাঁথার সুচের যে রান বা সেলাই ব্যবহার করা হয় তাকে বলে 'দোরোখা'। এতে সেলাই করা নকশা উলটো পিঠেও দেখা যায়। নকশি কাঁথায় যে-সমস্ত ফোঁড় ব্যবহার করা হয় তার মধ্যে আছে বখেরা ফোঁড়, তেরছা ফোঁড়, বরফি ফোঁড়, বাঁশপাতা ফোঁড়, লিক ফোঁড় ইত্যাদি। বড় কাঁথা হলে মাটিতে পেতে দুজনে মিলে সেলাই করে। প্রথমে কয়েক ভাঁজ কাপড় নির্দিষ্ট মাপে সেলাই করে আটকে নিয়ে তারপর নকশা অনুযায়ী ফোঁড় দিয়ে সেলাই করা হয়। অন্যান্য লোকআঙ্গিকের মোটিফের মতো নকশি কাঁথাতেও যেসব মোটিফ ব্যবহার করা হয় তার মধ্যে থাকে ফুল, লতা, পাতা, কলকা, চৌখোপি, গোল, জীবজন্তু, পশুপাখি, মন্দির, গির্জা, মসজিদ, চক্র, শঙ্খ ইত্যাদি। প্রতিটি কাঁথাতেই কেন্দ্রীয়ভাবে একটা বৃত্তাকার অংশ থাকে। তাতে হয় পদ্মফুল নয় অন্য কোনো গাছ বা মোটিফ থাকে। এইসব মোটিফগুলো মূলত প্রতীকী। রঙিন

সুতোর নকশা তোলা হয়ে গেলে ফাঁকা জায়গাগুলোতে ঢেউয়ের মতো ফোঁড় দেওয়া হয়। ব্যবহারিক দিক দিয়ে নকশি কাঁথা অনেক আকারের ও প্রকারের হয়। যেমন লেপ কাঁথা (গায়ে দেওয়ার) সুজনি কাঁথা (বিছানা ঢাকা), ওয়াড় কাঁথা (বালিশের ঢাকনা), শিশুর কাঁথা (সুতলি কাঁথাও বলা হয়। ঢাকনা কাঁথা (জিনিসপত্র ঢাকা দেওয়ার),আরশি লতা (আয়না ঢাকা), আসন কাঁথা (বসার জন্য) ইত্যাদি।

নন অবজেক্টিভ আর্ট (Non objetive Art)

এক ধরনের বিমূর্ত শিল্প। যে শিল্প চেনা বস্তুজগতের কোনো প্রতিরূপকে প্রকাশ করে না। সাধারণভাবে এই শিল্পের দৃশ্যগত উপাদান হল ফর্ম, কালার এবং টেক্সচার।

নন্দনতত্ত্ব

সৌন্দর্যের দর্শন। সৌন্দর্যের স্বরূপ নির্ণয় করা এবং সৌন্দর্য বীক্ষণ এই দর্শনের উদ্দেশ্য। আরও অনেক নামে একে ব্যক্ত করা হয়। কলাতত্ত্ব, শিল্পতত্ত্ব, সৌন্দর্যতত্ত্ব, শিল্পদর্শন ইত্যাদি। নান্দনিক অভিজ্ঞতা ও কর্ম মানুষের সহজাত বৃত্তি। স্বভাবতই নন্দনতাত্ত্বিকতা এক ধরনের সংস্কৃতিও। সমাজের গভীরে তার শিকড় প্রোথিত। কিছু মানুষ আছেন যাঁরা সৃষ্টি করেন, কিছু মানুষ আছেন তার তারিফ করেন উভয়ই নন্দনতত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত। যেহেতু এটাও একটা সংস্কৃতি তাই এরও ভালো মন্দ দুটো দিকই আছে। আবার যেহেতু এটা দর্শন তাই এতেও দৃষ্টিভঙ্গিগত ভাগ আছে। আছে সৌন্দর্যের ভাববাদী ব্যাখ্যা এবং বস্তুবাদী ব্যাখ্যা। ভারতে, গ্রিসে প্রাচীন কাল থেকেই নন্দনতত্ত্বের চর্চা হয়েছে। প্রাচীন ভারতে ভরত, অভিনব গুপ্ত, আনন্দবর্ধন প্রমুখ মনীষীরা নন্দনতত্ত্ব নিয়ে বই লিখেছেন। পাশ্চাত্যের প্রাচীন দার্শনিক অ্যারিস্টটল, প্লেটো প্রমুখের নাম বিখ্যাত। আধুনিক যুগে নন্দনতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা নিয়ে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করেছেন কান্ট, হেগেল, মার্কস, ক্রোচে প্রমুখ তাত্ত্বিকগণ।

নন্দনতত্ত্ব নিয়ে অনেকগুলি দৃষ্টিকোণ প্রচলিত আছে। যার মধ্যে কয়েকটি হল প্রধান দৃষ্টিকোণ। প্রধান মতবাদগুলি হল— এক. শিল্প জগতের অনুকরণ, দুই. শিল্প আনন্দময় মনের প্রকাশ। তিন. শিল্প জগৎ ও মনের সুন্দর রূপান্তর। অনুকরণবাদীদের মতে ইন্দ্রিয়জগৎ হল অতীন্দ্রিয় জগতের ছায়া আর এই ছায়াকেই শিল্পী অনুকরণ করেন। এই মতবাদ অনুযায়ী প্রকৃত স্রষ্টা শিল্পী নন ঈশ্বর বা সৃষ্টিকর্তা। এই মতের অন্যতম প্রবক্তা ছিলেন প্লেটো এবং অ্যারিস্টটল।

তবে অ্যারিস্টটল এর সঙ্গে একটা নতুন মাত্রা যোগ করে বললেন শিল্পের সাধারণ ধর্ম হল অনুকরণ আবার অনুকরণের ধর্ম হল বিশেষের মধ্যে সাধারণের সম্ভাবনাকে ব্যক্ত করা। আরেকটা মত অনুযায়ী প্রকৃতিকে অনুকরণ করা অসম্ভব। শিল্প হল একরকম ক্রিয়া অর্থাৎ সৃষ্টিক্রিয়া। শিল্পীর প্রতিভা শিক্ষা ও চর্চার বা সাধনার ফল। ফলে শিল্প হল জগতের রূপান্তর। রূপান্তর সত্ত্বেও বিষয়বস্তু চেনা যায়। শিল্পীর কল্পনা মিশে থাকে বলেই শিল্পে তার আগের রূপ সম্পূর্ণ হারিয়ে যায় না। এইমতের প্রবক্তারা রোমান্টিকতাবাদী বলেও পরিচিত।

প্রকাশবাদীরা আবার শিল্পকে আত্মার উদ্ভাস বা মনের প্রকাশ বলেই বর্ণনা করেছেন। এই মতের প্রধান পুরুষ ইতালীয় দার্শনিক বেনেদেত্তো ক্রোচে। তিনি বলেছেন প্রকাশকর্মের সাফল্যের মধ্যেই সৌন্দর্যের অবস্থান। প্রকাশের অক্ষমতা বা অপূর্ণতাই হল অসুন্দর। ক্রোচের মতে প্রকাশভঙ্গি ও কর্মই সৌন্দর্যের প্রাণ। তাঁর মতে যে কোনো শিল্প বা art মাত্রেই বীক্ষণক্রিয়ার ফল। এই বীক্ষণ দ্বারা যা প্রকাশ করা হয় তাই হল art বা শিল্প। প্রকাশ শব্দটির দুটো অর্থ— চেতনায় বা বোধে উদ্ভাস অর্থাৎ অন্তরে উপলব্ধি আর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যভাবে প্রকাশ যেমন ভাষায়, রূপে, ভঙ্গিতে, অভিনয়ে। প্রকাশবাদীদের কাছে চেতনা বা বোধে প্রকাশই মুখ্য। বহিঃপ্রকাশের প্রয়োজনহীনতাকে গ্রহণ করে কেউ কেউ 'নীরব কবিত্বের' কথা উল্লেখ করেছেন। কোনো কোনো প্রকাশবাদী আবার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বহিঃপ্রকাশকেই শিল্প বলে মনে করেন।

মার্কস নন্দনতত্ত্বে 'শিল্পের জন্য শিল্প'কে গুরুত্ব দেননি। মার্কসবাদী দর্শন অনুযায়ী চেতনা হল বস্তুজগতের প্রতিফলন স্বভাবতই সৌন্দর্য চেতনাও তার বাইরে থাকতে পারে না। জীবন নিরপেক্ষ বিশুদ্ধ শিল্প কার্যত অস্তিত্বহীন। মার্কসবাদী তাত্ত্বিকগণ সৌন্দর্যতত্ত্ব আলোচনায় সমাজ বাস্তবতার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং নৈতিকতাহীন শিল্পকে কখনোই গ্রহণ করা হয়নি। সমস্ত যুগের শিল্পেই যে মানব ও সমাজহিতৈষীমূলক আদর্শ রয়েছে মার্কস এঙ্গেলস তাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেছেন। *ইসথেটিকস দেখুন।

নবিস (Nabis) একদল ফরাসি শিল্পী ১৮৮৮ সালে এই গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এঁরা এই নামটি নিয়েছিলেন হিব্রু শব্দ থেকে

যার অর্থ হল ভবিষ্যৎবক্তা (Prophet)। ব্রিটানির পঁতাভঁ শহরে থাকার সময় গগাঁ যেভাবে ছবিতে ফ্ল্যাট অংশে বিশুদ্ধ বর্ণলেপন পদ্ধতি প্রয়োগ করেছিলেন তা এই শিল্পীদের আকৃষ্ট করেছিল। গগাঁ এই পদ্ধতি অনুসরণ করার পাশাপাশি বাস্তববাদী বর্ণনা রীতিকে বাতিল করতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। পঁতাভঁতে গগাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছবি 'ভিশন আফটার দি সারমন' নবিসের শিল্পীদের যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল। নবিসরা ভাবতেন কোনো ছবিকে বাস্তবের নকল হওয়া উচিত নয় বরং তাকে বাস্তবের সমান্তরাল হতে হবে, এতে ধারণার ওপর জোর দেওয়া হবে এবং কখনও তার রূপ হবে কাল্পনিক। ছবির পাশাপাশি এই শিল্পীরা রঙ্গমঞ্চের নকশা, বই অলংকরণ, পোস্টার তৈরি, স্টেইনড গ্লাস চিত্রণ থেকে জাপানি উডকাট প্রিন্টের মতো কাজও করেছেন। এই দলে ছিলেন পিয়ের বোনার, এদুয়ার ভুইয়ার, মোরিস দনিস, পল সেরুজিয়ের, অ্যারিস্টিড মাইলল প্রমুখ শিল্পী। বোনার ও ভুইয়ার বোধ হয় এই দলের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিল্পী, যাঁরা ঘটনাক্রমে একটু অন্যরকম শৈল্পীর দিকে ঝুঁকে পড়েন যা ইনটিমিজ্‌ম বলে পরিচিত।

নভেম্বর গ্রুপ (November Group)

সমাজতান্ত্রিক ভাবাদর্শে বিশ্বাসী প্রগতিশীল শিল্পীদের একটি গোষ্ঠী। ১৯১৮ সালে বার্লিনে এই গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠা হয়। একই বছরে বিশিষ্ট স্থপতি গ্রপিয়াস প্রতিষ্ঠিত 'ওয়ার্কার্স কাউন্সিল অব আর্টসের' সঙ্গে এই গোষ্ঠীর শিল্পীদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। পরের বছর ১৯১৯ সালের নভেম্বরে এই দুই সংস্থা মিশে যায়। এই গোষ্ঠীর সদস্য ছিলেন সিজার ক্লাইন, ম্যাক্স পেকস্টাইন, মুয়েলার এবং হাইনরিখ ক্যাম্পেনডঙ্ক সহ বিশিষ্ট শিল্পীরা। এই গোষ্ঠী চিত্রশিল্পী, ভাস্কর, স্থপতি, লেখক, চলচ্চিত্র নির্মাতা সহ নানান শিল্পীদের নিয়ে প্রগতিশীল সংস্কৃতি গড়ার কেন্দ্রস্থল হয়ে উঠেছিল। এঁরা শিল্পকলা ও জনগণের মধ্যে সমন্বয় ঘটানোর ডাক দিয়েছিলেন। তবে এঁদের এই আহ্বান রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের চেয়ে গোষ্ঠী চেতনা গড়তেই বেশি আগ্রহী ছিল এবং তাঁদের অনেক লক্ষ্যই শেষ পর্যন্ত বাউ হাউসের কাজে রূপায়িত। নভেম্বর গ্রপের শিল্পীরা আধুনিক শিল্পকলার সমস্ত ধরনের আন্দোলনকেই সাদরে গ্রহণ করেছিলেন। এসব সত্ত্বেও এই গোষ্ঠীর অস্তিত্ব দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। ১৯২৯ সালেই নভেম্বর গ্রুপ ভেঙে যায়।

নরউইচ স্কুল (Norwich School)

ইংরেজ ল্যান্ডস্কেপ চিত্রের আঞ্চলিক ঘরানা। ব্রিটিশ শিল্প ইতিহাসে এটাই একমাত্র স্থানীয় ঘরানা যা আদি ইতালীয় ঘরানার সঙ্গে তুলনীয়। ১৮০৩ সালে নরউইচে 'বৃদ্ধ' জন ক্রোম এর প্রতিষ্ঠা করেন। এই ঘরানার সঙ্গে যুক্ত শিল্পীরা ১৮০৫ থেকে ১৮২৫ সাল পর্যন্ত প্রতিবছর বাৎসরিক প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন। ক্রোম ছাড়াও অংশগ্রহণকারী আর একজন গুরুত্বপূর্ণ শিল্পী ছিলেন জন শেল কটম্যান। এই শিল্পীদের তেল ও জল রঙে আঁকা ল্যান্ডস্কেপ চিত্র সপ্তদশ শতাব্দীর ডাচ শিল্পী মেন্ডার্ট হোবেমা এবং জ্যাকব ভ্যান রুইসদেল-এর ল্যান্ডস্কেপের কথা মনে করিয়ে দেয়।

নর্থ লাইট (North light)

এক সময় শিল্পীরা সূর্যের আলোর ওপর নির্ভর করতেন। কেন না তখন এখনকার মতো কৃত্রিম বিজলি বাতির ব্যবস্থা ছিল না। জানলা থাকলে পূর্ব-পশ্চিম উত্তর-দক্ষিণ চারদিক দিয়েই আলো আসতে পারে। কিন্তু পূর্ব ও পশ্চিমমুখী জানলা দিয়ে আসা আলো সকালে বিকালে পালটায়। ফলে এই দু-দিকের দু-রকম আলোতে কাজ করা অসম্ভব। বাকি উত্তর ও দক্ষিণী আলোর মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য আছে। দক্ষিণ গোলার্ধ থেকে আগত আলো দক্ষিণমুখী জানলা দিয়ে সরাসরি ঘরে ঢোকে। সূর্য দক্ষিণ বরাবর সরে যায় বলে দক্ষিণমুখী জানলা দিয়ে আসা আলো লক্ষ্যণীয় ভাবে পালটে যায়। কিন্তু উত্তরমুখী জানলা দিয়ে আলো সরাসরি আসে না। এই আলো বস্তুত বিক্ষিপ্ত প্রতিফলিত আলো। বিক্ষিপ্ত আলোর রং, তীব্রতা এবং অভিমুখ সারাদিন ধরে প্রায় একই থাকে। এই আপেক্ষিক স্থিতিশীলতার জন্য শিল্পীরা উত্তরা আলো-কে পছন্দ করেন। তবে এখন নানাধরনের পছন্দসই কৃত্রিম আলোর লভ্যতার জন্য সূর্যের আলোর উপর নির্ভরতা কমেছে। স্বভাবতই উত্তর বা দক্ষিণ আলোর কার্যকারিতাও অর্থহীন হয়ে পড়েছে।

নরম্যান স্টাইল (Norman Style)

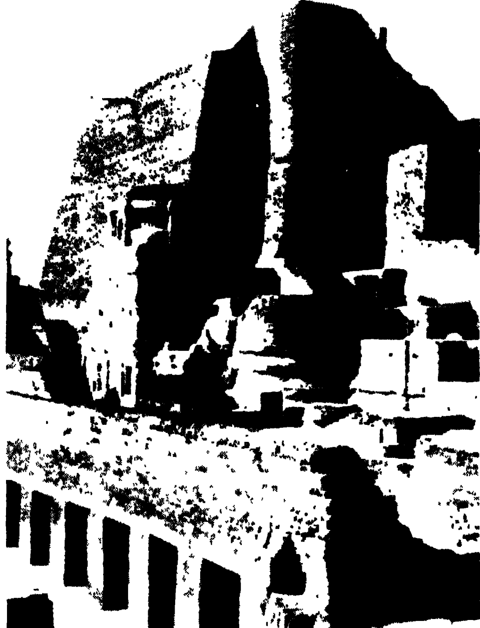
রোমানেস্কের ব্রিটিশ রূপ। ১০৬৬ সালের নর্মান বিজয়ের সঙ্গে যা যুক্ত। তবে এটা স্পষ্টতই বোঝা যায় যে এই শৈলী বারগান্ডি, রাইনল্যান্ড এবং নরম্যানডি থেকে নেওয়া। এর মুখ্য বৈশিষ্ট্য ছিল গোলাকার খিলান ও খোদাই করা অলংকৃতি। প্রায় ২০০ বছর ধরে এই শৈলী প্রচলিত ছিল।

নাঙ্গা স্কুল (Nanga School)

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে উদ্ভুত জাপানি চিত্রকলার একটি ঘরানা। জাপানি ভাষায় দক্ষিণী চিত্রকলা। নাঙ্গা ঘরানার শিল্পীরা ত্রয়োদশ শতাব্দীর পরবর্তী সময়ের ইয়ুয়ান কালের বিশিষ্ট অপেশাদার চিনা শিল্পীদের অনুশীলিত পুঁথিগত ছবিকে অনুকরণ করতেন। এমনকি যখন নাঙ্গা শিল্পীরা যথার্থই পেশাদার তখনও 'কানো' এবং 'তোসা' ঘরানার বাণিজ্যিক ছবির চর্চাকে সরিয়ে রেখেই তাঁরা এই ধরনের ছবি এঁকেছিলেন।

নালন্দা

বিহারের নালন্দা জেলায় অবস্থিত প্রাচীন ভারতের বিশ্বখ্যাত বিদ্যা ও ধর্মচর্চার কেন্দ্র। বুদ্ধদেব এবং মহাবীরও এখানে এসেছিলেন। প্রত্নতাত্ত্বিক সূত্র থেকে যে তথ্য পাওয়া যায় তা থেকে মনে করা হয় যে নালন্দায় সর্ব প্রথমে বিহার প্রতিষ্ঠা করেন গুপ্তবংশীয় সম্রাট প্রথম কুমার গুপ্ত পঞ্চম শতাব্দী নাগাদ। তারপর থেকে নালন্দা নানা পৃষ্ঠপোষকতায় বিকশিত হতে থাকে। নালন্দা ছিল মহাযান বৌদ্ধদের কেন্দ্র। এখানে মহাপণ্ডিতদের অধীনে নানা বিষয়ের জ্ঞান চর্চা হত। প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননে নালন্দায় প্রায় ১৩টি বিহার, ১৪টি মন্দির, অনেকগুলি স্তূপের সন্ধান পাওয়া গেছে। নালন্দায় যথেষ্ট পরিমাণে শিল্প চর্চা হত। নালন্দার শিল্পকে বলা হয়



নং ১১৭. নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ও তার প্রধান স্তূপের ভগ্নাবশেষ। নির্মাণকাল ৪৬৭ - ৪৪৩ খ্রিস্টাব্দ।

মগধী শিইম্প্রশেনিস্টদের শেষ প্রদর্শনীতে স্যুরা, সিগন্যাক, পিসারো যে ছবি প্রদর্শিত করেছিলেন সেখানে সাধারণভাবে রং লাগানোর পরিবর্তে বিশুদ্ধ রংকে বিন্দু বিন্দু করে লাগিয়ে ছবি এঁকেছিলেন। এই রীতি পয়েন্টিলিজ্‌ম নামেও পরিচিত। যা মনে এবং রেনোয়ারের ছোটোছোটো ডোরার মতন রং লাগানোর রকমফের। এই ছবি দেখে শিল্প সমালোচক ফেলিক্স ফেনেয়োঁ স্যুরা, সিগনাক, পিসারোর শৈলীকে নিও ইম্প্রশনিস্ট নামে আখ্যায়িত করেন। আধুনিক তত্ত্ব অনুযায়ী তাঁরা রংকে ক্যানভাসে না মিশিয়ে পাশাপাশি দৃশ্যত মিশিয়েছেন। তাঁরা বলেছিলেন যে রঙের নিয়মাবদ্ধ ও যুক্তিপূর্ণ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে ইম্প্রেশনিজ্‌মকে ক্রটিমুক্ত করে এগিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছেন।

নিও ক্লাসিসিজ্‌ম
(Neo Classicism)

ইউরোপে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে শিল্পকলার মোটিফ, বিষয় এবং আলংকারিক রীতিতে প্রাচীন গ্রিক ও রেমান শৈলী তথা ক্ল্যাসিকাল রূপের পুনর্জাগরণ। তবে এটা সংগঠিত হয়েছিল তৎকালীন রোকোকো ধারার হাস্যকর কাজকর্মের প্রতিক্রিয়ায়। ১৭৭০ সালে নিও ক্লাসিসিজ্‌ম পূর্ণ মানে প্রতিষ্ঠা পায়। এর কিছু আগেই পম্পেই এবং হারকিউলিয়াম আবিষ্কৃত হয়েছিল। এই আবিষ্কার প্রত্নতাত্ত্বিক অনুপুঙ্খতা সংশোধন করার দিকে উৎসাহিত করে। এই সময়ের আর-এক রীতি— বারোক ছিল সর্বেসর্বাবাদী। কিন্তু নিও ক্লাসিসিজ্‌ম ছিল যুক্তি ও আলোকপ্রাপ্তির প্রকাশ। নিও ক্লাসিসিস্টরা ক্লাসিক রূপকে দেখতেন বিদ্যমান দার্শনিক ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিগুলির যুক্তিপূর্ণ ও শৃঙ্খলাবদ্ধ রূপায়ণ হিসাবে। ফরাসি দেশে এই ধারা নির্দিষ্টভাবেই বিপ্লবের সঙ্গে যুক্ত ছিল এবং সেই সঙ্গে সমাজজীবনে প্রাচীন রোমান গুণাবলি সঞ্চারিত করায় আগ্রহী ছিল। এই সময় আগের যে-কোনো শিল্প আন্দোলনের চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণে তত্ত্ব রচিত ও প্রকাশিত হয়েছে। এই সময়ের অন্যতম বিশিষ্ট জার্মান প্রত্নতাত্ত্বিক উইঙ্কেলম্যান মনে করতেন প্রাচীন শিল্পের শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য হল—'noble simplicity and serene grandeur.' (অভিজাত, সরল এবং শান্ত মহনীয়) শ্রেষ্ঠ নিও ক্ল্যাসিকাল শিল্পীদের মধ্যে ক্যানোভা এবং ডেভিড-এর নাম উল্লেখযোগ্য।

নিও প্লাস্টিসিজ্‌ম
(Neo plasticism)

ডাচ শিল্পী পিয়েট মন্দ্রিয়ানের উদ্ভাবিত একটি শিল্পতত্ত্ব। এই তত্ত্বকে তিনি তাঁর ছবিতে প্রয়োগ করেছিলেন এবং থিও

ভ্যান ডসবার্গ প্রমুখ শিষ্যকেও প্রভাবিত করেছিলেন। এই তত্ত্ব প্রয়োগের উদ্দেশ্যে ১৯১৭ সালে নেদারল্যান্ডে 'De Stijl' (the style) নামের একটি গোষ্ঠীও স্থাপিত হয়। যার সদস্য ছিলেন মন্দ্রিয়ান স্বয়ং, তাঁর শিষ্য ডসবার্গ সহ ভ্যান ডার লেক, ভিলমোস হুসজার প্রমুখ। ডসবার্গ De Stijl নামে একটি পত্রিকাও সম্পাদনা করতেন। এই পত্রিকাতেই 'নিও প্লাস্টিসিজ্‌ম' নামে 'নতুন প্লাস্টিক (অবয়ব ধর্মী) শিল্পতত্ত্ব প্রকাশিত হয়, যার মধ্যে জগতের ঐকতান প্রকাশ হবে। শিল্পীরা যেসব দৃশ্য উপাদানকে বিশ্বজনীন মনে করতেন তার মধ্যেই নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখতেন। আর সেই সব ঐকতান ও শৃঙ্খলাকে জীবনের লক্ষ্য বলে মনে করেন তাকেই তাঁরা জ্ঞাপন করতেন। এই ধারণা অনুযায়ী শিল্প হল সম্পূর্ণ বিমূর্ত। আর এসব হল সরলরেখা, আয়তক্ষেত্র, প্রাথমিক রং (লাল, নীল, হলুদ) এবং সাদা, কালো, ধূসর এমন সব বর্ণহীন রং। স্বভাবতই তাঁদের শিল্পও ছিল একান্তই বিমূর্ত।

নিও (Neo romanticismä)

বিংশ শতাব্দীর স্বতন্ত্র অথচ সম্পর্কযুক্ত দুটো শিল্প ধারা। ১৯৩০ এবং ১৯৪০-এ উদ্ভুত প্রচণ্ড নাটুকে এবং কল্পনাপ্রবণ এই শৈলী সুরিয়ালিজ্‌মের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। এই সময় ফ্রান্সে একদল শিল্পী যার মধ্যে ছিলেন রুশ চিত্রকর ইউগিন বারম্যান ও পাভেল শেলিটশিউ, ফরাসি শিল্পী ও মঞ্চ রূপকার ক্রিস্তিয়ান বেরার্দ প্রমুখর। অতিরঞ্জিত পারস্পেকটিভের দুর্দান্ত ফলাফলকে ব্যবহার করে ভূমধ্যসাগরীয় দুর্দশার আকর্ষণীয় সব ছবি এঁকেছিলেন। এই সব কাজের সঙ্গে সুরিয়ালিস্ট শিল্পী দালির ছবির সাদৃশ্য ছিল! যদিও দালির ছবির উত্তেজনাময় রূপের কোনো উপস্থিতিই সেসব ছবিতে ছিল না। ১৯৩০-এর শেষে এবং ১৯৪০-এ বহু ব্রিটিশ শিল্পীও জাতীয় বৈশিষ্ট্য নিয়েই রোমান্টিক শৈলীর ছবি ও অলংকরণে ফিরে আসেন। গ্রাহাম সাদারল্যান্ড এর সিনিস্টার ল্যান্ডস্কেপ, জন পাইপারের ধরা চিত্রের পুনরুজ্জীবন ইত্যাদি হল নিও রোমান্টিসিজ্‌মের উদাহরণ।

নিম্বাস (Nimbus)

গ্লোরি দেখুন।

নেগেটিভ (Negative)

দু-তিন ধরনের বিষয়ের ক্ষেত্রে নেগেটিভ শব্দটা ব্যবহার করা হয়। প্রথমত, নেগেটিভ হল একটা ফোটোগ্রাফিক প্লেট বা ফিল্ম যাতে যে-কোনো ছবির উলটো রূপ এবং সেইমতো টোন ও রঙের ভ্যালু সম্পন্ন গুণ থাকে, যার মধ্য দিয়ে আলোক রশ্মি অতিবাহিত হয়ে কোনো আলোক সংবেদি কাগজে ঠিক প্রতিরূপ তৈরি করে। দ্বিতীয়ত খোদিত একটা ছাঁচ বা সিল। তৃতীয়ত, একটি এমন প্রতিরূপ যেখানে রিলিফ বা রঙের ফলাফলকে দেখলে মনে হবে উলটোভাবে আছে অর্থাৎ বাস্তবে যে রকম তার বিপরীত হয়েছে।

নেগেটিভ ভলিউম (Negative Volume)

একটি ছবিতে আঁকা কোনো বস্তু বা ফিগারের চারপাশের ছড়ানো জায়গা। সাধারণভাবে এই নেগেটিভ স্পেস ডার্কার বা কালচে হয়। অর্থাৎ চিত্রপটে যে বস্তুটি আঁকা হবে তার চারপাশের অংশে ডার্ক রং চাপিয়ে চাপিয়ে বস্তু বা ফিগারটিকে ফুটিয়ে তোলা হয়। অঙ্কিত বস্তুটির অধিকৃত অংশটি হল পজেটিভ স্পেস। তবে সব সময় নেগেটিভ স্পেস ডার্ক হবে এমন নাও হতে পারে। যেসব নেগেটিভ স্পেস হাল্কা বা উজ্জ্বল হয় তাকে রিভার্স নেগেটিভ স্পেস বলে। এক্ষেত্রে ছবিতে ক্রমান্বয়ে অনচ্ছ রং চাপিয়ে তা করা হয়। আবার একটি ছবির বিষয়বস্তু অর্থাৎ পজিটিভ স্পেস বাদে চারপাশের ছড়ানো অংশে ডার্ক রং চাপিয়ে ঢেকে ফেলে যেমন নেগেটিভ স্পেস তৈরি করা যায় তেমনি সরাসরি রং চাপিয়ে পজিটিভ স্পেসও তৈরি করা সম্ভব।

নেভ আর্ট (Naive Art)

বিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় সাংস্কৃতিক জ্ঞানসম্পন্ন কিছু সশিক্ষিত অথবা পেশাদার শিক্ষায় প্রশিক্ষিত নন এমন শিল্পীর শিল্পকলা। এই শিল্পকলার মূল বৈশিষ্ট্যগুলি হল এর রূপ ভাবগত, সময়হীন বাস্তবতাসম্পন্ন, একটু রহস্যময় ও অদ্ভুত শিশুসুলভ বা অদক্ষ চাল, সতর্ক ও সরলীকৃত শৈলীবিশিষ্ট, পরিপ্রেক্ষিত বিজ্ঞানের ব্যবহারবিহীন, চড়া এবং উজ্জ্বল রং এবং কখনও বা কাল্পনিক দৃশ্যের মনোহর সরল চিত্রণ। 'নেভ আর্ট' ধ্রুপদি শিল্পতত্ত্বে আদর্শ হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হয়েও ঊনবিংশ শতাব্দীর বিদ্যমান সমকালীন শিল্পকলার নানা ঝোঁকের অন্যতম স্বতন্ত্র এক ধারা হিসাবে গড়ে উঠেছিল। 'নেভ' শিল্পীরা কোনো নির্দিষ্ট শিল্পান্দোলন বা নন্দনতত্ত্বকে অনুসরণ করতেন না তবুও তাঁরা বিংশ



নং ১১৮. রুশো : দ্য মেরি জেস্টারস। ১৯০৬। ১৪৬ X ১১৪.৩০ সেমি.। তেল রং।

শতাব্দীর শুরু থেকে আন্তর্জাতিক ভাবে পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন এবং তাঁদের প্রভাব বজায় রেখেছিলেন। ১৯২৮ সালে 'সেক্রেড হার্ট'-এর শিল্পী উইলহেম উহ্‌দে সংগঠিত 'নেভ' শিল্পীদের প্রদর্শনীটি ছিল 'নেভ' শিল্পকলার চরম স্বীকৃতি লাভের একটি বাঁক। বিখ্যাত 'নেভ' শিল্পদের মধ্যে আমেরিকান শিল্পী এডওয়ার্ড হিকস, গ্রান্ডমা মোসেস, ফরাসি শিল্পী ক্যামিলে বমবি, লুই ভিভিন এবং আঁরি রুশো উল্লেখযোগ্য।

ন্যুভো রেআলিজ্‌ম (Nouveau Realism)

ফরাসি পরিভাষায় নয়া বাস্তববাদ। ১৯৬০ সালে বিশিষ্ট ফরাসি শিল্প সমালোচক পিয়ের রেস্টানি প্রকাশিত একটি ইস্তাহারে এই শব্দটি প্রচলন করেন। জাঁ ত্যাঁজলি, ইভ ক্ল্যাঁ এবং আরমান ফারনান্ডেজ প্রমুখ একদল ফরাসি শিল্পীর বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করতে গিয়ে রেস্টানি এই আখ্যা ব্যবহার করেছিলেন। এই শিল্পীরা সমকালীন নাগরিক পরিবেশে প্রাপ্তিযোগ্য বস্তু বিশেষ করে পড়ে পাওয়া বস্তুকে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে অবাধ বিমূর্তিকরণকে বাতিল করেছিলেন এবং এর দ্বারা সমকালীন সমাজকে বিদ্রুপও করতে চেয়েছিলেন।

ন্যাচারালিজ্‌ম (Naturalism)

সাধারণভাবে ন্যাচারালিজ্‌ম বলতে বোঝানো হয় চোখের অভিজ্ঞতায় দেখা বস্তু জগতের রূপের অবিকল চিত্রণ, কোনো শৈলী, বৌদ্ধিক তত্ত্ব বা ধারণার আরোপ সেখানে থাকবে না। তবে ন্যাচারালিজ্‌মের ব্যাখ্যা নিয়ে শিল্প ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে। কখন এবং কার হাতে এর চর্চা হয়েছিল তা নিয়েও দ্বন্দ্ব আছে। এ সত্ত্বেও বলা যায় যে ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে সমগ্র ইউরোপজুড়ে এই ধরনের শৈল্পিক ঝোঁক বিদ্যমান ছিল। সাহিত্যের ক্ষেত্রে 'ন্যাচারালিজ্‌ম' শব্দটা একটু বেশি স্পষ্ট করে ব্যবহার করা যায় এমিল জোলার রচনার বেলায়। আবার 'রিয়ালিজ্‌মে'র সঙ্গে 'ন্যাচারালিজ্‌ম'কে মিশিয়ে ফেলার সম্ভাবনাও আছে। 'রিয়ালিজ্‌ম'-এ আলোকচিত্রের কায়দায় দর্পণ-প্রতিবিম্বের মতো করে বস্তুর স্বাভাবিক সৌন্দর্য চিত্রণের বদলে অধ্যাত্মিকভাবে বস্তুর প্রকৃত সৌন্দর্য এবং সত্যের বর্ণনা করা হয়। বিখ্যাত জার্মান শিল্পী অ্যাডলফ ভন মেনজেল, রাশিয়ান শিল্পী ইলিয়া রেপিন প্রমুখ 'ন্যাচারালিজ্‌ম' নিয়ে কাজ করেছেন। অন্যদিকে ফরাসি শিল্পী গুস্তেভ কুর্বেও 'রিয়ালিজ্‌ম' রীতিতে ছবি এঁকেছেন।

ন্যাজারেনিস (Nazarenes)

ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের জার্মান ও অস্ট্রিয়ান শিল্পীদের একটি গোষ্ঠী, যাঁরা ইতালিতে শিল্প চর্চা করতেন। বয়সে তরুণ এই শিল্পীরা ভিয়েনাতে ১৮০৯ সালে প্রায় ধর্মীয় সংগঠন 'ব্রাদারহুড অব সেন্ট লিউক' গঠন করেন। ১৮১০ সালে এঁরা রোমে চলে আসেন এবং একটি পরিত্যক্ত মঠে 'কমিউন' করে বাস করতে থাকেন। তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তি মধ্যযুগীয় রীতিবাদ এবং জাতীয়তাবাদ। এই লক্ষ্যে তাঁরা আদি ইতালীয় শৈলী এবং শ্রেষ্ঠ জার্মান শিল্পের সংমিশ্রণ ঘটানোর চেষ্টা করেছেন। স্বভাবতই তাঁরা রাফায়েল এবং ড্যুরাকে অনুকরণ করার চেষ্টা করেছিলেন। সেই সঙ্গে মধ্যযুগীয় গিল্ড ব্যবস্থাকে স্মরণে রাখতে তাঁরা সমবায়ভিত্তিক কর্মসূচিও গ্রহণ করেছিলেন। আর এসবের মধ্য দিয়ে ক্রিশ্চান আর্টকে পুনরুজ্জীবিত করতে চেষ্টা করেছিলেন। এঁদের সঙ্গে যুক্ত শিল্পীদের মধ্যে জার্মান শিল্পী পিটার ভন কর্নিলিউস, ফ্রেডারিক জোহন ওভরবেক, ফ্রাঞ্জ ফোর, জার্মান ভাস্কর ও শিক্ষক উইলহেম ভন স্যাডো প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

ন্যারেটিভ পেন্টিং (Narrative Painting)

গল্প বলার উদ্দেশ্য নিয়ে এই ধরনের চিত্রকলা তৈরি হয়। ইংল্যান্ডে ভিক্টোরীয় যুগে এই চিত্রকলা বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। 'ন্যারেটিভ পেন্টিং'-এ ছবির শিরোনাম একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যেমন ব্রিটিশ শিল্পী উইলিয়ম ফ্রেডরিকস ইয়েমেস-এর একটি ছবি, যার নাম ছিল 'এবং শেষ কবে তুমি তোমার বাবাকে দেখেছ?' বা রবার্ট মার্টিনের ছবির শিরোনাম 'পুরোনো বাড়িতে শেষ দিন।' এছাড়াও উইলিয়ম পাওয়েল ফ্রিথও এই রীতিতে ছবি এঁকেছেন।



প

পট

সংস্কৃত 'পট্ট' শব্দ থেকে পট কথাটির উৎপত্তি। পট্ট মানে কাপড়। কাপড়ের ফালির ওপর খড়িমাটি লেপে গ্রাউন্ড তৈরি করে অথবা কাগজ সেঁটে তার ওপর পট আঁকা হয়। এই পট দু-ধরনের। চৌকো পট এবং জড়ানো পট। চৌকো পট আয়তাকার যা জাদুপট নামে পরিচিত এবং জড়ানো বা দীঘল পট যা দেড় থেকে দু-ফুট চওড়া এবং প্রায় ২০ হাত পর্যন্ত লম্বা হতে পারে। এই পটের দুই প্রান্তে দুটো কাঠি আটকানো থাকে যার একটিতে পটটি গোটানো থাকে। এই জড়ানো পট খুলে গান গেয়েগেয়ে পটুয়ারা সাধারণ মানুষের মধ্যে একধরনের বিনোদনের ব্যবস্থা করেন যা আবার লোক বা জনশিক্ষার কাজও করে। স্বভাবতই পটুয়ারা চিত্রকলার পাশাপাশি কবিতা লেখা এবং সুর করতেও জানেন।

পটের ইতিহাস খুবই প্রাচীন। কেন না বাণভট্টের 'হর্ষচরিত' থেকে জানা যায় যে হর্ষবর্ধন থানেশ্বর নগরীতে একজন ব্যক্তিকে যমপট দেখিয়ে গান গাইতে দেখেছিলেন। জড়ানো পটের বিষয়বস্তু সাধারণভাবে সামাজিক এবং চৌকো বা জাদুপটের বিষয়বস্তু মূলত পৌরাণিক। কালীঘাটের পট এই চৌকো পট থেকে সৃষ্টি হয়েছে। পট যেহেতু লোকচিত্রকলা তাই এতে ব্যবহৃত উপকরণও দেশজ পদ্ধতিতে তৈরি। বহু আগে আরও অনেক ধরনের পট

তৈরি হত। যেমন তালপাতার পট, কাপড়ের ওপর আঁকা কাঁথাপট ইত্যাদি। তুলি তৈরি করা হত ছাগলের ঘাড়ের বা পেটের লোম বা কাঠবেড়ালির বা বেজির লেজের চুল কাঠিতে জড়িয়ে নিয়ে। রংও তৈরি করা হত নানা জিনিস দিয়ে। যেমন কাঁচা হলুদ, এলা মাটি গুলে হলুদ রং। হিঞ্চে পাতার রস থেকে সবুজ রং, জাম বা পুঁই মিটুলির রস থেকে বেগুনি রং। চুনের সঙ্গে খয়ের মিশিয়ে খয়েরি, সিন্দুর বা পোড়ামাটি থেকে লাল, সাদা রঙের জন্য খড়ি বা শাঁখের গুঁড়ো, কালো রং হত হাড়ির গা থেকে ভুসোকালি চেঁছে। নীল রং বানাতে নীল বড়ি বা তুঁতে কিনে আনা হত দোকান থেকে। আঠা হিসাবে ব্যবহার করা হত তেঁতুলবিচির কাই, নিমের আঠা বা ডিমের কুসুম। রং উজ্জ্বল করতে অনেক সময় ব্যবহার করা হত বেলের আঠা। রং গোলা হত নারকেলের মালাতে। এখন অবশ্য এসব উপকরণ সবই বাজার থেকে কিনে আনা হয়। দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা বীরভূমের 'যমপট ও পটুয়া' বই থেকে জানা যায়



নং ১১৯. বেলিয়াতোড়ের জড়ানো পট। বাঁকুড়া।
আরও ছবি নং ২২৩ পৃ. ৩৮৯

যে পট আঁকার ক্ষেত্রে পটুয়া বা শিল্পীরা প্রথমে হালকা লাল রং দিয়ে বিষয়বস্তু বা ফিগারের আউটলাইন এঁকে নিতেন। তারপর এই লাল রং দিয়েই হাত-পা চোখ মুখ আঁকতেন। এরপর ফিগারের মধ্যে বিভিন্ন অংশে প্রয়োজন অনুযায়ী নানা ধরনের রং ভরানোর কাজ করে কালো রং দিয়ে চুল ও চক্ষুদান এবং শেষে সাদা রং দিয়ে ফোঁটার কাজ সারা হত।

পটের রচনাশৈলীর মধ্যে নানা আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য আছে। অবস্থান ও পরিবেশ অনুযায়ী বাংলার পটকে চার ভাগে ভাগ করা যায়। সাঁওতাল উপজাতিদের জন্মকথা সংক্রান্ত পট, 'চক্ষুদান পট', 'যমপট', 'গাজিপট' এবং হিন্দু পুরাণ, মহাকাব্য, কৃষ্ণলীলা ইত্যাদি পট। চক্ষুদান পটের একটা ইতিবৃত্তি আছে। এই পটুয়াদের 'জাদু পটুয়া' বলে। এঁরা কেউ মারা গেলে মৃতের বাড়িতে গিয়ে মৃতের কল্পিত ছবির একটি পট দেখাত। কিন্তু চোখের তারাটি শূন্য রেখে দিত। সেই তারাশূন্য চোখটি স্বজনদের দেখিয়ে বলত যে চোখের তারা দান না করলে মৃতের আত্মা মুক্তি পাবে না। পটুয়াকে ভোজ্য দিলেই চোখের তারা এঁকে দেওয়া হবে এবং মৃত পরিত্রাণ পাবে। শেষে মৃতের আত্মীয়দের কাছ থেকে অর্থ ও আহার্য নিয়ে চোখের তারা দান করে দিত পটুয়া। সাঁওতাল ছাড়াও আরও কয়েক ধরনের উপজাতির মধ্যে এই চক্ষুদান পটের প্রচলন ছিল। যমপটও খানিকটা এ ধরনের। তবে তা শিক্ষামূলক। যাতে মৃত্যুর পর যমপুরীতে গিয়ে শাস্তি পেতে না হয় তার জন্য সৎ নির্দেশাবলি সংক্রান্ত চিত্রকলা।

পটের অঙ্কনশৈলীতে দেখা যায় যে বীরভূমের পটে শেডিং-এর ব্যবহার আছে। বাঁকুড়ার ফিগারের মুখ একপেশে বা প্রোফাইল। বীরভূমের মুখে ভ্রূ জোড়া। পুরুলিয়া এং হুগলির পটে রেখা সাধাসিধা মণ্ডনগুণহীন। মেদিনীপুরের নয়াগ্রামের পটুয়ারা তাঁদের বিষয়ে সমকালীন উপদানকে যুক্ত করে ফেলেছেন। পৌরাণিক বিষয় থেকে অনেক দূরে সরে এসে তাঁরা 'সাহেব পট', 'স্টিমার পট' 'বন্যা পট', 'স্বাধীনতা পট', 'বৃক্ষরোপণ পট' আঁকছেন।

পটের উপকরণ স্থায়ী নয় বলে বাংলার প্রাচীন পট বেশিরভাগই নষ্ট হয়ে গেছে। যে দুজন বিশিষ্ট মানুষ পট সংগ্রহ করে প্রতিষ্ঠানিকভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেন

তাঁরা হলেন গুরুসদয় দত্ত এবং দীনেশচন্দ্র সিংহ। এগুলির অনেকটাই রয়েছে আশুতোষ মিউজিয়ামে এবং গুরুসদয় দত্ত মিউজিয়ামে। উড়িষ্যার পটশিল্পও খুব সমৃদ্ধ। ওড়িয়া পটশিল্পীরা পুরীর কাছে রঘুরাজপুরে বাস করেন এবং পটও আঁকেন নিয়মিত। এসব পট মিনিয়েচার ধর্মী।

পঁতাভঁ স্কুল
(Pont-Aven School)

ব্রিটানির অ্যাটলান্টিক সাগরের তীরে ছোট্ট ছবির মতো গ্রাম পঁতাভঁ। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই শিল্পীদের নজরে পড়ে এই গ্রাম। ১৮৬০ সাল নাগাদ ফরাসি শিল্পীরা এই জায়গাটা আবিষ্কার করেন। ১৮৮৬ সালে পল গগাঁ এখানে প্রথম আসেন। এখানে থাকাকালীন গগাঁ তাঁর স্বকীয় শৈলীর রীতি ও চর্চার চরম অগ্রগতি ঘটান। পঁতাভঁতে গগাঁকে ঘিরে এমিল বেরনার, মোরিস দনিস, পল সেরুজিয়ের প্রমুখ একদল তরুণ শিল্পী জড়ো হয়েছিলেন। গগাঁ স্বাভাবিক ভাবেই এঁদের নেতা হয়ে যান। ১৮৯১ সাল পর্যন্ত বিদ্যমান এই গোষ্ঠীর শিল্পরীতি পঁতাভঁ স্কুল নামে খ্যাত। এখানে বার্টনের চাষিদের বিষয় নিয়ে কাজ করার সময়, ধারণা ও আবেগ নির্ভর স্বাভাবিকতাবাদ বহির্ভূত (non naturalistic) শৈলীর ভেতর ইম্প্রেশনিস্ট রীতির মতো বাহ্যজগতের স্বাভাবিকতাবাদী (naturalistic) উপস্থাপনা দেখে এঁদের মধ্যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। গগাঁ তাঁদের স্বাভাবিকতাবাদকে বাদ দিয়ে ধারণা ও আবেগের প্রতীকী অভিব্যক্তিকেই গ্রহণ করার পরামর্শ দেন। এই রীতি সিনথেটিজ্‌ম নামে পরিচিত। এতে ফ্ল্যাট রঙের অনেকটা অংশকে বলিষ্ঠ ও কালো

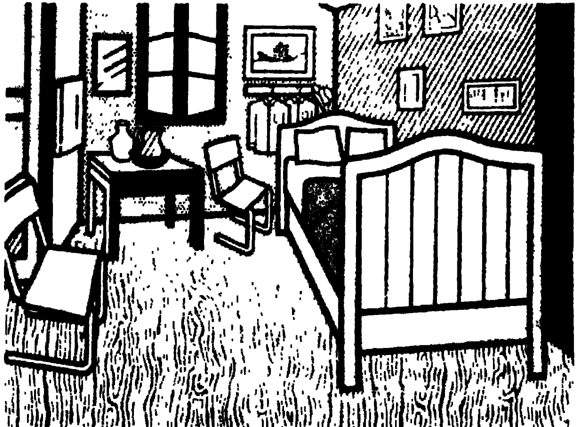


নং ১২০. এমিল বেরনার : ব্রেতোঁ উইম্যান অন আ ওয়াল। ১৮৯২। ক্যানভাসের ওপর তেল রং।

কনটুরের সাহায্যে ঘিরে দেওয়া হয়। এর সঙ্গে ক্লোয়াজনিস্‌মের সাদৃশ্য আছে। এই ধারায় বিখ্যাত ফরাসি শিল্পী লুই অ্যানকেটিনও চর্চা করেছেন।

পপ আর্ট (Pop Art)

ইংরেজি পপুলার আর্ট শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ হল পপ আর্ট। ১৯৫৮ সালে ব্রিটিশ শিল্প সমালোচক লরেন্স অ্যালোওয়ে একটি পাঠে (Text) ১৯৫০ পরবর্তী সময়ের মার্কিন ও ব্রিটিশ শিল্পকলার এক বিশেষ লক্ষণযুক্ত প্রবণতাকে পপ আর্ট বলে বর্ণনা করেন। ভোগবাদ এবং প্রচারমাধ্যম সংস্কৃতির নানান রূপকল্প, যেমন কমিকস্ট্রিপ, পিন-আপ, পোস্টার, প্যাকেজিং ইত্যাদির সঙ্গে নিন্দা-স্তুতির সুন্দর ও সামঞ্জস্যপূর্ণ মিশেল হল পপ আর্ট। ১৯৫২-১৯৫৩ সাল নাগাদ ইংল্যান্ডের ভাস্কর্য শিল্পী এডুয়ার্ডো পাওলেজি, পরিবেশবাদী শিল্পী অ্যান হ্যামিলটন এবং অ্যালোওয়ে ইনস্টিটিউট অব কনটেমপোরারি আর্টের ইন্ডিপেন্ডেন্ট গ্রুপের সদস্যদের সঙ্গে যৌথভাবে প্রযুক্তি ও গণমাধ্যম সম্পর্কিত সমকালীন সমাজ ও সংস্কৃতির স্বরূপ নিয়ে নিয়ে এক আন্তর্জাতিক বিতর্ক আহ্বান করেন। ঠিক এই সময়ে মার্কিন শিল্পী অ্যান্ডি ওয়ারহল, রয় লিখটেনস্টাইন, জিম ডাইন, ক্লিস ওলডেনবার্গ, জেমস রসেনকুইস্ট এবং আরও অনেকে পপ আর্টকে তাঁদের শিল্প চর্চার রীতি হিসাবে বেছে নেন এবং তার অগ্রগতি ঘটান। পরবর্তীকালে যা সারা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। পপ শিল্পীরা তাঁদের শিল্প উপকরণ হিসাবে ভোগ্যপণ্যের নানা ধরনের বিষয়কে ব্যবহার করেছিলেন। পপ আর্ট বস্তুত ছিল বিমূর্ত অভিব্যক্তিবাদের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া। লিখটেনস্টাইন বলেছেন—'I'm



নং ১২১. রয় লিখটেনস্টাইন : বেডরুম অ্যাট আরলেস। ১৯৯২। ক্যানভাসের ওপর তেল রং এবং ম্যাগনা। ৩.২ X ৪ ২ মিটার। রঙিন ছবি নং ২২৫ পৃ. ৩৯০

not interested in the subject matter to try to teach society anything or to try to better our world in any way.' (Quotation from THE ART OF MODERNISM : Sandro Bocola)

উল্লেখযোগ্য বিষয় হল যে, পপ আর্টে যেসব উপাদান ব্যবহৃত হয়েছিল তা শিল্পকলায় আগে কখন ব্যবহার হতে দেখা যায়নি। যেমন কোকাকোলার বোতল, বিভিন্ন দ্রব্যের ছাপা মোড়ক, কমিকস্ট্রিপস্, সেলিব্রেটির ফোটোগ্রাফ ইত্যাদি সহ একেবারে সাধারণ নিত্যব্যবহার্য জিনিসপত্র। যেমন কুর্বে বলেছিলেন 'সময়ের পারিপার্শ্বিক বাস্তব অবস্থাকে শিল্পকলায় স্থান দেওয়াই বাস্তববাদ' ঠিক তেমনি লিখটেনস্টাইনও বলেছেন—'...Really I suppose the meaning of the word realism is to take a common everyday object, which is not considered artistic and portray it. I'm not only portraying it, but I'm working in the style of it, or a style which at least parodies the style of everyday art and everyday society. So it's another form of realism..' (ওই)। পপ আর্টের তিনটে মূল লক্ষণকে চিহ্নিত করাই যায়। যেমন পপ আর্টে বাস্তবধর্মীতা অবয়বভিত্তিক, এই শিল্পকলা চূড়ান্তভাবে ভোগবাদ ও গণমাধ্যম সংস্কৃতি থেকে উদ্ভূত। এর রূপ-উপাদানও অভিনব। পপ আর্ট নির্দিষ্ট কোনো ফর্ম বা রূপকে আশ্রয় করেনি। ফলে সমকালীন বহু ধরনের শৈলীর সঙ্গে পপ আর্টের রূপগত সাদৃশ্য তৈরি হয়েছে। যেমন মিনিমালিজ্‌ম, দাদাইজ্‌ম প্রভৃতি। পপ আর্ট অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ যে কাজটা করেছিল তা হল ফাইন আর্ট এবং কমার্শিয়াল আর্টের মধ্যের সীমানা ভেঙে দিয়েছিল। আমেরিকার শিল্পী বারবারা ক্রুজের এর ১৯৮৭ সালে আঁকা 'আনটাইটেলড' নামে একটি ছবিতে দেখা যায় এক জোড়া উদ্ভাসিত চোখের সামনে কিছু পণ্যের ওপরে লেখা 'I shop therefore I am.' এইভাবে পপ আর্ট প্রচার মাধ্যম এবং বিজ্ঞাপনের জগতে ঢুকে পড়েছিল। পপ শিল্পী পিটার ব্লেক এবং তাঁর স্ত্রী জ্যান হাওয়ার্থ ১৯৬৭ সালে EMI প্রকাশিত একটি অ্যালবামের প্রচ্ছদের নকশা করেন। যা আধুনিক বিজ্ঞাপন শিল্প ও ধারণাকে শক্তিশালী করতে সাহায্য করেছে। আবার

মার্কিন শিল্পীর সখেনবার্গ পাট জাতীয় আঁশ জড়ো করে একটা পাঁঠার অবয়ব তৈরি করেছিলেন। ওয়ারহল কয়েক সারি কোকাকোলা বোতল সাজিয়ে বা ক্যাম্পবেল টোমাটো সুপের চারটে ক্যান সিল্ক স্ক্রিনে ছেপেদিয়েছিলেন। ইউরোপে যাঁরা পপ আর্ট চর্চা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন ডেভিড হকনে, রিচার্ড হ্যামিলটন, প্যাট্রিক লফিল্ড, অ্যালেন জোনস্ প্রমুখ।

পপিসিড অয়েল (Poppyseed oil) — পোস্তদানার তেল। তেল রঙের বাইন্ডার হিসাবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্যবহার হলেও লিনসিড অয়েলের তুলনায় এর গুণমান খুবই নিম্নস্তরের। লিনসিড অয়েলের তুলনায় অনেক তাড়াতাড়ি হলুদও হয়ে যায়। এমনকি পপিসিড অয়েলে যে ফিল্ম তৈরি তাও খুব শক্ত নয় এবং তাড়াতাড়ি চিড় ধরে যায়।

পয়েন্টিলিজ্‌ম (Pointilism) — ডিভিশনিজ্‌ম দেখুন।

পর্নোগ্রাফি (Pornography) — যৌন উত্তেজনা বা অনুভূতি সৃষ্টির লক্ষ্যে সৃষ্ট আদি রসের বা আচরণের বর্ণনা। অথবা সেই ধরনের উপাদানকে উপজীব্য করে তৈরি শিল্প। গোড়ার দিকে শব্দটি পতিতা বৃত্তির বর্ণনামূলক সাহিত্য ও শিল্পকে বোঝাত। যেহেতু পর্নোগ্রাফি শব্দের গ্রিক অর্থ 'বারবনিতার লেখা' তাই কোনো বেশ্যালয় বা বারবনিতার বাড়ির প্রবেশ পথের চিহ্ন বা সংকেত থেকে শব্দটির উদ্ভব বলে অনেকে মনে করেন। পর্নোগ্রাফি নিশ্চিতভাবে প্রাচীন বিষয় হলেও এর আদিপর্বের ইতিহাস খুব স্পষ্ট নয়। কারণ, তখন পর্নোগ্রাফিকে প্রথাগতভাবে চলতে দেওয়া বা সংরক্ষণ করা নিয়ে গুরুত্ব দিয়ে ভাবা হত না। তথাপি প্রাচীন কালের ভারত, চিন, গ্রিস, রোম সহ বহু ঐতিহাসিক সমাজের শিল্পকলায় আদিরসাত্মক রূপ ছিল খুবই সাধারণ বিষয় এবং তা কখনো-কখনো ধর্মীয় বিষয়ের মধ্যেও দেখা যেত। রোমান কবি ওভিড রচিত 'দি আর্ট অব লাভ' বস্তু চরিত্র ভ্রষ্ট করা এবং আদিম প্রকৃতিকে জাগানোর গ্রন্থ। আমাদের দেশেও বাৎসায়নের 'কামসূত্র', মধ্যযুগের কবি ভারতচন্দ্রের লেখা 'বিদ্যাসুন্দর'। ক্যাসানোভার 'মেমোয়ারস', আরব্য রজনী, দেকামেরনে প্রচুর আদিরসাত্মক উপাদান রয়েছে। ২০০৪

সালের নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখিকা ইয়েলনিকের লেখা উপন্যাসকেও অনেক সমালোচক পর্নোগ্রাফি বলে মনে করেন। আধুনিক মুদ্রণ ব্যবস্থার আবিষ্কারকে কাজে লাগিয়ে প্রচুর পরিমাণে পর্নোগ্রাফিক রচনা প্রকাশ করা হচ্ছে যা বিনোদন এবং যৌন আকাঙ্ক্ষাকে উত্তেজিত করার উদ্দেশ্যে কাজে লাগানো হচ্ছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপে পর্নোগ্রাফি সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিবাদের মাধ্যম হয়ে উঠেছিল যার চিরাচরিত লক্ষ্য ছিল রাজন্যবর্গ ও অভিজাত সম্প্রদায়ের কুকর্ম এবং যাজককুল। ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে যথাক্রমে আলোকচিত্র ও চলচ্চিত্রের অগ্রগতির ফলে পর্নোগ্রাফির ব্যাপক বৃদ্ধি ঘটে। একইভাবে আরও ছড়িয়ে পড়ে বিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে ইন্টারনেটের আবির্ভাবের ফলে। বিংশ শতাব্দী জুড়ে উত্তর আমেরিকা এবং ইউরোপের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে পর্নোগ্রাফির ওপর নিয়ন্ত্রণ শিথিল করা হয় কিন্তু এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য এবং আফ্রিকাতে এই নিয়ন্ত্রণ কঠোর ভাবে বজায় আছে। অবশ্য শিশু পর্নোগ্রাফি প্রায় সারা পৃথিবী জুড়েই নিষিদ্ধ।

পলিভিনাইল অ্যাসিটেট (P.V.A)

রেজিনের মতোই একটি সিনথেটিক রেজিন। অ্যাক্রিলিক পেন্টের বাইন্ডার হিসাবে ব্যবহৃত হয়। পলিভিনাইল অ্যাসিটেট 'র' ক্যানভাসের ওপরে প্রাইমার লাগানোর আগে আঠার প্রলেপের কাজেও ব্যবহার করা হয় যার বহুল পরিচিত ব্যান্ড নাম 'ফেভিকল'। এটি একটি শক্তিশালী আঠা। ভাঙা পটারি জোড়া লাগানোর কাজেও ব্যবহার করা যায়।

পলিমার ক্লে (Polymer Clay)

পলিভিনাইল ক্লোরাইডের দানাকে প্ল্যাস্টিসাইজারে ভিজিয়ে তৈরি মাটির মতো একধরনের পদার্থ। এই পদার্থ স্বাভাবিক তাপমাত্রায় নরম এবং নমনীয় থাকে কিন্তু সাধারণ উনানে গরম করলেই শক্ত হয়ে যায়। পলিমার ক্লে বাচ্চাদের খেলায় সামগ্রিক হিসাবে তৈরি হলেও এই মাটি দিয়ে শিল্পীরাও নানা শিল্পকর্ম গড়তে পারেন। এই পলিমার ক্লে বিভিন্ন রঙে দোকানে কিনতে পাওয়া যায়। যার একটি ব্র্যান্ড নাম হল 'প্লাস্টিসিন'। সাধারণ যন্ত্রপাতি ব্যবহার করেই এই ক্লে দিয়ে নানা ধরনের মডেল তৈরি করা যেতে পারে।

পাউন্সিং (Pouncing)

যথাযথ চিত্রতলে নকশা বা ছবির নকল তোলার একটি পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে একটি কাগজের ওপর ছকে নেওয়া

নকশার আউটলাইন বরাবর সূচাগ্র ফুটো করে নিয়ে সেই ফুটো দিয়ে চক অথবা গ্রাফাইটের মিহি গুঁড়ো পাঠিয়ে নকশার খসড়ার প্রতিলিপি করা হয়। এই কাজে সুবিধার জন্য 'পাউন্সিং হুইল' নামে একটি যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। ফ্রেস্কোর গ্রাউন্ডের ওপর খসড়ার স্থানান্তরকরণের জন্য এই পদ্ধতি খুবই উপযোগী।

পাঁচমারি মধ্যপ্রদেশের সাতপুরা পাহাড়ের একটি স্থান। উচ্চতা এক হাজার মিটারের সামান্য বেশি। ভীমভেটকার মতো পাঁচমারিতেও পাহাড়ের গায়ে সাদা ও বাদামি রঙে আদিম প্রস্তরচিত্র দেখতে পাওয়া যায়। এসব চিত্রের মধ্যে আছে শিকার ও গোচারণের দৃশ্য। এইসব দৃশ্যের মধ্যে দুটো বন্য পশুকে বশ মানানো এবং বাঁদরের বাঁশি বাজানোর ছবি খুবই আকর্ষণীয়।

পাঁচমুড়ার ঘোড়া বাঁকুড়া জেলার একটি গ্রাম পাঁচমুড়া। বহু প্রাচীন ঐতিহ্যপূর্ণ টেরাকোটা শিল্প কেন্দ্র। এখানেই তৈরি হয় বহু প্রসিদ্ধ 'পাঁচমুড়ার ঘোড়া'। পাঁচমুড়ার ঘোড়ার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল এই ঘোড়া চাকে তৈরি এবং কয়েকটি অংশে বিভক্ত। অংশগুলি জুড়ে জুড়ে সম্পূর্ণ ঘোড়ার মূর্তিটি তৈরি হয়। অবশ্য মনোলিথিক মূর্তিও আছে তবে তা আকারে ছোটো। ফর্মের দিক দিয়ে পাঁচমুড়ার ঘোড়া বাস্তবানুগ নয়। এর অবয়ব ভাবগত এবং যান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় তৈরি বলে এর রূপ ছাঁচবদ্ধ যার সঙ্গে টোটেমিক রূপের সাদৃশ্য রয়েছে। পাঁচমুড়ার ঘোড়া অ্যানাটমিক্যাল-রিয়ালিটিহীন এবং আলংকারিক। পাঁচমুড়ায় মাটির ঘোড়া তৈরি হলেও পাঁচমুড়ার মাটি দিয়ে তা তৈরি হয় না। মাটি আসে জয়পান্ডা নদী, ধোবাজোড়খাল সহ আশপাশের নানা জলাশয় থেকে। এবং এই মাটিও জমির এক বিশেষ স্তর থেকে তুলতে হয়। চাকে তৈরি হওয়ার জন্য মাটির মূর্তির ওজন যথেষ্ট কম হয়। পরে বিভিন্ন অংশগুলি চাকে তৈরি করে অল্প শুকিয়ে জুড়ে নেওয়া হয়। মাঝে মাঝে গোল ফুটো রাখা হয়। আবার ভালো করে রোদে শুকিয়ে তারপর বিশেষ ধরনের মাটির প্রলেপ দেওয়া হয় উজ্জ্বলতা তৈরি করতে। সবশেষে ভাটিতে পোড়ানো হয়। এই ভাটিকে বলে 'পণ'। পোড়ানোর কৌশলানুযায়ী মূর্তির রং লাল অথবা কালো হয়। ভাটি পুরো বন্ধ করে ঘুঁটে দিয়ে পোড়ালে মূর্তি কালো হবে আর



আউটলেট রেখে কাঠে পোড়ালে মূর্তি উজ্জ্বল লাল রঙের হবে। আজকাল সামাজিক কারণেই এধরনের লোকশিল্পের প্রতি কিছু মানুষের ঝোঁকে বেড়েছে। কিন্তু এর বিপণন ব্যবস্থা শিল্পীদের স্বার্থের অনুকূল নয়। ফলে এই শিল্প ক্রেতার অভাবে হারিয়ে যাওয়ারই কথা। কিন্তু তবু যে এই শিল্প যুগ যুগ ধরে বেঁচে আছে তার কারণটা খুবই বিস্ময়কর। এই শিল্পটি লোকধর্ম কেন্দ্রিক। বিভিন্ন গ্রাম দেবতা বা লোকদেবতা যথা ধর্ম, ভৈরব, বড়াম, রুদ্র, চণ্ডী, মনসা, বঙ্গা প্রভৃতির থানে এইসব মূর্তি চড়িয়ে পুজো দেওয়া, মানত করা দীর্ঘকালের গ্রাম্য রীতি। শহরে এধরনের লোকধর্মীয় উৎসব হয় না। আবার গ্রামেও সামাজিক কারণেই এই সংস্কৃতি বিলীয়মান। ফলে এই মূর্তির চাহিদা কমছে। পাঁচমুড়াতে গেলে দেখা যাবে, যে কয় ঘর কুমোর আছেন তাঁরা বছরের নির্দিষ্ট কিছু সময় ছাড়া বাকি সময় হাড়ি কলসি তৈরি করছেন। এঁদের মধ্যে দু-একজন আছেন যাঁরা টেরাকোটা শিল্পটাকে প্রথাগত রূপের বাইরে এনে অন্য ধরনের জিনিস তৈরি করছেন এবং জাতীয় পুরস্কারও পেয়েছেন। তবে তা এই শিল্প বেঁচে থাকার শর্ত হতে পারে না। পাঁচমুড়াতে ঘোড়া ছাড়াও একইভাবে হাতি, ষাঁড়, বাঘ সহ আরও নানাজাতীয় মূর্তি তৈরি হয় তার রূপবৈচিত্র্যও চমৎকার। বাঁকুড়ার পাঁচমুড়ার ঘোড়া দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে বিদেশের মাটিতেও খ্যাতিলাভ করেছে। পাঁচমুড়ার মৃৎশিল্পী রাসবিহারী কুম্ভকার রাষ্ট্রপতি পুরস্কার লাভ করেছিলেন। এছাড়াও আরও কয়েকজন বিশিষ্ট শিল্পী নানা পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন।

পাপিয়ের কোলে (Papier Colle)

শব্দটি এসেছে ফরাসি ‘সাঁটানো কাগজ’ থেকে। একটি ছবিতে নানা ধরনের ও রঙের কাগজ ব্যবহার করা বা এইসব কাগজ জড়ো করে একটা ছবি তৈরির জন্য কোলাজের একটা রূপকে বোঝাতে ‘পাপিয়ের কোলে’ শব্দটা ব্যবহার করা হয়। দশম শতাব্দীতে চিনে এধরনের আবিষ্কারকে জনপ্রিয় বিনোদন হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছিল। ব্রাক এবং পিকাসোর হাতে ১৯১২ সাল নাগাদ তা ললিতকলার রূপ পায়। মাতিসের শেষ জীবনে এরকম অনেক সুন্দর ‘পাপিয়ের কোলে’-র কাজ আছে।

পাপিয়ের-মাশ (Papier-mache)

পাপিয়ের-মাশ বা পেপার মাসে—ফরাসি এই শব্দের তরজমা হল ‘চিবোনো কাগজ’। এটি আসলে কাগজ এবং

মণ্ড ব্যবহার করে তৈরি এক ধরনে ভাস্কর্যরূপ। পাপিয়ের-মাশ দ্রব্য তৈরির দুটো মূল ধাপ আছে। প্রথম হল, সরু তার-জালি এবং দোমড়ানো নিউজ প্রিন্ট দিয়ে মূল একটা রাফ ফর্ম তৈরি করা হয়। এই প্রাথমিক আকারটা একটু শক্ত পোক্ত হওয়া দরকার যাতে পরবর্তী পর্যায়ে কাগজ বা মণ্ডের আস্তরণ লাগানোর সময়ে এটা চুপসে না যায় এবং ভার সইতে পারে। কখনো-সখনো একটু মোটা তারের আর্মেচার ব্যবহার করারও দরকার হয় যদি বস্তুটা আকারে বড়ো হয়। এরপর এই প্রাথমিক রূপটির গায়ে ময়দার লেই বা রঙিন কাগজের মণ্ডের ওপরে নিউজ পেপারের ছেঁড়া বা কাটা ফালি সাঁটানো হয়। এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন ধীরে ধীরে অভিপ্রেত রূপটি তৈরি হয় তেমনি এরফলে কাঠামোটিও শক্তিশালী হয়। অনেক শিল্পী টুকরো কাগজ দিয়ে মণ্ড বানিয়ে তিন-চারটে লেয়ারে তা লাগিয়ে থাকেন। কেউ কেউ আবার অ্যাক্রিলিক মডেলিং পেস্টও ব্যবহার করেন এবং সেই সঙ্গে রংও করেন কোনো কোনো শিল্পী।

কাগজের মণ্ড ছাড়াও আরও বিচিত্র পদার্থ ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন— বালি, চক ইত্যাদি। এধরনের ভাস্কর্য তৈতিে ছাঁচও ব্যবহার করা যায়। অষ্টাদশ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপে আসবাবপত্রের ছোটো ছোটো জিনিস এবং সজ্জাদ্রব্য বানাতে পাপিয়ের-মাশ ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হত।

ছবি নং ১৭০ পৃ ৩৫৮

পারফর্মিং আর্ট (Performing Art)

যে-সব সৃজনশীল কাজ দর্শক-শ্রোতার সামনে উপস্থাপিত বা সম্পাদন করা হয়। অর্থাৎ নাচ, গান, মূকাভিনয়, নাটক, আবৃত্তি, ম্যাজিক ইত্যাদি। অনেক সময় চিত্রকলা-ভাস্কর্যকেও অনেকে পারফর্মিং আর্ট বলে থাকেন। কিন্তু তা ঠিক নয়। চিত্রকলা-ভাস্কর্য বা সাহিত্য এইজাতীয় কর্মের মধ্যে পড়ে না তার চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের জন্য। তাছাড়া পারফর্মিং আর্টের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল, একটি রচনা বা কম্পোজিশনের পুনঃপুনঃ সম্পাদন বা উপস্থাপনা। যা চিত্রকলার ক্ষেত্রে অসম্ভব।

পারফর্ম্যান্স আর্ট (Performance Art)

পারফর্ম্যান্স আর্ট প্রকৃতপক্ষে একটি শিল্প লক্ষণ। এর প্রেক্ষাপট ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমসাময়িককালে নানা জটিল সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল। এবং পাশাপাশি বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে অসংখ্য আঁভ

ছবি নং ১৭২ পৃ. ৩৬০

গার্দ শিল্পধারা যেমন ফিউচরিজ্‌ম, রাশিয়ান রেয়নিজ্‌ম, কনস্ট্রাক্টিভিজ্‌ম, দাদা, সুরিয়ালিজ্‌ম, ১৯৫০-এর বাউহাউস প্রভৃতির প্রভাব। ফলত বহুতত্ত্ববাদী ও বহুরূপী শিল্পধারার চর্চার মধ্যে ১৯৬০-এর দশকে এই শিল্পধারা ক্রমশ একটি নির্দিষ্ট ঝোঁক নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে এবং বলা যেতে পারে ১৯৭০-এ নিজ অধিকারেই শৈল্পিক অভিব্যক্তি প্রকাশের মাধ্যম হিসাবে মান্যতা পায়।

বিংশ শতাব্দীতে পারফর্ম্যান্স আর্টের ইতিহাস হল যৌনতা বিষয়ক উদারতা, সীমাহীন পরিবর্তনশীলতার লক্ষ্যে মাধ্যমগত বাধ্যবাধকতার আগাম বর্জন, অতি প্রতিষ্ঠিত শিল্প আঙ্গিকের সীমাবদ্ধতার প্রতি অসহিষ্ণু শিল্পীদের দ্বারা রূপায়িত শিল্পকে প্রত্যক্ষভাবে দর্শকের সামনে নিয়ে যাওয়ার সংকল্পের ইতিহাস। এই কারণেই সম্ভবত পারফর্ম্যান্স আর্টের ভিত্তিটা নৈরাজ্যমূলক। স্বভাবতই এই শিল্প আন্দোলন এক অর্থে প্রতিবাদী চরিত্রের।

একটা সময় পারফর্ম্যান্স আর্টকে বলা হত 'লাইভ আর্ট' বা জীবন্ত শিল্প। যা ছিল প্রচলিত শিল্প প্রতিষ্ঠানকে কাঁপিয়ে দেওয়ার উপায় এবং নতুন ভাবনার অনুঘটক। তিনটে উপাদানে এর বৈশিষ্ট্য তৈরি। এক. এই শিল্প 'জীবন্ত' (live) এবং দর্শকের সামনে ঘটে। দুই. এই শিল্পে সাধারণভাবে অন্যান্য পারফর্মিং আর্টিস্ট যেমন নৃত্যশিল্পী, চারুশিল্পী, সংগীত শিল্পী, কবি প্রভৃতিকে কাজে লাগানো হয়। তিন. এখানে পারফর্মার বা উপস্থাপকই হল শিল্পী এবং সেই সঙ্গে কখনো-সখনো একজন অভিনেতা সদৃশ 'চরিত্র'। আমেরিকান শিল্পী ও তাত্ত্বিক তথা 'সংঘটনা' ('হ্যাপে-নিংস')-এর পুরোধা ব্যক্তিত্ব অ্যালান কাপ্রোর মন্তব্য এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, "আজকের দিনের তরুণ শিল্পীর একথা আলাদা করে বলার প্রয়োজন নেই যে, 'আমি একজন চিত্রকর' বা 'আমি একজন কবি' বা 'একজন নট'। সোজাকথায় সে একজন শিল্পী।"

পারফর্ম্যান্স আর্টকে বাংলায় 'অনুষ্ঠান শিল্প' বললে অনেকটাই ঠিক বলা হয়। এর গতি-প্রকৃতির বিচার সেরকমই। কেন না এর মধ্যে নানান শিল্পধারা, যেমন— ভাস্কর্য সংস্থাপন, প্রক্ষেপণ, অঙ্গসঞ্চালন, কৌতুক, ভাঁড়ামি, ধ্বনি, আলো, পাঠ, আবৃত্তি, নাটক এবং ধারাবিবরণী বা গ্রন্থনার ব্যবহার হয়। তেমনি এই শিল্পধারা মিডিয়া নির্ভর অর্থাৎ

আনুষ্ঠানিক উপস্থাপনার সাথে সাথে এর ভিডিয়ো, ফিল্‌ম বা চিত্রবদ্ধ করা হয়।

১৯৬৮ সালে তৈরি মার্কিন শিল্পী শ্রীমতী ইয়ায়োই কুসামা-এর একটি পারফর্ম্যান্স হল 'অ্যান্টি-ওয়ার'—নেকেড হ্যাপেনিং অ্যান্ড ফ্ল্যাগ বার্নিং" নিউইয়র্কের সেন্ট্রাল পার্ক এবং ওয়াল স্ট্রিট সহ বহু গুরুত্বপূর্ণ স্থানকে এজন্য বেছে নেওয়া হয়। যুদ্ধ ও প্রতিষ্ঠান বিরোধী এই পারফর্ম্যান্স-এ ব্রুকলিন সেতুর ওপর কিছু তরুণতরুণী নগ্ন শরীরে নাটকীয় ভঙ্গিমায় যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় পতাকায় আগুন লাগাচ্ছে। অথবা ১৯৬০ সালের মার্চে প্যারিসে শিল্পী ইভ ক্ল্যাঁ তাঁর 'লাইভ' পেন্টিং 'অ্যানথ্রোপমেট্রিকস অব দি ব্লু পিরিয়ড' প্রথম দর্শকের সামনে প্রদর্শন করেন। এই পারফর্ম্যান্সে ক্ল্যাঁর নির্দেশনা অনুযায়ী তিনজন ন্যূড মডেল তাঁদের শরীরে তাঁরই পেটেন্ট নেওয়া নীল রং (ইন্টারন্যাশনাল ক্ল্যাঁ ব্লু) মেখে মেঝেতে পেতে রাখা ক্যানভাসে শরীরের ছাপ লাগান। সেই সময় কুড়িজন যন্ত্রী বাদ্যযন্ত্রে হেনরির 'সিমফনিক মোনোটোন' বাজাতে থাকেন।

পারফর্ম্যান্স আর্টের সমগোত্রীয় আর্ট হল 'ন্যুভো রিয়ালিজ্‌ম, 'ফ্লাক্সাস', 'বডি আর্ট', 'হ্যাপেনিংস' প্রভৃতি। এর সঙ্গে যুক্ত বিশিষ্ট শিল্পীরা হলেন রসখেনবার্গ, ওল্ডেনবার্গ, ডাইন, ম্যানজনি এবং এঁদের পরবর্তী প্রজন্ম অ্যাকনসি, অ্যান্ডারসন, বার্ডেন, গিলবার্ট, উইলসন প্রমুখ।

পারমানেন্স (Permanence)

শিল্পকলার বিভিন্ন উপকরণের স্থায়িত্ব কালি, রং, কাগজ, ক্যানভাস এসবের জীর্ণতারোধক ক্ষমতা। কালি, রং, কাগজ, ক্যানভাস প্রভৃতি সময়ের কারণে জীর্ণ হয়ে যায়। রঙের ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল আলো প্রতিরোধ করতে না পেরে বিবর্ণ বা ম্যাড়মেড়ে হয়ে যাওয়া। যাকে বলে লাইটফাস্টনেস। আলোতে থাকা অতিবেগুনি রশ্মির জন্য এমনটা হয়। আজকাল নানা দেশের স্বীকৃত মানক সংস্থা রঙের আলো প্রতিরোধী ক্ষমতা পরীক্ষা করে মান নির্ধারণ করে দেন। যা রঙের আধারের গায়ে লেখা থাকে।

কাগজের ক্ষেত্রেও যেমন ড্রয়িং বোর্ড, ওয়াটার কালার বা প্রিন্টমেকিং-এর কাগজ পুরোনো হলে বিবর্ণ বা হলুদ হয়ে যেতে দেখা যায়। কাগজের উপাদানের মধ্যে অ্যাসিডের উপস্থিতি অথবা অম্লকর কোনো কিছুর সংস্পর্শে এলে

কাগজের এধরনের অবনমন ঘটে। কাগজ তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় কাঠের মণ্ড অম্লবৎ। সাধারণ নিউজপেপার কাঠের মণ্ড দিয়ে তৈরি হয় বলে সব থেকে তাড়াতাড়ি হলুদ এবং মচমচে ও ভঙ্গুর হয়ে পড়ে। এর প্রতিবিধান হল ছাপানোর সমস্ত উপকরণ থেকে অ্যাসিড দূর করা। সেইসঙ্গে ফিনিশ করা কাগজটিকে অম্লতাপূর্ণ জিনিসপত্র থেকে দূরে রাখা। কাগজ প্রস্তুতকারকরা কাগজের অ্যাসিডকে নিষ্ক্রিয় করতে ক্ষারীয় পদার্থ মিশিয়ে থাকেন।

ক্যানভাসের বেশিরভাগই তৈরি হয় কটন, লিনেন বা সিনথেটিক তন্তু যথা অ্যাক্রিলিক বা পলিয়েস্টার দিয়ে। সিনথেটিক কাপড় পেন্টিং-এর সাপোর্ট হিসাবে খুবই ভালো। এতে কটন বা লিনেনের মতো সমস্যা নেই। কারণ সিনথেটিক তন্তু বাতাস থেকে জলীয় বাষ্প শোষণ করে না বলে বাড়ে কমে না।

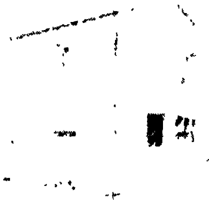
পারস্পেকটিভ (Perspective)

ত্রিমাত্রিক বস্তু বা দৃশ্য অথবা কোনো ত্রিমাত্রিক আয়তনের স্থানকে দ্বিমাত্রিক ও সম্পূর্ণ ফ্ল্যাট তলে উপস্থাপন করা বা আঁকার পদ্ধতি। পারস্পেকটিভ সাধারণ ভাবে দু-ধরনের। লিনিয়ার বা রৈখিক এবং এরিয়াল বা অ্যাটমসফেরিক বা বায়ুমণ্ডলীয়। লিনিয়ার পারস্পেকটিভকে প্যারালাল পারস্পেকটিভও বলে। আমরা যখন কোনো দৃশ্যের দিকে তাকাই তখন দূরের জিনিসগুলিকে কাছের জিনিসের তুলনায় ছোটো দেখি। কিন্তু দূরের জিনিস প্রকৃত অর্থে ছোটো নয়। এমনকি দূরের রংকেও হালকা এবং নীলাভ দেখি। এই দেখার বাস্তবতার সঙ্গে প্রকৃত বাস্তবতার যে



নং ১২২. ক্যানালেত্তো . ভেনিসের পিজা সান মারকোর উত্তর পূর্ব কোণ।

তফাৎ এটাই অ্যাটমসফেরিক পারস্পেকটিভের বিষয়। পারস্পেকটিভ এমন একটা পদ্ধতি যার দ্বারা দ্বিমাত্রিক চিত্রপটে ত্রিমাত্রিক আয়তনের বিভ্রম সৃষ্টি করা হয়। এই দৃষ্টিবিভ্রমকে ধরেই পারস্পেকটিভের বিশ্বাস হল যে, সমান্তরাল রেখাগুলি কেন্দ্রাভিমুখী হয়ে ক্রমশ দর্শকের চোখ বরাবর দিকচক্রবাল রেখার ওপর অবস্থিত একটি বিলীয়মান বিন্দুতে (vanishing point) মিলিত হয়। ফলে চোখের থেকে দূরে অবস্থিত বস্তুগুলি ক্রমশ ছোটো এবং গায়ে গায়ে দেখতে পাওয়া যায়। কোনো একটি বস্তুর ক্ষেত্রে বিজ্ঞানসম্মত পারস্পেকটিভের ব্যবহারকে বলা হয় 'ফোরশর্টেনিং'। প্রাচীন কালে ইজিপ্টীয়রা বিভিন্ন বস্তুকে ওপর আর-একটা প্রয়োজন মতো ছোটো বড়ো করে ওই 'ফোরশর্টেনিং'কে বোঝানোর চেষ্টা করতেন। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে গ্রিকরাও 'ফোরশর্টেনিং' সদৃশ কিছু সূত্র জানতেন। পরের শতাব্দীর মধ্যেই তাঁরা বস্তুর সঙ্গে ছায়ার ব্যবহার ঘটিয়ে এরিয়াল পারস্পেকটিভ সৃষ্টির চেষ্টা করেন। রোমানরাও এরকম পরিবর্তন এবং ছায়ার ব্যবহার করে অ্যাটমসফেরিক পারস্পেকটিভের সাহায্যে দূরত্ব এবং গভীরতার বিভ্রম বোঝাতেন। তবে বিজ্ঞানসম্মতভাবে আধুনিক পারস্পেকটিভ পদ্ধতির সূচনা হয় ইউরোপীয় রেনেসাঁসের সময়। এ ব্যাপারে ফ্লোরেন্টাইন স্থপতি ফিলিপ্পো ব্রুনেলেশ্চিকেই (১৩৭৭-১৪৪৬) পুরোধা বলে মনে করা হয়। অবশ্য আলবের্তি এবং পাওলো উচ্চেল্লোর অবদানও অসমান্য। এখন যেভাবে পারস্পেকটিভের ব্যবহার করা হয় এই পদ্ধতি হল 'কস্ত্রুজিয়োনি লেজিতিমা'র একটি পরিশীলিত রূপ। গোড়ার দিকে বহু দিন ধরে পারস্পেকটিভের পদ্ধতি নিয়ে অনুসন্ধান চলছিল এবং বহুরকম পদ্ধতি তৈরিও হয়েছিল। ফ্লোরেন্টাইনের মানবতাবাদী স্থপতি ব্রুনেলেশ্চির 'কনস্ত্রুজিয়োনি লেজিতিমা'র ধারণা সঠিক হলেও তা



ব্যবহারের উপযোগী ছিল না। এই পদ্ধতির ত্রুটি প্রথম চিহ্নিত করেন লিয়োনার্দো দা ভিঞ্চি। এর পরিবর্তে তিনি 'কার্ভলিনিয়ার' পারস্পেকটিভের-এর কথা বলেন। এরও কিছু সমস্যা ছিল। এরপর ব্রুনেলেশ্চি সেন্ট্রাল পয়েন্ট পারস্পেকটিভ নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা করেন। পারস্পেকটিভ নিয়ে প্রকাশিত বহু বইয়ের মধ্যে ১৫০৫ সালে জঁ পেলেরাঁ তাঁর বই 'আর্তফিসিয়ালি পারস্পেকতিভা'তে ডায়গোনাল এবং সেন্ট্রাল উভয় ধরনের ভ্যানিশিং পয়েন্টের পদ্ধতিই উপস্থাপিত করেছিলেন। ১৬০০ সালে ডায়গোনাল পদ্ধতিকে আরও উন্নত করেন গাইডো উবাল্ডো ডেল মন্টে। তিনি দেখালেন,কোনো তলে যে কোনো রেখার ভ্যানিশিং পয়েন্টকে চোখ থেকে পিকচার প্লেনের দিকে সেই রেখার সমান্তরাল রেখা টেনে নির্ধারণ করা সম্ভব। এভাবে যতগুলো প্রয়োজন তত সংখ্যক ভ্যানিশিং পয়েন্ট ব্যবহার করা যাবে। পরে ১৬৩৬ সালে গিরার্ড ডেসারেগেস তাঁর 'ম্যানিয়ের ইউনিভার্সেলি'তে ভ্যানিশিং অক্ষের ধারণার প্রবর্তন করেন যার দ্বারা একটি তলেই ঢালু পৃষ্ঠের বিভিন্ন দিকের ভ্যানিশিং পয়েন্ট বের করা সম্ভব। এভাবেই সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থ্রি-পয়েন্ট পারস্পেকটিভ পদ্ধতির উদ্ভব ঘটে এবং একটি নির্দিষ্ট অবস্থানে দাঁড়িয়ে যে-কোনো কোণ থেকে পিকচার প্লেনের দিকে সমতল সম্পন্ন কোনো বস্তুকে যথাযথভাবে চিত্রিত করা সম্ভব হয়।

লিনিয়ার পারস্পেকটিভের প্রাথমিক কিছু বিষয় :

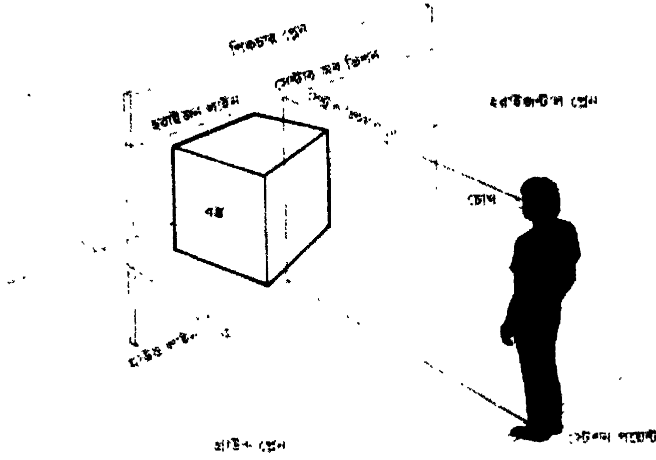
১. পারস্পেকটিভ ড্রয়িং-এ যে-অবস্থানে দাঁড়িয়ে কোনো বস্তুকে দেখা হবে তা হল 'স্টেশন পয়েন্ট'।

২. যে কাল্পনিক 'উল্লম্ব জানলার' মধ্যে কোনো বস্তুকে দেখা হবে তা হল 'পিকচার প্লেন'।

৩. পিকচার প্লেন যে-ভূমির ওপর দাঁড়িয়ে থাকে তথা বস্তুর সম্মুখাংশ যেখানে ভূমি ছুঁয়ে থাকে তা হল গ্রাউন্ড লাইন বা বেস লাইন। গ্রাউন্ড লাইন যে-তলে থাকে বা তা হল গ্রাউন্ড প্লেন।

৪. চোখের সমান্তরাল অনুভূমিক তল হল হরাইজন বা দিকচক্রবাল। এবং এই তল যেখানে পিচার প্লেনকে ছেদ করে সেই ছেদ বরাবর হরাইজন লাইন।

৫. চোখ থেকে দৃশ্যবস্তু বরাবর যে-রেখা পিকচার প্লেনের



ঠিক মাঝখানে যে-বিন্দুতে হরাইজন লাইনকে ছেদ করে সেখানে ভূমি পর্যন্ত লম্ব রেখা হল সেন্টার অব ভিশন।
৬. সেন্টার অব ভিশন ছুঁয়ে বস্তু থেকে চোখ পর্যন্ত প্রবাহিত রশ্মি হল সেন্টার অব ভিশুয়াল রে।
৭. দৃশ্যমান বস্তু বা দৃশ্য পিকচার প্লেন থেকে যত দূরে বা কাছে থাকবে দৃশ্যের আকারও সেই মতো ছোটো বড়ো হবে।

লিনিয়ার পারস্পেকটিভের তিনটি প্রধান সূত্র :

১. পিকচার প্লেনের সঙ্গে সমান্তরাল কোনো তলের আকৃতির কোনো পরিবর্তন হবে না। শুধু সাইজ ছোটো বড়ো হবে অর্থাৎ লম্ব রেখাগুলি লম্বভাবেই থাকবে। পিকচার প্লেনের সমান্তরাল অনুভূমিক রেখাগুলিও অনুভূমিকই থাকবে।
২. সমস্ত সমান্তরাল অনুভূমিক রেখাগুলি হরাইজন লাইনে অবস্থিত ভ্যানিশিং পয়েন্টের দিকে অপসৃত হবে। আর পিকচার প্লেনের সঙ্গে সমকোণী অনুভূমিক রেখাগুলি সেন্টার অব ভিশনে গিয়ে মিলিত হবে।
৩. চোখ বা স্টেশন পয়েন্ট থেকে বস্তুর কোনো রেখা/রেখাগুলির সমান্তরাল যে রেখা/ রেখাগুলি টানা হবে সেগুলি পিকচার প্লেনকে ছেদ করা হরাইজন রেখায়

অবস্থিত নির্দিষ্ট ভ্যানিশিং পয়েন্ট গিয়ে মিলবে। ভ্যানিশিং পয়েন্ট এক, দুই বা তার বেশিও হতে পারে। পারস্পেকটিভের এই বিভ্রমকে কাজে লাগিয়ে কোনো শিল্পী কোনো একটা নির্দিষ্ট অবস্থান থেকে একটা উঁচু খাড়া দেয়ালকে অসমান তিন ভাগে ভাগ করেও এমনভাবে দেখাতে পারেন যাতে সেই নির্দিষ্ট অবস্থান থেকে তিনটি ভাগকেই সমান উচ্চতাবিশিষ্ট বলে মনে হবে। এই রকম পদ্ধতিকে বলে কাউন্টার পারস্পেকটিভ।

অ্যাটমসফেরিক বা এরিয়াল পারস্পেকটিভ হল দূরত্বজনিত দৃষ্টিবিভ্রম। এটা কোনো দৃশ্য বা বস্তুর ওপর বায়ুমণ্ডলের প্রভাবের ফল। প্রথমত, বায়ুমণ্ডলে ধুলোবালি থাকার ফলে দূরের সব অংশ থেকে সমানভাবে আলো এসে পৌঁছাতে পারে না। সেই কারণে কোনো কোনো রং বায়ুমণ্ডলে শোষিত হয়। ফলে দূরের বস্তুর বহু ডিটেল হারিয়ে যায়, রং ম্যাড়মেড়ে হয়ে লক্ষণীয়ভাবে নীলাভ থেকে ধূসর বর্ণে পরিবর্তিত হয়। রোমান যুগের ফ্রেস্কো পেন্টিং-এ এই বৈশিষ্ট দেখা গেছে। তবে সেগুলি সবই ছিল ষোড়শ শতাব্দী পরবর্তী ইউরোপীয় স্বাভাবিকতাবাদী ল্যান্ডস্কেপ পেন্টিং-এর ধাঁচের। জাপানি ও চিনা কালিচিত্রেও এরকম অ্যাটমসফেরিক পারস্পেকটিভ ব্যবহার দেখা যায়। ভারতীয় প্রাচ্য রীতিতে এই জাতীয় গাণিতিক পারস্পেকটিভের দেখতে পাওয়া যায় না। সেখানে একরকম কাল্পনিক বহুমাত্রিক পারস্পেকটিভ দেখতে পাওয়া যায়।

পাল যুগের চিত্রকলা

মূলত পুঁথি বা গ্রন্থ চিত্রণ। তারানাথের লেখা বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাসে পাল পুঁথিচিত্র সম্বন্ধে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। এই সময়ের দুজন শিল্পী ধীমান ও তাঁর পুত্র বীতপাল পাল চিত্রকলায় দুটি রীতির প্রবর্তন করেন। পাল চিত্রকলার প্রভাব নেপাল থেকে তিব্বত এমনকি মঙ্গোলিয়ার চিত্রকলাতেও পরিলক্ষিত হয়। *তালপাতার চিত্রকলা দেখুন।

ছবি নং ২০৯ পৃ. ৩৮১

প্যালান্ডিয়ানিজ্‌ম (Pallandianism)

১৭২০-১৭৭০ সালে ইংল্যান্ডে এই স্থাপত্য আন্দোলন রমরমা হয়ে ওঠে। প্যালান্ডিয়ানিজ্‌ম প্রাণিত হয়েছিল ভেনিশিয়ান স্থপতি আন্দ্রে পালাদিয়োর কাছ থেকে। পালাদিয়ো ছিলেন রোমান স্থাপত্যতাত্ত্বিক ভিট্রুভিয়াসের শিষ্য রেনেসাঁসের প্রধান স্থাপতি। আবার পালাদিয়োর প্রথম

নং ১২৩. প্যালাডিয়ানিজ্‌ম চিজউইক হাউস। বারলিংটন। ১৭২৫ খ্রিস্টাব্দ।



ব্রিটিশ শিষ্য ছিলেন সপ্তদশ শতাব্দীর স্থপতি ইনিগো জোনস। অষ্টাদশ শতাব্দীতে জোনসকে অনুসরণ করেছিলেন বহু ব্যক্তি। যেমন স্কটসম্যান কোলেন ক্যাম্পবেল, স্থপতিদের পৃষ্ঠপোষক এবং বার্লিংটনের তৃতীয় আর্ল, স্থপতি রিচার্ড বয়লি, এবং বার্লিংটনের আশ্রিত উইলিয়ম কেন্ট প্রমুখ। প্যালাডিয়ানিজ্‌মের একটা রাজনৈতিক প্রভাব ছিল কেন-না হুইগ দলের অভিজাত সদস্যরা, যাঁরা হ্যানোভারের সংসদকে সমর্থন করেছিলেন তাঁরা প্যালাডিয়ানজ্‌মকে প্রশ্রয় দিতেন। যে বারোক রীতি তখনও পর্যন্ত ইউরোপের বেশিরভাগ অংশে বিদ্যমান ছিল রোম্যান ক্যাথলিকবাদ এবং পদচ্যুত রাজাদের সঙ্গে তাও তাঁদের দ্বারা প্যালাডিয়ানিজ্‌মের সহযোগী হয়েছিল। সাধারণভাবে প্যালাডিয়ানিজ্‌ম অষ্টাদশ শতাব্দীর সামাজিক প্রয়োজনে রোম সাম্রাজ্যের স্থাপত্যকে মুক্তভাবে গ্রহণ করেছিল। সেইসঙ্গে সাধারণ রোমক বাড়িগুলি থেকে নানা মোটিফ ধার করে গির্জা এবং অন্যান্য সাধারণ ও ব্যক্তিগত বাড়িগুলিতে ব্যবহারের জন্য কাজে লাগানো হয়েছিল।

পাহাড়ি চিত্রকলা

মুঘল সাম্রাজ্যের অবক্ষয়ের ফলে মুঘল দরবার থেকে চ্যুত শিল্পীদের অনেকেই রাজস্থানে সামন্ত রাজাদের কাছে আশ্রয় নিয়েছিলেন। এই সময় পাঞ্জাব উপত্যকা দ্বারা বিচ্ছিন্ন পার্বত্য রাজস্থানের কয়েকটি রাজ্যে গীতধর্মী হিন্দু বিষয়বস্তু সম্বলিত একধরনের চিত্রশৈলী গড়ে ওঠে যা পাহাড়ি


নং ১২৪. মাণ্ডির রাজা শামসের সেন এবং তাঁর পুত্র সুরমা সেন। ১৭.৭৫ খ্রিস্টাব্দ। কাগজের ওপর জল রং। ১৯.৭ X ২৫.৪ সেমি.।

চিত্রকলা নামে খ্যাত। পাহাড়ি চিত্রকলার তিনটে মূল ধারা হল বাশোলি, গুলের ও কাংড়া। ১৬৫০-এর আগে বাশোলিতে চিত্রকলার কোনো ঐতিহ্য ছিল না। কিন্তু বাশোলির রাজা সংগ্রাম পালের সময় বাশোলিতে এক নতুন চিত্ররীতি আচমকাই বেশ জোরালো হয়ে ওঠে। এই রীতি ১৬৯০ পর্যন্ত সজীব ছিল। এই সময়ের বাশোলি রীতি মূলত উজ্জ্বল রং ও ডিটেলের সমন্বয়। উজ্জ্বল রঙের এই ব্যবহার রাজস্থানী চিত্রকলার সঙ্গে সাদৃশ্যজনক বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। কুলু রাজ্যটি একসময় বাশোলি রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত ছিল। রাজা মান সিংহ নিজের রাজ্যক্ষমতা রামচন্দ্রকে অর্পণ করে তাঁর প্রতিনিধি হয়ে রাজত্ব চালিয়েছিলেন। সেই সময় মান সিংহ রামায়ণকে চিত্রিত করান। এই সময় বাশোলি চিত্রকলার উজ্জ্বল রং, সোনালি পটভূমি, বিভিন্ন ভঙ্গির হিউম্যান ফিগার, বিস্ফোরিত চোখ কুলু চিত্রে প্রধান হয়ে ওঠে। পরে ১৭৯০ থেকে কুলু চিত্রে রঙের ব্যবহার কমে আসে এবং নিসর্গ দৃশ্য প্রাধান্য পায় যা ত্রিকোণ আকৃতির পাইন গাছ দেখলেই বোঝা যায়। রাজস্থানী চিত্রকলার থিম পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, দেবীমাহাত্ম্য সবই পাহাড়ি চিত্রকলায় বারবার চিত্রিত হতে থাকে। পাশাপাশি মুঘল দরবারি বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে রাজস্থানি চিত্রকলার লোকবৈশিষ্ট্য মিলে এক সতন্ত্র বৈশিষ্ট্য গড়ে ওঠে। * গুলের এবং কাংড়া চিত্রকলা দেখুন।

পাহাড়পুর

বর্তমানে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের রাজশাহি জেলার জামালগঞ্জের কাছে পাহাড়পুর গ্রাম। এখানে খননকার্য চালিয়ে পাল বংশীয় রাজা দোপাল প্রতিষ্ঠিত একটি বৌদ্ধবিহার আবিষ্কৃত

নং ১২৫. পাহাড়পুর মন্দিরের টেরাকোটা ভাস্কর্য। শিব ও নৃত্যরতা বলিকারা। খ্রিস্টীয় অষ্টম শতাব্দী।



হয়েছে। নবম শতাব্দীতে নির্মিত এই বিহারটির নাম শ্রীধর্মপাল মহাবিহার বা সোমপুর মহাবিহার। এই বিহারটি সম চতুর্ভুজ। এইরকম বড়ো বিহার ভারতবর্ষে আর কোথাও দেখা যায়নি। বিহারের চারটি ভূজে ১৮৯টি কুঠুরি এবং প্রবেশপথে একটি বড়ো দালান আছে। প্রত্যেকটি কুঠুরির সামনে আট থেকে নয় ফুট টানা বারান্দা আছে। বিহারের পাদমূলে ৬৩ টি পাথরে খোদাই করা মূর্তি ফলক পাওয়া গেছে। এগুলি খুবই উৎকৃষ্টমানের।

কক্ষবেষ্টিত প্রাঙ্গণের মাঝখানে প্রধান মন্দিরটি যোগচিহ্নের মতো বিশাল আয়তনের এবং তিনতলা। একটি চতুষ্কোণ স্তম্ভকে ঘিরে মন্দিরটি গড়া হয়েছে। এর অঙ্গ বিন্যাসও বেশ জটিল। পাহাড়পুরের মন্দিরের মতো চতুর্মুখ এবং তলবিভক্ত মন্দির স্থাপত্যকে ভারতীয় বাস্তুশাস্ত্রে বলা হয় 'সর্বতোভদ্র'। জাভার বরবুদুরের মন্দিরের শিখর রীতির সঙ্গে এই মন্দিরস্থাপত্যের মিল লক্ষ করা যায়। পাহাড়পুরের মন্দির পোড়ানো ইট এবং কাদামাটি দিয়ে তৈরি। তবে মন্দিরের চাল বা চূড়া সবই ধ্বংস হয়ে গেছে।

পিউরিজ্‌ম (Purism)

একটি ফরাসি আভঁ গার্দ আন্দোলন। ১৯২৫ সালে শিল্পী ল্য করবুসিয়ের এবং আমেদে ওজেনফঁ প্রবর্তিত এই আন্দোলন বস্তুত সংগঠিত ছিল শেষ পর্বের কিউবিস্ট রীতিকে সংশোধনের লক্ষ্যে। এঁরা এঁদের তাত্ত্বিক কর্মসূচি ব্যাখ্যা করতে ১৯১৮ সালে 'After Cubism' (Apres le Cubisme) নাম দিয়ে একটি ইস্তাহারও প্রকাশ করেছিলেন। সেখানে তাঁরা সমকালীন কিউবিজ্‌মের সহজ আলংকারিক ফলাফলের প্রতি ঝোঁকের সমালোচনা করে

তাকে তার মূল রীতিতে ফিরে যাওয়ার জন্য সওয়াল করেছিলেন। তাঁরা মনে করতেন শিল্পকে যন্ত্রযুগের সঙ্গে সুর মিলিয়ে চলতে হবে। তাঁদের শিল্পেও যন্ত্রনির্মিত বস্তুর শান্ত এবং নিয়ন্ত্রিত রঙের ব্যবহার প্রাধান্য পেয়েছিল। ওজেনফঁ-এর 'কম্পোজিশন' (১৯২০), ল্য.করবুসিয়ের-এর 'স্টিল লাইফ' এই রীতির উল্লেখযোগ্য উদাহরণ।

পিকচার প্লেন (Picture Plane) — দর্শকের চোখের সামনে লম্বভাবে অবস্থিত একটি কাল্পনিক তল। ক্যানভাস বা কাগজ অর্থাৎ চিত্রপট দ্বারাই তা উপস্থাপিত। এই কাল্পনিক তলের নিরিখেই আমরা ছবিতে প্রদর্শিত বিষয়ের অবস্থান নির্ণয় করতে পারি।

পিকচার স্পেস (Picture Space) — পারস্পেকটিভ বা অন্য কোনো বিভ্রমাত্মক কৌশলে পিকচার প্লেনের পেছনে আপাত সৃষ্ট স্থান।

পিকচারেস্ক (Picturesque) — এই শব্দটি বিশেষ ভাবে প্রযুক্ত হত ধ্যাবড়া ল্যান্ডস্কেপ এবং ভাঙাচোরা বাড়ির ছবি ক্ষেত্রে। অষ্টাদশ শতাব্দীর ব্রিটেনে ফর্মের অমসৃণতা, অদ্ভুত এবং অনিয়মিত অবস্থার মধ্যে তৃপ্তি লাভের একটি নান্দনিক অভিমুখ বোঝাতে এই শব্দটি ব্যবহার করা হত। 'পিকচারেস্ক' সাবলাইম (মহত্তম) এবং বিউটিফুল (সুন্দর) এই দুয়ের ধারণার মধ্যে স্থান করে নিয়েছিল। অথচ সাবলাইমের সম্ভ্রম জাগানো চমৎকারিত্বও ছিল না আবার বিউটিফুলের ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা এবং সুষমতাও ছিল না। ১৭৯০ সালে উভডেল প্রাইস 'An Essay on the Picturesque as Compared with the Sublime and the Beautiful' নামে একটি বই লিখে শব্দটিকে প্রতিষ্ঠা দেন। এই তত্ত্বকে ঘিরে একটা বড় সাহিত্যগোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল এবং ভূদৃশ্যাঙ্কন, স্থাপত্য এবং উদ্যান তৈরির ওপর যা বিরাট প্রভাব ফেলেছিল। এর দুজন প্রধান শিল্পী হলেন ক্লদ লর‍্যাঁ এবং নিকোলাস পুস্যাঁ।

পিকটোগ্রাফ (Pictograph) — চিত্রলেখ। কোনো বস্তু বা কাজের অত্যন্ত সরল ধরনের প্রতীক বা সংকেত। ভাষা ও ধ্বনি আবিষ্কারের আগে প্রাচীন যুগের মানুষ এর সাহায্যে ভাবের আদান-প্রদান করত।

পিগমেন্ট (Pigment) — মিহি করে গুঁড়োনো রঙিন পদার্থ যা তরল মাধ্যমের (Vehicle বা medium) সঙ্গে মিশিয়ে রং তৈরি করা হয়। মনে রাখতে হবে পিগমেন্ট তরলে ভেসে থাকে, দ্রবীভূত হয় না। রং তৈরির যে উপাদান তরলে দ্রবীভূত হয় তাকে

বলে ডাই (dye)। কালো এবং সাদা সহ নানা রঙের পিগমেন্ট পাওয়া যায়। কৃত্রিম, জৈব, অজৈব ইত্যাদি নানা ধরনের পদার্থ দিয়ে পিগমেন্ট তৈরি হয়।

বিভিন্ন রঙের কয়েকটি পিগমেন্ট :

সাদা :

বেরিয়াম হোয়াইট — কৃত্রিম বেরিয়াম সালফেট

চাইনিজ হোয়াইট — জিঙ্ক অক্সাইডের একটা রূপ। ১৮৩৪ সালে জল রঙের জন্য উইন্ডসর নিউটন কোম্পানি প্রথম তৈরি করে।

ফ্লেক হোয়াইট — প্রাথমিক লেড কার্বোনেট। এটা তেল রঙের পক্ষে খুব স্থায়ী যদি তেল এবং বার্নিশ দিয়ে রাখা যায়। এই উপাদান সালফারের ধোঁয়ার সংস্পর্শে এলে হলদে হয়ে যায়। আবার অন্ধকারে রাখলে এর সাদা সিসের ফিল্ম কালো হয়ে যেতে পারে। তবে আবার আলোতে রাখলে উজ্জ্বলতা ফিরে আসে। এই পিগমেন্ট পেটে গেলে বিষক্রিয়া ঘটতে পারে।

টিটেনিয়াম হোয়াইট — এই পিগমেন্টে ৩০ শতাংশ টিটেনিয়াম ডাইঅক্সাইডের সঙ্গে বেরিয়াম সালফেট মিশিয়ে তৈরি। এর ঢেকে ফেলার ক্ষমতা জিঙ্ক বা ফ্লেক হোয়াইটের চেয়ে অনেক বেশি।

জিঙ্ক হোয়াইট — জিঙ্ক অক্সাইড দিয়ে তৈরি। বিশুদ্ধ, ঠান্ডা নির্বিষ সাদা রং। সালফার ধোঁয়ায় এলেও কালো হয়ে যায় না। জল রঙে একে চাইনিজ হোয়াইট বলে।

হলুদ :

লেমন ইয়েলো — বেরিয়াম ক্রোমেট। এর রঞ্জিত করার ক্ষমতা কম। তবে এই পিগমেন্ট স্থায়ী এবং পরিবর্তনশীল নয়। হাইড্রোজেন সালফাইডের কাছে এলে কালো হয়ে যায় না।

ক্রোম ইয়েলো — লেড ক্রোমেট। এটি বিষাক্ত কৃত্রিম ধাতব পিগমেন্ট। অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ায় ফরাসি রসায়নবিদ নিকোলাস লুই ভোক্যুল্যাঁ ভওকেলিন প্রথম প্রস্তুত করেন। সবচেয়ে ভালো মানের ক্রোম ইয়েলোরও আলো প্রতিরোধী ক্ষমতা কম অর্থাৎ এই রং স্থায়ী নয়। অনচ্ছতা ভালো।

ক্যাডমিয়াম ইয়েলো — ক্যাডমিয়াম সালফাইড। ১৮৫০

সাল নাগাদ ইংল্যান্ডে চালু হয়। মোটামুটি অনচ্ছ।

অরেঞ্জ :

একটি মিশ্র রং। সাধারণভাবে ক্যাডমিয়ামস এবং রেড অক্সাইডের মিশ্রণ।

ক্যাডমিয়াম অরেঞ্জ — ক্যাডমিয়াম সালফাইড অথবা ক্যাডমিয়াম সালফোসেলেনাইড। এটি পারমানেন্ট পিগমেন্ট।

লাল :

ভারমিলিয়ন — কৃত্রিম লাল মারকিউরিক সালফাইড। প্রাকৃতিক এই খনিজ পদার্থের নাম সিনাবার। কৃত্রিমভাবে পারদ এবং গন্ধক মিশিয়ে তৈরি করা হয়। পাকা রং তবে কয়েকটি গ্রেডের ভারমিলিয়ন কালো হয়ে যেতে চায়। অনচ্ছতা ভালো। আলো প্রতিরোধী ক্ষমতা খুব ভালো। তেল রং, জল রং, টেম্পারা সবেতেই ব্যবহার হয়।

কারমিন লেক — ইউরোপে কারমিস নামে এক রকম পতঙ্গের স্ত্রী-প্রজাতির দেহ থেকে ব্যাপকভাবে এই রং নিষ্কাশন করা হত। পরে ১৪৯২ সালে কলম্বাসের আমেরিকা অভিযানের পর কচিনিল নামে এক পতঙ্গের দেহ থেকে এই রং নিষ্কাশনের পদ্ধতি প্রবর্তিত হয়। এই পতঙ্গকে শুধুমাত্র নোপাল ক্যাকটাস খাওয়ানো হত। পরে ভারতেও এই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। তাই এখানেও নোপাল ক্যাকটাস জাতীয় এক ধরনের উদ্ভিদকে এই কাজের জন্য ইউরোপ থেকে এনে চাষ করা হয়। যদিও এখন কচিনিল পতঙ্গ চিলি, পেরু, স্পানিশক্যানারি দ্বীপে খামারে চাষ করা হয়। এই রঙের আলো প্রতিরোধী ক্ষমতা খুবই কম। অর্থাৎ এই রং স্বচ্ছ এবং পাকা নয়।

ক্রিমসন লেক — এই লেক পিগমেন্ট ও কচিনিল পতঙ্গ থেকে তৈরি করা হয়। এই রংও স্বচ্ছ। আলোপ্রতিরোধী ক্ষমতা দুর্বল। ফলে রং পাকা নয়।

স্কারলেট রেড — সিনথেটিক জৈবপিগমেন্ট ব্রোমিনেটেড অ্যানথ্রানথ্রোন। এটা প্রবর্তিত ১৯১৩ সালের পরে। বেশ স্বচ্ছ। আলো প্রতিরোধী ক্ষমতা মোটামুটি।

লাইট রেড — এক ধরনের সিনথেটিক আয়রন অক্সাইড থেকে তৈরি হয়। আগে তৈরি হত বাছাই করা ইয়েলো অকারকে ভেজে।

ইন্ডিয়ান রেড — এও এক ধরনের সিনথেটিক আয়রন অক্সাইড। ভারতের বিভিন্ন লৌহজাত কারখানায় বাই-প্রোডাক্ট

হিসাবে উৎপন্ন।

র-আম্বার — নানা মাত্রার ম্যাঙ্গানিজ এবং অ্যালুমিনিয়াম সিলিকেটের সঙ্গে খনিজ আয়রন অক্সাইডের মিশ্রণ। আলো প্রতিরোধী ক্ষমতা খুব ভালো অর্থাৎ পাকা রং। এর গাঢ় আভা একটু বেশি স্বচ্ছ। সব মাধ্যমের উপযুক্ত।

বার্ন্ট আম্বার — আয়রন অক্সাইড এবং ম্যাঙ্গানিজ ডাই অক্সাইডের মিশ্রণ অর্থাৎ র আম্বারকে তাপ দিয়ে পুড়িয়ে তৈরি। পাকা রং। ভালো রকম স্বচ্ছ। সব মাধ্যমেই ব্যবহার হয়।

র সিয়েনা — প্রাকৃতিক গেরিমাটি। এতে থাকে ভিজে আয়রন অক্সাইড এবং ম্যাঙ্গানিজ ও আয়রন সিলিকেটের মিশ্রণ। পাকা রং। এর অনচ্ছতা বেশ কম। সব মাধ্যমের জন্যই উপযুক্ত।

বার্ন্ট সিয়েনা — র সিয়েনাকে তাপ দিয়ে পুড়িয়ে তৈরি। গ্লেজিং রং হিসাবে ভালো। সব মাধ্যমের উপযোগী। পাকা রং অর্থাৎ আলো প্রতিরোধী ক্ষমতা খুব ভালো।

রোজ ম্যাডার — ম্যাডার গাছের মূল থেকে এই রং নিষ্কাশিত করা হয়। তারপর হালকা সালফিউরিক অ্যাসিড দিয়ে প্রক্রিয়া করে রঞ্জক উপাদান তৈরি করা হয়। সেই রঞ্জক বা ডাইকে ফিটকিরি ভিত্তিক কোনো পদার্থের ওপর থিতিয়ে এবং ভালো করে ধুয়ে লেক পিগমেন্ট তৈরি করা হয়। এর অনচ্ছতা ভীষণ কম। প্রায় গ্লেজের মতো। সব মাধ্যমের উপযোগী হলেও চুন-ফ্রোস্কোতে বিবর্ণ হয়ে যায়।

ব্লু বা নীল পিগমেন্ট :

প্রুশিয়ান ব্লু — কৃত্রিম অজৈব পিগমেন্ট ফেরিক ফেরোসায়ানাইড দিয়ে তৈরি। ১৭০৪ সালে বার্লিনে দুর্ঘটনা বশত এর আবিষ্কার। পরবর্তীকালে শিল্পীদের রঙের উপাদান হিসাবে প্রবর্তিত হয়। খুবই স্বচ্ছ এবং গ্লেজিং-এর জন্য আদর্শ। আলো প্রতিরোধী পাকা রং। তেলে একটু কালো হয়ে যায়। ক্ষারের সঙ্গে বিক্রিয়া করে বলে ফ্রেস্কোতে ব্যবহার হয় না।

কোবল্ট ব্লু — এই উজ্জ্বল নীল রং কোবল্ট এবং অ্যালুমিনিয়ামের অক্সাইডকে তাপ দিয়ে পুড়িয়ে তৈরি। ১৭৭০ সালে আবিষ্কার হলেও বাণিজ্যিক ভাবে আসে ১৮০৪ নাগাদ। আলো প্রতিরোধী পাকা রং। ভালোমতোই স্বচ্ছ। সব মাধ্যমেই ব্যবহার করা যায়।

আল্ট্রামেরিন বা ফ্রেঞ্চ আল্ট্রমেরিন ব্লু — কৃত্রিম আল্ট্রামেরিন পিগমেন্ট। মাটি, সোডা, গন্ধক এবং কয়লা অর্থাৎ সোডিয়াম অ্যালুমিনিয়াম সিলিকেট পলিসালফাইডকে তাপ দিয়ে পুড়িয়ে তৈরি। ১৮৩০ সাল থেকে ফ্রান্স এবং জার্মানিতে বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদিত হতে শুরু করে। তার আগে প্রাকৃতিক 'লাপিস লাজুলি' থেকে তৈরি হত। পাকা রং। সব মাধ্যমে স্থিতিশীল হলেও ক্ষারীয় উপাদানে বিক্রিয়াকারক। ফলে লাইম-ফ্রেস্কোতে ব্যবহার করা যায় না। তবে দু-এক ধরনের আল্ট্রামেরিন পিগমেন্ট তৈরি হয় যা চুনের সাথে বিক্রিয়া করে না।

সেরুলিয়ান ব্লু — কৃত্রিম পিগমেন্ট। কোবল্ট সালফেট, টিন সল্ট এবং কোবল্ট স্ট্যানেটকে তাপ দিয়ে পুড়িয়ে তৈরি এই রং দেখতে বেগুণিআভাযুক্ত ও উজ্জ্বল। এই পিগমেন্ট আলো প্রতিরোধী। এবং ঈষৎ স্বচ্ছ। সব মাধ্যমেই স্থায়ী।

টারকুইস ব্লু — সেরুলিয়ান ব্লু এবং কোবল্ট ব্লু-এর উপাদান দিয়ে তৈরি। আলো প্রতিরোধী ক্ষমতা খুব ভালো। ঈষৎ স্বচ্ছ। এই রঙে সবুজ আভা আছে। সব মাধ্যমের উপযোগী।

বেগুনি .

ভায়োলেট — বেগুনি রঙের এই পিগমেন্ট তৈরি হয় ম্যাঙ্গানিজ অ্যামোনিয়াম ফসফেট দিয়ে। এই রং আলো প্রতিরোধী। তবে এর অনচ্ছতা কম। সব মাধ্যমেই গোলা যায়।

মভ — বেগুনি বর্ণের একটি জৈব রঞ্জক উপাদান। অ্যানিলাইন দিয়ে তৈরি। এই রং খুব বেশি আলো প্রতিরোধী নয়। বেশ স্বচ্ছ।

সবুজ :

হুকার্স গ্রিন — প্রুশিয়ান ব্লু এবং গ্যাম্বোজের (একরকম হলুদ) মিশ্রণ। এই রং স্থায়ী নয়। কেন-না গ্যাম্বোজ আলো প্রতিরোধী নয়। এই পিগমেন্ট ক্রমশ নীল হয়ে যায়। তবে আধুনিক কালে থ্যালোসায়নিন ব্লু এবং ক্যাডমিয়াম ইয়েলো মিশিয়ে যে রং তৈরি হয় তা স্থায়ী।

স্যাপ গ্রিন — এই হলুদাভ সবুজ রং একরকম লেক। তৈরি হয় বৈচি ফলের মতো এক জাতীয় কাঁটা ঝোঁপের ফল ও ফিটকিরি থেকে। এই রং পাকা নয়। আধা স্বচ্ছ।

ভিরিডিয়ান গ্রিন — গাঢ় ও ঠাণ্ডা সবুজ রঙের পিগমেন্ট। জলীয় ক্রোমিক অক্সাইড থেকে তৈরি। স্থায়ী ও পাকা রং।

সব মাধ্যমের জন্য উপযোগী। বেশ স্বচ্ছ।

এমারেল্ড গ্রিন — কৃত্রিম এই পিগমেন্ট অ্যাসিটো আর্সিনেট। এই রং আলো প্রতিরোধী নয়। তাই পাকা নয়। আর্সেনিকের যৌগ থাকায় ভীষণ বিষাক্ত। সালফারজাত পিগমেন্টের সংস্পর্শে এলে কালো হয়ে যায়। মোটামুটি অনচ্ছ।

টেরা-ভার্ট — বিভিন্ন ভাগে মিশ্রিত প্রাকৃতিক অ্যালুমিনিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম এবং ফেরাস সিলিকেট। একটু নীলচে ধূসর সবুজ। আলো প্রতিরোধী এবং স্থায়ী। জল ও তেল রঙের জন্য উপযোগী। রোমান যুগ থেকেই প্রচলিত। আধা অনচ্ছ।

কালো :

আইভরি ব্ল্যাক — প্রাণিদেহ থেকে উৎপন্ন প্রাকৃতিক কালো পিগমেন্ট। আদিকালে হাতির দাঁত পুড়িয়ে তৈরি হত। এখন পশুর হাড় পুড়িয়ে তৈরি হয়। প্রকৃত আইভরি কালোতে কার্বন-এর পরিমাণ অনেক বেশি থাকে। এর আলো প্রতিরোধী ক্ষমতা চমৎকার। সব মাধ্যমেই ব্যবহার করা চলে।

ল্যাম্প ব্ল্যাক — ভুসোকালি থেকে তৈরি কালো পিগমেন্ট। এই কালোই বেশি ব্যবহার করা হয়। খুব স্থায়ী রং। সব মাধ্যমেরই উপযুক্ত। বেশ স্বচ্ছ।

পেনেস গ্রে — একটি জল রঙের পিগমেন্ট। এতে থাকে আইভরি ব্ল্যাক, আল্ট্রামেরিন ব্লু এবং অকার। এটা একটি স্থায়ী রং।

পিত্তুরা মেতাফিজিকা (Pittura Metafisica)

ইতালির এক শিল্প আন্দোলন। ১৯১৭ সালে ইতালির বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী কার্লো কারা্যা তাঁরই সতীর্থ শিল্পী জর্জিও দি শিরিকোর সঙ্গে যোগ দেন। আধুনিক শিল্পের ভূমিকা নিয়ে তাঁদেব সম্মিলিত সক্রিয়তা 'মেটাফিজিক্যাল স্কুল' স্থাপনের দিকে এগিয়ে দেয়। তাঁদের লক্ষ্য ছিল—'To construct a new metaphysical psychology of things.' (উদ্ধৃতিটি প্রিস্টেল ডিকশনারি অব আর্ট অ্যান্ড আর্টিস্ট ইন দি টেয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি থেকে নেওয়া)। তাঁরা একটি বিকল্প সত্যকে উপস্থাপিত করতে চেয়েছিলেন। যে সত্য সমস্ত বস্তুর বাস্তব অবস্থান পালটে তাদের এমন একটা বেমানান সম্পর্ককে তুলে ধরতে পারে যেন তা অপার্থিব যুক্তির ওপর নির্ভরশীল। তাই এই শিল্পীদের কাজ হয়ে দাঁড়াল দৃশ্যমানতার

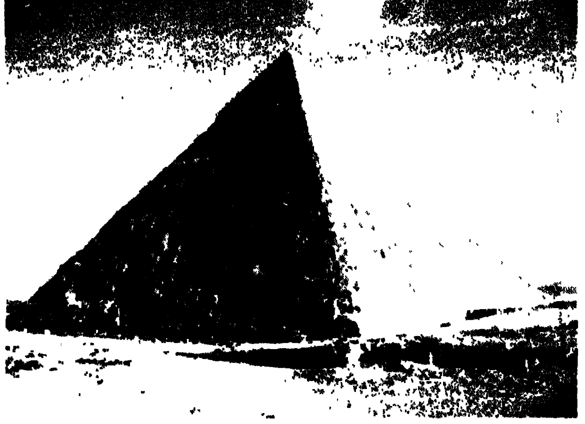
ছবি নং ১৭৪ পৃ. ৩৬১ আড়ালে থাকা জগতের রহস্যকে প্রকাশ করা। আর এজন্য

তাঁরা তাঁদেরই নির্দেশিত পথে বিভিন্ন বস্তুর অযৌক্তিক সমন্বয়পূর্ণ এক দৃশ্যরূপকে বেছে নিয়েছিলেন। পোশাক ঝোলানোর মডেল ব্যবহার করে কিছু শিল্পকলা এবং কিছু আধ্যাত্মিক গৃহসজ্জা তৈরি হয়েছিল। ছ'মাস পরেই কার‍্যা এই যৌথ উদ্যোগ সমাপ্ত করেন। পিতুরা মেতাফিজিকা 'ফিউচারিজ্‌ম' এবং 'ম্যাজিক রিয়ালিজ্‌ম' উভয়কেই প্রভাবিত করেছিল। এই আন্দোলনের বহু শিল্পী পরবর্তীকালে ফিউচারিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। উল্লেখযোগ্য শিল্পীরা হলেন ম্যারিয়ো সিরোনি, অ্যারদেঙ্গো সোফিসি, অ্যালবার্তো স্যাভিনিয়ো, জর্জিয়ো মোরান্দি।

পিরামিড (Pyramid)

প্রাচীনকালে নির্মিত বিভিন্ন বিশিষ্ট মানুষদের সমাধি ও স্মৃতিস্তম্ভ। পাথরের তৈরি প্রাচীন সভ্যতার ত্রিভুজাকার এই বিরাট নির্মিতি মিশর সহ বিশ্বের নানা স্থানে দেখতে পাওয়া যায়। ভারত মহাসাগরের মালদ্বীপে চার হাজার বছরের পুরানো চুনা পাথরের এক পিরামিড পাওয়া গেছে। কিন্তু পিরামিড বললে আমাদের মনে মিশরের কথাই আসে কেন-না শ্রেষ্ঠ পিরামিডগুলি এখানেই অবস্থিত। তবে এই পিরামিডগুলির অধিকাংশ ধ্বংস হয়ে গেছে। প্রাচীন মিশর তথা ইজিপ্টের 'ওল্ড কিংডম' বা পুরোনো রাজ্য অর্থাৎ ২৬৮০-২১৪০ খ্রিস্টপূর্বাব্দেই উল্লেখযোগ্য পিরামিডগুলি নির্মিত হয়েছিল।

প্রাচীন মিশরে বিশ্বাস করা হত যে মৃত্যুর পর স্বর্গ লাভের জন্য দুটো কাজ করা দরকার। মৃতদেহকে সুরক্ষিত রাখতে হবে এবং তাঁর ব্যবহার্য জিনিসপত্র খাবারদাবারও সমাধি কক্ষে রেখে দিতে হবে। এই লক্ষ্যেই প্রথম দিকে প্রাচীন মিশরের রাজা এবং অভিজাত ব্যক্তিরা 'মাসতাবা' নামে এক রকম সমাধি স্থাপত্য তৈরি করতেন। মিশরের দ্বিতীয় রাজা আহ-র মাসতাবা পাওয়া গেছে সাকারাতে। এই মাসতাবাটিতে কাঠের ছাদ, মাটির তৈরি গুহা আড়াআড়িভাবে পাঁচটি ভাগে বিভক্ত। এই ঘরগুলির মধ্যে মাঝখানের ঘরে শবাধার এবং অন্যগুলি রাজার ব্যবহার্য জিনিসপত্র, খাবারদাবার রাখার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। মাসতাবাটিকে পাঁচিল দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়েছে এবং বাইরে পরপর দুটি পাঁচিলের মধ্যে রাখা হয়েছে পায়ে চলার পথ। এই সব অংশে চুনপালিশ করে রঙিন নকশা আঁকা



নং ১২৬. গিজার সেফ্রানের পিরামিড। খ্রিস্টপূর্ব ২৬০০।

হয়েছে। এর পরবর্তীকালের মাসতাবায় একই সঙ্গে ইট এবং পাথর ব্যবহার করা হয়েছে। এই মাসতাবাগুলিই হল পিরামিডের প্রাথমিক পর্ব। তৃতীয় রাজবংশের সময় মাসতাবার আকৃতিগুলি একটু একটু করে পালটে গিয়ে তিনকোনা রূপ নিতে শুরু করে। নেমফিস শহরের উলটো দিকে সাকারাতে স্থপতি ইমহোটেপ তৃতীয় রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা জোসার-এর স্মৃতিসৌধের জন্য একটি উঁচু জমিতে পাথরের সাহায্যে এরকম তিনকোনা একটি স্থাপত্য নির্মাণ করেছিলেন। এটিই সবচেয়ে প্রাচীন বৃহদায়তন পিরামিড। ধাপে ধাপে এটা সরু হয়ে গেছে। স্থানীয় পাথর দিয়ে তৈরি করে টুরা চুনা পাথর দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে। এই পিরামিড প্রস্থে প্রায় ১১৯.৫ মিটার এবং উচ্চতায় ৬০.৯৬ মিটার। এই পিরামিডে গ্র্যানিট পাথরে ঢাকা প্রায় ৪ মিটার উঁচু আয়তাকার একটা সমাধি কক্ষ স্থাপিত। এর প্রবেশ দ্বার বন্ধ। বারান্দা উজ্জ্বল রঙের টালি দিয়ে সাজানো সেই সঙ্গে রাজার ছবি আঁকা। পিরামিডের পূর্বে রয়েছে রানি এবং রাজপুত্রের সমাধি। একটি আয়তাকার পাঁচিল ঘেরা জমির ওপরে এই পিরামিড স্থাপিত। পাঁচিল তৈরি হয়েছে চুনা পাথরে। এতে আছে ২১১টি গম্বুজ, ১৪টি নকল দরজা এবং একটি প্রবেশ পথ। স্থাপত্যের ইতিহাসে এত সুন্দর পিরামিড এটাই প্রথম।

রাজা সেনেফারুর পিরামিডে নানা পরিবর্তন এবং পরিবর্ধন লক্ষ করা যায়। এই পিরামিড প্রথমে ছিল সাত ধাপের পরে আর একটি ধাপ যুক্ত হয়। শেষ পর্যন্ত সমস্ত ধাপগুলিকে ঢেকে দিয়ে কৌণিক পিরামিড তৈরি হয়। এর ভিত্তি ছিল চৌকা এবং প্রবেশ পথ দুটো। সেনেফারুর পুত্র

'খুকু'র পিরামিড আর একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পিরামিড। রাজা চেফরেন-এর পিরামিডও একটি উল্লেখযোগ্য পিরামিড। এই পিরামিডের মন্দির স্থাপত্য খুবই সুন্দর এবং বিরল ধরনের। রাজা চেফরেন-এর পিরামিডের চত্বরে আছে পাথরের তৈরি ফিংক্স-এর মূর্তি। এসব ছাড়াও রাজা মাইসেরনুস, পঞ্চম বংশের শেষ রাজা উনস্ প্রমুখের পিরামিডের পাশাপাশি রাজবংশীয় সাহুরা, নেফেরিকরা, নিউসেরা এবং আবু সির নিজেদের পিরামিড তৈরি করেছিলেন। সবগুলিতেই কিছু আলাদা বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়। আমেরিকা মহাদেশেও প্রাচীন কালে বেশ কিছু পিরামিড নির্মিত হয়েছিল।

পিরামিডাল কম্পোজিশন (Pyramidal Composition) — একটি চিত্রে যখন ফিগার ও বিভিন্ন বস্তুগুলিকে এমনভাবে সাজানো হয় তা একটি পিরামিডের মতন সাদৃশ্য লাভ করে। রাফায়েল তাঁর 'ম্যাডোনা অ্যান্ড চাইল্ড' ছবিতে এরকম ব্যবহার করেছেন।

পিলার (Piller) — যে-কোনো স্থাপত্যে আয়তাকার এবং নিরালম্ব ও খাড়া অংশ বা কাঠামো।

পুঁথিচিত্র — কাগজ ও মুদ্রণ আবিষ্কারের আগে মানুষ নীতি, জ্ঞান, উপদেশ ও অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করতেন দেয়ালে বা পাথরের ফলকে। কিন্তু তা বহনযোগ্য হত না। পরে গাছের পাতায় কালি দিয়ে লেখার পদ্ধতি প্রবর্তিত হল। এগুলোই হল পুঁথি। এজন্য নানা ধরনের গাছের পাতা ব্যবহার করা হত। ভারতবর্ষ সহ অনেক দেশে এ কাজে সুবিধাজনক হওয়ার কারণে তাল পাতাই বেশি ব্যবহার করা হত। এই সব পুঁথিতে লিপিবদ্ধ বিষয়ের পাশাপাশি এক রঙে বা বহুরঙে নানা ছবি এবং নকশা আঁকা হত। লেখার সময়ে লিপিকরগণ চিত্রাঙ্কণের জন্য শূন্যস্থান রেখে দিতেন। পুঁথির পাতার সাইজ হত দৈর্ঘ্যে প্রায় তিরিশ সেন্টিমিটার এবং প্রস্থে প্রায় সাড়ে সাত সেন্টিমিটারের এর মতো।

পুঁথিতে সাধারণভাবে তিনটি চিত্রিত প্যানেল দেখা যায়। কখনো-কখনো আবার দুটি প্যানেল বা পাতার মাঝখানে একটি মাত্র প্যানেলও দেখা গেছে। প্যানেলগুলির মাপ মোটামুটি ৭ × ৬ সেন্টিমিটার। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই চিত্রকরদের নাম থাকত না তবে লিপিকরদের নাম থাকত। পুঁথি চিত্রণের ক্ষেত্রে চিত্রকরগণ শিল্পশাস্ত্র মেনে চলতেন।

এই সব শিল্পশাস্ত্র হল 'বিষ্ণু ধর্মোত্তর', 'শিল্প রত্ন', 'সমরাঙ্গন সূত্রাধার' প্রভৃতি। পুঁথিচিত্র আটটি বৈশিষ্ট্য তথা অঙ্গে বিভক্ত ছিল। এগুলি হল বর্তিকা (লেখনি বা তুলি তৈরি), ভূমি বন্ধন (চিত্রপট বা কাগজ তৈরি), লেখ্য (বিষয় নির্বাচন), রেখাকর্ম (ড্রয়িং বা খসড়া তৈরি), বর্ণকর্ম (রং চাপানো), বর্তনাক্রম (শেডিং অর্থাৎ ফিগারের প্লাস্টিক ফর্ম তৈরি)। এই সব পুঁথি পাল যুগেই বেশি পাওয়া গেছে। এর অধিকাংশই বৌদ্ধধর্ম ভিত্তিক। এই যুগের দুজন বিখ্যাত চিত্রকর ছিলেন ধীমান ও তাঁর পুত্র বীতপাল। এইসব পুঁথিচিত্র খুবই ছোটো আঁকারের অর্থাৎ অণুচিত্র বা মিনিয়েচার ছবির সমগোত্রীয়। বৌদ্ধলামা ঐতিহাসিক তারানাথের লেখা থেকে জানা যায় পাল পুঁথিচিত্ররীতি প্রবর্তিত হয় নবম খ্রিস্টাব্দের প্রথম ভাগে ধর্মপাল ও দেবপালের রাজত্বে। এশিয়াটিক সোসাইটিতে পাল পুঁথিচিত্রের নিদর্শন দেখতে পাওয়া যাবে। অন্যদিকে জৈনধর্মের পুঁথির নিদর্শন পাওয়া গেছে পশ্চিমভারতে। ১০৬০ খ্রিস্টাব্দে চিত্রিত 'ওঘ নিযুক্তি'র একখানা তালপাতার প্রাচীন পুঁথি এর নিদর্শন। এই সব পুঁথিচিত্রের কেন্দ্র ছিল গুজরাট, কাথিয়াবাড় এবং রাজপুতানা। জৈন পুঁথিচিত্রে সোনালি ও রুপালি রঙের ব্যবহার দেখা যায়। পশ্চিম মহীশূরে (কর্ণাটক) একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে হয়শল রাজত্বে তালপাতার পুঁথিচিত্র আঁকা হয়েছিল।
* তালপাতার চিত্র দেখুন।

পুতুল

বর্তমান সময়ের ধারণা অনুযায়ী খুব সহজেই বলা যাবে যে পুতুল হল ছোটোদের খেলনা। শৈশব এবং পুতুল এ যেন এক সর্বজনীন সত্য। কিন্তু পুতুলের উদ্ভবের সঙ্গে এই সত্য যুক্ত নয়। ছোটো আকারের মূর্তিকেই সাধারণভাবে পুতুল বলা হয়। তবে পুতুল শুধুমাত্র খেলার বা ঘর সাজানোর উপকরণ নয়। এর মধ্যে আছে সামাজিক ও নৃতাত্ত্বিক ঐতিহ্য। সব সমাজেই আদিমকাল থেকেই পুতুল তৈরি হয়েছে। এর রূপবৈচিত্র্য এবং উপকরণও নানা ধরনের। পুতুলের মধ্যে মানুষের নানা সংস্কার, ধারণা ও বিশ্বাস মূর্ত হয়েছে। আদিম মানুষের অলৌকিক বিশ্বাস এবং তাঁদের গোত্র পরিচয়ের ধারণার রূপায়ণ ঘটেছিল এক ধরনের মূর্তিতে যাকে টোটেম মূর্তি বলা যেতে পারে। এই সব ধারণা এবং মূর্তির আদিম রূপ ক্রমশ বিবর্তিত হতে

থাকে। মূর্তিগুলির মধ্যে মনুষ্যোচিত বৈশিষ্ট্য আরোপিত হয়। আমাদের বাংলায় হাতে টেপা মাটির পুতুল দেখলে বোঝা যাবে যে তার মধ্যে মানুষের অবয়বগত একটা ধারণা আছে। কিন্তু স্পষ্টভাবে খুঁজলে তা পাওয়া যাবে না। পুতুল গড়ার কার্যকারণ যাই হোক না কেন রূপবৈচিত্র্য ও গঠনগত বৈশিষ্ট্য মূর্তি ও পুতুলের মধ্যে ভেদরেখা নির্ধারণ করেছে। কিছু পুতুল অবশ্যই পাওয়া যাবে যাতে মূর্তির গুণাবলি আরোপিত আবার কিছু মূর্তিও এমন দুর্লভ নয় যাতে পুতুলের চরিত্রধর্ম বিদ্যমান। গোড়ার দিকে নানা মাধ্যম যেমন মাটি, কাঠ, পাথর, কাপড় ও অন্যান্য জিনিস দিয়ে পুতুল গড়া হয়েছে। বর্তমানে প্লাস্টিক ছাড়াও পুতুল তৈরির আরও অনেক রকমের উপাদান আছে। যেমন কাপড়, তুলো বা ফোম ইত্যাদি। পাশ্চাত্যে কাপড় দিয়ে এক ধরনের পুতুল তৈরি হয় তা 'র‍্যাগ ডল' (Rag doll) নামে পরিচিত। কাগজের মণ্ড ছাঁচে ঢেলে সুন্দর সুন্দর পুতুল তৈরি করা যায়। উত্তর প্রদেশের আগ্রা এবং আরও কয়েকটি জায়গায় এমন পুতুল কিনতে পাওয়া যায়। পশ্চিমবাংলায় মোট পাঁচ রকমের পুতুল যায়। যেমন ছোটো দেবদেবীর মূর্তি, মনুষ্যমূর্তি, পশুমূর্তি, 'যো' পুতুল—সংস্কার বিশ্বাসের পুতুল, নাচিয়ে পুতুল ইত্যাদি। পুতুলগড়ার উপকরণ হিসাবে আছে মাটি, কাপড়, তুলো, কাঠ, শোলা, হাতির দাঁত, পশুর হাড় বা শিং ইত্যাদি। এছাড়া কোনো কোনো জায়গায় বিশেষ শৈলীতেও কিছু পুতুল তৈরি হয়। যেমন মেদিনীপুরের খড়ুইয়ের গালা পুতুল। মাটির টেপা পুতুলের মতোই। এতে উঁই ঢিবির মাটি ব্যবহার করা হয়। তারপর পুড়িয়ে গালা প্রলেপ দিয়ে রঙিন অলংকরণ করা হয়। কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুলের খ্যাতি সাধারণের মধ্যে ব্যাপক। বাঁকুরার পাঁচমুড়ার পোড়ামাটির পুতুল যেমন ঘোড়া, ষাঁড়, হাতি ইত্যাদি খুবই জনপ্রিয়। হাওড়ার চণ্ডীপুরে আছে ছাঁচে তৈরি মাটির পুতুল। এর মধ্যে দেব পুতুল খেলনা পুতুল দুই-ই আছে।

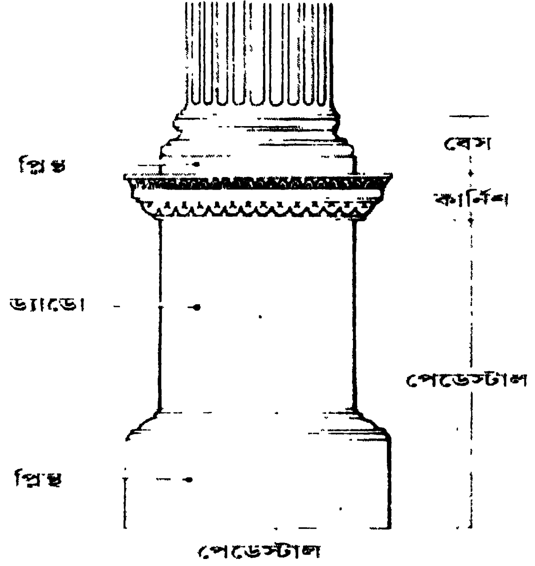


নং ১২৭. মাটির টেপা পুতুল। টেরাকোটা।

পুশ অ্যান্ড পুল
(Push and Pull)

এরকম এক ধরনের কাজ আমেরিকার বিমূর্ত প্রকাশবাদী শিল্পী হ্যানস হফম্যান চালু করেছিলেন। হফম্যান জার্মানির অধিবাসী ছিলেন। পরে আমেরিকাতে স্থায়ীভাবে চলে আসেন। তিনি ১৯১৫ সালে মিউনিখ এবং ১৯৩৩ সালে

নিউইয়র্কে একটি আর্ট স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই স্কুল আমেরিকার সমকালীন শিল্পকলার অগ্রগতিতে জোরালো প্রভাব ফেলেছিল। হফম্যান বিমূর্ত ছবিতে চড়া রঙের ভিন্নমুখী দাগে সৃষ্ট দৃশ্যগভীরতার মধ্যে গতি বোঝাতে এই শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন।



পেডেস্টাল

পেডেস্টাল (Pedestal) — যে-কোনো ধরনের ধারক বা অবলম্বন যার ওপর কোনো বস্তুকে রাখা হয়। পেডেস্টাল বলতে বিশেষ করে বোঝানো হয় ক্ল্যাসিকাল স্থাপত্যের স্তম্ভ বা কলামের ধারক বা Support-কে।

পেন্ট (Paint) — রং। যে-কোনো ধরনের রঞ্জক পদার্থ যা কোনো তরল মাধ্যম যথা জল, তেল তথা কোনো দ্রাবকে গোলা এক ধরনের মিশ্রণ এবং যার দ্বারা কোনো তলে রঙিন প্রলেপ লাগানো যায়। এছাড়াও শুকনো 'রং'ও আছে। যেমন প্যাস্টেল, ক্রেয়ন কন্টি ইত্যাদি। শিল্পীদের পেন্টের কিছু গুরুত্বপূর্ণ গুণ থাকে। যেমন পেন্টের 'বর্ণ' (Hue) যাকে সাধারণ কথায় রং বলে (লাল, নীল, সবুজ ইত্যাদি)। এই রঙের আলো প্রতিরোধী ক্ষমতা থাকতে হবে অর্থাৎ রং আলোতে রেখে দিলে সহজেই বিবর্ণ হয়ে যাবে না। তাকে রঙের স্থায়িত্ব বলে। অনচ্ছতা (opacity) অর্থাৎ চিত্রতলকে ঢেকে ফেলার ক্ষমতা। রঙের বিষক্রিয়া (Toxicity)। বেশির

ভাগ রঙেই পিগমেন্ট বা রঞ্জকের গুঁড়োকে ধরে রাখার জন্য বাইন্ডার বা আঠা মেশানো হয়। এছাড়া থাকে মাধ্যম (vehicle) যেমন তেল, জল ইত্যাদি। এর কিছু ব্যতিক্রমও আছে। যেমন কিছু জল রং আছে যাতে পিগমেন্টের গুঁড়োর বদলে ডাই বা রঞ্জক ব্যবহার করা হয়। আবার ফ্রেস্কোতে শুধু পিগমেন্ট এবং জল ব্যবহার করা হয়। তবে শিল্পীর প্রয়োজন এবং পছন্দই পেন্টের ক্ষেত্রে শেষ কথা। * পিগমেন্ট দেখুন।

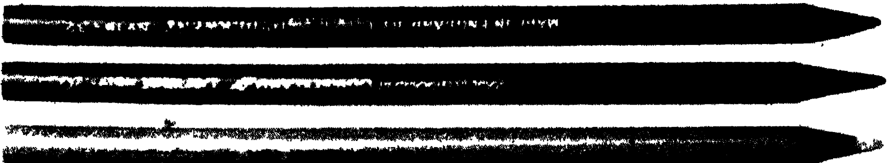
পেন্টিং নাইফ (Painting knife) — রাজমিস্ত্রির কর্ণিকের মতো দেখতে ছোট্টো পাতলা নমনীয়



ব্লেড যা দিয়ে ক্যানভাসে বা যে-কোনো গ্রাউন্ডে রং লাগানো হয়।

পেনড্যান্ট (Pendant) — ঝোলানো কোনো কিছু সাধারণ ভাবে গথিক শিল্পে কোনো পাথরের তৈরি খিলান বা কাঠের ছাদ থেকে ঝোলানো কোনো আলংকারিক উপাদান অথবা শিল্পীর পছন্দ বা ভাবনা অনুযায়ী স্বাধীন বা কম্পোজিশনের অঙ্গ হিসাবে ব্যবহৃত একজোড়া পেন্টিং, ভাস্কর্য, রিলিফ কিংবা অলংকার।

পেন্সিল (Pencil) — অষ্টাদশ শতাব্দীতে শিল্পীর তুলিকে বলা হত পেন্সিল। সুতরাং পেন্সিল চালনা বলতে বোঝানো হত তুলির কাজ। কিন্তু এখন পেন্সিল হল আঁকা ও লেখার জন্য গ্রাফাইটের কাঠি যা সাধারণভাবে কাঠ দিয়ে আবৃত থাকে। সাধারণত তিন ধরনের পেন্সিল আছে। গ্রাফাইট, কার্বন এবং রঙিন। সাধারণ কাঠপেন্সিল গ্রাফাইটের সঙ্গে ক্লে মিশিয়ে তৈরি। যত বেশি ক্লে মেশানো হয় তত বেশি কাঠিন্য আসে। গ্রাফাইট দিয়ে নানা মানের পেন্সিল তৈরি করা হয় এর কোমলতার বিভিন্ন মাত্রা রেখে। যেমন B, 2B, 4B, 6B,



8B ইত্যাদি। মাঝারি মাত্রা হল HB। আবার কঠিন মাত্রা হল H, 2H, 4H, 6H ইত্যাদি। এগুলি শক্ততর। সাধারণভাবে ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং-এ ব্যবহার করা হয়।

রঙিন পেন্সিলে রঙিন চক ব্যবহার করা হয়। ওয়াটার কালারের জন্য ওয়াটার কালার পেন্সিলও তৈরি হয়। এই পেন্সিল ঘষে তার ওপর তুলিতে করে জল লাগিয়ে রং করতে হয়। এছাড়াও আরও কয়েক ধরনের পেন্সিল তৈরি হয়। তার মধ্যে আছে ডুপ্লিকেটিং বা কপিং পেন্সিল।

পেপার মেকিং (Paper Making)

পেপার বা কাগজ হাতে এবং যন্ত্রে দু-ভাবেই তৈরি করা হয়। উভয় ক্ষেত্রেই নিয়ম একই। প্রথমে উদ্ভিদ, তন্তু, জল, আঠা, এবং কখনো কখনো বিশেষ রাসায়নিক পদার্থ মিশিয়ে মণ্ড তৈরি করা হয়। এই মণ্ড একটা ছাকনির ওপর ছড়িয়ে দিয়ে একটা ভিজে চাদর তৈরি করা হয়। এই ভিজে চাদরটিকে চেপে সব জল বের করে নেওয়া হয় তারপর বাষ্পীভূত করে শুকোনোর পর কাগজের শিটের ওপর নানা ধরনের আস্তরণ লাগানো হয় বিভিন্ন ফলাফল বা গুণ যুক্ত করতে।

হ্যান্ডমেড কাগজ তৈরি করতে কাঁচামাল হিসাবে পরিষ্কার কটন বা লিনেনের কম্বলকে ছেঁটে গুঁড়ো করে সেই আঁশকে জল দিতে দিতে ফ্যাটাতে হয় যাতে প্রতিটি আঁশ আলাদা হয়ে পড়ে। এরপর পরিমাণ মতো জল মিশিয়ে উপযুক্ত ঘনত্বের মণ্ড তৈরি করা হয়। এই মণ্ডকে নির্দিষ্ট আকারের কাগজের মাপের জন্য তৈরি জালি আটকানো ফ্রেমের ওপর আর একটা জালি ছাড়া ফ্রেমকে বসিয়ে বড়ো চৌবাচ্চার মধ্যে রাখা মণ্ডকে এমন অনুভূমিক ভাবে তুলতে হবে যাতে জালিতে সমান ঘনত্বের মণ্ড উঠে আসে। কিছুক্ষণ পরে সব জল ঝরে গেলে আর একটি জালি চাপিয়ে চাপ দিয়ে ভিজে মণ্ড থেকে সব জল বের করে দিতে হবে। তারপর শুকাতে দিতে হবে। এভাবে কাগজ তৈরি হবে। কাগজের পৃষ্ঠ-বুনোটের জন্য নির্দিষ্ট ধরনের জালি ব্যবহার করতে হয়।

কাগজ তৈরির বাণিজ্যিক পদ্ধতিও একই রকমের। শুধু সেখানে কিছু অতিরিক্ত ব্যবস্থা রাখা হয় অতি মাত্রায় উৎপাদনের জন্য। অবশ্য মেসিনে কাগজ তৈরির ক্ষেত্রে যান্ত্রিক প্রকৌশল অনুযায়ী সব কিছু সংঘটিত করা হয়।

পোর্ট্রেট
(Portait)

আসল ব্যক্তি বা বস্তুকে তুলে ধরে যে ছবি বা ভাস্কর্য। একই ভাবে কোনো স্থানের দৃশ্যকে ধরে রাখাকেও পোর্ট্রেট বলে। যখন ক্যামেরা ছিল না তখন এই পদ্ধতিই ছিল একমাত্র উপায় যার সাহায্যে স্মৃতিকে ধরে রাখা হত। যান্ত্রিকভাবে প্রতিকৃতি মেলানোই নয় প্রতিকৃতিতে আসল মানুষ বা বিষয়বস্তুর চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তোলাও পোর্ট্রেটের অন্যতম দিক। এই প্রসঙ্গে রোঁদার বালজাকের মূর্তি তৈরি ঘটনা অবশ্যই স্মরণীয়। বালজাকের দুশো বছর উপলক্ষ্যে রোদাঁকে বালজাকের মূর্তি তৈরির বরাত দেওয়া হয়েছিল উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে। উদ্যোক্তাদের সরবরাহ করা বালজাকের ছবির মধ্যে প্রকৃত বালজাককে খুঁজে না পেয়ে রোদ্যাঁ রাস্তায় বসে মানুষের মধ্যে বালজাককে খুঁজতে লাগলেন। শেষে একদিন নিজের স্টুডিয়োতে বসে মোমবাতির নীচে গাউনের ছাঁয়ার ভেতরে আসল বালজাককে আবিষ্কার করে তাঁর মূর্তি গড়লেন। ইতোমধ্যে এই খবর রটে গেল যে রোদ্যাঁর মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছে। উদ্যোক্তারা অন্য একজন শিল্পীকে দিয়ে বালজাকের মূর্তি বানিয়ে নির্দিষ্ট



নং ১২৮. ভিনসেন্ট ভ্যান গঘ : আত্মাপ্রতিকৃতি। ১৮৮৯। ক্যানভাসের ওপর তেল রং। ৬৫ X ৫৪ সেমি.।

দিনে যথাস্থানে স্থাপন করলেন। রোদ্যাঁর মৃত্যুর পর তাঁর বন্ধু এমিল জোলা রোদ্যাঁর স্টুডিয়োতে এসে রোদ্যাঁর তৈরি বালজাকের মূর্তিকেই যথাযথ বলে চিহ্নিত করেন। পরে মূর্তিটি প্রতিস্থাপন করা হয়।

পোরসিলেন (Polcelain)

এক ধরনের অত্যন্ত শক্ত, অনচ্ছ মৃৎশিল্প। এটা তৈরি হয় কেয়োলিন নামের সাদা খনিজ মাটির সঙ্গে দুটি খনিজ পাথর যথাক্রমে ফেলসপার এবং কোয়ার্টজ-এর গুঁড়ো মিশিয়ে ১৩০০° সেলসিয়াসেরও বেশি তাপে পুড়িয়ে। এত উচ্চতাপে পাথরের গুঁড়োগুলি গলে মাটির সঙ্গে মিশে কাচের মতো পদার্থে পরিণত হয়। স্বাভাবিকভাবেই পোরসিলেন সাধারণ মৃৎপাত্রের চেয়ে অনেক বেশি দৃঢ়, উজ্জ্বল এবং জল নিরোধক। চকচকে অর্থাৎ গ্লেজযুক্ত পোরসিলেন-এর উদ্ভব হয়েছিল মিশরে এবং মধ্যপ্রাচ্যে। চিন দেশের পোরসিলেনও প্রাচীন ঐতিহ্য সম্পন্ন। খ্রিস্টপূর্ব ৩০০০ থেকে ১৭০০ বছরের পুরোনো চাকে তৈরি পোরসিলেনের নমুনা পাওয়া গেছে চিনের কনসু প্রদেশে। এসব পোরসিলেন বড়ো ও মোটা এবং গ্লেজহীন কিন্তু মসৃণ আর লাল, সাদা, কালো রঙে অলংকৃত। গ্লেজযুক্ত মৃতপাত্রের ধারণা মধ্যপ্রাচ্য থেকে চিনে আসে বাণিজ্যের পথ ধরে। ধাতু গলাবার ভাটি তৈরির অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে চিনারা উচ্চতাপে পোরসিলেন পোড়ানোর কৌশল আয়ত্ব করেন। তাং যুগের পাত্রে অঙ্কনের পরিবর্তে রিলিফের নকশা দিয়ে অলংকরণ করা হত। পাত্রের নকশায় যেমন মধ্য প্রাচোর ছাপ আছে তেমনি গড়নে আছে ভারতীয় বৌদ্ধধর্মের প্রভাব। পোরসিলেনের পাত্রে নকশা অঙ্কন শুরু হয়েছিল সুঙ আমলের শেষ দিকে। এই সময় অর্থাৎ ৯৬০ থেকে ১২৮০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে পোরসিলেন শিল্প সব দিক থেকে ত্রুটিমুক্ত হয়ে ওঠে। তাপমাত্রা বেশি হওয়ার ফলে পোরসিলেনের উপাদান গলে মাটির পাত্রের চেয়ে অনেক বেশি দৃঢ় হয়ে ওঠে। মিশ্র উপাদানের জন্য আপেক্ষিক তাপমাত্রার সীমা মিশ্র উপাদানের গলনাঙ্কের মধ্যে থাকে ফলে পাত্র বিকৃতির হাত থেকেও বাঁচে। পোড়ানোর আগে বিভিন্ন রকম ধাতব অক্সাইড লাগিয়ে পাত্রে রঙের কারুকার্য করা হয়। সব ধরনের ধাতব অক্সাইড উচ্চতাপ সহ্য করতে পারে না বলে নির্দিষ্ট কিছু ধাতব অক্সাইডই ব্যবহার করা

হয়। রঙের এই সীমাবদ্ধতা পোরসিলেনের সৌন্দর্যে বিশেষ গুণ দান করেছে। এই সব অভিজ্ঞতা নিয়ে মিং আমল সমৃদ্ধ হয়েছিল। পোরসিলেন শিল্পও পৌঁছে গিয়েছিল উন্নতির সুউচ্চ শিখরে। অপরদিকে ইউরোপেও এই পোরসিলেন তৈরি চেষ্টা হতে থাকে। তুরস্ক চিনের নকশা নকল করে পোরসিলেন উৎপাদন হতে থাকে। চিনাদের কাছ থেকে পোরসিলেন তৈরি শিখে জাপান ও কোরিয়াও পোরসিলেন বাজারে সরবরাহ করতে শুরু করে। ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিকে ইতালির ফ্লোরেন্সে 'সফট্ পেস্ট পোরসিলেন' নামে এক ধরনের পোরসিলেন তৈরি হয়। এদিকে পারস্যেও পোরসিলেন উৎপাদন শুরু হয়। প্রথম দিকে লাল সাদা জাতীয় মিং নকশার অনুকরণ থাকলেও অচিরেই পারস্য নিজস্ব বৈশিষ্ট্য লাভ করে। ভারতে বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় কিছু রাজবন্দী জেলে বসে গ্লেজপটারি পদ্ধতির শিক্ষা নেন। এঁদের কয়েকজন কলকাতার আশেপাশে কিছু গ্লেজযুক্ত পটারি কারখানা স্থাপন করেন। তারই একটি ছিল 'বেঙ্গল পটারি।' ভারতের অন্যান্য স্থানেও পোরসিলেন শিল্প গড়ে ওঠেছে।

পোস্ট ইম্প্রেশনিজ্‌ম (Post Impressionism)

১৯১০ সালে লন্ডনের গ্রাফটন গ্যালারিতে শিল্প সমালোচক রজার ফ্রাই নিজেরই আয়োজিত একটি প্রদর্শনীর শিরোনামে 'মানে অ্যান্ড দি পোস্ট ইম্প্রেশনিস্টস'— শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন এবং তারপর ধীরে ধীরে শব্দটি পরিভাষার রূপ লাভ করে। যদিও ফ্রাই প্রাথমিক ভাবে তাৎপর্য ছাড়াই শুধুমাত্র প্রদর্শনীর সর্বাধিক ছবি যাঁদের ছিল সেই তিন শিল্পী গগাঁ, সেজান ও ভ্যানগঘের সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত শৈলীর ছবিকে পৃথক করতে শব্দটিকে ব্যবহার করেছিলেন। এই প্রদর্শনীতে সুরা-র ছবি ছিল দুটি। সিগন্যাকের ছিল পাঁচটি। কিন্তু সেজানের ছবি ছিল একুশটি, গগাঁর একচল্লিশ এবং ভ্যানগঘের বাইশটি। তিনি শব্দটিকে নেতিবাচক বলে স্বীকারও করেছিলেন। কিন্তু তাঁর যুক্তি ছিল যে এই শিল্পীত্রয় ইম্প্রেশনিজ্‌মের স্বাভাবিকতাবাদী লক্ষ্যের বিরুদ্ধে এবং বিষয়বস্তুর বৈশিষ্ট্য প্রকাশের ক্ষেত্রে আঙ্গিকগত সরলীকরণকে সাধারণ প্রয়োজন বলে গ্রহণ করেছেন।

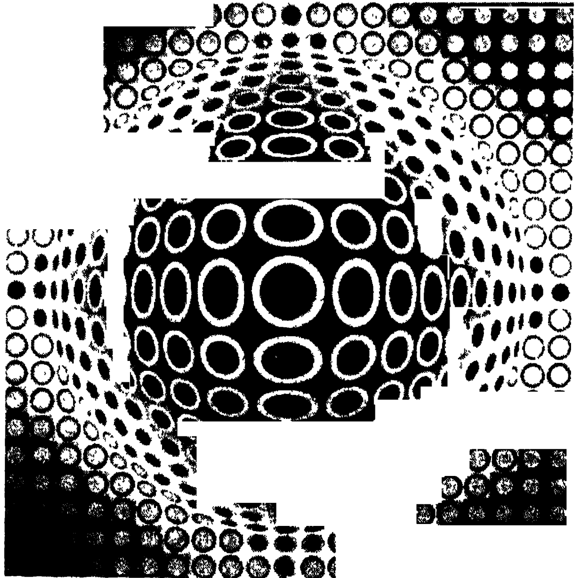
এই শিল্পীরা ইম্প্রেশনিস্টদের মতো ধাবমান আলো ও রংকে ধরতে চাওয়ার বদলে ছবিতে আরও বড়ো কিছু বিশেষ

ছবি নং ১৭৫ পৃ. ৩৬১

করে রঙের ভূমিকা, আঙ্গিক, ঘনত্ব ইত্যাদির খোঁজে নেমে পড়লেন। এই শিল্পীদের মধ্যমণি অবশ্যই ছিলেন সেজান। এ প্রসঙ্গে ব্রিটিশ শিল্প সমালোচক ও 'আর্ট' গ্রন্থের লেখক ক্লাইভ বেল এক প্রবন্ধে দাবি করেছিলেন যে সমকালীন চিত্রকরদের মধ্যে এমন ভালো ছ'জনকে পাওয়া যাবে না যিনি সেজানের প্রভাব মুক্ত। সেজান তাঁর ছবির বিভিন্ন মোটিফ তথা পোর্ট্রেট, ল্যান্ডস্কেপ বা অন্যান্য বস্তুকে চূড়ান্ত রকমের স্পষ্ট বর্ণ প্রণালীর সাহায্যে রূপায়িত করেছেন। পরবর্তীকালে 'নবিস' গোষ্ঠীর শিল্পীরাও এই ধরনের পন্থাকে গ্রহণ করেন সেই কারণে ফ্রাই তাঁর সংজ্ঞাকে আরও প্রসারিত করতে বাধ্য হন এবং সুরা ও বিন্দুবাদীদেরও (Pointilist) তার মধ্যে যুক্ত করেন। তবে একথাও ঠিক যে ফরাসি নিও ইম্প্রেশনিজ্‌ম-এর চেয়ে পোস্ট ইমপ্রেশনিজ্‌ম শব্দের ব্যবহার একটু আলাদা ধরনের। কেন-না নিও ইম্প্রেশনিজ্‌মের মধ্যে বিজ্ঞানের আশ্রয় আছে। ধীরে ধীরে পোস্ট ইম্প্রেশনিজ্‌ম প্রতীকবাদ (Symbolism) এবং নব্য ইম্প্রেশনিস্টবাদী ধারাকে ছাড়িয়ে যায়। অবশ্য এই সময় ইম্প্রেশনিজ্‌মের বিরুদ্ধে আরও কিছু রীতিরও প্রকাশ ঘটেছিল যেমন এক্সপ্রেশনিজ্‌ম, ফভিজ্‌ম ইত্যাদি।

পোস্ট পেন্টারলি অ্যাবস্ট্র্যাকশন (Post painterly abstraction)

১৯৫০-এর পরে আমেরিকার শিল্পকলায় বহু ছোটোছোটো গোষ্ঠীবদ্ধ আন্দোলন তথা শিল্পীরীতির উদ্ভব ঘটেছিল। এই



নং ১২৯. ভিক্‌তোব ভ্যাসারেলি : ভেগা পার। ১৯৬৯। ক্যানভাসে তেল রঙের ছবি। ৬৪X৬৪ ইঞ্চি।

সব রীতির চর্চার সঙ্গে যেমন খুব বেশি শিল্পী যুক্ত ছিলেন না তেমনি এগুলো বেশি দিন স্থায়ীও হয়নি। এমনকি খুব জোরালো প্রভাবও ফেলতে পারেনি। এই পরিস্থিতির মধ্যেই ১৯৬৪ সালে লস এঞ্জেলেস কান্ট্রি মিউজিয়াম অব আর্টসে আমেরিকার একজন প্রভাবশালী শিল্প সমালোচক ক্লেমেন্ট গ্রিনবার্গের নিজের তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত এক প্রদর্শনীর জন্য এই শব্দটি উদ্ভাবন করেন। এছাড়াও এই শব্দটির মধ্যে আরও অনেক ছোটো ছোটো গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিগত শৈলীও অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। যেমন 'হার্ডএজ পেন্টিং'-এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন অল হেল্ড, এলসোয়ার্থ কেলি, ফ্রাঙ্ক স্টেলা এবং জ্যাক ইয়াংগারম্যান। 'স্যাটিন পেন্টিং', যার মধ্যে ছিল হেলেন ফ্রাঙ্কেনথেলার, জন মিচেল, এবং জুলেস ওলিটস্কি। 'ওয়াশিংটন কালার' পেন্টার্স-এর সঙ্গে ছিলেন জেনে ডেভিস, মরিস লুইস এবং কেনেথ নোল্যান্ড। এমনকি মিনিমাল পেন্টিং পর্যন্ত। যার শিল্পীরা ছিলেন রবার্ট ম্যানগোল্ড, অ্যাগ্নেস মার্টিন, ব্রাইস মার্ডেল এবং রবার্ট রিম্যান। এগুলি সবই ছিল ১৯৫০ এবং ১৯৬০-এর অ্যাবস্ট্র্যাক্ট এক্সপ্রেশনিজ্‌ম থেকে উদ্ভূত নানারকম শৈলী। তলবদ্ধ রঙের প্রয়োগ এই রীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য। ছবিতে তলবদ্ধতার (Flatness) ওপর গুরুত্ব আরোপ মার্কিন আধুনিকতার অন্যতম লক্ষণ বলে মনে করা হয়। কিন্তু অসুবিধা হল এই রকম শিল্পাদর্শগত আঙ্গিক শেষ পর্যন্ত এমন রূপ ধারণ করে যে তত্ত্বগতভাবে বিশুদ্ধ ছবি এবং বস্তুর সাধারণ অবস্থার মধ্যে কোনো পার্থক্য নিরুপণ অসম্ভব হয়ে ওঠে। এই রীতিতে মূলত যাঁরা ছবি এঁকেছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন মরিস লুই, কেনেথ নোল্যান্ড, জুলেস ওলিটস্কি, এলসোয়ার্থ কেলি প্রমুখ।

পোস্টমডার্নিজ্‌ম (Postmodernism)

সাম্প্রতিক কালের এক দৃষ্টিভঙ্গি (দর্শন?) বিশেষ করে শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে। এই দৃষ্টিভঙ্গি যেমন অভিনব তেমনি বেশ জটিল। গত শতাব্দীর মধ্যপর্বের কিছু আগে থেকে ইউরোপ ও আমেরিকায় রাজনীতি, সমাজ, সাহিত্য, শিল্পকলা, সংস্কৃতিতে নানা ধরনের ঝোঁক ও তার রূপায়ণ দেখা দিতে শুরু করে। যেমন শিল্পকলার ক্ষেত্রে দাদা, পপ আর্ট, মিনিমাল আর্ট, বডি আর্ট, ল্যান্ড আর্ট, কনসেপচুয়াল আর্ট, আর্টিপোভেরা ইত্যাদি। এসবের মধ্য

ছবি নং ১৭৬ পৃ. ৬২, নং ১৯৭, পৃ. ৩৭৪, নং ১৯৯ পৃ. ৩৭৬
রঙিন ছবি নং ২২৬ পৃ. ৩৯০

দিয়ে ক্রমে বহুত্ববাদী দৃষ্টিভঙ্গি জন্ম নেয়। এই বহুত্ববাদী দৃষ্টিভঙ্গি বা প্লুরালিজ্‌মের একটি রূপ হল পোস্টমডার্নিজ্‌ম বা উত্তর আধুনিকতাবাদ। অদ্ভুতভাবে ১৯৪০ অথবা ১৯৫০ পর থেকে শিল্পে, সাহিত্যে, স্থাপত্যে, সংগীতে আঙ্গিকগত বা কোনো বিশেষ ধরনের পরিবর্তনকেই উত্তর আধুনিক বলে চিহ্নিত করার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। ১৯৪৪ সালে ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের থিয়েডার অ্যাডর্ন এবং হর্কহেইমার আলোক প্রাপ্তির যুগের অবদান তথা 'প্রগতি' 'আধুনিকতা', 'সার্বিক ইতিহাস'কে তীব্রভাবে সমালোচনা করে তা ধ্বংসের আলো ছড়াচ্ছে বলে অভিযোগ করেন। তবে পোস্টমডার্ন শব্দটি প্রথম স্পষ্টভাবে দেখা যায় ১৯৬৯ সালে। উত্তর আমেরিকায় অভিজাত (elite) এবং গণ (Mass) সংস্কৃতির মধ্যেকার সম্পর্ক বিষয়ক এক সাহিত্য সমালোচনায়। এরপর ১৯৭৫ সালে আধুনিক তথা মডার্ন আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া হিসাবে এই শব্দটি ব্যবহার করা হয় পোস্টমডার্ন বিল্ডিং-এর চূড়ান্ত লক্ষণ হিসাবে 'দ্বৈতনীতি' বোঝাতে। ১৯৭৯ সালে আমেরিকার সান্টা মনিকায় স্থপতি ফ্রাঙ্ক ঘেরি নিজের এবং অন্যান্য একক পারিবারিক যে বাড়িগুলি তৈরি করেছিলেন তা হল এক 'নিয়ম বহির্ভূত স্থাপত্য'। ফ্রাঙ্ক ঘেরির এই বাড়ি ছিল প্রথাগত ভার্নাকুলার স্টাইলের একটি কটেজ, যার চারদিকে সমন্বয়হীন ভাবে নতুন কিছু ঘর এমন ভাবে বসিয়ে দেওয়া হয় যেন পুরোনো একটি বাড়িকে ঊর্ধ্বকমার মধ্যে রাখা হয়েছে বা দেখলে মনে হয় নতুন বাড়িগুলি পুরোনো বাড়িটিকে ঘিরে ফেলেছে। উত্তর আধুনিকতার প্রবক্তারা বলেন ঘেরির এই বাড়ি হল বিনির্মাণবাদী স্থাপত্যের নমুনা।

'উত্তর আধুনিকতা' আধুনিকতা থেকে আলাদা। সেই কারণে আধুনিকতার বিরুদ্ধে কোনো প্রতিক্রিয়া হিসাবে একে চিহ্নিত করা যথাযথ নয়। তাত্ত্বিক জঁ ফ্রাঁসোয়া লিয়োতারকে পোস্টমডার্নিজ্‌মের জনক বলে মনে করা হয়। ১৯৭৯ সালে তিনি 'The Postmodern condition : A report on knowledge' বইয়ে বলেছেন উত্তর আধুনিকতার জন্ম ঠিক আধুনিকতার পরে নয়। (A work can become modern only if it is first modern

... Post modernism, thus understood is not moderism, at its end but in the nacent state'.)

উত্তর আধুনিকতার প্রবক্তারা মনে করেন তত্ত্ব নামক ব্যাপারটাই সংকটাপন্ন। প্রকৃতির জীব মানুষের জীবন ও কার্যকলাপ জটিল ও ব্যাখ্যাহীন। তাকে নিয়ে কোনো সর্বজনীন তত্ত্ব তৈরি করা যায় না। তাঁরা মহা আখ্যানকে (metanarrative) অস্বীকার করেন। উত্তর আধুনিকতার শর্ত হিসাবে লিয়োতারের মত হল, সত্যের সন্ধানে নয়, বৈজ্ঞানিক, প্রযুক্তিবিদ ও যন্ত্রপাতি কেনা হয় ক্ষমতা দেখানোর জন্য। বৈজ্ঞানিক ভাষার খেলা হল ধনীদের খেলা। অর্থাৎ যে যত বেশি ধনী সে তত বেশি সঠিক। সব প্রতিষ্ঠানই ক্ষমতার অপব্যবহার করে এবং একচ্ছত্রভাবে ক্ষমতা ভোগ করে। তাই লিয়োতার উত্তর আধুনিকতা বলতে যা বলেছেন তা হল সর্বপ্রথমে মহা আখ্যান (metanarrative) এবং প্রতিষ্ঠিত মতবাদ (foundationalism) সম্পর্কে অনাস্থা জ্ঞাপন ও বিরোধিতা করা; উত্তর আধুনিকতা কোনোরকম ভাবালুতা ছাড়াই তথাকথিত অপ্রদর্শনযোগ্য জিনিসও প্রদর্শন করতে পারে এবং সেক্ষেত্রে কোনোরকম সান্ত্বনা খোঁজার চেষ্টা করে না; সাবলাইম পুনঃপ্রদর্শনের ব্যাপারে আনন্দ ও যন্ত্রণা অনুভব করে; বাস্তব বোধের বদলে বরং প্রদর্শন করা যায় না এরকম কল্পনার পূর্বসূত্র আবিষ্কার করতে চায়; উত্তর আধুনিকতা সর্বদাই প্রচলিত মতের বিরোধী এবং বহুত্ববাদে বিশ্বাসী ও আবিষ্কারের জন্য অবিরামভাবে আত্মনিয়োজিত; উত্তর আধুনিকতা কোনো ঐতিহাসিক যুগের চিন্তা নয়, নন্দনতাত্ত্বিক অভ্যাস মাত্র; উত্তর আধুনিকতা দৃষ্টবাদী (Positivist) বিজ্ঞানের বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ জানায়।

উত্তর আধুনিকতার অন্যান্য তাত্ত্বিক যেমন মিশেল ফুকো, একদা বিখ্যাত মার্কসবাদী ফরাসি চিন্তাবিদ লুই আলথুসার-এর ছাত্র, ১৯৫০ সালে কুড়ি বছর বয়সে ফরাসি কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন। চার বছর পর কমিউনিস্ট পার্টি ছাড়েন, ব্যক্তিগত জীবনে ছিলেন সমকামী, তিনি কোনো মূল্যবোধ মানতেন না, কেন-না মূল্যবোধও তথাকথিত মহা আখ্যানের মধ্যে পড়ে। তিনি বলেছিলেন 'আমি দেখেছি কমিউনিস্টরাও বুর্জোয়াদের মতো বিভিন্ন মূল্যবোধে বেশ বিশ্বাস করে' (উদ্ধৃতি : সালাহউদ্দীন

নং ১৩০. চালর্স মুর : পিৎজা দ' ইতালিয়া। নিউ অরলেঁস। ১৯৭৫ - ৮০।



আইয়ুব, সংস্কৃতির জিজ্ঞাসা), জাক দেরিদা প্রমুখরা প্রত্যে৷ মনে করেন যে কোনো চরম বাচন অর্থাৎ মাস্টার ডিসকোর্স থাকতে পারে না। তাঁদের কথা হল যেহেতু মার্কসবাদ ইতিহাসকে বোঝার ও ভবিষ্যৎকে রূপ দেওয়ায় একমাত্র পথ হওয়ার দাবি করে তাই মার্কসবাদ একটি 'চরম বাচন'। মার্কসবাদকে তাঁরা আধিপত্যের এক রূপ হিসাবে চিহ্নিত করেন।

বাংলায় উত্তর আধুনিকতার অন্যতম বিশিষ্ট লেখক 'হাংরি' খ্যাত মলয় রায়চৌধুরী আধুনিকতা ও উত্তর আধুনিকতার লক্ষণের যে তালিকা দিয়েছেন তার কয়েকটি এরকম— আধুনিকতার লক্ষণ : 'যুক্তির প্রাধান্য, যুক্তির প্রশ্রয়, সিঁড়ি ভাঙা অঙ্কের মতো যুক্তি ধাপে ধাপে এগোয়, কবিতায় আদি-মধ্য-অন্ত এই ভাগগুলি বজায় থাকে, একরৈখিক ক্রমঅগ্রসর, কেন্দ্রাভিগ, যুক্তির দিকে কবিতার অভিমুখ, আঁটোসাঁটো দেখায়।' আর উত্তর আধুনিকতার লক্ষণ : 'যুক্তি বিপন্ন, যুক্তির কেন্দ্রিকতা থেকে মুক্তি, যুক্তির বাইরে বেরোনোর প্রবণতা, আবেগের সমউপস্থিতি, কবিতার শুরু হওয়া আর শেষ হওয়াকে গুরুত্ব না দেওয়া, ছেতরানো, ক্রমান্বয়বিহীন, আবেগ-যুক্তির দ্বৈরাজ্যময়তা, কেন্দ্রাতিগ, যুক্তি ও আবেগের দ্বৈরাজ্যের দিকে কবিতার অভিমুখ, এলোমেলো দেখায়।' আধুনিকতার লক্ষণ : 'সুনিশ্চিত মানে, পরিমেয়তার প্রতি গুরুত্ব, কবির ঠিক করে দেওয়া

মানে, স্থাবর'। এক্ষেত্রে উত্তর আধুনিকতার লক্ষণ : 'মানের নিশ্চলতা এড়িয়ে যাওয়া, অফুরন্ত মানে, যা ইচ্ছে মানে করে নিতে পারেন পাঠক, মানের ধারণার প্রসার, প্রচলিত মত অস্বীকার।' আধুনিকতার লক্ষণ যদি : 'পরম সত্য, অকাট্য সত্য, একটা কংগ্রেস, একটা মার্কসবাদী দল' তাহলে উত্তর আধুনিকতার লক্ষণ : 'সাময়িক প্রত্যয়, একই তত্ত্বের অনেক রকম অনুশীলন। তিনরকমের কংগ্রেস সাতাশ রকমের মার্কসবাদী, পাঁচ রকমের জনতা দল, তত্ত্বের ভাঙচুর।' সুতরাং বোঝা যায় যে উত্তর আধুনিকতায় সমগ্রতার সন্ধান নেই কিন্তু বিচ্ছিন্নতা এবং অসংপৃক্ততার ধারাবাহিকতা আছে। তাই দেখা গেল যে আধুনিকতার মূল চারটে সূত্র নিয়ে প্রশ্ন তোলার পাশাপাশি উত্তর আধুনিকতা এর বিরুদ্ধে বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপিত করল। যেমন —

আধুনিক	উত্তর আধুনিক
১. প্রত্যেক যুগের নিজস্ব একটা রীতি থাকে।	১. রীতির এবং ভাষার বহুত্বময়তা।
২. ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্বই ইতিহাসের মূল কথা।	২. বাস্তবতা হল অতীতের বিস্মরণ এবং যে তাৎক্ষণিকতার মধ্যে অতীত বর্তমান এবং ভবিষ্যতের ঐক্য।
৩. আনুষ্ঠানিক ও ক্রিয়া-মূলক অনুশাসন	৩. অলংকার এবং সজ্জার চেহারা।
৪. সারল্য, বিশুদ্ধতা, দ্বন্দ্ব, যুক্তিবাদিতা এবং অভিন্নতা বা ঐক্য।	৪. জটিলতা, বহুমুখিনতা, অস্থায়িত্ব, এবং ঘুরে বেড়ানো বা অস্থিরতা।

এসব কারণে বেশির ভাগ সময়েই তাবৎ প্রগতির ধারণার বিরোধিতাই উত্তর আধুনিকতার তত্ত্বের লক্ষ্য হয়ে ওঠে। যেহেতু উত্তর আধুনিকতার কোনো নির্দিষ্ট শৈলী বা রূপ নেই তাই কোনো নির্দিষ্ট শিল্পরীতি বা শিল্পীর ছবিকে উত্তর আধুনিক শিল্প বলে চিহ্নিত করা কঠিন। কিন্তু এর চরিত্র লক্ষণের সঙ্গে মিলিয়ে যেসব শিল্পীর ছবিকে উত্তর আধুনিক বলে আখ্যা দেওয়া যায় তাঁদের মধ্যে রবার্ট কুশনার, রডনি রিপস্, ইনস্টলেশন শিল্পী জোনাথন বোরোফস্কি, মেরি কেলি, এনজো কুচ্চি, অলডো স্পোলডি, অনিশ কাপুর,

চিত্রভানু মজুমদার, সঞ্চয়ন ঘোষ, অতুল দোধিয়া প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। এদের পূর্বসূরী যাঁরা উত্তর আধুনিক নন্দনতত্ত্বের সঙ্গে কোনো না কোনো ভাবে যুক্ত ছিলেন তাঁদের মধ্যে অ্যান্ডি ওয়ারহল, রবার্ট রসখেনবার্গ, রশিদ অ্যারাইন, কার্ল অঁদ্রে, ডেভিড স্যালি অগ্রগণ্য। এসব সত্ত্বেও পোস্টমডার্নিজ্‌মের তত্ত্ব সামগ্রিক ভাবে গৃহীত হয়নি। তার একটি কারণ অবশ্য এই যে পোস্টমডার্নিজ্‌মের অন্তর্গত অনেক উপাদান বৈশিষ্ট্য এবং ঝোঁক এমনিতেই প্রতিষ্ঠিত ও গৃহীত। সেই কারণেই তত্ত্বগতভাবে পোস্ট-মডার্নিজ্‌মের প্রস্তাবনার আগে থেকেই এমন বহু শিল্প সৃষ্টি হয়েছে বিষয় ও আঙ্গিকগত দিক থেকে পোস্টমডার্ন তত্ত্বানুসারি শিল্পের থেকে তাকে পৃথক করা কঠিন। থেমস অ্যান্ড হাডসন প্রকাশিত 'হিস্ট্রি অব আর্টস' গ্রন্থে পোস্ট মডার্নিজ্‌ম প্রসঙ্গে এইচ. ডব্লিউ. জেনসন বলেছেন—'Because it has so many meanings, post-modernism itself becomes a meaningless term, posing the kind of hopeless double bind that it delights in. In fact post-modernism as a whole is riddled with contradictions. But if *nothing is valid then the values it often es*pouses, feminism, pluralism, and the like must be fallacious as well. Seen in this light, post-modernism is sterile philosophy that reflects the impotence of the intelligentsia to act.' (বহুরকম অর্থ আছে বলেই উত্তর আধুনিকতা নিজে একটা অর্থহীন শব্দে পরিণত হয়, যে ধরনের ফালতু দ্ব্যর্থবোধকতায় সে তুলে ধরে প্রকট করে। বস্তুতপক্ষে উত্তর আধুনিকতা সামগ্রিকভাবেই স্ববিরোধে জর্জরিত। তাই কিছুই যদি প্রাসঙ্গিক না হয় তাহলে নারীবাদ, বহুত্ববাদ জাতীয় যে মূল্যবোধগুলিকে উত্তর আধুনিকতা তুলে ধরে সেগুলিও প্রাসঙ্গিক হতে পারে না। তাই এই আলোতে দেখলে উত্তর আধুনিকতা একটি বন্ধ্যা দর্শন বা বুদ্ধিজীবীদের কর্মে প্রবৃত্ত হওয়ার অক্ষমতাকেই প্রতিফলিত করে।) (History Art. H. W. Janson, Fifth Edition, Chapter Eight, Page 887).

পোস্টার (Poster) কাগজের ওপরে লেখা ও ছবি সহযোগে মুদ্রিত বা হস্তকৃত কোনো ঘোষণা বা বিজ্ঞাপন। কাগজের মাপ অনুযায়ী নানা মাপের রঙিন বা সাদা কালো দুইই হয়। উপযোগিতার

কারণে মুদ্রিত পোস্টারই বেশি। সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ের হাতে লেখা পোস্টার ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে প্রচলিত। পোস্টারের আদি রূপের নমুনা বলা যায় থিবসের ভগ্নাবশেষে প্রাপ্ত প্যাপিরাস কাগজে লেখা ৩০০০ হাজার বছর আগের একটি বিজ্ঞাপনকে। হাপু নামে মিশরের জনৈক তাঁতি এই বিজ্ঞাপনটিতে লিখেছিলেন যে 'শেম নামে তাঁর একজন ক্রীতদাস পালিয়েছে, তার বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে ঘোষণা করা হয়েছিল— পলাতককে ধরে এনে দিতে পারলে এক স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার দেওয়া হবে, আর সঠিক খবরের জন্য অর্ধেক স্বর্ণমুদ্রা' (আধুনিক বিজ্ঞাপন: ড. সমরজিৎ দত্ত পৃ: ১৫)। আজকে পোস্টার যে কত প্রয়োজনীয় তা লিখে বোঝানোই বাহুল্য। দেয়ালে, নির্ধারিত বোর্ডে, কিয়স্কে (শহরের ল্যাম্পপোস্ট বা অন্যান্য পোস্টে লাগানো বাকসো সদৃশ তল) সুদৃশ্য পোস্টার সকলেরই নজর কাড়ে। পোস্টারের এই কার্যকারিতা ও জনপ্রিয়তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় মুদ্রণ ব্যবস্থা আবিষ্কার হবার পর। স্বভাবতই আধুনিক পোস্টারের উদ্ভব পাশ্চাত্যে গ্রাফিক ডিজাইনের হাত ধরে। ১৮৯৮ সালে বেলজিয়ান গ্রাফিক ডিজাইনার হেনরি ভ্যান ডি ভ্যালডি ট্রপেনে ফুড কোম্পানির জন্য একসারি আলংকারিক বন্ধনকশা তৈরি করেছিলেন যা পরবর্তী কালে কোম্পানির পোস্টারে ব্যবহার করা হয়েছিল। একদিকে আধুনিক মুদ্রণ ও প্রযুক্তির অগ্রগতি এবং পাশাপাশি শিল্পকলা বিষয়ক নানা আন্দোলন, যেমন ইংল্যান্ডে ১৮৬১ উইলিয়াম মরিস প্রবর্তিত 'আর্ট অ্যান্ড ক্রাফ্‌ট মুভমেন্ট', ফ্রান্সে 'আর্ট ন্যুভো', জার্মানিতে 'সুগেন্ডস্টাইল' প্রভৃতি পোস্টারের আঙ্গিক ও ধারণাতে নানান পরিবর্তন ঘটায়। গ্রাফিক ডিজাইনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন ঘটায় জার্মানির বাউহাউস। ১৯২৩ সালে বাউহাউস প্রদর্শনীতে মোহলি-ন্যাগির ছাত্র জুস্ট স্কিমিডট্‌-এর কাজ পোস্টারের ডিজাইনে একটা নতুন মাত্রা যুক্ত করে। বলা যায় এই সময় মস্কো, বার্লিন এবং আর্মস্টারডামে গ্রাফিক আর্ট তথা পোস্টার ডিজাইনকে নিয়ে যে ত্রিভুজ গড়ে উঠেছিল যার কুশীলব ছিলেন দাদাবাদী এবং কনস্ট্রাক্টিভিস্ট শিল্পীরা এবং তাঁদের মিলন কেন্দ্র ছিল De Stijl (দ্য স্টাইল) এবং বাউহাউস। এঁরাই পোস্টার ডিজাইনের ক্ষেত্রে সারা ইউরোপ জুড়ে আভাঁ গার্দ আন্দোলন শুরু করেন এবং প্রচলিত নিয়মের বইকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে

পোস্টার ডিজাইনে ফোটোগ্রাফি সহ নতুন রূপের টাইপোগ্রাফিকে হাতিয়ার করে আধুনিক গ্রাফিক ডিজাইনের সূত্রপাত ঘটান। ১৯১৭ সালে রুশ বিপ্লবের পর নতুন সোভিয়েতে রাষ্ট্রনৈতিক ও সামাজিক প্রচারের কাজে পোস্টারের ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ করা যায়। আলেক্সি রেডাকভ-এর 'ব্লাইন্ড ম্যান...'। অ্যাডল্ফ স্ট্র্যাকভের 'উম্যানস ইমানসিপেশন ডে' বা ক্লাটসিসের ফোটোমন্তাজ অসম্ভব সাড়া জাগানো পোস্টার। এর মধ্যে স্ট্র্যাকভের পোস্টার কনস্ট্রাক্টিভিস্ট শৈলীতে করা।

১৯৬৪ সালে টমি আনগেরার রাইনোসেরস প্রেস থেকে 'ব্ল্যাক পাওয়ার হোয়াইট পাওয়ার' নামে একটি পোস্টার প্রকাশ করেন। এর ফলে তাঁকে কানাডাতে দেশান্তরিত হতে হয় এবং তাঁর প্রেস এফ. বি. আই কর্তৃক কালো তালিকা ভুক্ত হয়। ১৯৪৯ সালে পিকাসোর আঁকা 'ওয়ার্ল্ড পিস



নং ১৩১. জিগা ভারটভ : দি ম্যান উইথ·দি মুভি ক্যামেরা। পোস্টার। ১৯২৯। রাশিয়া।

কংগ্রেস' লিথোগ্রাফ পোস্টার এবং ১৯৫২ সালে ভ্যালাউরিসের প্রদর্শনী উপলক্ষ্যে রঙিন লিনোকাটের পোস্টার দুটোই উল্লেখযোগ্য। দ্বিতীয় পোস্টারটি সম্পূর্ণই প্রথাবহির্ভূতভাবে পিকাসোর নিজের শৈলীতে একটি ছাগলের মাথা ব্যবহার করে করা। আমাদের দেশে পোস্টারের কথা বলতে গেলে বিশেষ করে বলতে হয় স্বাধীনতা আন্দোলন চলাকালীন নন্দলাল বসুর আঁকা হরিপুরা কংগ্রেসের পোস্টার। হরিপুরা কংগ্রেসের জন্য নন্দলাল তিরাশিটি পোস্টার এঁকেছিলেন। যদিও টেম্পারাতে লোক আঙ্গিকে আঁকা এই ছবিগুলিকে নন্দলাল নিজে পোস্টার বলেননি। পোস্টারের শর্তে এগুলি আঁকাও হয়নি। ছবিগুলি আসলে একটি চিত্রমালিকার অংশ। পোস্টার শব্দটি পরে আরোপিত হয়েছে। মোটাদাগের রঙের ছোপে এবং গতিশীল রেখার সাহায্যে ফিগারগুলি আঁকার ধরণ এবং উপস্থাপনার সঙ্গে পোস্টারের চরিত্রে বৈশিষ্ট্য একটা মিল অবশ্যই আছে। তার পরেই উল্লেখ করতে হয় নন্দলালের সুযোগ্য ছাত্র সত্যজিৎ রায়ের নাম। তিনি তাঁর চলচ্চিত্রের জন্য যেসব পোস্টার ডিজাইন করেছিলেন তার মধ্যে ক্যালিগ্রাফি, নানারকম মোটিফ, অলংকরণ এবং ফোটোগ্রাফিকে এমনভাবে সাজিয়ে ছিলেন যে তা এক নতুন নতুন যুগলক্ষণ নিয়ে এসেছিল। বিশেষ করে 'পথের পাঁচালি', 'অপরাজিত', 'গুপি গাইন বাঘা বাইন', 'সোনার কেল্লা' এরকম প্রায় প্রতিটি ছায়া ছবির পোস্টারই নতুন নতুন মাত্রা নিয়ে তাঁর তুলি থেকে সৃষ্টি হয়েছে। চিত্ত প্রসাদের করা 'দো বিঘা জমিন'-এর পোস্টার এবং অরুণ কুমার গাঙ্গুলি তথা ও. সি.ও পোস্টারে গুরুত্বপূর্ণ মাত্রা যোগ করেছিলেন।

এর পরের যুগে ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার পোস্টার ডিজাইনকে আরও বর্ণময় এবং অসম্ভব সব এফেক্ট বা গুণযুক্ত করেছে।

প্যাগোডা (Pagoda)

বৌদ্ধমন্দির সম্পর্কিত বহুতলবিশিষ্ট উঁচু অট্টালিকা তথা পাথর, ইট, কাঠ দিয়ে নির্মিত টাওয়ার সদৃশ কাঠামো যাতে প্রাচীন ধর্মীয় বা সংস্কৃতির স্মারক রক্ষিত থাকে। কেউ কেউ বলেন পর্তুগিজরা এই শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন ষোড়শ শতাব্দীতে। এবং এর উৎপত্তি ফার্সি 'বাত-কাদাহ' বা সংস্কৃত 'ভগবত' থেকে। আবার কেউ কেউ বলেন এটি

এসেছে চিনা 'তা' শব্দ থেকে। প্যাগোডার আকৃতিগত ধারণা এসেছে ভারতীয় স্তূপ থেকে। শব্দ যেখান থেকেই আসুক না কেন পেশোয়ারের কাছে বর্তমানে পাকিস্তানে দ্বিতীয় শতাব্দীতে প্রথম কনিষ্ক বৌদ্ধধর্মের অমূল্য স্মারক সংরক্ষণের জন্য সবচেয়ে প্রাচীন বহুতল বিশিষ্ট প্যাগোডা নির্মাণ করেছিলেন। এই স্থাপত্যই পরবর্তীকালে ব্রহ্মদেশ, চিন, জাপানে প্যাগোডা নির্মাণের প্রেরণা হিসাবে কাজ করেছে। প্যাগোডা মূলত স্মারক হিসাবেই গড়া হয় তাই এর মধ্যে ব্যবহার যোগ্য স্থান খুব কমই থাকে। প্যাগোডার আকৃতিরও ভিন্নতা আছে তিব্বতের প্যাগোডা বোতলাকৃতির, লায়োস, কম্বোডিয়া, থাইল্যান্ড এবং ব্রহ্মদেশ বা মায়ানমারের প্যাগোডা পিরামিড বা শঙ্কু আকৃতির। আবার চিন, কোরিয়া, জাপানের প্যাগোডাগুলি বহুতল বিশিষ্ট ও উঁচু যার ওপরের তলাগুলি ক্রমান্বয়ে সংকুচিত হতে হতে একটি বিন্দুতে মিশে গেছে। প্রথম শ্রেণির প্যাগোডাগুলি তের, নয়, সাত এবং ছোটো প্যাগোডাগুলি পাঁচ ও তিন তলা বিশিষ্ট হয়। এই তলাগুলি কখনো গোলাকার, চৌকো বা বহুকোণী হয়। প্রতিটি তলেই অভিক্ষিপ্ত (Projected) ঢালু ছাদ থাকে। প্যাগোডার শিখরটি অলংকৃত করা থাকে।

নেপালের ভাঁটগাঁও-এর বহুবাণি মন্দির পিরামিডের আকারে তৈরি পাঁচতলা বিশিষ্ট একটি ভারতীয় রীতির প্রাচীন প্যাগোডা। ১৭০৩ সালে এটি নির্মিত। দক্ষিণ ভারতের তাঞ্জোরে একাদশ শতাব্দীতে নির্মিত রাজরাজেশ্বর মন্দিরটি প্রকৃতপক্ষে একটি উঁচু প্যাগোডা। স্তূপের মতো প্যাগোডাকেও মহাজাগতিক সৃষ্টির একটি নকশা বলে মনে করা হত। মন্দিরের ভেতরের স্তম্ভটি ধরা হত পৃথিবীর অক্ষ হিসাবে। যা স্বর্গের সঙ্গে মর্তের যোগসূত্র। জাপানিরা এখন প্যাগোডার চারটি স্তম্ভকে আকাশের ভাররক্ষক বলে মনে করে। প্যাগোডার প্রত্যেকটি তলাকে ধরা হয় পৌরাণিক পৃথিবীর পর্বতের ধাপ হিসাবে। আর প্যাগোডার শিখরে সজ্জিত ছত্রগুলিকে মনে করা হয় এক একটি স্বর্গ। কলকাতার ইডেন গার্ডেনে একটি পুরোনো কাঠের প্যাগোডা আছে। ১৮৫২ সাল নগাদ তৎকালীন ব্রহ্মদেশের প্রোম, শোয়ে, গঙ্গ এবং অরোফসার্ব অঞ্চলের গভর্নর মিস্টার মোঙ্গ হোনেনের স্ত্রী মিসেস মা কিন এটি তৈরি করিয়েছিলেন। ঘোঙ্গ নামে একজন দক্ষ কারিগর ১০ জন সহকারী নিয়ে



নং ১৩২. নারার ইয়াকুশি - জি প্যাগোডা। নারা যুগ। ৭০০ খ্রিস্টাব্দ।

১৫০০ টাকা ব্যায়ে তিন মাস ধরে এটি নির্মাণ করেন। ১৮৫৪ সালে ২৯ সেপ্টেম্বর লর্ড ডালহৌসি 'স্বরগঙ্গ' নামে একটি জাহাজে করে এই প্যাগোডাটিকে কলকাতায় আনেন এবং অকল্যান্ড সার্কাস গার্ডেনে (বর্তমান ইডেন গার্ডেন) ১৮৫৬ সালে এটাকে স্থাপন করে। এর জন্য ব্যয় হয়েছিল ৬০০০ টাকা। পরে কালক্রমে প্যাগোডাটি জীর্ণ হয়ে পড়লে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পূর্ত দপ্তর ১৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্যাগোডাটি সংস্কার করেন এবং ২০০০ সালের ৫ জুলাই এক অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে এর পুনরোদ্‌বোধন হয়। মায়ানমারের প্যাগোডা অলংকরণের জন্য বিখ্যাত।

প্যানথিয়োন (Pantheon) — গ্রিক ভাষায় এর অর্থ 'সর্ব দেবতা'। অর্থাৎ সর্ব দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদিত কোনো মন্দির। এর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হল ২৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দে রোমের আগ্রিপ্পাতে নির্মিত গোলাকার প্যানথিয়োন মন্দির। সেই থেকে এরকম দেখতে সব মন্দিরকে প্যানথিয়োন বলা হয়।

প্যানোরমা (Panorama) — যে-কোনো দিকে তাকালে দেখা যায়, একটি দৃশ্যের এরকম পূর্ণাঙ্গ দর্শন। সাধারণভাবে দর্শককে কেন্দ্রে রেখে ঘুরিয়ে এই দৃশ্য আঁকা হয়। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই ধরনের দৃশ্যচিত্র বিনোদন হিসাবেও খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। প্যানোরমার ছবি সাধারণভাবে মোটা দাগে আঁকা হত, খুব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কাজ তাতে থাকত না। হয় দর্শক ধীরে ধীরে ঘুরে গোটা দৃশ্যটা দেখতেন নয়তো গোলাকার পথটিকেই ঘুরিয়ে দর্শককে সম্পূর্ণ ছবিটি দেখানো হত। ১৭৮৮ সালে একজন স্কটিশ শিল্পী রবার্ট বার্কার এডিনবরা শহরের দৃশ্য নিয়ে সম্ভবত প্রথম প্যানোরমাটি আঁকেন। জনৈক আমেরিকান শিল্পী জন ভ্যান্ডারলিন ১৮০০ সালের গোড়ার দিকে ভারসেইলেসের প্রাসাদ ও বাগান-এর প্যানোরমা এঁকে দশ বছর ধরে প্রদর্শনী করেছিলেন। এর প্রয়োজনে তিনি একটি বাড়িই তৈরি করেছিলেন। বর্তমানে অবশ্য অনেকটা স্থান জুড়ে কোনো দৃশ্যকে বোঝাতে প্যানোরমা কথাটি ব্যবহার করা হয়।

প্যাপিরাস (Papyrus) — নলখাগড়া জাতীয় এক প্রজাতির উদ্ভিদ। প্রাচীন কাল থেকে মধ্যযুগ পর্যন্ত এই গাছের কাণ্ড থেকে কাগজ তৈরির প্রচলন

ছিল। প্রাচীন ইজিপ্টে এই পদ্ধতির উদ্ভব হয় এবং ইউরোপের বেশিরভাগ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। প্যাপিরাস গাছের কাণ্ড থেকে আঁশ ছাড়িয়ে ভিজিয়ে নিয়ে বিছিয়ে চাপে ম্যাট তৈরি করে তাকে শুকিয়ে নেওয়া হত। এই গাছের রসকেই আঁশগুলোকে ধরে রাখার আঠা হিসাবে ব্যবহার করা হত। বহু শত বছর ধরে প্যাপিরাস কাগজ তৈরিতে ব্যবহৃত হয়েছে। পরে এর জায়গায় আসে নিম্নমানের উদ্ভিদ থেকে কাগজ তৈরির সহজ পদ্ধতি। প্যাপিরাস গাছের বাহ্যিক চেহারাকে প্রাচীন ইজিপ্টবাসীরা তাঁদের স্থাপত্যের নানা নকশা তৈরির কাজে লাগাত। যার থেকেই নাম হয়েছে প্যাপিরাস ক্যাপিটাল।

প্যারালাল পারস্পেকটিভ (Parallel perspective)

পারস্পেকটিভ দেখুন।

প্যালেট (Palette)

সাধারণভাবে প্যালেট হল একটা পোর্টেবল সমতল ট্রে, মূলত কাঠের তৈরি। যার মধ্যে শিল্পী রং সাজিয়ে রাখেন এবং ছবিতে লাগানোর আগে এর ওপরে রং মেশান। কোনো কোনো প্যালেটের বৈশিষ্ট্য হল যে তার কিনারার কাছাকাছি একটি ফুটো থাকে ফলে বুড়ো আঙুলটা ঢুকিয়ে প্যালেটকে ধরা যায় এবং বাকি চারটে আঙুল রাখার মতো খাঁজ থাকে। এগুলো তেল রং বা অ্যাক্রিলিক ব্যবহারের জন্য। জল রঙের প্যালেটে রং রাখার খোপ থাকে এবং রং গোলারও আলাদা আলাদা ভাগ থাকে। এসব প্যালেট চিনা মাটি বা প্লাস্টিকের তৈরি। এছাড়াও প্যালেট শব্দটি



নির্দিষ্ট শিল্পীর ব্যবহৃত বিশেষ বর্ণসমষ্টিকেও বোঝায়। যেমন রেমব্রাঁর প্যালেট বা গগাঁর প্যালেট। এর অর্থ হল রেমব্রাঁ বা গগাঁ তাঁর ছবিতে যে ধরনের রং ব্যবহার করতেন তার শ্রেণি।

প্যালেট নাইফ (Palette Knife)

হাতলের সঙ্গে লাগানো একটা লম্বা নমনীয় ব্লেড বা পাত। এর দ্বারা রং মেশানো হয়, প্যালেটের রং চেঁছে তোলা হয়। এই ব্লেড ইস্পাত বা প্লাস্টিকের তৈরি। এর দ্বারা সাধারণত রং লাগানো হয় না।

প্যাস্টেল (Pastel)

দুশো বছরেরও কিছু বেশি পুরোনো এক ধরনের মাধ্যম হল প্যাস্টেল ব্যবহৃত হচ্ছে। মূলত চক, পিগমেন্ট (রঙের গুঁড়ো) এবং সাধারণভাবে গাম ট্রাগাকান্থ বা মিথাইল সেলুলোস জাতীয় আঠা তথা বাইন্ডার দিয়ে মেখে তৈরি শুকনো গোল, চৌকো স্টিক অথবা ব্লক। প্যাস্টেলে বাইন্ডার মেশানো হয় মূলত পিগমেন্টের গুঁড়োগুলিকে ধরে রাখার জন্য। সাপোর্টের ওপরে প্যাস্টেলকে আটকে রাখতে নয়। এ জন্য প্যাস্টেলে ছবি আঁকার পর স্থায়ী করতে ফিক্সেটিভ করতে হয়। কিছু প্যাস্টেলে অতিরিক্ত মাত্রায় বাইন্ডার থাকায় তা হার্ড এবং ভঙ্গুর হয়। অন্যগুলো নরম এবং বেশি মোলায়েম। প্যাস্টেলে আঁকার জন্য খসখসে অমসৃণ টেক্সচারসম্পন্ন সাপোর্ট বা কাগজ দরকার। মসৃণ তলে প্যাস্টেল ঘষে লাগানো যায় না। কোনো কোনো ছবিতে প্যাস্টেলের পাঁচটা আস্তরণও দেখতে পাওয়া যায়। আরও বেশি আস্তরণ লাগাতে গেলে মাঝে মাঝে ফিক্সেটিভ স্প্রে করে নিতে হয়। তবে ফিক্সেটিভ সামান্য হলেও প্যাস্টেলের ঔজ্জ্বল্যকে কমিয়ে দেয়। তাই অনেক শিল্পী ফিক্সেটিভ এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করেন।

প্যাস্টেল তিন রকমের পাওয়া যায়। সফট প্যাস্টেল যা কাগজে মোড়া থাকে, হার্ড প্যাস্টেল-এর স্টিক সাধারণত চৌকো হয় আর প্যাস্টেল পেন্সিল, কাঠের আবরণে ঢাকা থাকে।

তেল রং বা জল রং-এ যেমন অসংখ্য শেড বা বর্ণক্রম তৈরি করা যায় প্যাস্টেলে তেমনটি পারা যায় না। এক্ষেত্রে প্যাস্টেল প্রস্তুতকারকদের ওপরই নির্ভর করতে হয়। যদিও তারা একেকটি রঙের বহু শেড তৈরি করে সরবরাহ করেন।

প্যাস্টেলে রং চাপানোর সময় হ্যাচিং লাইন, ক্রস হ্যাচিং লাইন ব্যবহার করা হয়। সেই সঙ্গে মিশ্র মাধ্যম হিসেবে যেমন চারকোল, জল রং ইত্যাদি সঙ্গে মিশিয়েও ব্যবহার করা হয়। অয়েল প্যাস্টেল বা তেল খড়ির ক্ষেত্রে তেল রঙের মতো আগে ডার্ক টোনের রং চাপিয়ে তারপর লাইট টোনের রং চাপালে ভালো ফল পাওয়া যায়।
প্যাস্টেল ব্যবহারে শারীরিক ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে। কেন-না এর গুঁড়ো বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা হাওয়ায় ভেসে নিশ্বাসের সঙ্গে শরীরে প্রবেশ করতে পারে। তাই প্যাস্টেলে কাজ করার সময় যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

প্যাস্টেলের ছবির ক্ষেত্রে যার নাম সর্বাগ্রে মনে আসে তিনি হলেন এডগার দেগা। তাঁর প্যাস্টেলে আঁকা ক্যাবারে নাচিয়েদের নিয়ে অসাধারণ সব ছবি আছে। দেগা প্যাস্টেলে ইমপ্যাস্টো পদ্ধতির প্রয়োগ ঘটিয়েছিলেন প্রতিটি বর্ণস্তরে স্প্রে করে নিয়ে। এছাড়াও সুরা, রেনোয়া, সেজানের প্যাস্টেলে আঁকা উল্লেখযোগ্য ছবি রয়েছে। পিকাসোরও প্যাস্টেলের অসাধারণ কিছু ছবি আছে। গোপাল ঘোষও প্যাস্টেলে অপূর্ব কিছু ছবি এঁকেছিলেন।

প্রসেস আর্ট
(Process Art)

বিংশ শতাব্দীর মধ্যপর্বের পরে পাশ্চাত্যের শিল্প জগতে নানা ধরনের প্রবণতা দেখা যায়। বহু ধরনের এই প্রবণতা তথা বহুত্ববাদী শিল্প ধারণা থেকেই প্রসেস আর্ট-এর উদ্ভব। এসবের মধ্যে অনেকগুলি শিল্পরীতির মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গিত পার্থক্যও খুব বেশি ছিল না। যেমন কনসেপচুয়াল আর্টের মূল কথা হল পরিকল্পনা এবং সিদ্ধান্ত। যা শিল্প নির্মাণের অনেক আগেই তৈরি হয়। রূপায়ণটা শুধুমাত্র করার জন্য করা। তেমনিভাবেই ভঙ্গিই (Attitudes) রূপে (Form) পরিণত হল ক্রিস বার্ডেন, ব্রুস নম্যান, ভিটো অ্যাকনাসি প্রমুখ আমেরিকান শিল্পীদের কাজে।

১৯৬০ এবং ১৯৭০-এ শিল্প নামক শব্দটাকে আরও বিস্তৃত করার চেষ্টা হল। এই সব শিল্প ধারণা সমকালীন শিল্পরীতি 'ফ্লাক্সাস', 'হ্যাপেনিং' প্রভৃতির স্বতঃস্ফূর্ততা, সমকালীনতা থেকে এই নতুন শিল্পরীতির বিশদ পরিকল্পনা এবং তার যথাযথ শৈল্পিক ক্রিয়ায় লক্ষ্যমুখ আলাদা। এক্ষেত্রে শিল্পীর কাছে হাতে গোনা কয়েকটি বস্তুর একটি ভাণ্ডার এবং তাঁর আয়ত্বে থাকে ভাবভঙ্গির কিছু রূপাদর্শ (Pattern)। এখানে সৃষ্টির প্রক্রিয়াটাই হল বিষয়। দর্শককে ডেকে আনা হয় তাঁদের সামনে রাখা নমুনা দেখে গোটা বিষয়টাকে পুনর্গঠিত করার জন্য। পূর্বোক্ত শিল্পীদের পাশাপাশি আরও যাঁরা এই রীতি নিয়ে চর্চা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে পরিচিত ছিলেন জার্মান পারফর্ম্যান্স আর্টিস্ট ফ্রাঞ্জ ওয়ালদার, ক্লজ রিলকে, আমেরিকান ইনস্টলেশন শিল্পী কেইথ সোনিয়ার প্রমুখ।

প্রাইমারি কালার
(Primary Colour)

রঙের (Paint) ক্ষেত্রে প্রাইমারি বা মূল রং তিনটি। লাল, নীল এবং হলুদ। কিন্তু আলোর ক্ষেত্রে মূল রং হল লাল, সবুজ এবং নীল। এমনটিই টেলিভিশনের পর্দায় তথা

সি আর টি-র ভেতরে থাকে যার ফলে আমরা বহুবর্ণরঞ্জিত ছবি দেখতে পাই। কিন্তু রঙে আঁকা ক্ষেত্রে লাল নীল এবং হলুদ মিশিয়েই সমস্ত রং তৈরি করা সম্ভব। *কালার হুইল দেখুন।

প্রাইমিং (Priming)
ধারক বা সাপোর্ট অর্থাৎ ক্যানভাস, কাঠের ফলক, দেয়াল ইত্যাদির ওপর চিত্রতল বা গ্রাউন্ড তৈরি করার জন্য যে আস্তরণ লাগানো হয় তা। যেমন সারফেসার, হোয়াইট ওয়াশ, জেসো, .প্রাইমার ইত্যাদি।

প্রিন্ট (Print)
শিল্পীর পরিকল্পনা অনুযায়ী তাঁর নিজের হাতে করা অথবা তাঁর নির্দেশে তৈরি কোনো ছবির প্রতিলিপি। আজকাল অনেক সময়ই আলগাভাবে যান্ত্রিক উপায়ে মেসিনে ছাপা কোনো প্রতিলিপির ক্ষেত্রেও, তা অফসেটেই হোক বা কপিয়ারেই তৈরি হোক, প্রিন্ট শব্দটি ব্যবহার করা হয়। কিন্তু এটা যথাযথ নয়। এক্ষেত্রে 'রিপ্রোডাকশন' শব্দটিই উপযুক্ত। সত্যিকারের প্রিন্ট কথাটির মধ্যে প্রতিটি প্রতিলিপিতে শিল্পীর সক্রিয় অংশগ্রহণের বিষয়টি যুক্ত। প্রিন্ট শব্দটির জোলো হয়ে যাওয়া বা বিভ্রান্তি এড়াতে এবং প্রিন্ট তৈরিতে শিল্পীর প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণকে সুনিশ্চিত ভাবে বোঝাতে অনেকে ওরিজিনাল প্রিন্ট শব্দটি ব্যবহার করেন।

প্রিন্ট তৈরির প্রক্রিয়ার মধ্যে কতকগুলো বিশেষ বিষয় আছে। যেমন প্রিন্টের সংস্করণ এবং সংখ্যা প্রিন্টের সংখ্যা সীমাবদ্ধ। ধরা যাক, কোনো একটি ছবির ১০০টি প্রিন্ট তোলা হল তাহলে সেই সংস্করণের আকার হল ১০০। সাধারণত শিল্পী এই ১০০টির প্রতিটিতে নম্বর দেন এইভাবে ১/১০০, ২/১০০ এবং সই করেন। এই নম্বর দেওয়া এবং সই করা হয় পেন্সিলে যাতে মনে না হয় যে এসব প্রিন্ট যান্ত্রিক উপায়ে করা হয়েছে।



নং ১৩৩. নন্দলাল বসুর : লিনোকাট। ১২.৪ X ৬.৪ সেমি।

তাছাড়া এই নম্বর এবং সই ক্রেতাদেরও কিছুটা আশ্বস্ত করে। সই করা এবং নম্বর দেওয়ার এই অভ্যাসই সর্বত্র গৃহীত হয়েছে। এর ফলে প্রিন্টগুলো শিল্পী নিজের হাতে করেছেন এটা প্রমাণ না হলেও একটি সংস্করণে কতগুলো প্রিন্ট হয়েছে তা গোচরে থাকে। ওপেন এডিশন বা মুক্ত সংস্করণ শব্দটির অর্থ হল প্রিন্টের সংখ্যা অনির্দিষ্ট। তাই এতে নম্বর দেওয়ার বিষয়টিও অর্থহীন।



নং ১৩৪ চিত্তপ্রসাদ মা ও শিশু। লিনোকাট। ১৯৫৬।

প্রিন্ট নেওয়ার পদ্ধতি প্রক্রিয়া চার ধরনের। এগুলি হল রিলিফ (উচ্চতল) প্রিন্টিং, ইনটালিয়ো (অধতল) প্রিন্টিং, সারফেস (সমতল) এবং স্টেন্সিল (ছিদ্রতল)। রিলিফ প্রিন্টিং-এ মুদ্রণতল অর্থাৎ যে তলে কালি লাগানো হবে তা ওপরে উঠে থাকে এবং অমুদ্রণ তল থাকে খাদে। কাঠ বা লিনোলিয়াম জাতীয় তলে অমুদ্রণ অংশ খোদাই করে ফেলে দিয়ে রেখে দেওয়া অংশ অর্থাৎ মুদ্রণ তলে কালি লাগিয়ে কাগজের ওপর প্রিন্ট নেওয়া হয়। ইনটালিয়োতে মুদ্রণ অংশ থাকে খাদে। ধাতব কোনো পাতে যেমন দস্তা তামা ইত্যাদিতে মুদ্রণ অংশ ক্ষয় করে সেই অধতলে বা খাদে কালি ঢুকিয়ে তারপর কাগজে ছাপ তোলা হয়। সারফেস প্রিন্টিং-এ মুদ্রণ এবং অমুদ্রণ অংশ একই তলে থাকে। সারফেস প্রিন্টিংকে প্লেনোগ্রাফিক প্রিন্টিংও বলা হয়। তেলে জলে মেশে না এই ধর্মকে কাজে লাগিয়ে অমুদ্রণ অংশে জল লাগানোর ব্যবস্থা করা হয় যাতে সেখানে তৈলাক্ত কালি না ধরে। পাথরের তলে এরকম একটি কৌশলী নকশা করে তারপর কাগজে ছাপ তোলা হয়। স্টেনসিল প্রিন্টিং-এ কাগজ, প্লাস্টিক শিট, নাইলন কাপড়ে নকশা অর্থাৎ মুদ্রণ অংশকে উন্মুক্ত বা বাধাহীন রেখে বাকি



নং ১৩৫. নন্দলাল বসু : লিনোকাট। ১২.৭ X ৭.৪ সেমি।

অংশকে বন্ধ করে দেওয়া হয় যাতে কালি পাস করতে না পারে। তারপর নকশার ভেতর থেকে মুদ্রণপৃষ্ঠে কালি পাঠানো হয়। রিলিফ প্রিন্টিং-এর উদাহরণ হল উডকাট, লিনোকাট, উড এনগ্রেভিং ইত্যাদি। ইনটালিয়োর উদাহরণ হল এচিং, ড্রাইপয়েন্ট, অ্যাকোয়াটিন্ট, মেজোটিন্ট ইত্যাদি। সারফেস প্রিন্টিং হল লিথোগ্রাফ। আর স্টেন্সিল হল স্ক্রিন প্রিন্টিং বা সেরিগ্রাফ।

প্রিমিটিভ আর্ট
(Primitive Art)

প্রিমিটিভ আর্ট কাকে বলা হবে বা এর লক্ষণ কী তা স্পষ্ট করে বলা কঠিন। কেউ কেউ একে 'নেভ আর্ট'(Naive Art)-এর সমার্থক বলে মনে করেন। কিন্তু তাও সঠিক নয় কেন-না নেভ আর্ট হল সেই শিল্প যা আধুনিক সমাজের শিল্পীরা ইচ্ছাকৃত ভাবে বা অজ্ঞানতাবশত প্রচলিত কৌশল ও দক্ষতাকে পরিত্যাগ করে রচনা করেন। এক্ষেত্রে 'ব্রিটানিকা এনসাইক্লোপিডিয়া অব ভিশুয়াল আর্ট'-এর ব্যাখ্যা হল—'art of prehistoric culture' বা এনসাইক্লোপিডিয়া অব ব্রিটানিকার ব্যাখ্যা হল—'The work of prehistorical and preliterate peoples' তবে বেশিরভাগ ব্যাখ্যাকার মনে করেন প্রিমিটিভ আর্ট খুবই সরল এবং সৎ। প্রিমিটিভ শিল্পীরা তাঁদের শিল্পের বিষয়বস্তুকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে প্রশিক্ষিত দক্ষতা এবং কৌশল দিয়ে ঢেকে ফেলেননি। অর্থাৎ প্রিমিটিভ যুগের শিল্পীরা প্রকৃতি বা বিষয়কে যেমন দেখেছেন তেমনটি আঁকার চেষ্টা করেছেন, কোনো শিল্পশাস্ত্রবিধি প্রয়োগ করেননি। অবশ্য বর্তমানে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই 'প্রিমিটিভ আর্ট' এবং 'নেভ আর্ট' উভয়কেই অপ্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তির সৃষ্ট শিল্প বলে মনে করা হয়।

প্রিমিটিভিজ্‌ম
(Primitivism)

প্রাগৈতিহাসিক যুগের শিল্প লক্ষণকে গ্রহণ করে ভেবেচিন্তে এবং স্বেচ্ছায় সমকালীন শিল্পে প্রয়োগের

প্রিমিটিভিজ্‌ম আধুনিক শিল্পকলার অনুপ্রেরণার অন্যতম আধার যা আদিম উপজাতিদের শিল্পরূপ ও জাদু বিশ্বাস এবং প্রাচীন আর্কেইক শিল্পরীতিতে প্রত্যাবর্তন। বস্তুত প্রিমিটিভিজ্‌ম ছিল ধ্রুপদি ক্ল্যাসিকাল আকাদেমিক শিল্পের আদর্শ হিসাবে চাপিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে একটা আন্দোলন। 'প্রিমিটিভিজ্‌ম' শিল্পে আদিম ও বিশুদ্ধতা, অতিকথন ও জাদুবিশ্বাসের রোমান্টিক আকাঙ্ক্ষাকে পূরণ করেছিল। ছবিতে আদিম শিল্পরূপের শ্রেষ্ঠ প্রয়োগের প্রথম কৃতিত্ব বলা

যেতে পারে পল গগাঁর। ১৯১২ রাশিয়ান শিল্পী ডেভিড বারলিউক 'ব্লু' রাইডার'-এর বর্ষপঞ্জিতে ঘোষণা করেন যে আকাদেমিবাদের নিগড় ভেঙে শিল্পকে মুক্ত করার হাতিয়ার হতে পারে 'বারবারিক আর্ট'। এই ভাবনা প্রকৃত অর্থে পশ্চাদগামিতা নয় বরং বলা যায় যে পশ্চিমী চিন্তার এবং শিল্পের ছক থেকে শিল্পকে মুক্তি দেওয়া। আধুনিক শিল্পের বহু আন্দোলনেরই প্রেরণা এসেছে আফ্রিকার উপজাতি শিল্প, ওশেনিক মুখোশ এবং ভাস্কর্য থেকে।

১৯০৫ সালের এরই প্রভাবে যে আভঁ গার্দ আন্দোলন গড়ে উঠেছিল তার ধারণা এসেছিল রাশিয়ান লোকশিল্প এবং আইকন থেকে। সেই আন্দোলনের সঙ্গে যাঁরা যুক্ত ছিলেন তাঁদের মধ্যে ডেভিড বারলিউক ছাড়াও সুপরিচিত ছিলেন ল্যারিয়োনোভ, গনচারোভা, এবং তরুণ মালেভিচ সুপরিচিত।

প্রি র‍্যাফেলাইট (Pre Raphaelites)

১৮৪৮ সালে একদল ইংরেজ শিল্পী এই নামে একটি গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠা করেন। আকারে ছোটো হলেও এই গোষ্ঠী খুবই প্রভাবশালী ছিল। বিখ্যাত ইতালীয় শিল্পী র‍্যাফায়েলের (১৪৮৩-১৫২০) পূর্ববর্তী সময়ের শিল্পীদের মতো সরল ও নৈতিক বিষয়বস্তুকে পুনরাধিকারের লক্ষ্যেই তাঁদের এই প্রচেষ্টা। এই আন্দোলন ছিল রোমান্টিক মধ্যযুগীয় ভাবধারা এবং প্রকৃতির বাস্তববাদী অঙ্কন শৈলীতে ফিরে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা এই দুইয়ের মিশ্রণ। তাঁরা ব্রিটিশ আকাদেমি রীতির নিস্ফলা ঐতিহ্য এবং প্রচলিত মামুলি জঁর পেন্টিংকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেছিলেন। এই লক্ষ্যই আন্তরিকভাবে তাঁদের ছবিকে নৈতিক এবং নান্দনিক মূল্যসম্পন্ন করে তোলে। এই শিল্পীদের ছবিতে প্রকৃতির উপস্থাপনার পাশাপাশি বিশদ বর্ণনার দিকেও সতর্ক দৃষ্টি ছিল। রঙের বিশুদ্ধ দীপ্তিকে ফুটিয়ে তুলতে তাঁরা সাদা ক্যানভাসে ছবি আঁকতেন। গোষ্ঠীর সদস্যরা তাদের প্রির‍্যাফেলাইট ব্রাদারহুড নামে ডাকতেন। এঁদের মধ্যে তিনজন ছিলেন রয়্যাল আকাদেমির ছাত্র। এরা হলেন—দান্তে গেব্রিয়েল রোসেটি, উইলিয়াম হলম্যান হান্ট, স্যার জন এভরেট মিলাইস। বাকি সদস্যরা ছিলেন—থমাস উলনার, জেমস কলিনসন, সমালোচক এফ. এফ. স্টিফেনস এবং শিল্পী রোসেটির ভাই ডব্লিউ. এম. রোসেটি। প্রথম প্রদর্শনীতে এঁরা ছবিতে নাম না লিখে

শুধু PRB সই করেছিলেন। তাঁদের পরিচয় প্রকাশ হবার পর চার্লস ডিকেন্স সহ বিভিন্ন সমালোচক তাঁদের ছবিতে ধর্মীয় বিষয়ের অমূলক ব্যবহারের সমালোচনা করেন। কিন্তু রাস্কিনের প্রশংসার ফলে এঁরা জনপ্রিয়তা এবং বহু পৃষ্ঠপোষক লাভ করেন। আলংকারিক শিল্পের ওপরে এই গোষ্ঠীর ভালো প্রভাব ছিল। এই শিল্পীরা নানা ধরনের সজ্জাদ্রব্য যেমন রঙিন আসবাবপত্র, ট্যাপেস্ট্রি (ঢাকনা), স্টেইন্ড গ্লাস, কাপড় এবং ওয়ালপেপার নিয়ে কাজ করেছেন এবং যা 'আর্ট অ্যান্ড ক্রাফ্ট মুভমেন্ট'কে প্রেরণা দিয়েছিল। ১৮৫৪ সালে এই গোষ্ঠী ভেঙে যায়।

প্রিহিস্টোরিক আর্ট (Prehistoric Art)

প্রিহিস্টোরিক বা প্রাগৈতিহাসিক যুগ কাকে বলা হবে এ নিয়ে একটা বিতর্ক উঠতেই পারে। কেন-না ইতিহাস যেমন চরিত্রের দিক থেকে প্রসারণশীল তেমনি মানুষ যেদিন থেকেই কিছু না কিছু তৈরি করেছে তাই ইতিহাসের নথি বা স্বাক্ষরে পরিণত হয়েছে। তবুও ধরেই নেওয়া হয় এ একটা বিরাট যুগ। যা বলা যেতে পারে শেষ হয়েছিল ইজিপ্ট, মেসোপটেমিয়া, ক্রিট এবং সিন্ধুসভ্যতায় গিয়ে। মানুষ আপন খেয়ালেই ইতিহাসের সেই উপাদান রেখে গেছে পাহাড়ের গায়ে, গুহাচিত্রে, কোনো মূর্তি বা কোনো জিনিসপত্র তৈরির মাধ্যমে। এসবের মধ্য দিয়ে যেমন আদিম মানুষের জীবন ও পরিবেশের কথা জানা যায় তেমনি সেসবের মধ্য দিয়ে আমরা আদিম মানুষের সুকুমার বৃত্তি বা সৌন্দর্যবোধের কথাও উপলব্ধি করতে পারি।



নং ১৩৬. উইলেনডোর্ফ, অস্ট্রিয়া : দি ভেনাস অব উইলেনডোর্ফ। খ্রিস্টপূর্ব ৩০০০০ - ২৫০০০।

পণ্ডিতগণের মতে মানুষের সৃষ্ট প্রথম শিল্প হল ভাস্কর্য। চুনাপাথরে তৈরি সেই যুগের একটি নারীমূর্তি পাওয়া গেছে যার নাম 'ভেনাস' অব উইলেনডর্ফ। পৃথিবীর নানা জায়গা থেকে প্রাপ্ত প্রাগৈতিহাসিক যুগের শিল্পকলার মধ্যে একটি সাধারণ রূপ দেখতে পাওয়া যায় যা একই সঙ্গে সরল এবং বলিষ্ঠ। প্রস্তর যুগের চিত্রশিল্পকে বলা হয় 'ফ্রাঙ্কো ক্যান্টব্রিয়ান'। এর দেখা মেলে উত্তর আফ্রিকা, উত্তর স্পেন এবং ফ্রান্সে। স্পেনের আলতামিরা গুহাচিত্র আবিষ্কৃত হয় ১৮৭৯ সালে। যা প্রায় ১৩০০০ হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দের বলে ধারণা করা হয়। এই চিত্রের পদ্ধতি পলিক্রোম্যাটিক নামে সাব্যস্ত। যা পাহাড়ের গা খোদাই করে মাটি লেপে, রং করে তৈরি। রংও মাত্র তিনটে-চারটে। সাদা, হলুদ, খয়েরি এবং কালো।

ভিজে মাটিতে এঁকেছেন শিল্পী আর পরিচয় হিসাবে(?) হাতের ছাপ। ফ্রান্সে আবিষ্কার হল 'লাসকো'। যা আলতামিরার চেয়ে আর একটু প্রবীণ। ১৫০০০ খ্রিস্ট-পূর্বাব্দের মতো। পণ্ডিতগণ বলছেন পশুকূল ধ্বংস হয়ে যাওয়ার বিরুদ্ধে সতর্কবার্তা দিতেই এই ছবি আঁকা হয়েছে গভীর সুড়ঙ্গের ভিতরে।

ক্যান্টব্রিয়ান সভ্যতার পাশাপাশি আর এক সভ্যতা উঠে এসেছিল যার নাম ক্যাস্পিয়ান সভ্যতা। আগের চেয়ে আরেকটু উন্নত। যাযাবর মানুষ ঘুরতে লাগল দেশ থেকে দেশে ঘোড়াকে পোষ মানিয়ে। পালটে গেল জীবনযাপন। বাড়ল শিল্পকলার ঝোঁক। কাঠ খোদাই, হাড়ের কারুকাজ, চামড়ার কাজ আরও কত কী! এই প্রাচ্যেই পুরোনো রীতির পাশাপাশি সৃষ্টি করল নতুন রীতি যেন এক্সরের মতো অন্তর্দৃষ্টি। এরই পথ ধরে বিমূর্ত রেখা প্রধান নকশা বহু দেশে ছড়িয়ে পড়ল।

প্রস্তর যুগের পর আসে ব্রোঞ্জ যুগ। আরও শিল্প, আরও নকশা। খ্রিস্টপূর্ব ১০০ সালে রোমান ও গল জাতির হাতে এর শুরু। ইজিয়ান শিল্পে ব্রোঞ্জে, শ্বেত পাথরে, দেয়ালে, উজ্জ্বল রঙে নকশায় ফুটে উঠল সৌন্দর্যের নতুন নতুন আঙ্গিক। দক্ষিণ আফ্রিকার বুশম্যান প্রতিকৃতি তথা স্যান হল পাথরের দেয়ালে প্রথম এনগ্রেভিং করা চিত্র। ৪০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের এই সৃষ্টি বিস্ময়কর। অবশ্য ভারতেও কেরালার ওয়াইনাড় জেলার এডাক্কেল গুহায় এরই প্রায় সমসাময়িক কালের রক কার্ভিং পাওয়া গেছে।

তেমনি পাঁচ হাজার বছর আগের গ্রিসে টেরাকোটা শিল্প যেভাবে বিকশিত হয়েছিল তাও ভাবার মতো বিষয়। টেরাকোটার তৈরি ছোটো একটা বাড়ির মডেল শিল্প রুচির অসামান্য নমুনা। পাঁচ হাজার বছর পরেও যার আঙ্গিককে অতিক্রম করা অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব হয়নি। আফ্রিকার মুখোশের ইতিহাস সুবিদিত। কিন্তু দু-হাজার বছর আগের যুগোশ্লাভিয়ার দক্ষিণাংশে প্রিডিয়োনিকায় টেরাকোটার যে মুখোশ তার শৈলীর নান্দনিক মূল্য কোন মাপকাঠিতে বিচার হবে? এই মুখোশে চোখগুলো আমন্ড্ বাদামের মতো তির্যকভাবে বসানো। মজার কথা হল ব্রোঞ্জের যুগ এসে এই শিল্পকে প্রাতিস্থাপিত করে ইতিহাসের যুগের অনেক আগেই।

অস্ট্রেলিয়ার চারপাশে পলিনেশিয়া, মেলানেশিয়া, মাইক্রোনিশিয়া সহ অনেক দ্বীপ। ভারত থেকেই এখানে এসেছিল পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন মানুষ। সেই প্রস্তরযুগের সভ্যতার চিহ্ন এখনো ওখানে আছে। এখানের পাথরের রং বেশি লাল তাই খোদাই করে বাদামি ও সাদা রঙে সে ছবির রূপদান। তবে গুণমানে হারিয়ে দিয়ে মেলানেশিয়া এগিয়ে গেছে অনেক দূর।

নিগ্রো ভাস্কর্যের বৈশিষ্ট্য হল মাথা বড়ো, পা ছোটো। চুলের কায়দা অতি সূক্ষ্ম সেই সঙ্গে মুখে ট্যাটু। আর এই শিল্পের উপাদান হাতির দাঁত এবং ব্রোঞ্জ। প্রাগৈতিহাসিক যুগের শিল্পকলার এই মহতী মিছিলে আছে আমাদের ভারতবর্ষও। তার সাক্ষ্য ছড়িয়ে পাহাড়ের গুহা থেকে জনপদে। মহেঞ্জোদারো হরপ্পারও অনেক আগে মধ্যপ্রদেশে হোসেঙ্গাবাদে পাথরের গায়ে সাদা-বাদামি রঙের ছবি এঁকেছিল প্রাচীন মানুষ সেই কোন কালে। কিংবা উত্তরপ্রদেশের মির্জাপুরে। বেশিরভাগই শিকারের দৃশ্য। কিন্তু আলতামিরা বা লাসকোর মতো আবহাওয়াকে জয় করতে পারেনি প্রাচীন ভারতের আদি পুরুষদের এই শিল্প। তার অনেকটাই অবলুপ্ত। তবু যা আছে ইতিহাসের হাতে তাও অনেক।

প্রুফ (Proof)

সাহিত্য মুদ্রণের ক্ষেত্রে প্রুফের ভূমিকার মতো প্রিন্ট বা ছাপ চিত্রের ক্ষেত্রেও প্রুফ-এর একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। প্রিন্টের ট্রায়াল প্রুফ অর্থাৎ পরীক্ষামূলক ছাপ নিয়ে শিল্পীকে দেখতে হয় ছবি বা নকশাটিতে আর কোনো সংশোধন, পরিবর্তন, সংযোজনের দরকার আছে কিনা।

প্রোপরশন (Proportion)

প্রোপরশন হল কোনো ছবি, ভাস্কর্য বা স্থাপত্যের বিভিন্ন অংশের মধ্যে বা কোনো অংশের সঙ্গে পূর্ণাঙ্গ বিষয়টির তুলনামলক সম্পর্ক এবং বিচার। প্রোপরশনের গুরুত্ব নিয়ে কেউই আপত্তি তোলেন না। যদিও আজকাল কেউ কেউ বলেন যে এটাকে বোধ এবং আবেগের ওপরই ছেড়ে দেওয়াই ভালো। তবে সবসময়ই এরকমটা বলেন তা নয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত পাশ্চাত্যের বেশির ভাগ শিল্পীই স্থপতি এবং কারিগরদের মতো তাদের ছবির প্রোপরশন ঠিক করতে জ্যামিতিক নির্দেশ গ্রহণ করতেন। অবশ্যই তা বিষয় অনুযায়ী। গাণিতিক ভাবে প্রোপরশনকে

দু-ভাগে ভাগ করা যায়। ১. হারমোনিয়াস প্রোপরশন, ২. ভ্যারিড প্রোপরশন।

প্রোফাইল (Profile)
অনেকগুলি অর্থে প্রোফাইল শব্দটি ব্যবহার করা হয়। কোনো মোল্ডিং বা ছাঁচের ছেদকে প্রোফাইল বলা হয়। কোনো একটি বিল্ডিং, ফার্নিচার বা ডেকরেটিভ বস্তুর রেখাচিত্র হল প্রোফাইল। শিল্পকলায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ-এর যে ব্যবহার তা হল পাশ থেকে দেখা কোনো মুখ।

প্লাস্টার (Plaster)
মূলত জিপসাম কিংবা চুনের সঙ্গে বালি এবং জল মিশিয়ে তৈরি মিশ্রণ। ফ্রেস্কো আঁকার গ্রাউন্ড তৈরির জন্য এই মিশ্রণ দিয়ে দেয়ালে বা সিলিং-এ অস্তর লাগানো হয়।

প্লাস্টার অব প্যারিস (Plaster of Paris)
এক ধরনের প্লাস্টার। তৈরি হয় শুষ্ক জিপসাম অর্থাৎ অ্যানহাইড্রাস ক্যালসিয়াম সালফেট থেকে। এটা খুবই মিহি এবং দ্রুত জমাট বাঁধে। ভাস্কর্য, ছাঁচ থেকে ছাপ তোলা এবং দেয়াল বা সিলিং-এ নানা অলংকরণের কাজে এই প্লাস্টার ব্যবহার করা হয়। ভাঙা হাড় জোড়ার কাজেও এই প্লাস্টার ব্যবহৃত হয়। প্যারিসের কাছে আবিষ্কার ও ব্যবহার থেকে এর এই নাম। যদিও প্রায় চার হাজার বছর আগে গ্রিকরা এর ব্যবহার করতেন।

প্লাস্টিক আর্ট (Plastic art)
ত্রিমাত্রিক শিল্প বিশেষ করে মডেলিং বা মূর্তিশিল্প। যেমন ভাস্কর্য, সিরামিকস অথবা কোনো ধরনের সলিড অবজেক্ট। এই প্রসঙ্গেই আসে আরও একটি শব্দ তা হল প্লাস্টিক কোয়ালিটি। এর অর্থ আমরা আমাদের চারপাশের জগতের বিভিন্ন বিষয় যেমন মানুষ, ঘরবাড়ি. গাছপালা ইত্যাদিকে ঠিক যেরকম দেখি সেইরকম অবয়ব ধর্ম। এটা ভাবমূর্তি গুণের বিপরীত।

প্লাস্টিসিটি (Plasticity)
পদার্থের কঠিন অথচ নমনীয় গুণ যাতে সেই পদার্থকে সহজেই কোনো আকার দেওয়া এবং তা দিয়ে কোনো রূপ তৈরি করা যায়।

প্লুরালিজ্‌ম (Pluralisim)
বহুত্ববাদ দেখুন।

প্লেক্সিগ্লাস (Plexiglass)
এটি যদিও একটি ব্র্যান্ডের নাম তবুও কাচের মতো স্বচ্ছ অ্যাক্রিলিক পদার্থ পলিমিথাইল মেথাক্রিলেট— এই নামেই বেশি পরিচিত। ছবি বাঁধাইয়ের কাজে এবং ভাস্কর্য গড়ার

এক ধরনের উপাদান হিসাবেও অনেক ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। বাজারে এর জেনেরিক নাম হিসাবে অ্যাক্রিলিক শিট শব্দটি প্রচলিত। কাঁচের সঙ্গে তুলনায় প্লেক্সিগ্লাস অভঙ্গুর এবং হালকাও ফ্রেমিং-এর কাজে প্লেক্সিগ্লাস ব্যবহারের কিছু অসুবিধে আছে। যেমন এই শিটে প্রচুর পরিমাণে স্থির বিদ্যুৎ (Statical Elcectricity) তৈরি হয় তাই এই শিট চারকোল বা প্যাস্টেলের ছবিতে ব্যবহার করা উচিত নয়। কেন-না চারকোল বা প্যাস্টেলের গুঁড়োকে এ ধরে নেবে। দ্বিতীয়ত কাচের চেয়ে অনেক তাড়াতাড়ি এর তলে আঁচড় ধরে। সাধারণ সব গ্লাসক্লিনার প্লেক্সিগ্লাসের পৃষ্ঠের ক্ষতি করে দেয়। তাই প্লেক্সিগ্লাস নির্দিষ্ট ক্লিনার দিয়ে বা মৃদু সাবান জল দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে। তৃতীয়ত খুব বড়ো ছবি প্লেক্সিগ্লাসে বাঁধানোয় অসুবিধে হয়। কারণ বেশি বড়ো হলে প্লেক্সিগ্লাস কাচের চেয়ে অনেক তাড়াতাড়ি বেঁকে যাবে।

প্লেক্সিগ্লাস অন্য কাজেও লাগানো যায়। যেমন কেউ কেউ একে সাপোর্ট হিসাবে ব্যবহার করেন। সেক্ষেত্রে প্লেক্সিগ্লাসের শিটের ওপর মিহি সিরিশ কাগজ দিয়ে ঘষে তার ওপর অ্যাক্রিলিক রঙে ছবি আঁকেন। তারপর রংকে ভেতরের দিকে রেখে বাঁধানো হয় যাতে বর্ণস্তরের ক্ষতি না হয়।

প্লেনোগ্রাফি (Planography)

প্রিন্ট দেখুন।



ফ

ফাভজ্‌ম (Fauvism)

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণেই ইম্প্রেশনিস্ট শিল্পরীতির উদ্ভব হয়। আর এর মধ্য দিয়ে আভঁ গার্দ আন্দোলনের দ্বার খুলে যায় এবং নতুন নতুন শিল্পআঙ্গিকের সৃষ্টি হতে শুরু করে। ১৯০৫ সালে ফ্রান্সের বিখ্যাত শিল্প প্রদর্শনী 'সালোঁ দ'তোন'-এ নতুন এক ধরনের আঙ্গিকের ছবি দেখে বিশিষ্ট ফরাসি শিল্প সমালোচক লুই ভোজেল বিংশ শতাব্দীর শিল্পকলায় প্রথম এক বিপ্লবের এই নামকরণ করে বসেন। 'ফভ' কথার অর্থ হল 'বন্যপশু'।

ভোজেল প্রদর্শনীতে গিয়ে দেখেন একটি ঘরের চার দেয়ালে জোরালো ও চড়া নানা রঙে আভাসিত-রূপের রীতিবহির্ভূত আঙ্গিকে আঁকা সব ছবি ঝোলানো। আর ঘরের মাঝখানে অ্যালবার্ট মারকুইর একটি ছোটো ব্রোঞ্জ ভাস্কর্য রাখা আছে। মাতিস, ভ্লামিঙ্ক, মার্কেট, দর্ঁ্যা, ম্যাঙ্গুইন, রাওয়াল্ট প্রমুখের ওই ধরনের ছবির মাঝখানে একটি ছোটো ভাস্কর্য দেখে ভোজেল ব্যঙ্গ করে বলে উঠেছিলেন 'Ah, donatello au milieu des fauves' (ah donatello caged among the wild beasts') এই কথার সত্যতার ওপরে দাঁড়িয়ে বলা যায় যে সমালোচক ভোজেল-এর উক্তি থেকে ইউরোপের শক্তিশালী এক শিল্প আন্দোলনের নামকরণ হয়েছিল। তা হল 'ফভিজ্‌ম'। ভোজেল কিউবিজ্‌মেরও নামকরণ করেছিলেন। ঘটনা হল যে ভোজেলের এই কৌতুকপূর্ণ মন্তব্য সেই দিন সন্ধ্যার খবরের কাগজে সালোঁর সমালোচনার অংশ হয়ে প্রকাশিত হয় এবং ওই ছোট্টো গ্রুপটির নাম হয়ে যায় 'ফভস'। 'ফভিজ্‌ম'কে শিল্পকলায় 'সহিংস বিপ্লব' বলা হয়। যদি তা হয় তাহলে অবশ্যই সে লড়াই করেছিল আগেকার নিয়ম, রীতি এবং



নং ১৩৭. মাতিস : দি জিপসি। ১৯০৫-১৯০৬। ৫৫ X ৪৬ সেমি। তেল রং। আরও ছবি নং ২১৮ পৃ. ৩৮৬

ঐতিহ্যের বিধিনিষেধ থেকে শিল্পীদের মুক্ত করার জন্য। যা শিল্পীদের রঙের স্বাধীন ব্যবহারের ক্ষেত্রে অন্যতম বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

Pure colour ছিল ফভিস্টদের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। স্বভাবতই 'ফভিজ্‌ম' ছিল বিংশ শতাব্দীর প্রথম আভঁ গার্দ প্রচেষ্টা। এর পেছনে কোনো আদর্শগত ভিত্তি বা ইস্তাহার ছিল না যার মধ্য দিয়ে ফভিস্ট বিশ্বাস গড়ে উঠতে পারে। আসলে কিছু ব্যতিক্রমী শিল্পী-ব্যক্তিত্ব সঠিক সময়ে একত্র হয়েছিলেন এবং তাঁদের সৃজনশীল চর্চার একটা নির্দিষ্ট পর্বে এসে আকাদেমিক রীতিকে ভাঙার একইরকম উপায় খুঁজে পেয়েছিলেন। এই তাৎক্ষণিকতা এবং কেন্দ্রীয়ভাবে কোনো আদর্শ না থাকাটাই যে তাঁদের গোষ্ঠী কর্মকাণ্ডের স্বল্প স্থায়িত্বের কারণ তা বোঝা যায়। ফভিস্টদের কর্মকাণ্ড টিকে ছিল ১৯০৫ থেকে ১৯০৭ সাল পর্যন্ত। ফলত ১৯০৭ সালের পরেই এই গোষ্ঠীর শিল্পীরা সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন পথে যাত্রা করেছিলেন। যেমন মাতিসের সূর্যের সঙ্গে ভালোবাসার সম্পর্ক থেকে ব্রাকের বুদ্ধিদীপ্ত রেখার বিস্ময়কর গীতিধর্মিতা। কিংবা ডাফির আলংকারিক ও কাব্যিক ক্যালিগ্রাফি থেকে ভ্লামিঙ্কের নাটকীয় হিংসা অথবা ভ্যান ডনজেনের বিশ্বময়তা থেকে দর্‍্যাঁর শ্রেষ্ঠ ধ্রুপদিতত্ত্ব পর্যন্ত। তবে যাই হোক না কেন শেষ পর্যন্ত ফভিজ্‌ম অবশ্যই একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আন্দোলন যা প্রকৃতিকে অনুকরণ করার যে কোনোরকম বাধ্যবাধকতা থেকে সৃজনশীল ভাবনাকে মুক্ত করার দিকে একটা বিরাট পদক্ষেপ। এটা ঠিক যে আগেকার সব অভিজ্ঞতাকে ভেঙে বেরিয়ে আসার আকাঙ্ক্ষাই ছিল ফভিস্টদের শক্তি। আবার এটাও ঠিক যে প্রচলিত রীতি ভেঙে ফেলার এই যে জোর তা অবশ্যই সুরা, সেজান, ভ্যানগঘ, গগাঁর প্রথা ভাঙার উদ্ভাবন ছাড়া সম্ভব হত না। তাই একথা ঠিক যে ফভিজ্‌ম ভ্যানগঘ এবং গগাঁর বিশেষ করে প্রাধান্যমূলক রং এবং আগুনের শিখার সুলভ তুলির টান ইত্যাদির কাছে ঋণী। আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল এই যে, শিল্পীদের আজকের পৃথিবী এত মূল্য দেয় সে সময়ে তার ঠিক উলটোই ঘটত। কিছু বিস্মৃতপ্রায় রীতিবাদী এবং আকাদেমিসিয়ানরাই সরকারি সালোঁগুলোতে তাঁদের ছবির প্রদর্শনী করতেন। একমাত্র তাদের ছবিই বেশি দামে বিক্রি হত এবং খবরের কাগজে তাঁদের অনুকূলে ভালো

রিভিউও ছাপা হত। সেজান, ভ্যানগঘ, গগাঁ এঁদের কার্যত কেউই চিনত না এমনকি সমালোচক বা ছবির ডিলারও তাঁদের প্রশংসা করতেন না। বিংশ শতাব্দীর শুরুতেও ইম্প্রেশনিস্ট শিল্পীদের অবিশ্বাসের চোখেই দেখা হত। এমনকি ১৮৯৪ সালের শেষের দিকে প্যারিসের ল্যুভ্র্ মিউজিয়াম ইম্প্রেশনিস্টদের একগুচ্ছ কাজকে অবজ্ঞার সঙ্গে ফিরিয়ে দিয়েছিল। সমকালীন সময়ের জনরুচির মধ্যে প্রতিফলিত যে, বুর্জোয়া মূল্যবোধ উদ্ভাবন করাকে ভয় পায়। আভঁ গার্দ শিল্পী যাঁরা দুঃসাহসিকতার সঙ্গে প্রকাশের একটা নতুন উপায় খুঁজছিলেন তার সঙ্গে বুর্জোয়া মূল্যবোধের যে ফারাক তা এই সব ঘটনা স্পষ্টভাবে দেখিয়ে দেয়। ১৯০৫ সালের প্রদর্শনীতে উপস্থাপিত ছবিগুলির মধ্যে অপরিহার্য ছবিটি হল মাতিসের আঁকা 'ওম্যান উইথ এ হ্যাট'। এটি ছিল মাতিসের স্ত্রীর একটি প্রতিকৃতি। এর চড়া ও অস্বাভাবিক রং এবং আপাত উত্তেজনাকর তুলির ব্যবহার, সব মিলে এই ছবিটি সাড়া ফেলেছিল। বিশেষ করে বিকৃতিমূলক কোনো রীতির জন্য একজন চেনা নারী চরিত্রকে ব্যবহার করা হয়েছিল বলে। সবটা না বুঝেও দর্শক, সমালোচক, ডিলাররা ফভিস্টদের ছবি সম্পর্কে খুব উৎসাহিত হয়ে ওঠেন এবং বাজারে হঠাৎ ফভিস্টদের ছবির চাহিদার সৃষ্টি হয়। তবুও ১৯০৭ সালের মধ্যে এই রীতির বেশিরভাগ শিল্পী সমকালীন বিভিন্ন ধারার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। অথচ 'কিং অব দি ফভ্স' খ্যাত মাতিস কিন্তু এক অর্থে 'ফভ'ই থেকে যান।

ফর্ম
(Form)

সাধারণভাবে 'ফর্ম' বলতে কোনো বস্তুর ত্রিমাত্রিক বৈশিষ্ট্য যথা দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং গভীরতা বোঝায়। দ্বিমাত্রিক বস্তুর ক্ষেত্রে যা বোঝানো হয় 'শেপ' শব্দ দিয়ে। কিন্তু শিল্পকলার ক্ষেত্রে এই ব্যাখ্যা পর্যাপ্ত নয়। সীমাবদ্ধ অর্থে এটা চলতে পারে। কেন-না 'ফর্ম' শব্দটার গভীরতা অনেক। শুধুমাত্র আকার বা রূপ দিয়ে 'ফর্ম'-এর অর্থ ধরা যায় না। 'ফর্ম'-এর বৈশিষ্ট্য বোঝাতে বাংলাতে আঙ্গিক শব্দটিকেও ব্যবহার করা হয়। সামগ্রিকভাবে 'ফর্ম' হল কোনো শিল্পকর্মের অঙ্গ-বৈশিষ্ট বা মূল গঠন যা বিষয় বা কনটেন্ট-এর ঠিক বিপরীত। এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে বৃহত্তর অর্থে বিষয়, ভাব ও তার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী প্রকাশের ফর্মও আলাদা আলাদা।

সেই অর্থে কবিতা, ছোটোগল্প, উপন্যাস, নাটক, সংগীত, চিত্রকলা, ভাস্কর্য ইত্যাদি এক একটি 'ফর্ম'। কবিতায় প্রকাশযোগ্য ভাব বা বিষয় যেমন ছবিতে সচরাচর প্রকাশ করা যায় না। তেমনি ছোটোগল্পের উপযুক্ত বিষয় কবিতায় প্রকাশ করতে গেলে তাঁর চরিত্রই বদলে যাবে। এগুলো হল চরিত্রগত ফর্ম বা আঙ্গিক। কিন্তু শিল্পকলায় যে ফর্মের কথা বলা হয় তা হল চেহরা বা রূপগত আঙ্গিক।

দার্শনিক প্লেটো আপেক্ষিক (reletive) এবং বিশুদ্ধ (Absolute) এই দু-ধরনের ফর্মের কথা বলেছেন। আপেক্ষিক ফর্ম বলতে বোঝায় যা প্রকৃতির সহজাত রূপ এবং সজীব বস্তুর অনুকরণ। আর বিশুদ্ধ ফর্ম হল যন্ত্র, স্কেল, সমকোণ ইত্যাদির সাহায্যে তৈরি সোজা বা বাঁকা রেখা, কোনো পৃষ্ঠদেশ বা আকৃতি যা কোনো কিছুর সঙ্গে তুল্যমূল্যভাবে সদৃশ নয়, সম্পূর্ণ মৌলিক একটি ধরন বা রূপ। স্বভাবতই ফর্ম সাদৃশ্যমূলক হতে পারে আবার বিমূর্তধর্মীও হতে পারে।

ফর্মালিজ্‌ম (Formalism) ব্যাপকার্থে আঙ্গিক সর্বস্ব শিল্প। যেখানে বিষয়ের চেয়ে ফর্মকেই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। অর্থাৎ শিল্পকর্মে নানা রূপগত মান, জ্যামিতিক 'নিয়ম', রং লাগানোর কায়দাকানুন, প্রকরণ, কৌশল ইত্যাদিই প্রধান হয়ে ওঠে। আঙ্গিকবাদ বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বিমূর্তরীতির শরিক।

ফাইন আর্টস (Fine arts) সুন্দর, অনুপযোগীমূলক রূপকৃতি তথা চিত্র, ভাস্কর্য, প্রিন্ট, স্থাপত্য ইত্যাদিকে ফাইন আর্টস বা ললিতকলা বলা যায়। সাহিত্য এবং পারফর্মিং আর্টের ক্ষেত্রেও এই শব্দ ব্যবহৃত হয়। স্থাপত্যের ক্ষেত্রে বলা যায় যে স্থাপত্যের শুধুমাত্র নকশা ললিতকলার অন্তর্গত। কাঠামো তৈরিটা নয়। একই কারণে তথাকথিত বাণিজ্যিক কলা বা কমার্শিয়াল আর্টকে ফাইন আর্ট বলা হয় না কেন-না তা ব্যবসা অর্থাৎ পণ্য বিক্রয়ের লক্ষ্যেই তৈরি হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে অনেকে একটা প্রশ্ন তোলেন, তা হল অনেক সময় শিল্পীরাও বিক্রির উদ্দেশ্যে যে ছবি, ভাস্কর্য, প্রিন্ট তৈরি করেন তাকে কী বলা হবে? ইলাস্ট্রেশন বা অলংকরণকে অনেকে ফাইন আর্টের অন্তর্ভুক্ত করতে চান না। এর মধ্যেও জোরালো যুক্তি নেই। কেন-না যদি শিল্পকর্মে সৌন্দর্যসৃষ্টি সহ ললিতকলার অন্যতম

অন্যান্য শর্ত ও বৈশিষ্ট্য বজায় থাকে তাহলে ইলাস্ট্রেশনও ফাইন আর্টস হয়ে উঠতে পারে।

তবে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যপর্বের পরে অ্যাপ্লায়েড আর্ট আর ফাইন আর্টের মধ্যে পরিষ্কার বিভাজন ঘটেছে।

ফাউন্ড অবজেক্ট
(Found object)

পেয়ে যাওয়া এবং বেছে নেওয়া যে বস্তুর সাথে নতুন কিছু যুক্ত করে বা তার কোনো পরিবর্তন না ঘটিয়ে যাকে শিল্পবস্তু হিসাবে উপস্থাপিত করা হয়। দাদাবাদী ও সুরিয়ালিস্টরা এই ধারণার উদ্ভব ঘটান। এই সব বস্তু প্রাকৃতিক কোনো জিনিস যেমন— শামুক, পাথর, গাছের ডাল বা তৈরিকরা সামগ্রী যাকে 'রেডিমেড' বলা হয় তাও হতে পারে। এর সঙ্গে ফরাসি 'ওবজে ত্রুভে'-এর সাদৃশ্য আছে।

ফাঙ্ক আর্ট
(Func Art)

এই ধারা গড়ে উঠেছিল ক্যালিফোরনিয়ায় বিশেষ করে সানফ্রানসিসকো অঞ্চলে। মার্কিন কথ্য ভাষায় ফাঙ্কি (Funky) শব্দটি একটি বিশেষণ যার অর্থ হল 'দুর্গন্ধময়'। ১৯৫০-এর শেষ দিকে একদল শিল্পীকে 'ফাঙ্কি' নামে ডাকা হত। এঁরা এঁদের শিল্পের মাধ্যমে সমাজের নানা অবক্ষয়, অন্যায় ও বিচ্যুতিকে বিদ্ধ করার চেষ্টা করেছিলেন। সেই সঙ্গে এঁদের উদ্দেশ্য ছিল সমকালীন বিমূর্ত অভিব্যক্তিবাদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা। ফাঙ্ক আর্টিস্টরা সমকালীন শিল্পচর্চায় সামাজিক দায়বদ্ধতা, বাস্তববাদী বিধানকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এজন্য তাঁরা শিল্পকর্মে Shock দেওয়ার মতো একটি আঙ্গিকের প্রয়োগ ঘটিয়েছিলেন যার মধ্য দিয়ে হিংসা, গর্ভপাত, মৃত্যুদণ্ড, বার্ধক্য, পরমাণু যুদ্ধ, যুদ্ধ ব্যবসা, নারীত্বের অবমাননা ইত্যাদি বিষয়গুলিকে আলোয় আনতে চেষ্টা করেছিলেন। উপাদান হিসাবে এই শিল্পকর্মে ব্যবহার করা হত ভয়ঙ্কর এবং অস্বাভাবিক সব বস্তু যেমন হাড়, করোটি, মাংসের টুকরো, পুতুলের অঙ্গ, শুকনো প্রাণীদেহ এবং পরিত্যক্ত জিনিসপত্র। গোড়ায় এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ব্রুস কর্নার, জর্জ হারমস্, এড ক্লেইনহোলজ প্রমুখ। পরে যুক্ত হন পল থেক, লুকাস সামারাস, ব্রিটিশ শিল্পী কলিন সেলফ প্রমুখ। ফ্রাঙ্ক আর্টের ওপরে নিও দাদা, পপ আর্ট, বিট আর্ট প্রভৃতির প্রভাব ছিল। কর্নারের তৈরি ফাটাছেঁড়া কাপড়, ভাঙা আসবাবপত্র, ভাঙা সস্তা গহনা ইত্যাদি দিয়ে তৈরি অ্যাসেমব্লেজ 'ব্ল্যাক ডালিয়া' এবং 'দি চাইল্ড'

যথাক্রমে অভিনেত্রী এলিজাবেথ মার্ট এবং শিশুর প্রতি পিতামাতার অবহেলার ছবি। তবে এটা তৈরি কম্বল এবং নোংরা জিনিসপত্র দিয়ে। রবার্ট আর্নেসন, উইলিয়ম টি. উইলে, ভিয়োলে ফ্রে প্রমুখ আরও কিছু শিল্পীর কাজকেও ফাঙ্ক আর্ট বলে চিহ্নিত করা হয় যা কিছুটা কম উগ্র এবং ব্যাঙ্গাত্মক। কিছু তরুণ ব্রিটিশ শিল্পী যথা জেক এবং ডিনোস চ্যাপম্যান, ডেমিয়েন হার্স্ট প্রমুখরাও মানুষের প্রতি মানুষের অমানবিক আচরণ মৃত্যু ইত্যাদিকে নিয়ে ভয়ঙ্কর এবং উদ্ভট কিছু অ্যাসেমব্লেজ তৈরি করেছিলেন। এসবের মধ্যে চ্যাপম্যান ভাইদের 'হেল', হার্স্টস-এর 'থাউজেন্ড ইয়ারস' উল্লেখযোগ্য।

ফাংশনালিজ্‌ম (Functionalim)

'Form follows function' (উপযোগিতা ভিত্তিক আঙ্গিক)-এর এই তত্ত্বের ধারণা অষ্টাদশ শতাব্দীর অভিজ্ঞতাবাদী দর্শনের মধ্যে। তবে উনবিংশ শতাব্দীর শেষে আমেরিকান স্থাপতি লুই সুলিভান এই মতবাদ আনুষ্ঠানিক ভাবে ব্যক্ত করেন। এই তত্ত্ব অনুযায়ী কোনো বস্তু বা বাড়ির রূপ (Form) এবং কাঠামো (Structure) তার উপযোগিতার ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে। প্রাথমিকভাবে বিংশ শতাব্দীর প্রথামার্ধে এই তত্ত্ব শুধুমাত্র স্থাপত্যেই ব্যবহৃত হয়েছিল।

ফিউচারিজ্‌ম (Futurism)

বিখ্যাত ইতালীয় কবি এবং প্রচারক ফিলিপ্পো টমাসো মেরিনেত্তি ১৯০৯ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি প্যারিসের সংবাদপত্র 'লা ফিগারো'-তে এক ইস্তাহার প্রকাশ করেন, যার ভাষা ছিল লক্ষ করার মতো। 'It is from Italy we now establish Futurism with this manifesto of overwhelming and burning violence, because we free this country trom its fetid gangrene of professors, archaeologists, antiquarians and rhetoricians.' (ইতালিতে আমরা এখন অদম্য এবং জ্বলন্ত হিংসার সাথে ফিউচারিজ্‌ম প্রতিষ্ঠা করছি। কারণ আমরা এর পূতিগন্ধময় পচনশীল অধ্যাপক, প্রত্নতাত্ত্বিক, পুরা সংগ্রাহক এবং অলংকার শাস্ত্রীদের হাত থেকে দেশটাকে মুক্ত করতে চাই) এই ইস্তাহারে ১১ দফা কর্মসূচির কথা ঘোষণা করা হয়েছিল। যার নয় নম্বর পয়েন্টে বলা হয়েছিল, 'We will glorify war – the only true hygiene of the world – militarism, patriotism, the destructive gesture of the anarchist, the

নং ১৩৮. কার্লো কারা : প্যাট্রিয়টিক সেলিব্রেশন। ১৯১৪। কাপড়ে বাঁধানো কাঠের ওপর প্যাস্টেল পেপার ও নিউজ প্রিন্ট। ৩৪.৭ X ৩০.৫ সেমি।
আরও ছবি ১৭৭ পৃ. ৩৬২

beautiful ideas which kill and the scorn of woman.' (Quotation from 'Art in the modern era by Any Dempsey, Harry N. Abrams Inc.) (পৃথিবীর একমাত্র সত্য স্বাস্থ্যবিধি—যুদ্ধসহ সামরিকতাবাদ, দেশপ্রেম, নৈরাজ্যবাদীদের ধ্বংসত্মক ক্রিয়াকর্ম, সেইসব সুন্দর আদর্শ যা হত্যা করে এবং নারীদের ঘৃণা করে তাকে আমরা মহিমান্বিত করব।)

আর দশ নং পয়েন্টে বলা হল—'আমরা মিউজিয়াম, গ্রন্থাগার ধ্বংস করব, স্বাভাবিকতা, নারীবাদ এবং উপযোগিতাবাদী ভীরুতার বিরুদ্ধে লড়াই করব' (ওই) প্রাথমিকভাবে এই আন্দোলন সাহিত্য সংস্কার দিয়ে শুরু হলেও পরে অন্যান্য বিভাগগুলিও এর অন্তর্ভুক্ত হয়। এবং বিভিন্ন বিভাগের জন্য আলাদা আলাদা ঘোষণাপত্র প্রকাশ করা হয়। এভাবে ১৯১০ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি ফিউচারিস্টদের ঘোষণাপত্র 'Manifesto of Futurist Painters' প্রকাশিত হয়। এর ঠিক পরেই ওই বছরে ১১ এপ্রিলে প্রকাশ করা হয় 'Futurist Painting : Technical Manifesto'. যার মূল কথা পুরোনো সব মহৎ বিষয় ভেঙে যন্ত্র ও গতির যুগের পরিস্থিতিকে ভিত্তি করে সব

নতুন করে গড়তে হবে। যা হবে 'based on the Myth of the motor car and velocity' (Loredane Parmesani)

স্বভাবতই এঁদের কাজের মধ্যে মানবিক ও সুকুমার বৃত্তির চেয়ে যান্ত্রিক ও আঙ্গিকবাদী উপাদান তথা বিমূর্ত বিষয়েরই প্রাধান্য ছিল। এঁদের কাজের প্রথম সূচনা ১৯১১ সালে মিলানের প্রদর্শনীতে। ১৯১২ সালে প্যারিসে ফিউচারিস্টদের বড়ো মাপের প্রদর্শনীর পরে ফিউচারিজ্‌ম ও তার তত্ত্ব সারা ইউরোপে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। তবে ফিউচারিস্ট শিল্পীরা সমকালীন প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন আঙ্গিক থেকেও প্রাণিত হয়ে ছিলেন। তার মধ্যে যেমন কিউবিজ্‌ম ছিল তেমনি জিয়োকোমো বালার বর্ণতত্ত্বও ছিল। বালা অবশ্য ১৯১০ সালের ঘোষণাপত্রের অন্যতম স্বাক্ষরকারী ছিলেন। বালার ছাত্র ফিউচারিস্ট বোসিয়োনি আলোর বিমূর্ত ফলক ব্যবহার করার চেষ্টা করেছিলেন। এই রীতির সঙ্গে উল্লেখযোগ্য আরও যাঁরা যুক্ত ছিলেন তাঁরা হলেন জিনো সেভারিনি, কার্লো কার‍্যা, লুইজি রুসোলো (ইনি ঘোষণাপত্র রচনার মুখ্য ভূমিকায় ছিলেন)। রাজনীতিগতভাবে ফিউচারিস্টরা অত্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির ঘনিষ্ঠ ছিলেন। যেমন মেরিনেত্তি মুসোলিনির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব বজায় রাখতেন। যুদ্ধের পক্ষে তাঁরা অনেকেই প্রচার করতেন। এমনকি ১৯১৬-তে সামরিক অনুশীলনে অংশ নিয়ে দুজন গুরুত্বপূর্ণ শিল্পী মারাও যান। একজন হলেন বোসিয়োনি যিনি ঘোড়ার থেকে পড়ে মারা যান এবং অন্যজন সান্ট ইলিয়া লম্বার্ডি ভলান্টিয়ার সাইক্লিস্ট ব্যাটেলিয়নের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে মারা যান। এই দুটো মৃত্যুর পরে ফিউচারিস্ট আন্দোলন স্তিমিত হয়ে আসে। মেরিনেত্তি মুসোলিনির সঙ্গে সম্পর্ক রাখলেও ১৯২০ সালে ফ্যাসিবাদ থেকে ফিউচারিজ্‌মকে সরিয়ে নেন কিন্তু পরে আবার ফ্যাসিবাদের 'গতিময় সারমর্ম'কে ব্যক্ত করার জন্য ফিউচারিজ্‌মকে জোরাজুরি করেছিলেন। স্থাপত্য এবং চলচ্চিত্র নিয়েও ফিউচারিস্টরা কাজ করেছিলেন।

ফিক্সেটিভ (Fixetive

প্যাস্টেল, চারকোল, পেন্সিল ইত্যাদির ছবিকে স্থায়ী করতে অর্থাৎ এসবের গুঁড়ো বা কণাকে আটকে রাখতে ছবির ওপরে স্প্রে করার উপযোগী একধরনের বর্ণহীন তরল।

ফিক্সেটিভ চাপযুক্ত স্প্রে-ক্যানে ভর্তি অবস্থা কিনতে পাওয়া যায়। অথবা তৈরি করে নিয়ে স্প্রে বোতলে ভরেও লাগানো যায়। প্রাকৃতিক এবং কৃত্রিম গ্লু, সিনথেটিক রেসিন অথবা কেসিন ইত্যাদি নানা ধরনের পদার্থ দিয়ে ফিক্সেটিভ তৈরি হয়।

ফিগারেটিভ আর্ট (Figurative Art) — বাস্তবে দৃষ্ট নানা বিষয়, বস্তু বা প্রাণী জগতের অনুরূপ আকৃতি ব্যবহার করে তৈরি শিল্পকর্ম। ফিগারেটিভ আর্টকে সাদৃশ্যবাদের সমার্থক বলা যেতে পারে।

ফিগার গ্রাউন্ড রিলেশনশিপ (Figure ground relationship) — শিল্পের আঙ্গিকগত একটা শর্ত। সাধারণভাবে আমরা যখন কোনো বস্তুকে দেখি তখন বাস্তবধর্মী যুক্তিতে দৃষ্ট বস্তুকে পশ্চাৎপটের ওপরে স্থাপন করি বা বস্তুর পিছনে একটা পশ্চাৎপটকে বসিয়ে নিই। কিন্তু কখনো-কখনো বিশেষ করে বিমূর্ত ছবির ক্ষেত্রে 'বস্তু বা আকৃতি' এবং 'পশ্চাৎপট' বিষয়ের মতো সমান গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে এবং ফিগার ও ব্যাকগ্রাউন্ডের মধ্যের সম্পর্ক বিভ্রান্তিকর হয়ে ওঠে।

ফেক (Fake) — কোনো বিদ্যমান শিল্পকর্মের নকল অথবা কোনো শিল্পীর বিশেষ রীতি বা আঙ্গিকের অনুকরণে সৃষ্ট কোনো শিল্পকর্ম যা ওই শিল্পীর শিল্পকর্ম বলে চালানো হয়। এটা প্রায় জালিয়াতি কাজের সঙ্গে যুক্ত। অনেক সময় কোনো নির্দিষ্ট কালের শিল্পরীতি বা আঙ্গিকে তৈরি শিল্প বা তা পরিবর্ধন বা প্রতিলিপিকরণের সময় হয়তো অনেকটা পালটে গেছে ফলে তার আসল রূপের সঙ্গে বেশ তফাৎ হয়ে গেছে এরকম শিল্পকর্মকেও ফেক বলা হয়।

ফেস পেন্টিং (Face Painting) — ষোড়শ শতাব্দী নাগাদ প্রচলিত প্রতিকৃতি বা পোর্ট্রেট পেন্টিং-এর সমার্থক একটি সাবেক ইংরেজি শব্দ। তখন শিল্পীরা কারিগর হিসেবেই গণ্য হতেন।

ফেস্টুন (Festoon) — এক ধরনের ফুল বা ফলের মালা আকৃতির স্থাপত্য অলংকরণ। এগুলো শিকল বা দড়ি দিয়ে ঝোলানো থাকত।

ফোক আর্ট (Folk Art) — ফোক আর্ট বা লোকশিল্প বিষয়টি এখন বহু আলোচিত। কিন্তু একটা সময় পর্যন্ত এটি প্রায় ব্রাত্যই ছিল। অথচ এর ঐতিহ্য খুবই প্রাচীন। গ্রিক পণ্ডিত হেরাডেটাস-এর কাল তথা খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দী থেকে লোক ঐতিহ্য সম্পর্কে কৌতূহল সৃষ্টি হলেও লোকশিল্প বা ফোক আর্ট নিয়ে

আলোচনার সূত্রপাত ঘটে কার্যত ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের পরে। এটি ফোকলোরেরই একটি শাখা। লোক শিল্পের সৃষ্টি নাগরিক সভ্যতার তথাকথিত সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের বাইরে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বিপরীতে সাধারণ মানুষের সুসংহত সমাজের উর্বর ক্ষেত্রে। এই শিল্প কোনো একক প্রকাশ নয়। কোনো একজন মানুষ বা শিল্পী এই সৃষ্টির মালিকানার দাবিদার নন।

লোক শিল্পের সঠিক সংজ্ঞাও এখনও গড়ে ওঠেনি। তবে এখন সচেতনভাবে এনিয়ে অনুসন্ধান হচ্ছে, গবেষণা হচ্ছে। লোক শিল্প এবং মার্গ শিল্প এই দুই নামে শিল্পকে ভাগ করে ফেলার ব্যাপারেও পণ্ডিতমহলে বিতর্ক আছে। কিন্তু একথা ঠিক যে লোকশিল্প সাধারণ লোকের জন্য সাধারণ লোকের সৃষ্টি। এর মধ্যে মিশে থাকে সমাজের ছোটো বড়ো নানা বিষয়। জীবনের প্রয়োজনের নানা উপকরণ।

লোকশিল্পের বিচার প্রাতিষ্ঠানিক বা আকাদেমি আর্টের মতো স্টাইল, রীতি বা বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি দিয়ে হবে না। এর বিচারের ক্ষেত্রে প্রাধান্য পাবে মনোভাব বা Attitude। তবে লোকশিল্পের প্রান্তসীমায় কয়েক ধরনের শিল্পকর্ম আছে যার সঙ্গে লোকশিল্পের পার্থক্য আছে। এটা নিশ্চিতভাবে বুঝতে হবে। এগুলো হল কারুশিল্প, হস্তশিল্প, কুটির শিল্প, প্রাচীন শিল্প ইত্যাদি। লোকশিল্প নিয়ে বিজ্ঞানসম্মত আলোচনার সূত্রপাত করেন একজন অস্ট্রীয় শিল্প সমালোচক—এলিসরিগল।

লোকশিল্পের মধ্যে মোটিফ বা মুদ্রা অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট রূপের পুনরাবৃত্তি হতে দেখা যায়। এরকম মোটিফ হল পদ্ম, সূর্য, কলকা। আলপনা, কাঠের কাজ, মৃৎ শিল্পে, কাঁথা শিল্পে এসবের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। এসব মোটিফ মানুষের প্রাচীন বিশ্বাস, সংস্কৃতির প্রতীক। মানুষের উদ্ভাবনী ক্ষমতার মধ্য দিয়েই এই শিল্প রূপ লাভ করেছে। সেখানে অন্য শিল্পের সঙ্গে লোকশিল্পের কোনো তফাৎ নেই। লোকশিল্পের একটা বড়ো বৈশিষ্ট্য হল এর বিচ্ছিন্নতা। কোনো আন্তর্জাতিক স্টাইল এর নেই। কিন্তু যা মোটের ওপর এক তা হল এর সারল্য। লোকশিল্পে তিন ধরনের প্রকাশভঙ্গি দেখতে পাওয়া যায়। বাস্তবধর্মী, বিমূর্ত, ও রীতিবদ্ধ। আর একটা বিষয় হল এর উপাদান। লোকশিল্পের উপাদান আঞ্চলিকভাবে প্রাপ্ত প্রাকৃতিক বস্তু বা উপকরণ।

ফোকাল পয়েন্ট (Focal Point)
সেন্টার অব ইন্টারেস্ট দেখুন।

ফোরশর্টেনিং (Foreshortening)
এটি গভীরতার বিভ্রম সৃষ্টিকারী একটি কৌশল। একটি শায়িত মানুষকে পায়ের দিক দেখলে মানুষটি দৈর্ঘ্য অপেক্ষাকৃত কম বলে মনে হয়। পারস্পেকটিভের ফলেই এমনটা ঘটে। অর্থাৎ কেন্দ্রভিসারি রেখাগুলি পিকচার প্লেন বা দৃশ্যতলের নিরিখে দৃশ্যমান হওয়ার ফলে এরকম ছোটো দেখা যায়।

ফোরাম (Forum)
একটা উন্মুক্ত সর্বজনীন স্থান। বিশেষ করে প্রাচীন রোমে চারিদিকে মন্দির বা বাড়ি দিয়ে ঘেরা খোলা একরকম স্থান দেখা যেত। এ ধরনের স্থান রাজনৈতিক আলোচনা বা বাজার হিসাবে ব্যবহার করা হত।

ফ্যাকসিমিলি (Facsimile)
মাধ্যম, ফর্ম সাইজ কিছু মিলিয়ে কোনো শিল্পকর্মের হুবহু নকল। একটু আলগা করে বললে ছবি, ড্রয়িং, ছাপাই ছবি, পাণ্ডুলিপি ইত্যাদি যাকে খুব কাছ থেকে না দেখলে আসল বলে ভুল হয়।

ফ্যানলাইট (Fanlight)
দরজার ওপরে থাকা জানলা। কখনো-কখনো এটা অর্ধ গোলাকৃতিও হয়। এর কাচের পাতগুলো দেখতে পাখার রিবের মতো লাগে। এই জানলার ওপরের ভাগটা কবজা দিয়ে আটকানো থাকে। এবং ঠেস-এর সাহায্যে স্বাধীনভাবে খুলে রাখা যায়।

ফ্যান্টাস্টিক রিয়ালিজ্‌ম (Fantastic Realism)
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী বছরগুলিতে ভিয়েনাতে সংগঠিত অস্ট্রিয়ান শিল্পীদের একটি শিল্পান্দোলন। এর নামকরণ করেন শিল্প সমালোচক মুশচিক জোহান। ('Vienna School of Fantastic Realism') এর সঙ্গে যুক্ত শিল্পীরা ছিলেন এরিখ ব্রাউয়ার, আর্নিস্ট ফুকস, রুডলফ হাউসনার। এঁরা অন্তিম মধ্যযুগীয় ফ্যান্টাস্টিক শিল্পকলার থেকে উপাদান সংগ্রহ করে তার সঙ্গে ঊনবিংশ শতাব্দীর আকাদেমিবাদ এবং সুরিয়ালিজ্‌মকে যুক্ত করেছিলেন। প্রথম দিকে এর পুঁথিগত ঝোঁক এবং পরের দিকে অতিরিক্ত বাণিজ্য মুখীনতার জন্য এই আন্দোলন সমালোচিত হয়েছিল।

ফ্যানসি পিকচার (Fancy Picture)
অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই পরিভাষাটি দুটো বিষয় বোঝাতে ব্যবহৃত হত। এক. অলীক কল্পনার জগতের ছবিতে

ব্যবহৃত বাস্তবধর্মী রীতির জঁর পেন্টিং থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা সম্বলিত কোনো দৃশ্যচিত্র। দুই. কোনো প্রতিকৃতি বোঝাতে— যেখানে উপবিষ্ট ব্যক্তি বাহারি পোশাক বিশেষ করে গেঁয়ো চাষারে পোশাকে হাজির থাকেন।

ফ্যাসাড (Facade)
কোনো অট্টালিকা বা বাড়ির সম্মুখভাগ। কখনো-কখনো এর সহায়ক কোনো নির্মাণের সম্মুখভাগকেও বোঝায়।

ফ্রেমিং (Framing)
এক ধরনের বেষ্টনী যা ছবি তথা দ্বিমাত্রিক শিল্পকর্মকে বাঁধানোর জন্য, ছবি বা শিল্পকর্মের সুরক্ষার জন্য এবং তারচেয়েও গুরুত্বপূর্ণ— ছবির দৃশ্যমানতা বাড়িয়ে ছবির চেহারাকে আরও দৃষ্টিনন্দন করার জন্য ব্যবহৃত হয়। কাগজে বা ক্যানভাসে তৈরি ছবি বা কোনো শিল্পকর্মকে দর্শনের জন্য উপস্থাপনার সময় চারপাশের বিষয় ও পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করার দরকার হয় সেই ছবিটি তথা শিল্পকর্মের দৃশ্যগ্রাহ্যতা তৈরির বা বাড়ানোর জন্য। নইলে সেই শিল্পকর্মটি চারপাশের বিষয়ের মধ্যে এমনভাবে অঙ্গীভূত হয়ে যায় যে তাকে ভালো করে নিরীক্ষণ করে তার রসগ্রহণে বাধা সৃষ্টি হয়। এটা আমাদের দৃষ্টির এক ধরনের সীমাবদ্ধতা। ফ্রেমের গুরুত্ব এই কাজে সহায়তা করা। নানা ধরনের উপকরণ দিয়ে ফ্রেম তৈরি হয় যেমন কাঠ, অ্যালুমিনিয়াম, প্লাস্টিক, অ্যাক্রিলিক ইত্যাদি। অবশ্য তা শিল্পীর পছন্দ ও ভাবনা অনুযায়ী। তবে ফ্রেমের সাধারণ কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। যেমন— ১. শিল্পকর্মের কিনারা এবং ফ্রেমের মাঝখানে কিছুটা জায়গা ছেড়ে রাখতে হবে যাতে তাপমাত্রা বা আর্দ্রতার ফলে শিল্পকর্মের প্রসারণকে মানিয়ে নিতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে ইলাস্ট্রেশন বোর্ডের ওপরে আঁকা ছবি আর্দ্র পরিবেশের ফলে এতটাই বেড়ে যেতে পারে যে ফ্রেমের বাঁধা কোণকে আলগা করে দিতে পারে। ২. ফ্রেমে যে খাঁজকাটা বা র‍্যাবিট থাকে তার গভীরতা যথেষ্ট পরিমাণে হতে হবে যাতে ছবি, কাচ ও অন্যান্য উপকরণকে ঠিকমতো ধারণ করতে পারে। ৩. ক্ষতিকারক পদার্থ সম্বলিত কোনো উপকরণ যাতে বাঁধাইয়ের কাজে ব্যবহৃত না হয় তা লক্ষ্য রাখতে হবে। যেমন অম্লকর কোনো কাগজ বা বোর্ড পশ্চাৎপটে ব্যবহার করা উচিত নয়। সাধারণ বাদামি বোর্ড বা করুগেটেড

কাগজ অম্লকর। ৪. কোলাজ বা অ্যাসমব্লেজের জন্য সামনে কাচ বা প্লেক্সিগ্লাসের স্বচ্ছ বক্স লাগানো হয় যাতে পাশ থেকে দেখা যায়। ৫. ফ্রেমে আঁটা ক্যানভাস বাঁধাই করার সময় ছবির পিছনের দিকেও শক্ত কোনো বস্তু দিয়ে ঢেকে দেওয়া দরকার। যাতে কোনো কিছু ফুটে যাওয়া বা অন্য কোনো আঘাতের হাত থেকে রক্ষা করা যায়। ৬. প্যাস্টেল বা চারকোলের ছবি বাঁধাই-এর ক্ষেত্রে প্লেক্সিগ্লাস বা প্লাস্টিক শিট ব্যবহার করা উচিত নয়। কেন-না প্লেক্সিগ্লাস স্থিরবিদ্যুৎ তৈরি করে যা চারকোল বা প্যাস্টেলের আলগা ক্ষুদ্র বর্ণকণাকে টেনে নিতে পারে।

ফ্রেস্কো (Fresco)

ফ্রেস্কো একটি ইতালীয় শব্দ যার অর্থ হল তাজা (fresh)। এটি আসলে ভিত্তি চিত্র বা মুরাল তৈরির একটি পদ্ধতি। নিছক দেয়ালে ছবি আঁকা নয়। ফ্রেস্কো দু-রকমের। আসল বা ট্রু ফ্রেস্কো যা ‘বুয়োন’ ফ্রেস্কো নামে পরিচিত আর অন্যটি হল ফ্রেস্কো ‘সিক্কো।’ বালির পলাস্তরা করা দেয়ালে লাগানো তাজা চুনের অস্তরের ওপর রাসায়নিক পরিবর্তনের ফলে জমাট বাঁধা পাথরের মতো দানাদার পিগমেন্ট বা রংই হল ফ্রেস্কোর ভিত্তি। চুন যতক্ষণ তাজা থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত এটা হল কলিচুন বা ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড। কিন্তু যখন তা শুকোয় তখন বাতাসের কার্বন ডাইঅক্সাইডের সংস্পর্শে এটা ক্যালসিয়াম কার্বোনেটে পরিবর্তিত হয় এবং পিগমেন্টকে দানাদার কেলাসে পরিণত করে যা ফ্রেস্কোর চিত্রপটের



নং ১৩৯. ক্যাভালিনি : লাস্ট জাজমেন্টের চার ধর্ম প্রচারক। ১২৯৩ খ্রিস্টাব্দ।

দেহগত অংশ। চিত্রপটের উপরিতলে ব্যবহার্য তেল রং এবং টেম্পারা থেকে বিষয়টি আলাদা। বুয়োন ফ্রেস্কোতে দেয়ালের ওপর একটা মোটামুটি স্থূল প্লাস্টারের অস্তর লাগানো হয় যাকে বলা হয় 'অ্যারিকসিয়াটো'। প্লাস্টারের এই অস্তর তৈরি হয় চুন (ক্যালসিয়াম অক্সাইড) বালি এবং জল দিয়ে। এর ওপর মূল নকশার খসড়াকে ট্রেসিং বা স্থানান্তর করা হয়। এর জন্য কখনো-কখনো পাউন্সিল হুইলও ব্যবহার করা হয়। শেষ প্লাস্টারের অস্তরটি বা 'ইনটোন্যাকো' তৈরি হয় মিহি গুঁড়ো চুন দিয়ে। কিন্তু এই আস্তরণ সবটা একবারে লাগানো হয় না। একদিনে যতটা কাজ করা যাবে ততটাই লাগানো হয়। যাতে এই অস্তর স্যাঁতস্যাতে (damp) রেখে রং লাগানোর কাজ শেষ করা যায়। ভেজা অবস্থায় রং এবং প্লাস্টার শুকোতে শুকোতে পরস্পর মিশে যায় এবং একটা স্থায়ী ও ম্যাট বর্ণতল গঠন করে। যা ঘষা লাগলে উঠে যায় না, মামড়ি পড়ে না। অর্থাৎ ফ্রেস্কোর চিত্রের রং অন্যসব ছবির মতো তার গ্রাউন্ড বা চিত্রপটের ওপর পাতলা পর্দার মতো অবস্থান করে না। ফ্রেস্কোর চিত্রকরকে প্রতিদিনের কাজ খুব দ্রুত এবং পরিকল্পিতভাবে প্লাস্টার শুকিয়ে ওঠার আগেই শেষ করতে হয়। পরের দিনের জন্য নির্দিষ্ট অংশে নতুন তাজা প্লাস্টারের অস্তর বা ইনটোন্যাকো লাগিয়ে কাজ শুরু করতে হয়। স্বভাবতই সব ধরনের রং বা পিগমেন্ট ফ্রেস্কোর জন্য উপযোগী নয়। কারণ অনেক পিগমেন্ট আছে যেগুলি প্লাস্টারের মধ্যে থাকা ক্ষারীয় উপাদান বা চুনের সঙ্গে বিক্রিয়া করে। সাধারণভাবে ফ্রেস্কোর রং শুকোলে হালকা হয়ে যায় এবং স্বচ্ছ ফুরফুরে বর্ণমাধুরী সৃষ্টি করে। ইতিহাসে বিশেষ করে দেখা যায় ইতালীয় রেনেসাঁসের সময় স্বল্প সংখ্যক টোন ব্যবহার করে বড়ো আকারের সহজ ও চমৎকারিত্বে পূর্ণ সব ফ্রেস্কো সৃষ্টি হয়েছে। ভিজে বা ড্যাম্পই ফ্রেস্কোর ভিত্তি বলে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলেই এই শিল্পরীতি কেন্দ্রীভূত এবং এখানে বহু প্রাচীন কালে মাইনোয়ান, গ্রিক এবং অবশ্যই রোমানরা এর চর্চা করেছিলেন। খ্রিস্টপূর্ব ২৭ অব্দে বিশিষ্ট শিল্পতাত্ত্বিক ভিট্রুভিয়াস তাঁর গবেষণা গ্রন্থে একটি ফ্রেস্কো পদ্ধতির বর্ণনা করেছিলেন যা হুবহু ১৪০০ খ্রিস্টাব্দে ফ্লোরেন্টাইন শিল্পী সেনিনির লেখা 'দি ক্রাফ্টসম্যানস হ্যান্ডবুক'-এ উল্লিখিত

বর্ণনার মতো। মধ্যযুগে শুকনো প্লাস্টারের ওপর টেম্পারা দিয়ে আর এক ধরনের মুরাল আঁকা হত তাকে বলে ফ্রেস্কো সিক্কো। ফ্রেস্কো পেন্টিং-এর স্বর্ণ যুগ শুরু হয় জিয়োত্তোর হাতে এবং একে এগিয়ে নিয়ে যান ম্যাসাচ্ছিও, পিয়েরোদেলা ফ্রানসিস্কা, মাইকেলাঞ্জেলো এবং অন্যারা। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই পদ্ধতির চর্চা কমে যায়। এই সময়ের শেষ বড়ো কাজ হল ইতালির জিয়ামবাতিস্তা টিপোলো। ফের উনবিংশ শতাব্দীতে জার্মানিতে কর্নেলুইস এবং বিংশ শতাব্দীতে মেক্সিকোর মুরাল শিল্পীদের হাতে এর পুনর্জাগরণ ঘটে।

ফ্রোতাজ (Frottage)

ফরাসি ক্রিয়াপদ ফ্রোতে--অর্থাৎ ঘষা, থেকে উদ্ভূত। একটি বুনট তলে বা একটি রিলিফ নকশার ওপর কাগজ রেখে তার ওপর পেন্সিল বা ক্রেয়ন ঘষে ছাপ তোলা এই পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য। সুরিয়ালিস্ট শিল্পীরা বিশেষ করে ম্যাক্স আর্নেস্ট প্রতিকৃতি বা নকশা ফুটিয়ে তুলতে এই পদ্ধতির বহুল ব্যবহার করেছিলেন। এর সঙ্গে ডেক্যালকোম্যানিয়া পদ্ধতির মিল আছে।

ফ্লাক্সাস (fluxus)

একেবারে সাম্প্রতিক কালের শিল্পভাবনা। ১৯৬০ সালের পরবর্তীকালের অগ্রগতি। বলা যায় ফ্লাক্সাস হল 'পারফর্ম্যান্স আর্ট' (সম্পাদন শিল্প)-এরই একটি রূপ যা এই সময়েরই আর একটি শিল্পভঙ্গি 'হ্যাপেনিংস' (ঘটনা)-র সমান্তরাল বিষয়। কেন-না কিছু শিল্পী উভয় ধারাতেই অংশ গ্রহণ করেছেন। ১৯৬১ সালে আমেরিকায় জর্জি ম্যাকিউনাস ডিক হিজিংস এবং অন্যান্যদের সাথে নিয়ে এই আন্দোলনের সূত্রপাত করেন। 'ফ্লাক্সাস' কাজকর্মের পেছনে প্রাথমিক ধারণা হল— স্বয়ং জীবনটাকেই শিল্প হিসাবে উপভোগ করা যায়। ম্যাকিউনাস বলেছেন—'everything is art and everyone can do it.' আবার ডিক হিজিংস বলেছেন, 'Fluxus is not a movement, an historical momement, an organisation. Fluxus is an idea, a way of life, a loosely-knit group of people who execute *'fluxus works'*. (ফ্লাক্সাস কোনো আন্দোলন নয়। একটা ঐতিহাসিক মুহূর্ত, একটা সংগঠন। ফ্লাক্সাস একটা ধারণা, জীবনের একটা পথ, আলগাভাবে ঐক্যবদ্ধ একদল মানুষ যারা ফ্লাক্সাস-কর্ম সম্পাদন করেন।

উদ্ধৃতি : লোরডানা পারমেসানি, আর্ট' অব টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি, পৃ. ৬০) 'হ্যাপেনিং'-এ ঘটনাবলি দর্শকদের প্রতিক্রিয়ার ওপর নির্ভর করে এবং উদ্ভূত ফলকে সাধারণত খোলা রাখা হয়। অন্যদিকে 'ফ্লাক্সাসে'র ক্ষেত্রে পূর্ব নির্ধারিত দৃশ্যবিবরণীকে সতর্কভাবে দর্শকের সামনে উপস্থিত করা হয় এবং দর্শককে তার অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হয় কিন্তু দর্শকের প্রতিক্রিয়া জানানোর বিশেষ সুযোগ থাকে না।

ফ্লাক্সাস আন্দোলনের মূল ছিল মার্সেল দুসঁপ ও তাঁর দাদাবাদের মধ্যে। একথা ম্যাকিউনাস ফ্লাক্সাসের কুলুজিতেই দেখিয়েছেন। ম্যাকিউনাস ফ্লাক্সাসের ঘোষণাপত্রে বলেছিলেন—'Purge the world of the forms of bourgeois life. Know how to promot reality.' (ওই) অর্থাৎ বুর্জোয়াদের জীবনধারা থেকে বিশ্বের শুদ্ধতাকে রক্ষা কর। বাস্তবতাকে তুলে ধরতে শেখো। ফ্লাক্সাস আন্দোলনের গোড়ার দিকের নমুনা দেখতে পাওয়া যায় নিউইয়র্কের সুরকার ও কনসেপচুয়াল শিল্পী জন কেজ-এর ১৯৬০-এর গোড়ার দিকের পরীক্ষাধর্মী কাজের ধারার মধ্যে। 'ফ্লাক্সাস'-এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন জর্জ ব্রেখট,

নং ১৪০. জর্জ ম্যাকিউনাস, ডিক হিজিংস, উল্ফ ভোসেল, বেনজামিন প্যাটারসন প্রমুখেরা ফিলিপ কর্নারের 'পিয়ানো কাজকর্ম' উপস্থাপন করছেন। ১৯৬২।



অ্যালিসন নলেস, ইয়োকো ওনো, ন্যাম জুন পেইক, ডাইটার রথ, ড্যানিয়েল স্পেয়েরি, বেন ভউটিয়ার, উলফ ভোস্টেল, রবার্ট ওয়াটস, এমেট উইলিয়মস্ এবং লা মন্টেইয়ং প্রমুখ। পূর্বসূরী দাদাবাদী ও ফিউচারিস্টদের মতো ফ্লাক্সাস শিল্পীরাও নৈরাজ্যবাদী এবং ইউটোপীয় র‍্যাডিক্যাল কর্মী ছিলেন। ফ্লাক্সাসের বেশিরভাগ পরিকল্পনাই কোলাজ শিল্পী রে জনসন রূপায়িত করেছেন। রে জনসন ছিলেন 'মেল আর্টের' জনক। ১৯৬২ সালের সেপ্টেম্বরে ইয়েসব্যাডেনে ম্যাকিউনাস 'ফ্লাক্সাস ইন্টারন্যাশনেল ফেস্তসপিয়েলে নিউয়েস্তার মিউসিক' নামে প্রথম শো সংগঠিত করেন। এর অনুসরণে অন্যত্র আরও শো হয়। কয়েক দশক পরে ১৯৯২ সালে আবার কোলোন-এ 'ফ্লাক্সাস ভাইরাস' প্রদর্শনীর মধ্য দিয়ে ফ্লাক্সাস-এর নবজাগরণ ঘটে।

ফ্লুরোসেন্ট পেন্ট (Fluorescent Paint)

ফ্লুরোসেন্ট পেন্টের কাজ অনেকটা ফ্লুরোসেন্ট টিউব লাইটের মতো। এই পেন্ট একটা নির্দিষ্ট তরঙ্গদৈর্ঘের আলোকে শোষণ করে এবং অন্য তরঙ্গ দৈর্ঘ্যে তাকে বিকিরণ করে। ফলে এর রং দারুণভাবে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ফ্লুরোসেন্ট পেন্ট তৈরি করা হয় ফ্লুরোসেন্ট ডাই এর সঙ্গে পলিমার বা অ্যাক্রিলিক রেসিন মিশিয়ে। ফ্লুরোসেন্ট বা ডেগ্লো রং অতিবেগুনি রশ্মির প্রতিফলনে উজ্জীবিত হতে পারে। সাদা চিত্রপটেই এই রং ভালোভাবে আলোর প্রতিফলন ঘটতে পারে। এই রঙের আলো প্রতিরোধী ক্ষমতা খুবই কম অর্থাৎ এই রং স্থায়ী নয়।



ব

বটতলা

উত্তর কলকাতা গরানহাটা-চিৎপুর অঞ্চলের একটি স্থান। বাংলা মুদ্রণ তথা ছাপাই ছবির ইতিহাসে বটতলার অবদান অসামান্য। এই অঞ্চলের শোভাবাজারে একটি জায়গার নাম ছিল 'বান্ধাবটতলা'। এখানে একটি ছাপাখানা খোলেন জনৈক বিশ্বনাথ দেব। ধীরে ধীরে ছাপাখানার সংখ্যা বাড়তে বাড়তে

নং ১৪১. চিৎপুরের উডকাট : নৃত্যলাল দত্তর 'ভাইফোঁটা'। ১২৪.৮ x ৩৮.৮ সেমি.।



দরজিপাড়া, কুমোরটুলি, গরানহাটা, আহিরীটোলা প্রভৃতি অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। আজকের বইপাড়া যেমন কলেজস্ট্রিট তেমনি বলা যায় উনবিংশ শতাব্দীর ছয় ও সাত দশক পর্যন্ত বইপাড়া মানে ছিল বটতলা। ছাপার সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য সেকালের মুদ্রণপদ্ধতির উপযোগী কাঠের ব্লকে খোদাই করে ছবি ছাপা হত। আর এই কাজের মধ্য দিয়ে তৈরি হলেন বাংলা মুদ্রণের ইতিহাসে স্মরণীয় ব্যক্তি পঞ্চানন কর্মকার, তাঁর পৌত্র সুদক্ষ শিল্পী কৃষ্ণচন্দ্র কর্মকার প্রমুখরা। এই শিল্পীরা বইয়ের জন্য কাঠখোদাইয়ের ছবি করতে করতে বড়ো আকারের ছবিও তৈরি করেছিলেন। মানুষের চাহিদা মেটানোর জন্য এইসব ছবি বিক্রি করা হত। আর কালো কালিতে ছেপে নেবার পর এই ছবি হতে রং লাগিয়ে রঙিন করা হত। এ ধরনের ছবিকে বলা যেতে পারে হাটুরে ছবি বা Bazar painting। কলকাতার দক্ষিণে কালীঘাটের পটুয়ারা আঁকতেন পট। বটতলার কারিগরেরা তাঁদের বিষয়বস্তু ও চিত্রকল্পের

জন্য কালীঘাটের এই পটুয়াদের কাছে ঋণী। কাঠখোদাই করে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে ছাপা ছবির দাম কালীঘাটের পটের চেয়ে কম হত। কালীঘাটের পটের দাম যদি এক আনা হত তবে বটতলার ছবি দাম হত ১ পয়সা। আর রঙিন হলে ২ পয়সা। বটতলার ছবিতে বিদেশি উপাদান যেমন থাকত তেমনি পারিপার্শ্বিক জগৎ থেকে নেওয়া নানা রূপও থাকত। গবেষক শ্রীপান্থ এই ছবিকে সাধারণ মানুষের জন্য সাধারণ মানুষের ছবি বলে অবিহিত করে বলেছেন এ হল নাগরিক লোকশিল্প (urban folk art)। এই সব কাঠখোদাই ছবির সাথে সে সময় উদ্ভূত 'কোম্পানি স্টাইলে'র ছবির যেমন সাদৃশ্য আছে তেমনি এসব ছবিতে ব্যবহৃত ফিগারের সঙ্গে টেরাকোটার রূপেরও মিল খুঁজে পাওয়া যায়। বটতলার কাঠখোদাই ছবির জনপ্রিয়তা এমন জায়গায় পৌঁছেছিল যে অনুকরণ বা নকল আটকাতে শিল্পীরা ছবির নীচে নাম ঠিকানা খোদাই করতে শুরু করেছিলেন যা প্রথম দিকে থাকত না। এসব কাঠখোদাই শিল্পীদের মধ্যে আর্টস্কুল থেকে পাশ করা শিল্পীরাও ছিলেন। কিন্তু যন্ত্রশিল্প প্রবর্তনের ফলে কালীঘাটের শিল্পীদের মতো বটতলার শিল্পীরাও সংকটে পড়েন। কালীঘাটের পটুয়াদের মতো বটতলার শিল্পীরাও যন্ত্রশিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পরাজিত হন। ১৮৮০ থেকে ১৯৯০-এর মধ্যে বটতলার দিন শেষ হয়ে যায়। একথাও ঠিক যে বেশ কয়েকজন দক্ষ শিল্পী থাকলেও বটতলার কাঠখোদাই তেমন সুউচ্চমানে পৌঁছাতে পারেনি যেমনটা পেরেছিল চিন, জাপান বা ইংল্যান্ডের কাঠ খোদাই শিল্প।

বডি (Body)

রঙে অনচ্ছতা (opacity) তৈরি করতে বা বাড়াতে যে উপাদান ব্যবহার করা হয় তাকে বডি বলে। সাধারণ ভাবে সাদা রং বডিকালার হিসাবে পরিচিত। তেল রঙের ক্ষেত্রে বডি বলতে পিগমেন্টের ঘনত্বকে বোঝায়।

বডি আর্ট (Body Art)

১৯৬০-এর দশক থেকে পাশ্চাত্যে বেশ বিতর্কিত এই শিল্প খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং পৃথিবীজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। নামের মধ্যে এই শিল্পরীতির বৈশিষ্ট্য প্রচ্ছন্ন। ১৯৬০ এবং ১৯৭০-এ শিল্প প্রকাশের মাধ্যম হিসাবে মনুষ্য শরীরের যে ব্যবহার শুরু হয় তাই ক্রমশ 'বডি আর্ট' হিসাবে প্রতিষ্ঠা পায়। অর্থাৎ এই ধরনের শিল্প রীতিতে মানুষের দেহ এবং তা সাধারণভাবে শিল্পীর নিজেরই শরীর মাধ্যম হিসাবে

নং ১৪২. ক্রিস বার্ডেন : ট্রানস ফিক্সড। ২৩ এপ্রিল ১৯৭৪। আরও ছবি ২১৪ পৃ. ৩৮৪



ব্যবহৃত হয়। একদিকে এটা যেমন সমসাময়িক কিছু শিল্পকলা 'প্রসেস আর্ট', 'অ্যাকশন পেন্টিং' ইত্যাদি এবং খানিকটা 'কনসেপচুয়াল আর্টের' রকমফের তেমনি অনেকাংশে 'কনসেপচুয়াল আর্ট' এবং মিনিয়াল আর্ট-এর নৈর্ব্যক্তিকতার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার প্রকাশ। পারফর্ম্যান্সের প্রবক্তা আমেরিকান শিল্পী ভিটো অ্যাকনসি বলেছিলেন এই সময়ের বেশিরভাগ শিল্পের মধ্য থেকে স্রষ্টার ব্যক্তিগত দৈহিক উপস্থিতি হারিয়ে গেছে। যদিও 'বডি আর্ট' কনসেপচুয়াল আর্টের বর্ধিত রূপের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। আবার যখন বডি আর্ট গণ আচারঅনুষ্ঠানের রূপ গ্রহণ করে তখন এটাও 'পারফর্ম্যান্স আর্টের সঙ্গে একাকার হয়ে যায়। যদিও এই শিল্প ব্যক্তিগতভাবে তৈরি করে কোনো ঘটনা প্রদর্শনের বা অভিনয়ের মধ্য দিয়ে দর্শকদের উদ্দেশ্যে উপস্থাপিত করা হয়, যা অনেক ক্ষেত্রেই দর্শককে একজন এমন রসগ্রাহকে পরিণত করে যে অন্যের দুঃখকষ্ট বা রতিক্রিয়া দেখে আনন্দ অনুভব করে। এর অন্যতম মুখ্য

বৈশিষ্ট্য হল যে, বডি শিল্পীরা তাঁদের শরীরকে কোনো গল্প বর্ণনা কিংবা কোনো চরিত্রের ব্যাখ্যা করার জন্য ব্যবহার করেননি। তাঁদের শরীরগুলোই স্বয়ং ছিল চরিত্র (character) এবং প্রতিপাদ্য বিষয়কে উত্তম পুরুষে প্রকাশ করতেন। বডি শিল্পীদের এই সমস্ত ক্রিয়া (action) গ্যালারিতে, মিউজিয়ামে সরাসরি (live) উপস্থাপিত হত এবং তার ভিডিয়ো করা বা ছবি তোলা হত। এ ধরনের কাজে শিল্পীরা দর্শককেও অন্তর্ভুক্ত করতে চাইতেন এবং তা উপলব্ধি এবং অনুমোদনের জন্য তৃতীয় ব্যক্তির সামনে তা করা হত। অবশ্যই এসব দর্শক হতেন শিল্পীর ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত এবং ঘনিষ্ঠ। সুতরাং দর্শকও আবেগে ভেসে এতে অংশ নিয়ে এই কীর্তিকলাপের চক্রী হয়ে ওঠেন। বডি আর্ট দিয়ে কোরিয়োগ্রাফও করা যেতে পারে। যেমন দেখিয়েছেন লন্ডন অধিবাসী শিল্পীদ্বয় স্যান মার্টিনো এবং টটনেস ডেভন ওরফে গিলবার্ট ও জর্জ। ১৯৬৫ সাল থেকে আমেরিকান শিল্পী ব্রুস ন্যম্যান 'মিনিম্যাল বডি অ্যাকশন'-এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। আর একজাতীয় বডি আর্টে শিল্পীর নিজের দেহকেই কাটাছেড়া করে এক ধরনের আত্মপীড়নমূলক সম্ভোগেচ্ছার প্রকাশ ঘটানো হয়। ১৯৭৪ সালে ইতালীয় বডি শিল্পী শ্রীমতী জিনা পেন, যিনি তাঁর 'অ্যাকশন সাইকি' নামের বডি আর্টে নিজের তলপেটে রেজর ব্লেড দিয়ে চিরে ক্ষত করে বেশ কিছুক্ষণ ধরে রক্ত ঝরিয়েছিলেন। কিংবা ৬০০ গ্রাম মাংসের কিমাকে খেয়েছিলেন যা হজম হতে সময় লাগে এবং হজম করা খুবই কঠিন এবং স্বাভাবিক পরিপাকক্রিয়ার ক্ষতি করে। অথবা ভিটো অ্যাকোনি ১৯৭০ সালে একটি রেস্তোরাঁতে বসে তার একটি হাত ঘসতে থাকেন এবং প্রতি পাঁচ মিনিট অন্তর তার ছবি তোলা হয় যতক্ষণ না পর্যন্ত তাঁর হাতের সামনের অংশে লাল দাগ পড়ে। এই আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিনিধিরা ছিলেন আমেরিকায় ডেভিড অ্যাসকেভোল্ড, জন বল্ডেসারি, বিল বেকলে, পিটার হাচিনসন, উইলিয়ম ওয়েজম্যান, ফরাসি দেশের অ্যানেট মেসাজের, ক্রিস্তিয়াঁ বোলতানস্কি, জঁ ল্য গাক, জার্মানির বার্নন্ড অ্যান্ড হিলা বেকার, ইতালীয় ফ্র্যাঙ্কো ভ্যাকসারি, মিকেলে জাজা এবং সেই সঙ্গে লইজি অনটানি, আরস লুখ্, ক্রিস বার্ডেন, হারম্যান নিটশখ্, ওটো মুয়েল, আরনালফ রেইনার, ম্যারিনা অ্যাব্রামোভক প্রমুখ।

বডি কালার (Body Colour)
একটি অর্থে এটি গুয়াশের সমার্থক শব্দ। আরেকটি অর্থে যে রং অনচ্ছ বা ওপেক অর্থাৎ যা স্বচ্ছ নয় সে রকম রং। শব্দটি বিশেষ ভাবে জল রঙের পিগমেন্টের সঙ্গে সাদা মিশেল দিয়ে অনচ্ছ ওপেক বানানোর ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়।

বলাস গ্রাউন্ড (Bolus Ground)
লালচে বাদামি মাটি দিয়ে তৈরি একটি উপাদান যা তেল রঙের গ্রাউন্ড অর্থাৎ পট তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয় আবার উজ্জ্বল প্রলেপ দেওয়ার কাজেও ব্যবহার করা হয়।

বহুত্ববাদ
ইংরেজিতে প্লুরালিজ্‌ম। বিপরীতে ইউনিটারিয়ানিজ্‌ম বা অদ্বৈতবাদ। সকল সৃষ্টির মূল একটাই। এই মতকে বলে অদ্বৈতবাদ। শংকরের বেদান্ত ব্যাখ্যা হল অদ্বৈতবাদ। যাঁরা এই মতে বিশ্বাস করেন তাঁদের বলা হয় অদ্বৈতবাদী। অদ্বৈতবাদীরা আবার দুটো ঘরানায় বিভক্ত। এঁদের একটি মত অনুযায়ী সৃষ্টির মূলকেন্দ্র আদতে একটি ধারণা। এই মতের বিশ্বাসীদের অন্যতম হলেন প্লেটো, হেগেল প্রমুখ। অপরপক্ষের মত হল সৃষ্টির সবকিছুই বস্তুত প্রকারভেদ। এই ঘরানার সঙ্গে বামপন্থী ও দ্বান্দ্বিক তত্ত্বের বিশ্বাসীদের একটা বড়ো অংশ যুক্ত। অবশ্যই দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ এর মধ্যে পড়ে না। এই দুই ঘরানার বিপরীত দিকে বহুত্ববাদের অবস্থান। অর্থাৎ ভিন্নমতের অস্তিত্বের স্বীকৃতি। ইতিহাসের সময়ের কোনো ছকে যেমন এঁদের বেঁধে ফেলা যাবে না তেমনি কোনো নির্দিষ্ট তত্ত্বের আলোকে এঁদের সংজ্ঞা নিরুপণ করা যাবে না। অবশ্য বহুত্ববাদীরা এমনও মনে করেন যে সংজ্ঞায়িত করলেই কোনো না কোনো ছকে বাঁধা পড়তে হবে তাই কোনো সংজ্ঞার প্রয়োজন নেই। স্বভাবতই বহুত্ববাদকে প্রকৃত অর্থে কোনো 'বাদ' বা 'ism' বলা যথার্থ নয়। বহুত্ববাদীদের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোনো প্রশ্নেও তাঁদের অবস্থান আপেক্ষিক ও সাময়িক এবং একইসঙ্গে তাঁদের তুল্যমূল্যতাও অস্থায়ী ও পরিবর্তনশীল। বহুত্ববাদের সঙ্গে উত্তর আধুনিক দৃষ্টিকোণের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ বা বলা যেতে পারে বহুত্ববাদ একটি উত্তর আধুনিক তথা পোস্টমডার্ন অনুষঙ্গ। তাই এর সঙ্গে মার্কসবাদের একটা স্বাভাবিক বিরোধিতা আছে। বহুত্ববাদের প্রধান দিক হল শিল্পসাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্র। পোস্টমডার্ন তথা পোস্ট স্ট্রাকচারালিস্ট শিল্প সাহিত্য সমালোচনার দৃষ্টিকোণটি বহুত্ববাদের ওপরেই

প্রতিষ্ঠিত। যে মত অনুযায়ী কোনো সাহিত্যকর্মের নির্দিষ্ট পাঠকৃতি হয় না। পাঠকৃতি তৈরি হওয়ার অর্থ হল লেখকের মৃত্যু। একটি সাহিত্যকর্মের অসংখ্য পাঠকৃতি গড়ে ওঠে। ফলে একটি পাঠ সম্ভব নয়। লেখকের দৃষ্টিভঙ্গির বাইরে পাঠকও তাঁর নিজের মতো করে স্বাধীন পাঠকৃতি তৈরি করে নিতে পারেন। তাই লেখকের অভিপ্রায়ের সঙ্গে পাঠকের কোনো সম্পর্ক নেই। কোনো কিছুকে দেখা ও বিচার করার ক্ষেত্রে স্থিতিশীল অবস্থানকে মুক্তি দিয়ে অস্থির বা ভাসমান অবস্থান থেকে দেখাই হল বহুত্ববাদী দৃষ্টিভঙ্গি। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় জন বার্জারের 'ways of seeing'-এর কথা। যেখানে তিনি শিল্প বিচারের ক্ষেত্রে এরকম পথকেই বর্ণনা করেছেন।

জার্মান দার্শনিক লিবনিৎজ তাঁর 'theory of monads' লিখে বহুত্ববাদী ধারণাকে সমৃদ্ধ করেছিলেন। লিবনিৎজের ব্যাখ্যা অনুযায়ী সত্য হল এরকম সাধারণ পদার্থ, যার নাম তিনি দিয়েছেন 'monads'। যা শুধুমাত্র উপলব্ধি ও আকাঙ্ক্ষা দিয়ে গঠিত। এই মোনাড অসংখ্য ও স্বয়ংক্রিয় এবং তার গতিপ্রকৃতি নির্ধারিত হয় তার পূর্বনির্ধারিত একধরনের সঙ্গতির দ্বারা ('each state of a monad is the cause of its succeeding state and the effect of its preceeding one') এই সঙ্গতির নিয়ামক হল সর্বোচ্চ মোনাড অর্থাৎ যাকে মনে করা হয় ঈশ্বর। মোনাডের ব্যাখ্যায় পরমাণুর ধারণার একটা প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতও লক্ষ করা যায়।

প্রসঙ্গত বলা যায় যে অদ্বৈতবাদ এবং বহুত্ববাদ-এর মধ্যবর্তী স্তরে আরও একদল দার্শনিক ছিলেন তাঁরা দ্বৈতবাদে বিশ্বাস করতেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন রেনে, দেকার্তে, কান্ট প্রমুখ। এঁরা অদ্বৈতবাদ এবং বহুত্ববাদের মধ্যে বিদ্যমান দ্বন্দ্বগুলোর খানিকটা নিরসন করেছিলেন। কিন্তু তাঁরা তুলনামূলকভাবে বহুত্ববাদের প্রতি কঠোর ছিলেন।

বাইজেনটাইন আর্ট (Byzantine art)

প্রাচীন রোম সাম্রাজ্যের পূর্বদিকের অর্ধাংশ তথা বাইজেনটাইন সাম্রাজের স্থাপত্য ও শিল্পকলাকে সাধারণভাবে বাইজেনটাইন আর্ট বলা হয় কিন্তু সময়কাল এবং উপাদানের এই রকম সোজাসাপটা সংজ্ঞা শিল্প ঐতিহাসিকদের কাছে কার্যত গুরুত্বহীন। আজকের ইস্তানবুল শহর ৬৬০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে



নং ১৪৩. সেন্ট ভিটেল এর বহির্দৃশ্য। র‍্যাভেনা। ৫৪৪-৫৪৬ খ্রিস্টাব্দ।

মেগারা থেকে আসা গ্রিকদের উপনিবেশ হিসাবে গড়ে ওঠে এবং পৌরাণিক প্রতিষ্ঠাতা বাইজাসের নাম থেকে এর নাম হয় বাইজানশন। যদিও বাইজানশন কখনোই প্রাচীন গ্রিক বা রোমক জগতের কোনো গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল না। সেপটিমিয়াস সেভেরাস প্রথম শহরটিকে ধ্বংস করে এর প্রতিরক্ষা এবং বিনোদনের ব্যবস্থা গড়ে তোলেন এবং শহরটির নতুন নাম দেন অ্যানটোনিয়া। এরপর সম্রাট কনস্ট্যানটাইন দ্য গ্রেট রোম সাম্রাজ্যের পূর্বভাগেও একটি নতুন রাজধানী প্রতিষ্ঠা করতে মনস্থ করেন এবং অনেকগুলি স্থান যথা নিকোমেডিয়া বেসালোনিকা ইত্যাদি দেখার পর বসফরাসের তীরে অবস্থিত বাইজানশন শহরটিকেই নতুন রোম হিসাবে গড়ে তোলার জন্য বেছে নেন। ৩৩০ খ্রিস্টাব্দের ১১ মে নতুন শহর কনস্টান্টিনোপলসকে উৎসর্গ করেন। এর ফলে রোম সাম্রাজ্য কার্যত দু-ভাগে ভাগ হয়ে পড়ে। পশ্চিমের রাজধানী থাকে রোম এবং পূর্বের রাজধানী হয়ে ওঠে কনস্টান্টিনোপলস। কনস্টান্টিনোপলের অধিবাসীরা তাঁদের শহরকে রোমের অন্যতম রাজধানী হিসেবে গণ্য করতেন। ১৪৫৩ সালের ২৯ মে তুর্কি আক্রমণে ভেঙে যাওয়া পর্যন্ত এই অবস্থা বজায় ছিল। যদিও নতুন রোম ক্রিশ্চিয়ান উত্তরাধিকার হিসাবে পেগান রোমের প্রতি উৎসর্গিত হয়নি। কনস্টান্টিনের খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ এবং ৩৯২ খ্রিস্টাব্দে থিয়োডোসিয়াস কর্তৃক খ্রিস্ট ধর্মকে সরকারিভাবে রাষ্ট্রের সংস্কৃতি হিসাবে চালু করলে এই ধারণা ও বিশ্বাসের সৃষ্টি হয় যে শহরটি কুমারীকে উৎসর্গিত একটি পবিত্র দুর্গ

এবং নতুন জেরুজালেম। এখানকার নাগরিকরা কখনো-কখনো তাঁদের বাইজেনটাইন এবং শহরটিকে বাইজেনটিয়াম বললেও প্রায়শই তাঁরা নিজেদের 'রোমায়োই' বলে পরিচয় দিতেন এবং শেষ কয়েক শতাব্দীর মধ্যে তা হয়ে দাঁড়ায় 'হেলেনিজ'। তাঁরা গ্রিক ভাষায় কথা বলতেন এবং লিখতেন। স্বাভাবতই বাইজানটাইন বলতে নিশ্চিতভাবে বোঝায় ৩৩০ খ্রিস্টাব্দের পরবর্তী সময়ে গোঁড়া জনজাতির মধ্যে গড়ে ওঠা সভ্যতা ও সংস্কৃতির শিল্প। তাই বাইজেনটাইন শিল্পকে ৩৩০ থেকে ১৪৫৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কনস্টান্টিনোপলের রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণাধীন অঞ্চলের শিল্প হিসাবে চিহ্নিত করাকে সাধারণ বলে গ্রহণ করা যায় না। আরও কিছু ব্যাখ্যা আছে যাতে বলা হয়েছে প্রকৃত বাইজেনটাইন শিল্প জাস্টিনিয়ানের শাসনকালেই গড়ে উঠেছে।

রোম সাম্রাজ্যের ভাগাভাগির পরেই কিন্তু এখানকার রাজকীয় শিল্প-ঐতিহ্যের বিপথগমন শুরু হয় এবং পুনরায় অবনতি ঘটে পশ্চিমে বর্বরদের আক্রমণের পর। বাইজেনটাইন শিল্পের ওপর নানান শিল্প ঐতিহ্যের প্রভাব পড়েছিল। যার মধ্যে আছে রোম রাজতন্ত্রের প্রভাব, গ্রিক তথা হেলেনিস্টিক শিল্প ঐতিহ্যের প্রভাব, মধ্যপ্রাচ্য এবং প্রাচ্য শিল্প প্রভৃতির প্রভাব। অন্তিম রোমান রীতির আদি ক্রিশ্চিয়ান অভিযোজন থেকে বাইজেনটাইনরা নতুন একধরনের দৃশ্য ভাষা সৃষ্টি করে সংযুক্ত চার্চ এবং রাষ্ট্রের ধর্মমত ও শাস্ত্রীয় আচার ইত্যাদিকে প্রকাশ করেছিলেন। খ্রিস্টীয় পঞ্চম থেকে একাদশ শতাব্দীর মধ্যে বাইজেনটাইন শহরে গড়ে ওঠা এই বিশেষ শিল্পরীতিই বাইজেনটাইন শিল্প। ঘটনাক্রমে বাইজেনটাইন রীতি রাজধানী ছাড়িয়ে ভূমধ্যসাগরীয় দেশ ঘুরে দক্ষিণ ইতালি থেকে বলকান হয়ে রাশিয়া পর্যন্ত বহুদূর ছড়িয়ে পড়েছিল। বাইজেনটাইন শিল্পের তথাকথিত প্রথম স্বর্ণযুগ শীর্ষস্তরে পৌঁছায় ষষ্ঠ শতাব্দীতে সম্রাট জাস্টিনিয়ানের রাজত্বে। তখন স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হেগিয়া সোফিয়া নির্মিত হয়। এটি এখন ইস্তানবুলের প্রধান মসজিদ। এখানে দেখতে পাওয়া যায় বাইজেনটাইন রীতির মুখ্য বৈশিষ্টগুলি যেমন গোলাকৃতি খিলান, বৃত্ত, বিশেষ করে গম্বুজ অট্টালিকার প্রাচীর এবং নানা রঙের মার্বেল এবং অন্যান্য পাথরের কারুকার্য।

এইসব রীতি পশ্চিম ইউরোপের স্থাপত্যকে যে প্রভাবিত করেছিল তার প্রমাণ মেলে ইতালির ভেনিসে সেন্ট ক্যাথিড্রালে। হেগিয়া সোফিয়ার কিছু মোজাইক এখনো টিকে আছে। তবে এ সময়ে রাজধানীর শ্রেষ্ঠ মোজাইকের নমুনা দেখা যায় র‍্যাভেনার গির্জাগুলিতে। সাম্রাজ্যের প্রান্তিক অঞ্চলে হেলেনীয়বাদ টিকে থাকলেও কনস্টান্টিনো-পলের শিল্পকলা অনমনীয় প্রথাসিদ্ধ রক্ষণশীল মূল্যবোধের দ্বারা ধীরে ধীরে রূপান্তরিত হতে থাকে। হেলেনীয় স্বাভাবিকতাবাদ হারিয়ে গিয়ে গভীর আধ্যাত্মিকতার প্রকাশ ঘটে। প্রায়ই তা কমবেশি কঠোরভাবে অনুসরণ করা হত। তা সত্ত্বেও প্রাচীন শিল্পকর্মের কদর ছিল এবং তার অনুকরণও হত বিশেষ করে ম্যাসিডোনীয় রেনেসাঁসের শিল্পীদের দ্বারা। ম্যাসিডোনীয় রেনেসাঁস আসে আইকনোক্লাস্টিক পিরিয়ডের ঠিক পরেই, যে সময় উপাসনামূলক মূর্তি তৈরি কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ ছিল। অভিজাত রীতি হলেও পুঁথি বা পাণ্ডুলিপি অলংকরণের কৌশলগত মান খুবই দুর্বল ছিল। শিল্পীরা ধ্রুপদি এবং প্রাচীন ক্রিশ্চিয়ান মডেল ব্যবহার করতেন তবে তার স্বাভাবিকতাকে অনুসরণ না করে বা তার পরিসরগত প্রয়োগকে না বুঝেই। পাশাপাশি গির্জার সজ্জার আদর্শ মাধ্যমে হিসাবে মোজাইকই বজায় থাকে।

বাইজেনটাইন আর্টের দ্বিতীয় স্বর্ণযুগের উন্মেষকাল হল ১০৫৭ থেকে ১১৮৫ খ্রিস্টাব্দে। গ্রিসের ডেকনির গির্জার মোজাইক এই প্রকাণ্ড ও বিস্ময়কর গুণের সাক্ষী। একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে পশ্চিম ইউরোপে বাইজেনটাইন শিল্প রীতি গৃহীত হলেও সারা পাশ্চাত্যের শিল্পী ও পৃষ্ঠপোষকরা এই সমৃদ্ধ বাইজেনটাইন শিল্পকে আগ্রহের সঙ্গে অনুসরণ ও অনুকরণ করেন মধ্যযুগ ধরে। ভেনিসীয় এবং সিসিলীয় গির্জাগুলির মোজাইক বাইজেনটাইন আর্টের প্রত্যক্ষ প্রভাবের উদাহরণ।

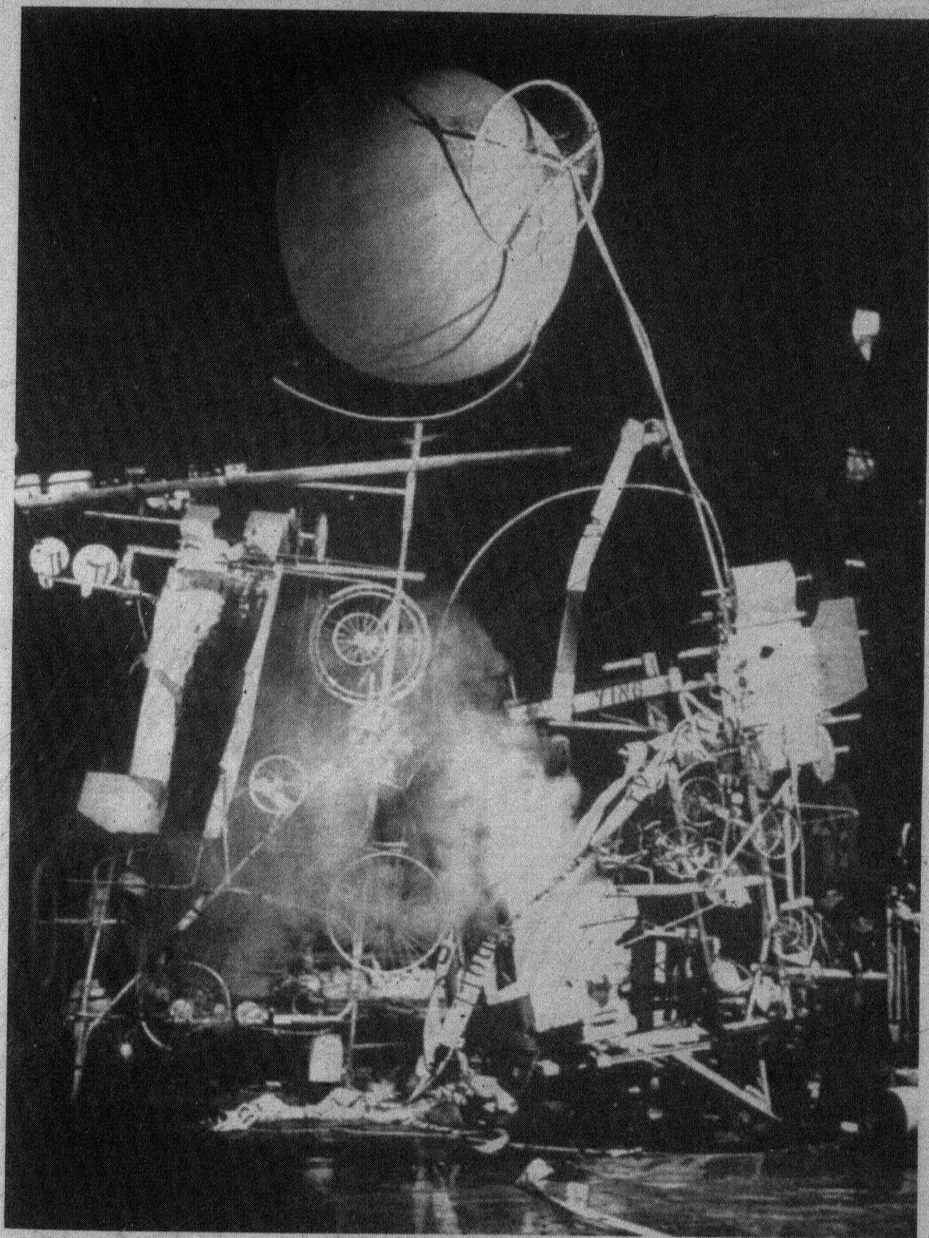
একাদশ শতাব্দীতে কনস্টান্টিনোপল তুর্কদের অধিকারে আসার আগেই গ্রিক অর্থডকস্ চার্চের প্রভাব সার্বিয়া, কিয়েভ-রুশ, বুলগেরিয়া ইত্যাদি স্লাভ অধ্যুষিত অঞ্চলে বিস্তার লাভ করে। অনেক স্লাভ রাজাই গ্রিক যাজকদের সঙ্গে চিত্রকর, ভাস্কর ও স্থপতিদের নিজ নিজ দেশে আমন্ত্রণ করে নিয়ে আসেন। এই সময় এই সব দেশগুলোতে যে সব স্থাপত্য, সৌধ নির্মাণ, মূর্তি তৈরি, চিত্রাঙ্কন সহ কাঠের

কাজ, টেম্পারা ইত্যাদি শিল্প. তেল রঙে সাধুসন্তদের আঁকা ছবি, রঙিন কাঁচ জুড়ে স্টেইন গ্লাস নকশা, দুর্গ, গির্জাতে ঝোলানো কাপড়ের নকশা, উপসনাগৃহে ঝুলিয়ে রাখার জন্য যিশু, মেরি, সাধুসন্তদের ছবি সম্বলিত লকেট সবই বাইজেনটাইন শিল্পের নিদর্শন। এমনকি কাল এবং স্থানভেদে এই সব অঞ্চলে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত উচ্চমার্গীয় স্থাপত্য, ভাস্কর্য এবং চিত্রকলাও মূলত বাইজেনটাইন শিল্পকলা। বাইজেনটাইন আর্টের তৃতীয় স্বর্ণযুগ হল ১২৬১-১৪৫৩ খ্রিস্টাব্দ। এই সময় স্বাধীনভাবে ঐতিহ্যগত যাজকতান্ত্রিক রীতির অগ্রগতি ঘটে। কেবলমাত্র ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীতে কষ্টশীল মোজাইকের স্থান নেয় ফ্রেস্কো।

বাইজেনটাইন স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য হল স্তম্ভহীন দেয়ালের ওপর অর্ধবৃত্তাকার খিলান, সমবাহু ত্রিভূজাকৃতি দোতলা ছাদ। দরজার ওপর সমবাহু খিলান এবং পেঁয়াজের মতো



নং ১৪৪. কনস্টান্টিনোপল : সন্ন্যাসীদের মধ্যে ম্যাডোনা। সপ্তদশ শতাব্দী।



নং ১৪৫. জঁ ত্যাঁজলি : হোমেজ টু নিউইয়র্ক। ১৯৬১। মিশ্র মাধ্যম।
ব্যবহৃত বস্তুগুলি নিজে থেকেই ধ্বংস হয়ে যেতে পারে।



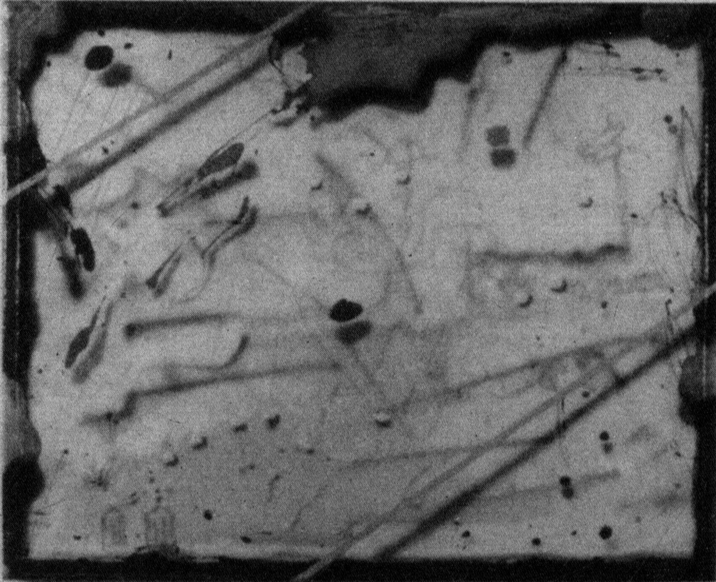
নং ১৪৬. মসজিদের বাতিদান। ১৫৫৭ খ্রিস্টাব্দ।
উচ্চতা ১৯ ইঞ্চি। তুরস্ক।

নং ১৪৭. জ্যাকসন পোলক তাঁর লং আইল্যান্ডের স্টুডিয়োতে কাজ করছেন। ১৯৫০।



নং ১৪৮. প্রতিনিধিরা উপহার নিয়ে চলছেন। ৪৯০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ। চুনাপাথর।
২৬০X১৫০ সেমি.। পারস্য।

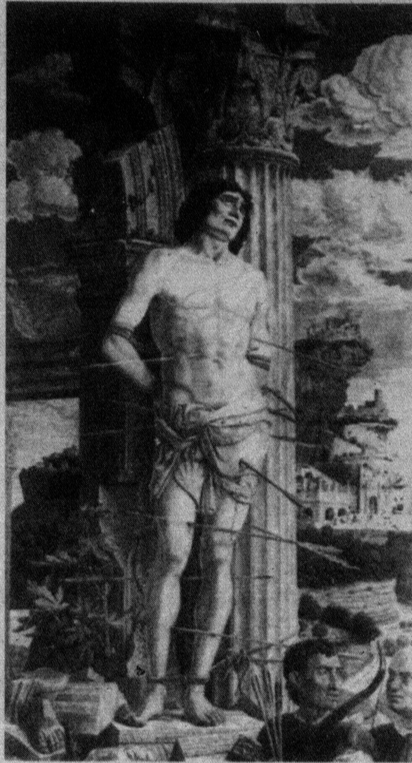
নং ১৪৯. জ্যাক লেমবেক : স্টার ওয়ারস II। ১৯৭৮।



নং ১৫০. হোলবাইন : অ্যানামরফোসিস। 'দি অ্যাম্বাসাডারস'। ১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দ। বাঁ দিকের নীচের কোণটিকে চোখ বরাবর করে তুলে ধরলে বোঝা যাবে যে ছবির নীচের লম্বাটে বস্তুটি আসলে একটি করোটি।

নং ১৫১. প্রোসারপিনা সারকোফাগাস। দ্বিতীয়-তৃতীয় শতাব্দী। সেন্ট মিকেল চ্যাপেলের রিলিফ।





নং ১৫২. ম্যান্তেগ্র : সেন্ট সেবাস্তিয়ান। ১৪৭০ খ্রিস্টাব্দ।
প্যানেলের ওপর টেম্পারা। ১৫৭X১৪২ সেমি.।

নং ১৫৩. জঁ মার্ক নাতিয়ে : কুইন মারি লেকজিনস্কা। ১৭৪৮।
ক্যানভাসের ওপর তেল রং। ১৩৫X৯৮ সেমি.।





নং ১৫৪. ফিলিপ পার্লস্টাইন : টু ফিমেল মডেলস উইথ রিজেন্সি সোফা।
১৯৭৪। ক্যানভাসের ওপর তেল রং। ১৫২.৪ X ১৮২.৯ সেমি.।

নং ১৫৫. কুমোরের চাকে মাটির পাত্র।





নং ১৫৬. ইংল্যান্ডের সলিসবারি ক্যাথিড্রালের মূল অংশ। ত্রয়োদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগ।

নং ১৫৭. এমিল নোলডে : লাস্ট সাপার। ১৯০৯।
ক্যানভাসের ওপর তেল রং। ৮৬X১০৭ সেমি.





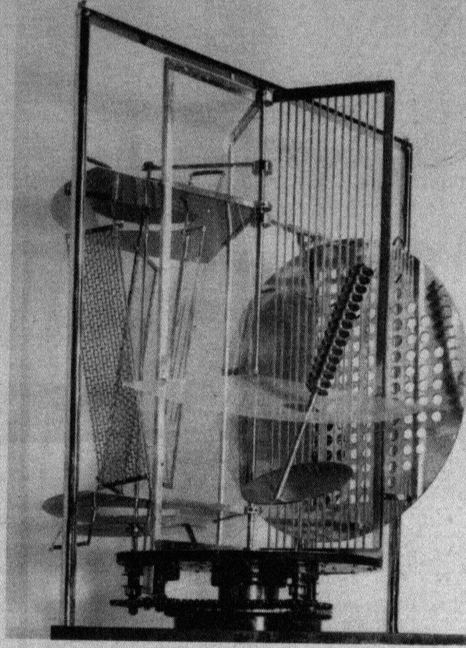
নং ১৫৮. জেমস ম্যাকলেন হুইসলার : নর্কটান ইন ব্ল্যাক অ্যান্ড গোল্ড - দি ফলিং রকেট।
১৮৭৫। প্যানেলের ওপর তেল রং। ৬০.৩X৪৬.৬ সেমি.।



নং ১৫৯. আংগ্রে : ল্য গ্রঁ ওদালিস্ক। ১৮১৪। ক্যানভাসের ওপর তেল রং। ৮৯.৭X১৬২ সেমি.।

নং ১৬০. বরার্ট রসখেনবার্গ : বেড। ১৯৫৫।
বিছানার চাদরে পেন্ট মাখিয়ে তৈরি।

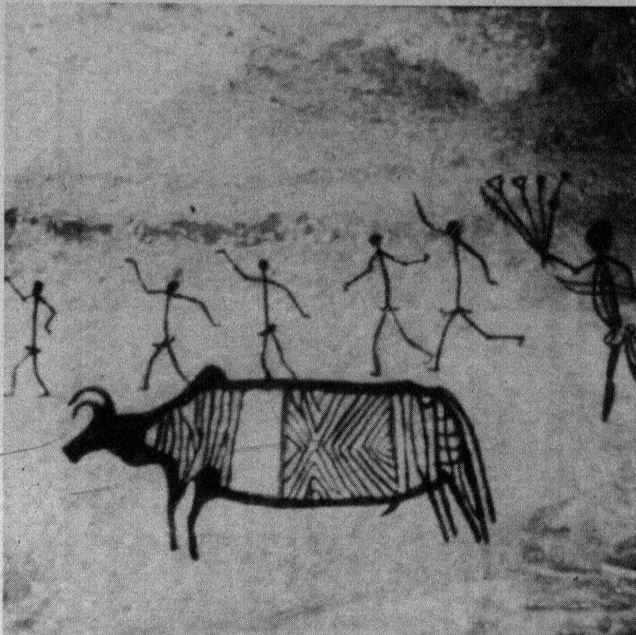




নং ১৬১. ল্যাসলো মোহলি-ন্যাগি : লাইট স্পেস মডিউলেটর।
১৯২২-৩০। ইস্পাত, প্লাস্টিক,
কাঠ ও ইলেকট্রিক মোটর দিয়ে তৈরি।

নং ১৬২. কালীঘাটে পট যশোধা ও কৃষ্ণ।
অনুমানিক ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দ।





নং ১৬৩. ভীমবেটকার প্রস্তরচিত্র শিকার নৃত্য।
৫৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ। উচ্চতা ২০ ইঞ্চি।

নং ১৬৪. ক্যারেল অ্যাপেল : উইলেম স্যান্ডবার্গের প্রতিকৃতি।
১৯৫৬। ক্যানভাসের ওপর তেল রং। ১৩০.২X৮১ সেমি.।





নং ১৬৫. এবো গসপেল : ক্যারোলিনজিয়ান রেনেসাঁস।
৮৩০ খ্রিস্টাব্দ। ভেলাসের ওপর কালি ও রং।
২২X২৬.২ সেমি.।

নং ১৬৬. মার্ক টোবি : ক্যালিগ্রাফিক পেন্টিং।
১৯৬০। ক্যানভাসের ওপর তেল রং।





নং ১৬৭. গ্লাসগো স্কুল : চার্লস বেনি ম্যাকিনটোশ লাইব্রেরি। ১৯০৭ - ০৯।

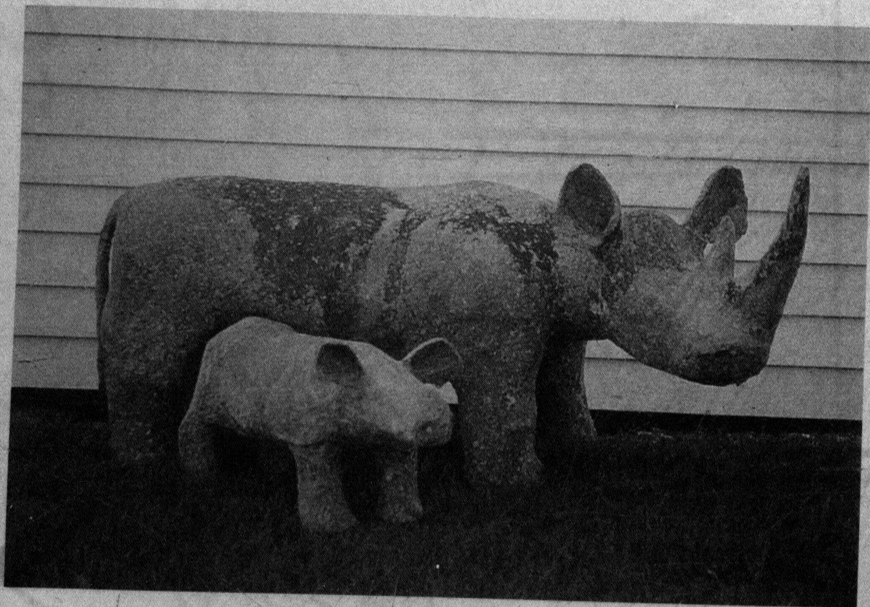
নং ১৬৮. হুয়াং চুয়াং : শৈল শহর। ১৯৮১। পেন, প্যাস্টেল, জল রং।





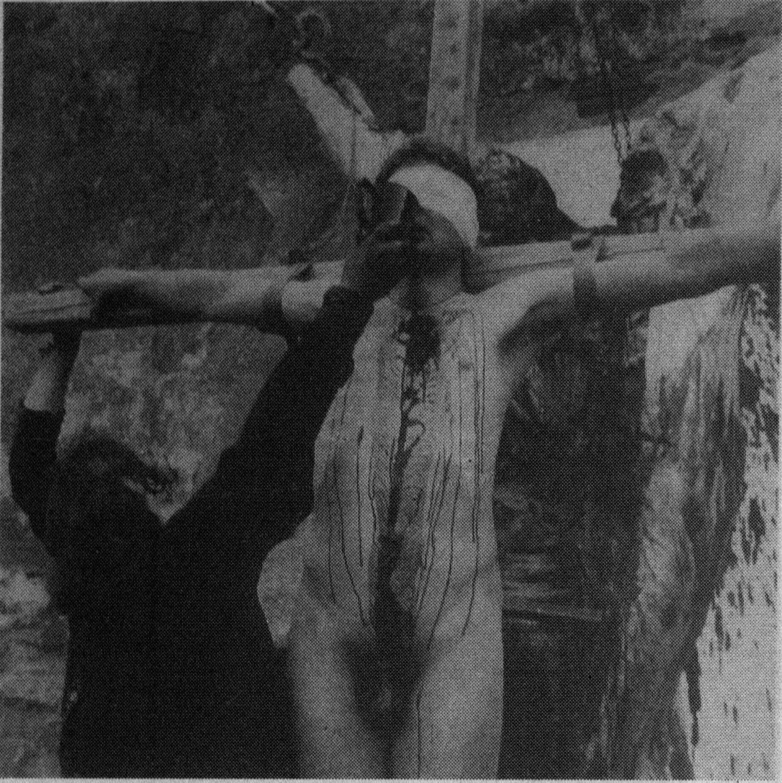
নং ১৬৯. র‍্যাফেলে পেলি : স্নানের শেষে। ১৮২৩। ক্যানভাসের ওপর তেল রং।

নং ১৭০. পাপিয়ের মাশ। দঁ পেজ : মাদার অ্যান্ড চাইল্ড। কাগজের মণ্ড, টুকরো কাগজ, আঠা। ৪৬ ইঞ্চি লম্বা। ১৯ ইঞ্চি উঁচু।





নং ১৭১. থাংকা। দি গডেস তারা, ইনকারনেশন অব বুদ্ধিস্ট উইসডম। সপ্তদশ শতাব্দী।



নং ১৭২. হারম্যান নিট্‌শ : পারফর্ম্যান্স। ১৯৭৫। ওরগিস থিয়েটারের ৫০তম অ্যাকশন। অস্ট্রিয়া।

নং ১৭৩. পিটার আর্টসেন : দ্য মিট স্টল। ১৫৫১ প্যানেলের ওপর তেল রং। ১২৩.৩ X ১৫০ সেমি.।





নং ১৭৪. কার্লো কারা : দি ইঞ্জিনিয়ারস মিস্ট্রেস।
১৯২১। ক্যানভাসের ওপর তেল রং।

নং ১৭৫. সেজান : আপেল ও কমলালেবু। ১৮৯৭। ক্যানভাসের ওপর তেল রং। ৭৩X৯২ সেমি.।



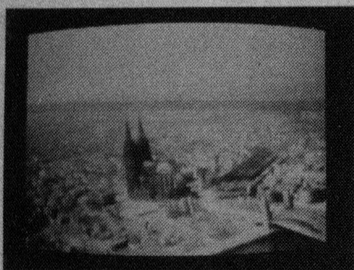


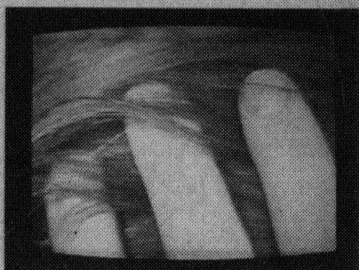
নং ১৭৬. এ.আর.পেংক : 'জার্মানিতে আমি'। ১৯৮৪। কাপড়ের ওপর অ্যাক্রিলিক রং।। ৬X১২ মিটার।

নং ১৭৭. উমবার্তো বোসিয়োনি : দি স্ট্রিট পেনিট্রেটস দি বিল্ডিং। ১৯২১। ক্যানভাসের ওপর তেল রং।



নং ১৭৮. বারোক শিল্প। গিয়ানলোরেঞ্জো বেরনিনি : দ্য এক্সট্যাসি অব সেন্ট তেরেজা।
১৬৪৫-৫২। মার্বেল। উচ্চতা ৩.৫ মিটার। রোম।

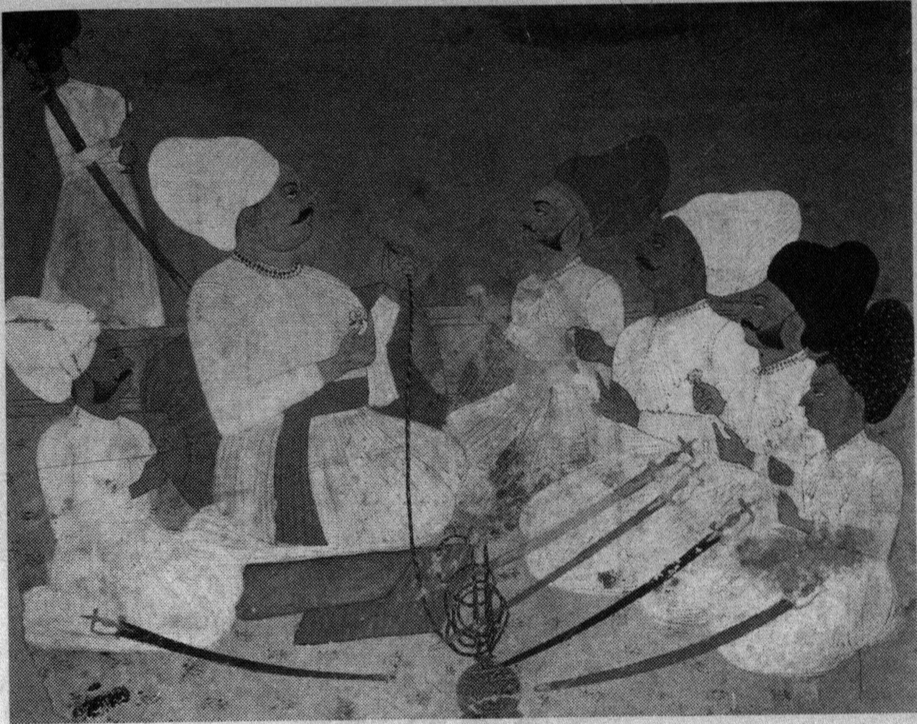


নং ১৭৯. ভিডিয়ো আর্ট। ক্লস ভন ব্রুস : দি অ্যালায়েড ব্র্যান্ড। ১৯৮২।
ভিডিয়োটেপ, রং,শব্দ। দশ মিনিট। বন।

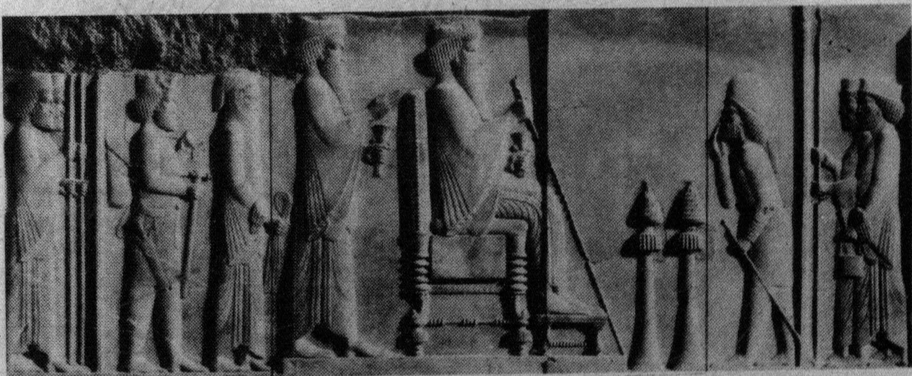
নং ১৮০. অ্যানসেম কিইফার : টু দি আননোন পেন্টার। ১৯৮৩।
ক্যানভাসে তেল, ইমালশন, উডকাট, চাচগালা, ল্যাটেক্স, খড় ইত্যাদি। ৯.২X৯.২ ফুট।





নং ১৮১. রাজা অজিত সিং। মেবার মিনিয়েচার স্কুল। ১৭২৫। ২২X২৮ সেমি.

নং ১৮২. পারস্য। রিলিফ দারিয়ুস এবং জারজেক্স সাক্ষাৎকার দিচ্ছেন।
৪৯০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ। চুনা পাথর। উচ্চতা ২.৫ মিটার।





নং ১৮৩. আরলি রেনেসাঁস। আন্দ্রিয়া দেলারোবিয়া : দুজন দেবদূতের মধ্যে ম্যাডোনা ও শিশু।
১৪৭০। গ্লেজড় টেরাকোটা। ব্যাস ১ মিটার।

নং ১৮৪. হাই রেনেসাঁস। র‍্যাফায়েল : আলবা ম্যাডোনা।
১৫১০। প্যানেলের ওপর তেল রং। ব্যাস ৯৪.৫ সেমি.।





নং ১৮৫. রোকোকো। থমাস গেইনসবোরা : মি. এবং মিসেস অ্যান্ড্রুজ।
১৭৫০। ক্যানভাসের ওপর তেল রং ৭০ X ১১৯ সেমি.।

নং ১৮৬. মিচেল হেইজার : ডবল নেগেটিভ। ১৯৬৯। ভার্জিন রিভার। ৪৫৭ X ১৫ X ৯ মিটার
গর্ত খুড়ে ২৪০০০০ টন বেলেপাথর তোলা হয়েছিল।



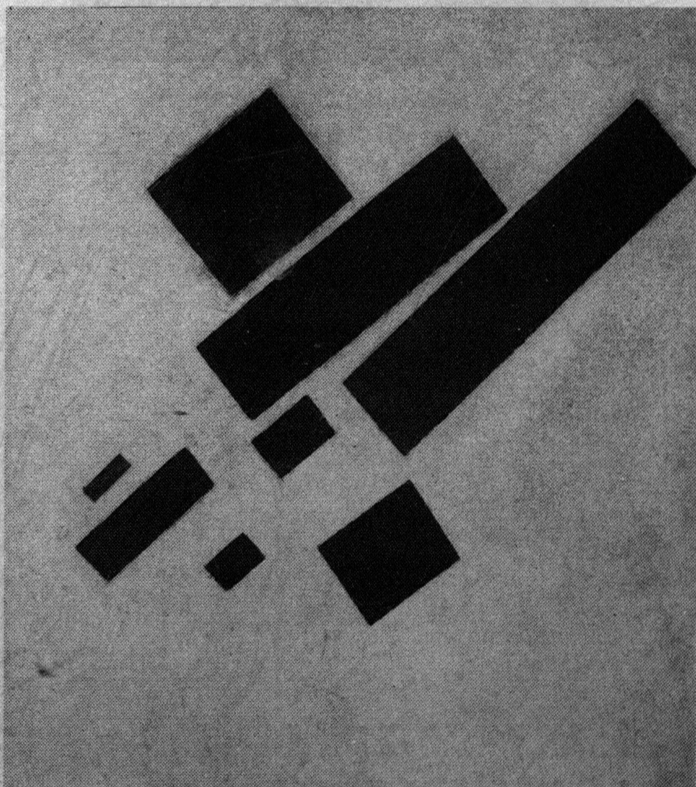


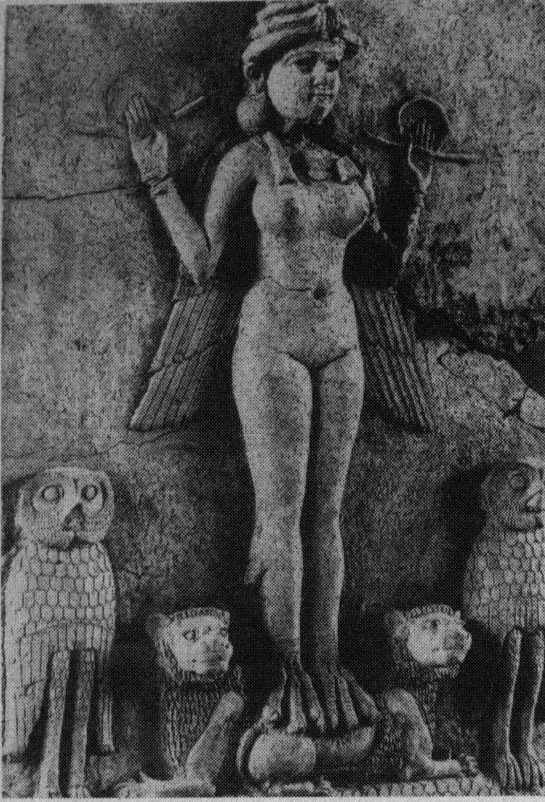
নং ১৮৭. মা ইউয়ান : চাঁদের আলোয় ভূদৃশ্য। ১২১০।
সিল্কের উপরে কালি ও রং। ১৫০X ৭৮ সেমি.।



নং ১৮৮. ফার্দিনান্দ হোল্ডার : রাত্রি। ১৮৯০। ক্যানভাসের ওপর তেল রং। ১৯১X১১৬ সেমি.। সুইজারল্যান্ড।

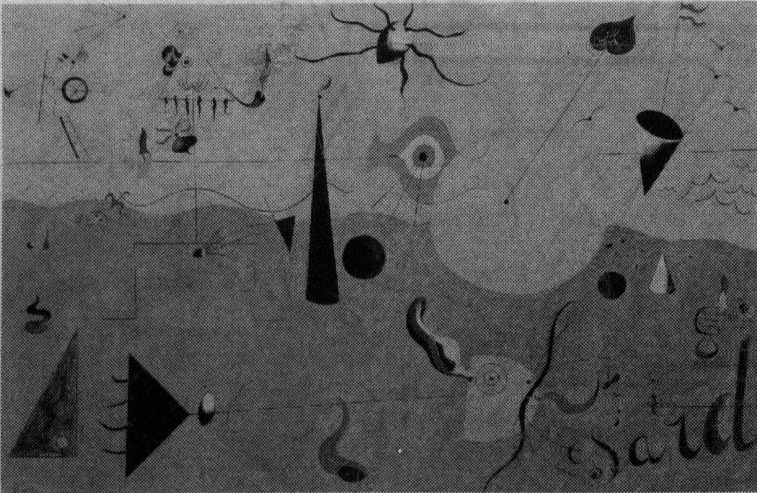
নং ১৮৯. মালেভিচ : আটটি আয়তক্ষেত্র। ১৯১৫। ক্যানভাসের ওপর তেল রং। ২২.৫X১৯ ইঞ্চি।

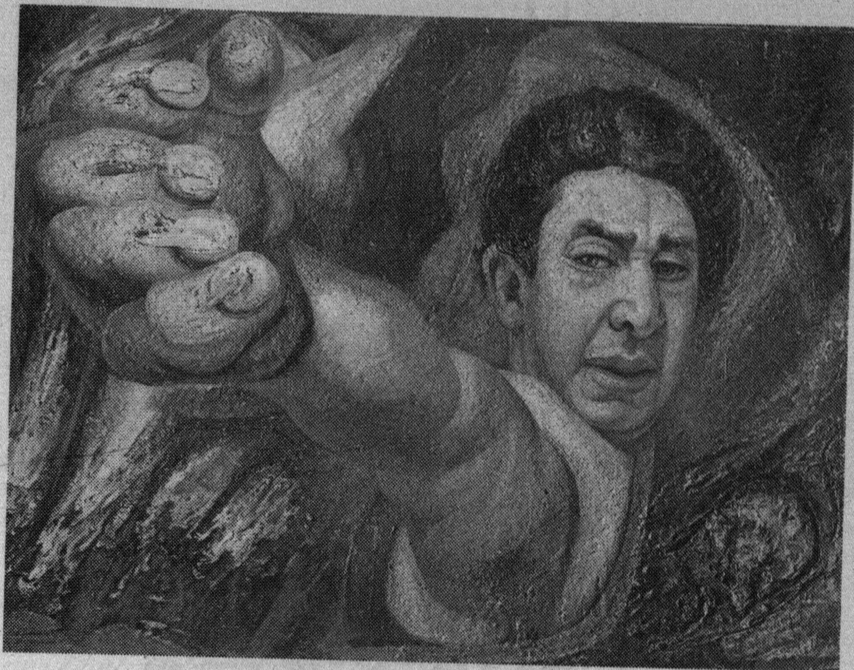




নং ১৯০. লাইলিথ : ২০২৫ - ১৭৬৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দ।
টেরাকোটা। উচ্চতা ৫০.৮ সেমি.।

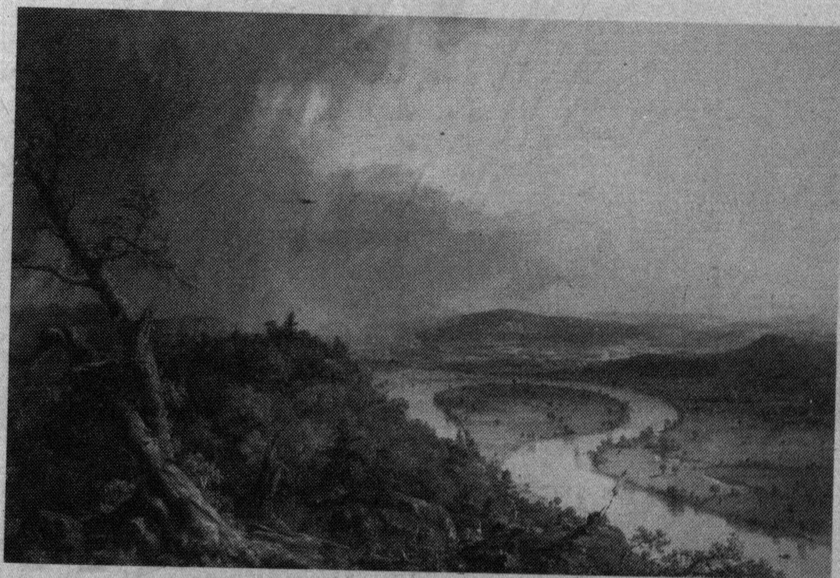
নং ১৯১. জন মিরো : দ্য হান্টার।
১৯২৩। ক্যানভাসের ওপরে তেল রং। ৬৫X১০০ সেমি.।

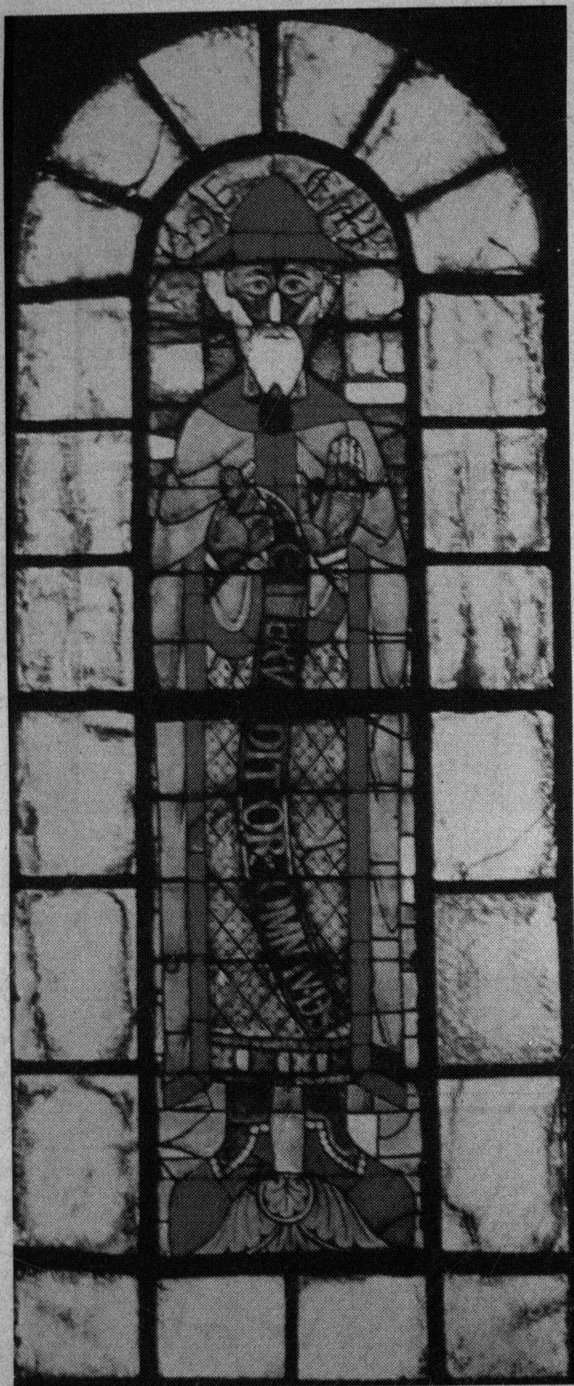




নং ১৯২. ডেভিড সিকেরাস : আত্মপ্রতিকৃতি। ১৯৪৩। ক্যানভাসের ওপর তেল রং। মেক্সিকো।

নং ১৯৩. থমাস কোলে : হাডসন নদীর দৃশ্য। ১৮৩৬। ক্যানভাসের ওপর তেল রং। ১৩১X১৯৩ সেমি.।





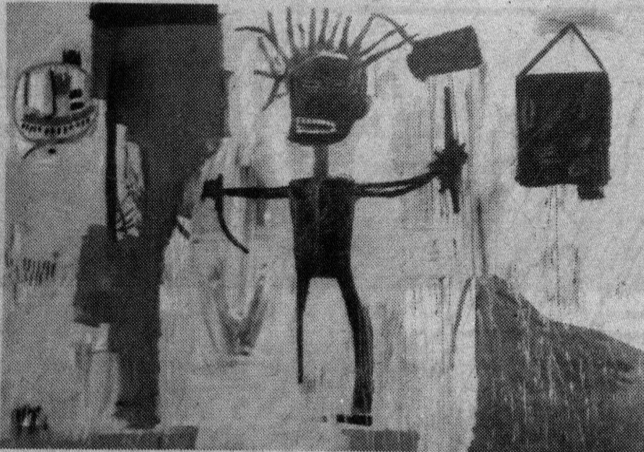
নং ১৯৪. এ প্রফেট। অ্যাসবার্গ চ্যাপেলের জানলার স্টেইন্ড গ্লাস।



নং ১৯৫. লিয়োনার্দো দা ভিঞ্চি : মোনালিসা। ১৫০৩ - ১৫০৬। কাঠের ওপর তেল রং। ৭৭X৫৩ সেমি.।

নং ১৯৬. পিকাসো : দেমোয়াজেল দা'ভিনিয়োঁ। ১৯০৭। ক্যানভাসের ওপর তেল রং। ২২৪X২২৩ সেমি.।

নং ১৯৭. জঁ মাইকেল বাস্কিয়াত। ১৯৮৬। ক্যানভাসের ওপর অ্যাক্রিলিক রং।
১৮০X২৬০ সেমি.।





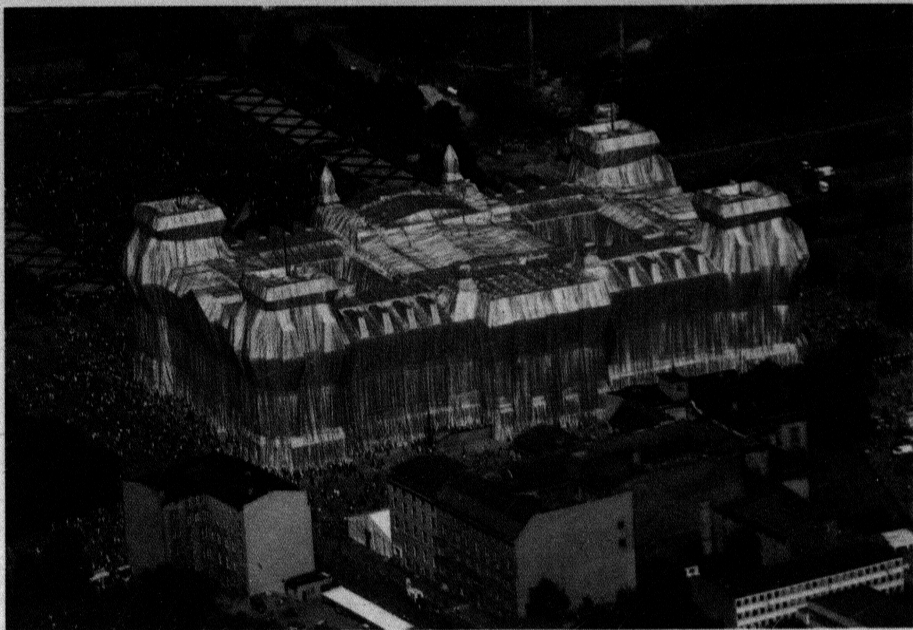
নং ১৯৮. নটরাজ। চোল আমল। ১০৫০। ব্রোঞ্জ। উচ্চতা ৯৬ সেমি.।



নং ১৯৯. পোস্টমডার্নিজ্‌ম। জর্জ বেসিলিট্‌স : আত্মপ্রতিকৃতি বিপর্যয়। ১৯৮৭। ক্যানভাসের ওপর প্যাস্টেল ও তেল রং। ২.৫X২ মিটার।

নং ২০০. ওয়াল্টার ক্রেন : রাজনৈতিক কার্টুন। ১৮৪৬। উডকাট।





নং ২০১. অঁপাকেতাজ । ক্রিস্তো জাভাশেফ এবং জঁ কোলো : আচ্ছাদিত রাইখস্ট্যাগ। ১৯৭১-৯৫। এখন উন্মুক্ত।

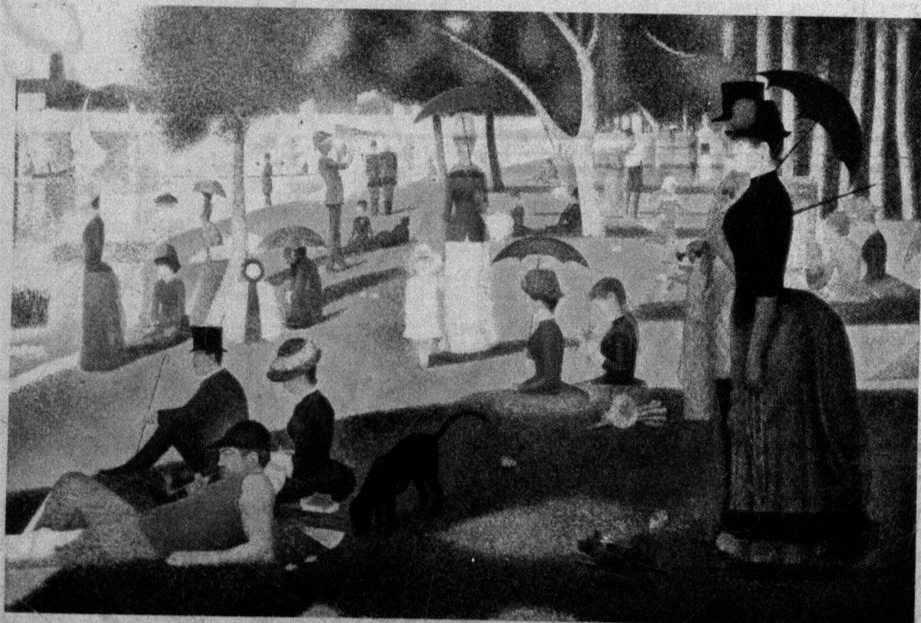
নং ২০২. কুর্ট শিটার্স : রিলিফ। ১৯২৩। কাঠের ওপর
নানা জিনিসের কোলাজ। ৩৫.৫X৩০ সেমি.।

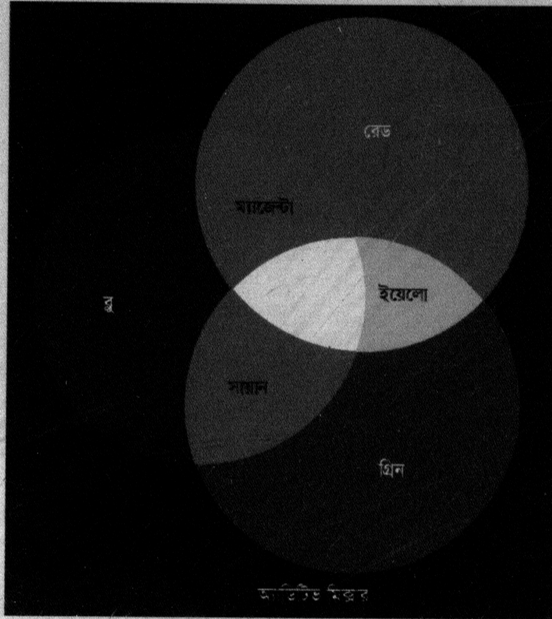




নং ২০৩. ইম্প্রেশনিজ্‌ম। ক্লোদ মনে : 'ইম্প্রেশন সানরাইজ'। ১৮৭২। ক্যানভাসের ওপর তেল রং। ৪৫.১X৫৫.২ সেমি.।

নং ২০৪. পয়েন্টিলিজ্‌ম। স্যুরা : সানডে আফটারনুন অন দি আইল্যান্ড অব ল্য গর্দ-জেটি।
১৮৮৪ - ৮৬। ক্যানভাসের ওপর তেল রং। ২০৫.৭X৩০৫.৮ সেমি.।

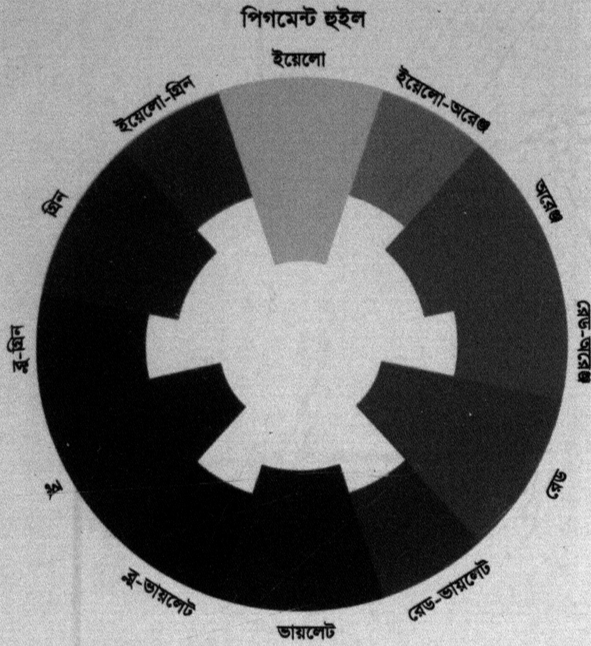




নং ২০৫. অ্যাডিটিভ মিশ্রণ। তিনটে রঙের আলোর এরকম মিশ্রণ উপজাত হিসাবে নতুন তিনটি বর্ণের সৃষ্টি করে। এই বর্ণ তিনটি প্রসেস পিগমেন্টের মূলবর্ণ হিসাবে কাজ করে।

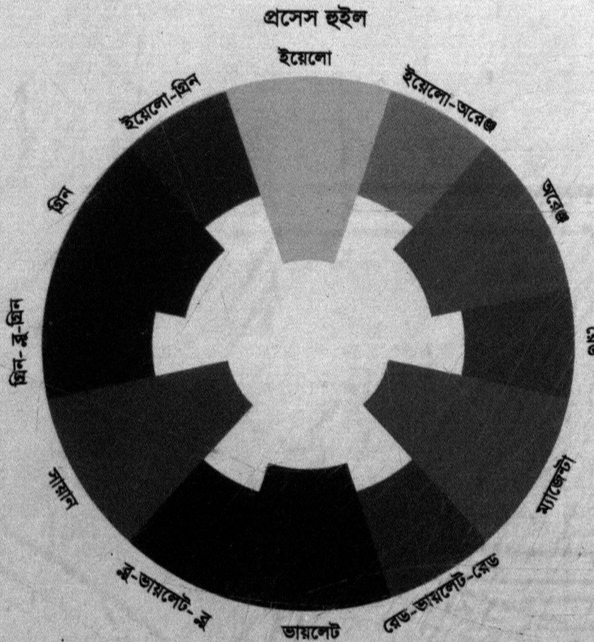
নং ২০৬. পিগমেন্টের প্রাইমারি, সেকেন্ডারি এবং টার্শারি বর্ণশ্রেণি।

ইয়েলো	ইয়েলো-অরেঞ্জ-ইয়েলো	ইয়েলো-অরেঞ্জ	অরেঞ্জ-ইয়েলো-অরেঞ্জ
অরেঞ্জ	অরেঞ্জ-রেড-অরেঞ্জ	রেড-অরেঞ্জ	অরেঞ্জ-রেড-অরেঞ্জ
রেড	রেড-ভায়লেট-রেড	রেড-ভায়লেট	ভায়লেট-রেড-ভায়লেট
ভায়লেট	ভায়লেট-ব্লু-ভায়লেট	ব্লু-ভায়লেট	ভায়লেট-ব্লু-ভায়লেট
ব্লু	ব্লু-গ্রিন-ব্লু	ব্লু-গ্রিন	গ্রিন-ব্লু-গ্রিন
গ্রিন	গ্রিন-ইয়েলো-গ্রিন	ইয়েলো-গ্রিন	ইয়েলো-গ্রিন-ইয়েলো



নং ২০৭. পিগমেন্টের বর্ণচক্র। এই বারো পর্যায়ে দুটো প্রাইমারি মিশে একটি করে সেকেন্ডারি এবং দুটো সেকেন্ডারি মিশে একটি করে টার্শারি বর্ণ তৈরি করে।

নং ২০৮. প্রসেস কালার হুইল। বারো পর্যায়ের এই বর্ণচক্রে প্রাইমারি এবং টার্শারি রংগুলি একটু আলাদা কিন্তু সেকেন্ডারি রংগুলি একই। এটা প্রকৃত অর্থে সাবট্রাকটিভ মিশ্রণ। সাধারণভাবে এই বর্ণচক্র মুদ্রণের রঙের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়।

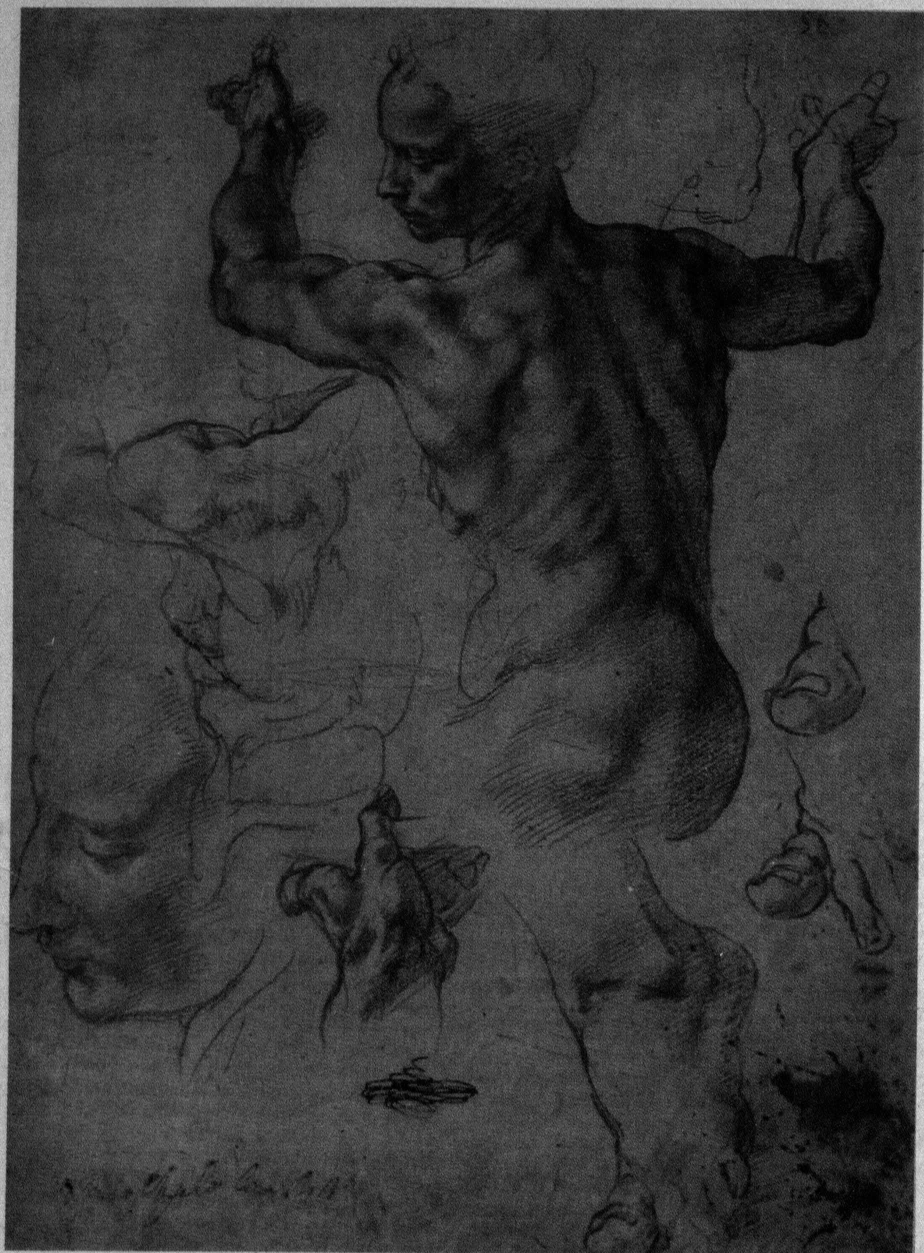




নং ২০৯. পালযুগের চিত্রকলা অষ্ট সহস্র প্রজ্ঞাপারমিতা। বোধিসত্ত্ব সামন্তভদ্র সঙ্গে বৌদ্ধ প্রজ্ঞার আবির্ভাব - তারা এবং বামনরূপী আচার্য বজ্রপাণি। ১২২০ খ্রিস্টাব্দ।

নং ২১০. নিহাল চাঁদ : কিষেণগড়ের রাধা। রাজস্থানি চিত্র। ১৭৬০।
কাগজের ওপর তেল রং। ১১X১৪ ইঞ্চি।

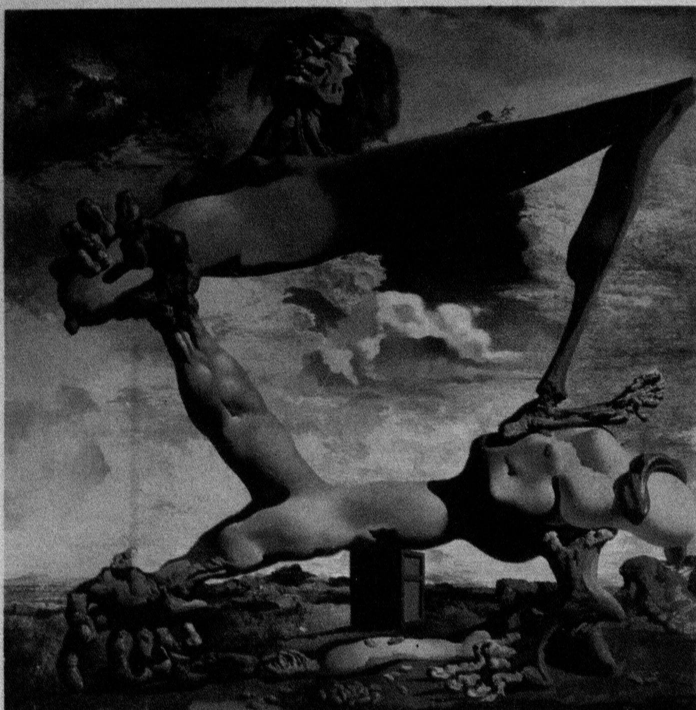




নং ২১১. মাইকেলাঞ্জেলো : লিবিয়ান সিবিলের অনুশীলন। ১৫১১।

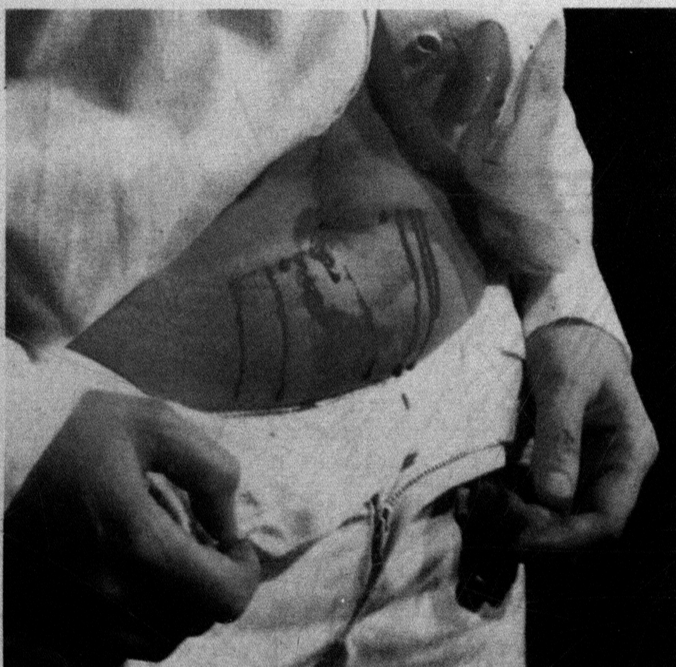


নং ২১২. ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার : শকুন্তলা। কাগজের ওপর টেম্পারা এবং ওয়াশ।



নং ২১৩. সালভাদোর দালি : সফ্‌ট কনস্ট্রাকশন উইথ বয়েল্‌ড বিন্‌স (সিভিল ওয়ার ইন ফ্রান্স)।
১৯৩৬ ক্যানভাসের ওপর তেল রং। ১০০X৯৯ সেমি.।

নং ২১৪. জিনা পেন : বডি আর্ট। অ্যাকশন সাইকি। ১৯৭৪।





নং ২১৫. গোইয়া :১৮০৮ সালের ৩ মে। ১৮১৪। ক্যানভাসের ওপর তেল রং। ২৬৬X৩৪৫ সেমি.। স্পেন।

নং২১৬. কুর্বে: দি আর্টিস্টস স্টুডিয়ো। ১৮৫৫। ক্যানভাসের তেল রং। ৩৬১X৫৯৮ সেমি.।
শিল্পীর স্টুডিয়োতে সাধারণ মানুষের উপস্থিতির মধ্যে শিল্পীর বন্ধু
বোদলেয়রকে দেখা যাচ্ছে (একবারে ডান দিকে)।





নং ২১৭. ফ্রাঙ্ক ওয়েব : ভেরো বিচ। ১৯৮৭। জল রং। ১৫ X২২ ইঞ্চি।

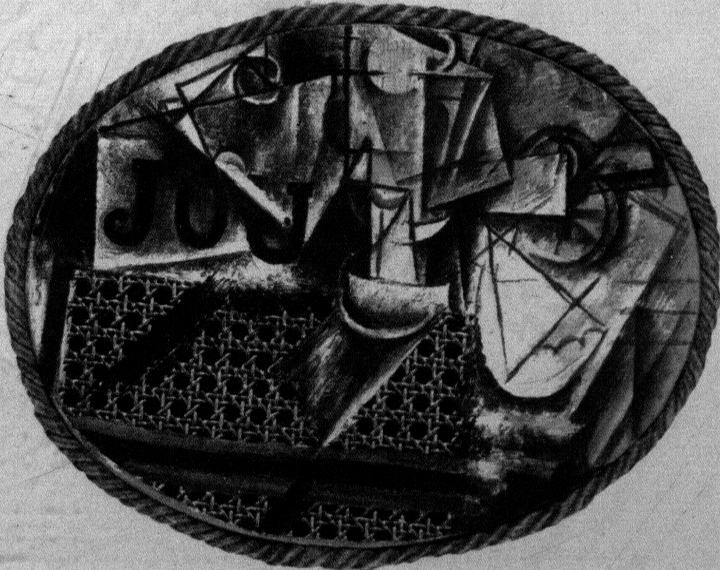
নং ২১৮. ফভিজ্‌ম। আঁরি মাতিস : মাদাম মাতিসের প্রতিকৃতি। দি গ্রিন লাইন। ১৯০৫। ক্যানভাসের ওপর তেল রং। ৪০.৩X৩২.৭ সেমি।





নং ২১৯. কিউবিজ্‌ম। জর্জ ব্রাক : ল্যান্ডস্কেপ অ্যাট ল্য' এস্তাক। ১৯০৮।
ক্যানভাসের ওপর তেল রং।

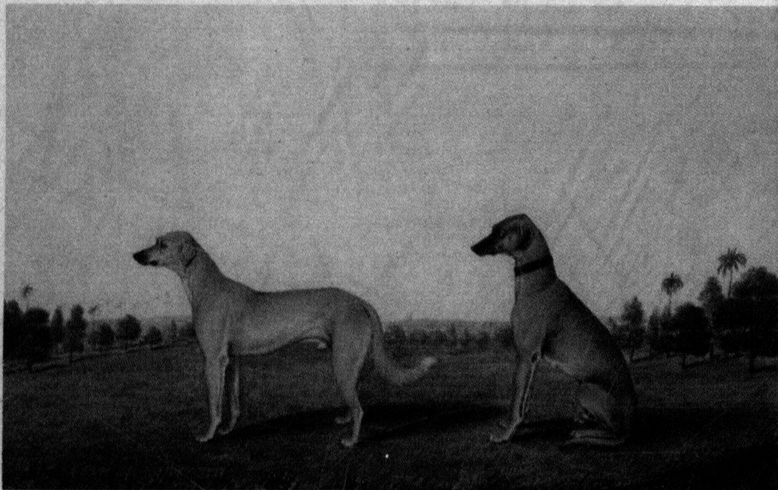
নং ২২০. সিনথেটিক কিউবিজ্‌ম। পিকাসো : স্টিল লাইফ উইথ চেয়ার ক্যানিং।
১৯২২। ক্যানভাসের ওপর তেল রং ও অয়েল ক্লথের টুকরো।
ক্যানভাসের চারধার দড়ি দিয়ে মোড়া। ২৭X৩৭ সেমি।

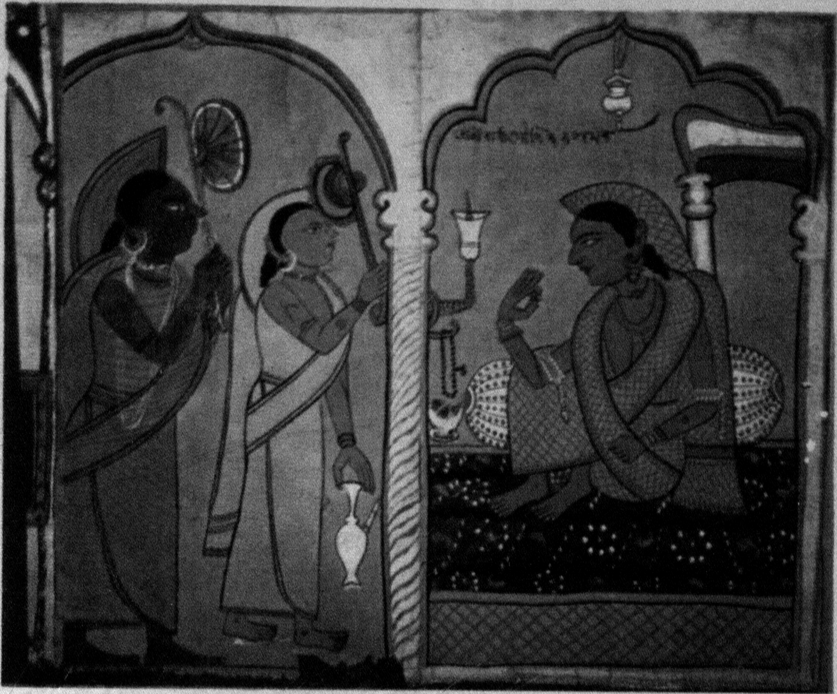




নং ২২১. দরবারি চিত্রকলা। আবুল ফজলের আকবরনামা। ১৫৯৫।
রেখা বসওয়ান। রং ছুতাই। কাগজের ওপর জল রং।

নং ২২২. কোম্পানি স্কুল। শেখ মহম্মদ আমির : চারণভূমিতে দুটো কুকুর।
১৮৪৫ - ৫০ খ্রিস্টাব্দ। কলকাতা।





নং ২২৩. জাদুপট পারলৌকিক চিত্র। উনবিংশ শতাব্দী। ২১X১৮ ইঞ্চি। বিনপুর। মেদিনীপুর।

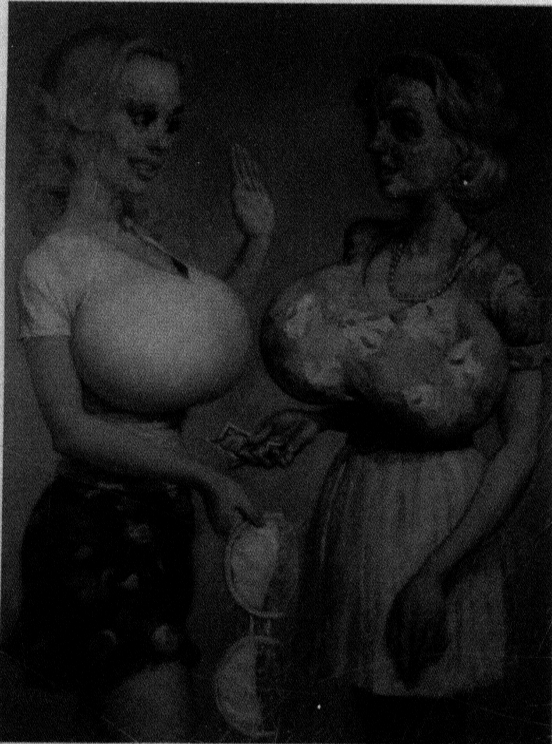
নং ২২৪. মাতিস : সরো অব দি কিং। ১৯৫২। কাগজের ওপর গুয়াশ ও রঙিন কাগজের টুকরো।
মাতিসের ভাষায় 'কাটিং দি কালার আউট অ্যালিভ'।

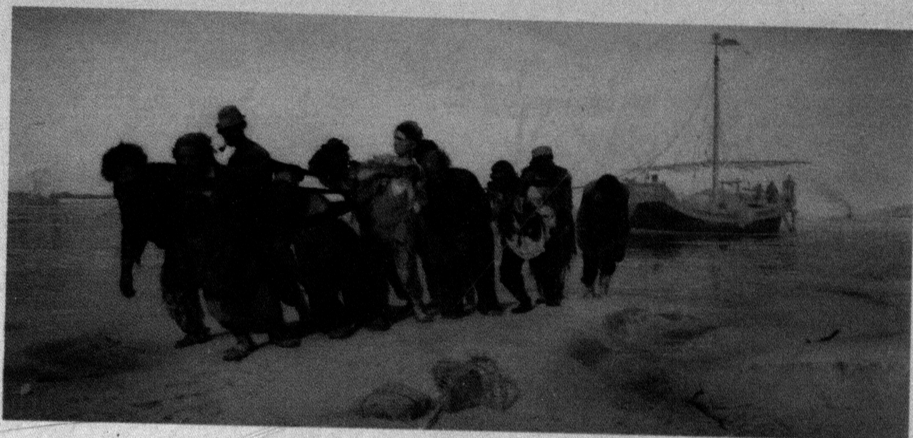




নং ২২৫. পপ আর্ট। উল্ফ ভোসেল : কোকাকোলা। ১৯৬১।

নং ২২৬. জন কুরিন : জন্টি অ্যান্ড মেইনি।
১৯৯৭। ক্যানভাসের ওপর অ্যাক্রিলিক রং।

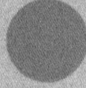
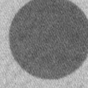
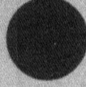
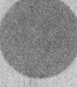
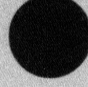
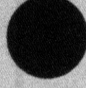
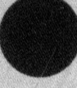
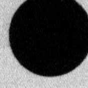
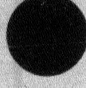
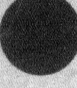
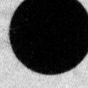
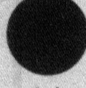
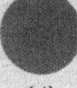
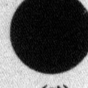




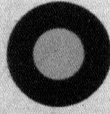
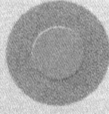
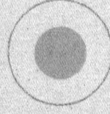
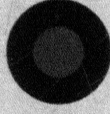
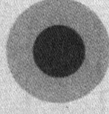
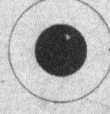
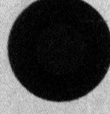
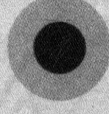
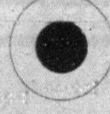
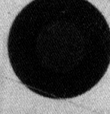
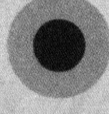
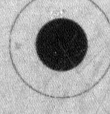
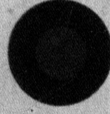
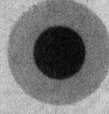
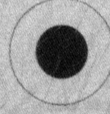
নং ২২৭. সোশ্যাল রিয়ালিজ্ম। রেপিন : ভোলগার বার্জশ্রমিক। ১৮৭৩। ক্যানভাসের ওপর তেল রং। ১৩২X২১৪ সেমি.। রাশিয়া।

নং ২২৮. ব্লু রাইডার ক্যান্ডিন্স্কি : ইম্প্রোভাইজেশন ॥। । ১৯০৯। ক্যানভাসের ওপর তেল রং। ৯৪X১৩০ সেমি.।



বিশুদ্ধ রং	রং অনুযায়ী ভ্যালু	রঙিন ধুসর
		
		
		
		
		
(ক)	(খ)	(গ)

নং ২২৯. ভ্যালু। তিন সারি রঙের প্রথম সারি 'ক'-তে মুনসেলের মূলবর্ণ সমূহকে দেখানো হয়েছে। 'খ'-তে দেখানো হয়েছে এইসব মূলবর্ণের মূল্যমানের সমতুল্য গ্রে রং এবং 'গ'-তে দেখানো হয়েছে 'ক' ও 'খ' এর মিশ্রণকে।

		
		
		
		
		
(ক)	(খ)	(গ)

নং ২৩০. বিভিন্ন পশ্চাৎপটের বিচারে নানান রং বা হিউর মুল্যমান বা ভ্যালু। মুনসেলের পাঁচটি প্রাথমিক রংকে ব্যবহার করা হয়েছে। সাদা ও কালো প্রেক্ষাপটে একই হিউর মুল্যমানের হ্রাস বৃদ্ধিকে দেখানো হয়েছে।

উলটানো গম্বুজ অলংকৃত ক্রশের আকারের ভূমিনকশা। বাইজেনটাইন ভাস্কর্য ও চিত্রকলায় ব্যবহৃত মূর্তির প্রধান বৈশিষ্ট্য হল তা অসাধারণ লম্বা এবং ক্ষীণকায়। সেই সঙ্গে আরও কিছু বৈশিষ্ট্য হল এসব মূর্তির উপস্থাপনা প্রধানত সম্মুখবর্তী (frontality)। ত্রিমাত্রিকতা বোঝানোর জন্য চড়া উচ্চালোক ব্যবহার কিন্তু কিয়রাসকিউরো ব্যবহার না মানার জন্য চিত্রপট থাকে প্রায় সমতল এবং রৈখিকভাবে বিভাজিত। ছবিতে জমি ছাড় দেওয়ার অভাবে ছবি বেশ ওজনদার বলে বোধহয়। পঞ্চদশ শতাব্দীতে কনস্টান্টিনোপলের পতনের পর পাশ্চাত্যের শিল্পীরা তাদের প্রেরণার জন্য বাইজেন-টিয়ামের দিকে আর তাকাননি। তবে রাশিয়া এবং বলকান দেশগুলিতে বাইজেনটাইন প্রভাব অব্যাহত থাকে।

বাইন্ডার (Binder)

রঙের রঞ্জককণিকাগুলিকে সংলগ্ন করে চিত্রপটে ধরে রাখার জন্য ব্যবহৃত এক ধরনের আঠালো পদার্থ হল বাইন্ডার। একে ভেহিক্যালও (Vehicle) বলা হয়। বিভিন্ন রঙের জন্য পরিচিত বাইন্ডারগুলি হল— তেল রঙের ক্ষেত্রে লিনসিড অয়েল, জল রঙের ক্ষেত্রে গঁদের আঠা, প্যাস্টেলের ক্ষেত্রে ট্রাগাকান্থ আঠা, এগ টেম্পারার ক্ষেত্রে ডিমের কুসুম ইত্যাদি। অন্যদিকে কাঠের মেঝের ধারক কড়ি বরগাকে যা দিয়ে আটকে রাখা হয় তাকেও বাইন্ডার বলে।

বাউহাউস (Bauhaus)

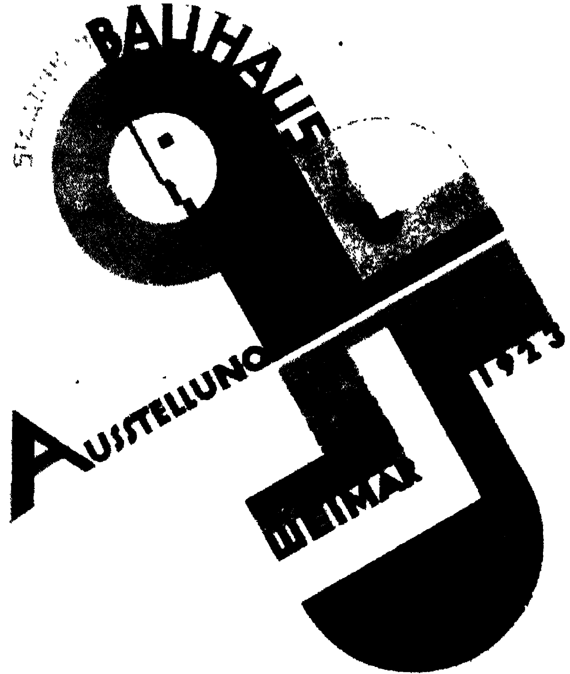
বাউহাউস হল একটি শিল্প শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ১৯১৯ সালে জার্মানির ওয়াইমারে বিশিষ্ট স্থপতি ওয়ালটার গ্রপিয়াস নতুন ধরনের এক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এই স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। 'বাউয়েন' (bauen) অর্থাৎ তৈরি করা (to build) এবং 'হাউস' (house) এই দুটি শব্দকে মিলিয়ে গ্রপিয়াস বাউহাউস শব্দটি উদ্ভাবন করেন যা ছিল তাঁর বিশ্বাসের রূপক। প্রাথমিক ভাবে বাউহাউস তৈরি হয়েছিল 'ওয়াইমার আকাদেমি অব ফাইন আর্টস' এবং 'স্কুল অব আর্টস অ্যান্ড ক্রাফ্টস'কে একত্র করে। যার লক্ষ্য ছিল তত্ত্বগত ও ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের সাহায্যে ছাত্রদের একই সঙ্গে শৈল্পিক গুণসম্পন্ন ও বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদনে সমর্থ করে তোলা। সেই সঙ্গে ফাইন আর্ট বা ললিতকলা এবং অ্যাপ্লায়েড আর্ট বা ব্যবহারিক কলার সংযুক্তিকরণের মধ্য দিয়ে সমবায়মূলক, গুণমান সচেতন, সময়োপযোগী শিল্পজাত দ্রব্য তৈরি করা। স্বভাবতই বাউহাউস সমকালীন জার্মানির আধুনিক চারুকলার



নং ২২৯. বাউহাউস স্কুল। ডেসাউ। জার্মানি। ১৯২৫।

কেন্দ্র হিসাবে শিল্প, প্রযুক্তি এবং চারুকলার মধ্যে এমন এক সম্পর্ক স্থাপন করেছিল যা স্থাপত্যশিল্প এবং ব্যবহারিক চারুকলায় যুগান্তর ঘটায়। বাউহাউসের শিল্প ধারণা প্রাথমিকভাবে স্থাপত্য ভিত্তিক হলেও এর মধ্যে অন্যান্য শিল্প বিভাগগুলিও স্থান পেয়েছিল। মাত্র ১৪ বছরের স্থায়িত্ব সত্ত্বেও বাউহাউসের দৃষ্টিভঙ্গি পরবর্তীকালে সারা পৃথিবীর স্থাপত্য, দৃশকলা, ডিজাইনেব ওপর গুরুত্বপূর্ণ ও দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব সৃষ্টি করে ছিল। এই স্কুল স্থাপত্যের এমন একটি মতবাদ প্রবর্তন করেছিল যার বুনিয়াদি সূত্রগুলি আজও প্রাসঙ্গিক। সেই সঙ্গে বাউহাউস ঘরোয়া শিল্পদ্রব্যের জন্য নান্দনিক আদর্শের প্রচলন করেছিল এখন তা 'ডিজাইন'-এর অন্তর্ভুক্ত। সর্বোপরি এই স্কুলে শিল্পকলার প্রশিক্ষণে সম্পূর্ণ নতুন ধারণার প্রয়োগ ঘটানোর পাশাপাশি বিভিন্ন গোষ্ঠীর বিশিষ্ট ও অসামান্য শিল্পীদের দ্বারা তা শেখানোর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। যথা ডার স্টার্ম, ব্লু রাইডার, ব্লু ভিয়ের প্রভৃতি গোষ্ঠীর প্রথিতযশা শিল্পী যথাক্রমে পল ক্লি, ওয়াসিলি ক্যান্ডিন্স্কি, লিয়োনেল ফেইনিনজার, জোহানেস ইটেন, জর্জ মুশে, অসকার স্কেহ্‌লমার প্রমুখরা ছিলেন শিক্ষক। ১৯১৯ থেকে ১৯২২ সালের মধ্যেই গ্রপিয়াস এই সব

শিক্ষকদের নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি বলতেন 'আমাদের মাঝারি মান দিয়ে শুরু করাই উচিত নয়।' সেই সঙ্গে তাঁর বক্তব্য ছিল 'আমাদের দায়িত্ব হল যখনই সম্ভব শক্তিশালী বিখ্যাত ব্যক্তিত্বদের তালিকাভুক্ত করা এমনকি আমরা যদি তাঁদের সম্পূর্ণ নাও বুঝতে পারি তবুও।' শিল্পী ইটেন এই স্কুলে সকল ছাত্রের জন্য বিধিবদ্ধ প্রাথমিক পাঠক্রম প্রস্তুত করেছিলেন। ছাত্ররা শিল্প প্রশিক্ষণের যেসব প্রাচীন ধ্যানধারণাগুলিকে নিয়ে আসে তা দূর করে তাঁদের সৃজন শক্তিকে মুক্ত করার লক্ষ্যেই এই পাঠক্রম প্রবর্তন করা হয়েছিল। শিল্পের নানা উপকরণ, যন্ত্রপাতি, বর্ণতত্ত্বের চর্চা, ওল্ড মাস্টারদের ছবির কাঠামোগত বিশ্লেষণ সহ ব্যায়াম এবং ধ্যানও এই পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত ছিল। দুটো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যথা রং এবং তত্ত্ব পড়াতেন ক্লি এবং ক্যান্ডিন্‌স্কি। আর ইটেন নিতেন ব্যবহারিক ক্লাস। ইটেন যে ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার ওপর জোর দিতেন, তার উৎস ছিল আমেরিকান দার্শনিক জন ডিউইর প্রগতিশীল শিক্ষাতত্ত্ব— 'কর্মের মধ্য দিয়ে শেখা'। এই আদর্শই সারা পৃথিবীর আর্ট এবং ডিজাইন স্কুলগুলির আদর্শ হয়ে উঠেছিল। প্রাথমিক



নং ২৩০. বাউহাউসের ছাত্র জুস্ট স্মিড-এর প্রথম পোস্টার। ১৯২৩।

পাঠক্রম পাস করার পর ছাত্রদের ওয়ার্কশপে যেতে হত শিল্পী ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কারিগরের কাছে শিক্ষা নেওয়ার জন্য। সীমাবদ্ধ সম্পদ থাকা সত্ত্বেও ১৯২২ সালের মধ্যে এখানে অনেকগুলি বিষয়ের ওয়ার্কশপ চালু হয়েছিল। ক্যাবিনেট তৈরির ওয়ার্কশপে কাজ শেখাতেন গ্রপিয়াস, কাঠ ও পাথর খোদাইয়ে স্কেহ্‌লমার, মুরাল পেন্টিং-এ ক্যান্ডিন্‌স্কি। কাচে ছবি আঁকা এবং বই বাঁধানোর ওয়ার্কশপে ক্লি, ধাতুর কাজে ইটেন, সিরামিকসে বা পটারিতে গেরহার্ড মার্কস, বয়ন কলায় মুশে, ছাপাই বিভাগে ফেইনিনজার, থিয়েটারের ওয়ার্কশপে লেদার স্ক্রেইয়ার প্রমুখ। এই সময় পর্যন্ত বাইহাউসে স্থাপত্যকলা বিভাগ ছিল না। তবে গ্রপিয়াস 'স্পেস' নিয়ে বক্তৃতা করতেন এবং তাঁর স্থাপত্যকর্মের সহযোগী অ্যাডল্ফ মিয়ার আংশিক সময়ের জন্য টেকনিক্যাল ড্রয়িং শেখাতেন।

একদিকে বাউহাউসের প্রয়াস ছিল যেমন সমাজ সচেতন শিল্পী, নকশাকার, স্থাপতি তৈরি করা এবং অন্য দিকে তেমনি লক্ষ্য ছিল সমাজের মঙ্গলসাধন এবং জাতীয় সংস্কৃতির উন্নতি বিধান। এতসব সত্ত্বেও বাউহাউসের সঙ্গে একমাত্র সিরামিকস এবং বয়ন কলার বাইরে আর কোনো শিল্পের ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠেনি। এজন্য ডাচ সাময়িকী 'De Stijl' (দ্য স্টাইল) এই সংস্থার পরিচালকদের বিশেষত ইটেনের সমালোচনা করেছিল। ১৯২৩-এ ইটেন পদত্যাগ করেন এবং তার জায়গায় আসেন হাঙ্গেরীয় শিল্পী লাজোলো মোহোলি ন্যাগি। বাউহাউসের বিকাশের ক্ষেত্রে এই সময়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ১৯২৩-এ গ্রপিয়াস বাউহাউস প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। জনসাধারণের উদ্দেশে দেওয়া " 'আর্ট' অ্যান্ড টেকনোলজি — এ নিউ ইউনিটি' " শীর্ষক একটি বক্তৃতায় তিনি বাউহাউসের নীতিগত পরিবর্তনের বিষয়টি পরিষ্কার করে দেন। কিন্তু এরকম একটি সন্ধিক্ষণে ওয়াইমারে জয়ী হয় নাৎসি দল প্রভাবিত ন্যাশনাল সোশালিস্ট জার্মান ওয়ার্কার্স পার্টি। স্বভাবতই বাউহাউসের বামপন্থী সমাজতান্ত্রিক রাজনীতি তাঁদের পছন্দ ছিল না। রাজনৈতিক মত পার্থক্যের কারণে আঞ্চলিক নাৎসি সরকার বাউহাউসের জন্য বরাদ্দ সরকারি অর্থ বন্ধ করে দেন এবং বাউহাউসকে ওয়াইমার ছেড়ে যেতে বাধ্য করে। ১৯২৫ সালে বাউহাউস সোশ্যালিস্ট প্রভাবিত ডেসাউতে চলে আসে এবং সেখানকার কর্তৃপক্ষ,

শিক্ষক ও ছাত্রদের জন্য বিশেষ ভাবে নকশা করা স্কুলবাড়ি বানাতে সাহায্য দেয়। এই সময় থেকে বাউহাউস নিজস্ব ডিপ্লোমা দিতে শুরু করে। সেই সঙ্গে আঞ্চলিক কারিগরদের সংঘগুলির সাথে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেলে নিজেরাই একটি লিমিটেড কোম্পানি গঠন করে তার মধ্য দিয়ে সমস্ত পণ্য বিপণনের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু প্রয়োজনীয় আয় না হওয়ায় গ্রপিয়াস ডিরেক্টর পদ ছেড়ে দেন মিয়ারকে। মিয়ারের সময় বাউহাউসের ব্যবসায়িক সাফল্য আসে। বিভিন্ন উৎপাদকদের বাউহাউসের তৈরি নকশা ব্যবহারের লাইসেন্সের ক্ষেত্রও প্রসারিত হয়। মিয়ার নকশা তৈরিতে বিজ্ঞানভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেন স্কুলে সমাজবাদ, মার্কসবাদ, অর্থনীতি বিষয়ক বক্তৃতার ব্যবস্থা করেন অতিথি অধ্যাপকদের এনে। কিন্তু ডেসাউর ক্ষমতাও নাৎসিদের দখলে এলে এতেও ছেদ পড়ে এবং স্কুলকে শেষ পর্যন্ত বন্ধ করে দিতে হয় ১৯৩১ নাগাদ। পরে বার্লিনে প্রাইভেট স্কুল হিসাবে বাউহাউস প্রতিষ্ঠিত হয়। সেখানেও কমিউনিস্ট সাহিত্য খোঁজার নামে গেস্টাপো বাহিনী বাউহাউসে তল্লাসি চালায় এবং স্কুল বিল্ডিং সিল করে দেয়। পরে শিক্ষকগণ মিলিত হয়ে ১৯৩৩ সালের ১৯ জুলাই বাউহাউসকে তুলে দেবার সিদ্ধান্ত নেন। বাউহাউসের বহু শিক্ষক (Master) ব্রিটেন হয়ে আমেরিকাতে সমবেত হন। ১৯৩৭ সালে শিকাগোতে মোহোলি ন্যাগি 'নতুন বাউহাউস' প্রতিষ্ঠা করেন। তবে তার গণ্ডি ছিল সীমিত।

বাঘ গুহা

ভারতবর্ষের বিখ্যাত ও গুরুত্বপূর্ণ গুহাগুলির অন্যতম হল বাঘ। মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত প্রাক্তন গোয়ালিয়র রাজ্যের বাঘ গ্রামের খুব কাছে বিন্ধ্য পর্বতের ঢালে পার্শ্ববর্তী বাঘ নদী থেকে ১৫০ ফুট ওপরে এই গুহাশ্রেণি অবস্থিত। অজন্তার সমসাময়িক এই বৌদ্ধ গুহামন্দিরগুলিও গুপ্ত যুগেই নির্মিত। এগুলো মহাযান বৌদ্ধদের বিহার। মোটামুটি ৪০০ থেকে ৭০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে তৈরি। এখানে মোট ৯টি গুহা ছিল। তার মধ্যে ২, ৪ এবং ৫ সংখ্যক গুহাগুলি গুরুত্বপূর্ণ। এই গুহাগুলি ১৮১৮ সালে বলা যায় প্রায় পুনরাবিষ্কার করেন লেফটানেন্ট ডেঞ্জারফিল্ড। তবে এসব গুহা নিয়ে কর্ণেল সি. ই. লুয়ার্ড-এর কৌতুহল এবং চর্চাই এদের পরিচিতি ঘটায়। নন্দলাল বসু এবং অসিতকুমার হালদার সহ সুরেন্দ্রনাথ

কর, এ.বি. ভোশলে, বি. এ. আপ্তে, জি.বি. জগতাপ প্রমুখরা বাঘের কপি করেছিলেন। যার মধ্যে ভালো অবস্থায় থাকা নকলগুলো গোয়ালিয়র মিউজিয়ামে দেখতে পাওয়া যাবে। ২ নং গুহার আঞ্চলিক নাম হল 'পান্ডবংকি গুহা'। এখানে কতগুলি বুদ্ধমূর্তি দেখে পঞ্চপাণ্ডব বলে বিভ্রম জাগতে পারে।

৩ নং গুহার নাম হাতিখানা। গুহার সামনের দিকে হাতি, সিংহ ইত্যাদি পরপর খোদাই করা আছে। এই গুহাটির প্রায় সবটাই নষ্ট হয়ে গেছে। ৪ নং গুহাটির নাম রংমহল। আকারে সবচেয়ে বড়ো এই গুহাটি ছবির জন্যই বিখ্যাত। ২ নং গুহায় যেমন ২৪টি স্তম্ভ আছে। তেমনি ৪ নং গুহার স্তম্ভের সংখ্যা ৩৮। বেশ কয়েকশো বছর ধরে এখানে ছবি আঁকা হয়েছিল। দেয়াল এবং স্তম্ভগুলি স্টাকো পদ্ধতিতে চুন বালি লেপে প্লাস্টার করা ছিল। এর ওপরেই আঁকা ছিল অসাধারণ চিত্রাবলি অনেকটা অজন্তার মতো। বাঘের ছবিতে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বন থাকলেও তাতে কোনো গোঁড়ামি নেই। দৈনন্দিন জীবনের ছবিও এখানে স্থান পেয়েছে। জন মার্শালের মতে বাঘের ছবির মুখ্য গুণ হল তার অলংকরণ এবং বৈচিত্র্য। ৪ নং গুহার ছবিগুলির মধ্যে চতুর্থ ছবিটির একটি বৈশিষ্ট্য আছে। এখানে সাতটি মেয়ে পরিবৃত নৃত্যরতা একটি মেয়ের ছবি আছে। যাতে নৃত্যরতা মেয়েটির পরনে দেখা যায় হালকা সবুজ রঙের ওপরে সাদা ফুটকি দেওয়া লম্বা হাতাওয়ালা হাঁটু পর্যন্ত কামিজের মতো জামা। কোমরে হালকা করে আঁটা কোমরবন্ধনী। জামার গলা কলারের মতো। তার ওপর মুক্তো ও নীলার হার। নিম্নাঙ্গে পাজামা। বাঘের আর কোনো ছবিতে এমনটি নেই। মাথার চুল খোলা এবং ঘাড়ের ওপর ছড়ানো। ঘিরে থাকা মেয়েদের মধ্যে একজন খোল বাজাচ্ছে। ওপরের দিক অনাবৃত। তিনজন খঞ্জনি বাজাচ্ছে। হ্যাভেল-এর মতে এতবড় দৃশ্যপট এবং বোল্ড ব্রাশিং অজন্তায়ও পাওয়া যায় নি। বাঘে পারস্যের পোশাক পরা নর্তক ও একজন অশ্বারোহীর বহু আলোচিত ছবিটি দেখে ফার্গুসন চিত্রকরদের ওপর পারস্যের সংস্কৃতির প্রভাব পড়ার সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছেন। তবে একথাও ঠিক যে পারস্যের চিত্রকলা বেশি উন্নত ছিল এমন কোনো প্রমাণ নেই। বাঘের ছবিতে যেসব রং ব্যবহার করা হয়েছিল তার মধ্যে আছে সাদা

খড়ি, নানান শেডের গেরিমাটি, সবুজ পাথর থেকে পাওয়া রং, নীল এবং লাক্ষার মতো লাল রং। বাঘে আলো ও ছায়ার ব্যবহার আছে যা অজন্তায় দেখতে পাওয়া যায় না।

বাটিক কাপড়ে রং ধরাকে প্রতিরোধ করার কৌশল কাজে লাগিয়ে তৈরি করা নকশা বা ছবি। বহু শতাব্দী ধরে দক্ষিণ পূর্ব এশীয় দেশগুলিতে বাটিকের চর্চা হয়ে আসছে। মূলত সিল্ক বা সুতির কাপড়ে নকশা এঁকে বা ভেবে নিয়ে যেখানে রং লাগতে দেওয়া হবে না এরকম অংশে গলানো মোমের প্রলেপ লাগিয়ে নেওয়া হয় এবং তারপর সেই কাপড়ের টুকরোকে ডাই বা রঙের মধ্যে ডোবানো হয়। ফলে মোমে ঢাকা নেই কাপড়টির এমন সব অংশ রঙিন হয়ে যায়। এইভাবে কাপড়টির নতুন নতুন অংশ মোম দিয়ে ঢেকে এই প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি করে নানা রকম রং লাগানো হয়। এই কাজে যে ধরনের মোমের মিশ্রণ ব্যবহার করা হয় তা তৈরি হয় ১ ভাগ মৌচাকের মোম এবং ২ ভাগ প্যারাফিন মিশিয়ে। এই মিশ্রণ গলিয়ে নিতে হয় গলনাঙ্কের চেয়ে একটু বেশি তাপমাত্রায়। তরল মোম তুলি, জাস্টিং নিড্‌ল, কাঠ বা লিনো ব্লকের সাহায্যে লাগানো হয়। রং শুকিয়ে যাওয়ার পরে গরম জলে ধুয়ে মোম পরিষ্কার করতে হয়। কাপড়ে রং ধরানোরও অনেকগুলি পদ্ধতি আছে। কোনো পদ্ধতিতে পরবর্তী রঙে ডোবানোর আগে কিছু মোম তুলে ফেলা হয় যাতে সেই সব অংশে একের বেশি রং লাগতে পারে। * টাই অ্যান্ড ডাই দেখুন

বামিয়ান বুদ্ধ আফগানিস্থানের একটি স্থান বামিয়ান। কাবুল এবং তুর্কিস্থানের মাঝামাঝি হিন্দুকুশ পর্বতমালার কোহ্-ই-বাবা অংশের দক্ষিণে অবস্থিত একটি উপত্যকা। এখানে উত্তরদিকে পাহাড়ের গায়ে বড়ো বড়ো কুলুঙ্গি সদৃশ খাত কেটে তার মধ্যে বিরাট আকারের মনোলিথিক রিলিফ মূর্তি খোদাই করা হয়েছে। এ সবের সময়কাল খ্রিস্টীয় প্রথম থেকে দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যে। সবচেয়ে বড়ো মূর্তির উচ্চতা ৫২.৭৩ মিটার। দ্বিতীয় একটি মূর্তি ৩৬.৫৭ মিটার উঁচু। অন্যান্য মূর্তিগুলি মোটামুটি ১৬ মিটারের মধ্যে। চিনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাং এই বড়ো মূর্তিগুলিকে ব্যাখ্যা করে তাদের বুদ্ধের মূর্তি বলে চিহ্নিত করেছেন। মাঝারি মূর্তিটির সঙ্গে গান্ধার শৈলীর মিল ছিল। বড়ো কুলুঙ্গিতে উড়ন্ত দেবদেবী এবং বোধিসত্ত্বের মূর্তি, মাঝারি মূর্তির কুলুঙ্গিতে



নং ২৩১. পাহাড়ের পাথর কেটে গুপ্ত শৈলীতে তৈরি বিশাল মাপের বুদ্ধ মূর্তি। খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রথম ভাগ। উচ্চতা ১৭৫ ফুট। বামিয়ান। আফগানিস্তান।

সূর্যদেবের মূর্তি আঁকা আছে। বামিয়ান ছিল রাজকীয় নগর। এখানে বৌদ্ধদের ১০টি মঠ এবং হাজার বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ছিলেন। এশিয়ার ক্যারাভান ভারতে আসার পথে এখানে বিশ্রাম নিত। হাজার বছর ধরে এই ভাস্কর্যকীর্তি অটুট থাকলেও পরে বর্বর ও ধর্মীয় স্বৈরাচারীদের আক্রমণে এইসব মহান ভাস্কর্যের প্রভূত ক্ষতি হয়। তবুও যা ছিল তাও বেশ বিস্ময়কর। এই সব বুদ্ধমূর্তির বেশভূষা ও অলংকার চুন ও অন্যান্য পদার্থ মিশিয়ে তৈরি স্টাক্কো দিয়ে তৈরি। মূর্তিগুলির মাথায় ওঠার জন্য পাহাড় কেটে সিঁড়ি করা ছিল। এই সব মূর্তির ওপর এক সময় যেমন নাদির শা আক্রমণ চালিয়ে ছিল তেমনি আক্রমণ চালিয়েছিল চেঙ্গিস খানও। ১৯৩০ সালে এখানে প্রাপ্ত একটি পুঁথি থেকে জানা যায় যে, অষ্টম শতাব্দীর প্রথম দিকেও বামিয়ানে বৌদ্ধ ধর্মের খুবই গৌরবময় যুগ ছিল। এই তথ্য পাওয়া যায় হুয়েই-চুটাও নামে একজন কোরীয় সন্ন্যাসীর বিবরণ থেকে। এই মহৎ কীর্তিগুলি ২০০১ সালে

আফগানিস্তানের ওপর আমেরিকা বোমা নিক্ষেপের সময় মৌলবাদীদের আক্রমণে ধ্বংস হয়ে যায়।

বায়োমরফিক (Biomorfic)
শব্দটি অ্যাবস্ট্যাক্ট আর্ট প্রসঙ্গে ব্যবহার করা হয়। প্রকৃতিতে পাওয়া নানা ধরনের আকারের মধ্যে যে সমস্ত বিমূর্ত ও অনিয়মিত রূপ (Form) পাওয়া যায় তা এর অন্তর্গত। এ ধরনের রূপগুলি সুরিয়ালিজ্‌মের ছবিতে আকছার দেখা যায়। উদাহরণ হিসাবে ইভস টাংগির পেন্টিং বা হানস্ আর্প-এর ভাস্কর্যের কথা উল্লেখ করা যায়।

বার (Burr)
প্রিন্ট মেকিং-এর সময় প্লেটে বুরিন বা নিড্‌ল দিয়ে কাটার পরে উৎকীর্ণ রেখাগুলির দু-ধারে অসমান যেসব খোঁচ দেখা যায় সেগুলো। ড্রাই পয়েন্ট এনগ্রেভিং-এ এই 'বার' রেখে দেওয়া হয়। কেন-না এতে যেমন বুনট-গুণ সৃষ্টি হয় তেমনি আউটলাইনগুলোকে কোমল করে তা ড্রাই বৈশিষ্ট্য দান করে। অবশ্য না চাইলে পরে স্ক্র্যাপার দিয়ে চেঁছে বারগুলিকে তুলে ফেলা যায়।

বার্ডস আই ভিউ (Birds eye view)
পাখির চোখে দেখা কোনো দৃশ্য অর্থাৎ বহু ওপর থেকে একটি দৃশ্যকে যেমনটি দেখা যায়। এধরনের দৃশ্যে দিগন্ত অর্থাৎ হরাইজন বা আইলেভেল অনেক উঁচুতে থাকে।

বারবারিয়ান আর্ট (Barbarian Art)
সারা ইউরোপ জুড়ে নিওলিথিক ও ব্রোঞ্জ যুগের মানুষদের দ্বারা সৃষ্ট শিল্পকলা। এই শিল্পকলা কোনো উন্নত শিল্পকলার মতো নয় বরং এসব উপজাতিশ্রেণীর শিল্পকলার সৃষ্টির মতো। এর অন্যতম চরিত্র বৈশিষ্ট্য হল অ্যানিম্যাল ইন্টারলেস।

বারবিজোন স্কুল (Barbizone School)
প্যারিসের একটু দক্ষিণে ফঁতেইন ব্লু বনের প্রান্তে বারবিজোন। ১৮৪০-এর পরে এখানে বাসরত একদল ফরাসি ল্যান্ডস্কেপ শিল্পীদের চিত্র ঘরানা এই নামে পরিচিত হয়। ব্রিটিশ নিসর্গচিত্রী কনস্টেবল, বোনিংটন এবং সপ্তদশ শতাব্দীর ডাচ শিল্পীদের নিসর্গচিত্র বারবিজোন স্কুলের প্রাথমিক প্রেরণা হলেও এই ঘরানার মূল ভিত্তি ছিল প্রকৃতির প্রত্যক্ষ অনুশীলন। স্বভাবতই বারবিজোন শিল্পীরা কোমল ও প্রাকৃতিক দৃশ্য, বিশেষ করে ল্যান্ডস্কেপ আঁকার প্রতি মনোনিবেশ করেছিলেন। যেমনটি করেছিলেন তাঁদের অগ্রণী তেয়োদোর রুশো। বারবিজোন স্কুলের একটি সুপরিচিত উদাহরণ হল জঁ ফ্রঁসোয়া মিলের ১৮৫৭ সালে আঁকা মাঠে কর্মরত মজুরদের ছবি 'দ্য গ্লিনারস'। এরকমভাবে ল্যান্ডস্কেপের

নং ২৩২. জঁ ফ্রসোয়া মিলে দি গ্লিনার্স। ১৮৫৭। ক্যানভাসের ওপর তেল রং। ৮৫ X ১১১ সেমি.।



বাস্তব ধারার বর্ণনায় আকাদেমি রীতি বর্জন ইম্প্রেশনিস্টদের রাস্তা তৈরি করেছিল। এঁদের প্রদর্শিত ছবি প্রায়ই স্টুডিয়োতে বসে আঁকা। কিন্তু প্রকৃতিকে চর্চার ফলে তাঁদের ছবিতে পিগমেন্টের বলিষ্ঠ ব্যবহারে উন্নত যুগধারণা এবং খোলা হাওয়ার গুণ তৈরি হয়েছিল। এই রীতির সঙ্গে যুক্ত শিল্পীদের মধ্যে আন্যান্য উল্লেখযোগ্যরা হলেন কনস্টান্ট ত্রোঁয়োঁ, জঁ বাপতিস্ট-কামিই কোরো প্রমুখ।

বারোক (Baroque)

ষোড়শ এবং সপ্তদশ শতাব্দীর ইতালি তথা ইউরোপের প্রচলিত চিত্র, ভাস্কর্য ও স্থাপত্যের শিল্পরীতি বোঝাতে ঊনবিংশ শতাব্দীর শিল্প ইতিহাসকারদের হাতে শব্দটি প্রতিষ্ঠা পায়। বারোকের উদ্ভবকাল, স্থান এবং শিল্পচরিত্র নিয়ে মতভেদ আছে। কারও মতে ক্যাথলিক ধর্মের প্রতিসংস্কার আন্দোলনের সমসাময়িক কালে ইতালি সহ ইউরোপের শিল্প হল বারোক। আবার কারও মতে সপ্তদশ শতাব্দীর ল্যাটিন আমেরিকা এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপের ক্যাথলিক এবং প্রোটেস্টান্ট মতাবলম্বী সবদেশেই বারোক শিল্প বিকশিত হয়েছিল। তবে এসবের মধ্যেও নানান ভিন্নতা আছে। যেমন ইতালির রেনেসাঁস সংস্কৃতির অন্যতম ব্যাখ্যাকার জ্যাকব বার্কহাডট্-এর ব্যাখ্যা অনুযায়ী এই শিল্পের উৎপত্তি রোমের শিল্পী জিয়ানলোরেঞ্জো বের্নিনির ভাস্কর্য থেকে। অন্যদিকে আর একজন ব্যাখ্যাকার হাইনরিশ ওলফলিন-এর মত অন্যরকম। তিনি বলেন হাই রেনেসাঁসের সময়েই ধ্রুপদি রীতির বিরুদ্ধাচারণ করে ভাস্কর

মাইকেলাঞ্জেলো যে ভাস্কর্য নির্মাণ করতে শুরু করেছিলেন তার মধ্যেই বারোকের উৎস। বারোক শব্দটির উৎপত্তি নিয়েও মতভেদ রয়েছে। সাধারণভাবে ইতালীয় শব্দ 'বারোক্কো' থেকে এর উৎপত্তি বলে ধরা হলেও দেখা গেছে যুক্তিবিদ্যায় এক বাধা প্রসঙ্গে মধ্যযুগীয় দার্শনিকগণ বারোক্কো শব্দটি ব্যবহার করতেন। পরে ঘোরালোপ্যাঁচালো বোঝাতে এই শব্দের ব্যবহার শুরু হয়। অন্যদিকে পর্তুগিজ ভাষায় বারোক্কো শব্দের অর্থ হল এবড়োখেবড়ো বা সৃষ্টিছাড়া মুক্তো। শেষপর্যন্ত বারোক শব্দের অর্থবোধ বা ভাবার্থ মোটামুটি দাঁড়াল 'বিদ্‌ঘুটে রূপ'। সর্বোপরি আরও একটা কথা বলা সংগত যে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে, কালে, রূপে বারোক-এর অগ্রগতি ঘটেছে তাই সামগ্রিকভাবে বারোক রীতি না বলে বারোক যুগ বলাই যুক্তিযুক্ত।

বারোক শিল্পের গতিপ্রকৃতি নির্ণয়ের বেশ কয়েকটি



নং ২৩৩. গিয়ানলোরেঞ্জো বেরনিনি : ডেভিড স্লেয়িং গলিয়াথ। ১৬২৩। মার্বেল। আরও ছবি ১৭৮ পৃ. ৩৬৩

নির্দিষ্ট পদ্ধতি আছে। তবে সাধারণভাবে গৃহীত পদ্ধতি হল ম্যানারিজ্‌ম এবং রোকোকো যুগের মধ্যবর্তী পর্বের প্রধান শৈলী। বেশ কয়েকজন শিল্প ঐতিহাসিক হাই রেনেসাঁসের প্রথম ভাগের শৈলীর সঙ্গে দ্বিতীয়ভাগের শৈলীর মৌলিক পার্থক্য দেখিয়ে প্রথমভাগের শিল্পকে ম্যানারিজ্‌ম আখ্যা দিয়েছিলেন। ম্যানারিজ্‌মের নীরস শিল্পীরীতির প্রতিক্রিয়াতেই বারোকের সৃষ্টি। যদিও একথা ঠিক যে দুয়ের মধ্যে আঙ্গিকগত মিল ছিল। ম্যানারিস্ট শিল্পীরা যেসব উপায় অবলম্বন করে আবেগের অভিব্যক্তি ফুটিয়ে তুলতেন বারোক শিল্পীরা সেই একই দৃষ্টিবিভ্রমময় মায়া সৃষ্টিকারী উপায়ের সাহায্যে নাটকীয়ভাবে শরীরী শিল্প সৃষ্টি করেছিলেন। বারোক রীতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী রেমব্রাঁ ছবিতে যেভাবে হাইলাইট ব্যবহার করেছেন তাতে স্পষ্ট যে তাঁর ছবিতে ম্যানারিজ্‌ম এবং বারোক রীতির লক্ষণগুলো সমন্বিত হয়েছে। অন্যদিকে বারোকের চরিত্র লক্ষণের আরও কিছু বৈশিষ্ট্য হল জেল্লাদার বর্ণপ্রকল্প ও সংঘাতময় আলোছায়ার অতিরঞ্জন, অস্বাভাবিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার উপযোগী ত্রিমাত্রিক ব্যাকগ্রাউন্ড নির্মাণে গুরুত্বদান এবং ভঙ্গিমার অতিরঞ্জন বোঝাতে ফোরশর্টেনিং-এর নাটুকে ব্যবহার। এই ধারায় প্রধান প্রধান শিল্পীরা হলেন বেলজিয়ামের চিত্রশিল্পী রুবেন্‌স, ইতালীর ভাস্কর লোরেঞ্জো, পুসাঁ, ফ্রঁসোয়া বোরোমিনি, ফ্লান্ডারস, প্রমুখ। বারোক শিল্প পরবর্তীকালের বিভিন্ন শৈলীর ওপরও প্রভাব ফেলেছিল যার দৃষ্টান্ত দেখা যায় ফরাসি রোমান্টিক চিত্রকলা, উত্তর ইউরোপীয় অভিব্যক্তিবাদী এবং পরাবাস্তববাদী চিত্রকলায়।

বাস্তার

মধ্যপ্রদেশের একটি জেলা। ডোকরা শিল্পীদের আদি স্থান। ডোকরা সহ এখানকার কাঠের কাজ এবং ধাতুর শিল্পকলা বেশ উন্নত। বাস্তবের অনেক কাজে আদিম টোটেমিক শিল্পরূপের লক্ষণ আছে।

বাস্ট (Bust)

বাংলায় আবক্ষ অর্থাৎ বুক সহ মাথা নিয়ে যে ভাস্কর্য প্রতিকৃতি। তবে আবক্ষ মূর্তির একটা বিশেষ ধরন বা টাইপ আছে।

বাস-রিলিফ (Bas-relief)

'Bas' অর্থ অল্প এবং 'relief' অর্থ উঁচু হয়ে থাকা। যে ভাস্কর্যের গোলাকার অংশগুলি পৃষ্ঠ তল থেকে সামান্য উঁচু হয়ে থাকে তাকে বলে Basrelief। অন্যদিকে হাই-রিলিফ

(High-relief) তার অবয়বের Thikness-এর অর্ধেকাংশ পৃষ্ঠ তল থেকে উঁচু হয়ে থাকে।

বিজার সিল্ক (Bizarre Silk) একধরনের সিল্ক। যার ওপরে ফুল পাতা ইত্যাদির অসামঞ্জস্যপূর্ণ নকশা কাটা থাকে। প্রাচ্যের বয়ন শিল্পের অনুসারি হলেও এই সিল্ক কিন্তু তৈরি হয়েছিল ইউরোপে ১৬৯৫-১৭২০ সালের মধ্যে।

বিটুমেন (Bitumen) রাসায়নিকভাবে এটি হাইড্রোকার্বনের বিভিন্ন ধরনের মিশ্রণ তথা আরও নির্দিষ্ট করে বললে শক্ত আলকাতরা জাতীয় মিশ্রণ। তৈরি হয় অ্যাসফলটাম থেকে। বিটুমেন কার্বন ডাইসালফাইডে দ্রবীভূত হয়। তবে এই অস্থায়ী বাদামি পিগমেন্ট কখনোই সম্পূর্ণ শুকোয় না এবং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কালচে ও ওপেক বা অস্বচ্ছ হতে থাকে। একই সঙ্গে এতে চুলের মতো সূক্ষ্ম ফাটল (Hair Crack) ধরে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে অথবা ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বিটুমেন অন্তর্বর্ণস্তর হিসাবে ব্যবহৃত হত ফলে ওই সময়ে আঁকা অনেক ছবিই পরবর্তী কালে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যেমন স্যার জশুয়া রেনল্ডের ছবি।

বিড়লা আকাদেমি বিড়লা আকাদেমি অব আর্ট অ্যান্ড ক্রাফ্‌টস। এই প্রতিষ্ঠানটি গড়ে ওঠে ১৯৬০-এর দশকে কলকাতায়। পঞ্চাশের দশক থেকে কলকাতার কিছু বিশিষ্ট শিল্পরসিক এবং কলা সংগ্রাহক যথা এন. সি. মেহ্‌তা, আর. কে. কেজরিওয়াল, মি. এবং মিসেস আর. কে. বিড়লা প্রমুখরা প্রচুর মূল্যবান ও দুর্লভ শিল্প সামগ্রী সংগ্রহ করেছিলেন। এই সামগ্রী ও শিল্পকর্ম সংরক্ষণের জন্য একটা শিল্প সংগ্রহশালা ও আকাদেমি স্থাপনের প্রচেষ্টা হয়। এই প্রচেষ্টার অঙ্গ হিসাবে ১৯৬২ সালে একটা ট্রাস্ট গঠন করা হয়েছিল। ১৯৬৬ সালে সাদার্ন অ্যাভিনিউতে গড়ে তোলা হয় ১১তলা বিশিষ্ট একটি বাড়ি। ১৯৬৭ সালে বেসরকারি উদ্যোগে গড়ে ওঠা এই বাড়ির দ্বারোদ্ঘাটন করেন তৎকালীন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ড. করণ সিংহ। এখানে নিয়মিত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরের শিল্পকর্মের প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। এঁদের প্রকাশনাও আছে।

বুদ্ধগয়া গয়া রেল স্টেশন থেকে ১৩ কিমি দূরে বিহারের গয়া জেলার লীলাজন বা ফল্গু নদীর তীরে অবস্থিত একটি বৌদ্ধধর্মকেন্দ্র। প্রাচীনকালের বৌদ্ধ তীর্থ সম্বোধিকে কেন্দ্র

করে আজকের বুদ্ধগয়ার উৎপত্তি। এক সময় সম্বোধ পরিচিত হয় মহাবোধি নামে। এখানকার বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠানটির নামও সম্বোধি। কিংবদন্তি হল যে, এখানে একটি অশ্বত্থ গাছের তলায় তৃণাসনে এবং পরে বজ্রাসনে বসে ছ-বছর কঠোর তপস্যার পর গৌতম বোধি লাভ করে বুদ্ধ নামে অভিহিত হন। বুদ্ধগয়ার প্রাচীন নিদর্শনগুলির মধ্যে আছে বোধিবৃক্ষের সামনে খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে নির্মিত কারুকার্যশোভিত পাথরের বেদি, লাল বেলেপাথরে খোদাই করা ক্রসবার, চতুষ্কোণ আবেষ্টনীর অংশ বিশেষ, বুদ্ধদেবের পদচারণ-চাতালের স্তম্ভ সমূহের পাদপীঠ এবং একটি স্তম্ভ। গুপ্তযুগে এই আবেষ্টনী সম্প্রসারণ করা হয়। যদিও পুরোনো আবেষ্টনীর আদলে তৈরি তবু এর গঠনশৈলী সম্পূর্ণ ভিন্ন। মূল মন্দিরটি আনুমানিক ষষ্ঠ শতাব্দীতে তৈরি হয়েছিল।

বুরিন (Burin)

হাতল যুক্ত ছোটো এনগ্রেভিং করার যন্ত্র যা এনগ্রেভার নামেও পরিচিত। সাধারণভাবে এটা একটা চৌকো লোহার শলাকা যার মাথার দিকটা তেরচা ভাবে কাটা থাকে। খোদাইকর হাতের চাপে এর সাহায্যে ধাতব প্লেটে বিভিন্ন মাত্রার গভীরতা সম্পন্ন নানা ধরনের রেখা সম্বলিত কোনো নকশা উৎকীর্ণ করেন। এ ধরনের যন্ত্র লিনো কাট বা উড এনগ্রেভিং-এর কাজেও ব্যবহার করা হয়। লিনোকাটের ক্ষেত্রে বুরিনের অগ্রভাগ 'V' এবং 'U' আকৃতির হয়। এই আকৃতিগুলির ব্যবহারও হয় বুনট তৈরির প্রয়োজন অনুযায়ী।

বুশম্যান পেন্টিং (Bushman Painting)

বুশম্যানরা ছিল দক্ষিণ আফ্রিকার কালাহারি মরুভূমির যাযাবর শ্রেণীর মানুষ। নামিবিয়া এবং দক্ষিণ আফ্রিকার হাজার দেড়েক জায়গায় তাঁদের আঁকা প্রস্তর ও গুহাচিত্র পাওয়া গেছে। এসব চিত্রে বুশম্যান তথা স্যান প্রজাতির মানুষদের সমাজজীবনের নানা বিষয়, তাঁদের বিশ্বাস, ক্রীড়া ও বিশেষ করে শিকারের দৃশ্য প্রভৃতি বর্ণিত হয়েছে। বুশম্যানদের চিত্র অন্যতম প্রাচীন রক এনগ্রেভিং। বুশম্যানদের চিত্রকলায় শিকারি এবং শিকারের মধ্যে গভীর সম্পর্কের প্রতিফলন ঘটেছে। বুশম্যান প্রস্তরচিত্রে শুধুমাত্র পশু, পশু শিকার, শিকারিদের বা বর্ষার আচার অনুষ্ঠানের ছবিই আঁকা হয়নি যে সব ছবির মধ্যে নানা গূঢ় অর্থও প্রচ্ছন্ন রয়েছে।

বেঙ্গল স্কুল
(Bengal School)

'ব্রাশ ক্লাব' নামে একটি সংস্থা ১৮৩১ সালের ১ ফেব্রুয়ারি টাউন হলে কলকাতার প্রথম চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন। এই ব্রাশ ক্লাবের উদ্যোগেই দেশি চিত্রকরদের ইউরোপীয় ধারায় আঁকা তেল রঙের ছবি নিয়ে আরও এক ধরনের প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল। এই ধরনের ছবির শিল্পীদের মধ্যে আর্ট স্কুলে শিক্ষাপ্রাপ্ত এবং স্বশিক্ষিত উভয় শ্রেণির ব্যক্তিরাই ছিলেন। কলকাতার শিল্প সংগ্রাহক এবং রসিকদের কাছে এই ছবির ধারা সাধারণভাবে 'বেঙ্গল স্কুল' নামে অভিহিত। অথচ বেঙ্গল স্কুল বলতে বেশি পরিচিত হল অবনীন্দ্রনাথ-নন্দলাল প্রবর্তিত আর এক ধারার ছবি। কিন্তু প্রাগুক্ত রীতির ছবির সংগ্রাহক ও রসিকগণের ভাষায় বা সাধারণভাবে অবনীন্দ্রনাথ-নন্দলাল প্রবর্তিত ছবির ধারা হল 'নিওবেঙ্গল স্কুল' বা নব্যবঙ্গীয় চিত্রকলা।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সরকারি আর্ট স্কুলে যোগ দিয়েছিলেন



নং ২৩৪. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ভারতমাতা। ১৯০৫। ওয়াশ এবং টেম্পারা।

১৯০৫ সালে এবং ইস্তফা দিয়েছিলেন ১৯১৫ সালে। এই সময়ে অর্থাৎ প্রায় এক দশক কাল বাংলার চিত্রকলার জগতে প্রধান পুরুষ ছিলেন অবনীন্দ্রনাথ। হ্যাভেল কলকাতা ত্যাগ করার পরেই অবনীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে যে প্রাচ্যদেশীয় রীতির চিত্রকলা দেশে ও বিদেশে খ্যাতি লাভ করে তা নব্যভারতীয় নামেই আখ্যাত হওয়া উচিত ছিল কিন্তু এক শ্রেণির পশ্চিমভারতীয় শিল্পীর অস্বীকৃতির কারণেই তা নব্যবঙ্গীয় চিত্রকলা নামে পরিচিতি লাভ করে। ১৯১৪ সালে ফরাসি শিল্পী আঁদ্রে কার্পেলের উদ্যোগে প্যারিসে এই চিত্রকলার এক পূর্ণাঙ্গ প্রদর্শনী হয়। এই প্রদর্শনীতে অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর সহযোগী ছাত্ররা অংশগ্রহণ করেন। প্যারিসে এই প্রদর্শনীর ভূয়সী প্রশংসা হয়। প্যারিসের প্রায় সমস্ত দৈনিক কাগজ বিশেষ করে শিল্প বিষয়ক পত্রিকায় এই প্রদর্শনীর দারুণ প্রশংসা করা হয়েছিল। সেখানে এই চিত্রকলাকে কলকাতার চিত্রশৈলী বলে উল্লেখ করা হয়। প্যারিসের শিল্পকলা বিষয়ক পত্রিকা 'Illustration' এবং 'L' Art Decoratif'-এ এ নিয়ে প্রবন্ধ ও চিত্র প্রকাশিত হয়েছিল। কলকাতায় 'The Statesman' পত্রিকায় এই প্রদর্শনীর সংবাদের শিরোনাম ছিল 'Exhibition of Indian Paintings in Paris–The triumph of Abanindranath'.

এই চিত্রকলা চর্চাকে কেন্দ্র করেই অবনীন্দ্রনাথকে ভারত শিল্পের পুনরুজ্জীবনবাদী বলে আখ্যায়িত করা হয় কিন্তু এই চিত্রকলা আদতে তা নয়। অবনীন্দ্রনাথের পক্ষে ভারতীয় রীতিতে ছবি আঁকাও কিছুটা অসুবিধেজনক ছিল। কেন-না তিনি ছবি আঁকা শিখেছিলেন বিদেশি ওস্তাদগণের কাছে। তাঁর ছাত্রদের পক্ষে বরং একাজ অনেক সহজ ছিল। প্রকৃতপক্ষে অবনীন্দ্রনাথ এক্ষেত্রে প্রাচীন ও সমকালীন ধারার সম্মেলন ঘটিয়ে একটি নতুন ধারা সৃষ্টি করেছিলেন। আদর্শগত ও সাহিত্য থেকে অনুপ্রাণিত হওয়ার কারণে অনেক সমালোচক বিশেষ করে অর্ধেন্দ্রকুমার গাঙ্গুলি ভিক্টোরীয় যুগের প্রির্যাফেলাইট আন্দোলনের সঙ্গে নব্যবঙ্গীয় চিত্রকলার তুলনা করেছেন। কিন্তু গোড়ার দিকে সে রকম না হলেও পরে অবনীন্দ্রনাথের অনেক অনুসরণকারীর ছবিতে অতিরিক্ত পরিমাণে সাহিত্য রস বিতরণের ঝোঁক দেখা যায়। তা সত্ত্বেও নব্যবঙ্গীয় চিত্রকলা প্রির্যাফেলাইট আন্দোলনের মতো ক্ষীণপ্রভ হয়ে শেষ হয়নি। বরং তা

বহুদিন ধরে প্রাণবন্ত ও গতিশীল ছিল। অবনীন্দ্রনাথের প্রথম সারির ছাত্ররাই ছিলেন এই চিত্রকলার মুখ্য শিল্পী। তাঁরা হলেন সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, নন্দলাল বসু, অসিতকুমার হালদার, দুর্গেশচন্দ্র সিংহ, ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার, কে ভেঙ্কটাপ্পা, সমরেন্দ্রলাল গুপ্ত, শৈলেন্দ্রনাথ দে, হাকিম মহম্মদ খান প্রমুখ। এই চিত্রকলার মধ্যে অবনীন্দ্রনাথের 'ভারতমাতা', 'শেষের বোঝা', 'ওমর খৈয়াম' সিরিজ, নন্দলালের 'সতীর দেহত্যাগ', 'সতী', 'আহত মরাল হাতে সিদ্ধার্থ', 'অহল্যার শাপমুক্তি', ক্ষিতীন্দ্রনাথের 'পর্বতকন্যা পার্বতী', 'অর্জুন' ও 'উর্বশী', 'শ্রীরাধার অভিসার', অসিতকুমারের 'জাগ্রত ভারতমাতা', 'পূজারিণী', 'পদ্মফুল' ভেঙ্কটাপ্পার 'রামচন্দ্রের সেতুবন্ধ', 'সীতার বিবাহ', 'দময়ন্তী' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। গগনেন্দ্রনাথও নব্যবঙ্গীয় চিত্রকলার আন্দোলনের সাথে যুক্ত হয়েছিলেন। তাঁর বিশেষ ধরনের পরীক্ষানিরীক্ষা নব্যবঙ্গীয় চিত্রকলার পরিসরকে আরও বিস্তৃত করেছিল। বেঙ্গল স্কুলের চিত্রকলার আর একটি সুন্দর নিদর্শন হল লন্ডনের অলডুইকের ওপর নির্মিত ইন্ডিয়া হাউস বা ভারতভবনে অঙ্কিত চিত্রমালা। লন্ডনে ভারতের তৃতীয় হাইকমিশনার স্যার অতুল চ্যাটার্জির উদ্যোগে নানা ভারতীয় ঘটনা বা আখ্যানবলিকে নিয়ে বিশিষ্ট ভারতীয় শিল্পীদের ভারতীয় রীতিতে ছবি আঁকানো হয়। এখানে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলাদা আলাদা ধরনের ছবি এঁকেছিলেন রণদাচরণ উকিল, সুধাংশু শেখর চৌধুরি, ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মণ, ললিত মোহন সেন প্রমুখ।

বেনিন আর্ট (Benin Art)

এডোভাষী মানুষ যাঁরা সাধারণভাবে বিনি নামে পরিচিত তাঁদের প্রাচীন রাজ্য ছিল বেনিন। এঁরা এখনও পশ্চিম নাইজেরিয়ার নাইজার বদ্বীপ অঞ্চলে বাস করেন। এঁদেরই শিল্পকলা হল বেনিন আর্ট। ত্রয়োদশ থেকে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যে এই বেনিন রাজ্য বিকশিত হয়। ১৮৯৭ সালে ব্রিটিশ অভিযানের সময় এখানকার চমৎকার সব ব্রোঞ্জ ও হাতির দাঁতের কাজ লুট করে লন্ডনে নিয়ে আসার পর পাশ্চাত্যের নজরে আসে এবং বেনিন আর্টের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। বেনিন আর্ট অবশ্যই দরবারি শিল্প। এডোদের রাজা 'ওবা'র বংশগত রাজদরবার ছিল এর চর্চাকেন্দ্র। দরবারি পৃষ্ঠপোষকতায় একটা বড়ো কারিগরসভা চলত।

নং ২৩৫. নাইজিরিয়া : জনৈক বেনিন রাজা ও তাঁর অনুচরবৃন্দ। ব্রোঞ্জ।



কামার, কুমোর, কাঠ ও হাতিরদাঁতের খোদাইকরদের নিয়ে কিংবদন্তি আছে যে চতুর্দশ শতাব্দীর শেষের দিকে বেনিনের রাজা 'ওবা'কে ইফাতে পাঠানো হয়েছিল তাঁর লোকদের ফাঁপা ঢালাই (cire perdue) পদ্ধতিতে তামার সংকর তথা ব্রোঞ্জের স্মারক মূর্তি তৈরি শেখানোর জন্য কামার ধরে আনতে। আদি পর্বের বেনিন ভাস্কর্য খুবই পাতলা এবং ফাঁপা ঢালাইয়ে ব্রোঞ্জের মাথাগুলির শৈলী ইফার ধ্রুপদি বাস্তব রীতির মতো। বেনিন ভাস্কর্যে যে শৈলী ক্রমশ প্রাধান্য লাভ করছিল তা এমনকি আদি পর্বের প্রতিকৃতির মাথাতে আগে থেকেই ব্যবহৃত হত। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যপর্ব থেকে অসংখ্য সুসজ্জিত ব্রোঞ্জের ফলক তৈরি হয় যাতে রাজা, সৈনিক, দাসদের মূর্তির হাই রিলিফ দেখতে পাওয়া যায়। বেনিন রাজ্য জটিলতার মধ্যে গড়ে ওঠার কারণে এর শিল্পের মধ্যেও বেশ কিছু অসংগতি লক্ষ করা যায়। এর শেষ পর্বের রীতির ক্ষেত্রে 'বারোক' শব্দটি ব্যবহার করা হয়।

বোজার (Beaux-Arts)

এই ধারার উৎপত্তি ফ্রান্সে। প্যারিসের সরকার পোষিত স্কুল 'The Ecole des Beaux-Art' থেকে এই শৈলীর সৃষ্টি হয় উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি। এই শৈলী ক্লাসিসিজ্‌ম, আকাদেমিক ক্লাসিসিজ্‌ম বা ক্ল্যাসিকাল রিভাইভাল নামেও পরিচিত। স্থাপত্য, গৃহসজ্জা তথা আসবাব এবং বয়ন শিল্পজাত নানা বস্তুতে এই শৈলী প্রয়োগ করা হয়েছিল।

বোজার-এর চরিত্র বৈশিষ্ট্য হল এই শৈলীর শৃঙ্খলা, প্রতিসাম্য, আঙ্গিক, নকশা, আড়ম্বর এবং অলংকারসমৃদ্ধি। বোজার ধ্রুপদি গ্রিক ও রোমান স্থাপত্যের সাথে রেনেসাঁসের ধারণাকে সংযুক্ত করে সারগ্রাহী নব্যধ্রুপদি এক শৈলীর সৃষ্টি করেছে, যার লক্ষণীয় দিক হল এর জোড়া স্তম্ভ, নকশার ভেতর নকশা, ছাদের উঁচু কিনারা, গম্বুজ, অভিক্ষিপ্ত (Projected) সম্মুখভাগ, বালুস্ট্রেড, পিলাস্টার, চাতাল ইত্যাদির ব্যবহার। তবে আকার ও আড়ম্বরের কারণে বোজার শৈলী প্রধানত সর্বসাধারণের ব্যবহার উপযোগী বাড়ি যেমন মিউজিয়াম, লাইব্রেরি, রেলস্টেশন ইত্যাদির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে। অবশ্য আমেরিকার 'গিল্ডেড যুগে' বেশ কিছু শিল্পপতি তাদের ব্যক্তিগত বাড়ি তৈরিতে এই শৈলী ব্যবহার করেছিলেন ফলে তাদের প্রতিবেশীদের পরিকল্পনার ওপর এর প্রভাব পড়েছিল এবং বড়ো ও জমকালো বাড়ি, প্রশস্ত উদ্যানপথ, পার্ক তৈরির পরিকল্পনা করা হয়েছিল।

১৮১৯ সালে ফ্রান্সে শিল্পকলা বিদ্যালয় হিসাবে একোল দে বোজার ('The Ecole des Beaux-Art') গড়ে ওঠে ফ্রান্সের সাবেক রয়াল আকাদেমিগুলির একমাত্র উত্তরসূরী হিসাবে। অনেক আগেই এটি স্থাপত্যের একমাত্র বিদ্যালয় হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে ছাত্ররা এখানে পড়তে আসত। আমেরিকার বহু স্থপতি এই কিংবদন্তি বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। তাঁদের মধ্যে আছেন



নং ২৩৬. জন ক্যারে এবং থমাস হেস্টিং : নিউ ইয়র্ক পাবলিক লাইব্রেরি। ১৮৯৭ - ১৯১১।

রেমন্ড হুড, চার্লিস ফলেন, ম্যাকিন, লুই সুলিভান, জন রাসেল পোপ প্রমুখ। বাউহাউসের মতো The Ecole des Beaux-Artও ডিজাইন পদ্ধতির আদর্শের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিদ্যালয় ছিল। বোজার আন্দোলন আঙ্গিক, নগর পরিকল্পনার সঙ্গেও যুক্ত হয়েছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে স্থাপত্য ও ভূদৃশ্যের সৌন্দর্য বৃদ্ধির মাধ্যমে আমেরিকার শহরাঞ্চলের পরিবেশের উন্নতি বিধানের লক্ষ্যে যে তথাকথিত নাগরিক সৌন্দর্যায়ন আন্দোলন গড়ে উঠেছিল তাকেও প্রাণিত করেছিল বোজার। এই প্রক্রিয়ার প্রথম প্রকাশ দেখা যায় ১৮৯৩ সালে ওয়ার্ল্ড কলাম্বিয়ান এক্সপোজিশনের জন্য তৈরি 'দি হোয়াইট সিটি'তে। ১৯২০ সাল নাগাদ এই শৈলীর জনপ্রিয়তা হ্রাস পেতে থাকে। এই শৈলীর বাড়িগুলি অচিরেই দেমাকি বস্তুতে পরিণত হয়। অবশ্য পরবর্তীকালে উত্তর আধুনিকতাবাদীরা বোজার-এর আদর্শের রসমূল্যকে পুনরায় আবিষ্কার করেন। বেশির ভাগ ইম্প্রেশনিস্ট শিল্পীরা বোজার-এ প্রশিক্ষিত হলেও তাঁরা এর শিক্ষার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন। অবশ্য এখন এই স্কুল অনেক উদার।

বোটেগা (Bottega) — ইতালীয় মধ্যযুগে বা রেনেসাঁসের সময় যে কর্মশালায় একজন প্রতিষ্ঠিত শিল্পী তাঁর সহযোগীদের নিয়ে কাজ করতেন। ইতালীয় পরিভাষায় এর অর্থ হল 'দোকান'। দ্বিতীয় একটি অর্থ অনুযায়ী বোটেগা হল ওস্তাদ শিল্পীর নিজের হাতে গড়ার পরিবর্তে, তাঁর তত্ত্বাবধানে নির্মিত শিল্পকর্ম।

বোধিসত্ত্ব — মথুরার বুদ্ধ মূর্তিকে বলা হয় বোধিসত্ত্ব। এই শিল্পীরা নিজেদের কল্পনা এবং ধারণা অনুযায়ী যেমন বুদ্ধকে যক্ষের আকারে গড়েছেন তেমনি বুদ্ধকে দেখেছেন পৃথিবীর অধিপতি রূপে। মথুরার বুদ্ধমূর্তি গৃহী আত্মতৃপ্ত ব্যক্তি যার চোখ খোলা এবং হাস্যময়। শরীরও একটু শিথিল। সারনাথের জাদুঘরে রক্ষিত আছে এ যুগের শ্রেষ্ঠ বোধিসত্ত্বের মূর্তি। শ্রাবস্তীর জেতবনের কাছে পাওয়া এ সময়েরই একটি বোধিসত্ত্বের মূর্তি আছে কলকাতার ভারতীয় জাদুঘরে।

অজন্তার ১নং গুহার দেয়ালে গুপ্তযুগে, সম্ভবত পঞ্চম শতাব্দীতে আঁকা বোধিসত্ত্ব পদ্মপাণির একটি ছবি আছে।

নং ২৩৭. বোধিসত্ত্বকে মারের নিগ্রহ। গান্ধার ভাস্কর্যের অংশ। কুষাণ যুগ। খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী।



ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিতে একটু ঢিলেঢালা ভাবে দণ্ডায়মান। হাতে নীলপদ্ম গায়ে দামি রত্নের অলংকার। গলায় পবিত্র মুক্তোর মালা যা বুদ্ধদেবের বংশ আভিজাত্যের নমুনা। ছবির ছায়াহীনতা অপার্থিব আলোর উপস্থিতিকে দেখিয়ে দেয়। ১নং গুহাতে এরকম আরও একটি বোধিসত্ত্বের মূর্তির ছবি আছে। যাতে তাঁর দরবারে রানি এবং প্রমীলা পরিবৃত্ত অবস্থায় চিত্রিত। এটি মহাজনক জাতকের গল্পের রূপায়ণ।

বোহিমিয়ান আর্ট (Bohemian Art)

বোহিমিয়া হল মোটামুটিভাবে বর্তমান চেকোশ্লোভাকিয়া। রেনেসাঁসের একটি পর্বের তথা অন্তিম চতুর্দশ শতাব্দী ও আদি পঞ্চদশ শতাব্দীর সময়কালীন বোহিমিয়ার এই শিল্পকলা বোহিমিয়ান আর্ট নামে পরিচিত। বোহিমিয়ার রাজা সম্রাট ষষ্ঠ চার্লসের রাজত্বে প্রাগে শিল্পকলার পুনরুজ্জীবন ঘটে, বিশেষ করে যা উদ্দীপ্ত হয় সম্রাটের দুর্দান্ত পৃষ্ঠপোষকতা এবং শিল্প চর্চার আগ্রহে। একটি নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। সেই সঙ্গে একদল ফরাসি স্থপতি ম্যাথিয়াস অব আরাস

এবং তার উত্তরসূরী এবং ভাস্কর পিটার পারলার-এর দ্বারা নতুন একটি বিরাট গথিক ক্যাথিড্রাল নির্মিত হয়। সম্রাট ক্যাথিড্রালের জন্য অসংখ্য স্মারক-আধার, ইতালীয় রীতির মুরাল এবং মোজাইক তৈরির নির্দেশ দেন। ফ্রান্সের সেন্ট ডেনিসের যে সব রাজকীয় সমাধিগুলি চার্লস দেখেছিলেন তা স্বাভাবিকভাবেই একাজে প্রাণিত করেছিল। সম্রাটের কার্লস্টাইনের দুর্গে ওস্তাদ থিয়োডেরিকের তৈরি শিল্পকর্ম সহ অসংখ্য প্যানেল এবং মুরাল আজও টিকে আছে। সম্রাটের পারিষদবর্গের উদ্যমী পৃষ্ঠপোষকতায় এমন দরবারি শিল্প লালিত হয়েছিল যার ওপরে সে সময়ের ইউরোপের কোনো শিল্প ছিল না। পাণ্ডুলিপি ও প্যানেল চিত্রণের ওপর বিশেষ করে ভিসি ব্রডের শিল্পীদের কাজে ফরাসি ও সিয়েনিজ (পশ্চিম-মধ্য ইতালির শহর সিয়েনার) প্রভাব লক্ষ করা যায়। চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ পর্বে বোহিমীয় চিত্রকলা ও ভাস্কর্যে 'সফট স্টাইল' রীতির উদ্ভব ঘটে। এই 'সফট স্টাইল' পরবর্তীকালে 'ইন্টার ন্যাশনাল গথিক' রূপ নেবার ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পঞ্চদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে হাসাইট যুদ্ধ এখানকার শিল্পচর্চার প্রভূত ক্ষতিসাধন করে।

ব্যাকরান (Backrun)

রঙের প্রতিসরণ। এটা বিশেষ করে ঘটে জল রঙের ক্ষেত্রে। দুটো অংশের তরল রং পরস্পরের সঙ্গে মিশে যাবার সময়ই এমনটা হয়। যার ফলে একটা অন্যরকম বুনট বা ফলাফল তৈরি হয়। রং লাগানো অংশ এবং সাদা জল লাগানো দুটো অংশের মিলনের সময়ও এমনটা ঘটে। অনেক সময় ব্যাকরান গ্রহণযোগ্য হয় বা শিল্পীরা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে ইচ্ছে করেই এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করেন। আবার অনেক ক্ষেত্রেই এমনটা ঘটলে ছবির রং নোংরা হয়ে যায় যা কাঙ্ক্ষিত নয়। ব্যাকরান সবচেয়ে ভালো বোঝা যায় যখন দুটো অসমান সিক্ত অংশের মধ্যে সংযোগ ঘটে। যেমন সাদা জল (Plain water) লাগানো অংশ এবং শুকিয়ে ওঠা জল রঙের স্যাঁতস্যাঁতে অংশ। এর কারণ অতি তরল জল কম তরল রঙের মধ্যে আগ্রাসীভাবে প্রবাহিত হওয়ার সময় রঙের পিগমেন্টকে ঠেলে সরিয়ে দেয়।

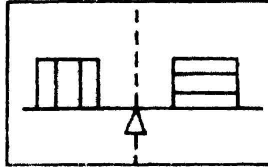
ব্যাকস্টাইনগটিক (Backsteingotic)

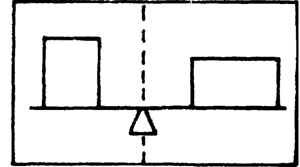
উত্তর জার্মানির আদর্শগত এক সরলীকৃত ইটের তৈরি গথিক স্থাপত্য। এই রীতির সর্বোচ্চ বিকাশ ঘটেছিল চতুর্দশ শতাব্দীতে।

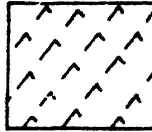
ব্যাডপেন্টিং (Badpainting)
নিওএক্সপ্রেশনিজ্‌ম-এর মার্কিনি তর্জমা।

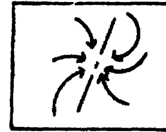
ব্যাটল পিস (Battle-piece)
সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে এক ধরনের কম্পোজিশন খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। সেসব চিত্রে একটা যুদ্ধের পরিবেশকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছিল কিন্তু তা কোনো নির্দিষ্ট যুদ্ধের দৃশ্য নয়। এসব ছবির বেশিরভাগই তুলনামূলকভাবে ছোটো পরিসরের হত। এছাড়া সাধারণভাবে যে কোনো যুদ্ধের ছবি বা ভাস্কর্যকেও বলা হয় ব্যাটল পিস।

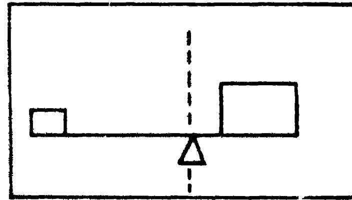
ব্যালেন্স (Balance)
চিত্র কিংবা ভাস্কর্য সংক্রান্ত রচনা অর্থাৎ কম্পোজিশনে ব্যবহৃত বিভিন্ন উপাদান বা বিষয়ের মধ্যের ভারসাম্যের


পিয়োর সিমেট্রি


অ্যাপ্রক্সিমেট সিমেট্রি


ক্রিস্টালোগ্রাফিক ব্যালেন্স


রেডিয়াল ব্যালেন্স


অ্যাসিমেট্রিক্যাল ব্যালেন্স

ধারণা। সাধারণভাবে এইসব উপাদান বা বিষয় তথা ফর্মগুলিকে একটি অক্ষের চারপাশে বিন্যস্ত করে ভারসাম্য সৃষ্টি করা হয়। ভারসাম্য নির্ভর করে রূপ (Form) এবং রং উভয়ের বিন্যাসের ওপর। এরকম ক্ষেত্রে কোনো একটি কাল্পনিক অবলম্বন বা ভরের কোনো একটি বিন্দুর থেকে দূরে থাকা একটি ছোটো আকার বা রূপও ওই অবলম্বন বা ভরের কাছাকাছি থাকা বড়ো একটি আকার বা রূপের যথাযথ প্রতিওজন হতে পারে। ঠিক অনুরূপভাবে একই

আকারের বা অপেক্ষাকৃত ছোটো কোনো কালচে রঙের আকৃতিও সমান মাপের আকৃতির চেয়ে তুলনামুলকভাবে বেশি ভারী হতে পারে।

এছাড়াও কিছু সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক কারণের ওপরেও ভারসাম্য নির্ভরশীল। যেমন বিমূর্ত নয় এমন কোনো রূপ বা আকৃতি যদি দর্শকের জ্ঞান অনুযায়ী বাস্তবিকভাবে ভারী কোনো জিনিসের সদৃশ হয় তাহলে দর্শক সেই বস্তুকে ভারী বলেই মনে করবেন। আবার একইভাবে সেই বস্তু যদি দর্শকের জ্ঞান অনুযায়ী ভাবপূর্ণ কোনো কিছু যথা মুখ সদৃশ হয় তাহলে দর্শক স্বাভাবিকভাবেই তাকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দেয়। সুতরাং কম্পোজিশনের ভারসাম্য নির্ণয়ের ক্ষেত্রে তার ওজনও বৃদ্ধি পায়। *ডিজাইন দেখুন।

ব্রাশ (Brush)

সাদা বাংলায় তুলি। শিল্পীর প্রধান হাতিয়ার। বেশিরভাগ ব্রাশ বা তুলিতে যা থাকে তা হল একগুচ্ছ লোম দিয়ে তৈরি তুলির মাথা, এই লোম বা আঁশগুচ্ছকে বেঁধে রাখার জন্য একটা একমুখ চাপা ফেরুল বা ধাতব চোং এবং একটা হাতল তথা handle যে হাতলের এক প্রান্তে ফেরুল সহ তুলির মাথা আটকানো থাকে। তুলির মাথার লোমের বা আঁশগুচ্ছের বিভিন্ন ও নির্দিষ্ট ধরনের আকার হয়। যেমন চ্যাপ্টা, গোলাকার, বর্তুলাকার ইত্যাদি। ভালো ফেরুলগুলি মরচে পড়ে না এমন ধাতু দিয়ে জোড়হীন ভাবে তৈরি। হাতলে ব্যবহৃত কাঠ সাধারণভাবে হার্ডউড এবং তাতে পালিশ করা থাকে। অবশ্য সস্তা ব্রাশে প্লাস্টিকের হাতলও ব্যবহার করা হয়।

তুলিতে সাধারণত তিন ধরনের আঁশ ব্যবহার করা হয়। এগুলো হল কোমল প্রাণীর লোম যেমন মেরু অঞ্চলের মূল্যবান বেজি জাতীয় প্রাণী কোলিনস্কি স্যাবেল-এর লোম বা অপেক্ষাকৃত সস্তা কাঠবেড়ালির লোম, শূকরের লোম এবং কৃত্রিম সিনথেটিক আঁশ। অতি মূল্যবান কোমল প্রাণীর লোম ব্যবহার করা হয় এর স্থায়িত্ব, 'স্প্রিং'-গুণ এর জন্য। প্রতিটি স্ট্রোকের পর আঁশগুচ্ছ সহজেই আগের অবস্থায় ফিরে আসতে পারে এরকম বৈশিষ্ট্য হল স্প্রিং গুণ। শূকরের লোমে তৈরি ব্রাশ শক্তপোক্ত কাজ এবং মোটা রং ব্যবহারের জন্য শক্ত ধরনের। এই কারণে তেল রং-এর তুলি শূকরের লোমে বা hog hair দিয়ে তৈরি হয়।

সিনথেটিক আঁশ তৈরি হয় নাইলন এবং পলিয়েস্টার জাতীয় আধুনিক উপাদান দিয়ে। বর্তমানে অতি উন্নত মানের সিনথেটিক আঁশযুক্ত ব্রাশ প্রস্তুত হচ্ছে যা গুণগত দিক দিয়ে মূল্যবান প্রাণীর লোমের তৈরি ব্রাশের সমতুল। শিল্পীরাও তা পছন্দ করছেন। দামের দিক থেকেও প্রাণীর লোমের তৈরি ব্রাশের থেকে বেশি নয়। স্যাবেল হেয়ার, হগ হেয়ার বা সিনথেটিক সব ব্রাশই যে কোনো মাধ্যমেই ব্যবহার করা যায় তবে অ্যাক্রিলিক রঙের জন্য সিনথেটিক হেয়ারের ব্রাশই ভালো। কেন-না অ্যাক্রিলিক রং স্যাবেল হেয়ার এবং হগ হেয়ারকে রুক্ষ করে দেয় এবং ব্রাশের ক্ষতি করে। এমনকি হগ হেয়ার অ্যাক্রিলিক রঙের জল শোষণ করে নরম হয়ে পড়ে।

ব্রাশের হাতলও কাজের প্রয়োজন এবং সুবিধে অনুযায়ী ছোটো বড়ো হয়। প্রথা অনুযায়ী তেল রং বা অ্যাক্রিলিকে ছবি আঁকা হয় ইজেলে ক্যানভাস চড়িয়ে ফলে চিত্রপট থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে ছবি আঁকতে হয় বলে তেল রং বা অ্যাক্রিলিক রঙের ব্রাশের হাতল লম্বা হওয়ার দরকার হয়। কিন্তু জল রং দিয়ে ছবি আঁকা হয় চিত্রপটকে অনুভূমিক অবস্থায় রেখে এবং তুলিও ধরা হয় লেখনির মতো করে। তাই জল রঙের জন্য তুলির হাতল ছোটো হওয়া সুবিধাজনক। যে-কোনো তুলি যে-কোনো মাধ্যমেই ব্যবহার করা গেলেও তুলি নির্বাচনের ক্ষেত্রে শিল্পীর পছন্দই শেষ কথা। তবুও সাধারণভাবে দামের নিরিখে দামি থেকে দস্তা একটি তালিকা করা যেতে পারে।

কলিনস্কি স্যাবেল : উত্তর এশিয়ায় প্রাপ্ত বেজি প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণী Mustelidae-র লেজের লোম দিয়ে তৈরি। সাধারণভাবে স্বীকৃত সবচেয়ে ভালো প্রাকৃতিক লোম এবং অত্যন্ত দামি।

লাল স্যাবেল : 'মাসটিলেডেই' পরিবারের অন্যতম সদস্য লাল স্যাবেল (Red Sable)-এর লোম। উন্নতমানের হলেও কলিনস্কি-এর মতো অত ভালো এবং 'স্প্রিং-গুণ' সম্পন্ন নয়। মাসটিলেডেইর মতো দামিও নয়।

স্যাবেলাইন : সত্যিকারের স্যাবেলের লোম নয়। উন্নতমানের ষাঁড়ের লোম। রং করে স্যাবেলের মতো করা হয়।

ষাঁড়ের লোম : ষাঁড়ের লোম বেশ শক্ত এবং এর 'স্প্রিং-গুণ'ও ভালো। বিভিন্ন প্রজাতির ষাঁড়ের থেকে এই

লোম পাওয়া যায়। এই লোম পাওয়াও যায় সহজে।

ব্রিস্টল্ : বেশ কয়েক ধরনের প্রাণী যেমন কাঠবেড়ালি, ছাগল, টাট্টু ঘোড়া ইত্যাদির (উট নয়) লোম। নানা ধরনের ও দামের মধ্যে এসব পাওয়া যায়।

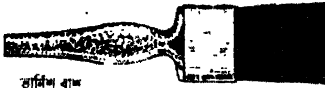
স্কুইরেল .: আসল কাঠবেড়ালির লোম। তুলনামূলক ভাবে দামে। সস্তা। এই লোমের গুচ্ছে অনেকটা পরিমাণ তরল ধরে এবং মপ (mop) ব্রাশের মতো জল রঙের কাজে ব্যবহার করা হয়।

সিনথেটিক : সিনথেটিক হেয়ার হল সাধারণভাবে মনুষ্যসৃষ্ট উপাদান। যথা নাইলন, পলিয়েস্টার ইত্যাদি। এসব তন্তু দিয়ে তৈরি তুলি সব রকম মাধ্যমেই ব্যবহার করা যায় তবে অ্যাক্রিলিক রঙের জন্য বিশেষভাবে উপযুক্ত।

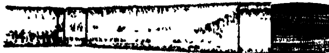
নানারকম লোমে তৈরি তুলির আকারও আছে নানা রকম। এক এক ধরনের তুলির উপযোগিতা এক এক রকম। সাধারণভাবে তুলি তিন রকম আকারের। রাউন্ড, ফ্ল্যাট এবং ফিলবার্ট। আবার এসবের মধ্যেও নানা বৈচিত্র্য আছে। যেমন—


অ্যাঙ্গুলার লাইনার

অ্যাঙ্গুলার লাইনার : শূকরের সাদা লোম অর্থাৎ ব্রিস্টল দিয়ে তৈরি এক ধরনের ফ্ল্যাট ব্রাশ। মাথাটা তেরচা কাটা। এটা আউট লাইন বা রানিং লাইন টানার কাজে ব্যবহার করা হয়। এর আর একটি নাম ফ্রেস্কো লাইনার।


ভার্নিশ ব্রাশ

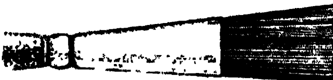
ভার্নিশ বা হাউস পেন্টিং ব্রাশ : এটিও একটি ফ্ল্যাট ব্রাশ। তবে এগুলো বেশ চওড়া হয়। এর হাতল মোটা ও ছোটো। এতে থাকে নরম ক্যামেল হেয়ার। বড়ো কোনো জায়গায় রং করা বা বার্নিশ করার কাজে এই তুলি ব্যবহার করা হয়।


ব্রাইট

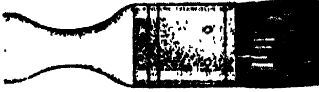
ব্রাইট অথবা শর্ট ফ্ল্যাট ব্রাশ : এটি তেল রং, কেইসিং পেন্টিং, পলিমার পেন্টিং-এর ব্রাশ। চ্যাপটা। মাথা ছোটো ও চৌকো। সাদা শূকরের লোমে তৈরি। হাতল সরু ও লম্বা।


ফ্ল্যাট

লং ফ্ল্যাট : ব্রাইটের মতোই চৌকো মাথা তবে একটু লম্বা মাথা। এটিও ভারী রঙের অর্থাৎ তেল রং, অ্যাক্রিলিক রঙের ক্ষেত্রে সুবিধাজনক।

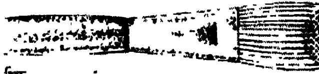

ইজেল ব্রাশ

ইজেল ব্রাশ : এটিও চৌকো মাথা লং ফ্ল্যাট ব্রাশ তবে মাথার প্রান্তদেশ চওড়া। টেম্পারার কাজে উপযুক্ত।


সাইনরাইটার ব্রাশ

সাইনরাইটার ব্রাশ : ষাঁড়ের লোমে তৈরি এটিও একটি চৌকো মাথা ফ্ল্যাট ব্রাশ। গঠন অনেকটা বাটালির মতো। এটা মোটা বলে এর ফিলামেন্টে বেশি রং ধরে। সাইনবোর্ড রং করার জন্য বেশি ব্যবহার করা হয়।

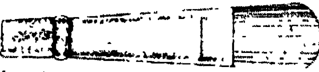
সাইনরাইটার ফিচ : ইজেল ব্রাশের মতোই তবে মাথাটা আর একটু বেশি লম্বা। নানারকম দৈর্ঘ্যে পাতলা মোটা বিভিন্ন শ্রেণির সানরাইটার ফিচ পাওয়া যায়। মূলত সাইনবোর্ড লেখার কাজে এই ব্রাশ ব্যবহার হয়।


ফিচ

ফিচ (Fitch) : ইজেল ব্রাশেরই মতন ফ্লাট ব্রাশ। শুধু মাথাটা বাটালির ফলার মতো করে কাটা।


বুলেটিন কাটার

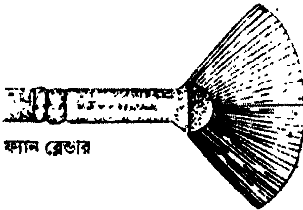
বুলেটিন কাটার : চ্যাপ্টা ও চওড়া ছোটো হাতলের ব্রাশ। সাদা শূকরের লোমে তৈরি। মাথাটা পাতলা করে কাটা। এর হাতলও চ্যাপ্টা। সাইনবোর্ড পেন্টারগণ ব্যবহার করেন।


ফিলবার্ট

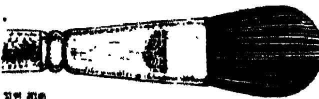
ফিলবার্ট : ফ্ল্যাট ব্রাশের একটি ধরন হল ফিলবার্ট। এটি কার্যত একটি লং ফ্ল্যাট ব্রাশ কিন্তু মাথাটা উপবৃত্তাকার বা oval করে ছাঁটা। সাধারণত হগ হেয়ারে তৈরি এই ব্রাশ তেল রঙের কাজে লাগে।


ড্যাগার স্ট্রিপার

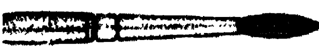
ড্যাগার স্ট্রিপার : লম্বা হেয়ার দিয়ে তৈরি পেট মোটা এক রকম তুলি এতে অনেক বেশি পরিমাণে রং ধরে। এই ফ্ল্যাট ব্রাশের একটি ধার সোজা এবং অন্য ধারটি বাঁকিয়ে একটি বিন্দুতে এমন ভাবে মেলানো হয়েছে যে দেখতে একটি চাকুর মতো। সাধারণত বাদামি ক্যামেল হেয়ার দিয়ে এই ব্রাশ তৈরি। বিভিন্ন তলে খুব সূক্ষ্ম ও সুষম লাইন টানা যায়।


ফ্যান ব্লেন্ডার

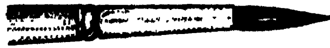
ফ্যান ব্লেন্ডার : নরম চ্যাপটা তুলি। এর লোমগুচ্ছকে একটি বিশেষ ধরনের ফেরুলের সাহায্যে পাখার মতো করে বাঁধা থাকে। লাল স্যাবেল এবং শূকর উভয় লোম দিয়েই এই ব্রাশ তৈরি হয়। নানা ধরনের সূক্ষ্ম এফেক্ট তৈরি করতে এবং রং মেশাতে এই ব্রাশ ব্যবহৃত হয়। প্রধানত তেল রঙের কাজে লাগে।


মপ ব্রাশ

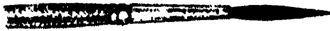
মপ ব্রাশ : লম্বা এবং গোল মাথার ব্রাশ। ক্যামেল হেয়ার দিয়ে তৈরি এই ব্রাশ জল রঙের ওয়াশ লাগানোর কাজে লাগে।


রাউন্ড

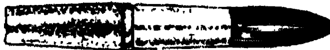
রাউন্ড ব্রাশ : তেল রং করার এই ব্রাশ ফ্ল্যাট ব্রাশের মতোই লম্বা। এর মাথা গোল এবং শীর্ষবিন্দু গোলাকার। স্কেচ, আউটলাইন এবং সূক্ষ্ম ডিটেলের কাজে উপযুক্ত।


রেড স্যাবল

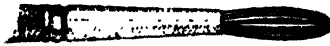
রেড স্যাবেল ব্রাশ : এই ব্রাশ তেল রং, জল রং, কমার্শিয়াল আর্ট, রিটাচিং, লিথোগ্রাফি, সিরামিকস সহ নানান কাজে ব্যবহার করা হয়। জল রঙের জন্য তৈরি স্যাবেল ব্রাশ সূচিমুখ এবং চ্যাপ্টা, মপ সব রকমই তৈরি হয়। তেল রঙের ব্যবহারের জন্য ফ্লাট, লং ফ্লাট, ব্রাইট, স্কোয়ার এবং রাউন্ড ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনে পাওয়া যায়।


স্ক্রিপ্ট ব্রাশ

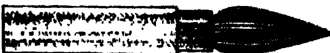
স্ক্রিপ্ট ব্রাশ : রেড স্যাবেলে তৈরি অতি লম্বা মাথা সূচিবৎ অগ্র সম্পন্ন রাউন্ড ব্রাশ। এই তুলি দিয়ে অলংকৃত হরফ এবং নানা ধরনের সূক্ষ্ম নকশা আঁকা হয়।


ওয়াশ ব্রাশ

ওয়াশ ব্রাশ : ক্যামেল হেয়ারে তৈরি অপেক্ষাকৃত ছোট মাথার গোল তুলি। জল রঙের ছবিতে ওয়াশ দিতে ব্যবহার করা হয়। মপ ব্রাশও এই গোত্রে পড়ে।


পোস্টার ব্রাশ

পোস্টার ব্রাশ : কালো স্যাবেলের লোম অথবা ক্যামেল হেয়ার দিয়ে এই ব্রাশ তৈরি। এর হাতল লম্বা এবং সূচিবৎ এই ব্রাশ জল রঙের কাজে উপযোগী।


বাম্বু ব্রাশ

বাম্বু ব্রাশ : ধাতব ফেরুল ছাড়াও এক ধরনের ব্রাশ তৈরি হয়। তার মধ্যে প্রধান হল বাম্বু ব্রাশ। বাঁশের হাতলের মধ্যে ষাঁড়ের লোম গুঁজে এই ব্রাশ তৈরি হয়। এর মাথা খুবই সূচালো। চৈনিক শিল্পীরা এই ধরনের তুলি ব্যবহার করেন। সিরামিক পেন্টিং-এও এ ধরনের তুলি ব্যবহার করা হয়।

ব্রাশ পেন
(Brush pen)

একটি মার্কার পেন যার নমনীয় আঁশজাতীয় উপাদানে তৈরি মুখকে রাউন্ড পেন্ট ব্রাশের মতো ব্যবহার করা যায়। এর সাহায্যে সরু বা মোটা লাইন টানা সম্ভব। এই ধরনের পেন বিভিন্ন রঙের পাওয়া যায়।

ব্রাশ মেনটেনেন্স
(Brush Maintenance)

শিল্পীর অন্যতম প্রধান হাতিয়ার হল ব্রাশ বা তুলি। কিন্তু এই তুলি নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ক্রমশ ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়ে। সতর্কতার সঙ্গে সঠিক যত্ন নিলে এবং রক্ষণাবেক্ষণ করলে একটি ব্রাশকে বহুদিন পর্যন্ত ব্যবহার উপযোগী রাখা সম্ভব। প্রথমত দেখা যায় যে সস্তা তুলির ফেরুল এবং ব্রাশের লোমকে সংঘবদ্ধ রাখার পদার্থ ঠিকমতো না থাকলে লোমগুলি ক্রমশ আলাদা হয়ে ঝরে যায়। কেনার সময়ই এটা দেখে নেওয়া উচিত। খুব বেশি রুক্ষ বা খসখসে ক্যানভাস বা চিত্রপটে ছবি আঁকলে দ্রুতই তুলি ক্ষয় হয়ে যায়। তাই রং লাগানোর আগে চিত্রপটের মসৃণতা দেখে নেওয়া উচিত।

প্রতিবার ব্যবহারের পর ব্রাশ ভালো করে পরিষ্কার রাখা দরকার। নইলে ব্রাশে থাকা রং শুকিয়ে গিয়ে তুলির লোম জমাট বেঁধে যায়।

তেল রং ব্যবহারের পর ব্রাশকে বেশ কয়েকবার টারপেনটাইন বা মিনারেল স্পিরিটের মধ্যে ভালো করে নাড়িয়ে রং পরিষ্কার নিয়ে তারপর কাপড় দিয়ে মুছে হালকা সাবান গোলা গরম জলে ধুয়ে নিতে হবে। সাবান ব্রাশে থাকা তেলের অবশেষকে গুলে বের করে আনবে। এর পর হাতের চেটো দিয়ে ব্রাশে চাপ দিয়ে বাকি পিগমেন্টকেও দূর করা যাবে। সবশেষে আবার গরম জলের ধারায় ধুয়ে নিতে হবে।

তেল রঙে শক্ত হয়ে যাওয়া তুলি কখনো-কখনো অ্যাসিটোনে ভিজিয়ে ঠিক করা যায়। কিন্তু সেক্ষেত্রে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। কেন-না অ্যাসিটোন ফেরুলের মধ্যের ব্রিসল্‌কে আটকে রাখা আঠাকেও গলিয়ে দেয়। তাই ব্রাশকে অ্যাসিটোনের দ্রবণে দ্রুত ডোবাতে ওঠাতে হবে এবং বারে বারে কাপড় দিয়ে মুছে নিতে হবে। তারপর সাবান জলে ধুতে হবে। তাছাড়াও যেহেতু অ্যাসিটোন দাহ্য পদার্থ তাই উপযুক্ত বায়ু চলাচল সম্পন্ন স্থান ছাড়া এই কাজ করা উচিত নয়।

ব্রাশে চাচ গালা জমে শক্ত হয়ে গেলে তা সোহাগার জলের দ্রবণে ধুয়ে নেওয়া যায়। টেম্পারায় শক্ত হয়ে যাওয়া ব্রাশ অ্যামোনিয়ার দ্রবণে নরম করা যায়। ল্যাকারে শক্ত হয়ে যাওয়া ব্রাশ অ্যাসিটোন, জল এবং সামান্য ট্রাইসোডিয়াম ফসফেট দ্রবণের সাহায্যে পরিষ্কার করা যায়।

অয়েল পেন্ট-এর ক্ষেত্রে হোয়াইট পেট্রোলিয়াম জেলি ব্যবহার করলে ভালো ফল পাওয়া যায়। এমনকি কাজ করার পর যদি ভালো করে পরিষ্কার করার মতো সময় না পাওয়া যায় তাহলেও হোয়াইট পেট্রোলিয়াম জেলি মাখিয়ে রাখলে রং জমে শক্ত হয় না।

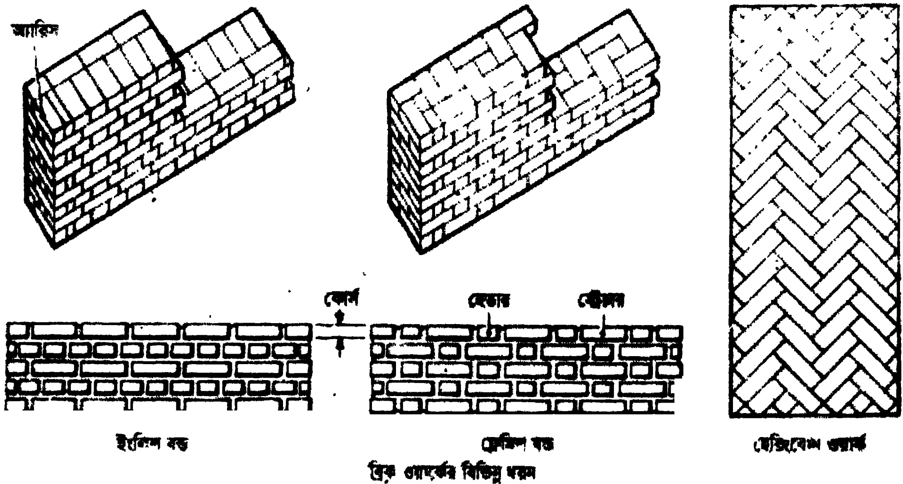
জল রঙের তুলিও কাজ করার পরে সাবান জলে ভালো করে ধুয়ে রাখা উচিত। ধোয়ার পর বুড়ো আঙুল, তর্জনী এবং মধ্যমার সাহায্যে তুলির মাথাকে যথাযথ আকারে আনতে হবে এবং শুকোতে দিতে হবে। শুকোবার পর ব্রাশকে ধুলোহীন ড্রয়ারে শুইয়ে রাখা উচিত। ব্রাশ সম্পূর্ণ না শুকোলে ব্রাশে মাইল্ডিউ নামে ক্ষতিকারক একধরনের ছত্রাক জন্মায়।

ব্রাশ সাইজ (Brush Size)

ব্রাশের সাইজের কোনো আন্তর্জাতিক মাপকাঠি নেই। এ ব্যাপারে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ধরনের মাপকাঠি ও শর্ত চালু আছে। অনেক জায়গায় যেমন আমেরিকাতে তুলির মাপ প্রকাশ করা হয় তিন ভাবে। যেমন ফ্ল্যাট ব্রাশের ক্ষেত্রে ইঞ্চি ও তার ভগ্নাংশ দিয়ে ফেরুলের চওড়া মেপে তার সাইজ ভাগ করা হয়। যথা ১২ নং ফ্ল্যাট ব্রাশ হল ১ ইঞ্চি চওড়া তেমনি ৬ নং ফ্ল্যাট ব্রাশ স্বাভাবিক ভাবেই ১/২ ইঞ্চি চওড়া এবং এই ভাবে এগিয়ে পিছিয়ে নং ঠিক হয়। আবার রাউন্ড বা গোল ব্রাশের ক্ষেত্রে তার ফেরুলের ব্যাস মেপে সাইজ ঠিক করা হয়। যেমন ৫ নং ব্রাশের ফেরুলের ব্যাস হল সিকি ১/৪ ইঞ্চি।

ব্রিক ওয়ার্ক (Brick work)

বাড়ি বা ইমারতের ছোটো অঙ্গ বা ইউনিট হল ইট। যা আকারে আয়তাকার ঘনক। প্রায় ছয় হাজার বছর আগে সূর্যের তাপে শুকনো খণ্ড হিসাবে প্রথম তৈরি হয়েছিল। ইটের মূল উপাদান হল মাটি যা খোলা গর্ত থেকে খুঁড়ে তোলা হয়। তারপর হাতে বা ছাঁচে ইট তৈরি করে তার শক্তি, কাঠিন্য এবং তাপ প্রতিরোধী গুণ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ভাটিতে পোড়ানো হয়। প্রাচ্যের কাছাকাছি স্থানে প্রাচীনকালে বাড়ি তৈরির মুখ্য উপকরণ ছিল ইট। প্রাচীন রোমে উন্নত প্রক্রিয়ায় ইট তৈরি করে এবং আটকানোর নতুন কৌশল ব্যবহার করে ইটকে বহুমুখী গুণসম্পন্ন করে তোলা হয়। পশ্চিম ইউরোপে ইটের ব্যাপক ব্যবহার শুরু হয় এর অগ্নি



ব্রিক ওয়ার্কের বিভিন্ন ধরন

প্রতিরোধী গুণের জন্য। ইটকে থরে থরে সাজিয়ে দেয়াল বা স্থাপত্যের নানা অঙ্গ তৈরি করা হয় যাকে গাঁথুনি বলে। ইটের এই গাঁথুনিকর্মের নানা রকম বিন্যাস বা ভাগ আছে। যেমন—

অ্যারিস (Arris) : ইটের দুটো তলের মিলিত তীক্ষ্ণ প্রান্ত রেখা।

কোর্স (course) : সারি সারি ইট যেভাবে পেতে গাঁথনি তোলা হয়। সাধারণত অনুভূমিক ভাবে পাতা ইটের ধারাবাহিক সারি।

ফুটিং (footing) : দেয়ালের বা গাঁথনির ভিত্তিতে ধাপে ধাপে ছড়ানো ইটের পত্তন (Course), যার মাধ্যমে কাঠামোর ভর সুষম ভাবে বণ্টিত হয়।

হেডার (Header) : গাঁথনিতে আড়াআড়িভাবে পাতা ইট বা তার বেরিয়ে থাকা প্রান্ত।

স্ট্রেচার (Stretcher) : গাঁথনিতে লম্বালম্বি ব্যবহার করা ইট।

নানা রকম শৃঙ্খলায় ইট সাজিয়ে দেয়াল গেঁথে তোলা হয়। অবশ্যই ইটের এই শৃঙ্খলার ওপর গাঁথনির জোর নির্ভর করে। এরকম কিছু গাঁথনির নমুনা হল—

ব্রিক-ন্যাগিং (Brick-nagging) : খাড়া কাঠের খুঁটির মধ্যে ইট ভরতি করে তৈরি দেয়াল বা পার্টিশন।

চেকারওয়ার্ক (Chequer work) : পর্যায়ক্রমে চৌকো পাথর এবং ইট তথা বিপরীতধর্মী উপকরণ সাজিয়ে তৈরি দেয়াল বা বাঁধানো শান।

ইংলিশ বন্ড (English bond) : পর্যায়ক্রমিক ভাবে আড়াআড়ি এবং লম্বালম্বি ইটের পত্তন সাজিয়ে গাঁথা দেয়াল।

ফ্লেমিশ বন্ড (Flemish Bond) : পর্যায়ক্রমে আড়াআড়ি এবং লম্বালম্বি ইট সাজানো পত্তনির পর্যায়ক্রমিক ব্যবহারে গঠিত দেয়াল বা কাঠামো।

হেরিংবোন ওয়ার্ক (Herringbone work) : প্রতিটি ইটকে তির্যকভাবে সাজিয়ে এবং পাশের সারিটি পর্যায়ক্রমিকভাবে বিপরীতমুখী করে সাজিয়ে তোলা গাঁথনি।

ব্লক (Block) — এক খণ্ড কাঠ বা বাঁধানো ধাতুর পাত, যাতে উন্নত রিলিফ পদ্ধতিতে কোনো নকশা খোদাই করা থাকে। এই রিলিফ-এ কালি লাগিয়ে ছাপানো হয় বা কোনো তলে সিলমোহর লাগানোর কাজে ব্যবহার করা হয়।

ব্লাঁ ফিক্‌সে (Blanc fixe) — সাদা গুঁড়ো পদার্থ তথা বেরিয়াম সালফেট। গুয়াশের প্রধান ভিত্তি বা বস্তু হিসাবে ব্যবহৃত হয়। তাই থেকে লেক রং তৈরি করতে এবং কিছু আধুনিক ফ্রেস্কোর জন্যও ব্লাঁ ফিক্স ব্যবহৃত হয়।

ব্লু-ভিয়ের (Blaue Vier) — ব্লু ফোর গোষ্ঠী। চারজন শিল্পী যথা লিয়োনেল ফেনিঞ্জার, ভ্যাসিলি ক্যান্ডিন্‌স্কি, পল ক্লি এবং আলেক্সি ভন জলেন্‌স্কি তাঁদের পৃষ্ঠপোষক শ্রীমতী গালকা স্কেইয়ারের পরামর্শে এই গোষ্ঠী গঠন করেন ১৯২৪ সালের মার্চ মাসে। শ্রীমতী গালকা আমেরিকাতে আসেন ১৯২৪ সালে। তিনি প্রায় ২০ বছর ধরে ইউরোপীয় শিল্পকলার একজন ব্যবসায়ী ছিলেন। বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিগত সংগ্রহককে তিনি জড় করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল লুই এবং ওয়ালটার আরসেনবার্গ। দলের এই নাম রাখারও পরামর্শ দেন তিনি। যার উৎস অবশ্যই 'ব্লু রাইটার' গ্রুপ। কেন-না এই চারজন শিল্পীই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে ব্লু রাইটার গ্রুপের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এর উদ্দেশ্য ছিল শ্রীমতী স্কেইয়ারকে প্রতিনিধি করে দূরদূরান্তে তাঁদের চিন্তা ও কাজের প্রচার করা। শ্রীমতী গালকা ১৯২৪ সালের মে মাসে সানফ্রানসিস্কো শহরে এই গোষ্ঠীর একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। সেখানে প্রদর্শনীর সঙ্গে শিল্পীদের দেওয়া একগুচ্ছ বক্তৃতায ব্যবস্থা কবা হয়েছিল। পরে এই প্রদর্শনী পশ্চিম দেশেও নিয়ে যাওয়া হয়। গালকা তাঁর ব্লু ভিয়ের চিত্রের একটা বড়ো সংগ্রহ প্যাসাডেনার নরটন সিখরন মিউজিয়ামে দান করেন।

ব্লুম (Bloom) — বার্নিশ করা কোনো তলে বিশেষ করে স্যাঁতস্যাঁতে পরিবেশে সৃষ্ট ক্রমবর্ধমান অনচ্ছতা (opacity)।

ব্লুমস্‌বারি গ্রুপ (Bloomsbury group) — ইংল্যান্ডের লেখক শিল্পী বুদ্ধিজীবীদের ঢিলেঢালা একটা গোষ্ঠী। এঁরা লন্ডনের ব্লুমসবারি শহরে ভার্জিনিয়া উলফের বাড়িতে অথবা ভ্যানিসা বেল কিংবা ক্লাইভ বেলের বাড়িতে

অনির্দিষ্টভাবে আনুষ্ঠানিকতা ছাড়াই মিলিত হতেন। এই গোষ্ঠীর সদস্যদের কোনো নির্দিষ্ট মতাদর্শ বা শিল্পতত্ত্ব ছিল না। তৎসত্ত্বেও ১৯১০ সালের পরবর্তীকালের ব্রিটিশ সংস্কৃতি ও বুদ্ধিজীবী জীবনের ওপর এঁদের দারুণ প্রভাব সৃষ্টি হয়ে ছিল। রক্ষণশীল ভিকটোরিয়ান সংস্কৃতি এবং ভণ্ড শালীনতাপন্থীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তাঁরা ঐক্যবদ্ধ ছিলেন, সামাজিক অবরোধের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার পক্ষে তাঁরা সওয়াল করতেন। সমালোচক রজার ফ্রাই-এর শিল্প ঘরানার প্রভাবে তাঁরা শিল্পগতভাবে সবার ওপরে গুরুত্ব দিতেন পোস্ট ইম্প্রেশনিজমকে। বিশুদ্ধ বিমূর্ত ছবির পরবর্তী পর্যায়ে ডানকান গ্রান্ট এবং ভ্যানিসা বেল-এর আঁকা বর্ণময় ফিগারেটিভ চিত্রভঙ্গি কার্যত ব্লুমস্‌বারি শৈলীর প্রতীক হয়ে ওঠে। ১৯৩০ সালের গোড়ার দিকেই কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় শিল্পীর মৃত্যুর সাথে সাথে ব্লুমস্‌বারি রীতি সেকেলে হয়ে যায়। এই গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিরা ছিলেন ই. এম. ফরস্টার, লিটন স্ট্র্যাচি, ভার্জিনিয়া উলফ, ক্লাইভ বেল, ভ্যানিসা বেল, লিয়োনরা ক্যারিনটন, ডানকান গ্রান্ট, হেনরি, ল্যাম্ব এবং অর্থনীতিবিদ মেনার্ড কেইন্স প্রমুখ।

ব্লু রাইটার গ্রুপ (Blaue Reiter group)

ইংরেজি পরিভাষায় 'The Blue Rider' (নীল সওয়ার)। জার্মানির মিউনিখের একদল শিল্পী। ১৯১১-১৪ মাত্র চার বছরের জন্য তাঁরা সক্রিয় ছিলেন। জার্মান অভিব্যক্তিবাদের অন্তর্গত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিল্পান্দোলন এই ব্লু রাইডার গ্রুপ। 'ডাই ব্রুকে' (Die Brüke)-এর তুলনায় এই গোষ্ঠী ঢিলেঢালা এবং যথেষ্ট বড়োও ছিল। এর নামকরণের পিছনে ক্যানন্ডিনস্কি এবং ফ্রাঞ্জ মার্কের ভূমিকা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যদিও গোষ্ঠীর নামটা ১৯০৩ সালে আঁকা ক্যান্ডিনস্কির একটা ছবি থেকে নেওয়া তবে তাও ছিল ১৯১১ সালে ক্যান্ডিনস্কি এবং মার্ক পরিকল্পিত বর্ষপঞ্জির শিরোনাম যা পাইপার পাবলিশিং হাউসের দ্বারা প্রকাশিত হয়েছিল ১৯১২ সালে। ১৯১১ সালের ডিসেম্বরে এই শিরোনামে থানহাউসার গ্যালারিতে একটি প্রদর্শনীরও আয়োজন করা হয়েছিল। নীল রঙের প্রতি ক্যান্ডিনস্কি এবং মার্ক দুজনেরই অনুরাগ ছিল প্রবল। কান্ডিনস্কির কথায়—'Both of us liked blue, Marc for horse, I for riders. So the name came by itself.' (আমরা

দুজনেই নীল রং পছন্দ করতাম! মার্ক করত ঘোড়ার জন্য। আমি করতাম সওয়ারের জন্য। এই ভাবেই নাম তৈরি হয়ে গেল)। মার্ক এবং ক্যান্ডিন্‌স্কি কিউবিজ্‌ম এবং জার্মান এক্সপ্রেশনিজ্‌মের সমালোচনা করেছিলেন। কিউবিজ্‌মকে তাঁরা অতি যুক্তির দোষে দুষ্ট বলে মনে করতেন এবং জার্মান এক্সপ্রেশনিজ্‌মের জোরালো সামাজিক বিষয়ের বিরুদ্ধে তাঁরা রুশোর প্রিমিটিভ, নেইভ পেন্টিং 'লি দোঅনিয়ে'-র পুনরুজ্জীবন ঘটাতে চেয়েছিলেন আরও নিবিড় অনুভূতি প্রকাশের এক চিত্রভাষা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে। ফলত কিউবজ্‌মের বস্তুগত উপাদান এবং জার্মান এক্সপ্রেশনিজ্‌মের সামাজিক সমস্যার ঠিক বিপরীতভাবে তাঁদের ছবির ভিত্তি ছিল সম্পূর্ণত রূপগত ভারসাম্য এবং রঙের স্বচ্ছতা ও প্রাচ্য দেশোদ্ভুত নানা রূপের সুসংগতি। 'ব্লু-রাইডার' গোষ্ঠীর আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা মার্ক এবং ক্যান্ডিন্‌স্কি তাঁদের ঘোষণামতো বিমূর্ত রূপের প্রতীকী ও মনস্তাত্ত্বিক ফলদানের সক্ষমতায় বিশ্বাস সত্ত্বেও উভয়ের আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যেও তফাৎ ছিল। সেই কারণেই ক্যান্ডিন্‌স্কি যখন বলছেন— নিয়মকে বৈশ্লেষক আধ্যাত্মিক রহস্যবাদ হিসেবে বর্ণনা করা যায় তখন মার্ক বলছেন ঈশ্বর সর্বভূতে বিরাজমান— এই দর্শনের কথা। মার্ক দ্বন্দ্ব ও সুষমা, দুইকেই প্রকাশ করতে ব্যাপক ও বিস্তৃত ভাবে চড়া রঙের ব্যবহার করেছেন। এ ব্যাপারে তিনি তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু আগস্ট ম্যাকের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। তবে ম্যাকের কাজ মার্কের ঠিক বিপরীতভাবে শহুরে ধরনের ছিল, যা তাঁর সমকালীন ফরাসি সতীর্থ ফভিস্ট-অরফিস্টদের কাজের কাছাকাছি। এর থেকেই মনে হয় যে ব্লু রাইডার গোষ্ঠীর শিল্পীদের একই ধরনের শৈলী তৈরির উদ্দেশ্য ছিল না। যেমন পল ক্লিও ম্যাকের মতন রং নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা করেছিলেন কিন্তু তা ছিল একেবারেই তাঁর নিজস্ব ধরনের।

এই গোষ্ঠীর সঙ্গে বিভিন্ন দেশের আভঁ গার্দ শিল্পীদের আরও যাঁরা যুক্ত ছিলেন তাঁরা হলেন জার্মানির গ্যাব্রিয়েল মুনটার, অস্ট্রিয়ান আলফ্রেড কাবিন প্রমুখ। এছাড়াও এঁদের প্রদর্শনীতে আরও অনেক শিল্পী অংশ নিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে এলিজাবেথ এপস্টাইন, জে. বি. নিসলে, হাইনেরিখ ক্যাম্পেনডঙ্ক, চেক শিল্পী ইয়ুগেন কাহ্‌লার, আমেরিকান শিল্পী অ্যালবার্ট ব্লচ, রাশিয়ান শিল্পী ডেভিড এবং ভ্লাদিমির

রঙিন ছবি নং ২২৮ পৃ. ৩৯১

বারলিঙ্ক সহ আরও বহু শিল্পী এবং প্রিন্ট মেকার। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মার্ক মারা যাবার পর এই গোষ্ঠী ভেঙে যায়।

ব্লু রোজ গ্রুপ
(Blue Rose group)

রাশিয়ান আভঁ গার্দ শিল্পীদের একটি গোষ্ঠী। ১৯০৭ সালে ওয়ার্ল্ড অব আর্ট মুভমেন্ট-এর বদ্ধমূল দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিক্রিয়ায় এই গোষ্ঠী গঠিত হয়। তাঁদের মূল কাজগুলির বৈশিষ্ট্য ছিল বেগবান রং এবং শৈলীবদ্ধ ফিগারের ব্যবহার। যা ইউরোপীয় চিত্রধারা বিশেষ করে প্রতীকবাদী শিল্প এবং মিখাইল ভ্রুবেল, ভ্লাদিমির সেরোভ, ভিক্টর বরিস্‌ভ-মুসার্টভ প্রমুখের দ্বারা প্রভাবিত ছিল। এই গোষ্ঠী 'দি গোল্ডেন ফ্লিস' নামে একটি মুখপত্র প্রকাশ করতেন। ১৯০৮ সাল থেকে এঁরা বহু গুরুত্বপূর্ণ প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন। যে সব প্রদর্শনীতে রাশিয়ান শিল্পীদের ছবির সাথে পোস্টইম্প্রেশনিস্ট, ফভিস্ট শিল্পীদের ছবিও প্রদর্শিত হত। এই গোষ্ঠীর বিশিষ্ট শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন প্যাভেল কুজনেটস্‌জভ, ম্যারিটর সারিয়ন, মিখাইল ল্যারিয়োনভ, নাতালিয়া গোনচারোভা প্রমুখ।

ব্ল্যাক-ফিগার
(Black-figure)



নং ২৩৮. এক্সিকিয়াস : ব্ল্যাক ফিগার ভাস। গায়ে এইস এবং এচিলেসের দাবা খেলার দৃশ্য। খ্রিস্টপূর্ব ৫৫০ - ৫৪০।

খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে করিন্থে উদ্ভব হওয়া গ্রিক ভাস চিত্রণের একটি কৌশল। এই ধরনের ভাসচিত্রে লাল রঙা জমির ওপরে কালো রঙের নকশা চিত্রিত করা হয়। এই কৌশল অনুযায়ী লাল রঙের ভাসের গায়ে কালো ছায়া চিত্রের (silhouette) অনুপুঙ্খের জন্য ব্যবহার করা হয় আঁচড়কাটা তীক্ষ্ণ রেখা যার মধ্য দিয়ে নিচের লাল রং বেরিয়ে পড়ে। পরবর্তী বিষয়গুলি যেমন মানুষের ছবির ক্ষেত্রে চুলদাড়ি প্রভৃতির জন্য পরে কালচে, লাল এবং সাদা ইত্যাদি আনুষঙ্গিক রং লাগানো হত। লালের ওপর কালো রঙের এই নকশা আঁকার জন্য ব্যবহার করা হয় আয়রন অক্সাইড, বৃষ্টির জল এবং কাঠের ছাইয়ের মিশ্রণ। যথাযথ পোড়ানোর শর্ত সাপেক্ষে এই মিশ্রণ কালো হয়ে যায়। লাল রং অপরিবর্তিত থেকে যায়। এই পদ্ধতির চূড়ান্ত বিকাশ ঘটে অষ্টম শতাব্দীর অ্যাথেনসে। ব্ল্যাক ফিগারের পরেই রেড ফিগারের উদ্ভব হয়। *গ্রিক আর্ট, রেড-ফিগার ভাস দেখুন।

ব্ল্যাক লেটার
(Black letter)

হরফের ছাঁদের সর্বাপেক্ষা পুরোনো শ্রেণি বা বর্গ। 'গথিক' নামেও এটা পরিচিত। যা দ্বাদশ শতাব্দী উত্তর মূল ল্যাটিন লিপির অনুকরণ। এর বৈশিষ্ট্য হল এই হরফ বক্রতা বা Curve বর্জিত ঠাসা রূপের এবং এর প্রধান টান চওড়া

সেই সঙ্গে কৈশিক রেখার ব্যবহার। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের শেষ পর্যন্ত জার্মানি, অস্ট্রিয়াতে এই হরফের ব্যবহার হত।

ব্ল্যাঙ্কেট (Blanket) নরম, স্থিতিস্থাপক পদার্থ তথা কম্বল বা পশম যা ছাপ চিত্র তৈরির সময় কাজে লাগে। এচিং প্লেট থেকে ছাপ তোলার সময় মেশিনের রোলার ও কাগজের মাঝখানে এই ব্ল্যাঙ্কেট রাখতে হয় যাতে রোলারের চাপ কাগজের ওপর সমান ভাবে ছড়িয়ে দেওয়া যায়।



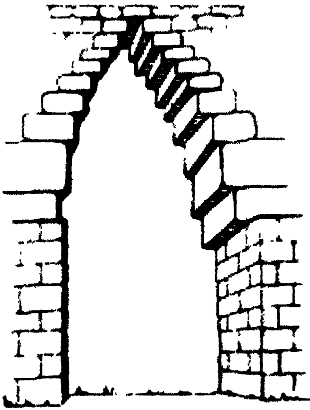
ভ

ভর্টিসিজ্‌ম (Vorticism) স্বল্পস্থায়ী ইংরেজ আভঁ গার্দ আন্দোলন। ১৯১৪ সালে এই আন্দোলনের পত্তন ঘটান বিশিষ্ট ব্রিটিশ শিল্পী ওয়াইন্ডহ্যাম লেউইস এবং আরও কয়েকজন শিল্পী মিলে। ইতালিতে উদ্ভূত ফিউচারিজ্‌মের বিরুদ্ধে একসঙ্গেই এই আন্দোলনের প্রকাশ ঘটে। তবে ভর্টিসিজ্‌মের মধ্যে কিউবিস্ট এবং এক্সপ্রেশনিস্ট উপাদানও অন্তর্ভুক্ত ছিল। লেউইস 'ব্লাস্ট' পত্রিকার দুটো সংখ্যার সম্পাদক ও প্রাবন্ধিক ছিলেন। যেখানে তিনি ভর্টিসিজ্‌মের দৃষ্টিভঙ্গি প্রচার করেছিলেন। লেউইস অবশ্য পরে বলতেন, ভর্টিসিজ্‌ম হল কিছু সময়ের জন্য তাঁর ব্যক্তিগত কাজ এবং বক্তব্য। তবে এই আন্দোলনের অন্যতম লক্ষ্য ছিল শিল্পকলাকে শিল্পকারখানার প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত করা। লক্ষণীয় হল লেউইসের আধা বিমূর্ত ছবির রূঢ় ও যান্ত্রিক শৈলী 'ব্লাস্ট'-এর অন্য রচনাকার যেমন গদিয়ার-ব্রেজ্‌স্কা রবার্ট, এডোয়ার্ড ওয়ার্ডসওয়ার্থ প্রমুখের কাজের মধ্যেও প্রতিফলিত হয়েছে। ১৯১৫ সালের জুন মাসে লন্ডনে এই শিল্পীদের একটিমাত্র প্রদর্শনী হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে আর এই আন্দোলন টিকে থাকেনি। তবে ১৯২০-র গোড়ার দিকের ব্রিটিশ আধুনিক চিত্রকলার ওপর এর বেশ প্রভাব পড়েছিল। ভর্টিসিজ্‌মের সঙ্গে যুক্ত লেখকদের মধ্যে এজরা পাউন্ড, টি. এস. ইলিয়ট, টি. ই. হিটসের নাম অগ্রগণ্য। পাউন্ডের সংজ্ঞা অনুযায়ী ভর্টিসিজ্‌ম হল ঘণীভূত ঘূর্ণয়মান বস্তুর কেন্দ্র। পাউন্ড পরে ভর্টিসিজ্‌ম

নামটি উদ্ভাবন করার কৃতিত্বের দাবি করেছিলেন। ভর্টিসিজ্‌মের বৈশিষ্ট্য চিহ্ন হল তীক্ষ্ম বিমূর্ত রূপের মধ্যে উপস্থাপিত সাধারণভাবে অস্পষ্ট এবং যন্ত্রবৎ মনুষ্য শরীর।

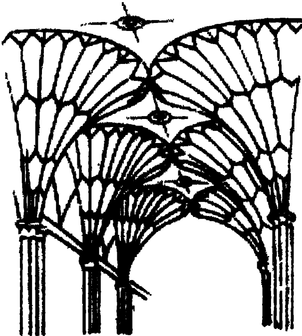
ভল্ট (Vault)

ধনুকের মতো খিলানবৎ ছাদের পিঠ বা সিলিং। অথবা বলা যায় ভল্ট হল ধনুকাকৃতি খিলানের কাঠামো সূত্রের ওপর ভিত্তি করে তৈরি ছাদ। ভল্ট নির্মিত হয় প্রাক রোমান যুগে। কিন্তু রোমানরা ভল্টের নকশা এবং নির্মাণ পদ্ধতিতে প্রভূত উন্নতি ঘটায়। আদিপর্বের ভল্টের দুটো মূল নকশা হল ব্যারেল ভল্ট এবং ক্রস ভল্ট। ব্যারেল ভল্ট প্রকৃতভাবে আধা চোঙাকৃতি কাঠামো যা দুটো সমান্তরাল দেয়ালের ওপর ভর দিয়ে থাকে। ইট গেঁথে তৈরি এই ব্যারেল ভল্ট অসম্ভব ভারী হয় এবং যে দেয়ালের ওপর অবলম্বন করে তার ওপর প্রচণ্ড ভার দেয়। এই ভারের গতিমুখ শুধু নিম্নাভিমুখীই নয় তা একই সঙ্গে বহির্মুখীও। এই কারণে এই ভল্টের জন্য খুব মোটা এবং শক্তিশালী ধারক দেয়াল দরকার হয়। এই সমস্যার আংশিক সমাধান করা যায় ক্রস-ব্যারেল ভল্ট ব্যবহার করে। আসলে ক্রস-ব্যারেল ভল্ট একটার সঙ্গে আর একটার সমকোণে থাকা দুটো ব্যারেল ভল্ট। এই ধরনের ভল্ট তার ধারক দেয়ালের ওপর অপেক্ষাকৃত কম ওজন ছাড়ে। সেইসঙ্গে এর গতি কেন্দ্রীভূত করে ব্যারেল দুটোর জোড়ের কোনায়।

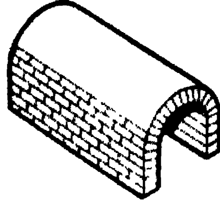


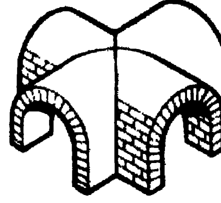
করবেল ভল্ট

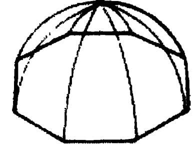
সাধারণভাবে ক্রস-ব্যারেল ভল্টকে গ্রোইন ভল্ট বলা হয়। সমগ্র রোমানেস্ক যুগ ধরে স্থাপত্যে এই ধরনের ভল্ট ব্যবহৃত হত। গথিক স্থাপত্যে ভল্টের কাঠামোয় অন্তত দুটো গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে। প্রথমত, সর্বত্র সমান মোটা পাথরের ভল্টের পরিবর্তে সেখানে ভারবাহী পাথরের দণ্ড নির্মিত কাঠামো ব্যবহার হতে শুরু করে। তার ওপরে পাতলা পাতলা পাথর স্থাপন করা বা পাতা হত। ফলে ভল্টের সামগ্রিক ওজন কমে এল। দ্বিতীয়ত, প্রচলিত মোটা এবং নিরেট দেয়ালের জায়গায় এল পাতলা দেয়াল। আর এই দেয়ালের ধারক বাইরের দিকে বেরিয়ে থাকা একরকম বাঁধনি যার নাম 'ফ্লাইং বাট্রেস'। এতে দেয়াল যেমন পাতলা করা গেল তেমনি এই দেয়াল নিরেট করার দরকার হল না। সেই সঙ্গে এসব দেয়ালে জানলা লাগানো সম্ভব হল। ফলে ঘরের ভেতর আরও বেশি আলো ও হাওয়ার পথ



ফ্যান ভল্ট


ব্যারেল ভল্ট


গ্রোইন ভল্ট


ডোমিক্যাল ভল্ট

করে দেওয়া গেল এবং জানলাগুলিতে স্টেইন্ড গ্লাস লাগিয়ে সৌন্দর্যও বাড়ানো গেল। ব্যারেল ভল্ট এবং ক্রস ভল্ট ছাড়াও আরও কিছু ভল্ট আছে। সেগুলো হল—

করবেল ভল্ট : ভল্টের স্বীকৃত সংজ্ঞার বাইরে একমাত্র ভল্ট। যা ক্যান্টিলিভার পদ্ধতিতে দু-পাশে ধাপে ধাপে পাথর সাজিয়ে একটি শীর্ষবিন্দুতে মিলিয়ে ভল্ট তৈরি করা হয়।

ডোমিক্যাল ভল্ট : কোনো ভিত্তি থেকে উত্থিত কয়েকটি তল একটি বিন্দুতে মিলে গঠিত গম্বুজাকৃতি ভল্ট। যার ভিত্তিটা আয়তাকার বহুভূজ।

ফ্যান ভল্ট : একমাত্র ইংল্যান্ডের অন্তিম গথিক স্থাপত্যে একসারি করবেল থেকে ছড়ানো রিব দিয়ে তৈরি পাখা আকৃতির এক ধরনের জটিল রূপের ভল্ট।

ভলিউম (Volume)

সাধারণভাবে কোনো ত্রিমাত্রিক ফিগার বা বস্তু পরিপূর্ণ একটি পরিসর (space) হল আয়তন বা ভলিউম। অথবা রং করা কোনো ফিগার বা বস্তুর সামনে যে পরিসরকে ভরতি করতে হবে তাকেও ভলিউম বলে। ভলিউমের সমার্থ শব্দ হল 'mass' অর্থাৎ অনেকটা অংশ বা জড়ো করা বস্তুর সম্মিলিত পরিসর।

ভাইকিং আর্ট (Viking Art)

স্ক্যান্ডিনেভিয়ার ভাইকিং জনগণের শিল্পকলা। এই শিল্পকলার শ্রেষ্ঠ সময়কাল ছিল ৮০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১১০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্য পর্যন্ত। এই যুগের অধিকাংশ সময়ের যে সব কাজ রয়ে গেছে তা প্রধানত হল দারুভাস্কর্য, ধাতুনির্মিত কাজের জিনিসপত্র এবং অলংকার। যেমনটা পাওয়া গিয়েছিল ওসেবার্গের জাহাজ সমাধিতে নবম শতাব্দীর গোড়ার দিকে। এসব ডেকরেটিভ রিলিফের কাজে জান্তব-রূপাকৃতি এবং আলংকারিক উপাদানের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মিশ্রণ লক্ষ করা যায়। আর এসব করাও হয়েছে সূক্ষ্ম পরিকল্পনা এবং যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গে। ভাইকিংদের খ্রিস্ট ধর্মান্তরণ এই অখ্রিস্টীয়

পেগান শৈলীর মৌলিকত্বকে খর্ব করেনি এবং নব্য প্রবর্তিত ধর্মীয় ফিগারগুলি প্রচলিত শৈলীর মোড়কে উপস্থাপিত হয়েছিল। এর একটা বড় দৃষ্টান্ত হল জুটল্যান্ডের রয়াল সেমেটারিতে পাথরে নির্মিত খ্রিস্টান রাজা হেরাল্ড ব্লুটুথের স্মারক। এছাড়া পরিযায়ী ভাইকিংরা উত্তর ইউরোপের বহু অংশে বিশেষ করে ইংল্যান্ড এবং আয়ারল্যান্ডে তাদের শিল্পকলা নিয়ে আসেন।

ভাব

শিল্পতত্ত্ব আলোচনায় ভাব একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ও উপাদান। ভাব শুধু একটি মানসিক অবস্থার বিষয়ই নয়। ভাবের একটা রূপগত দিকও আছে। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিষয়টি নিয়ে বলেছেন এইভাবে—'প্রতিমাশিল্পের কৌশলই হচ্ছে রূপটাকে ভাবের প্রতিম করে তোলাতে। একটা পোড়া মাটির পুতুল— তার সঙ্গে ভাব হয় কেন-না সেটা ভাবের প্রতীক করে গড়ে তোলা হয়েছে বলেই, কিন্তু বেশ করে পোড়ানো একখানা এগারো ইঞ্চি ইট বা টালি তার সঙ্গে ভাব হওয়া শক্ত— সেটা ভাবের বস্তু নয় বলেই।' (বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলি পৃ: ৩২৬)

বাৎস্যায়নের ভাষ্যকার যশোধর পণ্ডিতের কাছ থেকে বাৎস্যায়ন কৃত শিল্পশাস্ত্রের বিধান হিসাবে শিল্পের ষড়ঙ্গের কথা জানা যায়। এই ষড়ঙ্গ বিধানের অন্যতম হল ভাব।

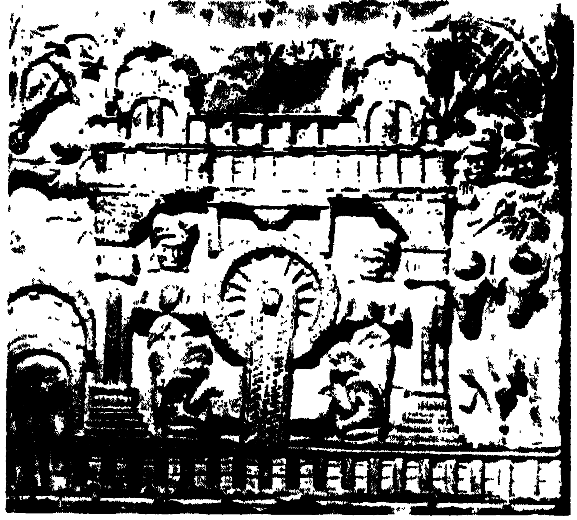
'রূপভেদা: প্রমাণানি ভাবলাবণ্য যোজনম্
সাদৃশ্যং বর্ণিকাভঙ্গ ইতি চিত্রং ষড়ঙ্গকম।'

এখানে শাস্ত্রকার রূপের সঙ্গে ভাবকে যুক্ত করার কথা বলেছেন। অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন, এই ভাব যোজনার ফলেই পাথরে তৈরি হাজারো ইমারতের মধ্যে তাজমহল কাব্যময় হয়ে ওঠে। ভারতের শিল্পাচার্যগণ ভাব প্রকাশের আর একটি এমন পদ্ধতি সৃষ্টি করেছিলেন যা অন্য কোনো দেশের শিল্পশাস্ত্রে বর্ণিত হয়নি। তা হল আঙুলের ভাষা। যাকে আমরা মুদ্রা বলে জানি। আঙুলের এই ভাব ও ভাষা অজন্তা তথা ভারতীয় চিত্রকলা ও ভাস্কর্যে জীবন্ত দৃষ্টান্ত। ভারতীয় শিল্পশাস্ত্রে ভাবের সঙ্গে রস শব্দটিও একই সঙ্গে উচ্চারিত হয়। কখনো-কখনো ভাব থেকে রসকে আলাদা করাও যায় না। সে কারণেই ভারতীয় নন্দনতাত্ত্বিকরা বারবারই বলেছেন রসের মূল সম্পর্ক ভাবের সঙ্গে। ভারতীয় আলংকরিকরা অসংখ্য ভাবের মধ্যে নয়টি

স্থায়ীভাবের উল্লেখ করেছেন। যেমন রতি, হাস, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ, ভয়, জুগুপ্সা, বিস্ময় এবং শম। ('রতিহাসশ্চ শোকশ্চ ক্রোধোৎসাহৌ ভয়ং তথা।/ জুগুপ্সা বিস্ময়-শ্চেত্থমষ্টৌ প্রোক্তা শমোহপি চ।।') অন্যদিকে আলংকারিকদের মতে রসও নয়টি। শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভুত ও শান্ত। শিল্প ও নাট্যশাস্ত্রী ভরত রস প্রসঙ্গে বলেছেন নানা প্রকার ভাব-উপাদানে রস তৈরি হয়। এইসব ভাবগুলি হল— স্থায়ীভাব, বিভাব, অনুভাব এবং ব্যাভিচারী ভাব। এসবের মধ্যে বিভাব এবং অনুভাব হল স্থায়ী। বিভাবের উৎপত্তি সরাসরি বস্তু জগতের কোনো কারণ থেকে হয় না। বিভাবের উৎপত্তি হয় প্রকাশ ও প্রতিবেদনের সৌকুমার্য থেকে। আবার ব্যাভিচারীভাব স্থায়ীভাবের ওপর নির্ভরশীল এবং তা স্থায়ীভাবকে প্রস্ফুটিত করে। অভিনব গুপ্ত একটি উপমাতে একে সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন যেমন— বিভিন্ন ধরনের এবং নানান রঙের স্বচ্ছ স্ফটিক বা পাথরকে যদি একটি সুতোয় গাঁথা হয় তাহলে সুতোগুলিকে স্থায়ীভাব এবং পাথরগুলিকে ব্যাভিচারীভাব হিসাবে কল্পনা করা যেতে পারে। ভরত আটটি স্থায়ীভাব এবং তেত্রিশটি ব্যাভিচারীভাবের উল্লেখ করেছেন। অন্যদিকে অভিনব গুপ্ত বলেছেন এইসব শ্রেণিবিভাগ মনোবিজ্ঞান সম্মত, আলংকারিকদের খেয়াল নয়।

ভারহুত

মধ্যপ্রদেশের সাতনা জেলার এই ছোটো গ্রাম ভারহুতে ১৮৭৩ সালে আলেকজান্ডার কানিংহাম একটি বৌদ্ধস্তূপের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করেন। এই স্তূপের আকার আয়তন সম্পর্কে কিছু জানা না গেলেও অনুমান করা হয় এটা সাঁচীর প্রধান স্তূপেরই মতন। বহুকাল স্তূপটি অবহেলায় পড়ে থেকে জীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। স্থানীয় গ্রামবাসীরা স্তূপের নানা অংশ ও মালমশলা নিয়ে গিয়ে তাঁদের ব্যক্তিগত প্রয়োজনের কাজে লাগিয়েছেন, ফলে স্তূপটির অনেকটাই হারিয়ে গেছে। পরবর্তীকালে কানিংহাম স্তূপের বেদির রেলিং-এর অংশ সহ একটি তোরণ আবিষ্কার করেন। ১৮৭৫ সালে এইসব অংশ কলকাতায় ভারতীয় জাদুঘরে সংরক্ষণ করা হয়। অন্য কিছু অংশ এলাহাবাদ মিউনিসিপ্যাল মিউজিয়ামেও স্থান পায়।



নং ২৩৯. ভারহুত স্তূপের ভাস্কর্য। বিদূদভ বুদ্ধকে দর্শন করছেন। শুঙ্গ যুগ। খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী। লাল বেলে পাথর। উচ্চতা ৪৮ সেমি।

ভারহুত স্তূপ শুঙ্গযুগের স্থাপত্যের নিদর্শনের মধ্যে প্রাচীনতম। পণ্ডিতদের অনুমান স্তূপের গর্ভে বুদ্ধের পূতাস্থি রক্ষিত ছিল। স্তূপটির সকল অংশ একই সময়ে নির্মিত হয়নি। রেলিং বা আবেষ্টনী খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথম অর্থে নির্মিত বলে ধারণা করা হয়। কানিংহামের মতে এটি তৈরি হয় ২৫০-২০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে। ভারহুতের স্তূপের গায়ের একটা পাথরের ফলকে উৎকীর্ণ লিপি পাঠ করে জানা গেছে যে, রাজা ধনভূতি তাঁর রাজকোশ নিঃশেষ করে এই স্তূপ নির্মাণ করেছিলেন। শুঙ্গ রাজাদের তিন পুরুষের কথাও সেখানে উৎকীর্ণ ছিল।

ভারহুত স্তূপের বেষ্টনীটি ছিল গোলাকার। পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ এই চারদিকে চারটি তোরণ ছিল। ভারহুত স্তূপ নির্মিত হয়েছিল ইট এবং পাথর দিয়ে। ফলে এর দৃঢ়তা পাথরে নির্মিত স্থাপত্যের মতো মজবুত ছিল না। এর নির্মাণ কৌশল অনুযায়ী ব্যবহৃত পাথরের বেষ্টনীগুলি বস্তুত কাঠের বেষ্টনীর রূপান্তর। সমগ্র বেষ্টনীকে একটি সজীব বস্তু ধরে নিয়ে এর বিভিন্ন অংশকে ভিন্ন ভিন্ন নাম দেওয়া হয়েছে বলে পণ্ডিতগণ মনে করেন। যেমন লম্বভাবে দাঁড়ানো যে পাথরের স্তম্ভগুলির ওপর অনুভূমিক দণ্ডগুলি লাগানো তার নাম 'যব'।

আবার দণ্ডায়মান পাথরের চতুষ্কোণ স্তম্ভগুলি পর্যায়ক্রমিক ভাবে তিনটে পাথরের অনুভূমিক দণ্ড দ্বারা

সংলগ্ন। এই অনুভূমিক পাথরের দণ্ডগুলির প্রথমটির নাম 'উষ্ণীষ', দ্বিতীয়টির নাম 'সূচি'। বেষ্টনীর উচ্চতা সর্ব মোট ২.৭ মিটার এবং তোরণটির উচ্চতা প্রায় ৬.৭৫ মিটার। দু-পাশে দুটো যৌগিক স্তম্ভ দিয়ে তোরণটি তৈরি। প্রতিটি যৌগিক স্তম্ভে আছে চারটে করে আটকোনা নিরালংকার স্তম্ভ। স্তম্ভের মাথায় পিঠাপিঠি দুটো সিংহ এবং ষাঁড়ের মূর্তি। ষাঁড়ের মুখগুলি মানুষের মতো।

ভারহুতের স্তূপের ভাস্কর্যশৈলীর রীতি স্পষ্টতই ভারতীয়। এর বিষয়বস্তু যেমন সুস্পষ্ট তেমনি এর কালচিহ্নও নির্দিষ্ট। এই কারণেই ভারহুতের ভাস্কর্য ভারতীয় শিল্পকলা ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। ভারহুতের ভাস্কর্যের প্রধান বিষয় হল বুদ্ধদেবের জীবনের ঘটনাবলি এবং জাতক কাহিনি। এছাড়াও তোরণের গায়ে আছে নানা ঐতিহাসিক তথ্যসমৃদ্ধ লেখ। প্রাকৃতভাষায় উৎকীর্ণ এইসব লেখগুলির লিপি হল ব্রাহ্মী।

তবে শুঙ্গযুগের শিল্পকৃতি গুপ্তযুগের তুলনায় উন্নত ছিল না এমনও হতে পারে। ভারতীয় শিল্পশাস্ত্রের সূত্রগুলিও তখনও পর্যন্ত আয়ত্তে আসেনি বা রচিতও হয়নি। বেশির ভাগ শিল্পকর্মগুলি স্বভাবত বর্ণনামূলক এবং এতে কেন্দ্রাপসারী পরিপ্রেক্ষিত রীতি অনুসরণ করা হয়েছে।

ভার্নিশ (Varnish)

ড্রায়িং অয়েলে গোলা রেজিনের দ্রবণ বা বার্নিশ। সাধারণভাবে ব্যবহৃত রেজিন হল রজন এবং সাধারণ ড্রায়িং অয়েল হল তিসির তেল আর টাং অয়েল। বার্নিশ কখনওবা প্রতিরোধী আস্তরণ হিসাবে ব্যবহাব করা হয় আবার কখনওবা রঙের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করা হয়। ছবিতে প্রতিরোধী আস্তরণ হিসাবে বার্নিশ ব্যবহার করতে হলে ভালো করে বার্নিশের মোড়কের ওপর দেওয়া ব্যবহার-বিধি সংক্রান্ত বিবরণ পড়ে নেওয়া উচিত। বার্নিশের দুটো বড়ো গুণের প্রতি নজর রাখতে হবে। প্রথমত, তলার বর্ণস্তরের ক্ষতি না করে যেন সেই বার্নিশ তুলে ফেলা যায়। কেন-না অনেক সময় পুরোনো হলে বার্নিশ হলুদ হয়ে নোংরা হয়ে যায় তখন বার্নিশ তুলে ফেলার দরকার হতে পারে। অথবা ছবিতে আঁচড় পড়লে বা কোনোভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলে পেন্টিং-এর রেস্টোরেশনের দরকার হয় তখনও বার্নিশ তুলে ফেলতে হয়। অপসারণযোগ্য বার্নিশের

মধ্যে সবচেয়ে ভলো হল গ্যামার বার্নিশ। দ্বিতীয়ত, বার্নিশ হলুদ হয়ে যাওয়া, চিড় ধরা বা পুরোনো হলে এর চেহারায় যেন অন্য কোনো পরিবর্তন না হয়।

অ্যালকোহল বা ইথার দিয়ে তৈরি বার্নিশ হল স্পিরিট বার্নিশ। এই বার্নিশ দ্রাবকের বাষ্পীভবনের ফলে শুকিয়ে যায়। বার্নিশের সঙ্গে পিগমেন্ট মেশালে তা হয়ে ওঠে এনামেল। তেল রঙে যে বার্নিশ ব্যবহার করা হয় তা হল ড্যামার বার্নিশ।

ভিডিয়ো আর্ট (Video art)

প্রযুক্তি নির্ভর অন্য অনেক শিল্পের মতোই ভিডিয়ো আর্টের উদ্ভবও পাশ্চাত্যে। আরও কিছু বিষয় হল এই যে আধুনিক ও জটিল সমাজের মধ্যে বেশ কিছু শিল্পদৃষ্টি ভঙ্গি ও শৈলীর সৃষ্টি হয়েছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর যার ধারা আজও অব্যাহত। এরকমই এক ধারা হল ভিডিয়ো আর্ট। ১৯৬০-এ পপ শিল্পীরা মাস কালচার বা গণ সংস্কৃতি থেকে তুলে আনা চিত্রকল্প গ্যালারিতে প্রদর্শন করতেন। প্রযুক্তি, চলন (movement) এবং ধ্বনি প্রভৃতিকে ছুঁড়ে ফেলা হল। সেইসঙ্গে একদল শিল্পী অত্যন্ত শক্তিশালী নতুন গণমাধ্যম— টেলিভিশন হাতে তুলে নিয়েছিলেন। ভিডিয়ো আর্টের ক্ষেত্রে প্রথম দিকের কাজগুলোতে ছিল প্রাধান্যমূলক ভাবে নতুন পপ আর্টের সমালোচনা। ১৯৫৯ সাল থেকে ফ্লাক্সাস শিল্পী উলফ্ ভোস্টেল এবং জন্মসূত্রে কোরীয় আমেরিকান শিল্পী ও সংগীতকার ন্যাম জুন পেইক তাঁদের ইনস্টলেশনে টেলিভিশনকে অন্তর্ভুক্ত করতে শুরু করেন। তবে প্রতীকী ভাবে ভিডিয়ো আর্টের সৃষ্টি হয় ১৯৬৫ সালে পেইকের সোনি কোম্পানির হাতে ঝোলানো নতুন পোর্টাপ্যাক ভিডিয়ো ক্যামেরা কেনার পর। প্রথম প্রজন্মের ভিডিয়ো শিল্পীরা, শক্তিশালী টেলিভিশনের ভাষার গঠন উপাদান যেমন— স্বতঃস্ফূর্ততা, ছেদ, বিনোদন প্রভৃতিকে অনেক ক্ষেত্রেই এই শক্তিশালী মাধ্যমের বিপদকে প্রকাশ করতে ব্যবহার করেছিলেন। এই নতুন মাধ্যম সম্পর্কে পেইকের মন্তব্যও প্রণিধানযোগ্য। পেইক বলেছিলেন 'কোলাজ যেমন তেল রঙের জায়গা দখল করেছে তেমনি ক্যাথড-রে ক্যানভাসের জায়গা দখল করবে।' আদিপর্বের প্রভাবশালী ভিডিয়ো শিল্পীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যরা ছিলেন জার্মান শিল্পী উলফ্ ভোস্টেল এবং পূর্বোক্ত ন্যাম জুন পেইক।

পেইক টেলিভিশুয়াল রূপকে একটি উল্লম্ব রেখায় পরিবর্তিত করেন এবং রূপের (image) গতিকে টেলিভিশনের প্রধান বৈশিষ্ট্যের মতো বিধ্বংসী কৌশলের বিষয় করেন। ভিডিয়ো আর্টের অগ্রগতিও নানা বৌদ্ধিক ঝোঁকের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। ১৯৬০-এর দশকের ভিডিয়ো শিল্প যেখানে বেশিমাত্রায় সমাজ সমালোচক চরিত্রধর্মী এবং প্রায়ই তা পারফর্ম্যান্সের সঙ্গে যুক্ত সেখানে ১৯৭০-এর দশকের কাজে জ্ঞানতাত্ত্বিক নীতির সূত্রপাত ঘটে। গোড়ার দিকের ভিডিয়ো শিল্পীরা বিশ্ব ভাবসংযোগ (Commuinication) তত্ত্বকে প্রচলিত সংস্কৃতির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে ভিডিয়ো টেপ, সিঙ্গল বা মাল্টিচ্যানেল প্রযোজনা, আন্তর্জাতিক উপগ্রহ বিন্যাস (installation) মাল্টিমনিটর ভাস্কর্য ইত্যাদি তৈরি করেন।

১৯৬০ সালের শেষের দিকে ব্যবসায়িক প্রদর্শনীগৃহগুলি ভিডিয়ো আর্টকে তুলে ধরতে শুরু করে। ১৯৬৯ সালে নিউইয়র্কের হাওয়ার্ড ওয়াইজ গ্যালারি ভিডিয়ো আর্টের একটি যুগান্তকারী প্রদর্শনীর আয়োজন করে। এখানে পেইক-মুরম্যানের যৌথ উদ্যোগে তৈরি ‘টিভি ব্রা ফর লিভিং স্কাল্পচার’-এর সঙ্গে আরা স্নাইডার (Ira Schnider),



নং ২৪০. স্টিভ মান : ওয়্যারলেস ওয়ারেবল ওয়েবক্যাম। ১৯৮০। আরও ছবি নং ১৭৯ পৃ. ৩৬৪

ফ্রাঙ্ক জিলে (Frank Gillette), এরিক সিগেল (Eric Siegel) এবং পল রেয়ান (Paul Rayan) প্রমুখের কাজ ছিল। পরবর্তীকালে হাওয়ার্ড ওয়াইজ শিল্পীদের এডিটিং-এর সুবিধা ও টেপ ডিস্ট্রিবিউশন পরিষেবা দেবার জন্য ইলেকট্রনিক আর্ট ইনটারমিক্স স্থাপন করেন। এ ধরনের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে শিল্পীদের সঙ্গে বাণিজ্যিক টেলিভিশনের সৃজনমূলক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এখনকার টেলিভিশন এবং মিউজিক ভিডিয়োর পরিচিত অনেক টেকনিক এবং স্পেশাল এফেক্ট প্রথম তৈরি করেন পেইক এবং ড্যান স্যান্ডিন-এর মতো শিল্পীরাই। যেমন স্যান্ডিন ১৯৭৩ সালে ইমেজ প্রসেসর (IP) উদ্ভাবন করেন যার সাহায্যে ইলেকট্রনিক প্রক্রিয়ায় ভিডিয়ো ইমেজের পরিবর্তন ঘটানো যেত এবং বৈদ্যুতিন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে রঙের গতিময়তাকেও উৎসারিত করা যেত। আর একজন ভিডিয়ো শিল্পী এবং ভিডিয়ো প্রযুক্তির পথিকৃৎ উডি ভাসুলকা তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে যৌথভাবে শিল্পীদের ডিজিটাল ইমেজ আর্টিকিউলেটর সহ নানা বৈদ্যুতিন যন্ত্র তৈরি করেছিলেন। আর এসব অগ্রগতির মধ্য দিয়ে ভিডিয়ো আর্ট ক্রমশই উন্নত ও আধুনিকতর নির্মাণ কৌশল হিসাবে গড়ে উঠল। যেমন ওয়াই ব্রেনের কাজকে বলা হয় ক্লোজ সার্কিট ইনস্টলেশন। তিনটে ক্যামেরা ও মনিটর এমনভাবে একটি বৃত্তে ব্যবহার করা হত যে দর্শক সেই বৃত্তে ঢুকলেও নিজেকে দেখতে পেতেন না। এই কাজকে বলা হত এক্সপেরিমেন্টাল মিডিয়া অ্যাসেমব্লেজ। ভিডিয়ো আর্টের বিশেষ নমনীয় বৈশিষ্ট্যের কারণে এই শিল্পে মহিলাদের অংশ গ্রহণ বাড়ে। ১৯৮০ সালের মধ্যে সারা পৃথিবী জুড়ে বড়ো মিউজিয়াম এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে এই নতুন মাধ্যমের বিভাগ গঠন করা হয়।

এরপর ১৯৮০-র পরবর্তী সময়ে ভিডিয়ো এবং কম্পিউটারের মিশ্রণে আরও জটিল এবং আধুনিক শিল্প মাধ্যম হিসাবে নতুন ভিডিয়ো আর্ট গড়ে ওঠে। তবে খুব সাম্প্রতিককালে অবশ্য ভিডিয়োশিল্পী শব্দটি অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যাচ্ছে। একমাত্র ভাস্কর্য উপাদানের সঙ্গে ভিডিয়ো আর্টের উপাদান মিশে মোটামুটি স্বতন্ত্র একটা শিল্পরূপ তৈরি হয়েছে।

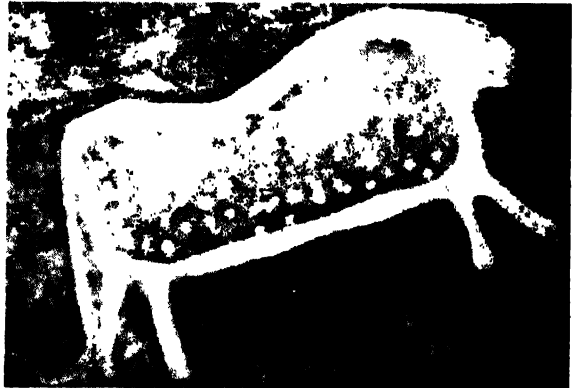
ভিনিয়েট (Vignette) কোনো ছবি তার প্রান্তের দিকে ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাওয়া। ভিনিয়েটের এই কৌশলকে নানান ভাবে নানা উদ্দেশ্যে

ছবি ও মুদ্রণের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। কিছু ভিনিয়েট আছে যা প্রতিসম (Symmetrical) আবার কিছু আছে যা অপ্রতিসম (Asymmetrical)।

ভীমবেটকা

প্রাগৈতিহাসিক যুগের গুহাঞ্চল। প্রচলিত নাম ভীমবেটকা হলেও আসলে স্থানটির নাম ভীমবৈঠিকা। মধ্যপ্রদেশের রাজধানী ভোপাল থেকে ৫৫ কিলোমিটার দূরে রায়সেন জেলায় অবস্থিত। উচ্চতা ৬০০ মিটার। এই গুহাসাম্রাজ্যে আছে ৮৩৮টি গুহা। ১৯৫৭-৫৮ সালে এই গুহার সন্ধান পান ড. বিষ্ণু শ্রীধর। প্রথমে উজ্জয়িনী বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতত্ত্ব বিভাগের উদ্যোগে তিনি খননকার্য চালান। পরে মধ্যপ্রদেশের সাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতত্ত্ব বিভাগ ১৯৭১ সালে কে.ডি. বাজপেয়ি এবং এস. কে. পান্ডের নেতৃত্বে দুটি গুহায় এবং পরে ডেকান কলেজের অধ্যাপক বি. এন. মিশ্রের নেতৃত্বে ১৯৭৩ সালে এখানকার তিনটে পাথুরে গুহায় খননকার্য চালায়।

ভীমবেটকার গুহাগুলির আলাদা আলাদা নামকরণ করেন ড. বাকনকর। যেমন সভাগৃহ, জুরক, ভোরবক, গণেশগুহা, বুলরক ইত্যাদি। ঐতিহাসিকগণের মতে ভীমবেটকায় আদিমকাল থেকে ৩০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মানুষের চলাচল এবং তাঁর সংস্কৃতি বিদ্যমান ছিল। গুহাচিত্রগুলিও ১০ হাজার থেকে ১২ হাজার বছর আগের অর্থাৎ প্যালিয়োলিথিক, মেসেলিথিক যুগের সমসাময়িক কালের। এসব চিত্রে লাল, সাদা, হলুদ ও সবুজ রঙের ব্যবহার আছে। তবে সবুজ রঙের ছবি খুবই কম। প্রথমদিকের ছবিতে ঘোড়া নেই। পরের দিকে যুদ্ধের ছবিতে ঘোড়া



নং ২৪১. চিতা বাঘ। মোটামুটি ১০ ইঞ্চি। নিয়োলিথিক চ্যাকোলিথিক যুগ। ভীমবেটকা।

এসেছে। ঘোড়সওয়ারের বেশভূষায় কুষাণযুগ এবং গুপ্তযুগের ছাপ রয়েছে। সমস্ত ছবি যুগ অনুযায়ী ভাগ করে বর্গীকরণ করা হয়েছে। এইসব গুহাচিত্রে হাতি, ঘোড়া, বন্যশুয়োর, মোষ, গোরু, হরিণ, বাঁদর প্রভৃতি পশুর ছবি আছে। আবার জুরকে কিছু দৃশ্য আছে যেমন একজন মৌচাক ভাঙছে, কিংবা সভাঘরে বসে পাত্রে করে জল পান করছেন এক ব্যক্তি। তাঁর পেটে খাদ্যনালি দিয়ে জল যাওয়ার দৃশ্যও বিন্দুর সাহায্যে দেখানো হয়েছে। নাচের ছবি আঁকা হয়েছে সাদা রঙে। সেখানে পশুও আছে। সাদা রং তৈরি করা হয়েছে চুনাপাথর দিয়ে। বেশিরভাগ ছবি যদিও নষ্ট হয়ে গেছে। তবে যেখানে বৃষ্টির জল পৌঁছতে পারে না সেখানকার ছবি অবিকল আছে। ভীমভেটকার ধর্মীয় ধারণা মহাভারতের যুগ আশ্রিত। ছবিতে তার আভাস আছে। তবে স্থানীয় মানুষের বিশ্বাস এইসব ছবি মনুষ্যকৃত নয়। এসব ছবির রচয়িতা হল কোনো পেত্নি। জনশ্রুতি হল এখানে পিশাচের আস্তানা ছিল আর সেকারণেই একটি গুহার নামকরণ হয়েছে 'পৈশাচ্য গুহা'।

ভেহিক্‌ল (Vehicle)

সাধারণভাবে একটি তরল পদার্থ যা রঞ্জকের গুঁড়োকে আটকে রাখতে সাহায্য করে। এটা হল মাধ্যম (Medium) এবং বন্ধন-উপকরণ (Binder)-এর মিশ্রণ। এই তরল মিশ্রণের মধ্যে পিগমেন্ট বা রঞ্জকের গুঁড়ো ভেসে থাকে এবং ভেহিক্‌লই পিগমেন্টকে চিত্রপটের ওপর ধরে রাখে। জল রঙের মিডিয়াম হল জল আর বাইন্ডার হল গাম অ্যারাবিক। এই দুয়ে মিলে তৈরি হয় আঠা বা Size অর্থাৎ ভেহিক্‌ল।

ভ্যানিটাস (Vanitas)

এক ধরনের রূপকাত্মক স্টিললাইফ ছবি। এতে যেসব বস্তুকে সাজানো হত তার উদ্দেশ্য ছিল প্রতীকী অর্থ সৃষ্টি করা। মানুষের জীবনকাল ক্ষণস্থায়ী, আনন্দ, অবদান সবই দু-দিনের জন্য—এই ছিল সেই প্রতীকের মূল কথা। মাথার খুলি, ঘড়ি, ভাঙা বীণা, ধোঁয়া ওঠা মোমবাতি, পাপড়ি ঝরানো ফুল ইত্যাদি সাজিয়ে প্রতীকী অর্থ তৈরি করা হত। ষোড়শ এবং সপ্তদশ শতাব্দীতে নেদারল্যান্ড, হল্যান্ডে এবং বিশেষ করে লেইডেন স্কুলের শিল্পীদের হাতে এধরনের ছবি খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল।

ভ্যানিশিং পয়েন্ট (Vanishing Point)

পরিপ্রেক্ষিত বা পারস্পেকটিভে কোনো বস্তুর থেকে কল্পিত কেন্দ্রাভিমুখী রেখাগুলি দিকচক্রবালে অবস্থিত একটি বিন্দুতে মিলিয়ে যাচ্ছে বলে মনে হয়। সেই বিন্দুকে বলে বিলীয়মান বিন্দু বা ভ্যানিশিং পয়েন্ট। *পারস্পেকটিভ দেখুন।

ভ্যালু (Value)

কোনো রং, টোন বা শেড-এর লাইটনেস (ঔজ্জ্বল্য) অথবা ডার্কনেস-এর (অনৌজ্জ্বল্য) আপেক্ষিক মাত্রা। ডার্কার বা কালচে রঙের ভ্যালুকে বলা হয় লো-ভ্যালু এবং লাইটার বা ফিকে ধরনের রঙের ভ্যালু হল হাই-ভ্যালু। ছবিতে তীব্র দৃশ্যগত আন্দোলন (excitement) সৃষ্টি করতে জোরালো বিপরীত ভ্যালু সম্পন্ন রং যেমন, সাদা ও কালো বা ওইরকম সম্পর্কের রং-কে পাশাপাশি ব্যবহার করা হয়। দুটো একই রকম ভ্যালু সম্পন্ন রং ব্যবহার করে এমনটা করা যায় না। পরিকল্পিত ভাবে বর্ণ-প্রকল্প (Colour Scheme) তৈরি করলে একই রঙের (Hue) ভিন্ন ভিন্ন গুণ তৈরি হতে পারে। *ডিজাইন দেখুন।

ছবি নং ২২৯, ২৩০ পৃ. ৩৮২



ম

মণ্ডন শিল্প

মণ্ডন শব্দের অর্থ সাজানো বা অলংকরণ। নন্দলাল বসুর দেওয়া সংজ্ঞা অনুযায়ী 'আলপনা, কার্পেট, জালিকাজ, বিভিন্ন দ্রব্যের উপর নকশা, যা কেবল স্থানবিশেষ বা বস্তুবিশেষকে অলংকৃত বা মণ্ডিত করবার জন্য প্রযুক্ত হয় তাই অলংকরণ বা মণ্ডন।' ('দৃষ্টি ও সৃষ্টি', পৃ. ২৯) এই ধরনের কাজকে বলা হয় মণ্ডন শিল্প। স্বভাবতই মণ্ডনের প্রধান লক্ষণ হল 'সাজানো' এবং সে-অর্থে এ শিল্পের আলাদা কোনো মূল্য নেই।

যে বস্তুকে অলংকৃত করা হবে তার ফর্ম এবং মুভমেন্টকে সর্বাগ্রে বুঝে নিতে হবে। অলংকরণের চরিত্রও সেই অনুযায়ী নির্ধারণ করতে হবে। ডিজাইনের সূত্র মেনে সেই পরিকল্পনা করতে হবে। রং ছাড়াও নানারকম দ্রব্য ও উপকরণ এতে ব্যবহার করা হয়। নকশার রূপের ক্ষেত্রে পরিচিত নানা বিষয়, বস্তু, মোটিফ যেমন—ফুল ফল,

লতাপাতা, পশুপাখি, প্রাণীসহ মনুষ্যাকৃতি এবং সেই সঙ্গে প্রাকৃতিক নানা বিষয় যেমন—ঢেউ, মেঘ, বৃষ্টি, চাঁদ, সূর্য, তারা ইত্যাদি সহ নানান ভাবগত ও বিমূর্ত মোটিফ ব্যবহার করা হয়।

মণ্ডন শিল্পে সবসময় দেশকালের গণ্ডির বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। ভারতবর্ষের শিল্পকলার ক্ষেত্রে এই বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে পদ্মফুল, আমপাতা, হরিণ এসব মোটিফ ব্যবহারের মধ্যে আবার চিন দেশে ফুটে উঠেছে ড্রাগনের রূপে।

মণ্ডল সংস্কৃত থেকে উদ্ভব এই শব্দটির অর্থ গোলাকার চাকতি, বেড় বা স্থান হলেও শিল্পকলা ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত অর্থ বেশ ব্যঞ্জনাময়। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বা ওই সম্পর্কীয় কোনো আকৃতি বোঝানোর নানারকম প্রতীকী চিহ্ন সম্বলিত এক ধরনের নকশামূলক উপস্থাপনা। প্রাচ্য ধর্মীয় উপাদানমূলক এই রূপ ধ্যানের কেন্দ্র হিসাবে পরিগণিত এবং বিশেষ করে বৌদ্ধ শিল্পকলায় বহুলভাবে ব্যবহৃত হয়েছে।

মডার্নিজ্‌ম (Modernism) বাংলায় আধুনিকতা। মডার্নিজ্‌ম বা আধুনিকতা হল বস্তুত একটা ঝোঁক। শিল্পে নতুন কিছু করার লক্ষ্যে বা প্রচরের বাইরে বা বিরুদ্ধে গিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা করার প্রবণতাকে আধুনিকতা বলে চিহ্নিত করা হয়। স্বভাবতই আধুনিকতার অন্যতম লক্ষণ হল ঐতিহ্য, রীতি বা পরম্পরার বিশুদ্ধতা থেকে সরে যাওয়া। সাধারণভাবে এধরনের প্রবণতাযুক্ত শিল্পরীতিকে পাশ্চাত্যে আভঁ গার্দ (Avant-garde) বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছিল এবং পশ্চিমি সংস্কৃতিতে প্রায় সমগ্র বিংশ শতাব্দী জুড়ে এই প্রবণতার প্রাধান্য ছিল। উল্লেখ করা যেতে পারে যে প্রতীকবাদ (Symbolism), প্রকাশবাদ (Expressionism), ভবিষ্যবাদ (Futurism), দাদা (Dadaism), অধিবাস্তববাদ (Surealism) ইত্যাদি শিল্পান্দোলন আধুনিকতাবাদের সঙ্গে সংপৃক্ত। প্রসঙ্গত মনে রাখা দরকার আধুনিকতার সঙ্গে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র এবং বহুত্ববাদী দৃষ্টিভঙ্গির সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ।

কেউ কেউ যেমন মনে করেন মডার্ন আর্ট আবশ্যিকভাবেই বিমূর্ত বা নির্বস্তুক এবং বৃহত্তর অর্থে তা আরও কিছু বেশি। তেমনি আবার অনেক ঐতিহাসিক এমনটিও মনে করেন যে, পাশ্চাত্যে মডার্ন আর্টের শুরু যে বারবিজোন স্কুল, ইম্প্রেশনিস্টদের ছবি বা আরও

অনেক কাজের মধ্যে তা কোনোভাবেই বিমূর্ত বা নির্বস্তুক নয়। কিন্তু একটা ব্যাপার ঠিক যে, বিভিন্ন কালে আর্টে যে রীতিবদ্ধ বৈশিষ্ট্যের উদ্ভব হয়েছে তার থেকে সরে এসেই বহু শিল্পী স্বাধীনভাবে বহুমুখী বিষয় নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা করছেন। সুতরাং মডার্ন আর্ট শুধুমাত্র নতুন নতুন মাধ্যম ও করণকৌশলগত চর্চার স্বাধীনতাই নয়, তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে সামাজিক ও রাজনৈতিক নানা বিষয়ে মত প্রকাশের স্বাধীনতা।

মডেলিং (Modelling)

দুটো অর্থগত বৈশিষ্ট্য নিয়ে মডেলিং শব্দটা ব্যবহৃত হয়। প্রথমত, কোনো দ্বিমাত্রিক তলে কোনো ত্রিমাত্রিক বস্তুর আভাসিত আদল গড়ে তোলা। দ্বিমাত্রিক তলে এরকমভাবে ত্রিমাত্রিক আভাস গড়ে তোলার জন্য শেডিং (ছায়া), ভ্যালু (কালচে ভাবের আপেক্ষিক মাত্রা) ইত্যাদি প্রয়োগ করা হয়। এর ফলে বস্তুর রূপসাদৃশ্য ফুটে ওঠে। দ্বিতীয় যে অর্থে ব্যবহৃত হয় তা হল কোনো নমনীয় অর্থাৎ প্লাস্টিক ধর্মের পদার্থ যেমন— মাটি, মোম ইত্যাদির সাহায্যে কোনো ত্রিমাত্রিক অর্থাৎ দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও গভীরতাসম্পন্ন বস্তু বা মূর্তি নির্মাণ করা।

মধুবনি চিত্রকলা

বিহারের একটি জেলা মধুবনি অঞ্চলের লোকচিত্রকলা। এই নামটির পেছনে একটু অর্থবোধক দ্যোতনা বিদ্যমান। মুলক-রাজ আনন্দের ব্যাখ্যায় 'The forest of honey' অর্থাৎ মধুর বন। যদিও আক্ষরিকভাবে মধুবনি জায়গাটা বর্তমানে একটি বাজার-শহর। আর বেশিরভাগ চিত্রকরেরা যে-গ্রামে ছবি আঁকেন তা হল জিতওয়ানপুর। মধুবনি থেকে তা প্রায় তিন মাইল দূরে। এখনকার গ্রাম্য পরিবেশ-প্রকৃতির দৃশ্য বস্তুত ছবির মতোই সাজানো। উত্তর বিহারের এই ছোটো ছোটো গ্রাম আমগাছ, কলাগাছের ঝাড় দিয়ে ঘেরা। তার মধ্যে খড়ের চালের ঘর, দূরে সবুজ পুকুর যার মধ্যে মোষের দল শরীর ডুবিয়ে ঠান্ডা হয় আর দুষ্টু বাচ্চারা তাদের কঞ্চি দিয়ে খোঁচা মেরে তাড়ায়। আর এইরকম গ্রামের বাড়ির গোবর-লেপা মাটির মেঝেতে মেয়েরা প্রতিদিন ছবি আঁকেন। এটা তাঁদের বংশ পরম্পরা ধরে একধরনের আচার। যেমন বাংলায় আলপনা।

মধুবনি চিত্রেব ভিত্তি হল ভারতীয় পুরাণতত্ত্ব, এর প্রধান বিষয় জগতের সৃষ্টি যার স্রষ্টা হল ব্রহ্মা এবং লক্ষ্মী। সেই

নং ২৪২. রাধাকৃষ্ণের লীলা। গ্রাম্য লোকনৃত্যের ছন্দে।



সঙ্গে আছে রামায়ণ মহাভারতের বীরদের কাহিনি। মধুবনি চিত্রকলার এই পুরাণতত্ত্ব নির্ভর বিষয়, যা কখনোই পাশ্চাত্যের রূপ-বৈশিষ্ট্যের মতো অর্থে ব্যবহৃত নয়। এই আচার-চিত্রকলার পদ্ধতি প্রকরণও সহজ সরল। এর কিছু প্রতীক ঐতিহ্যগত ভাবে পাওয়া। দিনের পর দিন এই জাতীয় আলপনা চৌকাঠে, প্রবেশপথে, দেয়ালে দেওয়া হয় যা বিশেষ একটা পালটায় না। উৎসবের সময় ঠাকুমা-বুড়ি পিসিরা তাঁদের স্মৃতি হাতড়ে কমবয়সের অন্য গ্রামের কিছু অস্পষ্ট রূপকে তুলে আনেন। ফলে পুরোনো ধারণার যেটুকু পরিবর্তন হয়।

রেখা প্রধান অত্যন্ত সরল এই লোকচিত্রকলায় পটধর্মিতা লক্ষণীয়। তবে এর শৈলীটি একেবারেই মৌলিক। ফিগারগুলির সঙ্গে মিশরীয় চিত্রকলার ফিগারের মিল আছে। বেশিরভাগ ফিগারই যৌগিক বা সমান্তরাল এক জোড়া রেখার সাহায্যে আঁকা এবং প্রায়ই এই জোড়া রেখার ভেতরটাও সমান্তরাল তির্যক রেখা দিয়ে ভরাট করা। কালো

রেখাবদ্ধ ছবি ফ্ল্যাট রং দিয়ে ভরাট করা হয় এবং এভাবেই গড়ে ওঠে মধুবনি চিত্রের নিজস্ব রূপ-বৈচিত্র্য। মধুবনির কিছু বিশিষ্ট শিল্পীরা হলেন সীতা দেবী, তাঁর পুত্র সূর্য দেব, সীতাদেবীর প্রতিবেশী বানাদেবী।

মন্তাজ (Montage)

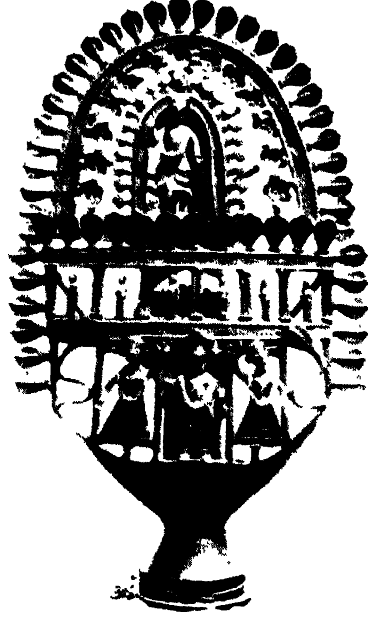
মন্তাজ শব্দটা ঊনবিংশ শতাব্দীর কারিগরি শব্দকোশ থেকে সংগৃহীত। মন্তাজ শব্দটির সাহায্যে একটি শৈল্পিক প্রক্রিয়াকে বোঝানো হয়। যে প্রক্রিয়ায় সাধারণভাবে শিল্পকলা বহির্ভূত এবং আগে থেকে নির্মিত জিনিসপত্র যেমন কলকব্জা, কোনো কিছুর টুকরোটাকরা ইত্যাদিকে জুড়ে বা সাজিয়ে শিল্পদ্রব্য তৈরি করা হয়। এই পদ্ধতি কোলাজ থেকে সামান্য আলাদা। কোলাজ হল মন্তাজ-এর সামান্য পরবর্তীকালে কিউবিস্টদের ব্যবহৃত একটি পদ্ধতি। যেখানে শিল্পী রঙের সঙ্গে সম্পর্কিত নয় এমন সব দ্রব্যাদিকে ছবির কমপোজিশন তথা নকশার মধ্যে ব্যবহার করেন। মন্তাজের ত্রিমাত্রিক দ্রব্য সহযোগে গঠিত রিলিফ সদৃশ চিত্রসূত্র খুব সহজে ভাস্কর্যেও ব্যবহার করা যায়। ফ্রাঙ্কো-রাশিয়ান শিল্পী মিখাইল ল্যারিয়োনভ ১৯১৩ সালে কার্ডবোর্ড, তুলো, কাঠ ইত্যাদি দিয়ে একটি 'ধূমপায়ী'র রূপ তৈরি করেন। আবার উমবার্টো বোসিয়োনি এই পদ্ধতিতে ভাস্কর্য তৈরি করেন। অন্যদিকে মার্সেল দুসঁপ সাইকেলের একটি চাকা এবং একটি বসার টুল দিয়ে তৈরি করেন 'রেডিমেড' নামে একটি শিল্পকর্ম আর এই সময়েই পিকাসোর ধাতু এবং কার্ডবোর্ডে তৈরি 'গিটার' আত্মপ্রকাশ করে। দাদাবাদী জার্মান গ্রাফিক শিল্পী এবং চিত্রকর জন হার্টফিল্ড নিজেকে 'মন্তাজবাদী দাদা' হিসেবে পরিচয় দিতেন। এরকমভাবে বার্লিন দাদাবাদীরা রাজনৈতিক এবং বিদ্রূপাত্মক ভাষ্য প্রকাশের উদ্দেশ্যে ফোটোমন্তাজের অগ্রগতি ঘটিয়েছিলেন। মন্তাজের পদ্ধতি চলচ্চিত্র সম্পাদনার কাজেও ব্যবহৃত হয়েছে।

ত্রিমাত্রিক বস্তু ছাড়াও শুধুমাত্র আলাদা অলাদা ছবি বা ছবির অংশ সেঁটে, যা কোনো না কোনো ভাবে একে অপরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে উঠেও মন্তাজ তৈরি হতে পারে। অর্থাৎ মন্তাজের বিভিন্ন অংশের একটা সাধারণ বিষয় থাকে। রং দিয়ে এঁকেও এমনটা তৈরি করা যেতে পারে।

মনসা ঝাড়

ত্রিস্তর আলংকারিক মনসা মূর্তি। প্রধানত বাঁকুড়ার পাঁচমুড়ায় তৈরি হয়। নৌকার আকারে একটি বেদিকার ওপর গোটা

নং ২৪৩. মনসা ঝাড়। টেরাকোটা। উচ্চতা ৩২ ইঞ্চি। পাঁচমুড়া, বাঁকুড়া।



কাঠামোকে গড়ে তোলা হয়। কাঠমোর মাথার দিকটা আর্চ করা। কেন-না কুপিতা-দেবী মনসা-কাহিনিতে জলযাত্রার একটা গল্প আছেই। নীচের নৌকাটি হল তারই প্রতীক। লক্ষ করার বিষয় হল মনসার গলায় মোটা সোনার হার ঝোলে। আর্চের ভেতর সর্বশেষ স্তরে ময়ূরের পিঠে বসা কার্তিকের মূর্তি, তাও সোনার হারে সাজানো। এই ধারণা উত্তরাঞ্চলের সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত কি না এরকম প্রশ্নও কেউ কেউ তুলেছেন।

মনোটাইপ (Monotype)

গ্রাফিক প্রিন্ট বা ছাপাই ছবি তৈরির একটি পদ্ধতি। এই প্রক্রিয়ায় একবার মাত্র প্রিন্ট নেওয়া যায় বলেই এরকম নাম। একটি কাচ, ধাতু বা যেকোনো মসৃণ তলে তেল রং বা ছাপার কালি দিয়ে উলটো ভাবে নকশা তথা ছবি আঁকা হয়। তারপর সেই অঙ্কিত তলের ওপর কাগজ চাপিয়ে প্রেসের সাহায্যে বা প্রথাগত হাত অথবা চামচ ইত্যাদি দিয়ে ঘষে ছাপ তুলে আনা হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে একবারের বেশি প্রিন্ট নেওয়া যায় না। কারণ পরবর্তী প্রিন্টগুলি ক্রমশ অস্পষ্ট হয়ে ওঠে। কেন-না এতে কালি দ্বিতীয়বার লাগানো যায় না। ফলে এরকম কথা কেউ বলতেই পারেন যে, যদি মনোটাইপে একবারই মাত্র প্রিন্ট নেওয়া যায় তাহলে প্রথমেই কোনো তলে যেমন হ্যান্ডমেড পেপার বা অন্য

কোনো কাগজে প্রিন্ট না নিয়ে সরাসরি এঁকে নেওয়াই তো ভালো। কিন্তু তা নয়। কেন-না এই পদ্ধতিতে ছাপ নেওয়া এবং সরাসরি আঁকা কোনো ছবির মধ্যে ফারাক বিস্তর। এভাবে স্কুইজি দিয়ে ঘষে ছাপ তোলা, কাগজ তোলার সময় সামান্য সরে বা নড়ে যাওয়া সহ গোটা প্রক্রিয়াটি মিলে ছবির এমন চেহারা তৈরি করে যা সরাসরি রং লাগানো মাধ্যমে করা অসম্ভব। মনোটাইপের মাধ্যমে এডগার দেগা, উইলিয়ম মেরিটকেস অসাধারণ সব ছবি তৈরি করেছেন।

মনোপ্রিন্ট (Monoprint) ছাপাই ছবির একটি রূপ। এর বৈশিষ্ট্য হল যে, প্রথাগত ছাপাই ছবি যথা এচিং, এনগ্রেভিং লিথোগ্রাফি, কলোগ্রাফি ইত্যাদির প্লেটে সাধারণ নিয়মানুযায়ী কালি লাগানোর পর তার ওপর অতিরিক্ত কালি দিয়ে আর একটি ইমেজ বা চিত্র তৈরি করে প্রিন্ট নেওয়া। এর ফলে একই ছবিতে পূর্বকৃত ছাপাই ছবির প্লেটের ফলাফলের সঙ্গে সংযোজিত অতিরিক্ত কালির নকশা মিলে মিশ্রগুণসম্পন্ন একটি নতুন ধরনের ছবি তৈরি হয়। সাধারণ অর্থে মনোপ্রিন্ট কোনো ছাপাই নয়। এর প্রতিলিপিকরণও খুব দুঃসাধ্য। খুব সতর্ক থাকলেও পরবর্তীকালের সংযোজিত অতিরিক্ত কালির ইমেজ একই রকম হওয়া কঠিন। তবে কিছু শিল্পী এবিষয়টাকে সুন্দরভাবে সামলেছিলেন। যেমন ডাচ শিল্পী রেমব্রাঁ। কেউ আবার কালির ভিন্নতা ঘটিয়ে অভিনবত্ব এনেছিলেন। যেমন এচিং প্লেটে প্রথাগত কালির ওপর অ্যাক্রিলিক রং দিয়ে অতিরিক্ত ছবিটি এঁকে তারপর ছাপ তুলেছিলেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য জ্যাস্পর জোনস।

মনোলিথ (Monolith) একটিমাত্র পাথরের খণ্ডে নির্মিত বৃহৎ ভাস্কর্য, স্থাপত্য বা স্মৃতিস্তম্ভ। পাথর ছাড়াও অন্য মাধ্যমে তৈরি জোড়হীন বড়ো আকারের নির্মিতিকেও মনোলিথ বলে উল্লেখ করা হয়।

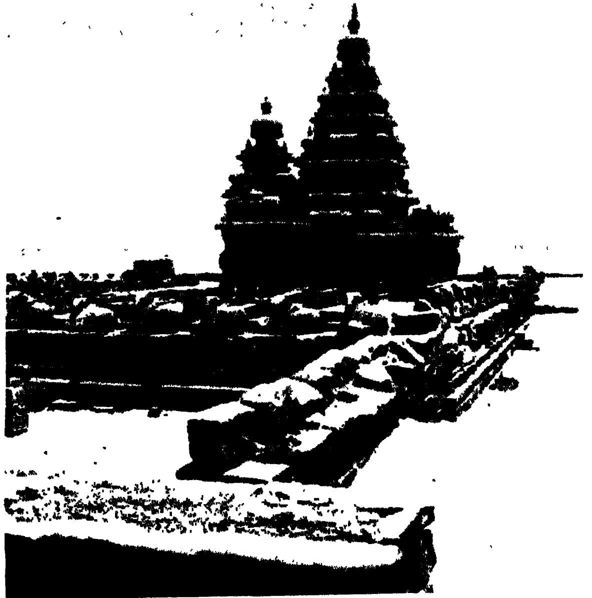
ময়েশ্চার প্রবলেম (Moisture Problem) ময়েশ্চার বা ভিজেভাবের জন্য যেকোনো সাপোর্ট বা তলে আঁকা ছবির সমস্যা হতে পারে। সাধারণভাবে আর্দ্রতা বা জলীয় বাষ্পের জন্য পরিচিত সমস্যাগুলি হল কাগজ কুঁচকে যাওয়া, প্যানেল বেড়ে যাওয়া ক্যানভাস ঝুলে পড়া। কেন-না এসব পদার্থগুলির বেশিরভাগই জলীয় বাষ্প শোষণ করে আয়তনে সম্প্রসারিত হয়। কাগজ, কাপড়, কাঠ এগুলি দীর্ঘদিন জলীয় বাষ্পের সংস্পর্শে থাকলে পচে

যেতে পারে। খুব বেশি জলীয় বাষ্প বা স্যাঁতসেঁতে জায়গায় থাকলে কাগজের ছবির ওপরে মরচে পড়তে পারে, ক্ষতিকারক ছত্রাক ধরতে পারে। ছবির ওপরের বার্নিশও জলীয় বাষ্পের কারণে আবছা হয়ে যেতে পারে। কাচে বাঁধানো ছবির ক্ষেত্রে অনেক সময় কাচের ভেতরে বিন্দু বিন্দু জল জমে যায়, যার ফলে বিশেষ করে জল রঙে আঁকা ছবিতে ছোপ ধরে যায়।

এসব এড়াতে ময়েশ্চার বা জলীয় বাষ্পহীন জায়গায় ছবি রাখা উচিত। কিন্তু আমাদের দেশের মতো নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে এরকম অবস্থা পাওয়া কঠিন। তাই সাধারণভাবে খোলামেলা স্বাভাবিক আলো হাওয়া ও তাপমাত্রাসম্পন্ন ঘরেই ছবি ঝোলানো উচিত।

মহাবলীপুরম

দক্ষিণ ভারতের ভাস্কর্য সমৃদ্ধ একটি স্থান। দক্ষিণ ভারতের ভাস্কর্য স্থাপত্যকে কয়েকটি নির্দিষ্ট সময়কালে ভাগ করা যায়। যার প্রথমভাগে রাজত্ব করতেন পল্লব রাজাগণ। পল্লব রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় ৪০০ খ্রিস্টাব্দে আর স্থায়ী ছিল প্রায় ৭৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। এঁরা প্রথমে বৌদ্ধ ছিলেন পরে শৈবধর্ম গ্রহণ করেন। পল্লবদের রাজধানী ছিল কাঞ্চিপুরম যার বর্তমান নাম কাঞ্জিভরম।



নং ২৪৪. সৈকত মন্দির। মামল্লপুরম। পল্লব যুগ। খ্রিস্টীয় অষ্টম শতাব্দীর আদিপর্ব।

পল্লব রাজা নরসিংহর রাজত্বকাল ছিল ৬৪২ থেকে ৬৬৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। তিনি মামল্ল অথবা মহামল্ল নামে পরিচিত ছিলেন। এই কারণে মহাবলীপুরমের আর একটা নাম মামল্লপুরম। রাজা প্রথম মহেন্দ্রবর্মন এবং নরসিংহ বর্মন মামল্লপুরম বা মহাবলীপুরমে পাহাড়ের পাথর কেটে মন্দির তৈরি করেন। এগুলিকে বলে সপ্তরথ। এই রথগুলির বিচিত্র নির্মাণ কৌশল এবং ভাস্কর্যের জন্য মহাবলীপুরমের বিশেষ খ্যাতি। সুবিশাল একক কঠিন গ্রানাইট পাথর কেটে তৈরি বলে এই স্থাপত্য ভাস্কর্যকে মনোলিথিক মন্দির বলা হয়। সেইসঙ্গে এগুলি দ্রাবিড় স্থাপত্য এবং কৈলাস ইলোরার শৈল মন্দিরের পূর্বাভাস হিসাবেও পরিগণিত।

এই রথাকৃতি মন্দিরের মধ্যে পাঁচটি রথ বিখ্যাত। এগুলি পাণ্ডবদের নামে চিহ্নিত। এই রথমন্দিরগুলি আকারে যেমন বড়ো নয় তেমনি এগুলি প্রায় অসমাপ্ত। মনে করা হয় এসব রথমন্দির বৌদ্ধদের বিহার-এর অন্তর্গত চৈত্য ছিল। এই পঞ্চরথ যথা ধর্মরাজ রথ, ভীমসেন রথ, অর্জুন রথ, সহদেব রথ এবং দ্রৌপদী রথ ছাড়াও গণেশ রথ বিখ্যাত। দ্রৌপদী রথের স্থাপত্যশৈলী বাংলার আটচালা মণ্ডপের মতন এবং এই রীতির স্থাপত্যকর্ম দক্ষিণ ভারতে আর কোথাও দেখা যায় না। গণেশ রথের ছাদ বৌদ্ধ চৈত্যের সদৃশ। মহাবলীপুরমে উপবিষ্ট সিংহের মাথায় স্তম্ভ লক্ষ করা যায়। এই স্তম্ভ 'য়লি' নামে পরিচিত।

মন্দির রথ ছাড়াও মহাবলীপুরমে আছে বেশ কয়েকটি প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম গুহা। গুহাগুলির গায়েও পাথর খোদাই করে নানান ভাস্কর্য রচনা করা হয়েছে। এইসব গুহাগুলির মধ্যে অর্জুনের তপস্যা, পঞ্চপাণ্ডব, কৃষ্ণলীলা, মহিষমর্দিনী, রামানুজ, কোনেরি, বরাহস্বামী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। অর্জুনের তপস্যা গুহায় তপস্যারত অর্জুনের উপবেশনের ভঙ্গিটি লক্ষণীয়। অর্জুনের মূর্তিটি গান্ধার রীতির সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। গুহার গায়ে অসংখ্য জীবের মূর্তি খোদাই করা আছে। তার মধ্যে হাতির পালের একটি দৃশ্য আছে। এই হাতির পালের অন্তর্গত সবচেয়ে বড়ো হাতিটি লম্বায় ১৭ ফুট এবং উচ্চতায় ১৪ ফুট। অন্যান্য মূর্তিগুলিও দীর্ঘাকৃতি এবং কিরীটযুক্ত।

মাইনোয়ান আর্ট (Minoan Art)

ব্রোঞ্জ যুগের অর্থাৎ ২৩০০ থেকে ১১০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের ক্রিটান আর্ট। ক্রিটদের কিংবদন্তি রাজা মাইনোসের নাম অনুসারে এই সভ্যতা ও শিল্পকলাকে আধুনিককালে এরকম নামকরণ করা হয়। খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর প্রথমার্ধের মাঝামাঝি সময়ে সাইক্ল্যাডের ঠিক দক্ষিণে ক্রিট দ্বীপে বেশ উন্নত এবং আপত নির্বিরোধী মাইনোয়ান সভ্যতা রূপ নিতে শুরু করে। সমগ্র পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল জোড়া সমৃদ্ধশালী এক ব্যবসায়িক যোগাযোগ কেন্দ্রের সুসংগঠিত অর্থনৈতিক এবং প্রশাসনিক পরিকাঠামোই ছিল মাইনোয়ান সংস্কৃতির ভিত্তি। এমনকি মাইনোয়ানরা লেখার জন্য নিজস্ব এক পদ্ধতির সৃষ্টি করেছিলেন। যার মধ্যে অন্যতম ছিল 'রৈখিক A' এই A গ্রিক হরফ নয়, এর পাঠোদ্ধার করা আজও সম্ভব হয়নি। মাইনোসের ইতিহাস সবটাই জানা গেছে বিংশ শতাব্দীর প্রত্নতত্ত্ববিদদের দেওয়া সাক্ষ্য থেকে। মাইনোয়ান শিল্প কতগুলি রাজপ্রাসাদকে ঘিরে গড়ে উঠেছিল। যার মধ্যে সবচেয়ে খ্যাত নসোস (Knossos)। বিশিষ্ট প্রত্নতাত্ত্বিক স্যার আর্থার ইভানস্ বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় নসোস খনন করেন এবং ধ্বংসাবশেষকে পুনর্গঠন করেন। এখানে খ্রিস্টপূর্ব ১৮০০ সাল নাগাদ বিমূর্ত শৈলীতে চিত্রিত খুবই সমৃদ্ধ পটারি তৈরি হত। ১৬০০ খ্রিস্টপূর্বের কাছাকাছি সময়ে সাদৃশ্যবাদী নকশা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বক্রতাময় রেখাবেষ্টনী ব্যবহারের প্রবণতা অনুভূত হয়। এই সময় থেকে অন্যান্য মাধ্যমে তৈরি খুবই দৃষ্টিনন্দন সব আকৃতির মধ্যে মানুষ ও পশুর মূর্তির ব্যবহারও স্থান পেতে থাকে।

মাইনোয়ানদের বড়ো বড়ো ভাস্কর্য সৃষ্টির প্রতি কোনো



নং ২৪৫. ক্রিটের নসোস্ : ষাঁড়ের ওপর নৃত্যরত মল্লযোদ্ধা। ফাঁপা ঢালাই পদ্ধতিতে তৈরি নিরেট ব্রোঞ্জ মূর্তি। ১৬০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ।

আগ্রহ ছিল না। ছোটো মাপের ভাস্কর্যের প্রচুর নিদর্শন টিকে আছে। ক্রিটদের মূর্তিকলার শৈলীতে তৈরি প্রচুর পাথরের ভাস এবং পাত্রের ঢাকনা পাওয়া গেছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি নমুনা হল 'হারভোল্টারস ভাস'। সিল বা ঢাকনাগুলো বিভিন্ন পদার্থ দিয়ে তৈরি। সাধারণভাবে এগুলো তৈরি হত শক্ত ও মোটামুটি দামি অ্যাগেট পাথর দিয়ে। উন্নত শৈলীর বিচিত্র কাজকর্মের এইসব পশু বা মনুষ্যমূর্তি ব্যক্তিগত নৈপুণ্যের যে ছাপ রেখেছে তা যেকোনো গ্রিক বা ইজিপ্টীয় বস্তু থেকে আলাদা। টেরাকোটার তৈরি অনেক ক্ষুদ্র ভাস্কর্যও দেখা গেছে যেগুলিকে ধর্মীয় আচারঅনুষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্কিত বলে মনে করা হয়। ১৭০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ কালে মাইনোয়ান সভ্যতা ভূকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পরবর্তীকালে পুনর্গঠিত প্রাসাদগুলিতে বড়ো আকারের দেয়াল-চিত্রের বিকাশ ঘটে। প্রকৃত ফ্রেস্কো কৌশল অনুযায়ী ভিজে প্লাস্টারের ওপর সরাসরি রং দিয়ে এগুলো আঁকা হয়েছিল। প্রাপ্ত টুকরো টুকরো অংশ জোড়া লাগিয়ে সংরক্ষণ করা নমুনা থেকে জানা যায় যে এগুলি মোটামুটি ১৬০০-১৮০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের তৈরি। এরকম একটি ফ্রেস্কোর টুকরো হল 'লা পারসিয়েনা'— অর্থাৎ একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে সমবেত মানুষজনের মধ্যেকার সম্মানীয়া প্রীতিভাজন জনৈকা রমণীর ছবি। পরবর্তীকালে আগ্নেয় ধ্বংসস্তূপের মধ্য থেকে প্রাপ্ত শিল্প খণ্ডতে ইউরোপীয় ল্যান্ডস্কেপের আদি ধারা স্পষ্ট।

১৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে মাইনোয়ান সংস্কৃতি মূল গ্রিক ভূখণ্ডের বিশেষ করে মাইসেনিয়ার সংস্কৃতির সঙ্গে সংমিশ্রিত হতে শুরু করে পরবর্তীকালে যার মধ্য দিয়ে মাইসেনিয়ান শিল্পের উদ্ভব হয়।

মাওরি আর্ট (Maori Art)

নিউজিল্যান্ডে বসবাসকারী পলিনেশীয় অধিবাসীদের শিল্পকলা। ইউরোপীয়দের এদেশ আবিষ্কারের সময়ে মাওরিদের কাঠখোদাই শিল্প ছিল খুবই সমৃদ্ধ ও ঐতিহ্যবাহী। যা উন্নত রূপ নিয়ে আজও বেঁচে আছে। মাওরিরা ঘরবাড়ি, শালতি নৌকো, ব্যবহার্য জিনিসপত্র পরিশীলিত বক্ররেখা বেষ্টনী এবং সর্পিল নকশা সহ শৈলীবদ্ধ মনুষ্য শরীর দিয়ে অলংকৃত করতেন। পলিনেশীয়দের নানা মাধ্যমের রকমারি মজাদার, জটিল ছন্দময় পৃষ্ঠ-অলংকরণ হাওয়াইয়েব

নং ২৪৬. খাম্বা গৃহকাষ্ঠের ওপর কারুকার্য। নিউজিল্যান্ড।



আকর্ষণীয় পালকের কাজ থেকে নিউজিল্যান্ড মাওরির সূক্ষ্ম কাঠখোদাই, গ্রিনস্টোনের কারুকর্ম সহ উল্কিকরা 'সজীব শিল্প' অসাধারণ কীর্তি। মাওরিদের বক্ররেখাবেষ্টনীমণ্ডিত পৃষ্ঠ-অলংকরণ মুখ্যত সংস্কার। শালতি নৌকার খোদাই কাজে, দরজার খুঁটিতে, সভাগৃহের লিনটেলে জটিল রৈখিক নকশার ব্যবহারের নমুনা পাওয়া গেছে। আধুনিক কালের বিভিন্ন শিল্পকর্মেও এর প্রভাব লক্ষ করা যায়।

মাকেত (Maquette)

এটি ছোটো মডেলের জন্য ব্যবহৃত একটি ফরাসি শব্দ। পূর্ণ মাপের ভাস্কর্যের ছোটো ত্রিমাত্রিক খসড়া রূপ। ভাস্কর্য শিল্পীরা তাদের কাজের সুবিধার জন্য মোম বা মাটি দিয়ে এরকম ছোটো আদর্শ তৈরি করেন যা অনেক ক্ষেত্রেই তাঁদের কাজের রূপরেখা হিসাবে ব্যবহৃত হয়। চিত্রশিল্পের ক্ষেত্রে যেমন 'থাম্বনেল স্কেচ'। কখনো-কখনো বিক্রির সময় পূর্ণমানের ভাস্কর্যের বিষয়গত ধারণা দিতেও মাকেত ব্যবহার করা হয়।

মার্কসবাদী নন্দনতত্ত্ব

বেশিরভাগ নন্দনতত্ত্বের চর্চার ক্ষেত্র হল নিরপেক্ষ, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এবং ঐশ্বরিক সৌন্দর্যের ব্যাখ্যা ও অনুসন্ধান। কিন্তু মার্কসবাদী

নন্দনতত্ত্বের মূল লক্ষ্য সামগ্রিকভাবে জীবন ও সমাজ। সৌন্দর্যের সমস্ত গুণ ও লক্ষণগুলিকে সমাজ ও ইতিহাসের সঙ্গে মিলিয়েই মার্কসবাদী নন্দনতাত্ত্বিক নীতি তৈরি হয়েছে। কেন-না মার্কসবাদী দর্শন অনুযায়ী শিল্প হল মানুষের সাংস্কৃতিক কুশলতার নিদর্শন। আর এই কুশলতা তৈরি হয় দ্বান্দ্বিকতার নীতির ভিত্তিতে শ্রমের প্রয়োগের মধ্য দিয়ে। সামাজিক-ঐতিহাসিক বিবর্তনের ধারায় যে সত্যকে মানুষ উপলব্ধি করে তারই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য একটি রূপ হল শিল্পকর্ম। স্বভাবতই এই শিল্পকর্ম যুগে যুগে সামাজিক স্তরবিন্যাস ও তার অগ্রগতির ওপর দাঁড়িয়েই একদিকে যেমন তার বিষয়কে উপজীব্য করেছে তেমনি তার আঙ্গিকও মূর্ত হয়েছে। মার্কসবাদী নন্দনতাত্ত্বিক ধারণা এক কথায় 'হিস্টোরিজ্‌ম' শব্দটির দ্বারা সূচিত করা হয়।

মার্কসবাদী চিন্তায় কোনো কিছু স্থাণু বা নিশ্চল নয় এবং তা অবশ্যই বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকের ক্ষেত্রেও। ফলে শিল্পের জগতে তাই সৃষ্টির যে বৈচিত্র্য তা একমাত্র মার্কসবাদী দর্শন দ্বারাই ব্যাখ্যা করা সম্ভব। মার্কসের মতে জগৎ নিয়ত পরিবর্তনশীল। এই পরিবর্তন বস্তু ও চিন্তার পারস্পরিক ক্রিয়ার ফলাফল। এর মধ্যেই দ্বান্দ্বিকতা নিহিত। এর মধ্য দিয়েই 'Homo Faber' অর্থাৎ শ্রমজীবী মানুষ 'Homo Aesthetices' অর্থাৎ সৃজনশীল মানুষে রূপান্তরিত হয়। কিন্তু এই রূপান্তরণ সমাজ নিরপেক্ষ নয়। এমনকি শ্রেণি নিরপেক্ষও নয়। সমাজে মানুষের মধ্যে যে শ্রেণিবিভাগ বিদ্যমান তা সবরকমভাবেই শিল্পকে প্রভাবিত করে। সৌন্দর্যের সীমানা এবং সৌন্দর্যের অধিকারও এর আওতায় আসে। তাই মার্কসবাদী নন্দনতত্ত্বের অন্যতম দিক অবশ্যই হল সর্বজনীন সৌন্দর্য সৃষ্টি যা একমাত্র শ্রেণি বিলুপ্তি তথা চিন্তা চেতনার ঐক্যের মধ্য দিয়েই সম্ভব। কেন-না মার্কসবাদী দর্শনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল— চেতনা বস্তুর প্রতিফলন। স্বাভাবিকভাবেই সামাজিক ভেদাভেদের প্রতিফলনে সৌন্দর্যোপলব্ধিও বিভক্ত হতে বাধ্য। তাই প্রকৃত সৌন্দর্যের খোঁজ মিলতে পারে শ্রেণিহীন সমাজের মানুষের সৃজনের মধ্যেই।

মালটিমিডিয়া (Multimedia)

আভিধানিক অর্থে তথ্যের সরবরাহ বা বিধানের একাধিক উপায়ের ব্যবহার। শিল্পকলার ক্ষেত্রে একটি অর্থে শব্দটি

মিক্সডমিডিয়া বা মিশ্রমাধ্যমের সমার্থক। সেই অর্থে মালটিমিডিয়া শব্দটি নতুন নয়। বিংশ শতাব্দীতে বহু ধরনের মাধ্যমের বা পদার্থের ব্যবহার ঘটিয়ে শিল্পকর্ম সৃষ্টির প্রচলন ঘটে। যদিও বহু ধারার শিল্প মাধ্যমের সংযুক্তি ঘটিয়ে শিল্প সৃষ্টির ইতিহ্নস বেশ পুরোনো। সেদিক থেকে দেখলে থিয়েটার, যাত্রায় নৃত্য, সংগীত, ধ্বনি, আলো, নকশা ইত্যাদির প্রয়োগ ঘটানো মালটিমিডিয়ার দৃষ্টান্ত। কিন্তু বর্তমানে কম্পিউটার থেকে তৈরি বিশেষ শিল্পমাধ্যম শব্দটির ব্যাখ্যায় নতুন দ্যোতনা যোগ করেছে। এখানে ধ্বনি, ছবি, ভিডিয়ো, অ্যানিমেশন এবং টেক্সট বা অক্ষর বিন্যাস এই পঞ্চ মাধ্যমের ব্যঞ্জনা বোঝায়। ছবি কোনো ফোটোগ্রাফ বা কম্পিউটারে আঁকা বা গ্রাফিক্স হতে পারে। ভিডিয়ো বা চলচ্চিত্র এবং অ্যানিমেশন আধুনিক মালটিমিডিয়ার অবিচ্ছেদ্য অংশ। আবার অ্যানালগ মালটিমিডিয়া থেকে 'ডিজিটাল' মালটিমিডিয়া আরও আধুনিক। সরল পদ্ধতিতে দেখে যেতে হয় না বলে ডিজিটাল মালটিমিডিয়াকে বলা হয় নন-লিনিয়ার। আধুনিক মালটিমিডিয়া এক অর্থে চলচ্চিত্র প্রক্রিয়ার মতো হলেও এর বিভিন্ন উপাদান সংগ্রহ ও ব্যবহারের জন্য লাগে একটি-কি দুটি কম্পিউটার। শিল্পীদের আঁকা ছবি, গ্রাফিক্স, অ্যানিমেশন, সংগীতকারদের সংগীত, ধ্বনি এবং ধারাভাষ্য সব কিছুই কম্পিউটারের মাধ্যমে করা যায়।

মালটিমিডিয়া প্রোগ্রামার এইসব উপাদানকে কম্পিউটারের ভাষায় জুড়ে মূল রূপটি দান করেন। মালটিমিডিয়া হল বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও শিল্পের অপূর্ব সংমিশ্রণ। ইন্টারনেট এবং ওয়েবসাইটের ব্যাপক প্রসারের ফলে মালটিমিডিয়ার ব্যবহার হচ্ছে সর্বত্র। পঠনপাঠন, শিক্ষাদান, ব্যবসা, বিনোদন প্রতিটি ক্ষেত্রেই মালটিমিডিয়ার অসামান্য পদ্ধতিকে কাজে লাগানো হচ্ছে।

মাস্টারপিস (Masterpiece)

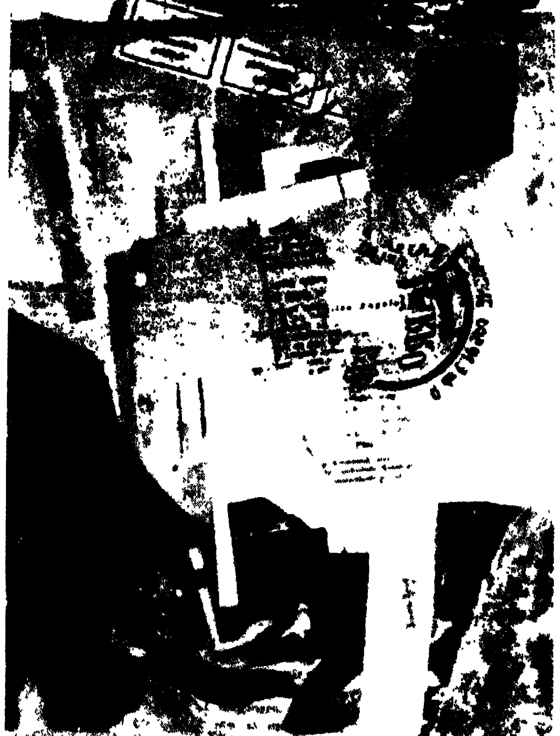
পাশ্চাত্যে মধ্যযুগীয় গিল্ড ব্যবস্থায় একজন শিল্পশিক্ষার্থীকে কোনো একজন গুরু বা কারখানার প্রধান শিল্পীর কাছে দীর্ঘ সাত থেকে আট বছর শিক্ষানবিশ থাকতে হত। তারপর গুরুর অনুমতি পেয়ে অর্থাৎ স্নাতক হয়ে সেই শিক্ষার্থী জার্নিম্যান বা পথিক-শিল্পী হিসাবে শিল্পী জীবনের প্রত্যক্ষ চর্চার পথে বেরিয়ে পড়তেন। সেই শিল্পী বিভিন্ন শহরে

গিয়ে কোনো কারখানার প্রধান শিল্পীর কাছে কাজ চাইতেন বা নিজে কারখানা খুলতেন। সে সময় ছবি তৈরির প্রতিষ্ঠানগুলি কারখানা বলেই পরিচিত ছিল কিন্তু নিজে কারখানা খুলে ব্যাবসা করতে হলে প্রধান শিল্পী বা মাস্টারের অনুমোদন লাগত। অনুমোদন পাবার জন্য শিক্ষার্থী একটি মৌলিক ছবি এঁকে বা মূর্তি গড়ে সেটিকে মাস্টারের কাছে অনুমোদনের জন্য পেশ করতেন। মাস্টারের জন্য রচিত এই ছবি বা মূর্তিকেই বলা হত মাস্টারপিস। মাস্টারপিসকে দেখে যথোপযুক্ত মনে হলে তবেই প্রধান শিল্পী বা গুরু তাকে অনুমোদন করতেন এবং অনুজ্ঞাপত্র দিতেন।

পরবর্তীকালে যেকোনো শিল্পীর বিশিষ্টতা পূর্ববর্তী উৎকর্ষমণ্ডিত ছবিকেই মাস্টারপিস বলে অভিহিত করা হয়।

মিক্সিডমিডিয়া (Mixedmedia)

প্রাথমিকভাবে মিক্সডমিডিয়া হল কোনো একটি শিল্পকর্মে একের বেশি মাধ্যম বা উপকরণের ব্যবহার। শব্দটি ব্যবহারের ক্ষেত্রগুলি হল— ১. যেসব ছবি দুই অথবা বেশি ধরনের রং যথা প্যাস্টেল এবং অ্যাক্রিলিক অথবা তেল



নং ২৪৭. স্কুইটারস : ওপেন বাই কাস্টমস। ১৯৩৭। কোলাজ। আরও ছবি ১৮০ পৃ. ৩৬৪

রং, জল রং এবং প্যাস্টেল ব্যবহার করে আঁকা। ২. ভিন্নধর্মী উপাদান যেমন রং এবং কাগজ ব্যবহার করে তৈরি চিত্র। ৩. রকমারি দ্রব্য যথা—ধাতু, রং, পাথর, কাঠ, তার ইত্যাদি ব্যবহার করে তৈরি অ্যাসেমব্লেজ বা ভাস্কর্য। মিক্সিডমিডিয়া কথাটি এতটাই ব্যাপক যে এতে ব্যবহৃত দ্রব্যাদির কোনো কার্যকারী তালিকা তৈরি করা অসম্ভব যাকে শৈল্পিক ক্রিয়ায় যুক্ত করা যাবে না।

মিক্সডমিডিয়া সাধারণভাবে ১৯৬০-এর অগ্রগতি হলেও এর সূত্রপাত ঘটেছিল বহু আগেই। ১৪৭৬ সালে কার্লো ক্রিভেলি তাঁর আঁকা সেন্ট পিটার ছবিতে উঁচু হয়ে থাকা গয়না, কাঠ, লাল, সবুজ ও স্বচ্ছ কাচ ব্যবহার করে যে অ্যাসেমব্লেজ তৈরি করেছিলেন প্রকৃতপক্ষে তা ছিল মিক্সডমিডিয়া। নানা পরীক্ষানিরীক্ষা ও বিবর্তনের মধ্য দিয়ে মিক্সডমিডিয়ার বিভিন্ন অগ্রগতি ঘটেছে। বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় কিউবিস্টদের হাতে মিক্সডমিডিয়া নতুন রূপ লাভ করে ব্রাক, পিকাসো, জুঁয়া গ্রির কাজের মধ্যে যা কোলাজ নামে পরিচিত হয়। কিউবিস্টরা ব্যবহার করেছিলেন রং কাগজ, ফোটোগ্রাফ ইত্যাদি জিনিস। বেশিরভাগ মডার্ন আর্ট মুভমেন্ট যেমন ফিউচারিজ্‌ম থেকে দাদা, সুরিয়ালিজ্‌ম, কনসেপচুয়াল আর্ট, এমনকি পারফর্ম্যান্স আর্টকেও মিক্সডমিডিয়া আর্টের শ্রেণিভুক্ত করা যায়। দাদাবাদী, অধিবাস্তববাদী (সুরিয়ালিস্ট), ফিউচারিস্টরা এমন কিছু মিক্সডমিডিয়া শিল্প সৃষ্টি করেছিলেন যাকে আধুনিক পরিবেশবাদী শিল্পের প্রত্যক্ষ অগ্রদূত বলা যেতে পারে। 'টোটাল আর্ট'-এর ধারণাকে গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে মিক্সডমিডিয়া আরও বিকশিত হয়। ১৯৩০ সালের পর থেকে এরকম মিক্সমিডিয়ার নমুনা দেখা যায় যা বিসদৃশ, বৈশিষ্ট্যহীন, নোংরা জিনিসপত্র সাজিয়ে তৈরি অরীতিগত ভাঁড়ামো পরিবেশের রূপে। এড কাইহোলজের একসারি মিক্সডমিডিয়ার অন্যতম 'স্টেট হসপিটাল' এরকম একটি শিল্পকর্ম যাতে একটি গোপন ছিদ্র দিয়ে হাসপাতালের একটি ওয়ার্ডের ভিতরের অদ্ভুতুড়ে দৃশ্য দেখানো হয়েছিল। বস্তুত নানারকম আঙ্গিককে কেন্দ্র করে মিক্সডমিডিয়ার অগ্রগতি ঘটেছিল। পাপিয়ের-মাশ এরকম একটি আঙ্গিক। মিক্সডমিডিয়াকে অনেক সময় কম্বাইন পেন্টিংও বলা হয়।

*পাপিয়ের-মাশ দেখুন

মিক্সড মেথড (Mixed Method)

রং চাপানোর একটা কৌশল। যাতে টেম্পারায় আঁকা অন্তর্চিত্রের ওপর ফাইনাল টাচ দেওয়া বা গ্লেজিং করা হয় তেল রঙের সাহায্যে। পঞ্চদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে উত্তর ইউরোপের শিল্পীরা বিশেষ করে হুবার্ট, জন ভ্যান আইক প্রমুখ এই কৌশল অবলম্বন করতেন। তাঁরা পাতলা করে জল রং (টেম্পারা) মাধ্যমের বর্ণস্তরের ওপর স্বচ্ছ ও পাতলা তেল রং ও রেজিনের গ্লেজ লাগাতেন।

মিডিয়াম (Medium)

শিল্পকলার ক্ষেত্রে মিডিয়াম বা বহুবচনে মিডিয়া অনেকগুলি অর্থে ব্যবহার করা হয়। যেমন— ১. যেকোনো ধরনের রঙের ক্ষেত্রে মিডিয়াম হল এমন একটি তরল যার মধ্যে সেই রঙে ব্যবহৃত রঞ্জকের (পিগমেন্ট) গুঁড়ো ভেসে থাকে। যেমন তেল রঙের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে লিনসিড অয়েল। ২. মিডিয়াম রঞ্জকের গুঁড়োকে সংঘবদ্ধ করে রাখে। যেমন জল রঙের ক্ষেত্রে গঁদের আঠা, টেম্পারার ক্ষেত্রে ডিমের কুসুম। ৩. শিল্পীর শিল্পকর্মে ব্যবহৃত মূল উপাদান যেমন জল রং, তেল রং, মাটি, প্লাস্টার, পাথর, লোহা, প্লেক্সিগ্লাস ইত্যাদি। ৪. অনেক সময় ব্যবহৃত রং বা উপাদানে গুণগত কিছু বৈশিষ্ট্য যোগ করার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত তরল বা অন্য পদার্থ। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে তেল রঙের ক্ষেত্রে ড্রায়ার বা শুষ্ককারক, জল রঙের ক্ষেত্রে গ্লিসারিন ইত্যাদি।

মিথুন

স্ত্রী-পুরুষের মিলন। মনুষ্যেতর প্রাণীর ক্ষেত্রেও হতে পারে, যেমন 'হংসমিথুন'। ভারতের অসংখ্য মন্দিরের গায়ে নারী-পুরুষের যুগল মূর্তি দেখতে পাওয়া যাব। প্রাচীনতার কারণে এইসব মূর্তির শিল্পসুষমা ক্ষয়ে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রে শুধুমাত্র কাঠামোগত রূপটুকুই রয়ে গেছে।

সৃষ্টির আদিতে আছে প্রকৃতির সঙ্গে পুরুষের মিলন। এরই অভিব্যক্তি ঘটেছে শিল্পী ভাস্করদের হাতে সৃষ্ট নরনারীর যুগল মূর্তির নানা ভঙ্গি, মুদ্রা ও শৃঙ্গার দৃশ্যে। ধর্ম এবং ধর্ম নিরপেক্ষতা নির্বিশেষে এর অস্তিত্ব কমবেশি আজও প্রবহমান।

মিথুন শব্দের আভিধানিক অর্থও হল 'স্ত্রীপুংসয়োর্যুগ্মম' অর্থাৎ যুগল। নরনারীর যুগল মূর্তি মাত্রই মিথুন দৃশ্যের অবতারণা করে। পাশাপাশি দাঁড়ানো, আলিঙ্গনাবদ্ধ, পারস্পরিক যৌনাঙ্গ স্পৃষ্ট, রতিক্রিয়ার দৃশ্যমণ্ডিত মিথুন

মূর্তি নানা ভঙ্গিতে বিভিন্ন প্রাচীন মন্দিরের গায়ে উৎকীর্ণ করা হয়েছিল। রুচি, শালীনতার দৃষ্টিভঙ্গি যুগে যুগে পালটেছে। স্বভাবতই আজকের যুগে তার রূপ ও আঙ্গিকের পরিবর্তন ঘটেছে। তাই প্রাচীন মন্দিরের গায়ে উৎকীর্ণ এইসব মিথুনমূর্তি দেখে জনমানসে মিশ্র প্রতিক্রিয়া ও অনুভূতি লক্ষ করা যায়। যদিও প্রাচীন মিথ, পুরাকাহিনির মধ্যে শুরু থেকেই যৌনতার পূর্ণ অস্তিত্ব ছিল। দর্শনে, শিল্পে, সাহিত্যে, পুরাতত্ত্বে, ধর্মাচরণে যৌনতার স্পষ্ট প্রতিফলন ঘটেছে। ঋগ্‌বেদে বলা হয়েছে সর্বপ্রথম কামনার আবির্ভাব হয়েছিল ('কামস্তদগ্রে সমবর্ত্রতাধি' দশমমণ্ডল, ১২৯ সূক্ত)। ভারতীয় ভাস্কর্যের মিথুন দৃশ্যের অতুলনীয় নমুনা দেখা যায় অজন্তার ১৯ নং গুহার নারী-পরিবৃত নাগরাজ, খণ্ডগিরির গণেশ পর্বতগুহায় উৎকীর্ণ দুই নারীর সঙ্গে লীলারত উপবিষ্ট অভিজাত পুরুষ, দেওগড়ের মন্দিরের স্তম্ভে ও প্রবেশ দ্বারে উৎকীর্ণ যুগলমূর্তি, ভুবনেশ্বরের



নং ২৪৮. মিথুন মূর্তি, কার্লে গুহার চৈত্য হলের প্রবেশ দ্বার। খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীর শেষ থেকে দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথম পাদ। অন্ধ্র।

পরশুরামের মন্দিরের দৃঢ় আলিঙ্গনাবদ্ধ মহারাজ, লীলাসনে উপবিষ্ট শিবদুর্গা, কোণারকের সূর্যমন্দিরে এবং খাজুরাহের কন্দর্প মহাদেব মন্দিরের দেয়ালে উৎকীর্ণ শৃঙ্গার নিমগ্ন যুগল প্রভৃতি মূর্তিতে।

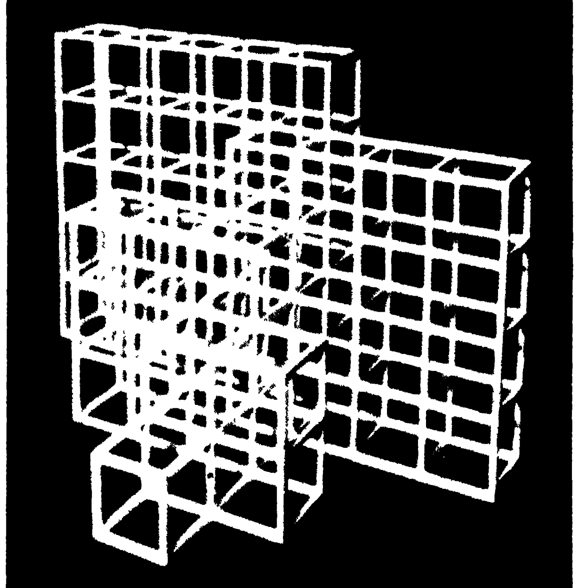
খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত মিথুনমূর্তিগুলি শুধুমাত্র নরনারীর পরস্পর সন্নিবদ্ধ ভঙ্গিতে রূপায়িত হয়েছিল যা লাবণ্যময় সৌন্দর্যের পরিচায়ক। আবার সপ্তম থেকে নবম শতাব্দীর মধ্যে রূপায়িত হয়েছিল মুখ্যত দৃঢ় আলিঙ্গনাবদ্ধ ভঙ্গির মূর্তি। ইলোরা, অজন্তা, এলিফ্যান্টায় নানা যুগল মূর্তিতে এর দৃষ্টান্ত লক্ষ করা যায়। নবম শতাব্দীর শেষভাগ থেকে মন্দিরের গায়ে শৃঙ্গার ক্রিয়ার বাস্তব দৃশ্য উৎকীর্ণ হতে দেখা যায়। এসবের মধ্যে বাদামি (৪নং গুহা), খাজুরাহোর পার্শ্বনাথ, জগদম্বা, বিশ্বনাথ, মাতঙ্গেশ্বর ও কন্দর্প মহাদেব মন্দির, ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ, মুক্তেশ্বর, ব্রহ্মেশ্বর, রাজারানি, পুরীর জগন্নাথ, ইলোরার কৈলাশ, কোণারকের সূর্যমন্দির, আবু পাহাড়ের তেজপাল, কয়লা পাহাড়ের হরসিদ্ধমাতা, কাঞ্চীপুরম, ভেল্লোরের মন্দির, কাঠমান্ডুর পশুপতিনাথ মন্দির উল্লেখযোগ্য। এইসময় থেকে মন্দিরের গায়ে যৌন দৃশ্য উৎকীর্ণ করা একটা আবশ্যিক প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তবে শিল্প-নান্দনিকতার বিচারে দশম ও একাদশ শতাব্দীর মন্দিরগুলিতে উৎকীর্ণ মিথুনদৃশ্যগুলি ভাস্কর্যগত উৎকর্ষ লাভ করেছিল। পরের শতাব্দীগুলিতে মিথুনমূর্তিসমূহে স্থূল রুচির লক্ষণ দেখা যায়। মন্দিরের গায়ে মিথুনমূর্তি তথা যৌন দৃশ্য উৎকীর্ণ করার পেছনে নানা মত আছে। যেমন, পুরুষ-নারীর মিলনেই জগৎ সৃষ্টির সার্থকতা. সেই মিলন শুধু মনের নয় দেহেরও। মানবাত্মা ও পরমাত্মার অবিচ্ছেদ্য মিলনের ঈপ্সা পরিপূরণের বিষয়টিই মিথুনমূর্তিতে প্রতিফলিত। ঈশ্বরের সামীপ্য পেতে পরীক্ষার দ্বারা চিত্তের শুদ্ধি অর্জন করতে হবে। গোপনতম মোহকে অতিক্রম করার আত্মপরীক্ষার উদ্দেশ্যেই মিথুন দৃশ্যের উৎকিরণ। যৌনদৃশ্য খচিত হয়েছিল অপদেবতা, দুষ্কৃতকারীদের হাত থেকে মন্দিরকে বাঁচানোর রক্ষাকবচ হিসাবে। হ্যাভেলের মতে দাক্ষিণাত্য থেকেই এই রীতির উদ্ভব। কামকলাও শিক্ষণীয় বিষয়। কামকলার দৃশ্যের মাধ্যমে যৌনশিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছিল। মন্দিরগুলি ছিল

লোকশিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রচারের কেন্দ্র। নবম থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত ভারতে তান্ত্রিকতার ব্যাপক প্রসার ঘটেছিল। উৎকীর্ণ মিথুনমূর্তিগুলি ছিল এই তান্ত্রিকতার ও কাপালিক ভ্রষ্টাচারের নিদর্শন। মন্দিরের উৎকট যৌনদৃশ্যাবলি উৎকীর্ণ হয়েছে বলা যেতে পারে নবম শতাব্দী থেকেই।

মিনিমাল আর্ট (Minimal Art)

মিনিমাল আর্ট বা মিনিমালিজ্‌ম শব্দটির ব্যবহার প্রাথমিক-ভাবে শুরু হয়েছিল নিউইয়র্কে রবার্ট মরিস, ড্যান ফ্ল্যাভিন, ডোনাল্ড জাড প্রমুখের মণ্ডনগুণবিহীন ভাস্কর্যের বর্ণনা করতে গিয়ে। অবশ্য ১৯২০-র শেষেই জন্মসূত্রে রুশীয় মার্কিন চিত্রশিল্পী জন গ্রাহাম মিনিমালিস্ট আন্দোলন শুরু করেছিলেন। তবে পরিভাষা হিসেবে শব্দটির প্রথম প্রকাশ ঘটে বিশিষ্ট মার্কিন দার্শনিক রিচার্ড ওলহেইমের ১৯৬৫ সালে লেখা একটি রচনার শিরোনামে। মিনিমাল আর্ট পপ আর্টের সমসাময়িক অগ্রগতি। মার্সেল দুসঁপের 'রেডিমেড', রসখেনবার্গের 'কম্বাইন পেন্টিং' এবং রেনহার্ডটের 'ব্ল্যাকপেন্টিং' নিয়ে ওলহেইম বলেছিলেন— 'তাঁদের কাজে শিল্পআধেয় অতি সামান্য (minimal)'।

যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে শিল্পকলাকে ঐতিহ্যের বন্ধন থেকে মুক্ত করার লক্ষ্য নিয়ে সৃষ্ট শিল্পের ধারণার পেছনে মৌল নীতিকেই বেশি বেশি করে কেন্দ্রীভূত করার প্রবণতা



নং ২৪৯. লেউইট : কিউব স্ট্রাকচার। ১৯৭২।

থেকে মিলিমালিজ্‌মের বিকাশ। পপ আর্টে ছিল রং ও মূর্তি বা ছবির প্রাধান্য। অন্যদিকে মিনিমাল আর্টে রং ও মূর্তি বা ছবি ছিল প্রায় অনুপস্থিত। ছবিকে 'কুলিং' (Cooling) করার জন্য মিনিমাল আর্ট বাস্তবের রূপগত ও রঙের প্রভাবকে কমিয়ে ন্যূনতম পর্যায়ে আনতে জ্যামিতিক রূপ এবং নিরপেক্ষ রং ব্যবহার করল, অথবা এমন সব উপাদান বেছে নিল যা নগরের জমকালো অলংকরণ বা চড়া রঙের সঙ্গে গুলিয়ে না যায়। প্রথম দিকে মিনিমালিজ্‌ম খুব সংগঠিত ছিল না। এই শিল্পকে সমালোচকরা অনেকগুলো তকমা দিয়ে চিহ্নিত করতেন। যেমন প্রাইমারি স্ট্রাকচারস, ইউনিটারি অবজেক্টস, এ বি সি আর্ট এবং কুল আর্ট। যদিও শিল্পীরা নেতিবাচক প্রয়োগের জন্য এইসব তকমা পছন্দ করতেন না কারণ তাঁদের শিল্পকর্ম ছিল খুবই সরল এবং আধেয় বিহীন। মিনিমাল শিল্পীরা রাশিয়ান কনস্ট্রাক্টিভিস্টস সুপ্রিম্যাটিস্টদের কাজের দিকে খুবই মনোযোগী ছিলেন বিশেষ করে যাদের শিল্পকর্ম অকপটভাবে বিমূর্ত। এদিক থেকে সুপ্রিম্যাটিস্ট শিল্পী কাশিমির মালেভিচের 'ব্ল্যাক স্কোয়ার' কাজটি এর উদ্দেশ্যমূলক অনুপকারিতা এবং অসাদৃশ্যবাদীতার কারণে এই নতুন শিল্পপ্রবণতার একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক। স্বভাবতই মিনিমাল ভাস্কর্য চরিত্রগত দিক ছিল সমকোণী এবং ঘনকসদৃশ রূপ যা সাধারণভাবে সারিবদ্ধভাবে সাজানো হত। মিনিমাল ভাস্কর্য বেশিরভাগ সময়ই কারখানার দ্রব্য ব্যবহার করে নির্মাণ পদ্ধতিতে সৃষ্ট। তবে মিনিমাল শিল্পীরা সৃজনের উৎকর্ষের উন্নতির জন্য না হলেও এমন কিছু প্রযুক্তিগত দ্রব্য ব্যবহার করেছিলেন যাতে দেখানো যায় যে এসবও নান্দনিক উপাদান হয়ে উঠতে পারে। তাঁদের নন্দনতাত্ত্বিক বর্ণনা ছিল বাধাহীন যাতে সহজেই নিয়মশৃঙ্খলা সহ শিল্পের ন্যূনতম (minimal) ভাষাকে বোঝা যায়। অতি সামান্য, অপরিহার্য, নিজের অন্তরছন্দের প্রতি একাগ্রতা, নিজস্ব গঠনমূলক শক্তি, দর্শকের প্রতি নির্লিপ্ততা, একমাত্র লক্ষ্য শিল্পকর্মকে নয়নাভিরাম হতে হবে। এই হল মিনিমাল আর্টের চরিত্র ধর্ম।

মিনিমাল শিল্পী জাড নিউইয়র্কের ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন এবং ইতিহাস নিয়ে পড়াশুনো করেছিলেন, তিনি ছিলেন মিনিমাল আর্টের একজন মননশীল

টীকাভাষ্যকার। অন্যদিকে রবার্ট মরিসের দেওয়া তাত্ত্বিক ধারণা বেশিরভাগ বিশিষ্ট মিনিমাল শিল্পীই গ্রহণ করেছিলেন। মিনিমাল শিল্পীরা তাঁদের মৌলিক রূপভাষা গড়ে তুলেছিলেন বিমূর্ত প্রকাশবাদের প্রতিক্রিয়ায়। মিনিমাল আর্টকেই একমাত্র প্রকৃত মার্কিন শিল্প হিসাবে ধরা হয় যার কোনো ইউরোপীয় প্রতিরূপ নেই। পরবর্তীকালে অবশ্য বিশ্বের নানা প্রান্তে এই শিল্পের কিছু প্রভাব গড়ে উঠেছে।

মিনিয়েচার (Miniature)

খুব ছোটো আকারের নিখুঁতভাবে ফিনিশ করা ছবি অথবা ড্রয়িং। সাধারণভাবে প্রতিকৃতি তবে দৃশ্যচিত্র এবং ল্যান্ডস্কেপও হতে পারে। মিনিয়েচার জল রং, গুয়াশ এবং টেম্পারাতে আঁকা হয় তবে তেল রঙে আঁকার দৃষ্টান্তও আছে।

মধ্যযুগে ম্যানাস্ক্রিপ্ট বা পাণ্ডুলিপির আদি অক্ষরটির অলংকরণ থেকে মিনিয়েচার শব্দটির উদ্ভব। একাজে ব্যবহার করা হত 'অতি সামান্য' (minimum) রেডলেড বা লেড অক্সাইড থেকে তৈরি রঞ্জক। পরে ১৫০০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ মিনিয়েচার পাণ্ডুলিপি অলংকরণের থেকে পৃথক হয়ে একটি জনপ্রিয় শিল্পআঙ্গিক হিসাবে গড়ে ওঠে। কনিষ্ঠ হানস হোলবাইনের ছবি মিনিয়েচার পেন্টিং, বিশেষ করে প্রতিকৃতি অঙ্কনকে, ভীষণভাবে প্রভাবিত করেছিল। মিনিয়েচার ছবি বেশিরভাগ সময় কাগজ, চামড়া, কাঠ, তামার পাত ও অন্যান্য পট ছাড়াও হাতির দাঁতের ওপর উত্তল আকারেও আঁকা হত। মিনিয়েচার ছবি উঁচু দেয়ালে টাঙিয়ে রাখার জন্য নয় বরং চোখের কাছে ধরে খুঁটিয়ে দেখার জন্যই যেন আঁকা, এতটাই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম এর কাজ।

ভারতে ছবির পরিচয়ের দুটি উৎসের অন্যতমটি হল মিনিয়েচার। এক্ষেত্রে মিনিয়েচার দু-রকমের। রাজপুত ও মুঘল। রাজপুত রাজাদের পৃষ্ঠপোষণায় রাজপুত মিনিয়েচার চিত্রের উদ্ভব আর মুঘল রাজদরবারে জন্ম মুঘল মিনিয়েচার চিত্রের। ধর্মের দিক থেকে রাজপুত হল হিন্দু এবং মুঘল হল মুসলমান। তবে ক্ষুদ্রকার ছবির এই রীতি পারস্য থেকেই বিভিন্ন স্থানে গেছে। আবার হাতির দাঁতের ওপর যে মিনিয়েচার আমাদের দেশে আঁকা হয়েছে তার উৎস ইউরোপীয় মিনিয়েচার।

ছবি নং ১৮১ পৃ. ৩৬৫

পারস্য মিনিয়েচারকে নীতিগত দিক থেকে তিনটে

ঐতিহাসিক পর্বে ভাগ করা যায়। যেমন মংগল, তৈমুরিজ এবং সাফাভিদ। ভারতবর্ষের অনেক অঞ্চলের ছবিই মিনিয়েচার রীতিতে আঁকা। অর্থাৎ এসব ছবির পরিসর ক্ষুদ্র। যেমন, রাজপুত চিত্রকলা, কাংড়া চিত্রকলা, বাশোলি চিত্রকলা, গুজরাটি চিত্রকলা, পাহাড়ি প্রভৃতি। যদিও এদের মধ্যে বিষয় ও আঙ্গিকের অনেক পার্থক্য আছে। দক্ষিণ ভারতেও মিনিয়েচার রীতিতে ছবি আঁকা হয়েছে। বিংশ শতাব্দীতে পৃথিবীর নানান জায়গায় মিনিয়েচার শিল্পীদের বেশ কয়েকটি সমিতি গড়ে উঠেছে। মিনিয়েচার নিয়ে এইসব সমিতিগুলির প্রত্যেকের নিজ নিজ রীতিনীতি আছে। যার মধ্যে সবচেয়ে পুরোনো হল ১৯৩১ সালে প্রতিষ্ঠিত 'দি মিনিয়েচার পেন্টারস্ স্কাল্পটরস্ অ্যান্ড গ্রেভারস্ সোসাইটি অফ ওয়াশিংটন. ডি. সি.'। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন অ্যালিন উইলিয়ম। যিনি তার আগে রয়াল মিনিয়েচার সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই সোসাইটি প্রদর্শনীর জন্য ২৫ বর্গ সেন্টিমিটারের বড়ো মিনিয়েচার ছবি গ্রহণ করত না।

মুখোশ

ইংরেজিতে মাস্ক (Mask)। আভিধানিক অর্থে মুখের সমগ্র বা একাংশের আবরণ। সাধারণভাবে ছদ্মবেশ বা সুরক্ষা দুটো উদ্দেশ্যেই হতে পারে। এছাড়াও বহু অনুষ্ঠান, সংস্কার, প্রথা এবং অধ্যাত্মিক কারণেও মুখোশ ব্যবহারের ইতিহাস আছে। যেমন নাটক বা অভিনয়ের ক্ষেত্রে চরিত্র চিত্রণের স্বার্থে, মুখের শ্রীহীনতাকে ঢাকতে, জাদু বিশ্বাসের কারণে। মুখোশ তৈরির ইতিহাস যেমন বহু প্রাচীন তেমনি কার্যকারিতার পাশাপাশি মুখোশের মধ্যে শিল্পগত সৌন্দর্যের দিকটিও বৈশিষ্ট্য লাভ করেছে।

প্রাচীন রোমে এবং ইউরোপের অন্যত্র রাজা ও বিশিষ্টদের মৃতদেহের মুখে মোম ঢালাই করে ছাপ-মুখোশ তৈরির প্রথা ছিল। মৃতব্যক্তির মুখের আদলে এই মুখোশ তৈরি করা হত। একে বলা হত 'ডেথ মাস্ক'। এই 'ডেথ মাস্ক' অন্য একজন 'অ্যাক্টর'-এর মুখের ওপর সাজিয়ে সমাধি পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হত। গ্রিক পুরাণের ডায়নিসিস প্রকৃত অর্থে 'মুখোশ দেবতা'। গ্রিক চিত্রকলা ও মন্দির স্থাপত্যে ডায়নিসিসের দাড়িওয়ালা মুখোশের বহু নমুনা দেখতে পাওয়া যায়। মেক্সিকো অঞ্চলে বিকশিত প্রাচীন মায়া সভ্যতার বিকট ও ভয়াল সব মুখোশ ছড়িয়ে আছে

নং ২৫০. পুরুলিয়ার ছৌ-এর মুখোশ।



ওদেশের প্রাচীন মন্দিরে দেয়ালে, কড়িবরগায়। মায়া রাজাদের আমলে রাজ অভিষেকের সময় যুবরাজ জাগুয়ারের মুখোশ পরে প্রবীণ রাজার হাত থেকে রাজদায়িত্ব গ্রহণ করতেন। মেক্সিকোতে সৎকারকালীন মুখোশ মূল্যবান জেড পাথরে তৈরি হত। অ্যাজটেকদের বসন্ত ঋতু এবং উদ্ভিদদেবতা থেপেটোটেকের মুখোশ হল সোনার। সারা পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র আদিম জনগোষ্ঠীর সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ধর্মীয় জীবনে নানা সাজগোজের কাজে 'মিথ্যে মুখ' অর্থাৎ মুখোশের ব্যবহার হত। এইসব মুখোশ মূলত মানুষের রূপ বা পশুপাখির আদলে তৈরি। এর একটা কারণ ছিল যে প্রাগৈতিহাসিক যুগে মানুষ যখন শিকার করে জীবন যাপন করত তখন বনের পশুকে ভয় দেখিয়ে বা রূপ দেখিয়ে বশীকরণ করার যে বুদ্ধি এঁটেছিল তার থেকেই মুখোশের উদ্ভব। পুরোনো প্রস্তরযুগে আঁকা ফ্রান্সের ত্রোয়িসফ্রেরেস গুহাচিত্রের কিম্ভূতকিমাকার পশু মুখোশ- ধারীকে মুখোশ ব্যবহারের সবচেয়ে প্রাচীন নিদর্শন বলে মনে করা হয়। এতে হরিণের মাথা, প্যাঁচার মুখ, নেকড়ের দুটো কান, ছাগলের দাড়ি, ভালুকের থাবা আর ঘোড়ার লেজ রয়েছে।

সাধারণভাবে মুখোশের দেশ বলতে বোঝায় আফ্রিকা মহাদেশকে। এই মহাদেশের বাগা, বাম্বারা, মেন্দি, ডান থেকে চম্বা, মুঙ্গি ইবিয়ো প্রভৃতি আদিম জাতির বিচিত্র সব মুখোশ আদিবাসীদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মূল্যবান সম্পদ। লক্ষণীয় হল সারা পৃথিবীতে মুখোশে প্রাধান্য হল পুরুষ রূপের। কোথাও কোথাও মুখোশ ব্যবহারের সামাজিক

অনুশাসন বজায় রাখতে সমিতিও রয়েছে যেমন 'ফলস্ ফেস সোসাইটি'।

জাপানে মুখোশ ব্যবহার শুরু হয় সপ্তম শতাব্দীতে। বৌদ্ধদের ধর্মীয় উৎসবে ব্যবহৃত এক ধরনের মুখোশের নাম ছিল 'গিগাকু'। চিনে কাঠের তৈরি একজাতীয় মুখোশকে বলা হত 'মুমিয়েন।'

ভারতবর্ষেরও নানা অঞ্চলে নানা ধরনের মুখোশ ও তার ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের বৈচিত্র্যময় লোকসংস্কৃতির ও তার অজস্র রূপের মুখোশ শিল্পকলার সমৃদ্ধ অংশ। এসবের মধ্যে ছৌ নাচের মুখোশ যা মূলত তৈরি হয় আঠায় ভেজানো দোমড়ানো কাগজ দিয়ে এবং পরে রং, রাংতা ও চুমকি দিয়ে সাজানো হয়। পশ্চিম দিনাজপুরের মোথা নাচের কাঠের মুখোশ, বিষ্ণুপুরের রাবণকাটা নাচের কাঠের তৈরি মুখোশ, গম্ভীরানাচের মুখোশ, যা প্রথমদিকে কাঠে তৈরি হলেও এখন টিন, পিজবোর্ড ইত্যাদি দিয়ে তৈরি হয়। জলপাইগুড়ির মুখাখেলের মুখোশ উল্লেখযোগ্য।

মুঘল আর্ট

মূলত মুঘল দরবারি শিল্প। ষোড়শ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত যা পল্লবিত ছিল। মুঘল শিল্পকলার আঙ্গিকগত উৎস পারস্যে কিন্তু বৈশিষ্ট্যলাভ ভারতবর্ষে। মুঘল আমলে সম্রাট হুমায়ুন পারস্যের শিল্পীদের এনে দরবারে চিত্রকলা চর্চার কাজে লাগালেও মুঘল শিল্পরীতির ভিতি স্থাপিত হয় আকবর বাদশার আমলেই। তিনি তাঁর দরবারে রাজপুতরীতির শিল্পী বসাওয়ন, কেশুদাস, দাসওয়ান্ত-এর সঙ্গে পারস্যের মীর সইদ আলী, আবদুস সামাদ, ফারুককে একসঙ্গে কাজে লাগান। ফলে দেশজ বাজপুত রীতির লৌকিক চরিত্র এবং ইরানের সাফাবিদ দরবারি রীতির উপাদান মিলে নতুন ধরনের শিল্পশৈলীর সৃষ্টি হয় যা মুঘল মিনিয়েচার নামে আখ্যায়িত। বাবর হুমায়ুনের নির্দেশমতো দস্তাঁ-ই-আমীর-হামজা মুরাক্কা বা অ্যালবামের কাজ শেষ করেন। এই অ্যালবামের নতুন নাম দেন হামজানামা। ১২ খণ্ডে ১৪০০ ছবি সম্বলিত এই অ্যালবামের প্রথম ছবি ১৫৬২-তে আঁকা। এই আলবামের প্রথম দিকের ছবির সঙ্গে পরের দিকের ছবিকে মিলিয়ে দেখলেই বোঝা যায় যে পারসিক রীতির ছবি ধীরে ধীরে



নং ২৫১. বেদি আজ-জমান মির্জার সাথে সম্রাট বাবর। ২৩ X ১৪ সেমি.। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর সংযোগকাল।

পালটে নতুন চরিত্র লাভ করেছে যা আঙ্গিকের দিক থেকে স্বাধীন। হামজানামা তুলট কাপড়ের ওপরে আঁকা।

হুমায়ুন এবং আকবর পারস্যের শিল্পী আবদুস সামাদের কাছে চিত্রকলা শিখেছিলেন। ফলে আকবরের নিজেরও ছবি আঁকায় উৎসাহ ছিল। মুসলমান ধর্মনিষ্ঠরা ছবি পছন্দ করতেন না। এ প্রসঙ্গে আকবরের মতামত খুবই গুরুত্বপূর্ণ। 'অনেকেই আছে, যাহারা চিত্র ঘৃণা করে, এসব লোকদের আমি পছন্দ করি না... ধর্মের গোঁড়া অনুসরণকারীরা চিত্রকলার উপর শত্রুভাবাপন্ন। তাহাদের চক্ষু এখন সত্যকে দেখুক।' (উদ্ধৃতি: শিল্পে ভারত ও বহির্ভারত: মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত)

হুমায়ুনের রাজত্বে মুঘল আর্ট মুখ্যত পারস্যের থেকে আনা শিল্পীদের ওপর নির্ভরশীল হলেও আকবরের রাজত্বকালে আকবর দেশি শিল্পীদের তৈরি করে নিয়েছিলেন। জাহাঙ্গীর সম্পূর্ণই নির্ভর করেছিলেন ভারতীয় শিল্পীদের ওপর। ১৫৭০ থেকে ১৫৮৫ পর্যন্ত আকবরের ফতেপুর

সিক্রিতে বসবাসকালীন সময়ই 'আকবর স্কুল অব পেন্টিং' এর শ্রেষ্ঠকাল। বলা যায় আগে ভারতবর্ষে টেম্পারা প্রথায় দেয়ালে ছবি আঁকা হত। কিন্তু পারস্যের শিল্পীদের কাছে ভারতীয় কারিগরশিল্পীরা উজ্জ্বল রং, আঠা বা মিডিয়াম সূক্ষ্ম তুলি ব্যবহার ও তৈরি করা শিখল। এসব ছবি আঁকা হত কাগজে। এই কাগজ প্রথমে পারস্য থেকে আনা হলেও পরে মুঘল সম্রাটরা ভারতেই কাগজের কারখানা স্থাপন করেছিলেন। আকবরের আমলে অনেকগুলি অ্যালবাম তৈরি হয়েছিল। যেমন তুলট কাপড়ের ওপর চিত্রিত তুতিনামা (১৫৮০-৮৫) এবং হামজানামা (১৫৬২-৭৭) কাপড়ের ওপর আঁকা বাবরনামা (কাজ শেষ হয় আকবরের আমলে ১৫৮৯-তে।), আকবরনামা (আনুমানিক ১৫৯০), আকবর ও যুবরাজ সেলিম অর্থাৎ জাহাঙ্গীরের আঁকা হরিবংশ (আনুমানিক ১৫৯০) এবং রাজমনামা (মহাভারতের গল্প, আনুমানিক ১৫৯৮)। জাহাঙ্গীরের রাজত্বে মুঘলচিত্র চরম উৎকর্ষ লাভ করে। সেই সঙ্গে মুঘল চিত্র তার ইন্দো-পারসিয়ান চরিত্রের বদলে রাজপুতশৈলীর সঙ্গে মিশে একটি নিজস্ববৈশিষ্ট্য লাভ করে। জাহাঙ্গীরের আমলের মুঘল আর্টে শিকারের দৃশ্য এবং ফুল, পশুপাখির ছবি গুরুত্ব পেয়েছিল। এই সময়েই মুঘলচিত্রে ইউরোপীয় আর্টের প্রভাবজাত পারস্পেকটিভ ও ল্যান্ডস্কেপের ব্যবহার ঘটতে থাকে এবং কারও কারও মতে খ্রিস্টধর্মের বিষয়বস্তুরও অনুপ্রবেশ ঘটে। শাহজাহানের রাজত্বে চিত্রকলার চেয়ে বেশি গুরুত্ব পায় স্থাপত্য কলা। শাহজাহানের সময় দিল্লি দুর্গ, দেওয়ান-ই-আম, দেওয়ান-ই-খাস, মোতি মসজিদ, তাজমহল তার শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত। শাহজাহান বড়ো কয়েকজন শিল্পীকে রেখে বাকিদের কাজ থেকে ছাড়িয়ে দেন। কর্মচ্যুত শিল্পীরা অমাত্য ও সচিবদের অধীনে কাজ নেয়। ফলে মুঘল চিত্র দরবারের বাইরেও ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ার সুযোগ পায়। আওরংজেব ধর্মের দিক থেকে একটু গোঁড়া ছিলেন বলে তাঁর রাজত্বে চিত্রকলা চর্চা ক্রমশ হ্রাস পায়।

মুঘল চিত্রের শ্রেষ্ঠ কীর্তি হল প্রতিকৃতি অঙ্কন। সাধারণভাবে সব প্রতিকৃতিই প্রোফাইল ঢঙে অর্থাৎ একপেশে করে আঁকা। তবে এতে দেহ আঁকার ক্ষেত্রে অনেক সময়ই অতি প্রাচীন রীতিকে গ্রহণ করা হয়েছে ঠিক যেমন আসিরীয় ছবিতে দেখা যায়। তবে প্রতিকৃতিগুলির ভাব-ব্যঞ্জনায়

কোনো ঘাটতি নেই। মুঘল আর্টের আর একটি দিক হল এর বর্ডার। এইসব বর্ডারে স্থান পেয়েছে ফুল, পাতা, লতা, পাখি, পশু, এমনকি মানুষের শরীরও। জাহাঙ্গীরের সময়ই এর চরম বিকাশ ঘটে। মুঘল চিত্রকলার এক একটি ছবি তৈরিতে বেশ কয়েকজন শিল্পী অংশ নিতেন। পার্সি রীতিতে যেমন ছিল। কেউ আঁকতেন প্রতিকৃতি, কেউ আঁকতেন বর্ডার, কেউ করতেন অন্যান্য অলংকরণ। এইজন্য পার্সি ব্রাউন মুঘল আর্টকে ফাইন আর্টের বদলে কারুকলা বলা সংগত মনে করেছিলেন ('Such a system of production seems to suggest that the painting of Mughal pictures was more of a craft than a fine art.') আওরংজেবের মৃত্যুর পর ক্রমশ মুঘল সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়ে এবং ধীরে ধীরে বিভিন্ন প্রদেশে স্বাধীন রাজত্ব গড়ে উঠতে থাকে। এই সময় মুঘল রীতির শিল্প নানা অঞ্চলে শাখা বিস্তার করে। তবে তা স্বাভাবিক ভাবেই একটু আলাদা। এইসব শাখা-প্রশাখাকে 'কলম' বলে অবিহিত করা হয়। এর মধ্যে হায়দরাবাদি কলম ও লক্ষ্ণৌ কলম উল্লেখযোগ্য।

মুদ্রা

শিল্পকলার আলোচনায় মুদ্রা শব্দটি দুটো অর্থে ব্যবহৃত হয়। প্রথমত মুদ্রা হল রস ও ভাব প্রকাশের একটা ভঙ্গি। নৃত্যকলার এই আঙ্গিক মূর্তিকলায় ব্যবহৃত হয়েছে। মানুষের অন্তরের ভাব ও রসকে জ্ঞাপন করার জন্য হাতের মুদ্রার প্রয়োগ ও সঞ্চালন ঘটানো হয়। হাতের আঙুল, পাতাকে নানারকমভাবে প্রসারিত ও কুঞ্চিত করে মুদ্রার সৃষ্টি করা হয়। এক এক ধরনের মুদ্রা এক এক ধরনের বিষয় ও ভাবকে প্রকাশ করে। যেমন 'পতাক' মুদ্রা আশীর্বাদ, প্রসাদ, অঙ্গরাগ, প্রলাপ ইত্যাদি বোঝানোর জন্য প্রয়োগ করা হয়।

মুদ্রার আর-একটি অর্থ হল প্রত্নলেখ। এই মুদ্রা এক ধরনের ঐতিহাসিক দলিল। স্বভাবতই শিল্পকলা উপাদানের ক্ষেত্রে এটিও গুরুত্বপূর্ণ। মুদ্রায় উৎকীর্ণ দেবদেবীসহ শাসকদের মূর্তি ও বিভিন্ন চিহ্ন নানা সাক্ষ্য বহন করে। খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে অ্যাথেনসের মানুষেরা রুপোর মুদ্রা নির্মাণ করতে শেখে এবং সমগ্র গ্রিসে সেই মুদ্রা প্রচলিত হয়। মুদ্রার একদিকে খোদিত ছিল দেবী অ্যাথেনার মস্তক ও অন্যপিঠে ছিল দেবীর বাহন পাখি। ভারতবর্ষেও



নং ২৫২. লিসিম্যাচাস প্রবর্তিত রৌপ্য মুদ্রায় আলেকজান্দারের প্রতিকৃতি। ব্যাস ৩ সেমি.।


নং ২৫৩. কনিষ্কের স্বর্ণমুদ্রায় বুদ্ধের মূর্তি। খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীর শেষ পাদ।

প্রাচীনকালের নানারকম মুদ্রার সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। ভারতবর্ষে প্রথম মুদ্রার পরিচয় পাওয়া যায় আনুমানিক পঞ্চম খ্রিস্টপূর্বাব্দে। তারও আগে মুদ্রার প্রচলন থাকলেও তার আবিষ্কারের তথ্য নেই। রুপোর তৈরি এই মুদ্রা পাওয়া গেছে উত্তর-পশ্চিম ভারতের তক্ষশীলা ও সংলগ্ন অঞ্চলে। এর মধ্যে অনেক মুদ্রা শিল্পের দিক থেকে মৌলিক এবং কিছু মুদ্রা অন্য সাম্রাজ্যের প্রভাবসম্পন্ন। রুপো ছাড়া তামা দিয়েও এই মুদ্রা তৈরি হত। এসব মুদ্রা চৌকো বা আয়তাকার। কোণগুলি কাটাকাটা। খুব হালকা ভাবে গাছপালা, হাতি, মাছ, ষাঁড় ইত্যাদির ছাপ থাকত। তামার মুদ্রাকে বলা হত কার্ষাপণ আর রুপোর মুদ্রাকে বলা হত ধরন বা পুরান। কোনো কোনো মুদ্রাতে সমকালীন সংস্কৃতির নানা উপাদানের সন্ধান পাওয়া যায়। যেমন, সমুদ্রগুপ্তের বেশিরভাগ মুদ্রায় সমুদ্রগুপ্ত যোদ্ধার বেশে সজ্জিত আবার কিছু মুদ্রায় বীণাবাদনরত। অর্থাৎ এই বীণা বাদন হল এলাহাবাদ প্রশস্তিতে বর্ণিত গুণাবলির দৃষ্টান্ত। বাংলাতেও মুদ্রার প্রচলন ছিল। বাংলায় বেশি পাওয়া গেছে গুপ্তযুগের সোনা ও রুপোর মুদ্রা। চন্দ্রকেতুগড়েও প্রচুর মুদ্রা পাওয়া গেছে। এসব মুদ্রা মৌর্য-শুঙ্গকালের।

মুরাল পেন্টিং (Mural Painting)

দেয়ালের ওপর সরাসরি আঁকা বা কোনো প্যানেলে এঁকে তা স্থায়ীভাবে সাঁটানো— এরকম চিত্র হল মুরাল পেন্টিং। প্রায় ৩০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে পাহাড়ের গুহার গায়ে আঁকা মুরাল পেন্টিং-এর সন্ধান পাওয়া গেছে। পাহাড়ের গুহা প্রাচীর সাজানোর জন্য আদিম মানুষেরা এসব মুরাল এঁকেছিলেন। এক্ষেত্রে চারপাশে প্রাপ্ত খড়ি, রঙিন মাটি, কাঠ কয়লাকে সরাসরি হাত দিয়ে বা পালক কিংবা পল্লবের সাহায্যে ব্যবহার করা হয়েছিল। আরও একটি পদ্ধতিতে রং লাগানোর যে-প্রমাণ পাওয়া গেছে তা হল দেয়ালে প্রাণীদেহের চর্বি মাখানো তৈলাক্ত তলের ওপর টিউবে বা হাড়ের মধ্যে ভরা রঙের গুঁড়ো ফুঁ দিয়ে ছড়িয়ে দেওয়া। এই পদ্ধতি নাকি অস্ট্রেলীয় বুসম্যানরা এখনও অনুসরণ করে। তবে প্রাচীন এইসব দেয়াল চিত্র বা মুরাল পেন্টিং-এ বাইন্ডার হিসাবে কোনো পদার্থ ব্যবহার করা হত কি না তা স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা যায়নি। যদিও রক্ত বা গাছের কষ জাতীয় কিছু পদার্থও ব্যবহার করা হয়েছিল তবে তা

ধুয়ে গেছে অথবা নষ্ট হয়ে গেছে। তাছাড়া এসব মুরালে নোনা ধরেছে বা চুন জমেছে। তার ফলে রঙের অস্তর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। যার ফলে রঞ্জককে বিশ্লেষণ করা কঠিন হয়ে পড়ায় এতে ব্যবহৃত পদার্থ সম্বন্ধে জানা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। এইসব মুরাল পেন্টিং সাধারণভাবে আচার-অনুষ্ঠানের অঙ্গ। প্রতিবার অনুষ্ঠানের সময় একই ছবির ওপরে নতুন করে রং লাগানো ছিল প্রথা। ফলে বর্ণের অস্তরের আধিক্যজনিত কারণেও রঞ্জক বিশ্লেষণ করা কঠিন।

অন্যান্য সব মুরাল পেন্টিং-এর জন্য পাথর বা খসখসে দেয়ালকে মসৃণ করে সমান একটা জমি বা গ্রাউন্ড তৈরি করে তার ওপরে রং লাগানো হয়। প্রাচীন ইজিপ্টীয়রা মাটির সঙ্গে খড় মিশিয়ে এধরনের জমির ওপর চুন বা ক্যালসিয়াম সালফেটের একটা মসৃণ পলেস্তারা লাগিয়ে তার ওপর জলে গোলে এমন আঠার সাথে রং মিশিয়ে ছবি আঁকতেন। পরে বিশেষ করে চতুর্দশ শতাব্দীতে যখন ইতালিতে ছবি আঁকার মাধ্যম হিসেবে ফ্রেস্কো প্রাধান্য লাভ করে তখন পলেস্তারা তৈরি হত চুন ও বালি জল দিয়ে মেখে। পরে বাতাসের কার্বন ডাই অক্সাইডের সংস্পর্শে এসে চুন কেলাসিত হয়ে বালির সঙ্গে অমসৃণ দেয়ালে আটকে যায়। ২৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে মেসোপটেমিয়ায় এক ধরনের চুনের পলেস্তারা ব্যবহার করা হত যাতে খড় ও

নং ২৫৪. অরোজ্কো : দি পিপল্স অ্যান্ড দেয়ার ফলস লিডার। ১৯৩৭। মেক্সিকো।



মার্বেল গুঁড়ো মেশানো হত ভিত্তিতলের শক্তি বাড়ানোর জন্য। ভিট্রুভিয়াসের লেখা থেকে জানা যায় যে রোমানরা মুরালের জন্য পালিশ করা গ্রাউন্ডের ভক্ত ছিল। ক্ল্যাসিকাল যুগের দেয়াল টিকে যাওয়ার অন্যতম কারণ মোম পালিশ বলে মনে করা হয়। অষ্টম শতাব্দীর একটি ম্যানাস্ক্রিপ্ট থেকে জানা যায় যে এই সময় মুরাল পেন্টিং-এর জন্য মিশ্র মাধ্যম ব্যবহার করা হত। একটি মাধ্যমে ছবি এঁকে নিয়ে তার ওপর অন্য আর-একটি মাধ্যম যেমন ডিম বা আঠা ব্যবহার করা হত। নবম শতাব্দী থেকে ফ্লেশ টোনের (ছায়) অন্তঃস্তর হিসাবে সাধারণভাবে সবুজ রং ব্যবহার করা হত। উত্তর ইউরোপের স্যাঁতসেঁতে ও ঠান্ডা আবহাওয়া মুরাল পেন্টিং-এর পক্ষে উপযুক্ত ছিল না। ফলে মুরাল পেন্টিং-এর বদলে পাণ্ডুলিপি ও প্যানেল পেন্টিং-ই প্রধান উপজীব্য হয়। থিয়োফিলাসের বইয়ে মুরাল নিয়ে একটি মাত্র পরিচ্ছেদ থাকলেও তার চিত্রপট ও ড্রয়িং নিয়ে কোনো আলোচনা ছিল না যদিও শুকনো তলে চুনজল এবং এগটেম্পারা পেন্টিং-এর বর্ণনা ছিল। ১৪০০ সালে বিশিষ্ট ফ্লোরেন্টাইন শিল্পী সেনিনোর (Cennino) লেখা 'The Craftsman's Handbook'-এ মুরাল পেন্টিং-এর গুরুত্বপূর্ণ রূপের তথ্য পাওয়া যায়। এর নাম হল বুয়োন ফ্রেস্কো। যাতে ছবি আঁকা হয় তাজা চুনের ভিজে প্লাস্টারের ওপর পরিষ্কার জলেগোলা রঞ্জক দিয়ে। এই পদ্ধতিতে প্লাস্টারে ব্যবহৃত তাজা চুন বাতাসের কার্বন ডাইঅক্সাইডের সঙ্গে মিশে শক্ত হওয়ার প্রক্রিয়ার সময় রঞ্জকও তার অঙ্গীভূত হয়ে একটি মাত্র স্তরে পরিণত হয়। রেনেসাঁস যুগের বহু শিল্পী এই পদ্ধতিতে অসামান্য সব ছবি এঁকেছেন। সিসটাইন চ্যাপেলের গায়ে মাইকেলাঞ্জেলো অনেকগুলো মুরাল তৈরি করেছিলেন। মেক্সিকোতে বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে মুরাল পেন্টিং-এর যে আন্দোলন গড়ে ওঠে তাও মেক্সিকোর ঐতিহ্য থেকেই সংগৃহীত। প্রাচীনকালে মেক্সিকোর আদিবাসী রেড ইন্ডিয়ানরা ফ্রেমে ছবি এঁকে দেয়ালে ঝোলাতেন না। তাঁরা সরাসরি মন্দির বা প্রাসাদের দেয়ালে স্থায়ীভাবে সাজানোর জন্য ছবি আঁকতেন। এসব ছবির রংও শিল্পীরা নিজেরাই তৈরি করতেন নানা খনিজ পদার্থ, উদ্ভিজ্জ পদার্থ, এমনকি বিভিন্ন ধরনের পতঙ্গকে গুঁড়ো করে তার সঙ্গে তেল বা জল মিশিয়ে। এই রং টিকতও বহুদিন। স্প্যানিশ অধিকারের পর

স্পেনীয়রা রেড ইন্ডিয়ানদের রীতিতে আঁকা ধর্মীয় মুরাল পেন্টিংগুলি ইউরোপীয় রীতির চিত্র দিয়ে প্রতিস্থাপিত করে। ১৯১০-এর বিপ্লবের সঙ্গে মেক্সিকোতে মুরালচিত্রেও বিপ্লব ঘটে। একদল তরুণ মেধাবী চিত্রকর যেমন রিভেরা, অরোজ্কো সিকেরাস প্রমুখরা মেক্সিকোর ঐতিহ্যকে ভিত্তি করে বহু বিশালাকার মুরাল পেন্টিং করেন। *ফ্রেস্কো দেখুন।

মুরালিজ্ম (Muralism)

১৯১০ সালে মেক্সিকোতে বিপ্লবের পর সংঘঠিত মুরাল পেন্টিং আন্দোলনের মতবাদ। বিংশ শতাব্দীর শিল্পকলায় মেক্সিকোর এই মুরাল আন্দোলনের অবদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর মূল ভিত্তি ছিল সংঘটিত বিপ্লবের রাজনৈতিক ও সামাজিক বার্তাকে জনসাধারণ তথা শ্রমজীবীদের চেতনার মধ্যে প্রসারিত করা। মেক্সিকোর ঐতিহ্যের মধ্যেই মুরাল পেন্টিং-এর এক শক্তিশালী ধারা নিহিত ছিল। স্বভাবতই মুরালিজ্ম ১৯১০-এ বিপ্লবের পর মেক্সিকোর সামাজিক সংস্কৃতিক জীবনেও যে নবজাগরণ ঘটে তারই গুরুত্বপূর্ণ প্রতিফলন। নতুন সমাজনীতির দ্বারা অনুপ্রাণিত এই আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটেছিল যে শিল্পীদলের হাতে তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য হলেন দিয়েগো রিভেরা, যোসে ক্লেমেন্টো অরোজ্কো, ডেভিড অ্যালফ্রে সিকেরাস। এক দশকের রাজনৈতিক শাসনকালে চলমান এই মুরাল আন্দোলনে সৃষ্টি হয়েছিল অসম্ভব নান্দনিক গুণ সমৃদ্ধ বিপুলাকার বহু মুরাল। যা প্রদর্শনীকক্ষে বা অভিজাতশ্রেণির গৃহের ভেতরে বন্দি হয়ে থাকার বদলে মানুষের এই সৃষ্টি উপস্থাপিত হয়েছিল সাধারণের ধরাছোঁয়ার মধ্যে সরকারি ও সর্বজনীন বাড়ির দেয়ালগুলিতে। রস আস্বাদনের পাশাপাশি এইসব সুন্দর মুরাল সাধারণ মানুষকে জীবনাবোধে উজ্জীবিত করার প্রেরণা হয়ে হাজির হয়েছিল।

১৯১০ সালে মেক্সিকোতে দীর্ঘদিনের পোরফিরিও ডিয়াজ জমানার অবসান ঘটে এবং ক্ষমতায় আসে এমিলিয়ানো জাপাটা এবং প্যাঙ্কো ভিলা। ভূমি ও শ্রম সংস্কারমুখী নতুন সংবিধান প্রবর্তিত হয়। এইসময় বড়ো বড়ো সরকারি বাড়িগুলির গায়ে সরকারি এবং সামাজিক নীতিগুলিকে ভিত্তি করে বিরাট বিরাট মুরাল আঁকেন শিল্পীরা। ন্যাশনাল ট্রেনিং স্কুল (Escuelta Nationel Preparatoria) যেখান থেকে 'মুরালিজ্মো' (Murali-

smo)-র মহান ধারণার উদ্ভব ঘটে সেখানেই প্রথম বড়ো মুরালের আত্মপ্রকাশ ঘটে। তারপর বহু বড়ো বড়ো বিল্ডিং-এ এধরনের মুরাল আঁকা হয়। ১৯৩০ সালে রিভেরার মতো একজন বিশ্বস্ত কমিউনিস্ট শিল্পী আমেরিকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে আশ্চর্যজনক ভাবে মুরাল আঁকার জন্য বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বরাত পান। পুঁজিবাদী শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিই এমনটা সম্ভব করে। তবে শিল্পী ও পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য একাজে শেষপর্যন্ত সমস্যা সৃষ্টি করে। যার পরিণতিতে ১৯৩১ সালে রকফেলার সেন্টারে রিভেরার আঁকা সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য মুরালটা ধ্বংস করে ফেলা হয়।

পরবর্তী প্রজন্মের মুরাল শিল্পীরা তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গির অনেক পরিবর্তন ঘটিয়ে ফেলেছেন। তাঁরা গোড়ার দিকের রাজনৈতিক-সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রণোদিত শিল্পচর্চা থেকে সরে এসে শান্ত চিত্রভাষার মধ্যে নতুন নান্দনিক মূল্যবোধ খোঁজার চেষ্টা করছেন। এঁদের মধ্যে ট্যামায়োর নাম উল্লেখযোগ্য। অবশ্য মুরালিজ্‌ম নানা দেশের শিল্পীদের ওপর কমবেশি প্রভাব ফেলতে সফল হয়েছে।

মৃৎশিল্প

মাটি দিয়ে নির্মিত শিল্প। সাধারণভাবে মৃৎশিল্প অর্থে সব কিছুকেই বোঝানো হয়। যেমন নানা ধরনের মাটির পাত্র। যা সংসার জীবনে প্রয়োজনীয়, নানা ধরনের সংরক্ষণের উপযোগী পাত্র, আচার অনুষ্ঠানের উপযোগী পাত্র এবং বিশেষ ও নির্দিষ্ট ধরনের পাত্র। দেবদেবীর মূর্তি তথা প্রতিমা, টেরাকোটা মূর্তি, পুতুল ও টালি, সরা আঁকা, খেলনা, ঘর ছাওয়ার টালি ও খোলা তৈরি করা বিভিন্ন বাদ্য-যন্ত্রের খোল নির্মাণ। কিন্তু শিল্পকলার ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ গড়ন বা রূপই মৃৎশিল্প হিসেবে গুরুত্ব পাওয়ার উপযুক্ত। যদিও প্রত্নতাত্ত্বিকগণ পুরাবস্তুর আলোচনায় এরকম কোনো বিভাজন করেননি। কেন-না সেখানে শিল্পকলা সামাজিক অগ্রগতির সঙ্গে সম্পৃক্ত। তাই সাধারণ মৃৎপাত্র বা বস্তু তখনই শিল্পকলার পর্যায়ভুক্ত হয় যদি তা শিল্পগুণমণ্ডিত হয়। মৃৎশিল্পের ক্ষেত্রে মাটির ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ। সব ধরনের মাটিতে মৃৎশিল্প ভালো হয় না। তাই সর্বত্র মৃৎশিল্পের একইভাবে অগ্রগতি ঘটেনি। বিশুদ্ধ মাটি হল কেয়োলিন বা পোরসিলেন ক্লে। অন্যান্য নানা রকম পদার্থ মিশে থাকে বলে মাটির রকমফের হয়। তবে সাধারণ



নং ২৫৫. বাংলার মৃৎশিল্প : রঙিন শিব মস্তক। উচ্চতা ৬.৫ ইঞ্চি।

মাটিতে লোহা এবং বালি একটা আনুপাতিক হারে থাকাটাই মাটির চরিত্র। এই আনুপাতিক হারের ওপরই নির্ভর করে মাটির ব্যবহার ও মূল্যমান।

মাটি শুকিয়ে এবং পুড়িয়ে দু-ভাবেই মৃৎশিল্প নির্মিত হয়। মাটিকে পুড়িয়ে শক্ত করা যায় এই কৌশল মানুষ বহু বছর আগেই জেনেছিল। তুরস্কের আনাতোলিয়ান মালভূমি অঞ্চলে প্রায় ন'হাজার বছর আগে প্রথম মৃৎপাত্র তৈরি হয়েছিল। আর পাঁচ হাজার বছর আগের প্রথম তৈরি মৃৎপাত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে মেসোপটেমিয়াতে। বাংলাদেশেও প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই মৃৎশিল্পের ঐতিহ্য আছে। উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার চন্দ্রকেতুগড়ে প্রাপ্ত 'খেলনা গাড়ি' অথবা কুষাণযুগে নির্মিত 'বাঘের পিঠে চড়া মানুষ' এই পোড়ামাটির পুতুলকে প্রাচীনতম উদাহরণ বলা যেতে পারে। বাঁকুড়ার বিভিন্ন অঞ্চলে গুপ্তযুগের পোড়ামাটির অলংকরণের নমুনা পাওয়া গেছে। পালযুগে পাহাড়পুর, মহাস্থানগড় প্রভৃতি স্থানে বৌদ্ধমন্দির ইত্যাদিতে মৃৎফলক দিয়ে অলংকরণের আধিক্য লক্ষ করা যায়।

মাটি শুকিয়ে এবং পুড়িয়ে উভয় প্রক্রিয়াই মৃৎশিল্পে ব্যবহার করা হয়। ব্যবহার্য ও শৌখিন বিভিন্ন রকম পাত্র, পুতুল, অলংকরণের জন্য ফলক, টালি, গয়না প্রভৃতি সাধারণত পোড়ামাটির হয়। প্রতিমা ও অন্যান্য কিছু মূর্তি কাঁচা মাটি শুকিয়ে তৈরি করা হয়। উভয়ক্ষেত্রেই রং ব্যবহার করা হয় প্রয়োজন ও পরিকল্পনা মতো। পোড়ামাটির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য হল বাঁকুড়ার পাঁচমুড়ার ঘোড়া, হাতি, ষাঁড়, মনসা চালি, মনসা ঘট, দেয়াল অলংকরণের জন্য রিলিফে তৈরি দৃশ্য ও নকশা খচিত ফলক বা টালি। আর কাঁচা মাটির উদাহরণ হল বেশ কিছু টেপা পুতুল সহ কৃষ্ণনগর ও কলকাতার কুমারটুলি সহ অনেক অঞ্চলের প্রতিমা ও মূর্তি শিল্প। কুমারটুলির মাটির প্রতিমা নির্মাণের ক্ষেত্রে অবশ্য মাটি ছাড়াও খড় এবং বাঁশ কাঠের কাঠামো ব্যবহার করা হয়। বাংলার মৃৎশিল্পে যেসমস্ত রূপ বা ফর্মগুলি উল্লেখযোগ্য তা হল বিভিন্ন রূপের ঘট, ঘটবারি, আঙুলে গড়া বা টেপা পুতুল, ছাঁচে গড়া পুতুল, ব্রাকেট, দেওয়াল পরী, পরী, জেলেনি (উত্তর ভারতেও আছে), গোয়ালিনি, আহ্লাদী, বেনেবউ, প্রতিমা, ঘোড়া, সিংহ, ময়ূর ইত্যাদি।

মেজোটিন্ট (Mezzotint)

এনগ্রেভিং-এর একটি পদ্ধতি। লাইন এচিং-এর ঠিক বিপরীত। এই পদ্ধতিতে গ্রে কালারের শেড ফুটিয়ে তোলা যায়। সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি এই পদ্ধতির আবিষ্কার হয় এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপে এর ব্যাপক ব্যবহার হয়। লাইন এচিং-এর কাজ হয় পালিশ করা ধাতব তলে নকশাকে ক্ষয় করে। কিন্তু মেজোটিন্ট করা হয় অমসৃণ তলে। এর জন্য ধাতব পাতকে রকার (সূক্ষ্ম দাঁতযুক্ত বাটালি) বা রাওলেট (করাতের মতো খাঁজযুক্ত ঘর্ষণি) দিয়ে পরিকল্পিত ভাবে অমসৃণ করে নেওয়া হয়। রকারের মাথাটা একটু গোলাকার থাকে যাতে নানান অভিমুখে তা চালানো



নং ২৫৬. ডেভিড লুকাস ইয়েমাউথ বে। ডোরসেটশায়ার। ঊনবিংশ শতাব্দী। ৫.৮ X ৭.২ ইঞ্চি।

যায়। রকার দিয়ে ঘষলে সিরিশ কাগজের মতো এফেক্ট তৈরি হয়। এরপর বার্নিশার নামে একটি হাতযন্ত্র দিয়ে নকশায় সাদা বা আলোবোধক অংশগুলির জন্য ধাতব প্লেটকে প্রয়োজন মতো কুঁদে এবং চেঁছে মসৃণ করে দেওয়া হয়। তারপর কালি লাগিয়ে প্রিন্ট নেওয়া হয়। বার্নিশার দিয়ে চেঁছে দেওয়ার মাত্রা অনুযায়ী সেই তলের ছাপ কালচে বা ধূসর হবে। আর সম্পূর্ণ চকচকে অংশের ছাপ উঠবে সাদা। ব্রিটিশ শিল্পী টার্নার মেজোটিন্টে বহু ল্যান্ডস্কেপ এঁকেছিলেন।

মেডিয়াভাল আর্ট (Medieval Art)

সাধারণভাবে পাঁচশো থেকে পনেরোশো খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ের শিল্পকলা। ভারতের ক্ষেত্রে এই কালপর্ব নিয়ে কিছুটা মতভেদ আছে। বহুল প্রচলিত মত হল ৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে সুলতান মামুদের গুজরাট অধিকারের সময় থেকে

১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজদের পলাশির যুদ্ধ পর্যন্ত। ইউরোপে রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর থেকে অর্থাৎ খ্রিস্টানদের সময় থেকে রেনেসাঁস পর্যন্ত। রেনেসাঁসের সময়ে ইউরোপের এই সময়কে শিল্প সংস্কৃতির অবক্ষয়ের যুগ বলে মনে করা হত। তবে অষ্টাদশ শতাব্দীর পরে মধ্যযুগীয় শিল্পের কদর ও গুরুত্ব দেওয়া শুরু হয়। তথাকথিত অন্ধকার যুগের পরে ইউরোপে তিনটে গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক শৈলীর উদ্ভব ঘটে। এগুলো হল রোমানেস্ক, গথিক এবং ইন্টারন্যাশনাল গথিক। ভাস্কর্য এবং চিত্রকলায় আলংকারিক শৈলী এবং বিমূর্ত শৈলী যার চূড়ান্ত বিকাশ লক্ষ করা যায় কেলটিক, আংলোস্যাক্সন, মোজাম্বিক আর্ট, থেকে শুরু করে ফিগারেটিভ এবং অতিসজ্জিত নানা শ্রেণির আঙ্গিকের মধ্যে। ভারতবর্ষে এই সময়ে ইলোরা, এলিফ্যান্টার গুহামন্দির ও ভাস্কর্য নির্মিত হয়েছে। চোল ব্রোঞ্জ, নটরাজ, সহ পালযুগ, পাহাড়পুরের স্থাপত্য, ভাস্কর্য, খাজুরাহো মন্দির ভাস্কর্য, পাল পুঁথিচিত্রণ, কোণারকের সূর্যমন্দির, মুঘল স্থাপত্য, মুঘল মিনিয়েচার, রাজপুত চিত্রকলা. কালীঘাটের ছবির মতো রত্নরাজি সৃষ্টি হয়েছে।

মেরিন পেন্টিং (Marine Painting)

যে ছবি সমুদ্র, জাহাজ চলাচল সংক্রান্ত এমনকি কখনো-কখনো নৌযুদ্ধের দৃশ্য অথবা সমুদ্রবিষয়ক ঐতিহাসিক ঘটনাকে তুলে ধরে। সপ্তদশ শতাব্দীর হলান্ডে এটা প্রথম মৌলিক রীতি হিসাবে উঠে আসে। এই সময়কার শীর্ষ ওলন্দাজ শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন পিতা এবং পুত্র উভয় ভ্যান ডি ভেল্ডার্স। মেরিন পেন্টিং-এর সমার্থক শব্দ হিসাবে সিপিস; সিস্কেপও শব্দও প্রচলিত।

মেলানেশিয়ান আর্ট (Melanesian Art)

দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত সাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে তথা নিউগিনি থেকে ফিজি অঞ্চলের অধিবাসীদের শিল্পকলা। মেলানেশীয় জনগণের ভিন্ন ভিন্ন আঞ্চলিক সংস্কৃতির সঙ্গে ছিল বৈচিত্র্যময় শিল্প ঐতিহ্য। মেলানেশীয়রা তাঁদের নানা ধরনের চিত্রকলা, ভাস্কর্য এবং মূর্তিকে সমন্বয় করে স্থাপত্যকে সাজানোর জন্য ব্যবহার করতেন। পোশাক এবং রোজকার ব্যবহার্য সামগ্রীতেও তাঁরা নানা কারুকৃতি ব্যবহার করতেন। পূর্বপুরুষদের আত্মার উদ্দেশ্যে নিবেদিত ধর্মীয় অনুষ্ঠানের জন্য তাঁরা নানা শিল্পকলা উৎসর্গ করতেন। অনেক সময়

ক্ষণস্থায়ী উপাদান দিয়েই তাঁরা এইসব অনুষ্ঠানের জন্য নানারকম মুখোশ সদৃশ্য পোশাক, ভাস্কর্যমূর্তি তৈরি করতেন। এইসব সমৃদ্ধ ও আকর্ষণীয় উপজাতি শিল্পকলা পাশ্চাত্যেও সমাদৃত।

মেসোপটেমিয়ান আর্ট (Mesopotamian Art)

সুপ্রাচীন কালে মানুষের শিল্প সুকৃতির অন্যতম মূল্যবান নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায় মেসোপটেমিয়ান আর্টে। প্রায় তিন হাজার বছর ধরে এই শিল্পকলার বিকাশ ঘটেছিল মধ্যপ্রাচ্যের টাইগ্রিস এবং ইউফ্রেটিস নদীর মধ্যবর্তী একটি অঞ্চলে বা আজকের বাগদাদের কাছে অবস্থিত মেসোপটেমিয়ায়। প্রায় ২৩৪০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে আক্কাডের রাজা সার্গন মেসোপটেমিয়ায় প্রতিষ্ঠিত সুমেরিয়ান রাজতন্ত্রকে উচ্ছেদ করে মেসোপটেমিয়া নগররাজ্যগুলি ঐক্যবদ্ধ করে আক্কাডিয়ান শাসনের পত্তন করেন। তারপর ক্রমান্বয়ে উৎসারিত সংস্কৃতির ফসল হিসাবে বৈচিত্র্যপূর্ণ এক শিল্পরীতি ও মাধ্যমের প্রসার ঘটে। আক্কাডিয়ানরা সুমেরিয়ানদের শিল্প-রীতিতেই কাজ করতেন। আক্কাডিয়ান পর্বের নিনেভের কাছে দুটো বড়ো মাপের শিল্পকর্মের নমুনা পাওয়া গেছে।



নং ২৫৭. এরিডু মেসোপটেমিয়ায় প্রাপ্ত খিস্টপূর্ব ৪৫০ বছরের প্রাচীন পুরুষ মূর্তি।

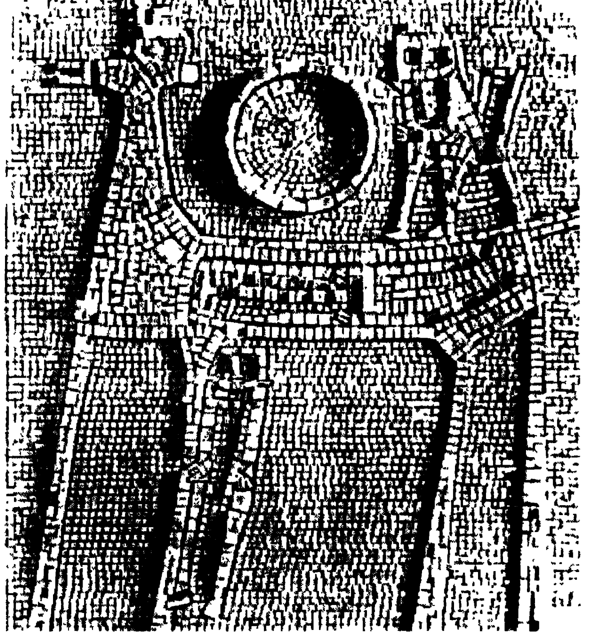
একটি ব্রোঞ্জনির্মিত 'হেড' সম্ভবত রাজা সার্গনের। অন্যটি 'স্টেলা অব নরাম-সিন'। এতে স্পেস-এর মুক্ত ব্যবহার ও সাবলিল কম্পোজিশন লক্ষ করার মতো।

পরবর্তীকালে পুরোনো ব্যাবিলনিয়ান কালে অর্থাৎ খ্রিস্টপূর্ব অষ্টাদশ শতাব্দীতে মারি-তে বিলাসবহুল রাজপ্রাসাদ জাঁকিয়ে ওঠে। এতে গেসো টেকনিকে তৈরি বহু সমৃদ্ধ মুরাল নির্মাণ করা হয়েছিল। যেমন 'দি ইনভেস্টিচার অব জিরমি-লিম'। এর পরে আসিরিয়ান ও শেষে নিওব্যাবিলিয়ান যুগ। এই সময় প্রাচীন ব্যাবিলন শহরকে ঝলমলে করে পুনর্নির্মাণ করেন রাজা ন্যাবোপোলাসার এবং তাঁর ছেলে নেবুচাডনেৎজার। ব্যাবিলনের পৌরাণিক শূন্যোদ্যান কিংবা টাওয়ার অব ব্যাবেল তথা জিগুরাট ধাপপাহাড় সবই হারিয়ে গেছে কিন্তু অসংখ্য প্রাসাদের অবশেষ, ইশতার তোরণ, শোভাযাত্রার পথ ইত্যাদিতে ব্যবহৃত ছাঁচে গড়া সিংহ, ষাঁড় এবং দেবতাদের অলৌকিক ড্রাগনরূপ সম্বলিত চকচকে টালি হারিয়ে যাওয়া বিশাল শিল্পসুকৃতির আভাস দেয়। পূর্ব বার্লিনের পারগেমন মিউজিয়ামে ইশতার তোরণ এবং শোভাযাত্রা পথকে সে সময়কার তৈরি অনেক আসল টালি ব্যবহার করেই পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে। অ্যাচিমেনিয়ান সম্রাট সাইরাস দ্য গ্রেট কর্তৃক ৫৩৯ খ্রিস্টপূর্বাব্দে মেসোপটে-মিয়া বিজয়ের সময় মেসোপটেমিয়ার সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক পরিচিতি চরম উন্নতি লাভ করেছিল। এটা আদি আয়োনিয়ান শিল্পকে প্রভাবিতও করেছিল।

মোজাইক (Mosaic)

মোজাইক বলতে সাধারণভাবে স্থাপত্যের পৃষ্ঠ বা দেয়াল অলংকরণের কৌশলকে বোঝায়। স্থাপত্যের দেয়ালে বা পৃষ্ঠে প্লাস্টার বা মর্টারের অস্তরের ওপরে ছোটো পাথরের টুকরো, কাঁচ বা সিরামিক দিয়ে উৎকীর্ণ করা নকশা মোজাইক নামে পরিচিত। মোজাইকের উদ্ভবকাল অনির্দিষ্ট হলেও সর্বাপেক্ষা প্রাচীন পরিচিত মোজাইক হল সুমেরিয়ান মোজাইক। যাতে ব্যবহার করা হত টেরাকোটা। পরবর্তীকালে খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চদশ শতাব্দীতে গ্রিক ও রোমানদের শাসনকালে খ্রিস্টানদের চার্চগুলিকে সজ্জিত করার জন্য ব্যাপকভাবে মোজাইক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। গ্রিক ও রোমানদের মতো ইজিপশিয়ান এবং মাইনোয়ানরাও মোজাইকে কাঁচ ব্যবহার করত। শুরুতে মোজাইক বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই

নং ২৫৮. আলেকজান্দ্রা কসবা : রিলিফ মোজাইক। ৪০.২ X ৩৫.৬ ইঞ্চি।



মেঝে এবং রাস্তায় ব্যবহার করা হত। পরে বাইজেনটাইন শিল্পে এটা প্রধান বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়ায়।

ক্ল্যাসিকাল যুগের যেসব মোজাইক রয়ে গেছে সেগুলো সবই রাস্তা বা চলার পথ। রাস্তার জন্য সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য উপাদান ছিল পাথর। কেননা পাথর সুন্দর, সস্তা এবং টেকসই। খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর গ্রিক নুড়িপাথরের মোজাইকগুলি আক্ষরিকভাবে না-ছাঁটা পাথরের তৈরি। এর রঙের শ্রেণিও সীমাবদ্ধ। মেসিডোনিয়ার পেলায় তিনশো খ্রিস্টপূর্বাব্দে তৈরি 'দি লায়ন হান্ট'-এ ব্যবহৃত পাথরের রং ছিল সাদা কালো এবং এতে বড়ো জোর কিছু সবুজ বা ধূসর পাথর ব্যবহার করা হয়েছিল। খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে প্রকৃত 'টেসারে' (tesserae) বা ছাঁটা পাথর প্রবর্তিত হয়। এই পাথরগুলি যেমন ছোটো তেমনি এর ধারগুলি সমান। এতে তৈরি ছবি অনেক পরিশীলিত এবং ফিনিশিংও অনেক মসৃণ। ক্রমশ অনেক বেশি বেশি রঙের মার্বেল ব্যবহার করা হতে থাকে। খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষের দিকে তৈরি ডেলোস মোজাইক 'ডয়নিসোস রাইডিং অন এ প্যান্থার'-এ মার্বেল, দামি পাথর, কাঁচ সহ মোট ১৫টি রং ব্যবহার করা হয়েছিল। এইসব মূল্যবান উদাহরণ

থাকলেও খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতেও মোজাইক খুব একটা সৃজনশীল মাধ্যম ছিল না। ভিট্রুভিয়াস এবং প্লিনির লেখায় জানা যায় সেসময় মোজাইককে ইমারতি ব্যবসার শাখা হিসাবে দেখা হত। এর মধ্যে অনেক মোজাইক ছিল ক্ল্যাসিকাল চিত্রের অনুকৃতি। সেগুলো এখন আর নেই। খ্রিস্টধর্ম দ্বারা স্বীকৃতি পাবার পর চার্চগুলিতে মুরাল তৈরির প্রধান মাধ্যম হয়ে ওঠে মোজাইক। মোজাইকের উজ্জ্বল রং এবং ঝকঝকে চরিত্রের জন্যই একে পছন্দ করা হত। এর পর কাঁচ গলিয়ে রঙিন টেসারে তৈরি করা শুরু হয়। মধ্যযুগের আদি পর্বের মুরাল মোজাইকের গঠন ক্ল্যাসিকাল যুগের পাকারাস্তার মোজাইক থেকে আলাদা। এক্ষেত্রে ইটের দেয়ালে পলেস্তারা বা মর্টারের অস্তর লাগিয়ে তার ওপর খানিকটা অংশ জুড়ে টেসারে (ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মোজাইক দানা) লাগানো হত ঠিক যতটা শিল্পী একদিনে ভরাট করতে পারবেন। ষোড়শ শতাব্দীতে দুটো গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি মোজাইককে অচল করে তোলে। প্রথমটা হল আলংকারিক চিত্রতলের বিপরীতে পিকটোরিয়াল স্পেস বা চিত্রপরিসরের গুরুত্বদান এবং দ্বিতীয়টা হল স্বয়ং মোজাইকের কৌশলের ক্রমবর্ধমান আধুনিকীকরণ। ফলে অসংখ্য শেডের মোজাইক টালি তৈরি হতে লাগল এবং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বর্ণমাত্রাকেও মোজাইকে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব হল। ক্রমশ মোজাইক তার নিজস্ব রূপধর্ম হারিয়ে অন্য শিল্প আঙ্গিকের নকল হয়ে উঠল। অবশ্য বিংশ শতাব্দীতে অনেক শিল্পী যেমন অ্যান্টনি গডি এবং দিয়েগো রিভেরা প্রমুখ নতুনভাবে ও মৌলিক রূপে মোজাইক মাধ্যমে ছবি নির্মাণ করেছেন।

মোজারাবিক আর্ট (Mozarabic Art)

মুসলিম স্পেন যা মোজারাবিস নামে পরিচিত, সেখানকার খ্রিস্টানদের বিশেষ করে নবম থেকে একাদশ শতাব্দীর সময়কালের শিল্পকলা। তাঁরা উন্নতমানের মৌলিক এক শৈলীর উদ্ভাবন করেছিলেন। যাঁরা মূলত যুক্ত ছিলেন বিটাস অ্যাপোক্যালিপসের পাণ্ডুলিপি অলংকরণের একটি বড়ো গোষ্ঠীর সঙ্গে। এই শিল্প ধ্রুপদি যুগের প্রভাব মুক্ত এক ধরনের আলংকারিক রীতির শিল্পকলা। খ্রিস্টান ভিসিগোথদের উত্তরাধিকার এবং মুসলিম শিল্পকলার প্রভাবে এই ধরনের ক্যালিগ্রাফিক রীতির চিত্রকলার সৃষ্টি হয়েছিল। যার উজ্জ্বল রঙের ডোরা কাটা পশ্চাৎপটে থাকত ফ্ল্যাট এবং আদর্শ-

রূপহীন ফিগার-এর দ্বারা সৃষ্ট প্যাটার্ন বা নকশা। ধীরে ধীরে এই শিল্প রোমানেস্ক শৈলীর দখলে চলে যায়।

মোটিফ (Motif)

শিল্পকলায় মোটিফ হল বিষয়বস্তু বা প্রধান উপাদান। অনেক সময় মোটিফ অর্থে শিল্পে উপস্থাপিত বিষয় বা বস্তুর সাধারণ জাতিকে বোঝায়। যেমন একটি কালো গোরু। অন্যদিকে মোটিফ কোনো নির্দিষ্ট এবং সাধারণভাবে সুপরিচিত বিষয়কে বা বস্তুকে প্রকাশ করে। যেমন একটি প্রদীপ, সাইকেল, কড়াই।

মোল্ডিং (Moulding)

নকশাদার স্ট্রিপ বা ফালি অথবা ধার। এই নকশা উত্তল বা অবতল এবং সাদামাটা অথবা নানা বৈচিত্র্যময় অলংকার-মণ্ডিত হতে পারে। মোল্ডিং-এর নকশার বিভিন্ন নাম ও ধরনের কয়েকটির নমুনা এরকম —

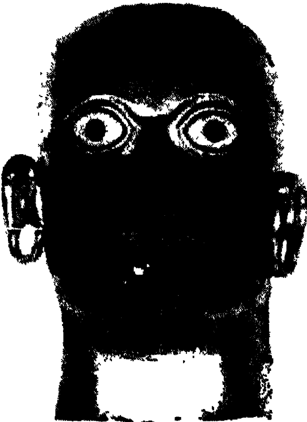
বাগেট— ছোটো উত্তল মোল্ডিং যার প্রস্থচ্ছেদ প্রায় চোঙাকৃতির।

কেব্‌ল মোল্ডিং— এই মোল্ডিং দেখতে পাকানো দড়ির মতো।

এগ অ্যান্ড ডার্ট — এই নকশাদার মোল্ডিং পর্যায়ক্রমিকভাবে সূচালো এবং গোলাকার রূপ দিয়ে গঠিত।

মোশে আর্ট (Moche art)

পেরুর উত্তর উপকূলে এক থেকে ছয়শো খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বসবাসকারী মোশে জনগণের শিল্পকলা। এই অঞ্চলে বিশেষ করে মোশে এবং শিকামা উপত্যকায় ধ্বংসাবশেষের মধ্যে কাঁচা মাটির ইটে তৈরি পিরামিড, রাজগৃহ, দুর্গ, সেচের খাল প্রভৃতির সন্ধান পাওয়া গেছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বড়ো হল মোশের ধাপ পিরামিড যা সূর্যমন্দির নামে পরিচিত। সুন্দর ধাতুর কাজ, কাঠ খোদাই, মুরাল পেন্টিং এবং সামান্য কিছু বয়নশিল্পের নমুনাও পাওয়া গেছে। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল মোশে জনগণের পটারি শিল্প। যা আজও বিদ্যামান। কিছু পাত্রের গায়ে প্রাণবন্ত দৃশ্যাবলি এবং বিমূর্ত নকশা চিত্রিত। আবার কিছু পাত্রের গায়ে লো রিলিফ এবং রাউন্ড ভাস্কর্যে লতাপাতা, মানুষ, পশুপাখি, বাড়িঘর সহ জড়বস্তু, পৌরাণিক চরিত্র ও ঘটনাবলি উজ্জ্বলভাবে উপস্থাপিত। এর মধ্যে সিরামিক্‌সে নির্মিত 'লাফিং ম্যান ভেসেল' নামে নিখুঁতভাবে গড়া একটি বাস্তবধর্মী প্রতিকৃতিমণ্ডিত পাত্র উল্লেখযোগ্য নমুনা।



নং ২৫৯ মোশে ভোটিক মুখোশ। ৩৫০ খ্রিস্টাব্দ। ২৬ X ২১ সেমি। সোনা ও তামার সংকর এবং কালো রং।

ম্যাজিক রিয়ালিজ্‌ম (Magic Realism)

জার্মান শিল্প সমালোচক ফ্রাঞ্জ রোহ্ ১৯২৫ সালে সমকালীন শিল্পধারায় সাদৃশ্যবাদী এবং প্রকাশবাদী ঝোঁকের মধ্যে পার্থক্য বোঝাতে গিয়ে ম্যাজিক রিয়ালিজ্‌ম শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেছিলেন। রোহ্-এর লেখা বইটির নাম ছিল 'নাখ্-এক্সপ্রেশনিজমুস, ম্যাজিস্‌খের রিয়ালিজমুস : প্রবলেমি ডার নিউয়েসটেন ইউরোপাইসখার ম্যালেরি'। অর্থাৎ এক্সপ্রেশনিজ্‌মের পর ম্যাজিক রিয়ালজ্‌ম : নবীনতম ইউরোপীয় চিত্রকলার সমস্যাবলি। যদিও শেষপর্যন্ত জার্মানিতে এটা 'নিউ অবজেক্টিভিটি' (Neue Sachlichkeit) পরিভাষার নীচে চাপা পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু সেসময় অনেকেই ম্যাজিক রিয়ালিজ্‌ম শব্দটি গ্রহণ করেছিলেন আরও অনেকগুলি শব্দের সঙ্গে। যেমন—'প্রিসাইজ রিয়ালিজ্‌ম', 'শার্প-ফোকাস রিয়ালিজ্‌ম'। সাধারণভাবে এর চরিত্রবৈশিষ্ট্য হল এই ছবিতে বিষয়বস্তুর হুবহু বাস্তব রূপের সযত্ন ও সম্পূর্ণ ফোটোগ্রাফিক উপস্থাপনার মধ্যে এবং দ্ব্যর্থক পরিপ্রেক্ষিতের ব্যবহারের সাহায্যে রহস্য ও জাদুবোধক বিষয়ের অসাধারণ সংযোজন ঘটানো হয়। যার উৎস বলা যেতে পারে জর্জিয়ো ডি শিরিকোর মেটাফিজিক্যাল পেন্টিং। যদিও এই দুই শিল্পরূপের মধ্যে আপাত মিল থাকলেও ম্যাজিক রিয়ালিস্টরা তাঁদের ছবিতে পূর্ণ সাদৃশ্যবাদী চরিত্রকে গুরুত্ব দেওয়ার বদলে চিত্রগত মূল্য বা ভাবের ওপর জোর দিতে চেয়েছেন। তবে রোহ্‌র মতে ম্যাজিক রিয়ালিজ্‌ম বা জাদু বাস্তববাদ মৌলিকভাবেই এক্সপ্রেশনিজ্‌ম বা প্রকাশবাদের



নং ২৬০. পল ভিলাভোয়া : দ্য হ্যান্ড (দ্য ড্রিম)। ১৯৪১।

উত্তরভাগ। ম্যাজিক রিয়ালিস্টরা সুরিয়ালিস্টদের মতো মুক্ত অনুষঙ্গ ব্যবহার করে প্রাত্যহিক বিষয়ের মধ্যে বিস্ময়াভাস সৃষ্টি করতেন। কিন্তু এক্ষেত্রে তাঁরা ফ্রয়েডীয় স্বপ্নরূপ এবং স্বতঃক্রিয়াকে বাদ দিয়েছিলেন। আমেরিকায় চর্চা করেছেন এমন জাদুবাস্তববাদী শিল্পী হিসাবে পরিচিতরা হলেন পিটার ব্লুম, লুই গুইলিয়েলমি, ইভান অলব্রাইট, জর্জ টুকার। ব্লুমের বিখ্যাত জাদুবাস্তববাদী ছবি হল 'দি ইটারনাল সিটি'। ব্লুম একধরনের 'সমাজ অধিবাস্তববাদ' সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁর এই প্রতিবাদী ছবিতে 'প্রিসিসনিস্ট' চিত্রতল পদ্ধতির মিশ্রণের সঙ্গে সমাজবাস্তবতার কাজ এবং অধিবাস্তববাদী মায়াবী দৃশ্য ভাষাকে আধেয় করেছিলেন। এরদ্বারা তিনি মুশোলিনি ও ইটালীয় ফ্যাসিবাদের তীব্র সমালোচনাকে ফুটিয়ে তুলেছিলেন। একটি ছবিতে ছিল বাক্সবন্দি খেলনার মতো ধূসর রঙের শিয়াল-মুশোলিনি সভার সামনে হাজির হয়েছেন।

মাগরিতও একজন সুপরিচিত জাদুবাস্তববাদী শিল্পী। তাঁর ছবি হল অসম্ভব পরিশ্রমে তৈরি বাস্তববাদী 'সাধারণ বিষয়ের ফ্যান্টাসি'। অধিবাস্তববাদী স্বতঃক্রিয়ার মতবাদের বিপরীতে মাগরিতের দাবি হল— অন্তর্জগত যেমন অবচেতনের উৎস তেমনি দৃশ্যজগৎ হচ্ছে বিস্ময়ের উৎস।

জাদুবাস্তববাদের চিত্রনীতি বিশেষ করে বাস্তববাদী রূপের সঙ্গে জাদু বিষয়ের সংমিশ্রণ নিশ্চিতভাবেই পরবর্তীকালে ন্যুভো রিয়ালিজ্‌ম, নিও দাদা, পপ আর্ট, সুপার রিয়ালিজ্‌ম-এর সঙ্গে যুক্ত শিল্পীদের ওপর প্রভাব সৃষ্টি করেছে। মৌলিকভাবে জাদুবাস্তববাদী শিল্পী না হলেও ভারতবর্ষের অনেক শিল্পীর ছবিতে জাদুবাস্তববাদী রূপ লক্ষ করা যায়। এঁদের মধ্যে গুলাম মহম্মদ শেখ, ভুপেন খক্কর, বিভান সুন্দরম, মৃণালিনী মুখার্জি, রোদ্বিতীয়া, ক্রপ্তি প্যাটেল, সুধীর পট্টবর্ধন প্রমুখ। এমনকি যোগেন চোধুরি ও মনোজিৎ খাওয়ার অনেক ছবির হেঁয়ালির রূপও ম্যাজিক রিয়ালিজ্‌মের সমার্থক।

ম্যানারিজ্‌ম (Mannerism)

র‍্যাফায়েলের ১৫২০ সালে আঁকা 'দি ট্রানসফিগারেশন' ছবিটি এবং ১৫৩০ সালে মাইকেলাঞ্জেলো নির্মিত 'ভিক্টোরি' মূর্তিটিকে লক্ষ করলে দেখা যাবে মূর্তি এবং ছবিতে আঁকা ফিগারগুলির ভঙ্গি বেশ অতিরঞ্জিত বা অতিরিক্ত মাত্রায় শৈলীবদ্ধ। এই অতিরিক্ত শৈলীবদ্ধতাই ম্যানারিজ্‌মের ভিত্তি।

নং ২৬১. আংগ্রে : লা কঁতেস দোসোঁভিই। ১৮৪৫।



এ ব্যাপারে তৎকালীন ইতালির শিল্পকলার প্রথম প্রণালীবদ্ধ ইতিহাসকার তথা অন্যতম বিশিষ্ট ম্যানারিস্ট শিল্পী জর্জিয়ো ভ্যাসেরি ম্যানারিজ্‌মের উৎস—ইতালীয় 'ম্যানিয়েরা' শব্দটির মোটামুটি অর্থ করেছেন 'স্টাইল'। পরবর্তীকালের ঐতিহাসিকরা 'ম্যানিয়েরা' শব্দটির ভাষান্তর করেছেন 'ম্যানারিজ্‌ম' যার অর্থ হয়েছে 'স্টাইলিশনেস' অথবা 'স্টাইলাইজেশন' অর্থাৎ শৈলীরূপ বা শৈলীকরণ। এবং ম্যানারিজ্‌ম শব্দটি শীর্ষ রেনেসাঁসের ক্ল্যাসিকাল রীতির অবক্ষয় বলেও নিন্দিত। ম্যানারিজ্‌ম শব্দটির মধ্য দিয়ে সেই সব শিল্পীর শ্রেণিকে বোঝানো হত যাঁরা আন্তরিকতাহীন ভাবে তাৎপর্যকে অনুধাবন না করেই অন্য শিল্পীদের বিশেষ করে মাইকেলাঞ্জেলোর রীতিকে অনুকরণ করতেন। পরে অবশ্য ধীরে ধীরে এইরকম কড়া সমালোচনামূলক ব্যাখ্যা বন্ধ হয়ে যায় এবং সাধারণভাবে ১৫২০ থেকে ১৬০০ সালের মধ্যবর্তী পর্যায়ের অর্থাৎ শীর্ষ রেনেসাঁস থেকে বারোকের উদ্ভবকাল পর্যন্ত সময়ের ইতালির চিত্রকলা ও

ভাস্কর্যের রীতিকেই বোঝানো হয়।

ম্যানারিজ্‌মের শৈলীর উৎস যে দুজন শিল্পীর কাজের মধ্যে-সেই মাইকেলাঞ্জেলো এবং রাফায়েল দুজনেরই অত্যন্ত আকর্ষণকারী দৃশ্যগত ফলাফল তৈরির দিকে ঝোঁক ছিল। বেশিরভাগ ম্যানারিস্ট ছবির বৈশিষ্ট্য ছিল এই ছবিতে উপস্থাপিত ফিগারগুলি লম্বাটে, অতিরিক্ত পেশিবহুল এবং অযৌক্তিক মোচড়-ভঙ্গি সম্পন্ন। বিষয়বস্তুও খুব দুর্বোধ্য, অজানা কারণে ক্যানভাসে প্রচুর ফিগারের উপস্থাপন অথবা কম্পোজিশনের তেরচা অভিমুখ। ছবিতে ব্যবহার্য রংও অনেক ক্ষেত্রে কর্কশ এবং নিষ্প্রাণ সম্ভবত গভীর ও আবেগানুভূতি তৈরির জন্য। ম্যানারিজ্‌মকে এক সময় অবক্ষয়ের সঙ্গে মিলিয়ে ফেলা হয়েছিল। তবে এই শৈলীর ইতিবাচক রূপগুলি এখন স্বীকৃতি পেয়েছে। যে সমস্ত বিশিষ্ট শিল্পীরা ম্যানারিজ্‌ম শৈলীতে অবদান রেখেছেন তাঁদের মধ্যে গিউলিয়ো রোমানো, পারমিজিয়ানিয়ো, পনতরনো, রসো, গিয়ামবোলগনা প্রমুখের নাম অগ্রগণ্য।

ম্যাল্‌স্টিক (Mahlstick)

এই উপকরণটি শিল্পী তুলি-ধরা হাতের ভর রাখার জন্য ব্যবহার করেন। এর আর একটি নাম হল রেস্ট-স্টিক। যাতে বড়ো ছবির মাঝখানের কোনো অংশে রং লাগানোর



সময় ছবিতে হাতের স্পর্শ না লাগে। বেত, কাঠ, প্লাস্টিক বা যে কোনো জিনিস দিয়ে তৈরি লম্বা স্টিক বা কাঠির মাথায় তুলোর গুটি করে তার ওপর পরিষ্কার কাপড়ের টুকরো দিয়ে মুড়ে কাপড়ের নীচের দিকটা শক্ত করে বেঁধে তৈরি করা হয়। এবার এই তুলোবাঁধা মাথাটা ক্যানভাসের কোনো একটা প্রান্তে ঠেকানো অবস্থায় এই স্টিকের ওপর তুলি-ধরা হাতের ভর রেখে ছবিতে রং লাগাতে সুবিধে হয়। এতে যেমন ছবিতে হাতের ছোঁয়া লাগে না তেমনি ভারসাম্যও বজায় রাখা যায়।

ম্যাস্টিক ভার্নিশ (Mastic Vernish)

এক ধরনের বার্নিশ। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে পাওয়া যায় এমন একজাতীয় গাছের কষ বা ম্যাস্টিক

সলভেন্ট বা দ্রাবকে গুলে তৈরি করা হয়। সলভেন্ট হিসাবে ব্যবহার করা হয় টারপেন্টাইন বা অ্যালকোহল। তবে এর ব্যবহার এখন প্রায় কমে এসেছে বিশেষ করে এর বিবর্ণ হয়ে যাওয়া বা ফাটধরা চরিত্রের জন্য।



য

যক্ষ

এক. সপ্তদশ শতাব্দীতে তিব্বতি ঐতিহাসিক লামা তারানাথ বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস নিয়ে একটি বই লেখেন। ১৬০৮ খ্রিস্টাব্দে রচিত এই বইতে লামা তারানাথ বহু তথ্যের সমাবেশ ঘটিয়েছিলেন। তার সত্যাসত্য স্পষ্ট না হলেও সেখানে তিনি প্রাচীন বৌদ্ধশিল্পের তিনটি যুগের কথা উল্লেখ করেছেন। দেবযুগ, যক্ষযুগ নাগযুগ। যক্ষ যুগকে তারানাথ সম্রাট অশোকের সমসাময়িক বলে বর্ণনা করেছেন। এই যক্ষ কারা ছিলেন তা নিয়ে বহু অনুসন্ধান হয়েছে। তবে সাধারণভাবে মনে হবে যে তারানাথ বর্ণিত যক্ষদের আঁকা ছবি কোনো মানুষের আঁকা নয়। তা অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন কারও আঁকা। এঁরা গ্রিক-ব্যাকট্রিয়ান গান্ধার দেশের লোক এমন মতামতও দিয়েছেন কোনো কোনো শিল্প ভাষ্যকার। তবে তারানাথের লেখা থেকে এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায় যে দেব, যক্ষ, নাগ এই তিন বৌদ্ধ শিল্পরীতি ছিল খুবই বাস্তবধর্মী। কেন-না তিনি বলেছেন, 'বহু বছর ধরে দেব, যক্ষ, নাগদের শিল্প তাদের বস্তুনিষ্ঠার জোরে দর্শকের চোখে ভ্রম ধরিয়েছে।' (উদ্ধৃতি : অশোক মিত্র, ভারতের চিত্রকলা)।



নং ২৬২. মথুরায় প্রাপ্ত প্রস্তর মূর্তি। ১০০ খ্রিস্টাব্দ

দুই. ভারতীয় ভাস্কর্যে রাশি রাশি যক্ষ-যক্ষিণীর মূর্তি দেখতে পাওয়া যায়। অভিধান অনুযায়ী যক্ষ হল উপদেবতা বা ভূতপ্রেত। যক্ষমূর্তি সংস্কৃতি বেশ বিচিত্রভাবে হিন্দু ও বৌদ্ধ মূর্তিকলার ধারণায় মিলেমিশে গেছে। প্রাচীন মৌর্যযুগে প্রচুর যক্ষ-যক্ষিণীর মূর্তি দেখতে পাওয়া যায়। ভারহুত ও সাঁচীতেও যক্ষ-যক্ষিণীর পুজো প্রচলিত ছিল। এর সূত্রপাত বৈদিক যুগে। তখন প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা দেবতারা কল্পনামাত্র। তাদের কোনো মূর্তি বা মন্দির ছিল না। জনগণ এই কাল্পনিক

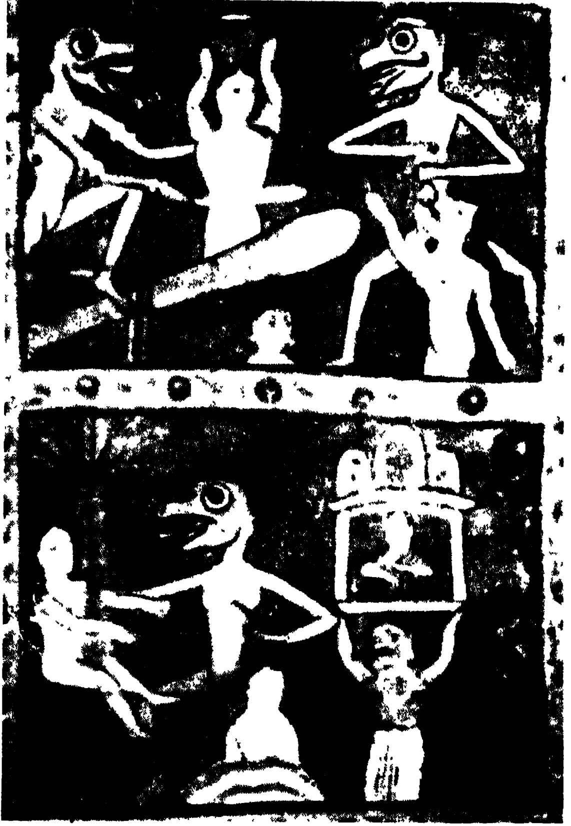
বা অ্যাবস্ট্র্যাক্ট দেবতা বুঝতে পারত না। তারা যক্ষ, নাগ ও ভূমিদেবীর পুজো করত। যক্ষ কল্পনা স্বভাবতই প্রাক্ বুদ্ধ যুগে ছিল। কুমারস্বামীর লেখা থেকে জানা যায় যে, প্রাক্‌যুদ্ধ যুগে যক্ষকে বলা হত 'পুণ্যজন' এবং এই যক্ষমূর্তি থেকেই বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব মূর্তির রূপকল্পনা হয়েছিল। শুধু বৌদ্ধ নয় হিন্দু মূর্তির বিবর্তনেও যক্ষ মূর্তির বড়ো ভূমিকা ছিল। মথুরা মিউজিয়ামে রক্ষিত পারখামে প্রাপ্ত খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ-তৃতীয় শতাব্দীর বিশালাকার মূর্তিটিও একটি যক্ষের মূর্তি।

প্রাচীনতর যক্ষের মূর্তিগুলি কাঠ বা পোড়ামাটিতে তৈরি হত বলে তাদের কোনো নিদর্শন পাওয়া যায় না। অনেক যক্ষ ও যক্ষিণী মূর্তির নতুন নামকরণ হওয়ায় তাদেরও আর আলাদা করে চিহ্নিত করা সম্ভব নয়। এভাবেই গণেশ, কার্তিক, সরস্বতী, ইন্দ্রাণী, তারা প্রভৃতি মূর্তিগুলি যে প্রাক্‌বৌদ্ধ, প্রাক্‌বৈদিক সংস্কৃতি থেকে নেওয়া হয়েছিল তা নিশ্চিত করেই বলা যায়। কলকাতার জাদুঘরে যে যক্ষিণী মূর্তিটি আছে তা পাওয়া গিয়েছিল প্রাচীন বিদিশা তথা বেসনগরে। এর উচ্চতা ৬ ফুট ৭ ইঞ্চি! এই মূর্তির ভঙ্গিকে বলে ফ্রন্টালিটি বা সম্মুখবর্তিত, অর্থাৎ সোজা দাঁড়িয়ে সামনের দিকে তাকানো অবস্থা। পারখাম ও বিদিশার উভয় যক্ষ মূর্তির পরনে ধুতি। সামনে কোঁচা ও কোমর বন্ধনী। কোমর ও বুকের উত্তরীয় দড়ির মতো। মৌর্যযুগের পরবর্তীকালে মথুরা ও গুপ্তযুগের ভাস্কর্য রীতি অনুযায়ী যক্ষ-যক্ষী মূর্তিতেও কোমরে পাকানো চাদরের মতো বন্ধনী দেখা যায়। যা খুবই শৌখিনতার পরিচায়ক। মৌর্যযুগের মূর্তিতে কাপড়ের (Drapery) ওপর থেকে শরীরের আদল বোঝা যায় না। কিন্তু মথুরা ও গুপ্ত যুগের মূর্তির কাপড়ের মধ্য দিয়ে শরীরের গঠন বোঝানো হয়েছে। এসব যক্ষ-যক্ষী মূর্তির গায়ে প্রচুর অলংকারও আছে।

যন্ত্র একটি জ্যামিতিক নকশা। বৌদ্ধ চিত্রকলায় এর ব্যবহার দেখা যায়। বিশেষ করে আধ্যাত্মিক ধ্যানমগ্নতা বোঝাতে এই রূপ-চিহ্নের প্রয়োগ করা হয়।

যমপট চটের ওপর ছবি আঁকা এ-দেশের এক প্রাচীন রীতি। লম্বা চট বা কাপড়ের ফালিতে আঁকা এই ধরনের ছবি কাঠিতে জড়িয়ে খুলে খুলে দেখানো হত। প্রাচীনকালে এরকমই এক ধরনের পটকে বলা হয় যমপট। এই পট বাংলায় ঘরে ঘরে দেখানো হত। এই পটের বিষয় ছিল মৃত্যুর পরে যমালয়ে

নং ২৬৩. যমপট : বীরভূম। ২৪ x ৩২ ইঞ্চি।



গিয়ে মানুষকে কী ধরনের যন্ত্রণা ভোগ করতে হয় তার ছবি। বাণ 'হর্ষচরিত'-এ তাঁর দেখা এরকম পটের বর্ণনা দিয়েছেন। যেখানে থানেশ্বর নগরীতে পট্টিকার তাঁর বাঁ হাতে ঝোলানো পট খুলে খুলে গান গেয়ে যমপট দেখাচ্ছেন। সংস্কৃত নাটক মুদ্রারাক্ষসেও যমপটের নিদর্শন আছে। এখনও এই ধারা পুরোপুরি হারিয়ে যায়নি।



র

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মশতবর্ষে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা চিন্তার প্রসার ও প্রচার এবং রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ির 'মহর্ষি ভবন' প্রাঙ্গণে ১৯৬২ সালে ৮ মে রবীন্দ্রনাথের নামাঙ্কিত এই বিশ্ববিদ্যালয়ের

যাত্রা শুরু। পশ্চিমবঙ্গের তৃতীয় বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে এর প্রতিষ্ঠার পেছনে ছিল তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ডা. বিধানচন্দ্র রায়ের ব্যক্তিগত এবং সক্রিয় প্রচেষ্টা। শুরুতে রবীন্দ্র ভারতীতে দুটো শিক্ষা অনুষদ (Faculty) ছিল। চারুকলা অনুষদ এবং কলা অনুষদ। চারুকলা অনুষদদের আওতায় ছিল কণ্ঠসংগীত, যন্ত্রসংগীত, রবীন্দ্রসংগীত, নাটক ইত্যাদি এবং কলা অনুষদে ছিল ভাষা ও সাহিত্য, ইতিহাস ইত্যাদি। পরে ১৯৭২ সালে দৃশ্যকলা অনুষদ গঠিত হয়। যার অধীনে আছে চিত্রকলা, ভাস্কর্য, গ্রাফিক আর্ট, কর্মাশিয়াল আট ইত্যাদি। ১৯৭৬ সালে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় সম্প্রসারিত হয়। নতুন একটি প্রাঙ্গণ চালু হয় বি. টি. রোডের মরকত কুঞ্জে। মরকতকুঞ্জও ছিল ঠাকুর পরিবারের সম্পত্তি। এটি নির্মাণ করেছিলেন পাথুরিয়াঘাটার হরকুমার ঠাকুরের বংশধরেরা। এটিও একটি 'ঐতিহ্যগৃহ'। এখানে বালক রবীন্দ্রননাথের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের। বর্তমানে রবীন্দ্রভারতীর সবকটি অনুষদই 'মরকুঞ্জে' অবস্থিত। জোড়াসাঁকোতে রয়েছে শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রদর্শশালা। বর্তমানে 'রবীন্দ্রভবন' নামে আর একটি প্রাঙ্গণের কাজ শুরু হয়েছে বিধাননগরে।

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্যান্য অনুষদ থাকলেও এর খ্যাতি ও গুরুত্ব মূলত চারুকলা ও দৃশ্যকলা অনুষদের জন্যই। এখানে চারুকলা ও দৃশ্যকলাতে স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর উভয় পাঠক্রমই পড়ানো হয়। আগে দৃশ্যকলা অনুষদ প্রদত্ত ডিগ্রির নাম ছিল এম. ভি. এ এবং বি. ভি. এ কিন্তু বর্তমানে তা পরিবর্তিত হয়ে হয়েছে বি. এফ. এ এবং এম. এফ. এ। এর ফলে কিছু বিভ্রান্তিও দেখা দিয়েছে প্রায়োগিক বোঝাপড়ার দিক থেকে।

১৯৬৬ সালে. রবীন্দ্র ভারতী ইন্ডিয়ান আর্ট কলেজকে অনুমোদন দেয়। ২০০৬ সালে মেদিনীপুর আর্ট কলেজ এর অনুমোদন লাভ করে।

রাইস পেপার (Rice Paper)

প্রাচ্য দেশীয় এক ধরনের কাগজের জাতিগত নাম। নানা রকম দ্রব্য দিয়ে এই কাগজ প্রস্তুত করা হয়। এই কাগজের উপাদান হিসাবে বিশেষ করে ব্যবহার করা হয় তুঁতগাছ। তবে কোনোভাবেই ধান নয়। বেশিরভাগ রাইস পেপার পাতলা, দুর্বল এবং চোষক। তবে কিছু ব্যতিক্রমও আছে। সাধারণভাবে পাশ্চাত্য শিল্পীরা যেভাবে জল রং কাগজের

ওপর ঘষাঘষি জোরাজুরি করেন তা এই কাগজের ওপর চলবে না। বেশিরভাগ রাইস পেপারের ওপর রং লাগানোর সঙ্গে সঙ্গে স্থায়ী হয়ে যায়। তাই রাইস পেপারে সবসময় নিশ্চিত হয়ে এবং সুনিয়ন্ত্রিতভাবেই রং চাপাতে হবে।

রাগরাগিণী

ভারতীয় সংগীতের মূল শাখাপ্রশাখা রাগরাগিণী নামে পরিচিত। বিভিন্ন সময়ের জন্য আছে ভিন্ন ভিন্ন রাগরাগিণী। দিনের আট ভাগের এক ভাগকে বলে এক প্রহর। প্রতিটি প্রহরের ভাব ও মুহূর্তের উপযোগী একটি করে রাগ আছে। রাগরাগিণীর উৎস চারটে। যেমন লোকসংগীত, কাব্য, ভজন বা কীর্তন, দরবারি সংগীত। রাগমালার বিভিন্ন নামে এদের প্রমাণ মেলে। যথা পাহাড়ি, হিন্দোল, যোগী, সারঙ্গ প্রভৃতি। ষোড়শ শতাব্দী থেকে গাওয়ার পাশাপাশি রাগমালার কাব্য লেখার প্রচলন হয়। সেইসঙ্গে রেওয়াজ হয় রাগমালা কাব্যের পুঁথিতে ছবি এঁকে—দেখানোর রীতি। অনেক ছবি গীতবিধি সম্মত হল, আবার অনেক ছবি হল শিল্পীর খেয়াল অনুসারি।

প্রসিদ্ধ বহু রাগের ছবি অনেক সময়ই একরকম। যেমন



নং ২৬৪. টৌড়ি রাগিনী : মালব ঘরানার অণুচিত্র। সপ্তদশ শতাব্দী। ২৯ X ২১ ইঞ্চি।

ভৈরব রাগে আঁকা হল শিবের ছবি। ঝুলনের ছবিতে বোঝানো হল হিন্দোল, চৌড়িতে দেখানো হল একজন নারীর বীণার সুর শুনে হরিণ কাছে আসছে। বসন্ত রাগে দোলের ছবি। মেঘমল্লার বোঝানোর জন্য আঁকা হল কৃষ্ণের নাচ। বিভাস বোঝাতে প্রেমের দৃশ্য, এক পুরুষ প্রেমের ধনুক থেকে পুষ্প বাণ নিক্ষেপ করছে।

দীপক রাগের বিষয়ে অনেক গল্প প্রচলিত আছে। তানসেন এই রাগের অনুশীলন করতেন। আকবর বাদশার অনুরোধে একবার যমুনায় ডুবে এই রাগ আরম্ভ করেন। যমুনার জল গরম হয়ে ওঠে এই রাগের প্রভাবে। তানসেন নাকি দগ্ধ হয়ে সংগীত অসমাপ্ত রেখে তীরে উঠে আসেন। তখন তাঁর এক কিশোরী মেয়ে তাঁকে শীতল করতে মেঘরাগ দিয়ে বৃষ্টি ঝরান। এই রাগের ওপর বহু কাংড়া চিত্র অংকিত হয়েছে। অধিকাংশ চিত্রের ব্যাকগ্রাউন্ডে হলুদ লাগানো হয়েছে গ্রীষ্মের দাবদাহ বোঝাতে। রাগের স্ত্রী হল রাগিণী। রাগিণীদেরও নানা ছবি আছে। এদের আবার পুত্রও আছে। যেমন মালকোশ রাগ। পাঁচ স্ত্রী ও আটটি পুত্রকে নিয়ে গঠিত এই পরিবার।

দিনের বিভিন্ন প্রহরে বিভিন্ন রাগ গাওয়া হয়। যেমন ভোরের আলো আঁধারিতে গাওয়া হয় ভৈরব রাগ। রামকিরি গাওয়া হয় ভোরের আলোতে। সূর্যোদয়ের রাগ হল বিলাওয়ালী। কল্যাণ হল সন্ধ্যার অবসানের কালে। রাগরাগিণী ছবির পথ প্রদর্শক হল রাজস্থানি চিত্র। অন্য অঞ্চলের চিত্রকররা রাগরাগিণীর ছবি আঁকলেও তা রাজস্থানি চিত্রের মূল্যকে অতিক্রম করতে পারেনি বরং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই হয়ে উঠেছে রাজস্থানি চিত্রের অনুকরণ।

রাগমালা চিত্র

রাগরাগিনী দেখুন।

রাজপুত চিত্রকলা

রাজপুত চিত্রকলা হল রাজপুতানা, বুন্দেলখণ্ড এবং হিমালয় সংলগ্ন পাঞ্জাবের চিত্র। এই চিত্রের সময়কাল ষোড়শ শতাব্দীর শেষ থেকে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত। রাজপুত চিত্রকে সাধারণভাবে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। এক ভাগ হল রাজস্থানি অন্যভাগ পাহাড়ি। রাজস্থানি চিত্র হল সমতলের রাজপুতানা ও বুন্দেলখণ্ড আর পাহাড়ির রীতির দুটো শ্রেণি হল কাংড়া ও ডোগরা (জম্মু)। রাজপুত চিত্রের নানা শাখাপ্রশাখা ও বিবর্তন ধারা আছে যার মধ্যে নানা আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য বিকশিত হয়েছে যেমন গাড়োয়াল চিত্র,

নং ২৬৫. পাহাড়ি চিত্রকলা। গুপ্ত পরকীয়া। রসমঞ্জরী। ১৬৬০-৭০ খ্রিস্টব্দ।



শিখ চিত্র, জয়পুর, যোধপুর, কিষানগড়, বাশোলি প্রভৃতি। অনেকসময় হালকাভাবে দেখতে গিয়ে রাজপুত চিত্রের সঙ্গে হিন্দুচিত্র রীতিকে এক করে ফেলা হয়। এর একটা কারণ ভারতবর্ষের একটা অঞ্চলের সঙ্গে অন্য অঞ্চলের চিত্ররীতির ব্যাপক আদানপ্রদান। রাজপুত চিত্রকলার আলোচনায় সমসাময়িক মুঘল চিত্রের উপস্থিতি অনিবার্য এবং প্রাসঙ্গিক। কেন-না একে অপরের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে নানাভাবে। মুঘল আমলের ঐতিহাসিক আবুল ফজল বলেছেন 'drawing the likeness of anything is called tawsbir' অর্থাৎ কোনো কিছুর সাদৃশ্য অঙ্কন হল তসবির। কিন্তু মুঘল চিত্রে Contemporary life বা *সমসাময়িক জীবনের ছবি আঁকা হয়নি তা আঁকা হয়েছে* রাজপুত চিত্রে। উলটোদিকে মুঘল চিত্রের মুখ্য বিষয় হল শাসককুল এবং তাদের প্রথা ও রীতি। কুমারস্বামীও বলেছেন যে বহু হিন্দুশিল্পী মুঘল দরবারে কাজ করতেন বলে মুঘল চিত্রে রাজপুত তথা ভারতীয় চিত্ররীতির মিশ্রণ ঘটে। যেমন মুঘল চিত্রে রাজপুত চিত্রের কম্পোজিশন রীতি এবং স্পেস তথা বিস্তার চেতনার প্রয়োগ ঘটে। আবার রাজপুত চিত্রে

দিন ও রাতের মধ্যে আলোর যে প্রভেদ বোঝা যেত না তা দূর হয় মুঘল চিত্রের সংস্পর্শে এসে। তবে রাজপুত চিত্রকলা মুঘল চিত্রকলার থেকে অনেক বেশি প্রাচীন এবং তার ভিত্তিও পাকাপোক্ত। কেন-না রাজপুত চিত্রকলার ঐতিহ্যের শিকড় রয়েছে প্রাচীন ভারতীয় ফ্রেস্কো তথা প্রাচীরচিত্ররীতির মধ্যে। রাজপুত মুঘল চিত্রে রেখার প্রাধান্য থাকলেও সেই রেখা মুঘল চিত্রের মতো প্রবহমান এবং পেলব নয়। তা অনেক বেশি নির্দিষ্ট। মুঘল চিত্রের উৎস পারস্য রীতি, ফলে মুঘল চিত্রে ক্যালিগ্রাফির প্রভাব বিদ্যমান, যদিও উৎকর্ষ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তা হ্রাস পেয়েছে কিন্তু রাজপুত চিত্রের সঙ্গে ক্যালিগ্রাফির কোনো সম্পর্ক নেই। ষোড়শ শতাব্দীর রাজপুত চিত্র বিশেষ করে 'কৃষ্ণলীলা'তে গুজরাটি চিত্ররীতির প্রভাব আছে। সেখানে ফিগারগুলি, যেমন কৃষ্ণের জন্য অপেক্ষমাণ রাধা একটার ওপর আর একটা—এভাবে Superimpose করে আঁকা। পারস্পেকটিভের ব্যবহার নেই। অন্যদিকে ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে রাগমালা চিত্রে কিছু নতুন বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। এই চিত্রাবলিতে রঙের উজ্জ্বলতা বেড়েছে। এসময়ের ছবি একটু অ্যাবস্ট্র্যাক্ট। রেখা ও রং জোরালো। বিষয় বিন্যাস পরিমিত। দর্শকের কল্পনা ও আবেগের স্থান আছে। রাজপুত চিত্রের মধ্যে পৌরাণিক ও লৌকিক উভয় বিষয়ই স্থান পেয়েছে। রাজপুত চিত্রের পোর্ট্রেট মুঘল প্রোর্ট্রেটের মতো প্রতিকৃতি চিত্রণের চেয়েও পৌরাণিক বীরোচিত ভাবকেই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। পরবর্তীকালের রাজপুত চিত্রের শিল্পীদের একটি অসামান্য নৈপুণ্য উল্লেখযোগ্য। তা হল সোনার জলের প্রাথমিক প্রলেপের ওপর গ্লেজিং পদ্ধতিতে একই ছবিতে চাঁদের আলো এবং আগুনের আলোকে ফুটিয়ে তোলা। রাজপুত চিত্রের শেষ পর্যায় হল কাংড়া বা কাটোচ স্কুল।

রাজস্থানি চিত্র

রাজপুত চিত্রের দুটো ভাগের একটি হল রাজস্থানি অন্যটি হল পাহাড়ি। এই বিভাজন হয়েছে ভূগোল অনুসারে। কুমারস্বামী রাজপুত চিত্রকে বলেছেন অভিজাত লোকশিল্প। এরই সন্ধান পাওয়া যাবে রাজস্থান সহ পশ্চিমভারতের প্রাচীরের গায়ে। এই প্রাচীরচিত্রের রীতি ও মুঘল মিনিয়েচারের মিশ্রণ রাজপুতানা এবং পাঞ্জাবের কিছু অংশের শিল্পীদের হাতে যে নতুন রূপ পায় তাই রাজস্থানি চিত্র নামে পরিচিত।

ছবি নং ২১০ পৃ ৩৮১

রিজিয়নালিজ্‌ম (Regionalism)

একটি আমেরিকান সাদৃশ্যবাদী ধারার চিত্র আন্দোলন, ১৯৩০-এর মধ্যপশ্চিম আমেরিকার শিল্পীদের সঙ্গে যুক্ত মুখ্যত, গ্রান্ট উড, থমাস হার্ট বেনটন এবং জন স্টিউয়ার্ট কারির শিল্পকর্ম। এই ত্রিমূর্তি শিকাগোর আর্ট ইনস্টিটিউটে প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন। তাঁরা সকলেই ছিলেন মধ্যপশ্চিম অঞ্চলের বাসিন্দা। তবে তাঁদের প্রাথমিক চর্চার ক্ষেত্রে ভিন্নতা ছিল। এঁদের মধ্যে অন্যতম বেনটন প্যারিসে সিনক্রোমিজ্‌ম রীতিতে কাজ করতেন। এমনকি দেশে ফেরার পরেও! ১৯২০ সালে তিনি ফিগারেটিভ পেন্টিং-রীতিতে কাজ করতে শুরু করেন। গ্রান্ট উড প্রাথমিকভাবে ইমপ্রেশনিস্ট রীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পরে জার্মান রেনেসাঁস এবং ন্যু শাকলিক্‌কিটের দ্বারা প্রভাবিত হন। উড তাঁর ছবিতে নির্লিপ্ত বিচ্ছিন্নতা এবং সময়ের ব্যঙ্গাত্মক টুকরো-বাস্তববাদকে প্রকাশ করতেন। এছাড়াও মধ্যপশ্চিম আমেরিকার চাষি ও মধ্যবিত্ত মানুষের নিখুঁত ডিটেল এবং তাদের পেশার খুঁটিনাটি এঁকে উড আমেরিকান বাস্তববাদীরীতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ রূপকার হিসাবে পরিচিত হয়েছিলেন। কিন্তু ১৯১০-এ যখন বিশুদ্ধ আমেরিকান ফিগারেটিভ ছবি এবং ছাপাই ছবির ক্ষেত্রে বিচ্ছন্নতাবাদী মন্দা এসেছিল তখন তাঁদের রিজিয়নালিজ্‌ম জাতীয় স্তরে বহুল প্রশংসিত হয়। আশ্চর্যের হল, এই তিন শিল্পীরই ১৯২০ সালে ইউরোপে বিমূর্ত ধারায় কাজ করার ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা ছিল। কিন্তু অ্যাবস্ট্র্যাক্ট এক্সপ্রেশনিজ্‌মের উত্থান হলে অনুগ্রহের অভাবে রিজিয়নালিজ্‌ম কাজ বন্ধ করে। পরে এর বিষয় গভীরতা আবার খ্যাতি লাভ করলে ১৯৭৫-এ পুনরায় চর্চা শুরু হয় এবং ১৯৮০ ও ১৯৯০-এ ফের বড়ো মাপের প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়।

রিয়ালিজ্‌ম (Realism)

সাধারণভাবে বাস্তববাদী রীতিকে বোঝালেও প্রকৃতপক্ষে রিয়ালিজ্‌ম হল ঊনবিংশ শতাব্দীর শিল্প আন্দোলনের এক ধারা যা ঊনবিংশ শতাব্দীতে ফ্রান্সে গস্তেভ কুর্বের নেতৃত্বে একদল শিল্পীর তৎকালীন শিল্পরীতি রোমান্টিসিজ্‌মের কল্পনা এবং ভাবাবেগ সর্বস্বতার বিরুদ্ধে এক বিদ্রোহ। এই ধারার শিল্পীরা সমকালীন সাধারণ জীবন আচরণ এবং সমস্যার চিত্রকেই তাঁদের বিষয় করেছিলেন। এমনকি রোমান্টিসিজ্‌মের বিরোধিতার অঙ্গ হিসাবে তাঁদের ছবিতে অতিরিক্ত পরিমাণে মানুষের আদিম আচরণসহ অশিষ্ট কাজকর্মকেও অন্তর্ভুক্ত

করেছিলেন। সেইসঙ্গে সমাজের উঁচু তলার মানুষের অনৈতিক কাজকর্মকে নিয়ে তীব্র ব্যঙ্গাত্মক চিত্রও এঁকেছিলেন। এর অন্যতম বড়ো উদাহরণ হল দ্যমিয়ের ছবি। সাধারণ মানুষের শ্রমনিবিড় দৃশ্যও এসব ছবির মধ্যে ফুটে উঠেছিল। এই আন্দোলনের প্রবাদ প্রতিম শিল্পী কুর্বে ছিলেন আমজনতার আদমি। টগবগে ডেমোক্র্যাট। বুর্জোয়া সম্মানের প্রতি কোনো মোহ ছিল না। ১৮৫০ সালের সালোঁতে তিনি গ্রামীণ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ('এ বারিয়াল অ্যাট অরন্যানস') এবং পাথর ভাঙারত শ্রমিকের একগাদা ছবি নিয়ে তীব্র বিতর্ক জুড়ে দিয়েছিলেন। চাষি মজুরদের নিয়ে ছবি আঁকা কোনো নতুন বিষয় ছিল না। ডাচ জঁর পেন্টিং-এ এরকম ছবি বহু আঁকা হয়েছে কিন্তু কুর্বে এই মজুরদের পূর্ণাবয়ব প্রতিকৃতি এঁকে তাঁদের মর্যাদা এবং গুরুত্ব দিয়ে ব্যতিক্রম সৃষ্টি করেছিলেন।

১৮৫৫ সালে প্যারিস ওয়ার্ল্ড এগজিবিশন-এর প্রবেশ পথের কাছেই কুর্বে তাঁর একক প্রদর্শনী করেছিলেন। প্রদর্শনীর জুরিদের কাছে মনোনয়নের জন্য ছবি জমা দিতে হবে বলে তিনি ওয়ার্ল্ড এগজিবিশনের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে তাঁর প্রদর্শনীকক্ষের দরজায় তিনি লিখে রেখেছিলেন— রিয়ালিজ্ম জি. কুর্বে : এগজিবিশন অব ফরটি অব হিজ পেন্টিংস।' 'এ বারিয়াল অ্যাট অরন্যানস' প্রসঙ্গে একটি সংবাদপত্রে চিঠি লিখে কুর্বে তাঁর অবস্থান স্পষ্ট করে বলেছিলেন। 'আমি শুধু একজন সোশ্যালিস্ট নই, আমি একজন ডেমোক্র্যাট এবং একজন রিপাব্লিকান; সংক্ষেপে, আমি সমগ্র বিপ্লবকেই সমর্থন করি এবং সর্বোপরি আমি সম্পূর্ণরূপেই একজন বাস্তববাদী... কারণ বাস্তববাদী হওয়ার অর্থ হল প্রকৃত সত্যের একজন সৎ বন্ধু হওয়া।' (উদ্ধৃতি: ব্রিটানিকা এনসাইক্লোপিডিয়া অব ভিশুয়াল আর্ট থেকে ভাষান্তরিত)।



নং ২৬৬. দ্যমিয়ে · দ্য থার্ড ক্লাস ক্যাবেজ। ১৮৬২। তেল রং। আরও ছবি নং ২১৬ পৃ. ৩৮৫, ২২৭ পৃ. ৩৯১

কুর্বের আঁকা 'দি স্টোনব্রেকার' ছবিটি অন্যান্য রিয়ালিস্টদের কাছে আদর্শস্বরূপ ছিল। বিশেষ করে সেই সব রিয়ালিস্ট যাঁরা প্রগতিবাদী সমাজ ও রাজনৈতিক প্রচারের স্বার্থে কমবেশি স্বাভাবিক রূপকে ব্যবহারের কথা বলেন। সমাজবাদের অন্যতম একজন প্রবক্তা প্রুধোঁ 'স্টোনব্রেকার' ছবিটিকে 'প্রথম সমাজতান্ত্রিক' ছবি বলে চিহ্নিত করেন।

কুর্বের অন্যতম বিখ্যাত ছবি হল 'দি আর্টিস্ট'স স্টুডিয়ো'। বিশাল এই ছবিটি প্রায় ২০ ফুট প্রশস্ত। ১৮৫৫ সালে প্যারিসের আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে ইন্ডিপেন্ডেন্ট 'প্যাভিলিয়ন অব রিয়ালিজ্‌ম'-এ প্রদর্শিত হয়েছিল। দেলাক্রোয়া পর্যন্ত বলেছিলেন 'এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছবি'। কুর্বে নিজে এই ছবি সম্পর্কে বলেছিলেন, এই ছবি হল তাঁর স্টুডিয়োর নৈতিক এবং আক্ষরিক ইতিহাস। বোদলেয়র রিয়ালিস্ট ছবি নিয়ে রচনা লিখলেন— 'দি পেন্টার অব মডার্ন লাইফ।'

দ্যমিয়ে এই সময়ের সমাজজীবন নিয়ে আঁকলেন 'দ্য থার্ড ক্লাস ক্যারেজ'। যার মধ্যে ফুটে উঠল সাধারণ মানুষের অভাবী জীবনযাত্রার যন্ত্রণা। এই ছবিতে কোনো বীরসুলভ ভঙ্গি ছিল না। ছিল না ভাবপ্রবণতার রোমান্টিক অনুভূতি। বরং দ্যমিয়ের স্বভাবসিদ্ধ দক্ষতায় প্রতিটি ফিগার ও চরিত্র স্পষ্টতা নিয়ে চত্রিত। বালজাক দ্যমিয়েকে মাইকেলাঞ্জেলোর সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। এমনকি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে দেলাক্রোয়া দ্যমিয়ের তেল রঙের অনুকরণ করেছিলেন।

দ্যমিয়ের রিয়ালিজ্‌মের সত্যনিষ্ঠা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, শাসককুল এবং তাঁদের প্রতিভূরা বিরূপ হয়ে পড়েছিলেন। তথাকথিত বুদ্ধিজীবী সমাজ সমালোচনায় মেতে উঠলেন। দ্যমিয়য়ের ছবি 'রু ট্রানসনোনেইঁ' লিথোগ্রাফে পুলিশি নির্যাতনে মৃত্যুর ছবির বাস্তবতা সংবাদপত্রের চিত্রধর্ম লাভ করেছিল। এমনকি পুলিশ সেই লিথোগ্রাফের পাথরটি পর্যন্ত বাজেয়াপ্ত করে। এসব সত্ত্বেও রিয়ালিস্টদের ছবিতে অনিবার্যভাবেই কিছু চিন্তাগত স্ববিরোধিতাও লক্ষ করা যায়।

রিলাইনিং (Relining) ছবি বাঁধানোর একটি পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে পুরোনো ক্যানভাসটিকে নতুন একটি মাউন্ট করা ক্যানভাসে বাঁধানো হয়।

রিলিফ (Relief) ভাস্কর্যের একটি রূপ। এতে বিষয়বস্তুর অবয়বকে নিরলাম্ব (Free Standing) না করে কোনো পৃষ্ঠতলের ওপর

অংশত বা সম্পূর্ণ উন্নত করে তৈরি করা হয়। রিলিফ বা অনুন্নত ভাস্কর্যের শ্রেণিবিভাগ আছে। যেমন লো রিলিফ। যাকে ফরাসি এবং ইতালীয় ভাষায় যথাক্রমে বাস রিলিফ ও বাসো রিলিভো বলে। এই রিলিফে অবয়বের প্রকৃত গভীরতার অর্ধেকের কম অংশ পৃষ্ঠতল থেকে উঁচু হয়ে থাকে। মেজোরিলিফ বা মিডিয়াম রিলিফে ভাস্কর্যের অবয়ব পৃষ্ঠতলে তার মূল গভীরতার অর্ধেক উন্নত অবস্থায় থাকে। হাই রিলিফ বা ইতালীয় পরিভাষায় অলটো রিলিভোতে ভাস্কর্যের অবয়বের মুখ্য অংশগুলো এতটাই উঁচু হয় যেন তা পৃষ্ঠতল থেকে সম্পূর্ণ আলাদা বলে মনে হয়। রিলিফকে চিত্রায়িত ভাস্কর্য বলা যায়। একই সঙ্গে দ্বিমাত্রিক ও ত্রিমাত্রিকতার যুগ্ম চরিত্র রিলিফকে বহুমুখী ও তাৎপর্যপূর্ণ আঙ্গিকের মর্যাদা দিয়েছে। লো রিলিফ প্রায় চিত্রবৎ। লো রিলিফ কখনোই ভাস্কর্যের সংকোচন নয়। বরং অনেক লো রিলিফকে ড্রয়িং ও পেন্টিং-এর উৎকর্ষ রূপ বলেই মনে করা হয়। যেমন প্রাক্ কলম্বীয় ভাস্কর্যের উন্নত সমতল ছায়াচিত্রবৎ রিলিফ কিংবা প্রাচীন পশ্চিম এশিয়ার উৎকীর্ণ রেখাদার রিলিফ। উভয়ই ভাস্কর্যের গভীরতার বদলে তাৎপর্যপূর্ণ টেক্সচার ও প্যাটার্ন তৈরি করেছে।

সংকোচনশীল চিত্রপরিসর হিসরবে রিলিফের ধারক পৃষ্ঠতলের ধারণা আদিযুগের ভাস্করদের অজানা ছিল না। তবে পঞ্চদশ শতাব্দীতে প্রণালীবদ্ধ পরিপ্রেক্ষিত বা পারস্পেকটিভের উদ্ভাবনের পর এটা সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হয়। মহান ইতালীয় শিল্পী এবং ফ্লোরেনটাইন ভাস্কর দোনাতেল্লো এক ধরনের রিলিফের উদ্ভাবন করেন যা স্টিয়াক্কিয়াটো বা ফ্ল্যাটেন রিলিফ নামে পরিচিত। সামান্য মাত্রার উন্নত তল এবং উৎকীর্ণ রেখার সুন্দর সমন্বয় ঘটিয়ে এক উত্তম চিত্রগত পরিবেশের ফলাফল সৃষ্টি এই রিলিফের বৈশিষ্ট্য। সাদা মার্বেল পাথরে তৈরি দোনাতেল্লোর এই রিলিফের মডেলিং ও এনগ্রেভিং-এর সূক্ষ্ম উৎকর্ষকে আজও কেউ ছাপিয়ে যেতে পারেনি। পাথরের রিলিফে উপস্থাপিত অবয়বের গভীরতাকে কখনোই বাস্তব অবয়বের প্রকৃত গভীরতার মতো করা যাবে না। রিলিফ ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে পশ্চাৎ ধাবিত সামনের ফর্মগুলির আপাত সঠিক বিন্যাস সৃষ্টি একটি কঠিন কাজ। শিল্পী এর একটা সমাধানে পৌঁছোতে, সামনে থেকে দেখতে যেমন লাগে সেই

অনুসারে ফর্মের বিকৃতি ঘটান। ফলে এই রিলিফ তির্যকভাবে দেখতে একটু অন্যরকম লাগতে পারে। কখনো-কখনো দূরের দৃশ্যগত ফলাফল তৈরির জন্য পৃষ্ঠতলে উপস্থাপিত বস্তুর অবয়বের প্রোজেকশন বা অভিক্ষেপণের মাত্রার তারতম্য ঘটানো হয়। ঘিরার্টির 'গেটস অব প্যারাডাইস' রিলিফটি এর একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। এই রিলিফটি তৈরি করা হয় যখন সিস্টেমেটিক পারস্পেকটিভের সদ্য আবিষ্কার ঘটেছে। এই ছবিতে বর্ণিত দূরের ফিগার ও অন্যান্য জিনিস পৃষ্ঠতল থেকে অতি সামান্য উন্নত। কিন্তু কাছের বস্তু ও ফিগারগুলিকে মিডিয়াম-হাই রিলিফে এমনকি কার্যত পৃষ্ঠতলের সঙ্গে সম্পর্কহীন করে করা হয়েছে। যদিও রিলিফ মূলত স্থাপত্যের সঙ্গে সম্পর্কীত বিষয় তবু রিলিফ মুদ্রা, পদক এমনকি আসবাবপত্রের ক্ষেত্রেও পরিচিত। তাছাড়া চিত্রকলায় ত্রিমাত্রিকতার আভাসগুণকে রিলিফ বলা হয়।

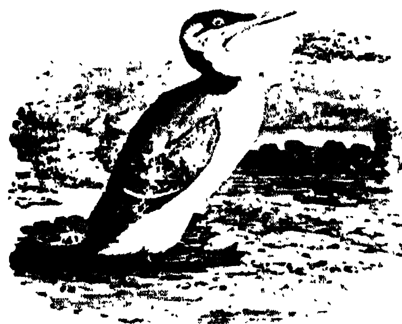
ছবি নং ১৮২ পৃ. ৩৬৫

রিলিফ প্রিন্টিং (Relief Printing)

মুদ্রণ বা ছাপার একটি পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে কালি থাকে উন্নত তলে অর্থাৎ raised surface-এ। মুদ্রণতলের অপ্রয়োজনীয় অংশ হয় কেটে তুলে ফেলা হয়, নয় নীচুতে থাকে। মুদ্রণতল উন্নত হয় বলেই এই পদ্ধতির নাম রিলিফ প্রিন্টিং। ছাপচিত্র বা প্রিন্ট মেকিং-এর ক্ষেত্রে উডকাট, লিনোকাট, উড এনগ্রেভিং হল রিলিফ প্রিন্টিং-এর উদাহরণ। ছাপার এই পদ্ধতির সঙ্গে ইউরোপীয় শিল্পীদের পরিচয় প্রায় পাঁচশো বছর আগে ঘটলেও মনে করা হয় এর উদ্ভব চিন দেশে প্রায় চোদ্দোশো বছর আগে। কাঠ বা অন্য কোনো তলে একটি নকশাদার অংশকে রেখে বাকি অংশকে বাটালি দিয়ে কুঁদে তুলে ফেলে নকশাদার অংশে কালি লাগিয়ে তার ওপর কাগজ বা বিকল্প কিছু চাপিয়ে জোরে চাপ দিয়ে

নং ২৬৭. থমাস বেউইক। ব্রিটিশ বার্ড। ছাঁচ সহ উড এনগ্রেভিংস। ১৮৬২। ৬৪.১X৯০.২ সেমি.।





ছাপ তুলে আনা হয়। একটা আলুকে দু-টুকরো করে কেটে নিয়ে একটি শিশুও এভাবে ছাপ তুলতে পারবে। জাপানে এই পদ্ধতিতে আধুনিক পদার্থ ব্যবহার করে শিল্পী কিতাগাওয়া উতামারো এক উন্নত শিল্পআঙ্গিক তৈরি করেছিলেন। পিকাসো এবং মাতিস দুজনেই লিনো মাধ্যম দিয়ে চর্চা করেছেন এবং সুন্দর লিনোকাট ছবি তৈরি করেছিলেন। প্রিন্টমেকিং বা ছাপচিত্রের জন্য লাগে কাগজ। মধ্যযুগের শেষ পাদে ইউরোপের বাইরেও কাগজ তৈরির কারখানা ছড়িয়ে পড়ে। সেই সঙ্গে চালনযোগ্য হরফ দিয়ে ছাপা আবিষ্কার হওয়ায় বইয়ের মুদ্রণও বেড়ে যায়। সেই বইতে সংকলনের জন্য এই পদ্ধতিতে ছবি ছাপা হতে শুরু করে। মধ্যযুগে ইউরোপে উড এনগ্রেভিং খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। বহু স্বর্ণকার এবং অস্ত্র নির্মাতা এই পেশা গ্রহণ করেন। উড কাট এবং উড এনগ্রেভিং-এর একজন দক্ষ খোদাইকর এবং কারিগর টমাস বেউইক আদতে ছিলেন নবিশ স্বর্ণকার। টমাস বেউইক চোদ্দো বছর বয়সেই একজন এনগ্রেভারের কাছে কাঠের ব্লকে ছাপা অলংকরণের শিক্ষানবিশ ছিলেন। রিলিফ প্রিন্টিং-এর জন্য লাগে খুব সাদামাটা যন্ত্র ও উপকরণ। যেমন বক্স উড। কাট কাটার জন্য নরুন জাতীয় জিনিস। কাটার যন্ত্রগুলি 'U', 'U', 'V' আকৃতির হয়। এগুলিকে বলে গ্রেভার টুল বা বুরিন। কাঠের তলে নকশা এঁকে নিয়ে এই বুরিন দিয়ে নকশাদার অংশ ছাড়া বাকি অংশ কুঁদে তুলে তারপর কালি লাগিয়ে ছাপ নেওয়া হয়। *উড কাট দেখুন।

রেজিন (Resin)

বিভিন্ন গাছগাছড়া বিশেষ করে পাইন, ফার প্রভৃতি থেকে ক্ষরিত প্রাকৃতিক কষ বা আঠা। হলদে থেকে বাদামি রঙের এই কষ স্বচ্ছ অস্বচ্ছ দুইই হয়। বাতাসের সংস্পর্শে এসে এই কষ শক্ত বা আধাশক্ত হয়ে যায়। অনেক গাছের ক্ষরিত রসকে গাম বলে, যা জলে গুলে যায় কিন্তু রেজিন জলে দ্রবীভূত হয় না। রেজিন বার্নিশের উপাদান হিসেবে ছাপাই ছবির কালিতে, পাতগালা এবং ল্যাকার বার্নিশে ব্যবহার করা হয়। কয়েকটি রেজিন মধ্যে যেমন, কোপাল রেজিন, ড্যামার রেজিন— ইন্দোনেশিয়ায় জন্মানো এক ধরনের গাছ থেকে প্রাপ্ত। এই রেজিন নরম, ঠিক কোপাল বার্নিশের বিপরীত। ড্যামার রেজিন টারপেনটাইনে দ্রবীভূত হয়।

ম্যাস্টিক রেজিন— গাছের আঠা থেকে প্রস্তুত। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে এই গাছ জন্মায়। ড্যামার বার্নিশের মতো করে এই রেজিন তৈরি করা হয়। তেল রঙের ছবির ওপরে এই রেজিন থেকে তৈরি বার্নিশের প্রলেপ লাগানো হয় ধুলোময়লা ও আর্দ্রতা রোধ করতে। তবে এখন এর ব্যবহার কমে এসেছে আরও উন্নতমানের সিনথেটিক রেজিন তৈরি হওয়ার।

রেজিস্টার (Register) — রঙিন মুদ্রণের ক্ষেত্রে একের বেশি রঙের প্লেট বা ব্লক থেকে কাগজে বা অন্য কোনো তলে ছেপে পূর্ণাঙ্গ রঙিন ছবি করা হয়। এইসব আলাদা আলাদা রঙের প্লেট বা ব্লকগুলোর ছাপ একটি নির্দিষ্ট অবস্থানে না পড়লে ছবি অস্পষ্ট হয়ে যায়। এই ছাপ পড়ার স্থানের নির্দিষ্টকরণকে বলে রেজিস্ট্রেশন। তা থেকে রেজিস্টার অর্থাৎ একরেখ।

রেটিনাল পেন্টিং (Retinal Painting) — অপটিক্যাল আর্টের সমার্থক শব্দ।

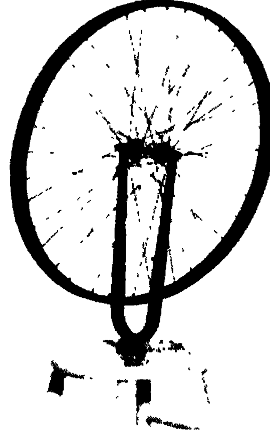
রেডফিগার ভাস (Redfigure Vase) — গ্রিক ভাসচিত্রের একটি কৌশল। অ্যাথেন্সে খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ থেকে পঞ্চম শতাব্দীতে এই রীতির উদ্ভব হয়েছিল। এটি ব্ল্যাক ফিগার পদ্ধতির ঠিক বিপরীত। এই চিত্রে পাত্রের ওপর আঁকা ফিগারগুলো রিভার্স বা উলটো। পাত্রের মূল রং লালে হয় আর ফিগারের চারপাশের জমি অর্থাৎ ব্যাকগ্রাউন্ড কালো রং দিয়ে ভরাট করা হত। এই পদ্ধতির সুবিধা হল যে এতে তুলির সাহায্যেই ফিগারগুলিকে অনেক বেশি অনুপুঙ্খ করে চিত্রিত করা যেত। ব্ল্যাক ফিগারের ক্ষেত্রে যা করতে হত ছায়া সদৃশ ফিগারের ওপর উৎকীর্ণ রেখার সাহায্যে।



নং ২৬৮. ইউফ্রোনিয়োস : রেড ফিগার। ৫১০ - ৫০০ খ্রিস্টপূর্ব।

রেডিমেড (Readymade)

১৯১৩ সালে মার্সেল দুসঁপ এই শব্দটিকে পরিভাষা রূপ দান করেন। সাধারণভাবে শিল্প-কারখানায় প্রস্তুত পণ্যাদি। এইসব বস্তুকে তার ব্যবহারিক ভূমিকা থেকে সরিয়ে এনে শিল্পকর্ম হিসাবে উপস্থাপিত করা। এক্ষেত্রে পণ্যটির কোনো পরিবর্তন ঘটানো হয় না অথবা হলেও সামান্য। দুসঁপের প্রথম রেডিমেড হল 'বাইসাইকেল হুইল', 'বটল্‌ রক', 'ফাউনটেন' ইত্যাদি। রেডিমেডের মধ্য দিয়ে শিল্পীরা



নং ২৬৯. মার্সেল দুসঁপ : বাইসাইকেল ১৯৫১। অ্যাসেমব্লেজ।

উদ্দেশ্যমূলক ও ক্রোধোদ্দীপকভাবে প্রথাগত শিল্পকর্মকে অস্বীকার করতে চেয়েছেন। অন্যদিকে রেডিমেড অত্যন্ত জোরের সঙ্গে নির্দেশ করেছে শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে রূপায়ণের চেয়ে ধারণার অগ্রাধিকারকে।

রেনেসাঁস (Renaissance)

প্রায় ১৪০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৬০০ খ্রিস্টাব্দ কাল পর্যন্ত ইতালির সামাজিক, রাজনৈতিক, শিল্পসাহিত্যের ক্ষেত্রে উদ্ভূত বৈশিষ্ট্য। রেনেসাঁস শব্দটা ফরাসি। যার অর্থ হল 'নবজন্ম'। রোমানেস্ক বা গথিক শব্দের মতো রেনেসাঁস শব্দটি কোনো তকমা নয়। রেনেসাঁস একটা যুগলক্ষণ বা যুগ। এই যুগ এবং শিল্পসংস্কৃতিবিপ্লবের সূত্রপাত ঘটেছিল উত্তর ইতালিতে। এই পরিবর্তনকে নানাভাবে বর্ণনা করা



নং ২৭০. মাইকেলাঞ্জেলো . ডেভিড। ১৫০১ - ০৪ খ্রিস্টাব্দ। উচ্চতা ১৬ ফুট ১০.৫ ইঞ্চি। আরও ছবি নং ১৭৩ পৃ. ৩৬০ নং ১৮৩, ১৮৪ পৃ. ৩৬৬, ছবিনং ১৯৫ পৃ. ৩৭৩

হয়েছে। যেমন, কখনও বলা হয় ধ্রুপদি আদর্শের অনুকরণে শিল্প ও সাহিত্যের পুনরুজ্জীবন অথবা একটি মানবতাবাদী আন্দোলন, যার মধ্যে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে সম্ভ্রান্ত মানুষের নতুন বিশ্বাস এবং বাস্তব জগতে তার দৃঢ় ও সাহসী ভূমিকা। মহান ইতালীয় শিল্পী ও ঐতিহাসিক জর্জিয়ো ভ্যাসেরি এই প্রসঙ্গে 'রিনাসকিটা' শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। জিয়োত্তো থেকে মাইকেলাঞ্জেলো পর্যন্ত চিত্রকলায় আঙ্গিকগত যে পরিবর্তন হয়েছিল বলে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন তাকে বোঝাতে এই শব্দটির প্রয়োগ করেছিলেন। তবে শব্দটির সবচেয়ে ব্যাপক অর্থে প্রয়োগের ধারণাটি আসে জ্যাকব বার্কহার্ডের লেখা 'সিভিলাইজেশন অব দি রেনেসাঁস ইন ইতালি' থেকে। যা কিছুমাত্রায় রোমান্টিক এবং গোটা পর্বটাকে পুষ্পিত নান্দনিক মূল্যবোধ এবং সাংস্কৃতিক যুগসন্ধিক্ষণ বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আসলে শব্দটা পঞ্চদশ শতাব্দীর ইতালীয়রা ব্যবহার করতেন সমকালীন চিন্তা ও শিল্পের জগতে যে বিপ্লব সংঘঠিত হয়েছে তাকে বর্ণনা করতে। তাঁরা দৃঢ়ভাবে জানতেন যে, তাঁরা মোড় ঘুরছেন এবং উৎসাহের সঙ্গে বিশ্বাস করতেন যে, বহুযুগের নিদ্রার পরে তাঁরা ধ্রুপদি মূল্যবোধ ও সত্যিকারে শিল্পের পুনরুজ্জীবন ঘটাচ্ছেন।

মধ্যযুগে প্রাচীন গ্রিস ও রোমের সাফল্যকীর্তি হারিয়ে গিয়েছিল বা অবহেলিত হয়েছিল। মধ্যযুগের পরপরই রেনেসাঁস এসেছে বলে এমনটা মনে হতে পারে। হাজার বছরের বিরতির পর হঠাৎ চোদ্দোশো খ্রিস্টাব্দে নতুন করে শুরু হল— আর্টের ক্ষেত্রে এমনটা সম্ভব নয়। আসলে সমগ্র মধ্যযুগ ধরে সামাজিক, রাজনৈতিক ও বৌদ্ধিক জগতের ভেতরে ভেতরে ধীরে ধীরে যে শক্তির সমাবেশ ঘটছিল তাই চোদ্দোশো খ্রিস্টব্দে একত্রিত হবার ফলে সমস্ত ধরনের কাজকর্মের উদ্গীরণ ঘটে যে কালে তাকে আমরা বলি রেনেসাঁস। সেই কারণেই বলা যায় মধ্যযুগের শেষ পর্বের মূল্যবোধের সঙ্গে রেনেসাঁসের আদিপর্বের মূল্যবোধের বিশেষ কোনো পার্থক্য ছিল না। তবু এযুগের বৈশিষ্ট্যের গভীরতার জন্যই রেনেসাঁসকে আলাদা করে চেনা যায়। এই যুগে সবরকম মানবিক, বৌদ্ধিক, সামাজিক রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপেরই বৈপ্লবিক অগ্রগতি ঘটেছিল। সামগ্রিকভাবে ইউরোপীয় সংস্কৃতিতে যে ধর্মনিরপেক্ষতার গুরুত্ব বাড়ছিল

তা রেনেসাঁসের সময়ে অভিজাতবর্গের পৃষ্ঠপোষকতার মধ্যে প্রতিফলিত। তথাপি মহান শিল্পীদের ক্ষেত্রে গির্জার আনুকূল্য ও পৃষ্ঠপোষণা অব্যাহত ছিল। যেমন মাইকেলাঞ্জেলোর ক্ষেত্রে পোপদের সাহায্য। তা শুধু যে রোমের মুখই উজ্জ্বল করেছিল তা নয়, গোটা ইউরোপীয় শিল্পের অগ্রগতি ঘটিয়েছিল। রেনেসাঁস শিল্পীদের অবস্থার ক্ষেত্রেও মৌলিক পরিবর্তন এনেছিল। এতদিন তাঁদের বলা হত দক্ষ, বা একটু সম্মান দিয়ে কারিগর। এখন তাঁরা গুণের জন্য প্রশংসিত ও অভিনন্দিত হলেন এমনকি ভয় মিশ্রিত বিস্ময়েও তাঁদের দেখা হতে লাগল। রেনেসাঁসে শিল্পীরা হলেন শ্রেষ্ঠস্তরের মানুষ। এই সময়ের শ্রেষ্ঠ প্রতিভাধরদের অনেকের মনন বৌদ্ধিক ও শৈল্পিক গণ্ডি ছাড়িয়ে গিয়েছিল। যাঁদের এখন বলা হয় 'রেনেসাঁস ম্যান' অর্থাৎ যাঁরা বহুক্ষেত্রে পারদর্শী। এর আদর্শ উদাহরণ হল লিয়োনার্দো দা ভিঞ্চি, মাইকেলাঞ্জেলো প্রমুখ। দা ভিঞ্চির কথা যেমন সবাই জানেন মাইকেলাঞ্জেলো বুয়োনারত্তিও তেমনি। শুধু সিসটাইন চ্যাপেলের ফ্রেস্কোই নয়, ফ্লোরেন্সের বিশালাকার ভাস্কর্য 'দাভিদ'ও তাঁর বিস্ময়কর সৃষ্টি। তিনি কবিতা লিখতেন, স্থাপত্য গড়তেন, এমনকি শাসক পোপের জন্য অস্ত্রের নকশাও বানাতেন।

রেনেসাঁসে স্থাপত্যের ক্ষেত্রে দেখা যায় যুক্তি ও বিজ্ঞানসম্মত অভিমুখ নিয়ে প্রাচীন স্থাপত্যরীতির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হল। সরল আকৃতি যেমন চৌকো, গোল এসবকে ব্যবহার করা হল। ভিট্রুভিয়ান কায়দার মতো করে মানবদেহের আনুপাতিক হার ঠিক করা হল এবং আলবের্তি, ব্রুনেলেশ্চি প্রমুখরা যুক্তিবাদী নীতিনির্দেশ ঠিক করলেন। প্রাচীন ভাস্কর্যের নবরূপকার হিসাবে নিকোলা পিসানোর নাম বলা হয়। কিন্তু প্রাচীন ভাস্কর্যের তাৎপর্য যাঁর সৃষ্টিতে প্রথম ধরা পড়েছিল তিনি হলেন দোনাতেল্লো। চিত্রকলার ক্ষেত্রে সমস্যা হল সেইসময় শিল্পীদের কাছে কোনো রোমান আদর্শ ছিল না। বরং প্লিনির দেওয়া বর্ণনা অনুযায়ী প্রকৃতির দিকে সত্যের ধ্রুপদি অনুসন্ধান এবং মানুষের অবয়বের উৎকর্ষ রূপের তাগিদ গথিক রীতি ও আদর্শকে বাতিল করেছিল। ব্রুনেলেশ্চি এক-বিলীয়মান-বিন্দু পরিপ্রেক্ষিত আবিষ্কার করেছিলেন। যদিও যে ছবিগুলিতে তিনি এর প্রয়োগ করেছিলেন তা হারিয়ে গেছে। পরে আলবের্তি

গাণিতিক নিয়মের সাহায্যে এই সূত্রের উন্নতিসাধন করেন। এই সময় মুদ্রণ পদ্ধতির বৈপ্লবিক প্রযুক্তির আবিষ্কার হয়। সামগ্রিক রেনেসাঁস আন্দোলনের কিছু পর্ব-বিভাগও করা হয়েছে। যেমন আরলি রেনেসাঁস বা আদি রেনেসাঁস এবং শীর্ষ রেনেসাঁস বা হাই রেনেসাঁস। হাই রেনেসাঁসের সময়কাল খুবই সংক্ষিপ্ত। মাত্র ১৫০০ থেকে ১৫২০ খ্রিস্টাব্দ। হাই রেনেসাঁসের প্রকাশ হয়েছে যখন আরলি রেনেসাঁস পূর্ণমানে বিকশিত তখন। আরলি বা আদি রেনেসাঁসের বিষয় ছিল সাধারণভাবে ধ্রুপদি জগতের পুনরাবিষ্কার। শিল্পী ও ঐতিহাসিক ভ্যাসেরির কথায়, পঞ্চদশ শতাব্দীর শিল্পীরা সূক্ষ্ম বিষয়গুলি ধরতে পারেননি, সজীব এবং মূর্তি বিষয়ের মনোহর ও সুন্দর কোমলতাকে উপেক্ষা করেছেন, তাঁদের কাজেও যথেষ্ট পরিমাণে সুন্দর পোশাক, কল্পনাময় অনুপুঙ্খতা, মুগ্ধকর রং, বহু ধরনের বাড়িঘর, ভূ-দৃশ্যের গভীরতার অভাব ছিল। ভ্যাসেরির মতে লিয়োনার্দো দা ভিঞ্চিই এগুলি প্রবর্তন করেন এবং যা পূর্ণতা পায় মাইকেলাঞ্জেলোর হাতে, ঠিক যখন আধুনিক পর্ব চরমসীমায় পৌঁছায়। হাই রেনেসাঁসের উল্লেখযোগ্য সৃষ্টির মধ্যে রয়েছে দা ভিঞ্চির শেষের দিকের কাজ, র‍্যাফায়েলের পরিণত সৃষ্টি, মাইকেলাঞ্জেলোর এই সময়কালের সব কাজ। রেনেসাঁসের সংস্কৃতি ক্রমে ইউরোপের অন্যান্য দেশেও পৌঁছোয়। প্রায় সমকালেই ইতালির বাইরে রেনেসাঁস সংস্কৃতির যে প্রসার ঘটে তা নদার্ন রেনেসাঁস নামে পরিচিত। যার শুরু বলা যায় ইন্টারন্যাশনাল গথিক দিয়ে আর সমাপ্তি বারোকে।

রেপ্লিকা (Replica)

প্রকৃত অর্থে রেপ্লিকা হল কোনো শিল্পীর নিজের শিল্পকর্মের তথা চিত্র. ভাস্কর্যের স্বকৃত প্রতিলিপি। কিন্তু একটু ঢিলেঢালা ভাবে বললে রেপ্লিকা হল একটি শিল্পকর্মের দুটো অভিন্ন প্রতিরূপের কোনো একটি, বিশেষ করে যখন কোনটা আসল তা জানা নেই। তবে এখন সাধারণভাবে রেপ্লিকা বলতে বোঝায় যেকোনো শিল্পকর্মের ছোটো বড়ো হুবহু প্রতিরূপ।

রেয়নিজ্‌ম (Rayonnism, Rayonism, Rayism)

রাশিয়ান ভাষায় লুচিজ্‌ম। 'লুচ' হল Ray বা রশ্মি। এই 'রে' থেকেই 'রেয়নিজ্‌ম' বা 'রেইজ্‌ম'। এই আন্দোলনের সূত্রপাত করেছিলেন প্রখ্যাত রাশিয়ান শিল্পী ও নকশাকার মিখাইল ল্যারিয়োনভ, তাঁর স্ত্রী শিল্পী নাতালিয়া গনচারোভা

এবং আরও কয়েকজনকে নিয়ে। ১৯১৩ সালের মার্চে তাঁরা 'টারগেট' নাম দিয়ে এই আঙ্গিকের ছবি নিয়ে প্রথম প্রদর্শনী করেন মস্কোতে। রাশিয়ান এই শিল্পীদ্বয় ইতোমধ্যে রাশিয়ান আভঁ গার্দ আন্দোলনে সহায়ক হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছেন, বিশেষ করে জ্যাক অব ডায়মন্ড গোষ্ঠীর সদস্য হিসাবে। যা সেসময়ে পাশ্চাত্য আভঁ গার্দ এবং রাশিয়ান লোকশিল্পের মিলিত এক শিল্পরীতিকে তুলে ধরেছিল।

রেয়নিজ্‌মের বৈশিষ্ট্যকে নিয়ে ল্যারিয়োনভরা প্রায় ১৯১১ সাল থেকে কাজ করে যাচ্ছিলেন। প্রদর্শনীর প্রায় এক মাস পরে ১৯১৩-র এপ্রিলে রেয়নিস্ট ম্যানিফেস্টো প্রকাশিত হয়। সেখানে রেয়নিস্ট ধারার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন ল্যারিয়োনভ। রেয়নিজ্‌ম হল অবৈষয়িক বা নন অবজেক্টিভ চিত্রশৈলী। ল্যারিয়োনভ বলেছিলেন, রেয়নিস্ট পেন্টিং-এর লক্ষ্য বস্তু নয়, বস্তুর থেকে প্রতিফলিত আলোক রশ্মির পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া। যেহেতু রশ্মিগুলি রঙের দ্বারা উপস্থাপিত তাই রেয়নিজ্‌ম যৌক্তিকভাবে 'প্রকৃতরূপ' নিরপেক্ষ একটা শৈলীতে পরিণত হয়ে 'চতুর্থ মাত্রা'র সৃষ্টি করেছে।



নং ২৭১. মিখাইল ল্যারিয়োনভ : জনৈক নারীর প্রতিকৃতি। ১৯১৯।

রেয়নিস্টদের ম্যানিফেস্টোতে ঘোষিত বর্ণনা, গতি নির্দেশক প্রাণবন্ত রেখার ব্যবহার প্রভৃতি রেয়নিস্টদের ইতালীয় ফিউচারিস্টদের সঙ্গে যুক্ত করেছিল। রেয়নিস্টরাও তাঁদের কাজে ফিউচারিস্টদের মতো যন্ত্র সৌন্দর্যের জন্য আবেগের প্রদর্শন করতেন। রেয়নিজ্‌মের পেছনে বিভিন্ন বিষয়ের একটি সম্মিলিত প্রভাব ছিল। একদিকে যেমন ছিল রাশিয়ান সিম্বলিস্ট মিখাইল ভ্রুবেল-এর ছবিতে ব্যবহৃত ভাঙা রত্নসদৃশ পৃষ্ঠতলের মতো বুনট তেমনি অন্যদিকে ছিল বিজ্ঞান ও আলোকচিত্রে আগ্রহী ল্যারিয়োনভের নিজস্ব আলোকচিত্র বিষয়ক আবিষ্কার 'রে-গাম'। তবে রেয়নিস্ট ছবির মুখ্য আঙ্গিক হল রঙের সরু মোটা ফিতে সদৃশ পোঁচ। কেন-না ল্যারিয়োনভ নিজেই বলেছেন যে আমরা যা দেখি তা যদি আক্ষরিক ভাবে আঁকতে চাই তাহলে বস্তুর থেকে প্রতিফলিত আলোক রশ্মিগুচ্ছকে আঁকতেই হবে। রং, আলো এবং বুনটের অনুসন্ধান থেকে উৎসারিত এই রেয়নিস্ট চিত্রকলা কার্যত ১৯১৬-১৭ সালের রাশিয়ান শিল্পীদের সুপ্রিম্যাটিজ্‌মের সন্ধান দিয়েছিল এবং রাশিয়ান কনস্ট্রাক্টিভিজ্‌মের বিবর্তনের সহায়ক হয়েছিল।

এই আন্দোলনের স্বল্প সময়সীমার মধ্যে রেয়নিস্ট ছবির অসংখ্য আন্তর্জাতিক ও জাতীয় প্রদর্শনী হয়েছে। একা গনচারোভা প্রায় ৭০০ ছবি নিয়ে একটা একক প্রদর্শনী করেছিলেন। এই আন্দোলনের অন্যতম শরিক মালেভিচ ১৯১২-১৩ সালে করা নিজের কাজকে বলতেন 'কিউবো-ফিউচারিস্ট' শিল্প।

রেস্টোরেশন (Restoration)

শিল্পকলার ক্ষেত্রে ছবি রেস্টোরেশনের বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রেস্টোরেশন কথাটির অর্থ পুনরুদ্ধার। অর্থাৎ ছবিকে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে দেওয়া। যদিও এক্ষেত্রে সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধার দুটি শব্দই ব্যবহার করা হয়। কিন্তু পুনরুদ্ধারের চাইতে সংরক্ষণ কথাটিই অনেক বেশি যুক্তি সম্মত। অন্যদিকে সংরক্ষণ কথাটির তাৎপর্যও অনেক ব্যাপক। কেন-না সংরক্ষণ বললে যা বোঝায় তা হল কোনো শিল্পকলায় কী ধরনের বস্তু ব্যবহার করা হয়েছে, তাদের ধর্ম, গুণাগুণ, কীভাবে তা নাড়াচাড়া করা যাবে, সেই বস্তুসমূহের ক্ষতির কারণ, ক্ষতি রোধের উপায়,

ইত্যাদির চর্চা এবং কর্মপন্থা। লন্ডনের ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব কনজারভেশনের স্ট্যাটাসে যা বলা হয়েছে তা এইরকমই। তাই সংরক্ষণের মধ্যে রেস্টোরেশনও অন্তর্ভুক্ত। অন্যদিক থেকে এটা গুরুত্বপূর্ণ যে শিল্পকলা সামগ্রীকে যদি সঠিকভাবে ও অবস্থায় রক্ষণাবেক্ষণ করা যায় তাহলে শিল্পকলার স্বাস্থ্যও ভালো থাকে অর্থাৎ শিল্পবস্তুর ক্ষতি কম হয়।

প্রথমত, দেখতে হবে তাপমাত্রা ও আপেক্ষিক আর্দ্রতার বিষয়টি। যে-ঘরে শিল্পবস্তু রাখা হবে তার আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৪৫ থেকে ৬০ শতাংশের মধ্যে থাকা উচিত। আর তাপমাত্রা ২০° থেকে ২৪° ডিগ্রি সেলসিয়াস। এক্ষেত্রে শীততাপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সবচেয়ে বেশি কার্যকর হলেও তা ব্যয়বহুল। তবে বদ্ধ শোকেসে বা আলমারিতে 'সিলিকা জেল' রাখলে আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণে থাকে। এর জন্য প্রতি স্কোয়ার মিটারে ৫০০ গ্রাম সিলিকা জেল লাগবে। অন্যথায় কলিচুন বা যথেষ্ট পরিমাণে তুলো রেখে দিলেও কাজ চলে। সিলিকা জেল বা তুলো বাষ্পগ্রাহী বস্তু। আর্দ্র হলে জলীয় বাষ্প শোষণ করে আবার অনার্দ্র হলে বাতাসে জলীয় বাষ্প ত্যাগ করে। সিলিকা জেল নানা বাণিজ্যিক নামে পাওয়া যায়। যেমন জাপানে প্রস্তুত একধরনের সিলিকা জেলের বাণিজ্যিক নাম 'Art Sorb'। সৌরবিকিরণের প্রভাব কমাবার জন্য দেয়ালে আলো প্রতিরোধী ব্যবস্থা বা বস্তু যথা রিফ্লেক্টর লাগানো যেতে পারে। দ্বিতীয়ত, আলো নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি দেখতে হবে। শিল্পকর্ম তথা ছবির ওপর আলোর আপতনে ছবি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, বিশেষ করে জৈবসামগ্রী ব্যবহৃত ছবি। কতটা ক্ষতি হবে তা নির্ভর করে আলোর প্রকৃতি ও প্রাবল্য এবং শিল্পকর্মে ব্যবহৃত পদার্থের চরিত্রের ওপর। সাধারণত ৫০০ ন্যানোমিটারের নীচের তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলো শিল্পকর্মের ক্ষতি সাধন করে। সূর্যের আলোয় ৩০০ ন্যানোমিটারের নীচের তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের অতিবেগুনি রশ্মি থাকে না বায়ুমণ্ডলে শোষিত হবার কারণে। কিন্তু ৫০০ থেকে ৩০০ ন্যানোমিটার তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের UVR থাকে। এক্ষেত্রে সবচেয়ে ভালো টাংস্টেন ল্যাম্পের উজ্জ্বল আলো। এই আলোয় অতিবেগুনি রশ্মি এবং বেগুনি রশ্মি থাকে না। কিন্তু এই আলোর অন্য একটি সমস্যা হল এর থেকে সৃষ্ট উত্তাপ। সবচেয়ে ভালো

ফিলিপস-৩৭ ফ্লুরোসেন্ট টিউব। এতে UVRও কম উত্তাপও কম। তবে আলোর ব্যাপারে দেখতে হবে যাতে ব্যবহৃত আলোর দীপন মাত্রা ৫০ লাকসের বেশি না হয়। শিল্পকর্মকে কীটপতঙ্গের হাত থেকে রক্ষা করতে হবে। এজন্য শিল্পকর্মগুলিকে ফামিগেশন বা বাষ্পস্নান করাতে হবে। এ ব্যাপারে যে সমস্ত কীটনাশক রাসায়নিক যৌগ ব্যবহার করা হয় তার মধ্যে আছে প্যারাডাইক্লোরোবেঞ্জিন, কার্বন ডাই-সাইফালইড, মিথাইল ব্রোমাইড, কার্বন টেট্রাক্লোরাইড প্রভৃতি। এই কাজ দ্রবণ স্প্রে করেও করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে বাজারে কিনতে পাওয়া যায় এমন সব ঘরের পোকামাকড় মারার একটু দামি স্প্রে ব্যবহার করা যায়। তবে তা বর্ণহীন হওয়া দরকার ও তৈলাক্ত না হওয়া বাঞ্ছনীয়। দূর থেকে খুব সতর্কতার সঙ্গে স্প্রে করা উচিত। স্প্রে করার পর ঘরের মুক্ত হাওয়ায় কিছুক্ষণ রেখে দেওয়া দরকার দ্রবণ বাষ্পীভূত হওয়ার জন্য।

গ্রীষ্মপ্রধান দেশের আর্দ্র আবহাওয়াময় অঞ্চলগুলিতে আর এক ধরনের সমস্যা হল ছত্রাক। ছত্রাক যেহেতু নিজেদের খাদ্য নিজেরা তৈরি করতে পারে না, তাই আধারকেই তারা খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। ছত্রাক বায়ুজীবী বা অবাতজীবী দুটোই হয়। ছত্রাক চিত্রকলায় বড়ো রকমের বিকৃতি ঘটায়। তেল রঙের ছবিতে ছত্রাক জন্মানোটা এক অতি পরিচিত অভিজ্ঞতা। যেসব রং জৈব পদার্থ বা প্রাণিজ উপাদান দিয়ে তৈরি তার ওপর ছত্রাক বেশি জন্মায়।

ছত্রাক দূর করতে ক্যানভাসের ওপরের শুকনো ছত্রাক ভালো করে পরিষ্কার করা দরকার। তারপর ছত্রাকনাশক কাগজে মুড়ে সপ্তাহখানেক রেখে দিতে হবে। ফিল্টার কাগজ ১ শতাংশ ফিনাইল মারকিউরিক অ্যাসিটেট-এর দ্রবণে ডুবিয়ে শুকিয়ে নিয়ে ছত্রাকনাশক কাগজ তৈরি করা যায়। তেল রং ছাড়া অন্য মাধ্যমে আঁকা এরকম ছবির ক্ষেত্রে ক্যানভাসের পেছনে রেক্টিফায়েড স্পিরিটের সঙ্গে ১০ শতাংশ থাইমল মিশিয়ে স্প্রে করা যেতে পারে। তবে স্পিরিটের জন্য আগুনের দিকে নজর রাখতে হবে। ক্যানভাসে আঁকা ছবি সবসময় ফ্রেমে টানটান করে রাখতে হবে। ছবি রেস্টোরেশন বা পুনরুদ্ধারের বিষয়টি বেশ জটিল ও সঙ্কটপূর্ণ কাজ। বহু ধরনের পরীক্ষানিরীক্ষার প্রয়োজন হয় এই কাজের প্রস্তুতি পর্বে। ছবিতে ব্যবহৃত

উপকরণ ও তার চরিত্র, তার সংগ্রহের সময়কাল, চিত্রণের পদ্ধতি, অন্তবর্ণস্তর এবং চাপাপড়া বা পূর্বসম্পাদিত চিত্র কি না এসব জেনে নিতে হবে। অবশ্য এখন আধুনিক পদ্ধতিতে পরীক্ষা করে এ সবকিছু জানা সম্ভব। ফলে রেস্টোরেশনের কাজের অগ্রগতিও ঘটেছে অনেক। শিল্পীর ইতিহাস, অঙ্কিত ছবিটির ইতিহাস, সমকালীন করণকৌশলের ইতিহাস ও অগ্রগতি, চিত্রপরিকল্পনা ইত্যাদি অনেক খুঁটিনাটি বিষয় জেনে, পরীক্ষা করে রোগ নির্ণয়ের পর ছবি সারাইয়ের পন্থা নির্বাচন করতে হয়। একটু ভুল হয়ে গেলে ছবির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ওস্তাদি হারিয়ে যাবে চিরদিনের মতো। পরবর্তীকাল সেই অমূল্য সৃষ্টির একটা 'প্লাস্টিক সার্জারি' করা রূপকে দেখবে। তাই রেস্টোরেশনের কাজ খুবই কঠিন এবং দায়িত্বপূর্ণ। ভুল চিকিৎসায় যেমন মানুষ পঙ্গু হয়ে যায় তেমনি ছবির ক্ষেত্রেও রেস্টোরেশনে ভুল মানে ছবিকে সংকরত্ব দান। তবে এর ক্ষেত্রে অনেক উল্লেখযোগ্য কাজও হচ্ছে বিদেশে এবং আমাদের দেশেও। এখন তো ন্যাশনাল গ্যালারিতে সংরক্ষণ ও সংস্কার বিষয়ে ডিগ্রি পাঠক্রমও পড়ানো হয়। কলকাতার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে ১৯৪০ নাগাদ পার্সি ব্রাউনের উদ্যোগে ছবি সংরক্ষণ ও সংস্কার বিভাগ চালু হয়। এখানে বহু পুরানো ছবির সংস্কার করা হয়েছে। রোস্টোরেশনের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, পঞ্চদশ শতাব্দীতে আঁকা আলেজান্ডার মরনেয়র-এর প্রতিকৃতির টুপি এবং ব্যাকগ্রাউন্ডের প্রুশিয়ান ব্লু রংকে শিল্পীর ব্যবহৃত মূল বর্ণ প্রকল্পের অংশ বলেই প্রথমে ধরে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু চিত্রতলের ক্রস-সেকশন প্রিন্ট এবং বর্ণপ্রলেপের গঠনের গ্যাস-ক্রোমাটোগ্রাফির সাহায্যে মাইক্রোকেমিক্যাল পরীক্ষার পর জানা যায় যে প্রলেপের ওপরে ব্যবহৃত প্রুশিয়ান ব্লু রংটি পরে লাগানো হয়েছে। প্রুশিয়ান ব্লু আবিষ্কার হয় ১৭০৪ সালে অর্থাৎ ছবি আঁকার প্রায় ২০০ বছর পর। যেমন জানা গেছে সিসটাইন চ্যাপেলের মহাফ্রেস্কো মাইকেলাঞ্জেলো পোপ জুলিয়াস ২-এর জবরদস্তিতে শুরু করেছিলেন। প্রথমে অনিচ্ছা নিয়ে ফ্রেস্কোটি সংস্কার করতে গিয়ে এই তথ্য খুঁজে পেয়েছেন প্রখ্যাত রেস্টোরার জিয়ানলুইজি কোলালুচ্চি।

রেস্টোরেশন স্টাইল (Restoration Style) অতিসমৃদ্ধ ইংলিশ বারোক আলংকারিক শৈলী। ইংল্যান্ডে ১৬৬০ সালে দ্বিতীয় চার্লসের সিংহাসনে আরোহণ-এর সংস্কারের মধ্য দিয়ে এই শৈলীর প্রবর্তন হয়েছিল। এতে

হল্যান্ডের প্রভাব ছিল এবং কিছুটা ফ্রান্সেরও। সেই সঙ্গে প্রাচ্যের সুবিদিত ভারতীয় ছাপা কাপড় এবং জাপানি পালিশ করা আখরোটের ও ভিনিয়ার আসবাবপত্রের প্রভাবও ছিল। যা ক্রমশই ওক কাঠের ভারী আসবাবপত্রের স্থান দখল করে নিয়েছিল।

রোকোকো (Rococo)

ফরাসি রোকাই-কে (rocaille) রোকোকো শব্দটির উৎস বলে মনে করা হয়। যেন বারোকের সঙ্গে একটু ধ্বনিগত মিল বজায় রাখতে। আক্ষরিকভাবে 'রোকাই'-এর অর্থ হল রক ওয়ার্ক বা পাথুরে কর্ম। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ায় ফ্রান্সে রোকোকো একটি বিশুদ্ধ আলংকারিক শৈলী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। এর রূপ বৈশিষ্ট্যকে সাধারণভাবে তিনটে কথায় নির্দিষ্ট করা যায়। যথা সমতলতা ও ত্রিমাত্রিকতা বিহীন অলংকরণ, কোঁচকানো আকৃতিকে পিঠাপিঠিভাবে পেঁচিয়ে তৈরি বক্ররূপের প্রাচুর্য, এবং অপ্রতিসম নকশা। রোকোকেতে খোলা (Shell), পাথর বা উদ্ভিদের রূপকে C এবং S স্ক্রোল দিয়ে যুক্ত করা হয়েছে। রোকোকো আলংকারিক শৈলী হওয়ার কারণে ছোটো ছোটো শোভাপ্রদ জিনিসপত্র যেমন রুপো এবং পোরসিলেনের দ্রব্য সাজানোর ক্ষেত্রে এর ব্যাপক প্রয়োগ ঘটে। এর প্রভাবে আসবাব-পত্রগুলোর স্থাপত্য চরিত্র হ্রাস পেয়ে কার্যকারী এবং উপযোগী ও অনুপম হয়ে ওঠে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফ্রান্সের বড়ো ক্যাবিনেট প্রস্তুতকারকরা যেমন জে. এফ. ওব্যাঁ, জাক দুবোয়াস, শার্ল ক্রেসঁ, জে. এইচ. রেইজনের প্রমুখরা সম্ভবত রোকোকোর শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধিত্বকারী শিল্পী।

ইংল্যান্ডে আসবাবপত্রের নকশার বাইরে রোকোকোর বিশেষ একটা গুরুত্ব ছিল না। দক্ষিণ জার্মানিতে যে রোকোকো শৈলী গড়ে উঠল তা ফ্রান্সের থেকে একটু ভিন্ন চরিত্রের। দক্ষিণ জার্মানিতে রোকোকো যেন বারোকের শৈলীকেই অব্যাহত রাখে। বারোকের থেকে সব কিছু নিয়ে বিকশিত হয় অথচ বারোক থেকে সরে যাবার চেষ্টা করে। ফ্রান্সের রোকোকোর ধারণার সঙ্গে এর যোগ ছিল সামান্যই। বরং এর ওপর মুখ্য প্রভাবও ছিল ইতালীয় বারোকের। কখনও বা অস্ট্রিয়ার বারোকের প্রভাব লক্ষ করা গেছে। ইতালির দেশি বারোকের মধ্যেও রোকোকোর আলংকারিক রীতির প্রকাশ ঘটেছে। এই শৈলীতে অষ্টাদশ শতাব্দীর

ছবি নং ১৮৫ পৃ. ৩৬৭

ইতালিতে হাজার হাজার অট্টালিকা ঘর বাড়ি নির্মাণ করা হয়েছে। স্বীকৃত গির্জাগুলি এবং বিচারালয়গুলি ধ্রুপদি বারোকের অতি কোমল শৈলীকে উৎসাহিত করেছিল। রোকোকোর ক্ষেত্রে ফ্রান্স ও জার্মানির আলংকারিক শৈলী সমান গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ফ্রান্সের রোকোকো শৈলী সারা ইউরোপ সহ বাকি পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছিল। ফ্রান্সের শিল্পীরা যেমন জঁ অনারে ফ্রাগোনার্ড প্রমুখরা ইতোমধ্যেই রুবেনিজ্‌মের নিগড় ছিঁড়ে বেরিয়ে এসেছেন। তাঁদের প্যালেটে সাজালেন উজ্জ্বল সব রং, তাঁদের কম্পোজিশনে আনলেন সরল সৌন্দর্য্য, ওয়াটেকে অনুসরণ করে নতুন জঁর পেন্টিংকে কাজে লাগালেন। ওয়াটেকে রোকোকো শিল্পী বলা হয় তার কিছু বৈশিষ্ট্যের জন্য। কিন্তু রোকোকো আদিরূপ বা আর্কিটাইপাল পেন্টার হলেন ফ্রঁসোয়া বুসের। সারা ইউরোপ জুড়ে এই শৈলী ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু শতাব্দীর মধ্যপর্বের পরে বিভিন্ন শিল্পীদের কাজের সঙ্গে রোকোকোর চেনা প্রকাশভঙ্গির পার্থক্য গড়ে ওঠে। যেমন— ইংল্যান্ডে হোগার্থ, ইতালিতে জিয়ামবাতিস্তা তিয়েপোলোর ছবি। ১৭৬০ সালের মধ্যে ফ্রান্স এবং ইউরোপের অধিকাংশে রুচি পালটে যায় নিওক্লাসিসিজ্‌মের দিকে। কিন্তু জার্মানির বহু জায়গায় রোকোকো অব্যাহত থাকে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত।

রোমান্টিসিজ্‌ম্ (Romanticism)

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যপর্ব পর্যন্ত পল্লবিত এক মুখ্য শিল্প আন্দোলন। এই আন্দোলন লালিত হয়েছিল রুশো, বায়রন, ওসিয়ান এবং গেটে প্রমুখের রোমান্টিক সাহিত্য দ্বারা। কোনো কোনো মত অনুসারে রোমান্টিক আন্দোলন ছিল ক্লাসিসিজ্‌ম বা ধ্রুপদিবাদ এবং যুক্তিবাদী বিশ্বকোশ সংকলকদের বিরুদ্ধে এক প্রতিক্রিয়া, যদিও এর নিজেরই একটা ধ্রুপদি ভিত্তি ছিল। এই কারণেই আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে রোমান্টিক শব্দের এই ব্যাখ্যার প্রভেদ আছে। এই শব্দের ব্যবহারের ইতিহাসেও তা স্পষ্ট।

মধ্যযুগের বীরগাথা উৎসজাত romuant শব্দটি রেনেসাঁসের সময় থেকে কাল্পনিক বা অসম্ভবকে বোঝাতে ব্যবহৃত হত। জার্মান সমালোচক ফ্রেডরিক শ্লেভেল তাঁর ও তাঁর ভাইয়ের সম্পাদিত একটি পত্রিকায় ১৭৯৮ সালে



নং ২৭২. কনস্টেবল : দি হেওয়েন। ১৮২১। ক্যানভাসের ওপর তেল রং। ১৩০.২১X১০৯ সেমি.। আরও ছবি নং ২১৫ পৃ. ৩৮৫

রোমান্টিক কবিতার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে একরকম শিল্পের ক্ষেত্রে প্রথম romuant শব্দটি ব্যবহার করলেন। শ্লেভেল ভাইরা রোমান্টিসিজ্‌মকে ব্যাপক তাৎপর্যময় ও আধুনিক অর্থে সমগ্র ধ্রুপদি উত্তর যুগের ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে চেয়েছেন। কবি কোলরিজও একই রকমভাবে বিষয়টিকে দেখেছিলেন যে, প্রাচীনকালের সব কিছুকে ক্লাসিক নামে চিহ্নিত করা যেমন অভ্যাস তেমনি আধুনিক সময়ের সবকিছুই যেন রোমান্টিক। ফলে প্রথম রোমান্টিক শব্দটা মধ্যযুগীয় আধ্যাত্মিক এবং আজগুবি চরিত্রের বিপরীতে মৌলিকভাবে আধুনিক হিসাবে দেখা গেলেও এই আধুনিকতার মধ্যে ছিল বর্তমানের প্রতি স্পষ্ট বিরূপতা এবং যার অনুসিদ্ধান্ত সমকালীন জগতের বীরোচিত ধারণার বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি শ্লেষ। উভয় অর্থেই এই শব্দটা ১৮২০-র সময়কালে বিশেষকরে ফ্রান্সে একটা রণহুংকার সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু এই আন্দোলন সত্যিই শক্তি হারিয়ে ফেলে যখন রিয়ালিস্টরা কম উচ্ছ্বাসপৃক্ত বর্তমানের দৃষ্টিভঙ্গি সমর্থন করতে আরম্ভ করেন। যে পরিস্থিতিতে রোমান্টিসিজ্‌মের উদ্ভব তাই এর কল্পনার আকর্ষণকে বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। এই সময় জার্মান রোমান্টিসিজ্‌মের দুর্জ্ঞেয় ভাববাদ অধ্যাত্মবাদী দর্শনের দ্বারা উৎসাহিত হয়েছিল। তখনকার

রাজনৈতিক ঘটনাবলিও আরও বেশি করে একে সক্রিয় করেছে। সন্ত্রাসের শাসনে ফরাসি বিপ্লবের পরাজয় এবং পরবর্তীতে নেপলিয়নের একনায়কতন্ত্র ইত্যাদি ঘটনাবলি, বিশেষ করে ফ্রান্সের বাইরে অষ্টাদশ শতাব্দীর আলোক-প্রাপ্তিতে অর্জিত যুক্তিবাদী সক্ষমতা, স্বাভাবিক অনুভূতি, অতীতের কুসংস্কার এবং অবিচারকে তাড়িয়ে দেবার যে বিশ্বাস তা অনেকের কাছে মিথ্যে মনে হয়েছিল। এই রাজনৈতিক আন্দোলন এবং এতে বিশ্বাসী বুদ্ধিজীবীদের কাছে শিল্পবিপ্লবও ছিল খুব খারাপ যা সামাজিক অগ্রগতি নিয়েও সন্দেহ জাগিয়েছিল। যদিও ইংল্যান্ডে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পাদে শিল্পায়ন শক্তি সঞ্চয় করেছিল যার প্রতিফলন দেখা যায় শিল্পী ব্লেকের ছবিতে। ইউরোপের এই শিল্পায়নের অগ্রগতির বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়াই পাওয়া যায় গভীর রোমান্টিক রূপচিহ্নে। যার সঙ্গে ছিল প্রকৃতির অবাধ্য অবস্থার উপস্থাপন এবং অতীতের ওপর জোর দেওয়া। অতীতকাতরতা সত্ত্বেও এই প্রবণতার সঙ্গে ধ্রুপদিবাদী শিল্পী পুসাঁর আদর্শবাদী আর্কেডিয়ান ধারণার মৌলিক পার্থক্য আছে। বিষাদ, এমনকি ট্রাজিক মেলোড্রামাও অতীতের রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গির থেকে উঁচুতে। পরন্তু প্রাকৃতিক অবভাসও মানব অনুভূতির মধ্যে গলে গেছে। যার প্রথম আবির্ভাব ইংরেজি রোমান্টিসিজ্‌মে বিশেষ করে ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতায়। তবে জার্মান ল্যান্ডস্কেপ পেন্টিং-এও গাছ, পাহাড়, আকাশ সবই আবেগসিক্ত রূপ লাভ করেছে। ফ্রেডরিক এবং রুনজের ক্ষেত্রে ল্যান্ডস্কেপ ছিল সুন্দরের অভিব্যক্তি। রুনজের ল্যান্ডস্কেপে শিশুদের ছবি হল শৈশবের নির্মলতাব রোমান্টিক বিশ্বাসের যথার্থ অভিব্যক্তি। শিল্পী শিশুর কল্পনায় দেখা নির্মল প্রকৃতি জগৎকে আঁকার জন্য আত্মভোলা হওয়ার সংগ্রাম করেছেন। রোমান্টিক বিশ্বাসের কেন্দ্রীয় ভাবনা ছিল আত্মপ্রকাশ, স্বতঃস্ফূর্ততা এবং শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাস। ফ্রান্সে জেরিকোল একোল দে বোজার-এর কঠোর প্রশিক্ষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে বলেছিলেন প্রতিভা হল আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের মতো যা অবশ্যই 'ফেটে বেরোবে।' দেলাক্রোয়ার সমৃদ্ধ ও উজ্জ্বল রং, উদ্যমী তুলির কাজ, নাটকীয় ও আবেগপূর্ণ বিষয়ের মধ্যে একটা আদর্শ মূর্ত হয়েছিল। ইংল্যান্ডে রোমান্টিক চিত্রধারার সূত্রপাত ঘটেছিল ফুসেলির ছবি দিয়ে

আর শেষ হয়েছিল কনস্টেবল, টার্নারকে দিয়ে। ব্লেক-এর মতো মৌলিক প্রতিভাধর শিল্পীর তুলিতে ঘটেছিল এর চরম প্রকাশ। অত্যাচারের প্রতি বিদ্বেষ, বিপ্লবের প্রতি সমর্থন, শৈল্পিক স্বাধীনতার ঘোষণা ছিল ব্লেকের সমকালের বৈশিষ্ট্য। তথাপি তাঁর প্রকৃতিবাদ বহির্ভূত দৃষ্টিভঙ্গিতে তাঁর অন্তর্ভাবের চিত্রায়ণ ছিল দুর্লভ এমনকি রোমের শিল্পীদের মধ্যেও। সংকীর্ণ অর্থে বলা যেতে পারে ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি রোমান্টিসিজ্‌ম যখন শেষপর্যন্ত রিয়ালিজ্‌মের সঙ্গে মিশে গেল তখন তার সমাপ্তি ঘটল। কিন্তু বৃহত্তর অর্থে রোমান্টিসিজ্‌ম সেদিন থেকেই বেঁচে আছে, যেদিন সে কল্পনার অধিকারের দাবিকে তুলে ধরেছে। তাই রোমান্টিসিজ্‌ম হল প্রকৃত আধুনিক শিল্পের অগ্রপথিক। পরবর্তী ঘটনাক্রম তাই প্রমাণ করছে।

রোমানেস্ক আর্ট (Romanesque Art)

একাদশ শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যপর্ব পর্যন্ত বিস্তৃত পশ্চিম ইউরোপের শিল্পকলা। কোনো একটি নির্দিষ্ট দেশে এই শিল্পকলার জন্ম হয়নি। খুব ধীরে ধীরে একইসময়ে অনেকগুলি দেশ যথা ইতালি, ফ্রান্স, জার্মানি এবং স্পেনে এর বিকাশ ঘটেছিল। পূর্ববর্তী সময়ের চেয়ে, যখন ইউরোপের সভ্যসমাজ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার ভয়ের সামনে দাঁড়িয়েছিল, এই সময়ের বৃহত্তর রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, অর্থনৈতিক অগ্রগতি, ধর্মীয় সংস্থাগুলোর সংস্কারমূলক কাজকর্ম শিল্পচর্চার নবীকরণের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। এই পুনরুজ্জীবনের পূর্ববর্তী একশো বছরে বর্বরদের আক্রমণে ক্যারোলিনজিয়ান সভ্যতা ও সংস্কৃতির অনেকটাই ধ্বংস হয়ে যায়। এটা ঠিকই যে রোমানেস্ক আর্ট মূলত চার্চ আর্ট। তবে ধর্মনিরপেক্ষ কাজও কম ছিল না। আবার এও ঠিক যে পশ্চিম ইউরোপের সভ্য সমাজের পুনরুজ্জীবনের কাজ হয়েছিল মূলত সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের দ্বারা যাঁরা দুর্নীতি ও অবক্ষয়ের কালের থেকে উদ্ভূত হয়েছিলেন। রোমানেস্ক শিল্প এই পুনরুজ্জীবনের অবিচ্ছেদ্য একটি অংশ। কিন্তু এই যুগের শিল্প সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান মোটেই সম্পূর্ণ নয়। এই কারণে যে, সেই জ্ঞান একেবারেই যেসব ইমারতগুলি দুর্ঘটনাক্রমে বেঁচে গিয়েছিল তার ওপর নির্ভরশীল কিন্তু সেসব সামগ্রিক পরিমাণের একটা ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। এই ঘটনা ইংল্যান্ডের ক্ষেত্রে ভীষণ রকম সত্যি। যেখানে

বেশিরভাগ মনাস্টিক চার্চ এবং বিরাট সংখ্যক ধর্মীয় মূর্তির শিল্পকর্মকে গোঁড়াপন্থীরা সংস্কারের নাম করে পুনরায় ভেঙে ফেলে।

রোমানেস্ক আর্ট শব্দটা তুলনামূলকভাবে আধুনিক কালের সৃষ্টি। যার অভিপ্রায় এমন একটি শৈলীকে বোঝানো, যা রোমান আর্ট থেকে উদ্ভূত হয়েও তার থেকে স্বতন্ত্র। রোমানেস্ক আর্ট-এর সূত্র রোমান আর্ট একথা অনস্বীকার্য। কিন্তু এর বাইরেও অনেক আছে যেমন আদি খ্রিস্টান, বাইজেনটাইন, ক্যারোলিনজিয়ান, অটোনিয়ান, এমনকি ইসলাম এসব দেশ বা অঞ্চলের বহু বিষয় ও আঙ্গিক রোমানেস্ক আর্টেব সঙ্গে মিশে ভিন্ন ভিন্ন আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য লাভ করেছে। কিন্তু তারপরেও এই সমস্ত অঞ্চলের রোমানেস্ক আর্টে এমন কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য রয়ে গেছে যাতে 'রোমানেস্ক শৈলী' শব্দটির ব্যবহার যুক্তিযুক্ত।

রোমানেস্ক চার্চ স্থাপত্যের পূর্বাভাস ছিল দশম শতাব্দীর লম্বার্ডি এবং উত্তর স্পেনের অট্টালিকাগুলিতে। যা গোলাকার খিলান এবং সুসংগঠিত ভিত্তি নকশা ও নির্মাণের মধ্যে স্পষ্ট। এই রীতি এক অসাধারণ ভাস্কর্য শিল্পে তথা পোর্টাল বা খোদিত তোরণ এবং মূর্তিসম্বলিত স্তম্ভশীর্ষের জন্ম দিয়েছিল। এর মধ্যে ধর্মীয় এবং ধর্মবহির্ভূত উভয় ধরনের

নং ২৭৩ মোযস্যাক অ্যাবে। দি অ্যাপোক্যালিপসি।
টিম্পানাম। ১১১৫ ২০ খ্রিস্টাব্দ।



মূর্তি ছিল। এই পোর্টালি বা তোরণগুলির বৈশিষ্ট্য হল এর মাথার দিকে থাকত পেডিমেন্ট অর্থাৎ লিনটেল থেকে বারান্দার ঢালু ছাদের মধ্যবর্তী অংশ যাকে বলা হত টিমপানা। এগুলো হত অর্ধগোলাকৃতি এবং এর ভল্ট-এর মধ্যে নানারকম মূর্তি খোদাই-করা হত। এর নীচে থাকত স্তম্ভ এবং রিলিফের কাজ। এর অসাধারণ নমুনা হল বারগান্ডি এবং দক্ষিণ ফ্রান্সের মোয়াসাকে। আদি পর্বের রোমানেস্ক চার্চের ভাস্কর্যে রৈখিক শৈলী, বিমূর্ত রূপ এবং উচ্চ সৃষ্টিশীল অভিমুখ লক্ষ করা যায়। ক্যারোলিনজিয়ান, অটোনিয়ান আর্টের কোনো কোনো অংশে ধ্রুপদি বাস্তবতার যে দৃষ্টান্ত দেখতে পাওয়া যায় তাও অসাধারণভাবে অনুকৃত। যদিও তার মধ্যে ক্যারোলিনজিয়ান এবং অটোনিয়ান আদর্শগুলি খুবই প্রভাবশালী। উত্তর-পূর্ব ফ্রান্সের মোসান অঞ্চলের শিল্প একটা উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রমী উদাহরণ। রেইনের দ্য উই-এর ব্রোঞ্জ ভাস্কর্য যার উৎকৃষ্ট নমুনা। ব্যঙ্গাত্মক পুরুষমূর্তির ভয়ংকর পৈশাচিক রূপ, শৈলীবদ্ধ ধর্মীয় মূর্তি ইত্যাদির দ্বারা সাধারণভাবে মনের মধ্যে ধীরে ধীরে ভীতিকর শ্রদ্ধাবোধ সঞ্চার করাই ছিল যার উদ্দেশ্য। রোমানেস্ক যুগে সন্ন্যাসী লিপিকারগণ নতুন করে উন্নত মানের পাণ্ডুলিপি অলংকরণ করতে শুরু করেছিলেন। একাদশ শতাব্দীর পাণ্ডুলিপিতে ক্যারোলিনজিয়ান ও অটোনিয়ান প্রতিধ্বনি থাকলেও বাইজেনটাইন প্রভাব ক্রমশই জোরালো হচ্ছিল। ইউরোপের সর্ব প্রাচীন স্টেইন্ডগ্লাস পেন্টিং এবং রোমানেস্ক মুরাল রয়েছে। দ্বাদশ শতাব্দীর চিত্রকলার শ্রেষ্ঠ কাজগুলি ইংরেজদের করা। তার মধ্যে মাস্টার হুগের বারি বাইবেল এবং উইনচেস্টার বাইবেল। দুটোই অত্যন্ত উজ্জ্বল রঙে আঁকা। দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যপর্বে রোমানেস্ক থেকে গথিকে রূপান্তরণ চিত্রকলার চেয়ে স্থাপত্যেই বেশি লক্ষিত হয়েছিল। রোমানেস্কের স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য ছিল অতি ভারী ধনুকাকৃতি ছাদ বা খিলান যাকে ভল্ট বলে এবং সেই সঙ্গে এই ছাদ ধরে রাখার উপযুক্ত প্রকাণ্ড সব স্তম্ভ ও মোটা দেয়াল। এই রীতি পরবর্তীতে গথিক বৈশিষ্ট্যের দিকে নিয়ে যায়, যাতে বাইরের ভারবাহী স্তম্ভ বা বাট্রেস ব্যবহার করে পাতলা দেয়ালের সাহায্যে ছাদের ভার বহন করার ব্যবস্থা করা হয়।



ল

লন্ডন গ্রুপ
(London Group)

ব্রিটিশ চিত্রকরদের একটি সমিতি। গঠিত হয় ১৯১৩ সালে। কিছু ছোটো ছোটো গোষ্ঠীর সম্মেলনে এর সৃষ্টি। যেমন— ক্যামডেন টাউন গ্রুপ। ক্যামডেন টাউন গোষ্ঠী গঠিত হয় ১৯১১ সালে। ইম্প্রেশনবাদী শিল্পী ওয়ালটার সিকার্ট, ওয়ালটার বেইস, স্পেনসার গোরে, ডানকান গ্রান্ট, অগস্টাস জন, ওয়ান্ডহ্যাম লেইস সহ আরও অনেকের সঙ্গে মিলে ক্যামডেন টাউন গোষ্ঠী গঠন করে ইংল্যান্ডে পোস্ট ইম্প্রেশনিস্ট ধারার প্রবর্তন করেন। ১৯১১-১৯১২-র মধ্যে গোটা তিনেক প্রদর্শনী করার পর আরও কয়েকটি গোষ্ঠীর সঙ্গে এই গোষ্ঠীও লন্ডন গ্রুপের সঙ্গে মিশে যায়। লন্ডন গ্রুপের প্রথম দিকের শিল্পীরা শ্রমজীবী মানুষের ছবি আঁকার প্রতি উৎসাহী ছিলেন। তাঁরা শহরের দৃশ্যও আঁকতেন। তাঁদের আঙ্গিক ছিল ইম্প্রেশনিস্ট রীতির এবং রংও ব্যবহার করতেন চড়া। কিন্তু পরের দিকে শিল্পীরা কিউবিস্টদের মতো জ্যামিতিক আকার এবং বর্ণকল্পকে গ্রহণ করেন। মূলত রয়াল আকাদেমির রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ায় প্রগতিশীল ব্রিটিশ শিল্পীরা লন্ডন গ্রুপের প্রতিষ্ঠা করলেও ১৯১৩ সালের পরে বিশেষ করে ১৯১৪ সালে লন্ডনের গপিল গ্যালারিতে গ্রুপের প্রদর্শনীতে ব্রিটিশ আভঁগার্দ শিল্পী ভর্টিসিস্টদের ভূমিকাই প্রধান হয়ে ওঠে। ১৯১৫ সালের পর থেকে নিয়মিত বছরে দুটো করে প্রদর্শনী করত এই গোষ্ঠী। এই প্রদর্শনীতে গ্রুপের বাইরের শিল্পীদেরও ছবি থাকত। পরবর্তীকালে প্রখ্যাত শিল্প সমালোচক রজার ফ্রাই, পোস্ট ইম্প্রেশনিস্ট রীতির শিল্পী শ্রীমতী ভ্যানিসা বেল এবং ডানকান গ্র্যান্ট এই গোষ্ঠীতে যোগদান করেন। এঁরা আবার অন্য একটি গোষ্ঠী ব্লুমসবারি গ্রুপের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। এই সময় থেকে লন্ডন গ্রুপের কাজকর্মের মধ্যে ব্লুমসবারি গ্রুপের বৈশিষ্ট্যই মুখ্য হয়ে ওঠে। ১৯২৮ সালে লন্ডনের

বার্লিংটন গ্যালারিতে এই গোষ্ঠীর রেট্রোস্পেক্টিভ অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৩০ সালে লন্ডন গ্রুপে যোগ দেন ভাস্কর হেনরি মুর এবং শ্রীমতী বারবারা হেপওয়ার্থ। এবং গোষ্ঠীর প্রদর্শনীতে ভাস্কর্যও অন্তর্ভুক্ত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এই গোষ্ঠী এর প্রগতিশীল গতিধারা— যেমনটা ফ্রাই সূত্রায়িত করেছিলেন তা হারিয়ে ফেলে। ১৯৬৪ সালে লন্ডনের টেট গ্যালারিতে লন্ডন গ্রুপের পঞ্চাশতম বার্ষিকী পালন করা হয়।

ললিতকলা আকাদেমি

ভারতে এবং বিদেশে ভারতীয় শিল্পকলা যথা—চিত্রকলা, ভাস্কর্য, স্থাপত্য ও অন্যান্য গ্রাফিক শিল্পের প্রচার এবং প্রসারের উদ্দেশ্যে গঠিত সংস্থা। ১৯৫২ সালে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় তিনটে আকাদেমি গড়ার প্রস্তাব হয় যথা সাহিত্য আকাদেমি, নৃত্য-নাট্য-সংগীত আকাদেমি এবং ললিত কলা আকাদেমি। তার ভিত্তিতে ১৯৫৩ সালের ৭ অক্টোবর ভারত সরকারের শিক্ষামন্ত্রক ললিতকলা আকাদেমি স্থাপনের রেজোলিউশন গ্রহণ করেন। ১৯৫৪ সালে ১৫ আগস্ট ন্যাশনাল গালারি অব মডার্ন আর্টে অস্থায়ীভাবে ললিতকলা আকাদেমি গড়ে ওঠে। পরে ১৯৬১ সালে এই আকাদেমি বর্তমানের রবীন্দ্রভবনে স্থানান্তরিত হয়। আকাদেমির প্রথম চেয়ারম্যান ছিলেন দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী। এটি একটি স্বশাসিত সংস্থা। কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক আনুকূল্যে এটি পরিচালিত হয়। এই সংস্থার উদ্যোগে প্রতি বছর একটি করে জাতীয় প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয় এবং প্রতি তিন বছর পরে অনুষ্ঠিত হয় আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী—ট্রি-অ্যানাল। এছাড়া প্রতি বছর বিভিন্ন স্থানে প্রদর্শনী সংগঠিত করা হয়। এই সংস্থার নিজস্ব প্রকাশনা বিভাগ থেকে নিয়মিত শিল্পকলা বিষয়ক মূল্যবান বই এবং শিল্পকলার সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করা হয়। সংস্থার মুখপত্র ‘ললিতকলা’-তে ভারতীয় শিল্পের ওপর গবেষণামূলক নানা রচনা, তথ্য এবং শিল্পীদের জীবনী, শিল্পীদের অনুশীলন সম্পর্কিত তথ্য ও শিল্পকর্মের রঙিন প্রতিলিপি মুদ্রণ সহ শিল্পতত্ত্ব বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। আকাদেমির কর্মসূচির মধ্যে আছে ভারতীয় গুহা, মন্দির, দুর্গ, প্রাসাদ প্রভৃতিতে অঙ্কিত মুরাল ফ্রেস্কো সমূহের অনুলিপিকরণের কাজ। এছাড়াও সেমিনার বক্তৃতামালা, শিল্পীশিবির, ওয়ার্কশপ, প্রতিষ্ঠিত এবং স্বীকৃত

শিল্প সংগঠনকে আর্থিক সাহায্য দানের পাশাপাশি প্রতিষ্ঠিত শিল্পীদের ফেলোশিপ প্রদানের ব্যবস্থা। প্রতি বছর জাতীয় প্রদর্শনীর সময় পনেরোজন শিল্পীকে জীবনে একবারের জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হয়। প্রতি বছর আকাদেমি আনন্দ কুমারস্বামী স্মারক বক্তৃতার আয়োজন করে থাকে।

ললিতকলা 'কনটেম্পোরারি' নামে আকাদেমির একটি দ্বিবার্ষিক পত্রিকা আছে। আকাদেমির স্টুডিয়ো কমপ্লেক্স আছে কলকাতা, নয়াদিল্লি এবং গর্‌হিতে। এখানে শিল্পীদের প্রশিক্ষণ ও চর্চার ব্যবস্থা আছে। কলকাতা, চেন্নাই, ভুবনেশ্বর এবং লক্ষ্ণৌতে আকাদেমির আঞ্চলিক কেন্দ্র আছে। সেখানেও প্রশিক্ষণ ও চর্চার সুযোগ রয়েছে। গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচনের মাধ্যমে আকাদেমির সাধারণ পরিষদ গঠিত হয়। এর সদস্য সংখ্যা ৭৫। এর মধ্য থেকে কার্যকরী সমিতি গঠিত হয়। সাধারণ পরিষদে ১৫ জন নির্বাচিত হয়ে আসেন। ১১ জন মনোনীত হয়ে আসেন এবং কয়েকজন আসেন পদাধিকার বলে যেমন ন্যাশনাল গ্যালারির ডিরেক্টব. সাহিত্য আকাদেমির চেয়ারম্যান প্রমুখ। এছাড়াও আছেন বিশিষ্ট শিল্পীরা। যাঁদের ছবি ২বার বার্ষিক প্রদর্শনীতে নির্বাচিত হয়েছে তাঁরাই ভোটার হতে পারেন। যাঁদের ছবি বা শিল্পকর্ম ১বার নির্বাচিত হয়েছেন তাঁরা ভোটে দাঁড়াতে পারবেন কিন্তু ভোটার হতে পাববেন না।

লাইট (Light)

লাইট অর্থাৎ আলো হল এক ধরনের তড়িৎ চৌম্বকীয় শক্তি। এই শক্তি দু-ধরনের বিকিরণ করে। দৃশ্য এবং অদৃশ্য। তাই সব ধবনের আলো চোখে পড়ে না। এই বিকিরণেব তরঙ্গদৈর্ঘ্যের ওপব আলোর দৃশ্যমানতা নির্ভর করে। আলোর বর্ণালির যে অংশের দৈর্ঘ্য ৩৯০ থেকে ৭৬০ ন্যানোমিটার (এক মিলিমিটারের এক হাজার ভাগের একভাগ হল এক ন্যানোমিটার) তরঙ্গদৈর্ঘ্যের বিকিরণই দৃশ্যমান হয়। এই বিকিরণজাত আলো আমাদেব তাবৎ জগৎকে দেখতে সাহায্য করে। ৩৯০ ন্যানোমিটারের চেয়ে কম তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোকে বলা হয় অতিবেগুনি রশ্মি। আর ৭৬০ ন্যানোমিটারের চেয়ে বেশি তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলো হল অবলোহিত রশ্মি বা ইনফ্রাবেড। এছাড়াও আছে এক্স-রে, গামা-রে ইত্যাদি। সাধাবণ দিনের আলো বা সাদা আলো

হল নানারকম রঙের আলোর মিশ্রণ। একটি প্রিজ্‌মের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হতে দিলে এই রশ্মিগুচ্ছ বিশ্লেষিত হয়ে যায়। সপ্তদশ শতাব্দীতে স্যার আইজ্যাক নিউটন এইভাবে আলোকে বিশ্লেষণ করে দেখান যে, সাদা আলো সাতটি রঙের সমাহার। একে সংক্ষেপে বলে বেনীআসহকলা বা VIBGYOR অর্থাৎ বেগুনি, নীল, আকাশি, সবুজ, হলুদ, কমলা এবং লাল। কৃত্রিমভাবে তৈরি করে যদি দুটো আলোকে মেশানো যায় তাহলে তৃতীয় একটি রঙের সৃষ্টি হয়। এই ধরনের মিশ্রণকে বলে অ্যাডিটিভ মিশ্রণ। এইভাবে নীল এবং সবুজ আলো মেশালে তৈরি হবে আকাশি রঙের আলো। আবার লাল এবং সবুজ আলোকে মিশতে দিলে তৈরি হবে হলুদ রঙের আলো। এবং নীল ও লাল আলো মিশে তৈরি করে বেগুনি বা ম্যাজেন্টা রঙের আলো। এই প্রক্রিয়ায় টেলিভিশন বা কম্পিউটারের পর্দায় রঙিন ছবি তৈরি হয়। কিন্তু শিল্পীদের রঞ্জকের ক্ষেত্রে আলোর এই প্রক্রিয়া অচল। সেখানে যে মিশ্রণ হয় তাকে বলে 'সাবট্র্যাকটিভ' মিশ্রণ। *কালার দেখুন

লাইটফাস্টনেস (Lightfastness)

লাইটফাস্টনেস কথার অর্থ হল রঙের বিবর্ণ বা ফিকে হয়ে যাওয়া (Fading) কিংবা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে রঙের পরিবর্তন বা hue পালটে যাওয়াকে রোধ করার ক্ষমতা। বিবর্ণ বা fade হয়ে যাওয়া মানে বর্ণগভীরতা বা ভ্যালু হ্রাস পাওয়া আর রং বা hue পরিবর্তন মানে অন্য রং ধারণ। যেমন সবুজ রং ধীরে ধীরে সিপিয়া রং-এ পরিণত হয়। এসব ঘটার পেছনের কারণ হল রঙের আলো প্রতিরোধী ক্ষমতার অভাব এবং বিশেষ করে অতিবেগুনি রশ্মির প্রভাব। এটা নির্ভর করে রঙে ব্যবহৃত রঞ্জক বা পিগমেন্টের রাসায়নিক চরিত্র, এর ঘনত্ব এবং যে মাধ্যমে রংকে গোলা হয়েছে তার ওপর। যেমন তেল রঙে তেলের পরিমাণ বেশি হলে রঙের পর্দা পাতলা হবে রং বিবর্ণ হবে তাড়াতাড়ি। জল বা জলে দ্রবীভূত মাধ্যম রঞ্জক বা পিগমেন্টকে তেলের চেয়ে কম সুরক্ষা দেয়। তাই জল রঙের লাইটফাস্টনেস তেল রঙের চেয়ে কম। অনেক রঞ্জক আছে যারা বিশুদ্ধ অবস্থায় চরম লাইটফাস্ট কিন্তু তাদের সঙ্গে সামান্য সাদা মিশিয়ে একটু হালকা করে দিলেই

তাদের আলোপ্রতিরোধী ক্ষমতা কমে যায়।

পিগমেন্টের এই আলোপ্রতিরোধী ক্ষমতা পরিমাপ করার কতগুলি মাপকাঠি তৈরি হয়েছে। যেমন ব্রিটিশ মান বা ব্লু উল স্কেল এবং আমেরিকান মান আমেরিকান সোসাইটি ফর টেস্টিং অ্যান্ড মেটিরিয়ালস সংক্ষেপে এ এস টি এম (ASTM) এর মধ্যে ASTM I হল চমৎকার আলোপ্রতিরোধী, ASTM II হল খুব ভালো আলো প্রতিরোধী এবং ASTM III হল সন্তোষজনক নয় (তবে পূর্ণ শক্তিকে ব্যবহার করলে সন্তোষজনক হতে পারে)।

লাইট সোর্স (Light Source) আলোক উৎস। ছবি আঁকার ক্ষেত্রে আলোর উৎস খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আলোর উৎসের অবস্থান, আলোর চরিত্র, বস্তুকে আলোকিত করা, ছায়া সৃষ্টি, এসব সাদৃশ্যবাদী ছবিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেন-না এসবই নির্ভর করে আলোর উৎসের ওপর। আলোর উৎসের চরিত্র এবং তার অবস্থান পালটে গেলে সবকিছুই তদনুযায়ী পালটে যাবে। এক্ষেত্রে দুটো বিষয় হিসাবে রাখতে হবে শিল্পীকে। প্রথমত, আউটডোর পেন্টিং-এর ক্ষেত্রে, যদি সকাল আটটায় একটি ল্যান্ডস্কেপ আঁকতে শুরু করা হয় এবং সেটা করতে যদি দু-ঘণ্টা লাগে তাহলে এই দু-ঘণ্টায় প্রতিমুহূর্তে সূর্যের অবস্থান পালটানোর সঙ্গে আলোর অবস্থানও পালটে যাবে। আর এই পরিবর্তিত আলোতে বস্তুর আলোছায়ার বিন্যাসও পালটে যাবে যা এক জটিলতার সৃষ্টি করবে। এইরকম অবস্থায় যা করতে হবে তা হল আলোছায়ার বিন্যাস যা ছিল এবং যা আছে তার একটা মধ্যবর্তী পর্যায়কে নির্ধারণ করা। আবার কোনো চড়া তথা উষ্ণ আলোতে বসে কম তথা শীতল আলো সম্পন্ন কোনো দৃশ্যের ছবি আঁকতে গেলে ফলাফল অদ্ভুত হতে পারে। এক্ষেত্রে দেখতে হবে বস্তুর ওপর আপতিত আলো এবং যে-আলোতে বসে রং চাপানো হচ্ছে তা যেন যতটা সম্ভব একই রকমের হয়। আরও ভালো হবে যে-আলোতে বসে ছবি আঁকা হয়েছে সেইরকম আলোতেই যদি ছবিটা প্রদর্শন করার ব্যবস্থা করা যায়। সবটা করা সম্ভব না হলেও শিল্পীকে এ-ব্যাপারে সচেতন হতে হবে যে, আলোর ব্যাপক তফাৎ সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে।

লাইমলাইট (Limelight)

একসময় নাট্যমঞ্চ আলোকিত করার জন্য এই ধরনের অতি উজ্জ্বল আলো ব্যবহার করা হত। এই আলো সৃষ্টি করা হত অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন মেশানো গ্যাসের শিখার সাহায্যে ক্যালসিয়াম অক্সাইড বা চুনকে উত্তপ্ত করে। মঞ্চে দ্রষ্টব্য চরিত্র বা বিষয়কে আলোকিত করার জন্য ব্যবহার করা হত বলে শব্দটির অর্থ দাঁড়িয়েছে 'আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু'।

লাসকো (Lascaux)

দক্ষিণ ফ্রান্সের দরদইন অঞ্চলে অবস্থিত গুহাসমষ্টি। এখানে আবিষ্কৃত হয়েছে প্যালিয়োলিথিক যুগে আঁকা অনন্য সাধারণ চিত্রাবলি। এই গুহার সংকীর্ণ গলিপথের দেয়ালে আঁকা রয়েছে অসংখ্য জীবজন্তু যথা ঘোড়া, ষাঁড়, বাইসন, হরিণ সহ মানুষের ছবি। এর মধ্যে কিছু ছবি প্রমাণ সাইজের চেয়েও বড়ো। এইসব ছবি বিস্ময়করভাবে সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় রয়ে গেছে। তার একটা কারণ, এই চিত্রাবলি গুহামুখে আঁকা হয়নি। আঁকা হয়েছে অনেক ভেতরে যা বাইরে থেকে সরাসরি দেখা যায় না। বস্তুত লাসকো আবিষ্কারও হয়েছে হঠাৎ করে। ১৯৪০ সালে স্থানীয় বাচ্চাদের একটা কুকুর একটি গর্তে পড়ে গেলে তাকে খুঁজতে গিয়ে এই গুহার সন্ধান মেলে। স্পেনের আলতামিরার গুহাচিত্রের চেয়ে লাসকোর গুহাচিত্র অনেক বেশি বলিষ্ঠ। লাসকোতে সিলুয়েট চিত্রের পাশাপাশি জীবজন্তুর রঙিন চিত্রও আঁকা হয়েছিল এবং সেইসঙ্গে ছিল গুহার পাথরের দেয়ালে খোদাই করা এনগ্রেভিংস। কিছু ছবি পুরোনো ছবির ওপর সুপার-ইম্পোজ করে আঁকা হয়েছে। এই ছবির উদ্দেশ্য নিয়েও অনেক আলোচনা হয়েছে। গুহার এত ভেতরে ছবি আঁকা নিছক সাজানোর জন্য নয় বলেই মনে করা হয়। এমনকি শিকারের সাফল্যের জন্য অনুষ্ঠিত জাদু-সংস্কার থেকে এই চিত্রাঙ্কণের সম্ভাবনা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। আসলে পুরোনো প্রস্তর যুগের মানুষেরা আপাতভাবে ছবি এবং বাস্তবতার মধ্যে স্পষ্ট কোনো পার্থক্য করেননি।

নং ২৭৪. লাসকো। ফ্রান্স। দা হল অব বুল্‌স। খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০০।



জন্তু জানোয়ারের ছবি এঁকে তাঁরা বোঝাতেন যে পশুগুলি তাঁদের আয়ত্তে এসে গেছে। এবার তাঁরা ওই ছবির পশুকে 'হত্যা' করে মনে করতেন যে পশুর মূল জীবনীশক্তিকে হত্যা করেছেন। এই পশুবধ সংস্কার অনুষ্ঠানের পর 'মৃত' পশুর ছবির আর গুরুত্ব থাকত না। নতুন করে আবার এ ধরনের জাদু আবার পালন করা হত। এর মধ্য দিয়ে শিকারি ওইসব ভয়ংকর পশুকে তাদের আদিম অস্ত্রের সাহায্যে হত্যা করার জন্য আরও বেশি সাহস অর্জন করতেন। এখনও এই আচার সম্পূর্ণ হারিয়ে যায়নি। কিন্তু এই ব্যাখ্যা যদি সত্যি হয় তাহলেও ধাঁধা লাগে যে, এই শিকার-জাদু গুহার এত ভেতরের সঙ্কীর্ণ স্থানে কেন আঁকা হল! যেখানে হামাগুড়ি দেওয়া ছাড়া পৌঁছানো অসম্ভব! এখানে মনে রাখতে হবে ম্যাগডোলেনিয়ান গুহাচিত্রের কথা। একটা সময় এল যখন প্রচুর বড়ো বড়ো পশু শিকার করা যেন ছেলেখেলার বিষয় হল। বিবর্তনের সেই চূড়ান্ত পর্বে আঁকা জাদুছবির অর্থ বদলে গেল। প্রমাণ আছে যে মধ্য ইউরোপের আবহাওয়া উষ্ণ হয়ে উঠলে পশুরা দলে দলে উত্তর দিকে আশ্রয় নিয়েছিল। তাই আলতামিরা এবং লাসকোতে এই জাদু-আচারের উদ্দেশ্য ছিল সম্ভবত পশু-'হত্যা' নয় পশু 'তৈরি' যাতে পশু সরবরাহে বৃদ্ধি ঘটানো যায়! সাম্প্রতিককালে পশুর সঙ্গে সম্পর্কিত অস্ত্র, উদ্ভিদের রূপকে চিহ্নিত করা হয়েছে। ম্যাগডেলিয়ানরা পৃথিবীর গর্ভে এরকম কিছু উর্বরতার জাদু-আচার পালন করত এই বিশ্বাস নিয়ে যে পৃথিবী স্বয়ং একটি সজীব বস্তু যার গর্ভে অন্যান্য জীবনের সৃষ্টি হয়েছে। পরবর্তীকালের পার্থিব দেবদেবীর বিশ্বাসের মধ্যে এই ধরনের কল্পনার অস্তিত্ব লক্ষ করা গেছে। এর উৎস সম্ভবত সেই প্রাচীন প্রস্তরযুগ। এই তথ্যকে ভিত্তি করে বলা যায় যে, চমৎকার এইসব বাস্তবধর্মী গুহাচিত্রে শিল্পীরা সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা নিয়েই পশুর ছবি এঁকেছেন, হত্যা করার জন্য নয়।

লিথোগ্রাফ (Lithograph)

সারফেস (পৃষ্ঠতল) মুদ্রণের একটি পদ্ধতি। রিলিফ প্রিন্টিং-এর বিপরীত এই পদ্ধতিতে মুদ্রণতল এবং অমুদ্রণতল একই উচ্চতায় থাকে। রিলিফ প্রিন্টিং-এ মুদ্রণতল উঁচু হয়ে থাকে এবং অমুদ্রণ তল নীচুতে থাকে। অন্যদিকে ইনটালিয়ো প্রিন্টিং-এ মুদ্রণতল থাকে খাদে এবং অমুদ্রণ তল থাকে



নং ২৭৫. জর্জ রাওলাটের লিথোগ্রাফ।

উঁচুতে। লিথোগ্রাফির ভিত্তি হল তেলে জলে মেশে না—এই বৈশিষ্ট্য। তেল বা গ্রিজ এবং জলের এই বিপরীত ধর্মিতাকে কাজে লাগিয়ে ১৭৯৮ সালে মিউনিখে জার্মান টাইপোগ্রাফার অ্যালয়েস সেনেফিল্ডার লিথোগ্রাফির কৌশল আবিষ্কার করেন। লিথোগ্রাফি শব্দটা এসেছে গ্রিক 'লিথোস' (পাথর) এবং 'গ্রাফে' (ড্রয়িং)-কে যুক্ত করে। পরে এই পদ্ধতির জনপ্রিয়তা ছড়িয়ে পড়ে। গোইয়া তাঁর অ্যাকোয়াটিন্ট এবং এচিং এর মতো এই পদ্ধতিও ব্যবহার করেছিলেন। যেমন ফুসেলি এবং স্টোথার্ড ব্যবহার করেছিলেন ইংল্যান্ডে। ফ্রান্সে তলুজে লত্রেক, এদুয়ার ভুইয়ার এবং পিয়ের বোনার লিথোগ্রাফিকে চরম উৎকর্ষের সাথে ব্যবহার করেছিলেন। এছাড়াও লিথোগ্রাফি নিয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ করেছিলেন জেরিকোল, দেলাক্রোয়া, দ্যমিয়ে এবং পরবর্তীকালে ম্যানে, দেগা, হুইসলার, ওদিলঁ রদ্যেঁ প্রমুখ।

লিথোগ্রাফিকে অনেক সময় 'রাইটিং অন স্টোন' বলা হয়। একটা মসৃণ পাথরের ব্লক বা ফলকের ওপরে তৈলাক্ত কালি, যাকে টাস্কি বলা হয়, বা তৈলাক্ত লিথোগ্রাফিক চক দিয়ে নকশা বা ছবি এঁকে নেওয়া হয়। তৈলাক্ত পদার্থকে পাথর শুষে নেয়। তারপর এই নকশা আঁকা তলটিকে সামান্য নাইট্রিক অ্যাসিড মেশানো গাম অ্যারাবিকের দ্রবণ দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। এই দ্রবণ তৈলাক্ত কালি বা লিথো চককে 'স্থায়ী' করে। শুকিয়ে গেলে পাথরটিকে ধুয়ে অতিরিক্ত গাম অ্যারাবিককে দূর করতে হয়। কালি লাগানোর আগে সমগ্র সারফেসে জল দিয়ে ভিজিয়ে নিতে হয়। তৈলাক্ত কালিতে আঁকা ছবি বা নকশার অংশে জল ধরে না। ঠিক একইভাবে ছবি বা নকশার অংশে শুধু কালিই ধরে। এরপর কালি লাগানো পাথরের ওপর কাগজ রেখে প্রেসের সাহায্যে ছাপ তোলা হয়।

অফসেট লিথোগ্রাফি : অফসেট লিথোগ্রাফি বর্তমানে মুদ্রণের জগতে একটি সাধারণ পদ্ধতি যা ছোটোখাটো অফিস মুদ্রণ থেকে শুরু করে বিপুল পরিমাণের সংবাদপত্র বা অন্যান্য মুদ্রণের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে ব্যবহার হচ্ছে। সাধারণভাবে এতেও লিথোগ্রাফির প্রাথমিক কৌশলকেই কাজে লাগানো হয়। এখানে শুধু পাথরের বদলে ধাতুপাত বা ধাতব সিলিন্ডার ব্যবহার করা হয়। এই সিলিন্ডারে থাকা নকশা বা ছবিতে

কালি লাগিয়ে সরাসরি কাগজে ছাপ নেওয়া হয় না। এক্ষেত্রে কালি মাখানো সিলিন্ডার থেকে সরাসরি ছাপ নেওয়া হয় একটি রাবারের সিলিন্ডারে এবং সেই রাবারের সিলিন্ডার থেকে ছবি বা ইমেজের ছাপ ওঠে কাগজে। এইভাবে অপ্রত্যক্ষ প্রক্রিয়ায় কাগজে ছাপ ওঠে বলে এই পদ্ধতিকে 'অফসেট' বলা হয়। এই মধ্যবর্তী রাবারের সিলিন্ডার ব্যবহার করার কারণ হল প্রচুর কাগজ ছাপার জন্য মাস্টার সিলিন্ডারটির যাতে ক্ষতি না হয় তার সুরক্ষা দেওয়া। এখন দ্রুততম মুদ্রণ যন্ত্র বা হাইস্পিড রোটারির আবিষ্কার হয়েছে এবং সেই সঙ্গে লিথো প্লেটও তৈরি হচ্ছে নানারকম সংকর ধাতু দিয়ে। এসব লিথোপ্লেট পাতলা এবং শক্ত। এর জন্য ব্যবহার করা হয় দস্তা, অ্যালুমিনিয়াম, তামা, ক্রোমিয়াম এবং প্লাস্টিক পেপার। ছাপার আগে এই প্লেটকে ভিজিয়ে নেওয়া হয়। ভিজিয়ে নেওয়ার জন্য রোটারি প্রেসে আরও একটি সিলিন্ডার থাকে। যা লিথোপ্লেটে জল, গাম অ্যারাবিক ও অ্যাসিডের সলিউশন লাগায় এবং অন্য একটি সিলিন্ডার থেকে কালি লাগানোর পর সিলিন্ডার ঘুরিয়ে রানিং কাগজে ছাপ নেওয়া হয়।

সম্পুর্ণ রঙিন ছাপার জন্য 'ফোর কালার' পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। সাধারণভাবে ফোর কালার হল সায়ান (আকাশি), ম্যাজেন্টা (লালচে-বেগুনি), ইয়েলো এবং ব্ল্যাক। সংক্ষেপে সি এম ওয়াই কে (CMYK)। এর জন্য চার সেট আলাদা আলাদা সিলিন্ডার ব্যবহার করা হয়। প্রতিটি রঙের প্লেটে অসংখ্য ক্ষুদ্র বিন্দু রূপে ইমেজের যথাযথ অংশ থাকে। এক একটি প্লেট দিয়ে একটিমাত্র রংকে ছাপা যায় এবং পরপর একটির ওপর আর একটি রং ছেপে পূর্ণাঙ্গ ইমেজটি তৈরি হয়। এজন্য ছবির রংকে স্ক্যানারের সাহায্যে ওপরে বর্ণিত চারটে রঙে বিশ্লেষণ করে নিতে হয়। অফসেট প্লেটে ছবি বা ইমেজও আঁকা হয় ফোটোগ্রাফিক পদ্ধতিতে।

লিথোগ্রাফ অফসেট (Lithograph Offset) — লিথোগ্রাফ দেখুন।

লিনসিড অয়েল (Linseed Oil) — তিসি বা মসিনা বীজ থেকে প্রাপ্ত তেল। তেল রঙের ক্ষেত্রে লিনসিড অয়েলই প্রধান মাধ্যম। এটি একটি ড্রায়িং অয়েল অর্থাৎ তেল রঙের ছবিতে ব্যবহার্য তেল। অয়েল পেন্ট-এর বাইন্ডার হিসাবে ব্যবহার ছাড়াও কয়েক ধরনের বার্নিশ,

কালি এবং লিনোলিয়ামের উপাদান হল লিনসিড অয়েল। লিনসিড অয়েলকে ফ্লাক্সসিড অয়েলও বলে। প্রাচীনকালে গ্রিক ও রোমানদের খাদ্য তালিকায় থাকত লিনসিড অয়েল। এখন অবশ্য এর বীজ থেকে তেল নিষ্কাশনের পর ছিবড়েগুলি গবাদিপশুর খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

অপরিশোধিত লিনসিড অয়েলের রং উজ্জ্বল সোনালি। এর বৈজ্ঞানিক নাম 'লিনাসিয়া'। থিতিয়ে, বিধৌতকরণ এবং রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় লিনসিড অয়েলকে পরিশ্রুত করা হয়। শুকিয়ে গেলে অক্সিডাইজড্ এবং পলিমারাইজড্ হয়ে 'লাইনক্সিন' নামে একটি কঠিন যৌগে পরিণত হয়। এই পদার্থকে পুনরায় লিনসিড অয়েলে পরিণত করা যায় না। সদ্য তৈরি লিনসিড তেলের গন্ধ মিষ্টি। কটুগন্ধে বুঝতে হবে এর মধ্যে মুক্ত অ্যাসিডের উপস্থিতি আছে যা সাধারণভাবে বাতাসের সংস্পর্শে এলে বা গরম করলে তৈরি হয়। অ্যাসিডকে নিষ্ক্রিয় করতে প্রতি ২০ আউন্স তেলে বড়ো চামচের এক চামচ তাজা গুঁড়ো চুন ফেলে আধঘণ্টা ধরে উত্তাপ দিয়ে ক্রমাগত নাড়িয়ে যেতে হবে। পরে ক্যালসিয়াম অক্সাইড পাত্রের তলায় থিতিয়ে যাবে এবং ক্ষতিকর নয় এমন সাবানে রূপান্তরিত হবে।

লিনসিড তেলকে রং-এর সঙ্গে ব্যবহার করতে গেলে পরিশ্রুত করে নিতেই হবে। যেমন ফুটিয়ে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু এতে তেল কালো হয়ে যায়। পেশাই করার আগে বাষ্পের সাহায্যে ভেজে নেওয়া যায়। এতেও তেলের গুণ ভালো হয় না। নিরাপদ একটি পদ্ধতি হল কোল্ড-প্রেসড লিনসিড অয়েল। কাঁচা লিনসিডকে পেষাই করে তেল নিষ্কাশনের পর সেই তেলকে একটা ট্যাঙ্কে ভরে রেখে দেওয়া হয় যতক্ষণ না সবটা গাদ থিতিয়ে যাচ্ছে। তারপর তেলকে ছেঁকে নেওয়া হয়। এই ভাবে শোধিত তেলই পিগমেন্টকে গোলার কাজে ব্যবহার করা হয়। স্ট্যান্ড অয়েল পদ্ধতিতে অপরিশোধিত লিনসিড তেলকে চ্যাপটা পাত্রে ঢেলে সূর্যালোকে রেখে দেওয়া হয়। এখন অবশ্য অক্সিজেন মুক্ত পরিবেশে উচ্চতাপে গরম করে শোধন প্রক্রিয়া চালানো হয়। এই ভাবে শোধিত তেলই রঙের মাধ্যম হিসাবে বেশি ববহার করা হয়। যদিও এ দিয়ে পিগমেন্ট গোলা হয় না।

লিনিয়ার প্যারস্পেকটিভ (Linear Perspective)

ছবিতে গভীরতা বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত একটি কৌশল। সমান্তরাল রেখা কখনোই মিলিত হয় না। কিন্তু দেখলে সেরকম লাগে আর এই বিভ্রমটাই আমাদের মধ্যে দূরত্বের ধারণা সৃষ্টি করে। রেললাইন বা হাইওয়ের পাশে দাঁড়িয়ে দেখলে সহজেই এমন অভিজ্ঞতা হবে। হাইওয়েতে গাড়িতে বসে সামনে তাকালে মনে হয় দূরে রাস্তাটা যেন দিগন্তে অবস্থিত একটা বিন্দুতে মিলিয়ে গেছে। এই দৃষ্টিভ্রমই হল রেখাগত পরিপ্রেক্ষিত বা লিনিয়ার পারস্পেকটিভ। কিন্তু যতই সামনে যাওয়া যাক না কেন রাস্তা বরাবর সমান্তরাল। কিন্তু বাস্তবে যখন সমান্তরাল মিশে যাচ্ছে বলে মনে হয় তখন ছবিতেও তা হতে হবে। আর এই দৃষ্টিবিভ্রমকে যা দূরত্বের ধারণা দেয়, যদি ঠিক ঠিক ভাবে তুলে ধরতে হয় তাহলে পারস্পেকটিভের কিছু সহজ সংজ্ঞা এবং সূত্রকে বুঝে নিতে হবে। প্রথমত, দিগন্ত রেখার ওপর যে বিন্দুতে সমান্তরাল রেখা দুটি মিলিয়ে গেছে বলে মনে হয় তাকে বলে বিলীয়মান বিন্দু বা ভ্যানিশিং পয়েন্ট। দ্বিতীয়ত, এক বা একাধিক বিলীয়মান বিন্দুর সবগুলিই দিগন্তরেখা বা হরাইজন লাইনের ওপর অবস্থান করে। তৃতীয়ত, হরাইজন লাইন চোখের লেভেলে থাকে। যেহেতু ঘরবাড়ি, পাহাড়-পর্বত বা গাছপালার আড়ালের জন্য সব সময় দিগন্তরেখা দেখা সম্ভব নয়। তাই দিগন্তরেখা বা হরাইজন লাইনের পরিবর্তে আইলেভেল শব্দটা ব্যবহার করা সংগত। পারস্পেকটিভে হরাইজন লাইন এবং আইলেভেল সমার্থক। চতুর্থত, যেকোনো বাস্তববাদী ছবিতে একটি মাত্র আইলেভেল থাকে। এই আইলেভেল হল ছবির ভিত্তি। সবকিছুই এই আইলেভেলের আপেক্ষিক। কিন্তু যদি একই দৃশ্যকে একবার বসে এবং একবার দাঁড়িয়ে দেখা যায় তাহলে দৃশ্যটি দুবার দু-রকম ভাবে দেখা যাবে। সেক্ষেত্রে একই দৃশ্যের আইলেভেল হল দুটো। পঞ্চমত, ভ্যানিশিং পয়েন্টের দিকে ধাবমান রেখাগুলি যদি আইলেভেলের ওপরে থাকে তা হবে নিম্নমুখী আর আইলেভেলের নীচে থাকলে তা হবে ঊর্ধ্বমুখী। ষষ্ঠত, আয়তকার বস্তুর একটি তল যদি দৃশ্যতলের (Picture plane) সমান্তরাল হয় তাহলে ওই বস্তুর অপসৃয়মান রেখাগুলি একটি মাত্র বিলীয়মান বিন্দুতে হবে যা হল ওয়ান পয়েন্ট পারস্পেকটিভ। সপ্তমত, এক বা দুটো ভ্যানিশিং পয়েন্ট সম্বলিত পারস্পেকটিভের ব্যবহারই বেশি।

তবু তৃতীয় ভ্যানিশিং পয়েন্টও থাকতে পারে। কলকাতার টাটা সেন্টারের মতো আকৃতির খুব উঁচু বাড়িগুলির নীচে দাঁড়িয়ে দেখলে এই তৃতীয় ভ্যানিশিং পয়েন্টের নমুনা দেখতে পাওয়া যাবে। ভ্যানিশিং পয়েন্ট তিনটের বেশিও হতে পারে।

লিনেন (Linen)

শণগাছের তন্তু দিয়ে তৈরি একধরনের কাপড়। শক্ত এবং টেকসই এই কাপড় চিত্রপট হিসেবে দীর্ঘকাল ধরে জনপ্রিয়। তুলো বা কটনের চেয়ে লিনেন একটু দামি। শণগাছের প্রায় শাখাহীন কাণ্ড থেকে দীর্ঘ তন্তু পাওয়া যায়। কাপড় তৈরির শণ প্রায় সারা পৃথিবীতেই জন্মায়। তবে সবচেয়ে বেশি উৎপন্ন হয় রাশিয়াতে। পাশ্চাত্যের সবচেয়ে ভালো শণ আসে নিম্ন নরম্যান্ডি থেকে পিকার্ডি হয়ে ফ্লান্ডার্স এবং হল্যান্ড পর্যন্ত প্রায় ২০০ কিলোমিটার বিস্তৃত অঞ্চল থেকে। শণ চাষ এখানকার প্রাচীন ঐতিহ্য। শণ ফলনের জন্য সময় লাগে প্রায় ১০০ দিন। শণগাছ কেটে তোলা হয় না। উপড়ে নেওয়া হয় যাতে এর শিকড় সমেত পুরো কাণ্ডটাই পাওয়া যায়। শণ পাকলে ক্রমশ হলুদ থেকে বাদামি হয়ে যায়। তবে এর ভালো আঁশ পাওয়া যায় হলুদ অবস্থা থেকে। মাটি থেকে তুলে তিন থেকে ছয় সপ্তাহ মাঠে ফেলে রাখা হয় বা জলে ভিজিয়ে রাখা হয়। গাছ পচে গিয়ে আঁশ আলগা হয়ে আসে। এইবার আঁশ ছাড়িয়ে নিয়ে কিছু প্রক্রিয়ার পর তা দিয়ে সুতো তৈরি করা হয়।

লিনোকাট (Linocut)

একটি রিলিফ প্রিন্টিং বা উন্নততল ছাপাই পদ্ধতি। খোদাই করা লিনোলিয়াম শিট থেকে নেওয়া প্রিন্ট। একে লিনোলিয়াম



নং ২৭৬. গদিয়ে ব্রেঁৎসকা : রেসলার। ১৯১৪। লিনোকাট।



নং ২৭৭. চিত্তপ্রসাদ : বোম্বাই শহরের যাযাবর ১৯৫৬। লিনোকাট। ৯x৩.২ ইঞ্চি।

কাটও বলা হয়। লিনোলিয়াম শিট প্রধানত তৈরি হয় মেঝেতে পাতার জন্য। ক্যানভাসে বা শণের চটের ওপরে লাইনক্সিনের পুরু আস্তরণ। লাইনক্সিন হল ফোটানো লিনসিড অয়েলে কর্কের গুঁড়ো মিশিয়ে তৈরি একটি কঠিন নমনীয় পদার্থ। একে খুব সহজেই বিভিন্ন ধরনের কাটার যন্ত্র দিয়ে কেটে ফেলা যায়। বিভিন্ন আকৃতির এই কাটার যন্ত্রকে বলে বুরিন (Burin)। লিনোকাটের সাহায্যে সাদা কালো ছাড়া রঙিন প্রিন্টও নেওয়া যায়। রঙিন প্রিন্ট নেওয়ার ক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে দু-ধরনের পদ্ধতি আছে। একটি পদ্ধতি হল প্রতিটি রঙের জন্য আলাদা আলাদা লিনোলিয়ামের ব্লক কেটে নেওয়া এবং অন্যটি হল 'রিডাকশন টেকনিক' বা হ্রস্বীকরণ কৌশল। এতে একটি মাত্র লিনোশিটে প্রতিটি রং ছেপে নেবার পর সেই রঙের জন্য ব্যবহৃত লিনোলিয়ামের অংশগুলিকে কেটে বাদ দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে সাধারণত সুপার ইম্পোজ পদ্ধতিতে ছাপ নেওয়া হয়। প্রতিটি স্তরে লিনোলিয়াম হ্রাস পেতে থাকে। আগের রঙে আর ফিরে যাওয়া যায় না বা আর প্রথম থেকে ছাপ নেওয়া যায় না। কেন-না পূর্বেকার লিনোর অংশগুলো কেটে বাদ দেওয়া হয়ে গেছে। এক্ষেত্রে শিল্পীকে প্রতিটি পর্বে এক একটি রঙের জন্য বেশ কয়েকটি প্রিন্ট নিয়ে রাখতে হয় সম্পূর্ণ ছবিটির একের বেশি প্রিন্ট পাওয়ার জন্য। সাধারণভাবে ফ্ল্যাট রং ব্যবহার করা হলেও অনেক শিল্পী রঙের মাত্রার তারতম্য বা টোনাল ভ্যারিয়েশন আনার জন্য আবার কয়েকরকম পদ্ধতি প্রয়োগ করেন। প্রথমত, সহজপদ্ধতি হল লিনো শিটের প্রয়োজনীয় অংশে অসমান করে রং লাগানো। অথবা লিনো শিটের কোনো কোনো অংশে তুলি দিয়ে কস্টিক সোডা লাগিয়ে ক্ষয়করে (bite) নেওয়া যাতে একটা বুনট তৈরি হয়।

রিলিফ প্রিন্টিং হিসাবে লিনোকাটের প্রবর্তন হয় বিংশ শতাব্দী গোড়ায়। লিনোকাটকে ব্যবহার করে দুর্দান্ত সব ছবি তৈরি করেছেন পিকাসো, মাতিস, গদিয়ে-ব্রেৎসকা। আমাদের বাংলায় নন্দলাল বসুর লিনোকাট ছবি তো আর্কিটাইপ হয়ে গেছে। লিনোকাটের ছবিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে গেছেন আর একজন শিল্পী তিনি হলেন চিত্তপ্রসাদ।

লিনোলিয়াম কাট (Linoleum Cut)

লিনোকাট দেখুন।

লেআউট (Layout)

ছাপ বা শিল্পকর্মের খসড়া। পেন্টিং বা কমার্শিয়াল আর্ট তথা মুদ্রণ প্রক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। ছবি আঁকার আগে শিল্পী নানাভাবে তার রূপায়ণটাকে বুঝে নিতে একাধিক খসড়া নির্মাণ করেন। চিত্রতলের সঙ্গে বিষয়বস্তুর আকার আকৃতির সম্পর্ক, ব্যবহৃত ফর্মগুলির আন্তঃসম্পর্ক, বিশেষ করে স্পেসের ব্যবহার লেআউটের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কমার্শিয়াল আর্টের ক্ষেত্রে ছবি, অলংকরণ, ব্যাখ্যা, বিবরণ, ক্যাপশন বা শিরোনাম ইত্যাদির ব্যবহার, নির্দিষ্ট আকার ও আয়তনের সঙ্গে এসব উপাদানের সম্পর্ক ইত্যাদিকে বুঝতে ও বোঝাতে সাহায্য করে। এক কথায় সমগ্র শিল্পকর্মটির সুষ্ঠু রূপায়ণের পথ নির্দেশ এবং একই সঙ্গে শিল্পকর্মটির চূড়ান্ত রূপের প্রস্তাব হল লেআউট।

লে-ইন (Lay-in)

ড্রয়িং বা পেন্টিং-এর প্রথম স্তর। এই পর্বে চূড়ান্ত কাজের জন্য প্রাথমিক রং সমূহ এবং ভ্যালুকে প্রয়োগ করা হয়। এটি অ্যালা প্রাইমা পদ্ধতির বিপরীত। তেল রঙের ছবির ক্ষেত্রে সাধারণভাবে এই পর্বে লাগানো হয় ডার্ক মিডল টোন বা গাঢ় মাঝারি ধরনের ছায়। ছবির ধরন এবং রঙের পরিকল্প (Scheme) অনুযায়ী লে-ইনে রঙের নির্বাচনও হয় বিভিন্ন ধরনের। কখনো-কখনো এই পর্বে ব্যবহার করা হয় শুধুমাত্র ধূসর বা গ্রে কালার। তারপর অন্য সব রং প্রয়োগ করা হয়। লে-ইন একটি রঙের পাতলা প্রলেপ বা ওয়াশও হতে পারে। আসলে লে-ইনে ব্যবহৃত রং হল চূড়ান্ত রং সমূহের একটা প্রায় কাছাকাছি নির্বাচিত রূপ এটা এমন হবে যা চূড়ান্ত পর্যায়ের বর্ণবিন্যাস ফুটিয়ে তুলতে সাহায্য করবে। অপ্রয়োজনীয় রঙের অযৌক্তিক ব্যবহার যা ছবির স্বাস্থ্যের ক্ষতি করতে পারে তাকে এড়ানো যাবে।

লেড পেপার (Laid paper)

এক ধরনের কাগজ। এই কাগজে ঘন লম্ব অনুভূমিক রেখায় তৈরি পাঁজর সদৃশ একটা বুনট (texture) থাকে। অনুভূমিক রেখাগুলি একটু অস্পষ্ট। কাগজ তৈরি যন্ত্রের ছাঁচে একটা জালির ওপর মণ্ড স্প্রে করে কাগজ তৈরি হয়। এই জালির সরু ও মোটা তারের জন্যই এক রকম বুনট তৈরি হয়। আলোয় ধরলে কাগজের এই লম্ব রেখাগুলি স্পষ্ট দেখা যায়। এই কাগজ ওভ পেপার নামে আর একপ্রকার কাগজের সমতুল। ওভ একটু বেশি মসৃণ এবং এবং রিব বা পাঁজর অত স্পষ্ট নয়।

লেক (Lake)

এক ধরনের নিষ্ক্রিয় সাদা পদার্থকে রাঙিয়ে তৈরি পিগমেন্ট বা রঞ্জক। সাধারণভাবে রঞ্জনদ্রব্য বা কালার‍্যান্ট দু-ধরনের। পিগমেন্ট বা গুঁড়ো রং এবং ডাই বা রঞ্জনী। পিগমেন্ট হল খুব মিহি গুঁড়ো রং যা সরাসরি বাইন্ডারের সাথে মিশিয়ে পেন্ট তৈরি করা যায়। কিন্তু ডাই বা রঞ্জনী সরাসরি বাইন্ডারের সাথে মেশানোর উপযুক্ত নয়। ডাইকে আগে পিগমেন্টে পরিণত করে নিতে হয়। এজন্য ডাই বা রঞ্জনী দিয়ে কোনো নিষ্ক্রিয় সাদা গুঁড়ো পদার্থ যেমন ব্লাঁ ফিক্সে বা অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রেটকে রাঙিয়ে নেওয়া হয়। এভাবে তৈরি পিগমেন্ট অর্থাৎ রঞ্জিত সারবস্তু হল লেক। এই লেকের সঙ্গে বাইন্ডার মিশিয়ে পেন্ট তৈরি করা হয়। তবে সব ডাই যথেষ্টভাবে গাঢ় এবং আলো প্রতিরোধী না হওয়ায় তাদের দিয়ে লেক তৈরি করা যায় না।

লেপক্ষী

অন্ধ্রপ্রদেশের অনন্তপুর জেলার হিন্দুপুরের পূর্বদিকের একটি গ্রাম। এই গ্রামে ষোড়শ শতাব্দীতে নির্মিত একটি মন্দির। মন্দিরটির ঘরগুলি সেই অর্থে মস্ত না হলেও কারিগরি উৎকর্ষ, সুন্দর ও সুষমতাপূর্ণ ভাস্কর্য এবং সুচারু ফ্রেস্কো দিয়ে সাজানো। অথচ এই মন্দির দৃষ্টির বাইরেই থেকে গেছে। এই গ্রামে একদা কাপড় বোনার ঐতিহ্য থাকলেও আজ তা আর নেই। ফলে বর্তমানে প্রচলিত 'লেপক্শি প্রিন্টস্' শব্দটি একটা ভুল ধারণার সৃষ্টি করে। কেন-না এতে লেপক্ষী গ্রামটির বদলে যেন লেপক্ষী মোটিফের ধারণা দেয়। তেলেগু শব্দে 'লে' অর্থ ওঠো বা ওঠা। আর পক্ষী— পাখি। প্রচলিত বিশ্বাস হল এখানে রাবণের সঙ্গে সংঘর্ষে আহত জটায়ুকে দেখে রাম তাকে জেগে উঠতে বলেন। এই মন্দির নির্মাণ করেন নন্দী লক্কা শেঠীর দুই ছেলে সর্দার ভীরানা এবং ভীরুপান্না। তৎকালীন শীর্ষ দেবতা বীরভদ্রের একটি বড়ো মুরাল গর্ভগৃহের সিলিং-এ আছে। এখানকার শাসকরা সর্বধর্ম ও জাতের প্রতি সহিষ্ণু ছিলেন। এই উদারনৈতিক মূল্যবোধ মন্দিরের শিল্পকলাতে প্রকাশ পেয়েছিল। বিজয়নগরের শিল্পী ও ভাস্করেরা নিজেরাই চিত্রকল্পের এক বিশেষ স্কুল বা ঘরানা গড়ে তুলেছিলেন। দেবদেবী, সাধারণ মানুষ, রাজন্যবর্গ, অভিজাতশ্রেণি, পশুপাখি পরিবেশ সবই এই শিল্পকর্মে স্থান পেয়েছিল। এখানে যে তিনটি মন্দির আছে তার একটি

বীরভদ্রকে উৎসর্গিত। একটি ছবিতে আছে দক্ষকে ধ্বংস করার পর বীরভদ্র বেরিয়ে আসছে। অন্য দুটি মন্দির হল পাপানেসর ও রামলালার মন্দির। মন্দিরটি তিনটি ভাগে বিভক্ত। মুখমণ্ডপ বা নাট্যমণ্ডপ, অর্থ মণ্ডপ ও গর্ভগৃহ এবং কল্যাণ মণ্ডপ। মুখমণ্ডপের ঢোকার পথে আছে গ্র্যানাইট পাথরে খোদাই করা বিরাট স্তম্ভ। মুখমণ্ডপ আয়তকার। এর শৈলী পল্লব রীতির যা তৎকালীন বিজয়নগরে প্রচলিত ছিল। উত্তরপর্বে আছে শিবের বাহন নন্দীর মূর্তি। ১৫ × ২০ ফুট আকারের একটি পাথর কেটে তৈরি। সম্মুখভাগে 'নাগলিঙ্গ'। মুখমণ্ডপের একটি সিলিং-এ চোল রাজবংশের কাহিনি চিত্রিত আছে। এছাড়াও অনেক সিলিং-এ সুদৃশ্য মুরাল আঁকা আছে। যেমন— রঙ্গমণ্ডপের সিলিং-এ শিবের শিকার ধরার দৃশ্য।

লে, ভ্যাঁ (Les, Vingt)

বেলজিয়ানের ২০ জন প্রতীকীবাদী আভঁ গার্দ শিল্পী ও ভাস্করদের একটি সমিতি। ১৮৮৪ সালে এই গোষ্ঠী গড়ে ওঠে। এঁদের প্রধান লক্ষ্য ছিল র‍্যাডিক্যাল আর্টকে ব্রাসেলস্-এ নিয়ে আসা। লে ভ্যাঁ বেলজিয়ান আর্ট ন্যুভো-এর একটি কেন্দ্রীয় গোষ্ঠী হয়ে ওঠে এবং ১৮৮৪ সাল থেকে ১৮৯৪ সাল পর্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে অ্যাপ্লায়েড আর্ট এবং পেন্টিং-এর প্রদর্শনী করে। ১৮৯৪ সালে এই গোষ্ঠী তাদের দলের নাম পরিবর্তন করে। নতুন নাম হয় লা লিবরে এস্টেটিক (La Libre Estetique)। নতুন সংগঠনের অন্যান্যদের সঙ্গে ছিলেন বিশিষ্ট ডাচ শিল্পী চার্লি টুরোপ এবং বেলজিয়ান শিল্পী জেমস্ এনসোর। এই সব প্রদর্শনীতে অগ্রগণ্য বিদেশি শিল্পীদের ছবিও প্রদর্শন করা হয়েছিল। সেসব বিদেশি শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন গগাঁ, ভ্যানগঘ, সুরা, মানে, সেজান, লোত্রেক, হুইসলার, হেনরি ভ্যান ডি ভ্যালডে সহ ব্রিটিশ শিল্পী মরিস এবং বেয়ার্ডসলে প্রমুখ।

লোকাল কালার (Local Colour)

দিনের সাধারণ আলো ও পরিবেশে দৃষ্ট বস্তুর রং। আবহাওয়াগত কোনো পরিবর্তন, কৃত্রিম বা বিশেষ সময়ের বা কৃত্রিম আলোয় প্রভাবিত রং নয়। যেমন— রৌদ্রোজ্জ্বল দিনের সাধারণ আলোয় ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের যে ধূসর রং দেখা যায় তা হল লোকাল কালার। কিন্তু বিকেলের পড়ন্ত আলোয় এটা লাল আভাপন্ন হয়ে ওঠে।

লোয়ার কেজ (Lower Cage)

টাইপোগ্রাফির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত এই শব্দের দ্বারা ছোটো হাতের অক্ষরকে বোঝানো হয়। সাধারণভাবে মুদ্রক তার হরফ রাখার জন্য যে খোপ ব্যবহার করেন তা থেকেই এই নামকরণ। সাধারণভাবে ছোটো হাতের অক্ষরগুলির খোপ থাকে বাঁ দিকে।

ল্যান্ড আর্ট (Land Art)

১৯৬০-এর শেষের দিকে শিল্পের সাধারণ ধারণাগত সীমানা ভেঙে গিয়ে বিচিত্র সব উপাদান দিয়ে নানা আঙ্গিক ও রীতির শিল্পের উদ্ভব হতে শুরু করে। ল্যান্ড আর্ট ঠিক এই সময়ের এক অগ্রগতি। ল্যান্ড আর্ট আর্থ আর্ট বা আর্থ স্কাল্পচার নামেও পরিচিত। এই সময়ের বহু শিল্পই প্রচলিত ধ্যানধারণা ও উপাদানগত বিষয় থেকে সরে গিয়ে অভিনব সব বিষয়কে গ্রহণ করেছিল। সুদীর্ঘলালিত শিল্প ঐতিহ্যকে বাদ দিয়ে পপ আর্টের উপজীব্য ভোগবাদী নাগরিক সংস্কৃতির বিপরীতে ল্যান্ড আর্ট বেছে নিয়েছিল শহর এবং বসত এলাকার বাইরে দূরের কোনো পরিবেশকে। এই আন্দোলনের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল ক্রমবর্ধমান ধ্বংস ও দূষণের হাত থেকে পরিবেশকে রক্ষা করা এবং ভোগবাদের বৃদ্ধির বিরুদ্ধে মানুষকে পরিবেশ সচেতন করে তোলা। বিরাট বিরাট জমিতে বা অঞ্চলে পরিবেশগত এরকম শৈল্পিক ক্রিয়া যেমন এক অর্থে পরিবেশ সংরক্ষণের একটা রূপ তেমনি এর মাধ্যমে এই ভূখণ্ডটিকে উন্নয়নের ছোঁয়া থেকে সরিয়ে রাখা। অনেক ক্ষেত্রেই ল্যান্ড আর্ট ক্ষণস্থায়ী বলে একে বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার করা সম্ভব নয়। তাই

নং ২৭৮. বিচার্ড লং · এ লাইন ইন স্কটল্যান্ড। আরও ছবি নং ১৮৬ পৃ. ৩৬৭



ল্যান্ড আর্টের অস্তিত্বকে ধরে রাখতে ব্যবহার করা হয় ড্রয়িং, ফোটোগ্রাফ, চলচ্চিত্র এবং ভিডিয়ো।

ল্যান্ড আর্টের রূপকার বা শিল্পীরা সাধারণত যা করেন তা হল বিরাট বিরাট ভূখণ্ড জুড়ে নানা ধরনের কর্মকাণ্ড। যেমন কোনো এক মরুভূমি অঞ্চলে একটি বিরাট আকৃতির খননকার্য যেমনটি করেছিলেন আমেরিকান ভূমি শিল্পী মাইকেল হেইজার। তিনি থাকতেন নিউইয়র্কে। নেভাদা মরুভূমিতে তিনি প্রায় সোয়া এক কিলোমিটার দীর্ঘ সাড়ে তিনশো মিটারেরও বেশি চওড়া এবং তিরিশ মিটার গভীর একটি গর্ত খনন করেন। খননকার্য চলাকালীন কর্মস্থলটিতে যে আবহাওয়াগত পরিবর্তন ঘটে তা ভিডিয়োটেপ, ফিল্ম এবং আলোকচিত্রের সাহায্যে নথিবদ্ধ করা হয়। অথবা এই অঞ্চলেই হেইজার তাঁর আর একটি ল্যান্ড আর্ট প্রকল্প 'ডবল নেগেটিভ' বা 'সিলভার স্প্রিং'-এর জন্য মাটি খুঁড়ে প্রায় দু-লক্ষ চল্লিশ হাজার টন পাথর মাটি জড়ো করেছিলেন। অন্যদিকে আর একজন ব্রিটিশ ইনস্টলেশন ও ল্যান্ড আর্টিস্ট রিচার্ড লং প্রাকৃতিক গঠনকে কোনোভাবে নষ্ট না করে ছড়িয়ে থাকা নানা বস্তুকে জড়ো করে তাঁর এক মৌনভাষ্য রচনা করতেন, যেমনটি তিনি করেছিলেন আলাস্কাতে তাঁর ইনস্টলেশন 'এ সার্কেল ইন আলাস্কা বিয়ারিং স্ট্রেট ড্রিফটউড অন দি আর্কটিক সার্কেল'-এ। কিংবা আরেকটি উদাহরণ হল আমেরিকান শিল্পী রবার্ট স্মিথসন-এর 'স্পাইরাল জেটি'। উটার মহা সল্টলেকে একটি পরিত্যক্ত শিল্প কেন্দ্রে পাথর মাটি দিয়ে বিশাল অঞ্চল জুড়ে কুণ্ডলী আকারের একটি পথ তৈরি করেছিলেন স্মিথসন। বেশিরভাগ সময় এই নির্মাণটি লেকের জলের তলায় চলে যেত। কখনো-সখনো এর পিঠ জলের ওপব ভেসে উঠত এর ফলে সম্পূর্ণ রূপটিকে জানতে হয় এর নির্মাণ অব্যবহিত সময়ে তোলা আলোকচিত্র থেকে। বুলগেরীয়াজাত মার্কিন শিল্পী ক্রিস্তো জাফাশেফ যিনি 'আচ্ছাদন শিল্প' (অঁপাকেতাজ) চর্চা করে খ্যাতি পেয়েছিলেন। তিনি ঘরবাড়ি, ল্যান্ডস্কেপ ইত্যাদিকে কাপড়, প্লাস্টিক শিট ইত্যাদি দিয়ে মুড়ে দিতেন। অস্ট্রেলিয়ার লিটল বে-তে ১৯৬৯ সালে প্রায় দশ লক্ষ বর্গফুট অঞ্চলের ঘরবাড়ি এইভাবে কাপড় দিয়ে ঢেকে দিয়ে তৈরি করেছিলেন 'র‍্যাপড কোস্ট'। আয়তনের এই বিশালত্বের জন্যই ল্যান্ড

আর্ট বা আর্থ আর্টকে অনেক সময়ই জানতে হয় তার তথ্যায়িত নমুনা বা ডকুমেন্ট থেকে। একে রক্ষণাবেক্ষণ করাও বেশ মুশকিল বা করা যায় না বলেই বেশিরভাগ সময়ই এর অস্তিত্ব হারিয়ে যায়।

ল্যান্ডস্কেপ (Landscape)

সাধারণভাবে আউটডোর বা বহির্জগতের দৃশ্যকেই ল্যান্ডস্কেপ বলে। বাংলায় যা প্রাকৃতিক দৃশ্য বা ভূদৃশ্য। এই চিত্রে বিস্তীর্ণ অঞ্চলের মাঠঘাট, নদী, পাহাড়, সাগর, গ্রাম, শহর ইত্যাদির দৃশ্য থাকে। আবার আলাদা করে শুধু শহর বা সাগরের দৃশ্যকে যথাক্রমে যথাক্রমে সিটিস্কেপ বা সিস্কেপও বলা হয়। ল্যান্ডস্কেপ বিমূর্ত রীতিতেও আঁকা হতে পারে।

ছবির মুখ্য বিষয় হিসাবে ল্যান্ডস্কেপ চিত্রণ প্রথম দেখা যায় চিন দেশে তাং ও সোং রাজত্বে প্রায় দশম এবং একাদশ শতাব্দীতে। চিনা ল্যান্ডস্কেপের প্রকাশ দেখে মনে স্বপ্নময় বিশ্বজগতের সৃষ্টি হয়েছে মায়া থেকে। উঁচুনিচু এবড়োখেবড়ো পাহাড়গুলো অদ্ভুত সুন্দর, নদী যেন সময়ের মতো অনন্ত। এই ধারণার নায়ক হলেন কবি, যিনি তাঁর অসীম কল্পনার মধ্যে প্রায় অদৃশ্য ক্ষুদ্র একটি মানুষ। পাশ্চাত্যে প্রকৃতির এই রূপকল্পনা আসে অনেক পরে। চতুর্দশ শতাব্দীতে ইতালির কবি পেট্রার্ক দূরের দৃশ্য দেখার জন্য পর্বতারোহণ করেছিলেন। ক্ল্যাসিকাল যুগের ছবির আপাত বাস্তবধর্মী ছবিতে যে যৎসামান্য প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায় তা একান্তভাবেই পশ্চাৎপট উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছিল। কিন্তু মধ্যযুগে ল্যান্ডস্কেপের যে পুনরাবির্ভাব ঘটেছিল তা ছিল ভীষণরকম শৈলীবদ্ধ এবং সাংকেতিক বা আলংকারিক এক রূপ। এর দুর্দান্ত উদাহরণ হল ভেনিসের চিত্রকর পাওলো ভেনজিয়ানোর পুত্র জিয়োভান্নি ডি পাওলোর ছবি 'ম্যাডোনা অ্যান্ড দি চাইল্ড ইন ল্যান্ডস্কেপ।' ১৪৩৫ খ্রিস্টাব্দে জন ভ্যান আইক-এর আঁকা 'ম্যাডোনা উইথ চ্যান্সেলর রবিন' ছবিতে অত্যন্ত বাস্তবধর্মী রীতিতে ল্যান্ডস্কেপ আঁকা হয়েছে। কিন্তু সেই ল্যান্ডস্কেপ মনুষ্য ক্রিয়াকর্মের পরিপূরক হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রকৃত অর্থে ল্যান্ডস্কেপের স্বাধীন রূপ প্রথম দেখা যায় ব্রুইগেলের ছবিতে। অবশ্য অনেক শিল্প ঐতিহাসিক ক্লোদ লোরাঁকে ল্যান্ডস্কেপ চিত্রের জনক বলে মনে করেন। ১৫৬৫

নং ২৭৯. জ্যাকব ভ্যান রুইসডেল : গম খেত। ১৬৭০। ক্যানভাসের ওপর তেল রং। আরও ছবি নং ১৮৭ পৃ. ৩৬৮



খ্রিস্টাব্দে আঁকা ব্রুইগেলের ছবি 'দি হান্টার ইন দি স্নো'-তে যে মানুষের ফিগার আছে তা সম্পূর্ণভাবে প্রকৃতির অঙ্গ। অথবা বলা যায় সেখানে ঘটনা প্রধান নয়।

মৌলিক বিষয় হিসাবে ল্যান্ডস্কেপ চিত্রাঙ্কন সপ্তদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ডাচ শিল্পীদের অবদান। ডাচ শিল্পীদের এই সমস্ত ল্যান্ডস্কেপে একটি সদ্যজাত জাতির স্বাধীনতা, শান্তি, সমৃদ্ধি, তাঁদের জীবনযাত্রার নানা বিষয়গুলি উদ্‌যাপনের প্রতিফলন ঘটেছে। একটা আত্মবিশ্বাসের শক্তি থেকে এই সব ল্যান্ডস্কেপের সৃষ্টি হয়েছিল। তা যেন কৃষি অর্থনীতির দাবি অনুযায়ীই বিন্যস্ত, মাঠঘাট গ্রীষ্মের বিস্তীর্ণ আকাশের নীচে ছড়ানো বা শীতে সুপ্ত অবস্থায় শায়িত। জাপানের শিল্পী হোকুসাই-এর ছবিতেও ল্যান্ডস্কেপের দৃষ্টান্ত আছে। কিন্তু হোকুসাই-এর আগে জ্যাকব ভ্যান রুইসডেল ল্যান্ডস্কেপের অনুপুঙ্খ বিশদে ব্যবহার করেছিলেন। যার অন্যতম উদাহরণ— 'হুইটফিল্ড'। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই ল্যান্ডস্কেপে প্রতিটি বস্তুর সুনির্দিষ্ট রূপ, অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে চয়ন করা গাছপালা, আলোর ব্যবহারে সামগ্রিকভাবে একটি ঐক্যতান সৃষ্টি করেছে যেমনটি দেখা যায় হোকুসাই-এর ছবিতে। ব্রিটিশ শিল্পী গেইনসবোরার ছবিতেও ল্যান্ডস্কেপের ব্যবহার প্রাধান্য পেয়েছে। নীল রংকে যথাসম্ভব কম দেখিয়েও তিনি অসামান্য সব ল্যান্ডস্কেপ এঁকেছিলেন। তাঁর বিখ্যাত একটি ছবি হল 'মিস্টার অ্যান্ড মিসেস অ্যান্ড্রুস।' উনবিংশ শতাব্দীতে ভয়ংকর প্রাকৃতিক বিষয়গুলি ল্যান্ডেস্কেপের উপাদান হয়ে উঠল। যা রোমান্টিক শিল্পীদের কল্পনাকে কেড়ে নিল। এরকম একটা পরিস্থিতিতে এলেন

জোসেফ টার্নার। একজন ব্রিটিশ ল্যান্ডস্কেপ শিল্পী। টার্নারকে দেখা যায় যে তিনি প্রকৃতির মধ্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা থেকে প্রাকৃতিক রূপকে বোঝার চেষ্টা করছেন। জানা যায়, টার্নার জাহাজের মাস্তুলে নিজেকে বেঁধে লন্ডনের পার্লামেন্ট হাউসের অগ্নিকাণ্ডকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। ফলে আগুন, জল, হাওয়া ইত্যাদি উদ্বায়ী উপাদানের মধ্যে ল্যান্ডস্কেপ কার্যত অদৃশ্য হয়ে গেল। আর এটাই টার্নারের ল্যান্ডস্কেপের অন্য একটা বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠল। অন্যদিকে আরেক ব্রিটিশ ল্যান্ডস্কেপ শিল্পী কনস্টেবল, ইম্প্রেশনিস্ট আবহে ওয়ার্ডসওয়ার্থীয় দর্শনের প্রয়োগ ঘটিয়েছেন তাঁর ল্যান্ডস্কেপে। যার মূল কথা হল প্রকৃতির স্থায়ী রূপ ও সৌন্দর্যের মধ্যে মানুষের আবেগের মিশ্রণ। পাশ্চাত্যে আধুনিক ভাবনার যে প্রভাব ল্যান্ডস্কেপে পড়েছে তা দেখতে পাই হপার, মন্দ্রিয়ান প্রমুখের কাজে।

আমাদের দেশে প্রখ্যাত শিল্পীরা বহু ল্যান্ডস্কেপ এঁকেছেন। এইসব ল্যান্ডস্কেপে প্রকৃতি নানান ভাব নিয়ে হাজির হয়েছে। কালিকলম, জল রং, টেম্পারা ওয়াশ মাধ্যমে আঁকা এইসব ল্যান্ডস্কেপের বেশিরভাগই হয়তো বাস্তববাদী রীতিতে করা হয়নি, তবুও তা গভীর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এর মধ্যে যেমন আছে রবীন্দ্রনাথ, নন্দলাল, বিনোদবিহারী, যামিনী রায়, রামকিঙ্কর, হীরাচাঁদ দুগার প্রমুখের ছবি তেমনি আছে সাম্প্রতিককালের এফ. এন. সুজা, আকবর পদমসীর ছবিও।

ল্যাম্পব্ল্যাক (Lampblack)

কালো অঙ্গারের (কার্বন) একটি রূপ। খাঁটি বা প্রায় খাঁটি অতি মিহি এই কার্বন পাওয়া যায় জৈব পদার্থ পুড়িয়ে বিশেষ করে তেল পুড়িয়ে। ল্যাম্পব্ল্যাক হল সবচেয়ে পুরানো ধরনের কালো পিগমেন্ট যা নানা রকমের কালো রং এবং বিশেষ করে কালি তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।



শ

শপ পিকচার (Shop Picture)

এই শব্দটা ব্যবহার করেন মুখ্যত ডিলাররা। গিল্ড ওয়ার্কশপ বা কর্মশালায় বিখ্যাত শিল্পীর তত্ত্বাবধানে যেসব ছবি তৈরি হয় তা শপ পিকচার নামে আখ্যায়িত।

শিকাগো স্কুল
(Chicago School)

শিকাগোর বিশিষ্ট স্থপতি ও কারিগর লুই সুলিভান ১৮৯২ সালে 'স্থাপত্যে অলংকারের ব্যবহার' প্রসঙ্গে বলেছিলেন 'নান্দনিক মঙ্গলের স্বার্থেই কয়েক বছরের জন্য আমাদের স্থাপত্যে অলংকারের ব্যবহার বন্ধ রাখা উচিত।' এই ধারণাই ছিল 'শিকাগো স্কুল' আন্দোলনের অন্যতম মর্মবাণী। এই সঙ্গে সহমত পোষণ করতেন সমমনোভাবাপন্ন



নং ২৮০. ডি.এইচ. বার্নহ্যাম অ্যান্ড কোম্পানি। রিলায়েন্স বিল্ডিং। ১৮৯১ - ১৮৯৫। শিকাগো। ১৪ তলা বাড়িটির উচ্চতা ২০০ ফুট।

বেশ কয়েকজন স্থপতি এবং কারিগরের একটি গোষ্ঠী। এই গোষ্ঠী প্রথাসিদ্ধ ছিল না। এঁদের শিল্পশৈলী শিকাগো স্কুল নামে পরিচিত। এইসব স্থপতি ও কারিগরেরা ১৮৭৫ থেকে ১৯১০ সময়কালে শিকাগোতে কর্মরত ছিলেন। এটা কোনো ঘোষিত আন্দোলন ছিল না। এই গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ডাঙ্কমার অ্যাডলার, ডেনিয়েল এইচ বারহ্যাম, উইলিয়ম হোলেবার্ড, উইলিয়ম লে ব্যারন জেনি, মার্টিন রোশে, জন ওয়েলবর্ন রুট এবং প্রথম থেকেই ছিলেন সুলিভান। এই সময়ে যা ঘটেছিল তা হল, গৃহযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে শিকাগো কর্তৃপক্ষ স্থপতিদের প্রচুর সুযোগসুবিধা দেয়। শহরের পশ্চিমমুখী সম্প্রসারণ ঘটে। আবার অগ্নিকাণ্ডেও এর মধ্যাংশের অনেকটা জমি ধ্বংস হয়। জমির দামও যেমন বেড়ে যায় তেমনি জমির ব্যবহারও নিয়ন্ত্রিত হয়। এর একমাত্র সমাধান দাঁড়ায় বহুতল বাড়ি নির্মাণ যা এই আন্দোলনের ফসল। আর এর মধ্য দিয়ে ১৮৫৩ সালে এলিজা ওটিস-এর আবিষ্কৃত লিফটও কার্যকারী হয়। কিন্তু দুটো সমস্যা থাকে। একটা হল বাড়িগুলির স্ফীতি ও ওজনবহুলতা এবং আগুনের বিপদ। প্রথম সমস্যা সমাধানের জন্য প্রচলিত ভারবাহী দেয়ালের পরিবর্তে ব্যবহার করা হল অভ্যন্তরীণ ধাতুর ফ্রেম। এই প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে ১৮৮৩-৮৫ সালে জেনির হোম ইনশিয়োরেন্স বিল্ডিং তৈরি হয়। পরে অবশ্য ১৯৩১ সালে এই বাড়ি ভেঙে ফেলা হয়। এই বাড়িটিই ছিল বিশ্বের প্রথম যা সম্পূর্ণ আভ্যন্তরিক ধাতব কাঠামোর সাহায্যে তৈরি। আরও দেখা গেল লোহার খাঁচার ওপর ইমারতি কাজ দিয়ে কাঠামো যেমন উঁচু বাড়ির পক্ষে নির্ভরযোগ্য তেমনি ঢালাই লোহার খাঁচার চেয়ে এটা অনেক বেশি তাপরোধক। প্রযুক্তিগত উন্নতি আর সৌন্দর্যের বিষয় যে অবিচ্ছেদ্য তারও দৃষ্টান্ত দেখা গেল। মারাকেট বিল্ডিং, রুট অ্যান্ড চার্লস অ্যাটউড রিলায়েন্স বিল্ডিং-এ স্টিলের খাঁচাগুলি কাঁচের চাদর দিয়ে ঢেকে দেওয়া হল। ভারবাহী দেয়ালের প্রয়োজনীয়তা হ্রাস পাবার ফলে আরও নতুন কিছু মাত্রা সৃষ্টি হতে পারল। যেমন বিখ্যাত 'শিকাগো উইন্ডো'-এর জন্ম হল। যার ফলে বহির্মজ্জার সরলীকরণ ঘটল। এই সময়ের অন্য যে কোনো পার্টনারশিপের চেয়ে সুলিভান অ্যাডলার টিমের কাজকর্মই

যেন শিকাগো স্কুলের সঙ্গে বেশি সম্পর্কযুক্ত ছিল। এই সময়ের তৈরি স্থাপত্যের যেসব বৈশিষ্ট্য ছিল তা হল বাড়িগুলি প্রায় আকাশচুম্বি ধরনের, লম্বা ও খাড়া বাড়িগুলিতে একের পর এক যে অনুভূমিক স্তর ব্যবহার করা হয় তাতে সৃষ্ট সমস্যার সমাধানের জন্য অনুভূমিক স্তরগুলি সরাসরি ব্যবহার করা হয়েছে। জানলার নীচে ব্যবহৃত অলংকরণের সাহায্যে অনুভূমিক স্তরগুলির উপস্থিতিকে স্পষ্ট করা হয়েছে। ওপরে ব্যবহার করা হয়েছে সুসজ্জিত ফ্রিজ এবং চওড়া কার্নিস।

১৯০০ সালে অ্যাডলারের মৃত্যুর পর সুলিভান একা হয়ে পড়েন। তাঁর বরাত পাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। একই সময়ে আমেরিকাতে নিও ক্ল্যাসিকাল স্থাপত্যরীতি ফিরে আসে এবং শিকাগো স্কুল রীতির ফ্যাশন অচল হয়ে যায়।

শিনোয়াস্যরি (Chinoiserie)

চৈনিক ভাস্কর্য ও স্থাপত্যের খেলো ধরনের ইউরোপীয় নকল। ১৬৭০-এর কাছাকাছি সময় থেকে সারা ইউরোপে এই শিল্প জনপ্রিয় ছিল। তবে ইউরোপের রোকোকো শৈলীর সঙ্গে এর যোগ ছিল। এর প্রয়োগ ঘটেছিল স্থাপত্য, গৃহসজ্জা, চিত্রকলা, ভাস্কর্য, চিনেমাটি, ধাতুর কাজ সহ অন্যান্য শিল্পকর্মে।

শিপেনডেল (Cheppendale)

রোকোকো রুচিতে তৈরি ইংরেজ আসবাবপত্র। এতে অতিরিক্ত মাত্রায় আলংকারিক বক্রতার ব্যবহার আছে যা প্রায়ই জালের মতো একদিক থেকে অন্যদিকে দেখা যায়। যেমনটি চেয়ারের পিঠে থাকে। ডিজাইনার এবং ক্যাবিনেট প্রস্তুতকারক থমাস শিপেনডেল-এর নাম থেকে এর উৎপত্তি। ১৭৫৪ সালে শিপেনডেল এই জাতীয় শৈলীর নকশার ওপর একটা বই প্রকাশ করেন। যার নাম 'দি জেন্টল্‌ম্যান অ্যান্ড ক্যাবিনেট মেকারস্ ডিরেক্টর'।

শিল্পগুণ বিচার

শিল্প কী এককথায় তার উত্তর দেওয়া কঠিন। কেউ বলেছেন যে শিল্প হল প্রকৃতির সৃজনশীল প্রতিরূপ (Creative reproduction of nature)। কিন্তু এ ব্যাখ্যাও সম্পূর্ণ নয়। এতেও অনেক প্রশ্ন উঠে আসবে যার মীমাংসা নেই। তবে শিল্পের সংজ্ঞা যাই হোক না কেন শিল্পের সার, শিল্পের রসগুণ উপলব্ধি ও গ্রহণ করার ক্ষেত্রে কোনো বাধা নেই।

কিন্তু তা শিল্পকর্মকে নির্লিপ্তভাবে দেখেই হবে না। তার জন্যেও কিছু বিষয় ও তথ্যের সন্ধান করতে হবে শিল্পকর্মে উপস্থাপিত দৃশ্য উপাদানের ভেতরে। একটি নির্দিষ্ট শিল্পকর্মকে বিশ্লেষণের আগে দেখে নেওয়া যেতে পারে তথ্যানুসন্ধানের ভিত্তিগুলি কী কী?

যেমন শিল্প—

১. কতগুলো দৃশ্যোপাদানের আয়োজন যা দৃশ্যগত ভাষা হিসাবে কাজ করে। ২. নির্দিষ্ট কিছু পছন্দ যা উদ্দেশ্য অনুযায়ী সৃষ্ট। ৩. কিছু মিথস্ক্রিয়া, কিছু কিছু ঘটনা। ৪. মানুষের চিন্তনের দলিল, তথ্য।
এসবেরও আবার কিছু ব্যাখ্যা আছে। শিল্পকর্ম যে দৃশ্যভাষা দিয়ে তৈরি তা সবসময়ই কিছু বক্তব্য প্রকাশ করে। এই সব দৃশ্যভাষা নানা উপাদানে গঠিত। যেমন রেখা, রং, আভার মাত্রা (tone) বা ভ্যালু, আকৃতি, বুনট, পরিসর ইত্যাদি। এইসব মিলে তৈরি দৃশ্যভাষা অনেক সময়ই লিখিত ভাষার চেয়ে অনেক বেশি কিছু বলতে পারে। শিল্প অন্যান্য অনেক বিষয় থকে আলাদা কেন-না এটা মানুষের পছন্দজাত। মানুষের পছন্দ আবার প্রয়োজন ও উদ্দেশ্য দ্বারা পরিচালিত হয়। বস্তু ও ভাষা হিসাবে একটি শিল্পকর্মের পরিকল্পনা করা হয় কিছু করবার জন্য। শিল্পকর্মকে কখনোই একটা সরল বস্তু হিসাবে গণ্য করা উচিত নয়। বরং এটা হল কতগুলো মিথস্ক্রিয়া বা interactions যার সুস্পষ্ট সংবৃত্তি ঘটে দর্শক ও শিল্পকর্মের মধ্যে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে দর্শক ও শিল্পকর্মের মধ্যে এই প্রক্রিয়ারও পরিবর্তন ঘটতে থাকে। এই মিথস্ক্রিয়া বা interaction স্বভাবতই সরল নয় বরং জটিল ধরনের। শিল্পকর্ম অবশ্যই কোনো বস্তু। বৃহত্তর পরিসরে শিল্পের ইতিহাস হল বস্তুর ইতিহাস। এর সঙ্গে আছে মিথস্ক্রিয়া বা interaction যা তাদের নির্মাণের দিকে নিয়ে যায় এবং সৃষ্টির মধ্য দিয়ে প্রতিভাত হয়। শিল্প ঐতিহাসিকেরা শিল্পকর্মকে কালের বা বিষয়ের দলিল এবং তথ্য-উৎস হিসাবে চিহ্নিত করেন। সেই কারণেই লেখ্য দলিলের মতো শিল্পকর্মের মধ্যেও অবস্থাগত তথ্যকে 'পড়া' যেতে পারে। যেহেতু একটিমাত্র প্রমাণপত্র বা document আংশিক তথ্যকে জানাতে পারে তাই এক্ষেত্রে গুচ্ছ গুচ্ছ

শিল্পকর্মকে পর্যালোচনা করার চেষ্টা করা হয় যাতে শৈলীর Type-কে চিহ্নিত করা যায়। যা দিয়ে শিল্পের কাহিনিকে পুনর্গঠিত করা সম্ভব। যতক্ষণ শিল্পের ইতিহাস হল সাধারণভাবে শৈলী বা শিল্পকর্মের চেহারা পরিবর্তনের বর্ণনা তখন এটাও ঠিক যে তা অংশত বাস্তব, অংশত প্রকল্প বা কল্পিত সত্য। এখানে ঘটনা এবং সিদ্ধান্ত কমবেশি শিল্পের চেহারাকে রূপ দান করেছে। এর দ্বারা বোঝা যায় যে শিল্প হল—কী করে মানুষ সংকল্প ও অর্থ সৃষ্টি করে তার সাক্ষ্যপ্রমাণ এবং মানুষের খুবই জটিল চিন্তন প্রক্রিয়ার নমুনা।

এর ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে একটি শিল্পকর্মের বিষয়ে যেসব প্রশ্নগুলো করা যায় তা হল—

১. তথ্য বিষয়ক : কখন, কোথায়, কার দ্বারা শিল্পকর্মটি তৈরি হয়েছে? এর সম্পর্কে অন্যান্য কী কী অবস্থাগত তথ্য জানা যায়? একে কীভাবে ব্যবহার করা হয়েছে?

২. আঙ্গিকগত বিষয়ে দৃশ্যগত ঘটনা কী কী? কী কী পদার্থ ও উপকরণ এবং কৌশল ব্যবহার করা হয়েছে? কীভাবে শিল্পকর্মটির বিন্যাস ঘটানো বা সাজানো হয়েছে? কী ধরনের দৃশ্যগত নকশা ব্যবহার করা হয়েছে?

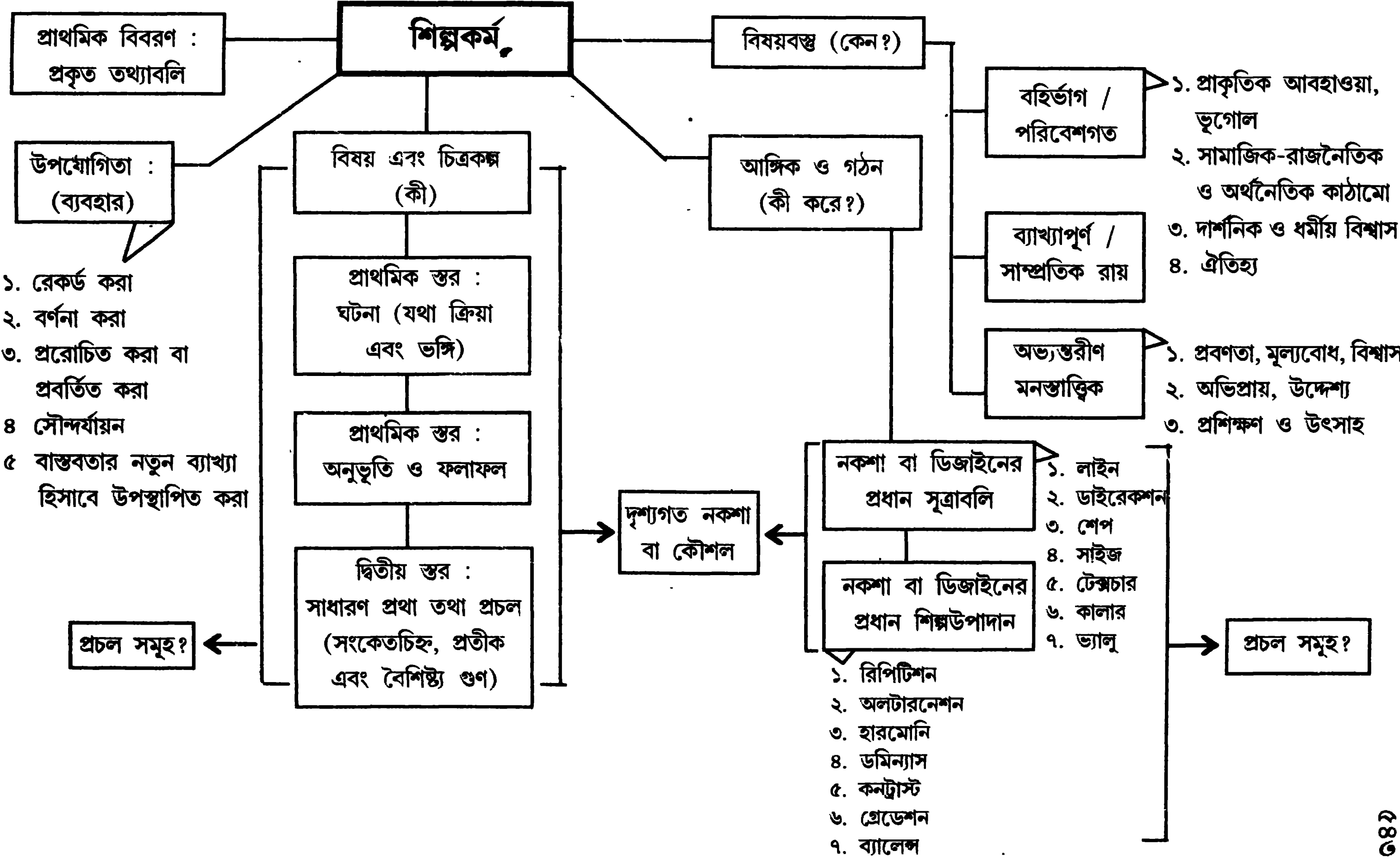
৩. চিত্রকল্প বিষয়ে : শিল্পকর্মটি কোন ছবিকে দেখাচ্ছে? কোন অনুভূতিকে বর্ণনা করছে? কী কী প্রতীক কাজে লাগানো হয়েছে?

৪. শিল্পকর্মটিকে ব্যাখ্যার বিষয়ে : শিল্পকর্মটি সাধারণভাবে এবং বিশদে যেমনটি দেখতে তেমনটি দেখাচ্ছে কেন? শিল্পকর্মটি যে সংস্কৃতির ফসল বা যে শিল্পী এর স্রষ্টা তার সম্বন্ধে শিল্পকর্মটি কী কী তুলে ধরেছে? কী উদ্দেশ্য এটা ব্যক্ত করছে? এই বিষয়ের অন্যান্য শিল্পকর্মের সঙ্গে এর আঙ্গিক ও রূপ কীভাবে তুলনীয়?

এই সমস্ত বিষয়ের নিরিখে বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও বড়ো মাপের শিল্পকর্ম তথা আধুনিক চিত্রকলার বিস্ময়কর সৃষ্টি পিকাসোর ‘গের্নিকা’ ছবিটিকে বিচার করে দেখে নেওয়া যেতে পারে। সঙ্গের চার্ট থেকে বুঝে নেওয়া যাক একটি শিল্পকর্মে ঠিক কোন কোন উপাদান তথা তথ্যকে খুঁজতে হবে।



নং ২৮১. পিকাসো : গের্নিকা। ১৯৩৭। ক্যানভাসের ওপর তেল রং। ১১.৬×২৫.৮ ফুট।


শিল্পকর্ম
প্রাথমিক বিবরণ : প্রকৃত তথ্যাবলি
উপযোগিতা : (ব্যবহার)
১. রেকর্ড করা
২. বর্ণনা করা
৩. প্ররোচিত করা বা প্রবর্তিত করা
৪ সৌন্দর্যায়ন
৫ বাস্তবতার নতুন ব্যাখ্যা হিসাবে উপস্থাপিত করা
বিষয় এবং চিত্রকল্প (কী)
প্রাথমিক স্তর : ঘটনা (যথা ক্রিয়া এবং ভঙ্গি)
প্রাথমিক স্তর : অনুভূতি ও ফলাফল
দ্বিতীয় স্তর : সাধারণ প্রথা তথা প্রচল (সংকেতচিহ্ন, প্রতীক এবং বৈশিষ্ট্য গুণ)
প্রচল সমূহ?
বিষয়বস্তু (কেন?)
বহির্ভাগ / পরিবেশগত
১. প্রাকৃতিক আবহাওয়া, ভূগোল
২. সামাজিক-রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো
৩. দার্শনিক ও ধর্মীয় বিশ্বাস
৪. ঐতিহ্য
ব্যাখ্যাপূর্ণ / সাম্প্রতিক রায়
অভ্যন্তরীণ মনস্তাত্ত্বিক
১. প্রবণতা, মূল্যবোধ, বিশ্বাস
২. অভিপ্রায়, উদ্দেশ্য
৩. প্রশিক্ষণ ও উৎসাহ
আঙ্গিক ও গঠন (কী করে?)
দৃশ্যগত নকশা বা কৌশল
নকশা বা ডিজাইনের প্রধান সূত্রাবলি
১. লাইন
২. ডাইরেকশন
৩. শেপ
৪. সাইজ
৫. টেক্সচার
৬. কালার
৭. ভ্যালু
নকশা বা ডিজাইনের প্রধান শিল্পউপাদান
১. রিপিটিশন
২. অলটারনেশন
৩. হারমোনি
৪. ডমিন্যান্স
৫. কনট্রাস্ট
৬. গ্রেডেশন
৭. ব্যালেন্স
প্রচল সমূহ?

গের্নিকা

প্রাথমিক বিবরণ

পিকাসোর ছবি 'গের্নিকা'। ১৯৩৭ সালে ক্যানভাসের ওপর তেল রঙে আঁকা। মাপ ১১´-৩$\frac{৩}{৩}$″ × ২৫´- ″। প্যারিসের আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে স্পেনের প্যাভিলিয়নের জন্য আঁকা।

উপযোগিতা

স্পেনের গৃহযুদ্ধের সময় গের্নিকা শহরে জেনারেল ফ্র্যাঙ্কোর সেনাবাহিনী বর্বরোচিতভাবে বোমা ফেলে অসংখ্য মানুষকে হত্যা করার প্রতিবাদ। অর্থাৎ এক্ষেত্রে স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য প্ররোচনা।

বিষয় বস্তু

বহির্গত/শৈল্পিক পরিবেশ সম্পর্কীত

চলতি সময়ের স্পেনের গৃহযুদ্ধ চলাকালীন পরিস্থিতি এবং সে সময়ে ইউরোপ জুড়ে ফ্যাসিবাদের ক্রমবর্ধমান নারকীয় হত্যাকাণ্ডের প্রতিফলন।

ব্যাখ্যাপূর্ণ/সাম্প্রতিক সিদ্ধান্ত

আধুনিক স্বৈরতন্ত্রের প্রমাণ সম্পর্কে একটা প্রামাণ্য রূপ এবং আধুনিক যুদ্ধবাদের বিপদ সম্পর্কে চেতাবাণী।

আভ্যন্তরীণ/মনস্তাত্ত্বিক

গের্নিকাতে বোমাবর্ষণের বিরুদ্ধে এক দেশপ্রেমিক প্রতিক্রিয়ার দাবিসনদ এবং মানুষের স্বাধীনতাকে সুরক্ষিত রাখার আখাঙ্ক্ষাজনিত প্রতিবাদ।

বিষয় এবং চিত্রকল্প

তথ্যপূর্ণ এবং তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়

মৃত সৈনিকের দেহ। মৃত ঘোড়া, একটি পতিত ষাঁড়ের সঙ্গে আগুনের শিখার মধ্যে স্থাপত্যের কিছু টুকরো যা চেনা যায়; উত্তেজিত এবং আর্ত নাগরিক যাদের চোখে মুখে ভয় এবং যন্ত্রণার ছাপ, অতিরঞ্জিত ভঙ্গি দ্বারা যাকে বাড়ানো হয়েছে।

প্রচলিত দৃশ্যরূপ

ষাঁড়ের ছবিটির উৎস হল স্পেনের চিরাচরিত ষাঁড়ের লড়াই এবং ভূমধ্যসাগরীয় আধা মানুষ আধা ষাঁড়রূপী দানবের পৌরাণিক কাহিনির আজগুবি বিষয়টিকে স্বৈরশক্তির হাতে স্পেনের অত্যাচারিত হওয়ার রূপক হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে।

→ মূর্তিবাদী প্রচল মোটিফ (চিত্রকল্প)

→ আঙ্গিকের প্রচল হল কিউবিস্ট রীতি

রূপ/আঙ্গিক

ডিজাইনের প্রধান সূত্রাবলি

তির্যক রেখার পুনরাবৃত্তির সাহায্যে গতির জোরালো উপস্থিতিকে বোঝানো হয়েছে। সেইসঙ্গে একটি কেন্দ্রীয়ভাবে প্রাধান্যমূলক ত্রিভুজের সাহায্যে কিছুটা স্থিতিশীলতার উপস্থিতি রাখা হয়েছে। ভ্যালু বা শেডিং-এর রূপকল্পে জোরালো বৈপরীত্যের সঙ্গে নানা ধরনের রূপ বিকৃতিও আছে। জটিলতা এবং বৈচিত্র্যও গুরুত্ব পেয়েছে।

ডিজাইনের প্রধান উপাদান

এটি কালো, সাদা, ধূসর রঙে আঁকা প্রায় একটিমাত্র টোনের ছবি এবং রেখাগুলি বাস্তবরূপের বর্ণনাধর্মী নয়। কিন্তু কৌণিক এবং বিকৃত বিষয়গুলি, বেশ কিছু ভিন্নধর্মী জ্যামিতিক আকৃতি সারাটা ক্যানভাস জুড়েই আছে। দৃশ্যগত নকশা। কৌশল (নির্দিষ্ট নয়)

→ আঙ্গিকের প্রচল হল কিউবিস্ট রীতি

শিল্প ষড়ঙ্গ

ষড়ঙ্গ দেখুন।

শিশুচিত্রকলা

শিখে অথবা মন থেকে ছোটোদের আঁকা ছবি। এখন খুব ছোটোবেলায় স্কুলে এবং বাড়িতেও বাচ্চাদের আঁকা এবং রং করার প্রাথমিক বিষয়গুলো শেখানো হয়। তথাপি দেখা যায় বাচ্চাদের আঁকা বেশিরভাগ ভালো ছবিগুলি বড়োদের শেখানো তথাকথিত নিয়মের বাইরে গিয়েই তৈরি হয়েছে। সম্ভবত সবচেয়ে খারাপ কাজ হল যে বাচ্চাদের ওপরে শিল্পবোধের নিয়ম চাপিয়ে দিয়ে তাদের শিল্পী জীবনের মুক্ত ভবিষ্যৎকে নষ্ট করে দেওয়া। যেমন— 'না, টুটুল, গাছ ওরকম দেখতে হয় না— এরকম ভাবে করো।' অনেক অভিজ্ঞ শিল্পীও সচেতনভাবে নিয়মের বাইরে বাচ্চাদের মতো আঁকতে চেষ্টা করেন। তবে এটা করতে পারা খুবই কঠিন কাজ। এ প্রসঙ্গে শিল্পী বিনোদ বিহারী মুখোপাধ্যায় 'শিশুদের ছবি আঁকা' প্রবন্ধে বলেছেন 'ছোটো বয়সেই প্রথমত ছোটোদের মনকে একটা বিশেষ দিকে জোর করে চালিত করবার চেষ্টা করা সংগত নয়।... দ্বিতীয়ত, অস্বাভাবিক উপায়ে ছোটোদের মনকে বিশ্লেষণধর্মী করে তোলার চেষ্টা না করাই ভালো।... যদি বিজ্ঞ শিক্ষক বৈজ্ঞানিক সূক্ষ্মতার সঙ্গে পারস্পেকটিভ, মডেল ড্রয়িং শেখাবার চেষ্টা না করেন, তাহলে ছোটো ছেলেমেয়েরা অবলীলাক্রমে এঁকে যাবে কেউ রেলগাড়ি, কেউ জাহাজ, কেউ হ্যাট কোট পরা ছড়ি



নং ২৮২. জনৈক শিশুর আঁকা একটা ছবি। ছবির স্বীকৃত গঠন উপাদানকে পরোয়া না করার সাহস।

হাতে সাহেব, ইলেকট্রিক ল্যাম্পপোস্ট, মোটরগাড়ি, আরও কত কী।'

শুক্রনীতিসার

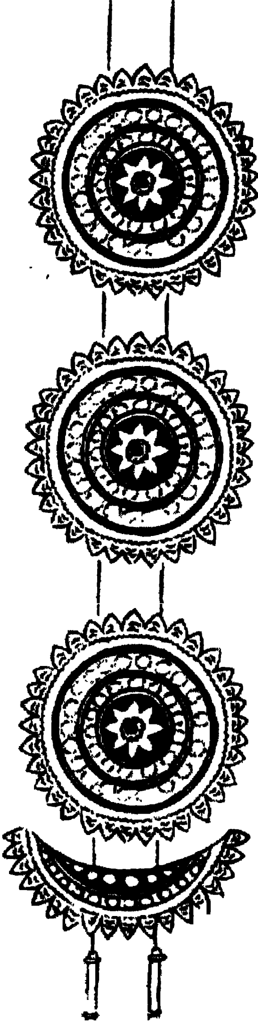
প্রাচীন ভারতের শিল্পশাস্ত্র। শিল্পাচার্য শুক্রাচার্য এর রচয়িতা। এই শাস্ত্রে মূর্তিগঠনের মাপজোকের বর্ণনা আছে। সাধারণভাবে প্রাচীন শিল্পশাস্ত্র অনুযায়ী মূর্তি পাঁচটি শ্রেণিতে বিভক্ত। নর, ক্রূর, আসুর, বালা এবং কুমার। এদের আবার পাঁচটি নির্দিষ্ট তাল আছে। যেমন নরমূর্তি— দশতাল, ক্রূরমূর্তি— দ্বাদশ তাল, আসুর মূর্তি— ষোড়শ তাল, বালামূর্তি— পঞ্চতাল, কুমারমূর্তি— ষট্‌তাল। মূর্তিকারের নিজের মুষ্টির চারভাগের একভাগকে বলে 'অঙ্গুলি'। এইরকম বারো 'অঙ্গুলি'-তে একতাল। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর বইতে শুক্রাচার্যের 'শুক্রনীতিসার' থেকে 'উত্তম নবতাল' নামে আর এক ধরনের মাপজোকের কথা উদ্ধৃত করেছেন। এই মাপ অনুযায়ী মূর্তির শিখা থেকে চুল পর্যন্ত তিন অঙ্গুলি, কপাল চার অঙ্গুলি, নাক চার অঙ্গুলি, নাক থেকে চিবুক চার অঙ্গুলি, গ্রীবা চার অঙ্গুলি। ভ্রূ চার আঙ্গুলি লম্বা এবং অর্ধ অঙ্গুলি চওড়া, চোখ তিন অঙ্গুলি লম্বা এবং দুই অঙ্গুলি চওড়া। চোখের তারা চোখের তিনভাগের একভাগ। কান চার অঙ্গুলি খাড়া এবং তিন অঙ্গুলি চওড়া। করতল সাত অঙ্গুলি। হাতের মাঝের আঙ্গুল ছয় আঙ্গুলি। স্ত্রীমূর্তি পুরুষ মূর্তির চেয়ে এক ভাগ খাটো হওয়াই বিধেয়।

শোলার কাজ

শোলা হল এক ধরনের জলজ উদ্ভিদ। বাংলাদেশের জলাজঙ্গলে, খালবিল এবং অগভীর পুকুরের ধারে নিজে থেকেই শোলা জন্মায়। কাঁচা অবস্থায় শোলার বাইরেটা দেখতে প্রায় সবুজ। বড়ো হলে উদ্ভিদটি বেশ পুষ্ট হয়। নদীয়া জেলার বাতের বিলে এক সময় প্রচুর শোলা উৎপন্ন হত। মাটির গুণে এর বাড় কমবেশি হয়। কখনো-সখনো এর ডাঁটার ব্যাস প্রায় ছয়-সাত ইঞ্চির মতো হয়ে থাকে। কিন্তু সরু মোটা সব শোলা শুকিয়ে নিয়ে ধারালো ছুরিতে ছাল ছাড়িয়ে যে হালকা সাদা অংশটি পাওয়া যায় তা দিয়ে নানারকমের শিল্পদ্রব্য তৈরি হয়। বাংলার ঐতিহ্যবাহী লোকশিল্পের অন্যতম সম্পদ হল এই শোলার শিল্প বা শোলার কাজ।

লোকশিল্পের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হল লোকশিল্প সমাজ। বাংলাদেশের মালাকার সম্প্রদায় হল শোলার শিল্পের প্রধান

কারিগর এবং ধারকবাহক। আদি পর্বে মালাকার সম্প্রদায় সম্ভবত ফুলের মালা গাঁথার কাজ করতেন। পরবর্তীকালে কোনো সময়ে স্থায়ী দ্রব্য দিয়ে মালা গাঁথার জন্য শোলার ফুল ব্যবহার শুরু হয়। ক্রমশ শোলার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের জন্যই সজ্জার উপকরণ হিসাবে এবং লৌকিক আচার অনুষ্ঠানের উপকরণ হিসাবে শোলার কাজ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। পশ্চিমবাংলার বেশিরভাগ জেলাতেই মালাকার শিল্পীরা বসবাস করেন। তার মধ্যে আছে দুই চব্বিশ পরগনা, হাওড়া, হুগলি, নদিয়া, মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বর্ধমান। কলকাতার কুমারটুলি, বাগবাজার অঞ্চলের মালাকার সম্প্রদায়ের শোলার কাজ খুবই উন্নত।



নং ২৮৩. শোলার তৈরি চাঁদমালা। সজ্জার এক পরিচিত উপকরণ।

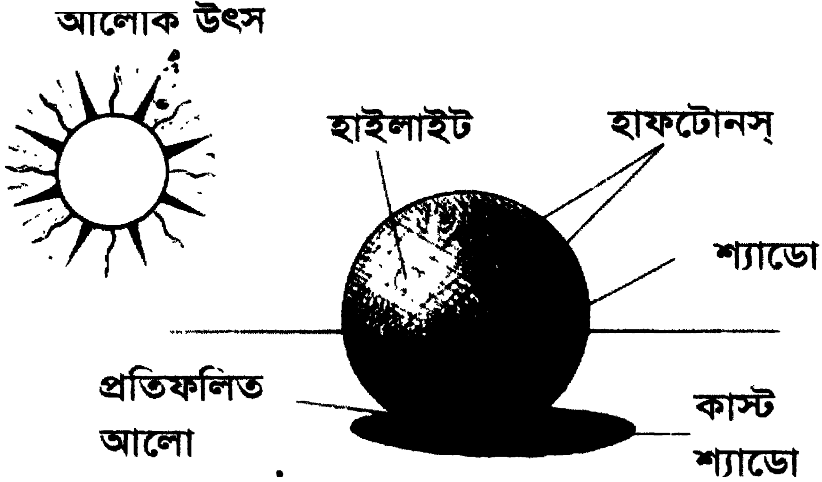
শোলা দিয়ে যেসব শিল্পদ্রব্য তৈরি হয় তার মধ্যে আছে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের জন্য তৈরি মালা, ফুল, চাঁদমালা, কদম, লৌকিক দেবদেবীর পুজোর ঘটের ওপর ঝোলাবার জন্য ঝারা, ফুলঘরা বা ফুলের ঘর। শ্রাবণ সংক্রান্তি উপলক্ষ্যে ব্যবহৃত মন্দিরাকৃতির শোলার পাতের ওপর অঙ্কিত করণ্ডি চিত্র এবং সেইসঙ্গে সুপরিচিত বিয়ের টোপর এবং কনের মাথার মুকুট বা সিঁথিমৌর।

এসব ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয় দ্রব্য ছাড়াও শোলা দিয়ে তৈরি হয় সাধারণ সজ্জাদ্রব্য, পুতুল, খেলনা এবং প্রতিমার অলংকার যা ডাকের সাজ নামে পরিচিত। নদীয়া জেলার মালাকারদের শোলার ডাকের সাজ খুবই প্রসিদ্ধ। বিভিন্ন গ্রামীণ মেলা ও উৎসবের প্রাঙ্গণে স্থাপিত বিপণীতে শোলার নানারকম পুতুল পাওয়া যায়। বর্তমানে অনেক মালাকার মাটির প্রতিমার বদলে মালাকারেরা শোলা দিয়েও প্রতিমা নির্মাণ করছেন। যা বিদেশেও পাড়ি দিচ্ছে।

শোলার কাজে শোলা ছাড়াও লাগে খুব ধারালো ছুরি, লেই বা আঠা, অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল, কাগজ, রং স্প্রে ইত্যাদি। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার মহেশপুর হল শোলার কাজের এক উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র। এখানে বেশি প্রস্তুত হয় চাঁদমালা। লৌকিক আচার অনুষ্ঠান ভিত্তিক অনেক কারুশিল্প হারিয়ে গেলেও শোলার কাজ টিকে আছে এর মাধ্যমগত বৈচিত্র্য এবং মালাকারদের উদ্ভাবনী ক্ষমতার জন্য।

শোলার শিল্প — শোলার কাজ দেখুন।

শ্যাডো (Shadow) — ছায়া। কোনো একটি ক্ষেত্র বা তলের অপেক্ষাকৃত অন্ধকারাচ্ছন্ন অংশ। অর্থাৎ যেখানে আলো কম এসে পড়ছে বা পড়ছে না। বিষয়টি চিত্রকলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। আমরা ছায়াকে দুটো মৌলিক ধরনে ভাগ করতে পারি। এক হল কাস্ট শ্যাডো বা প্রক্ষিপ্ত ছায়া এবং দুই হল শেডিং



বা ছায়া আবরণ। কাস্ট শ্যাডো হল আলোক রশ্মিকে বাধা দিয়ে কোনো বস্তু যে ছায়া ফেলে। কাস্ট শ্যাডোর একটা আকার থাকে এবং তা একটু তীক্ষ্ণ হয়। আর শেডিং হল বস্তুর যে পাশ আলোর দিক থেকে ঘুরে গেছে সেই অংশের অন্ধকারত্ব। টেবিলের ওপর একটা আপেল রেখে কোনাকুনি ওপর থেকে একটা আলো ফেললে এটা বেশ ভালো বোঝা যাবে। দেখা যাবে আলোর উলটো দিকে টেবিলের ওপর আপেলটি একটি কাস্ট শ্যাডো তৈরি করেছে। আলোর দিকটায় আপেলের রং উজ্জ্বল লাল। কিন্তু যে দিকটা আলোর থেকে ঘুরে গেছে সেই অংশটা ক্রমশ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়েছে। ছবিতে আলোর উপস্থিতি বোঝাতে ছায়ার ব্যবহার অপরিহার্য। ছায়ার রং কী হবে এ প্রশ্নও গুরুত্বপূর্ণ। এর কোনো নির্দিষ্ট উত্তর হয় না। অনেকগুলি শর্তের ওপর এটা নির্ভর করে। কিন্তু সাধারণভাবে বললে যে তলে ছায়া পড়ে বা সৃষ্টি হয় সেই তলের রঙের একটু অনুজ্জ্বল রূপ। ইম্প্রেশনিস্টরা ছায়ায় নীল রং ব্যবহার করেছেন। ছায়ার

আকারও হয় তলের চরিত্র অনুযায়ী। কাস্ট শ্যাডোর তীক্ষ্ণতা নির্ভর করে আলোর মাত্রার ওপর। আলোর উৎসের সংখ্যার ওপরে ছায়ার সংখ্যাও নির্ভর করে। এক্ষেত্রে উৎসগুলির নৈকট্যজনিত শর্ত অর্থাৎ অবস্থানের ওপর ছায়ার গভীরতার তারতম্য ঘটে।



ষ

ষড়ঙ্গ

শিল্পের ছয়টি অঙ্গ। এই ছয়টি অঙ্গের সমাহারে শিল্প তার প্রকৃত রূপ লাভ করে। লিখিতভাবে ষড়ঙ্গের কথা প্রথম পাওয়া যায় বাৎস্যায়নের টীকাকার যশোধর পণ্ডিতের ভাষ্যে। বাৎস্যায়নের কামসূত্রের প্রথম অধিকরণ তৃতীয় অধ্যায়ের টীকায় যশোধর পণ্ডিত শিল্পের এই ছয়টি অঙ্গের কথা লিখেছেন।

'রূপভেদাঃ প্রমাণানি ভাবলাবণ্যযোজনম।
সাদৃশ্যং বর্ণিকাভঙ্গ ইতি চিত্রং ষড়ঙ্গকম্।।'

যশোধর পণ্ডিতের টীকা থেকে জানা যায় যে বাৎস্যায়ন দেশের প্রাচীন এবং বড়ো বড়ো শাস্ত্র পড়ে, কীভাবে ওই সব শাস্ত্র লোকে প্রয়োগ করে সেসব পর্যবেক্ষণ করেই কামসূত্র রচনা করেছিলেন। যশোধর পণ্ডিত কামসূত্রের টীকা রচনা করেছিলেন একাদশ থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে। বাৎস্যায়নের কামসূত্র রচনাকালের সঠিক সময় জানা না গেলেও তাঁর রচনাতে উল্লেখিত নানা ঘটনা থেকে বোঝা যায় যে, বাৎস্যায়ন খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় বা চতুর্থ শতাব্দীর মানুষ ছিলেন। তাই বলা যেতে পারে কামসূত্র বহু প্রাচীন শাস্ত্র। বাৎস্যায়নের রচনা অনুযায়ী কামসূত্র বাৎস্যায়নের বহু আগেও প্রচলিত ছিল। ফলে ধরে নেওয়া যায় এতে উল্লেখিত চিত্রবিদ্যার শাস্ত্রও অতি প্রাচীনকাল থেকেই ভারতের শিল্পীরা জানতেন। তার ওপর শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরও বলেছেন ভারতের প্রতিবেশী দেশ চিনেও প্রাচীনকালে ভারতের মতো চৈনিক শিল্প ষড়ঙ্গ প্রচলিত ছিল। উভয়

দেশের ষড়ঙ্গের মধ্যে বেশ মিলও লক্ষ করা যায়। ভারতের ষড়ঙ্গ হল—রূপভেদ, প্রমাণ, ভাব, লাবণ্যযোজনা, সাদৃশ্য ও বর্ণিকাভঙ্গ, তেমনি চিন দেশের যে ষড়ঙ্গের উল্লেখ পাওয়া যায় তা হল—

১. Spiritual tone and lifemovement (চি-ইউন শেং-তুং), ২. Manner of brrush-work in drawing lines (কু-ফা উং-পি), ৩. Form in its relation to objects (ইং-ওউ হাসিয়াং ৎসাই), ৪. Choice of colour appropriate to the objects (সুই-লেই ফু-ৎসাই), ৫. Composition and grouping (চিং-ইং ওয়েই-চিহ্), ৬. The copying of classic masterpieces (চুয়ান-মোই-হ্সিচ) অথবা মহাশিল্পী ওকাকুরার ভাষান্তর অনুযায়ী—১. Rhythmic vitality, ২. Anatomical structure, ৩. Conformity with nature, ৪. Suitability of colouring, ৫. Artistic composition, ৬. Finish.

প্রাচীন শাস্ত্রকারদের প্রস্তাবিত শিল্পের ষড়ঙ্গতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন—'চিত্রকলা নিশ্চয়ই আমাদের দেশে শখের খেলা ছিল না ; আমাদের জ্ঞানের ও কর্মের সঙ্গে তাহার নিগূঢ় সম্বন্ধ ছিল। চিত্রকলাকে আমাদের পূর্বপুরুষগণ যে-চক্ষে দেখিতেন, এক চিন ও জাপান ছাড়া আর কোনো জাতি যে সে-চক্ষে দেখিয়াছে এমন মনে হয় না।' (ভারত শিল্পে ষড়ঙ্গ, পৃ. ১২)।

চৈনিক শিল্পষড়ঙ্গের সঙ্গে ভাবগত মিল থাকলেও ভারত শিল্পের ষড়ঙ্গ একটি সম্পূর্ণ শিল্পতত্ত্ব। তা এই বাণীর মধ্যে স্পষ্ট। 'ইতি চিত্রং ষড়ঙ্গকম্, অর্থাৎ স্পষ্টই বলা হয়েছে চিত্রের এই ছয়টি অঙ্গের বাইরে আর কিছু নয়।

ষড়ঙ্গের ছয়টি অঙ্গ বা বিষয়কে বোঝাতে অবনীন্দ্রনাথ ইংরেজি অনুবাদের সাহায্য নিতে বলেছেন, যেমন, রূপভেদাঃ— অর্থাৎ knowledge of appearances. চিত্রে রূপের পরিষ্কার অর্থ চেহারা। কোনো বিষয়ের পার্থিব রূপ, মানসরূপ, একই বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন রূপ, নির্দেশক রূপ অর্থাৎ খারাপ রূপ, ভালো রূপ, জীবিত বা নিষ্প্রাণ রূপ ইত্যাদি। আবার ভাবের পরিপ্রেক্ষিতে যেকোনো বস্তুর রূপও বদলে যায়। যেমন, ঝড়ের সামনে একটি মানুষের রূপ ফুলের বাগানে সেই মানুষটির রূপের থেকে ভিন্ন হতে

বাধ্য। তাই ভারতশিল্পে রূপভেদ সব সময় চাক্ষুষ অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে না। সেখানে বস্তুর ভাবগত ব্যঞ্জনা এবং অন্তর্গত পরিচয়ের দিকটিও গুরুত্বপূর্ণ। চিত্রে রূপ অনেকসময়ই আপেক্ষিক। একজন মা, একজন বধূ এবং একজন দাসী এই তিনজনকে যদি যথাক্রমে স্তন্যদানরত, কেশপরিচর্যারত এবং জল আনয়নরত অবস্থায় চিত্রিত করা যায় তাহলেই কি পরিচয়ের বৃত্তটি সম্পূর্ণ হয়? কেন-না একজন মাও তো চুল বাঁধেন, একজন দাসীও তো সন্তানকে স্তন্যদান করেন কিংবা একজন বধূও তো জল আনেন। এক্ষেত্রে রূপভেদ আপেক্ষিক। তাই রূপ সামগ্রিকভাবে বস্তুর চাক্ষুষ গঠন, ভাবগত বৈশিষ্ট্য, উপলব্ধিজাত চেহারার সম্মিলিত বিষয়। প্রমাণানি— অর্থাৎ Correct perception, measure and structure of forms. প্রমাণকে এককথায় বস্তুর ভূগোল বললে বোধহয় ঠিক বলা হয়। বস্তুর নির্দিষ্ট রূপটির আকার, আয়তন, অবস্থান ইত্যাদি। যাকে বলা হয় প্রমা। যা কোনো ভ্রম সৃষ্টি করবে না। প্রমাণ হল যুক্তিনির্ভর বিষয়। একদিকে বস্তুর নিজস্ব আকার, আয়তন ও অবস্থানগত পরিমাপ এবং অন্যদিকে পার্শ্ববর্তী বস্তু সমূহের সম্পর্ক। একটি ছবিতে দূরত্ববোধক স্থানের ব্যবহার ছাড়া যদি একটি মানুষ ও পরিণত হাতিকে সমান আকারে আঁকা হয় তাহলে নিশ্চিত ভাবে ভ্রম জন্মাবে। আবার মানুষ রান্না করছে। কিন্তু উনান এবং মানুষটির মধ্যে দূরত্ববোধক পরিসর এতটাই বেশি যে মানুষটির কড়াইয়ের নাগাল পাওয়াই অসম্ভব। এখানেও বিভ্রম ঘটার সম্ভাবনা থাকবে। তবে প্রমাণ শুধু এই জাতীয় গজ মিটারের মাপেরই বিষয় নয়। প্রমাণানির সঙ্গে পরিমিতির সম্পর্ক খুবই গভীর। একটি চিত্রে কোনো একটি বস্তুকে কত বড়ো বা ছোটো করলে তা দৃষ্টিনন্দন হয়ে উঠবে তাও বিচার্য। অবনীন্দ্রনাথের আঁকা 'শাহজাহানের শেষ দিনগুলি' ছবিটি দেখলে বোঝা যাবে ছবিতে উপস্থাপিত শাহজাহান, তাঁর কন্যা, তাঁর শয়নগৃহ, দূরে যমুনার তীরে তাজমহল প্রভৃতি বিভিন্ন আকারের হওয়া সত্ত্বেও যথাযথভাবে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। ভাব— অর্থাৎ The action of feeling on forms. কোনো অনুভূতি, উপলব্ধি যখন কোনো রূপের মধ্যে ক্রিয়াশীল তখনই ভাবের প্রকাশ ঘটে। ভাবের অস্তিত্ব কার্যত বিমূর্ত। কিন্তু যখন কোনো বস্তুর ভঙ্গি বা অবস্থা ভাবকে প্রকাশ

করে তখন ভাব মূর্ত হয়। অর্থাৎ কোনো বস্তুর বা প্রাণীর বিশেষ কোনো ভঙ্গি বা অবস্থাই হল ভাবের রূপ। ধরা যাক কাউকে দেখে একজন মানুষের মনে আনন্দ হল। তখন দর্শক মানুষটির চোখের ভাষা, শরীরভঙ্গিই হল আনন্দময় ভাবের প্রকাশ। ভাব প্রকাশের জন্য মানুষ বা অন্যান্য প্রাণীরও নানাবিধ ভঙ্গিকে বা অঙ্গ ক্রিয়াকে বেছে নেয়। একইভাবে প্রকৃতিজগতের নানা অবস্থার রূপবৈশিষ্ট্যকে ভাবব্যঞ্জক বলে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। যেমন শূন্যে হাত ছুঁড়ে জয়ের আনন্দ প্রকাশ করা দুঃখ বেদনায় প্রকাশের জন্য কপাল চাপড়ানো। ক্ষীণ বায়ুপ্রবাহের মধ্যে আকাশে মেঘ জমে থাকলে অনেক সময়ই বলা হয় 'আকাশের মুখ ভার'। চঞ্চল বাতাসের মধ্যে আলো ঝলমলে দিনকে দেখে ঠিক এমনিভাবেই বলা হয় 'খুশিভরা উজ্জ্বল দিন নেচে উঠছে।' ভারতের শিল্প শাস্ত্রকারগণ ভাব প্রকাশের জন্য একটা এমন পন্থা আবিষ্কার করেছিলেন যা আর কোনো দেশে পাওয়া যায়নি। এটা হল আঙুলের ভাষা বা মুদ্রা। (* মুদ্রা দেখুন) চোখে ভাবকে দেখা যায়। ভাবকে দেখানোর অন্যতম উপায় হল ভঙ্গি। শাস্ত্রসম্মত ভঙ্গি হল সমভঙ্গ, ত্রিভঙ্গ, অতিভঙ্গ ইত্যাদি। সাথে আছে শাস্ত্রবহির্ভূত অসংখ্য ভঙ্গি। কিন্তু ভাবকে চোখে দেখলেও ভাবের ব্যঞ্জনা আমরা অনুভব করি মন দিয়ে। তাই ভঙ্গির সঙ্গে যদি ইঙ্গিত এবং ব্যঙ্গ না থাকে অর্থাৎ ব্যঙ্গ এবং ইঙ্গিতের অভাব থাকে তাহলে ছবি অসম্পূর্ণ থেকে যায়। ভারতীয় শিল্পশাস্ত্র বলেছে, 'ব্যঙ্গ অভাবে শব্দচিত্র বাচ্যচিত্র, এমনকি, লিখিত চিত্র অনুত্তম হইয়া পড়ে। ... চিত্রমাত্রই উত্তম হয় ব্যঙ্গ থাকিলে।' (অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ; ভারত শিল্পে ষড়ঙ্গ)

ভাবের আর একটা উদাহরণ দেখে নেওয়া যেতে পারে পরিতোষ সেন রচিত 'ভ্যান গঘের চেয়ার' নামক রচনা থেকে। '... একটি চেয়ার, একটি মামুলি চেয়ার বই-কি। তাকে আমরা কোনো বিশেষ দৃষ্টিতে দেখি না। কিন্তু যখন মনে করি যে, তার স্বাভাবিক ধর্ম হচ্ছে মানুষকে আসন দেওয়া... তখন তা এক নতুন তাৎপর্য নিয়ে আমাদের দেখা দেয়। ... তাই শূন্য চেয়ার এক চরম নিঃসঙ্গতার প্রতীক হয়ে, ভ্যান গঘের চোখে ধরা দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বর্তমান মানসিক অবস্থার সমার্থক হয়ে দেখা দিল। ... ভ্যান গঘের কাছে এটি এখন আর শুধুমাত্র একটি বসবার স্থান নয়।

এটি যেন একটি বিশেষ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোক।... চেয়ারটি তাঁর সমস্ত চেতনাকে এমন ভাবে ঘিরে ফেলেছে যে, এটিকে না আঁকা পর্যন্ত তাঁর আর নিস্তার নেই। ... ভ্যান গঘ স্থির করলেন যে চেয়ারটিতে তিনি এমন একটি ভাব প্রকট করবেন যাতেকরে মনে হবে যে, চেয়ারটি দর্শকের দিকে এগিয়ে আসছে।' (পরিতোষ সেন, আলেখ্যমঞ্জরী)

লাবণ্যযোজনা— অর্থাৎ Infusion of grace, artistic representation. শিল্পাচার্য বলেছেন যে, ছবিতে শুধুমাত্র সৌন্দর্য সৃষ্টি করলেই তা পূর্ণাঙ্গ হয়ে ওঠে না। তাতে লাবণ্য যোগ করেই তাকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দিতে হবে। ছবিতে ভাবভঙ্গির যে উদ্দামতা প্রকাশ পায় তাকে শীতল, শোভন, নয়ন-স্নিগ্ধকর এবং মনোহর করে তুলতে পারে লাবণ্যযোজনা। চিত্রে লাবণ্যের ব্যবহার অনেকটা নুনের মতো। ব্যঞ্জন যেমন নুন কম হলে স্বাদহীন, বেশি হলে অখাদ্য।

সাদৃশ্যম্— অর্থাৎ Similitudes. চিত্রে সাদৃশ্য সৃষ্টি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। প্রত্যক্ষ রূপগত সাদৃশ্য সাধারণভাবে প্রতিরূপ বা অনুকরণের পর্যায়ভুক্ত। কিন্তু প্রত্যক্ষ সাদৃশ্যে মননশীলতার অভাব ঘটে। ছবিতে প্রত্যক্ষত সাদৃশ্যরূপ কল্পনাতে ব্যাঘাত ঘটায়, ফলে দর্শনতৃপ্তি হ্রাস পায়। কিন্তু সাদৃশ্য যদি ভাবগত হয় তা ছবিতে বহুমাত্রিক গভীরতা দান করে। রূপের ক্ষেত্রে ভাবগত সাদৃশ্যের নানা প্রয়োগ ও দৃষ্টান্ত আমরা দেখতে পাই। যেমন 'করকমল', 'খঞ্জননয়ন', 'পদপল্লব', 'চন্দ্রবদন', 'বৃষস্কন্ধ' অর্থাৎ পদ্মফুলের মতো কুঞ্চিত হাত, খঞ্জন পাখির মতো চোখ, পায়ের পাতা যেন গাছের পাতার মতো, চাঁদের মতো উজ্জ্বল মুখ, ষাঁড়ের মতো চওড়া কাঁধ ইত্যাদি। আসলে অপ্রত্যক্ষ বা ভাবগত সাদৃশ্যের মধ্য দিয়ে ছবিতে নানা গুণ আরোপ করা হয়। তাছাড়া আরও একটি দিক হল, সাদৃশ্যের কাজ বিষয়বস্তুর অবিকল নকলের সাহায্যে চোখকে ঠকানো নয়। বরং কোনো একটি রূপের সাহায্যে অন্য একটি রূপের ভাব আমাদের মধ্যে জাগিয়ে দেওয়া। শাস্ত্রে বলা হয়েছে 'সদৃশস্য ভাব ইতি সাদৃশ্য'। সেই কারণেই বলা হয় যা ভাবের অনুরণন দেয় তা হল উত্তম সাদৃশ্য আর যা কেবল রূপের অনুরণন দেয় তা হল অধম সাদৃশ্য।

বর্ণিকাভঙ্গ— অর্থাৎ Artistic manner of using the

brush and colours. শিল্পীর দক্ষতা এবং চিত্রের কলাকৌশল হল বর্ণিকাভঙ্গ। বর্ণিকাভঙ্গ ছবির শেষ পর্যায়। 'বর্ণ' থেকে এসেছে 'বর্ণিকা'। ষড়ঙ্গের বাকি পাঁচটি অঙ্গকেই রেখা ও রঙের সাহায্যে উপস্থাপন করতে পারলেই ছবি কথা বলবে। প্রাচীনকালে ভারতীয় চিত্র চর্চায়ও সমাজের মতো নানা বাছবিচার ছিল। যেমন সবর্ণ এবং অসবর্ণ। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে আটটি রসের (পরবর্তীকালে নবরস) উপযোগী সবর্ণের উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন—'শ্যামো শৃঙ্গারঃ, সিতো হাস্যঃ, কপোত করুণশ্চৈবঃ, রক্তো রৌদ্রঃ, গৌরো বীরস্তু বিজ্ঞেয়ঃ, কৃষ্ণশ্চৈব ভয়ানকঃ, নীলবর্ণ বীভৎসঃ, পীতশ্চৈব অদ্ভুতঃ' অর্থাৎ শৃঙ্গারে শ্যামা বা মেটে রং যা কালো আর হলুদের মিশ্রণ, হাসি এবং প্রফুল্লতায় সাদা অর্থে রুপো এবং শ্বেতচন্দনের আভা, করুণ বোঝাতে ধূসর, রৌদ্রের জন্য লাল, বীর বোঝাতে গৌরবর্ণ। তবে এক একটি অভিধানে গৌর বর্ণের এক একটি রূপের কথা বলা হয়েছে। যেমন—পদ্মকেশর, কুমকুম এবং অরুণ। তেমনি কালো রং ভয়ানক, নীল রং বীভৎস এবং হলুদ রং অদ্ভুতকে বর্ণনা করার জন্য। এখন যেমন আমরা জানি লাল নীল হলুদ হল প্রাথমিক রং। এদের মিশ্রণেই সমস্ত রঙের সৃষ্টি। তেমনি শাস্ত্রেও আছে যে, চার স্বভাবজ বর্ণ— শ্বেত, রক্ত, নীল, পীত বর্ণের সংযোগে নানা উপবর্ণের সৃষ্টি। যেমন, শ্বেত আর পীত বর্ণে পাণ্ডু বর্ণ, রক্তবর্ণ এবং শ্বেত বর্ণে পদ্মবর্ণ, নীল এবং সাদা মিলে কপোত বর্ণ, পীত ও নীলে হরিৎ বর্ণ, পীত আর রক্তবর্ণ মিলে গৌরবর্ণ ইত্যাদি। রং তৈরি এবং তার ব্যবহারের দক্ষতা বর্ণিকার অন্যতম প্রধান বিষয়। সেই সঙ্গে আছে নানা ধরনের রেখা সৃষ্টি ও তার ব্যবহার। কোমল রেখা, বলিষ্ঠ রেখা, সরল ও বক্র রেখা, ছন্দবদ্ধ রেখা, সুললিত রেখা, ঢেউ খেলানো রেখা, ভঙ্গুর রেখা, মসৃণ রেখা, এবড়োখেবড়ো রেখা আরও কত রকমের। কথায় বলে করণিকের রেখা এবং চিত্রকরের রেখা। করণিকের রেখা নিষ্প্রাণ কিন্তু চিত্রকরের রেখায় প্রাণ আছে। কারণ করণিকের রেখা শুধুমাত্র বিভাজনের উদ্দেশ্যে টানা। কিন্তু চিত্রকরের রেখা ভাব ও ছন্দ প্রকাশের জন্য সৃষ্ট। তেমনি যে-তুলির সাহায্যে রেখা টানা হবে সেই তুলিতেও কতটা রং নেওয়া হবে কতটা ঝেড়ে ফেলে দেওয়া হবে, কতটা

জোরে চাপ দেওয়া হবে বা আলতো ভাবে বোলানো হবে এসবই বর্ণিকা জ্ঞানের বিষয়। এর যথাযথ ব্যবহারেই ষড়ঙ্গ পূর্ণতা পায়।



সফট গ্রাউন্ড এচিং (Soft ground etching)

একটি ইনটালিয়ো ছাপার পদ্ধতি। এই ইনটালিয়ো ছাপচিত্রে ক্রেয়ন বা পেন্সিলের মতো ফলাফল সৃষ্টি করা যায়। সফট গ্রাউন্ড এচিং-এর মশলা তৈরি হয় হার্ড গ্রাউন্ড এচিং-এর মশলার সঙ্গে অর্ধেক পরিমাণ চর্বি বা গ্রিজ মিশিয়ে। (হার্ড গ্রাউন্ডের মশলা তৈরি হয় দু-ভাগ বিটুমেন এক ভাগ রজনকে গুঁড়ো করে দু-ভাগ গলানো মৌচাকের মোমের সঙ্গে মিশিয়ে) এই মিশ্রণ একটি ধাতব পাতে (দস্তার প্লেট) মাখিয়ে এবং শুকিয়ে নিয়ে তার ওপর একটা কাগজ রাখা হয়। এই কাগজের ওপর একটা সুঁচ দিয়ে নকশা আঁকা হয়। কাগজ সরিয়ে নিলে নকশার জায়গাগুলিতে ধাতবপাত বেরিয়ে পড়ে। কেন-না নকশার গ্রাউন্ড কাগজে লেগে উঠে আসে। সেই সঙ্গে গ্রাউন্ডেব ওপর কাগজের বুনোটের ছাপ পড়ে যায়। এরপর প্লেটের উন্মুক্ত বাকি অংশগুলি স্টপার দিয়ে প্লেটটিকে অ্যাসিডে বাইট করাতে হয়। সফট গ্রাউন্ড এচিং-এর ক্ষেত্রে নাইট্রিক অ্যাসিডের বদলে মৃদু ক্ষয়কারক নেওয়াই ভালো। কেন-না নাইট্রিক অ্যাসিডে বাইট করাতে মাত্র ৩০ সেকেন্ড মতো লাগে। সেখানে মৃদু ডাচ মরডান্ট দিয়ে ভালোমতো গভীর বাইট করাতে বেশ কয়েক ঘণ্টা লাগে। তাছাড়া নাইট্রিক অ্যাসিড একমাত্র তামার পাতের ওপরই ব্যবহার করা হয়। ডাচ মরডান্ট তৈরির অনুপাত হল হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ২০ ভাগ, পটাশিয়াম ক্লোরেট ৩ ভাগ এবং জল ৭৭ ভাগ। সফটগ্রাউন্ড-এর ওপর কাগজ ছাড়াও বিভিন্ন বুননতল সম্পন্ন জিনিস ব্যবহার করা হয় নানারকম বুনটের এফেক্ট আনতে। যেমন জালি, সিরিশকাগজ বা অন্যকোনো নকশাদার বস্তু।

সফট স্কাল্পচার (Soft Sculpture)

সফট স্কাল্পচার বা ভিন্ননামে সফট আর্ট তৈরি হয় নরম দ্রব্যাদি যেমন— ক্যানভাস, দড়ি, ভিনাইল, ল্যাটেক্স ইত্যাদি দিয়ে। এসব দ্রব্য দিয়ে তৈরি বস্তু এর ভার অনুযায়ী আকার পায়। সাধারণভাবে এই স্কাল্পচার নিরালম্ব নয়। একে কোনো সাপোর্টে ঝুলিয়ে রাখতে হয়। সফট স্কাল্পচার প্রথম দেখা যায় পপ শিল্পীদের শিল্পকলায় ১৯৬০-এ। বিশেষ করে শিকাগো অধিবাসী সুইডিশ শিল্পী ক্লেস ওলডেনবার্গ-এর তৈরি নরম পদার্থ দিয়ে বানানো একরকম শিল্পকর্মকে বোঝানো হয়। ১৯৬২ সালে ওলডেনবার্গ গ্রিন গ্যালারিতে ভোগ্যপণ্যকে শিল্পরূপ দেওয়ার প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত স্তরে এসে এই ধরনের ভাস্কর্য তৈরি করেছিলেন। সফট স্কাল্পচার নিয়ে আরও যাঁরা কাজ করেছিলেন তাঁরা হলেন আমেরিকান ভাস্কর জন অ্যানগাস চেম্বারলেন এবং ন্যুভো রিয়ালিজ্‌ম ও আর্টি পোভেরার সঙ্গে যুক্ত শিল্পীরা।



নং ২৮৪ ওলডেনবার্গ · হ্যামবার্গার, পপসিক্‌ল। প্রাইস। ১৯৬২।

সফট স্টাইল (Soft Style)

চিত্রকলা ও ভাস্কর্যে ইন্টারন্যাশনাল গথিকের জার্মান রূপায়ণ। এর বৈশিষ্ট্যের বিশেষ দিক ছিল কাপড়ের কোমল ভাঁজ। শেষের দিকের গথিকের উত্তর পর্বগুলিতে ব্যবহৃত কাপড়ের ভাঁজগুলি আবার অতিরিক্ত তেরচা। ১৩৮০ থেকে ১৪৩০-এর মধ্যে এই শৈলীর উদ্ভব ঘটে।

সরা

মাটির হাঁড়ির ঢাকনাকে সরা বলা হয়। কোথাও কোথাও হাঁড়িকে বলে পাতিল এবং সরাকে বলে বঁডউয়া। এই সরা চিত্রিত হয় না। তবে হিন্দুধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান যেমন বিবাহ বা পুজোপার্বণ উপলক্ষ্যে এই ধরনের সরা চিত্রিত হয়। হাওয়ায় প্রদীপ নিভে যাওয়াকে রোধ করতে এক ধরনের সরা ব্যবহার করা হয় এবং সেই সরাও অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে চিত্রিত হয়। কিন্তু সরা বলতে সাধারণভাবে বোঝায় লক্ষ্মী সরা। এই সরাতে আঁকা ছবি রীতিগত ভাবে সরাচিত্র বা লোকশিল্পের অন্তর্গত। পূর্ববঙ্গের যশোর জেলার এক শ্রেণির কুম্ভকার এই সরা চিত্রণে পারদর্শী। এঁদের মধ্যে মহিলারাও আছেন। লক্ষ্মী পুজোয় ব্যাপকভাবে এই সরা ব্যবহৃত হয়। যশোর ছাড়াও ঢাকা, ফরিদপুর, বরিশাল জেলায় এই সরা ব্যাপক প্রচলিত ছিল। বরিশালের খলিশাকোটা অঞ্চলের সরাচিত্রীরা খুবই নিপুণ চিত্রকর ছিলেন। দেশভাগের পর পশ্চিমবঙ্গের কোনো কোনো অঞ্চলে এঁরা বসতি স্থাপন করেন। এঁরা আজও এই সরা



নং ২৮৫. মাটির সরা। ঢাকা। ব্যাস ১৪ ইঞ্চি।

আঁকেন। বহুবর্ণে রঙিন গোলাকার এই সরাতে দেবদেবীর নানা ছবি আঁকা হয়। তার মধ্যে দুর্গা-কার্তিক-গণেশ-লক্ষ্মী-সরস্বতী এবং নীচের দিকে একটি লক্ষ্মীর মূর্তি থাকে। এই লক্ষ্মী মূর্তি একচোখা অর্থাৎ প্রোফাইল এবং সম্মুখবর্তীও হয়। এছাড়াও সরাতে কৃষ্ণ, নিমাই ইত্যাদিও থাকে। সাধারণভাবে মাটির প্রতিমায় ব্যবহার করা হয় এমন রং-ই এতে ব্যবহার করা হয়। এইসব সরা পুজোর শেষে ঘরে রেখে দেন কেউ কেউ।

সলভেন্ট (Solvent)

সাধারণভাবে সলভেন্ট বা দ্রাবক হল এমন একটি তরল যাতে নানারকম পদার্থ দ্রবীভূত হয়। যেমন জল। জলে বেশিরভাগ ক্ষার, অ্যাসিড সহ জৈব ও অজৈব বহু ধরনের পদার্থ দ্রবীভূত হয়। কিছু পদার্থ আছে যা জলে দ্রবীভূত হয় না কিন্তু অন্য কোনো তরলে দ্রবীভূত হয়। এরকম কিছু সলভেন্ট শিল্পীদের কাজের ক্ষেত্রে খুবই প্রয়োজনীয়। সলভেন্ট বেশিরভাগ সময়ই দ্রবণ তৈরি করতে ব্যবহার করা হয়। যেমন হয় রঙের ক্ষেত্রে। সলভেন্ট তাড়াতাড়ি বাষ্পীভূত হয়ে রংকে শুকোতে সাহায্য করে। সাধারণত সলভেন্টগুলি জৈব পদার্থ দিয়ে তৈরি এবং এর উদ্বায়ীভবনের মাত্রার তারতম্য আছে। কিছু সলভেন্টের বিবরণ—

অ্যাসিটোন (Acetone) : আসলে ডাই মিথাইল কিটোন। একটি প্রচণ্ড শক্তিশালী সলভেন্ট। এই দ্রাবক প্রাকৃতিক রেজিন, সেলুলোজ নাইট্রেট, ভিনাইল রেজিন সহ আরও বেশ কিছু পদার্থকে গলিয়ে দিতে পারে। শক্ত তেলের চিট নরম করতে সক্ষম বলে অ্যাসিটোন দিয়ে পলিয়েস্টার রেজিন নিয়ে কাজের যন্ত্রপাতি পরিষ্কার করা যায়। এর অদ্ভুত ধর্ম হল এটা জেল, তেল সহ বেশিরভাগ দ্রাবকের সঙ্গেই মেশে। অ্যাসিটোন বিষাক্ত এবং দাহ্য তাই যথেষ্ট খোলা জায়গায় সতর্কতার সঙ্গে ব্যহার করা উচিত।

অ্যাসিটোন, মিথাইল অ্যাসিটেট এবং মিথানল-এর মিশ্রণে তৈরি হয় মিথাইল অ্যাসিটোন। এটা ল্যাকার, সেলুলোজ প্লাস্টিকস এবং রং পরিষ্কার করার কাজে ব্যবহৃত হয়।

অ্যালকোহল (Alcohol) : সাধারণভাবে ইথাইল অ্যালকোহল। তবে আরও কিছু জৈব যৌগও অ্যালকোহলের মধ্যে পড়ে। যেমন—ইথাইল বা ইথানল বার্নিশ তৈরিতে,

গিল্টি করতে এবং এক ধরনের শেল্যাক থিনার তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়। মিথাইল অ্যালকোহল বা মিথানল-এর ব্যবহার ইথাইল অ্যালকোহলের মতোই। কিন্তু এটা বিষাক্ত। এর বিউটাইল অ্যালকোহল বা বুটানল রং ও বার্নিশের দ্রাবক হিসাবে ব্যবহার করা হয়। বুটানল ব্রাশের ব্যবহারগত গুণমান বৃদ্ধি করে। বুটানল দিয়ে প্লাস্টিকও তৈরি হয়।

বেনজিন (Benzene) : একে বেনজলও বলে। পেট্রোলিয়ামকে আংশিক পাতন করে বেনজিন পাওয়া যায়। রং ও বার্নিশ পরিষ্কার করতে ব্যবহার করা হয় এবং রাবার, সিমেন্টের দ্রাবক হিসেবেও কাজে লাগে। গ্যাসোলিনের চেয়েও বেশি দাহ্য এই পদার্থ খুব বিপজ্জনক কেন-না দীর্ঘদিন ফুসফুসে গেলে রক্তের ক্যানসার হবার আশঙ্কা থাকে।

গ্লিসারিন (Glycerin) : আর-একটি নাম গ্লিসারল। এটি অ্যালকোহল পরিবারভুক্ত। জলে, অ্যালকোহলে এবং আরও কয়েকটি জৈব দ্রাবকে মেশে। জলীয় মাধ্যম যেমন ডিম, জিলোটন, গাম ইত্যাদির নমনীয়তা বাড়াতে মেশানো হয়। গ্লিসারিন দেরিতে শুকোয় বলে স্ট্যাম্পপ্যাডের কালিতে ব্যবহার করা হয়।

টারপেনটাইন (Turpentine) : পাইন গাছের নির্যাস থেকে প্রস্তুত তীব্র ঝাঁঝালো গন্ধযুক্ত দ্রাবক। 'পিয়োর গাম টারপেনটাইন' বা 'স্পিরিট অব টারপেনটাইন' নামে বাজারে পাওয়া যায়। রং পাতলা করা এবং পরিষ্কার করার ক্ষেত্রে নিরাপদ। ড্যামার বার্নিশ গোলা এবং পাতলা করার ক্ষেত্রে টারপেনটাইনের কোনো বিকল্প নেই।

মিনারেল স্পিরিট (Mineral spirit) : পেট্রোলিয়াম শোধন করে তিনটে নির্যাস পাওয়া যায়। সাদা স্পিরিট, পেট্রোলিয়াম থিনার ও মিনারেল থিনার। এর গুণাগুণ টারপেনটাইনের মতো। কিন্তু ড্যামার তৈরি করা যায় না। যাঁদের টারপেনটাইনে অ্যালার্জি আছে তাঁরা মিনারেল স্পিরিট ব্যবহার করতে পারেন।

সাইক্ল্যাডিক আর্ট (Cycladic Art)

২৫০০-১৬০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের সাইক্ল্যাডিক দ্বীপপুঞ্জের ব্রোঞ্জযুগের শিল্পকলা। মূল গ্রিক ভূখণ্ডের দক্ষিণ দিক বরাবর বিস্তীর্ণ অংশে অবস্থিত দ্বীপপুঞ্জ সাইক্ল্যাড নামে পরিচিত। এই শিল্পকলার ওপর মাইনোয়ান এবং হেলাডিক উভয় শিল্পের স্বাভাবিক প্রভাব ছিল।

ব্রোঞ্জযুগে গ্রামের বাড়িঘর হত পাথর বা কাঁচা ইটের তৈরি এবং সেগুলো হত সরল ও আয়তাকার। প্রতিটি ঘরেই কমন দেয়াল ব্যবহার করা হত। এই অঞ্চলের আধুনিক গ্রামগুলিও এই রীতিকে ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে। ব্রোঞ্জযুগে এই অঞ্চলের সামাজিক সংগঠনগুলিও সামগ্রিকভাবে এইরকম সাদাসিধে ছিল। যদিও বিভিন্ন প্রদেশগুলির নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কিছু সংস্কৃতি ছিল। আর এর ওপর ভিত্তি করেই নানা মাত্রার শৈল্পিক উৎকর্ষ সৃষ্টি হয়েছিল। এখানকার মেলোস ও আইলিতে ছিল অবসিডিয়ান পাথরের একমাত্র উৎস। অবসিডিয়ান পাথর হল একরকম আগ্নেয় কাঁচ। এই কাঁচ দিয়ে যন্ত্রপাতি এবং অস্ত্রের ফলা তৈরি হত। সুবিদিত সাইক্ল্যাডিক শিল্পবস্তুর মধ্যে আছে শৈলীবদ্ধ নারীমূর্তি যা স্থানীয় সাদা মার্বেল পাথর খোদাই করে তৈরি। সেইসঙ্গে পাওয়া গেছে আদর্শ মাটির তৈরি নলিমুখ জাগ, মার্বেলের তৈরি সাধারণ হাঁড়ি, মাটির ফ্রাইপ্যান যা আয়না হিসেবে ব্যবহার করা হত।

সাইজ (Size)

আঠালো পদার্থ যথা— সিরিশ, জিলেটিন বা সিনথেটিক গ্লু-এর পাতলা দ্রবণ। কাগজ বা কাপড়কে শক্ত করতে মাখানো হয়। সাইজ বা আঠার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল এটা একটা তল থেকে আর একটা তলকে আলাদা করে রাখতে পারে। ক্যানভাসে সাইজ মাখানো হয় ক্যানভাসের শোষণ ক্ষমতা কমাবার জন্য। এছাড়াও তেলরঙের ক্ষেত্রে সাইজ ব্যবহারের আরও কিছু ভূমিকা আছে। তেলরঙের একটা অম্লত্ব ধর্ম আছে। যা কানভাসের আঁশের সংস্পর্শে এলে একটা সময় কাপড়ের ক্ষতি করে দেয়। সাইজ কাপড়েয় আঁশের মধ্যে ঢুকে একটা বাধার সৃষ্টি করে যাতে তেলরং কিছুতেই কাপড়ের সংস্পর্শে আসতে পারে না। আঠার এই দ্রবণ লাগাতেও হয় পাতলা করে। মনে রাখতে হবে এক্ষেত্রে আঠার ভূমিকা হল পাতলা বাধার সৃষ্টি করা, মোটা পর্দা তৈরি নয়। এছাড়াও সাইজ-এর পাতলা দ্রবণ প্লাস্টারের ওপর লাগানো হয় চকচকে এফেক্ট তৈরি করার জন্য। কিছু ক্ষেত্রে রঙের বাইন্ডার হিসাবে সাইজ ব্যবহার করা হয়।

সাইবারনেটিক আর্ট (Cybernetic Art)

সাইবারনেটিক আর্টকে কাইনেটিক আর্টের আর এক ধাপ উন্নত রূপের শিল্প বলা যায়। আসলে যান্ত্রিক ভাস্কর্য বা

অন্যান্য যেসব শিল্প বাইরের জগতের উত্তেজনায় সাড়া দিতে পারে, দর্শকদের অবস্থানকে বুঝতে পারে বা তাঁদের শব্দ ধরতে পারে এরকম শিল্প। যেমন মনুষ্যকৃতির রোবট বা যন্ত্রমানব।

সাউন্ড আর্ট (Sound art)

সাউন্ড আর্ট বা সাউন্ড ইনস্টলেশন হল বিংশ শতাব্দীর এক শিল্পরীতি। আসলে গোটা বিংশ শতাব্দী জুড়েই শিল্পকলার অগ্রগতিতে প্রথাগত শিল্পের গণ্ডিকে ভেঙে ফেলে শৈল্পিক অভিব্যক্তির এক নতুন ভাষা নির্মাণের প্রবণতা লক্ষ করা যায়। সাউন্ড আর্ট বা সাউন্ড ইনস্টলেশন এরকমই এক প্রবণতা। সাউন্ড ইনস্টলেশন এবং সাউন্ড স্কাল্পচার হল সংগীত এবং ললিত কলার মধ্যবর্তী পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত এক নতুন শিল্পজাতি বা জঁর। সাউন্ড আর্ট বা অডিয়ো আর্ট ১৯৭০ সালের শেষের দিকের অগ্রগতি। ১৯৯০ সালের মধ্যে এটা একটা সুপরিচিত বিষয় হয়ে ওঠে যখন সারা পৃথিবীর শিল্পীরা শব্দ নিয়ে কাজকর্মে যুক্ত হয়ে পড়েছিলেন। ১৯৭৭ সালে আর. মুরে স্ক্যাফার 'টিউনিং অব দ্য



নং ২৮৬. ক্রিস্টিয়ান মার্কলে: গিটার ড্র্যাগ। ২০০০ খ্রিস্টাব্দ।

ওয়ার্ল্ড'-এ প্রশ্ন তুলেছিলেন 'মানুষের সঙ্গে তার পরিবেশের শব্দের সম্পর্ক কী? এবং সেই শব্দগুলির পরিবর্তন হলে কী ঘটে?' শব্দগুলি প্রাকৃতিক হতে পারে, মানুষের দ্বারা সৃষ্ট হতে পারে, সংগীত থেকে হতে পারে, প্রযুক্তি বা অ্যাকোয়াস্টিক থেকেও আসতে পারে এবং এইসব কাজ অ্যাসেমব্লেজ, ইনস্টলেশন, ভিডিয়ো, পারফর্ম্যান্স, কাইনেটিক আর্ট সহ চিত্রকলা ও ভাস্কর্যের রূপও লাভ করতে পারে। সাউন্ড আর্টের মূল খুঁজে পাওয়া যেতে পারে বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের নানা শিল্পকর্মে। শিল্পের সঙ্গে সংগীতের সম্পর্ক বিমূর্ততার অগ্রগতির পেছনের অন্যতম চালিকাশক্তি। দাদাবাদী, ফিউচারিস্টরা 'আর্ট' অব নয়েজ' নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা করেছিলেন। বিশেষ করে বলা যায় ইতালির ফিউচারিস্ট শিল্পী রাসোলোর ১৯১৩ সালে প্রকাশিত ইস্তেহার 'Manifesto on the Art of sound'-এর কথা। রাসোলো ভেরীবাদ্যের সঙ্গে যুক্ত এক যান্ত্রিক শব্দবস্তু নির্মাণ করেছিলেন যা সাউন্ড আর্টের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৫৫-তে এর আরও অগ্রগতি ঘটান আমেরিকান সুরকার জন কেজ। কেজ রবার্ট রাসখেনবার্গের ১৯৫৫ সালের শিল্পকর্ম 'হোয়াইট পেন্টিংস'কে 'আলো, ছায়া এবং অব্যয়ী শব্দাবলির বিমানবন্দর' হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন এবং একে তিনি বলেছিলেন তাঁর 'সাইলেন্ট পিস ৪.৩৩'-এর প্রধান অনুপ্রেরণা। 'সংগীত'-কে ধ্বনি এবং চিৎকারের সমবায় হিসাবে নতুন ধরনের ব্যাখ্যা দিয়ে কেজ ১৯৫০ এবং ১৯৬০-এর একজন প্রভাবশালী দৃশ্যশিল্প ব্যক্তিত্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে বিশেষ করে যাঁরা 'বিট', 'নিওদাদা', 'ফ্লাক্সাস', এবং 'পারফর্ম্যান্স' প্রভৃতি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এগুলোই পর্যায়ক্রমে ১৯৭০-এ লয়ার অ্যান্ডারসন, রবার্ট উইলসনের মতো সাউন্ড এবং পারফর্ম্যান্স শিল্পীদের প্রভাবিত করেছিল।

সাউন্ড আর্টের বিশেষত্ব হল এতে শব্দের বিভিন্ন উৎস গুলিকে অস্বাভাবিক স্থানে সংস্থাপনের মাধ্যমে নতুন ধরনের শ্রবণ পরিপ্রেক্ষিতকে খুলে দেওয়া। দর্শকের সামনে গতিশীলতার মধ্যে শব্দের উৎসকে স্থাপন করলে অথবা শব্দের মিথস্ক্রিয়ায়, এর চলনে শব্দগুলি সক্রিয় হয়ে ওঠে বা শব্দের পরিবর্তন ঘটে। শব্দের এই পরিব্যাপনস্থানায়ন চিরাচরিত সুরসঙ্গতিকে বাতিল করে দেয়। পরিবর্তে

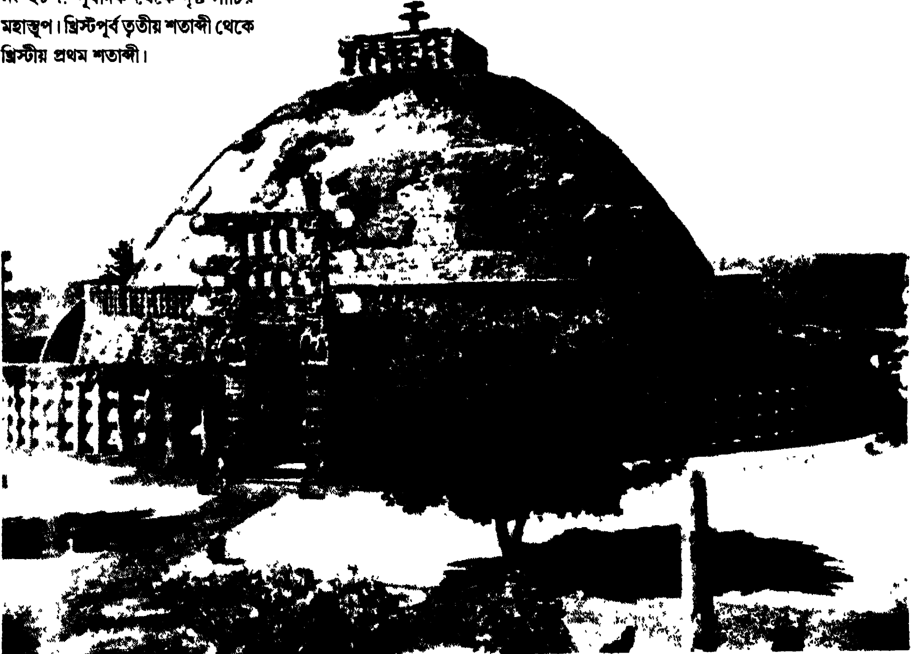
শ্রোতাদের শব্দাবলি বা শব্দসৃষ্টিকারী বস্তুর অভিমুখী হওয়ার জন্য সক্রিয়ভাবে প্রত্যাশী করে তোলে এবং এর দ্বারা শ্রবণ-পরিসর উন্মুক্ত হয়। ইনস্টলেশন এবং সাউন্ড স্কাল্পচারের মধ্যেকার সীমানা হল প্রবহমান এবং এর নিষ্পত্তি ঘটে এতে ব্যবহৃত দৃশ্যনকশার ভূমিকা পালনের মাধ্যমে। এর একটা আদর্শ উদাহরণ হল বিশিষ্ট পপ শিল্পী রাসখেনবার্গের শব্দ-শিল্পকর্ম 'ব্রডকাস্ট' (১৯৫৯)। এটি একটি কম্বাইন পেন্টিং। যার ক্যানভাসের পিছনে ছিল তিনটে রেডিয়ো এবং ক্যানভাসের পৃষ্ঠদেশে দুটো টিউনিং নব।

গোড়ার দিকের 'সাউন্ড আর্ট' শিল্পকর্মের এক প্রদর্শনী হয়েছিল ১৯৬৪ সালে নিউইয়র্কের 'কর্ডিয়ার অ্যান্ড একস্টর্ম গ্যালারি'তে 'ফর আইজ অ্যান্ড ইয়ারস' নামে। এতে দাদাবাদী শিল্পী মার্সেল দুশঁপ এবং পপ শিল্পী ম্যানরে-র কাজ ছিল।

সাঁচি

মধ্যপ্রদেশের একটি ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থান। প্রাচীন মালব রাজ্যের রাজধানী ছিল বিদিশা। বর্তমানে এর নাম বেসনগর। এই বিদিশা বা ভিলসাতে সম্রাট অশোক তাঁর পত্নীর স্মৃতি রক্ষা এবং বুদ্ধদেবের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে

নং ২৮৭. পূর্বদিক থেকে দৃষ্ট সাঁচির মহাস্তূপ। খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দী থেকে খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দী।



সংঘারাম এবং স্তূপ নির্মাণ করেন। স্তূপ বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধ শিল্পের একটি বিশিষ্ট বিষয়। প্রসিদ্ধ স্তূপগুলির অন্যতম হল সাঁচি। মধ্যপ্রদেশের অন্যতম বিখ্যাত স্তূপ ভারহুতের কিছুকাল পরেই সাঁচিতে অনেকগুলি স্তূপ নির্মিত হয়। অশোকের সময় এর নির্মাণ শুরু হয় কিন্তু শেষ হয় অনেক পরে। ফলে সাঁচি স্তূপে শুঙ্গরাজাদের শিল্পকৃতিরও নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়। যেমন— শুঙ্গযুগ অর্থাৎ খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে তৈরি হয়েছে। স্তূপ ও রেলিং আবার খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে অর্থাৎ অন্ধ্রযুগে তৈরি হয়েছে তোরণ। ভাস্কর্যের দিক থেকে সাঁচি ভারহুতের সমপর্যায়ভুক্ত। ভারহুতের মতো এখানেও বুদ্ধের উপস্থিতি প্রতীকী। তোরণে আছে জাতকের গল্পবলা গুণমণ্ডিত ভাস্কর্য চিত্রণ।

সাঁচির তোরণে উপরে, পাশে গাছকে অবলম্বন করে দাঁড়ানো নগ্ন নারীমূর্তি বিশেষ বৈশিষ্ট্যকে ব্যক্ত করে। এই নারীমূর্তি হল যক্ষিণী বা 'বৃক্ষিকা'। লীলায়িত দেহসুষমার এই মোহিনী নারীমূর্তি বৌদ্ধ আদর্শ অনুসারী নয়। ভূমিদেবীর পুজোর আদর্শ থেকে সৃষ্ট এই মূর্তিকে জনসাধারণ উর্বরতার প্রতীক বলেই বিশ্বাস করে। ভারতে এইরকম নগ্নমূর্তি নেই। স্তূপের প্রধান অংশ গর্ভ বা Dome-এর অভ্যন্তর ইট দিয়ে তৈরি। বহিরাবরণে শুধু পাথর ব্যবহার করা হয়েছে। গোলাকার স্তূপের প্রদক্ষিণ পথটি খুবই সুন্দর। বেষ্টনীর চারদিকে আছে চারটি তোরণ। সাঁচির স্তম্ভের গায়ে লতাপাতা ফুল ইত্যাদি খচিত যে নকশা তাকে বলে floral design। সাঁচি ও ভারহুতের শিল্পীরা কোনো শিল্পশাস্ত্র মেনে বা কোনো আধ্যাত্মিক বা তাত্ত্বিক বার্তা দেবার জন্য এই শিল্প সৃষ্টি করেননি। যা চোখে দেখেছেন, যা অনুভব করেছেন তাই রূপায়িত করেছেন। সাঁচির শিল্প যেন দরবারি অনুশাসনহীন লোকশিল্পের উৎকর্ষ রূপ। পরবর্তীকালের গুপ্ত শিল্পের সঙ্গে সাঁচির তফাৎ যেন প্রাকৃতের সঙ্গে সংস্কৃত ভাষার প্রভেদের মতো। তবু ভারহুতের তোরণের কম্পোজিশনের সঙ্গে সাঁচির পার্থক্য লক্ষ করা যায়। কারণ ভারহুত হল সম্পূর্ণতই ডেকরেটিভ আর সাঁচি হল ন্যাচারালিস্টিক। তার মূল কারণ হল শুঙ্গযুগ আর্যশিল্প প্রভাবিত এবং অন্ধ্রযুগ দ্রাবিড় শিল্প প্রভাবিত।

সানস্-সেরিফ (Sans-serif) ইংরেজি টাইপের একটি ছাঁদ। টাইপের ইতিহাসে এই টাইপ ফেসের উদ্ভব খুব প্রাচীন নয়। সাধারণভাবে ইংরেজি

ABCDEFGH
abcdefgh

টাইপের মূল ভিত্তি রোমান ছাঁদের হরফ যার শুরুতে এবং উপর নীচের দুই প্রান্তে যে স্ট্রোক বা আঁচড় থাকে এই টাইপে তা থাকে না। ফলে এই টাইপ হয় অলংকারহীন সাদাসিধে। সুতরাং বলা যায় সানস্-সেরিফ টাইপ হল সেরিফ ছাড়া রোমান টাইপ। সানস্-সেরিফ টাইপ প্রাথমিকভাবে তৈরি করা হয়েছিল পোস্টারে ব্যবহারের টাইপ হিসাবে। কিন্তু অচিরেই তা সাধারণভাবে ব্যবহার হতে শুরু করে। বিশেষ করে Jan Tschichold-এর (১৯০২-১৯৭৪) লেখা 'New Typography'বইয়ে এই ছাঁদের যে হরফ ব্যবহার করেন বিংশ শতাব্দীর মুদ্রণ নকশার ওপর তা বিরাট প্রভাব সৃষ্টি করে। যার ধারা আজও বহমান। জার্মান 'বাউহাউস' স্কুল এবং হল্যান্ডের 'দি স্টাইল' আন্দোলন সানস্-সেরিফের জ্যামিতিক হরফ তৈরি করে। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে এডওয়ার্ড জনসন এবং এরিক গিল সানস্-সেরিফের উল্লেখযোগ্য নকশা তৈরি করেছিলেন।

সায়র পেরদু
(Cire Perdue)

এই ফরাসি পরিভাষাটির অর্থ 'Lost wax' বা বিনাশপ্রাপ্ত মোম বা ফাঁপা ঢালাই। এটি একটি ঢালাই পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে ধাতু ঢালাই করে মূর্তি তৈরি করা হয়। এই ঢালাই পদ্ধতি বেশ প্রাচীন। এতে প্রথমে মোম ধুনো জাতীয় দাহ্যপদার্থ দিয়ে একটি ভাস্কর্য বা কোনো একটি বস্তু তৈরি করা হয়। তারপর এই ভাস্কর্য বা বস্তুটিকে ক্লে দিয়ে মুড়ে ফেলা হয়। কিন্তু ওপর দিকে একটি ফুটো রাখা হয় এবং এই ফুটোর সঙ্গে ফানেলের মতো একটা পথ করা হয় গলানো ধাতু বিশেষ করে ব্রোঞ্জ ঢালার জন্য। এর সারা গায়ে কিছু সূক্ষ্ম ছিদ্র রাখা হয় যাতে বাতাস বেরোতে পারে। গলিত ধাতুর সংস্পর্শে এসে মোম বাষ্পীভূত হয় এবং ধীরে ধীরে ধাতু মোমের জায়গা দখল করে। প্রাচীনকালে ইজিপশিয়ান, গ্রিক এবং রোমানরা এই 'Lost wax' ঢালাই পদ্ধতি ব্যবহার করতেন। ক্যারোলিনজিয়ান যুগে এবং পরবর্তীকালে জার্মানিতে অটোনিয়ান যুগে এই পদ্ধতির পুনরুজ্জীবন ঘটে। অটোনিয়ান যুগে এই পদ্ধতির পুনরুজ্জীবন ঘটান ধাতুশিল্পী বা কামারেরা। যাঁদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন হিলডেসহাইমের অ্যাবট বার্নওয়ার্ড। আজও ভাস্কর্য শিল্পীদের কাছে এটা ফাঁপা ঢালাইয়ের একটা অত্যন্ত সাধারণ পদ্ধতি।

আমাদের দেশে ডোকরা কামারগণ এই পদ্ধতি ব্যবহার করছেন সুদূর অতীতকাল থেকে। প্রখ্যাত ভাস্কর্য শিল্পী প্রয়াত মীরা মুখোপাধ্যায় এই পদ্ধতিতে বহু ভাস্কর্য নির্মাণ করে গেছেন। *ডোকরা শিল্প দেখুন।

সালোঁ (Salon) ফরাসি এই পরিভাষাটির সাধারণ অর্থ কোনো একটি স্বাধীন গোষ্ঠীর প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পকলা প্রদর্শনীর অধিকার। যদিও সপ্তদশ শতাব্দী থেকেই প্যারিসের ল্যুভ্‌র মিউজিয়ামে সালোঁ দাপোলোঁ-তে আনুষ্ঠানিক নয় এমন যেসব প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হত উনবিংশ শতাব্দীর আগেই তা শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা অর্জন করে। প্রদর্শনীতে উপস্থাপিত শিল্পকর্মগুলি বাছাই করতেন একদল নির্বাচকমণ্ডলী এবং এর স্বীকৃতিতে সাধারণভাবে কোনো একজন শিল্পীর ছবির বিক্রি এবং প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত ছিল। সেই সঙ্গে প্রদর্শনী থেকে চিত্রকলা, ভাস্কর্য এবং ছাপাই ছবির জন্য পদক পাওয়া ছিল অতিরিক্ত সম্মানের বিষয়। শতাব্দীর অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এইসব ব্যবস্থায় নানা পরিবর্তন ঘটতে থাকে। যেমন আকাদেমিক ও রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গির জুরিগণ বহু শিল্পীর নতুন ধরনের শিল্পকর্মকে বাতিল করে দিতে আরম্ভ করেন। ১৮৬৩ পর্যন্ত এরকম ঘটনা বহু ঘটেছে। এই বছরেই ক্ষমতাসীন সালোঁ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বেশ কিছু শিল্পকর্ম বাতিল করে দেওয়ার বিরুদ্ধে জোরালো প্রতিবাদে সাড়া দিয়ে তৃতীয় নেপোলিয়ন 'সালোঁ দে রফ্যুজে' প্রতিষ্ঠা করেন। এখানেই মানের আঁকা 'ওলিম্পিয়া' ছবিটি বেশ শোরগোল তোলে। ১৮৭০ নাগাদ সালোঁ গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে প্রথাসিদ্ধ গতানুগতিক শিল্পকলার সমার্থক হয়ে যায়। ১৮৮১ সালে 'সোসিয়েতে দেজার্তিস্ত ফ্রানচাইজি' সালোঁর দায়িত্বভার গ্রহণ করে।

সালোঁ দতোন (Salon d'Automne) প্যারিসের একটি বাৎসরিক চিত্রকলা প্রদর্শনী। ১৯০৩ সালে সালোঁ দেজন্দপঁদঁ এবং সরকারি সালোঁর বিকল্প হিসাবে এর সুত্রপাত। এর প্রথম প্রদর্শনীটি ছিল গগাঁর শিল্পকর্ম নিয়ে একটি স্মারক প্রদর্শনী। গগাঁর খ্যাতিকে আরও মহিমান্বিত করা ও অন্যান্য শীর্ষস্থানীয় আভঁ গার্দ শিল্পীদের প্রতিষ্ঠা দেওয়াই ছিল এর উদ্দেশ্য। কিন্তু তারপর থেকে কিছুদিন সালোঁ দতোন ছিল ফভিস্টদের প্রদর্শশালা। বিশেষ করে ১৯০৫ সালে মাতিস, দর‍্যাঁ, ভ্লামিঙ্ক প্রমুখদের উজ্জ্বল, অবাস্তববাদী ছবি, যা দেখে একজন ক্ষুব্ধ সমালোচক

'বন্যপশু' বা 'ফভস্' বলে মন্তব্য করেছিলেন, সালোঁ দতোন সেই ধরনের দুঃসাহসী প্রদর্শনীতে পরিণত হয়। দু-বছর পর এই সালোঁ হয়ে ওঠে সেজানের স্মারক প্রদর্শনীর কেন্দ্র এবং প্রথম তাঁর কীর্তিকে মানুষের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হয়। সালোঁ দতোন প্রদর্শনীকে বিংশ শতাব্দীর শিল্পের প্রস্তর ফলক হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

সালোঁ দেজন্দপঁদঁ
(Salon des Indipendants)

সরকারিভাবে সংগঠিত সালোঁতে ছবি নির্বাচন নিয়ে মাঝে মাঝেই সংঘাত বেঁধেছে। সেইরকমই জুরিদের অর্থাৎ নির্বাচকমণ্ডলীর সঙ্গে আপস করতে না পেরে ১৮৮৪ সালে সোসিয়েতে দেজার্তিস্ত অ্যাঁদেপঁদঁ প্রতিষ্ঠা করেন বিখ্যাত শিল্পী সিগন্যাক, সুরা প্রমুখরা মিলে। এই সমিতি দ্বারা আয়োজিত প্রদর্শনী হল সালোঁ দেজন্দপঁদঁ। এই প্রদর্শনীর জন্য কোনো নির্বাচকমণ্ডলী ছিল না। নিয়মানুযায়ী প্রত্যেক শিল্পী প্রবেশমূল্য দিলেই প্রদর্শনীতে অংশ নিতে পারতেন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল এই প্রদর্শনীতে প্রগতিশীল শিল্পকলা প্রকাশ্যে দর্শকের সামনে প্রদর্শন করার অনুমতি ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে এই সমিতি ভেঙে যায়।

সিকেটিভ
(Siccative)

তাড়াতাড়ি শুকোনোর জন্য রঙে যে পদার্থ মেশানো হয় তাকে বলে সিকেটিভ বা ড্রায়ার। সাধারণভাবে তেলরঙেই সিকেটিভ মেশানো হয়। কারণ তেলরং তুলনামূলক ভাবে ধীরে শুকোয়। কিন্তু সিকেটিভ তেলরং তৈরির সময়ই মেশানো হয়। কিছু ক্ষেত্রে আঁকার সময়ে রঙে সিকেটিভ মেশানো হয় রংকে আরও দ্রুত শুকোনোর জন্য। তবে সিকেটিভ কমবেশি রঙের ক্ষতি করে। কেন-না সিকেটিভ তেলরঙের গড়ে ওঠা পর্দা বা ফিল্‌মে চিড় বা ফাট ধরায় এবং রংকে কালচে করে দেয়। যাঁরা পুরু করে তেলরং চাপিয়ে কাজ করেন তাঁদের ক্ষেত্রে সিকেটিভ খুবই বিপজ্জনক। কেন-না দ্রুত শুকোয় বলে এক্ষেত্রে ওপর দিকের রং আগে শুকিয়ে যায় এবং ভেতর দিকটা কাঁচা থেকে যায় যার ফলে পরবর্তীতে রং ঝুলে পড়তে পারে। বিশেষজ্ঞরা সাধারণভাবে সিকেটিভ এড়িয়ে চলারই পরামর্শ দিয়েছেন। তবে সিকেটিভ হিসাবে কোবল্ট ড্রায়ার একটু নিরাপদ।

সিচুয়েশন গ্রুপ
(Situation Group)

১৯৬০ সালে লন্ডনের রয়াল সোসাইটি অব ব্রিটিশ আর্টিস্টস গ্যালারিতে তরুণ ব্রিটিশ চিত্রকরদের

একটি প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয় যার নাম ছিল 'সিচুয়েশন'। পরবর্তীকালে এই প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণকারী শিল্পীর 'সিচুয়েশন গ্রুপ' নামে পরিচিত হন। এইসব তরুণ চিত্রকররা বাণিজ্যিক গ্যালারিগুলোর দ্বারা তাঁদের কাজের প্রতি সুযোগসুবিধা দানের প্রশ্নে অবহেলার কারণে হতাশাগ্রস্ত হয়েছিলেন। সিচুয়েশন গ্রুপের শিল্পীরা সাধারণভাবে ১৯৫০-এর মার্কিন শিল্পীদের কাজ বিশেষ করে অ্যাবস্ট্র্যাক্ট এক্সপ্রেশনিজ্‌মের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। বস্তুত তাঁরা বড়ো বড়ো ছবি আঁকতে উৎসাহী ছিলেন। তারা বোঝাতে চাইতেন যে বিরাট আকারের বিমূর্ত ছবি দর্শকের সমগ্র দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে তার সামনে একটা 'সিচুয়েশন' বা পরিস্থিতি তৈরি করে। এর থেকেই এই শিল্পীরা 'সিচুয়েশন' নামটি গ্রহণ করেন। এই গোষ্ঠীর কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন উইলিয়াম টার্নবুল, রবিন ডেনি, বার্নার্ড কোহেন, গিলিয়ান আয়ারস্, রিচার্ড স্মিথ, জন হোয়ল্যান্ড প্রমুখ ব্রিটিশ চিত্রকরগণ। প্রদর্শনীটির রেট্রোস্পেক্ট হলে তাতে অংশ নেন ভাস্কর অ্যানথনি ক্যারো। ক্যারোর প্রথম জোড়া লাগানো ভাস্কর্য এতে প্রদর্শিত হয় যার সুর ছিল অনেকটাই আন্তর্জাতিক, অনেক বেশি উজ্জ্বল এবং আশাবাদী। ১৯৬১ সালে অনুষ্ঠিত হয় দ্বিতীয় 'সিচুয়েশন' প্রদর্শনী।

সিচুয়েশনিজ্‌ম (Situationism)

'অ্যাঁতেরনাসিয়োনাল সিতুয়েসিয়োনিস্ত' ছিল যুদ্ধোত্তরকালীন শিল্পতত্ত্ব ও প্রয়োগের একটি মৌলিক ধারার অন্যতম শিল্পান্দোলন। ১৯৫৭ সালে এই আন্দোলনের সূত্রপাত এবং চলেছিল ১৯৭২ সাল পর্যন্ত। ১৯৫৯ থেকে ১৯৬৯ পর্যন্ত এই আন্দোলনের বিকাশ কাল। সিচুয়েশনিজ্‌মের অন্যতম ব্যক্তিত্ব গি দ্যবোরদ ১৯৫২ সাল পর্যন্ত প্যারিসীয় লেত্‌রিজম-এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি এই আন্দোলনের আদর্শের তাত্ত্বিক ঘোষণাকে উপস্থাপিত করলেন। যার মধ্য দিয়ে সামাজিকভাবে শৈল্পিক কার্যকলাপ প্রসারিত করা হল প্রাসঙ্গিক রীতিতে ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক উভয় রাষ্ট্রকাঠামোর উচ্ছেদের জন্য আন্দোলনকে সাহায্য করতে। শিল্পকর্মের থেকে শিল্প দূরে সরে গেল। এসবের জন্য পরিস্থিতি তৈরি করা হল। শহুরে পরিসরে মনস্তাত্ত্বিক-ভৌগোলিক বিশ্লেষণ করা হল, আচরণগত পরীক্ষা করতে আগাম যান চালানো তথা সারা শহরে গাড়ি চালিয়ে ঘোরা,

খেলাকে মৌলিক করে তোলা অথবা আগে থেকে তৈরি নান্দনিক বস্তুসমূহ থেকে উদ্দেশ্যমূলক বিচ্ছিন্নতা তৈরি। এঁদের নিজস্ব মুখপত্রে 'অ্যাঁতেরনাসিয়োনাল সিতুয়েসিয়োনিস্ত' -এ সমকালীন সময়ের ইউরোপীয় শিল্পকলাকে আক্রমণ করা হয়েছিল। দ্রুত এই আন্দোলন অন্যত্র ছড়িয়ে পড়ে। যেমন ব্রাসেলস্ মরিস, ওয়াইকার্ট, মিউনিখে স্পার, কোপেনহেগ্‌নে জারগেন ন্যাশ, এবং আমস্টার্ডামে জং প্রমুখরা এই আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯৬৭ পর্যন্ত এই আন্দোলনের প্রধান তাত্ত্বিক কাজ ছিল 'দি সোসাইটি অব দি স্পেকটেকলস্' এবং 'হ্যান্ডবুক অন দি আর্ট অব্ লিভিং ফর দি ইয়ং জেনারেশন।' এই আন্দোলন কখনো-কখনো চরম সংঘর্ষের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে যেমন যুক্ত হয়ে পড়েছিল ১৯৬৮ সালে ফ্রান্সের সাধারণ ধর্মঘটের সঙ্গে। ১৯৫৬ সালে প্রকাশিত প্রথম দিকের অন্যতম একটি পাঠ 'ম্যানুয়াল ফর মিসিউজ' যেন ছিল ১৯৮০ এবং ১৯৯০ সালের তথাকথিত বহু শৈল্পিক কাজকর্মের গোপন ব্লুপ্রিন্ট।

সিটিস্কেপ (Cityscape)

শহরের দৃশ্যচিত্র। ল্যান্ডস্কেপে যেমন অ্যাকশনের ভূমিকা গৌন সিটিস্কেপেও তেমনি অ্যাকশন বা ঘটনার বিষয়টি গৌণ। এখানে প্রধান বৈশিষ্ট্য হল বাড়িঘর, যানবাহন, ব্রিজ ইত্যাদি শহরের অন্যান্য নাগরিক চিহ্ন সহ মানুষের ছবি, পার্কের দৃশ্যের উন্মুক্ত রূপ।

সিনোপিয়া (Cinopia)

ফ্রেস্কোর জন্য ব্যবহৃত খসড়া রেখাচিত্র। সাধারণত লালচে বাদামি চকের সাহায্যে এই ড্রয়িং করা হয়। এই লালচে বাদামি চককেও বলা হয় সিনোপিয়া।

সিম্বলিজ্‌ম (Symbolism)

প্রতীকবাদ। ১৮৮০ সাল থেকে ১৮৯০ সালের মধ্যবর্তী সময়কালে প্রধানত ফ্রান্সে বিদ্যমান এক শিল্প আন্দোলন। এর প্রাথমিক উৎস সাহিত্য হলেও পরে শিল্পের অন্যান্য শাখাতে বিস্তার লাভ করে। ঐতিহাসিকভাবে সিম্বলিজ্‌মের আগে আসে রোমান্টিসিজ্‌ম এবং তারপর আসে সুরিয়ালিজ্‌ম। ঐতিহাসিকদের মতে এই তিনটে আন্দোলনেই স্ববিরোধী সাফল্য লক্ষ করা যায়। আবার এই তিনটে আন্দোলনই ব্যক্তির কল্পনাপ্রবণতার গুরুত্বকেই জোর দিয়েছিল। তবে এটা বস্তুত বিশুদ্ধ ইম্প্রেশনিস্ট রীতির একটা বৌদ্ধিক বিকল্পকে তুলে ধরেছিল। সেই সঙ্গে সিম্বলিজ্‌ম রোমান্টিসিস্ট

নং ২৮৮. গুস্তভ মোরো : অ্যাপারিশন। ১৮৭৬। ক্যানভাসের ওপর তেল রং। ৫৪x৪৪.৫ সেমি.। আরও ছবি নং ১৮৮ পৃ. ৩৬৯



এবং প্রি-র‍্যাফেলাইটদের পূর্বসূরী হিসাবে স্বীকৃত দিয়েছিল। সিম্বলিস্ট পেন্টিং কিন্তু অ্যালিগরি বা রূপক থেকে আলাদা। সিম্বলিজ্‌মের মূর্তিরূপ কখনোই যথার্থভাবে ধারণা এবং আবেগের সমতুল প্রতিমূর্তি নয়, তবে তা একটু দ্ব্যর্থকভাবে এর কথাকে জাগিয়ে তোলে। এর বিষয়বস্তুও স্পষ্টভাবে বোধগম্য নয় বরং একটু ইঙ্গিতধর্মী। সিম্বলিজ্‌মে স্বপ্নের কথা থাকলেও তা সুরিয়ালিজ্‌ম থেকে স্পষ্টতই পৃথক। সুরিয়ালিজ্‌মের স্বপ্ন হল ফ্রয়েডীয় তত্ত্বানুসারী অর্থাৎ অবচেতন মনের উপলব্ধি। কিন্তু সিম্বলিজ্‌মের ক্ষেত্রে অবচেতন মনের কোনো প্রশ্নই নেই। সিম্বলিজ্‌মের স্বপ্ন হল ইন্দ্রিয়গত অভিজ্ঞতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এক ভাবাচ্ছন্ন রূপ। যা নান্দনিক ক্রিয়ার সাহায্যে মনকে জাগতিক কর্ম থেকে তুলে নিতে পারে। সিম্বলিজ্‌মে দুটো ধারা লক্ষ করা যায়। এক হল যাঁরা প্রি-র‍্যাফালাইটদের মতো পিয়োর, নোবেল এবং সাবলাইম্‌কে মহিমান্বিত করেছে আর অন্যদের ক্ষেত্রে গুরুত্ব পেয়েছে পাপ, যৌনতা, মৃত্যু এবং শয়তানি।

সিম্বলিস্টদের শিল্পকর্মে ঘুরেফিরে এসেছে স্বপ্নের প্রসঙ্গ। তাই স্বপ্নের শিল্পরূপ, এবং ফ্যান্টাসির প্রতি এর প্রাসঙ্গিক দায় এবং আবেগের শক্তি সিম্বলিস্ট চিত্র ও ভাস্কর্যের বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এরকম একটি প্রতিমূর্তি হল 'সোলোম'। ফলে বহু শিল্পীর ছবিতে সোলোমের নানারকম উপস্থাপনা লক্ষ করা যায়। যেমন ওদিলোঁ রদোঁর ছবি 'হেড অব এ মার্টার', পিয়ের পুভি-র ছবি 'দি বিহেডিং অব সেন্ট জনস্ দি ব্যাপ্টিস্ট' প্রভৃতি।

১৮৮৪ সালে জে. কে. উইসম্যান-এর উপন্যাস 'আ রব্যুর' প্রকাশিত হয়। তার মধ্যে শিল্পী মোরোর সিম্বলিস্ট পেন্টিং নিয়ে উচ্ছ্বসিত আলোচনা ছিল।

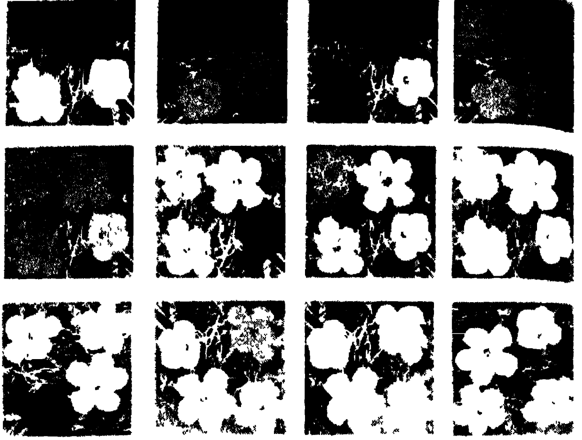
লক্ষণীয় বিষয় হল এই আন্দোলন ছিল মূলত বিষয়গত। এর কোনো আঙ্গিকগত রূপচিহ্ন ছিল না, ফলে অনেক সময় দেখা গেছে কোনো সিম্বলিস্ট শিল্পী অন্য কোনো শিল্পধারার জনক হিসাবে চিহ্নিত হয়েছেন। যেমন হয়েছিলেন বেলজিয়ান শিল্পী জেমস এঁসর। এছাড়াও সিম্বলিস্ট ছবির সঙ্গে 'আর্ট ন্যুভো' এবং 'ডেকাডেন্ট আর্ট-এর মধ্যের পার্থক্য অনেক সময় অস্পষ্ট। সিম্বলিজ্‌ম বিষয়গত বা অধ্যাত্মিকতার পক্ষে বস্তুগত পথকে বাতিল করে দিয়েছিল এবং বাস্তবতার সরাসরি উপস্থাপনা থেকে সরে গিয়ে নানা বিষয়কে সংযুক্তিকরণের মধ্য দিয়ে দ্ব্যর্থক অথচ শক্তিশালী প্রতীকের সাহায্যে কোনো ধারণাকে ব্যক্ত করেছিল। সিম্বলিজ্‌ম ধর্মীয় অতীন্দ্রিয়বাদের সঙ্গে বিকৃত ও আদিরসের মিশ্রণ ঘটিয়েছিল, আদিমের সঙ্গে ক্ষয়িষ্ণু অভিজাত সংস্কৃতির সংযুক্তি ঘটিয়েছিল।

সিরামিক্‌স (Ceramics)

এটি একটি সাধারণ শব্দ। ১৯০০ সালের পর পোরসিলেন এবং সব ধরনের পটারিকে বোঝাতে উনবিংশ শতাব্দী থেকে শব্দটি ব্যবহৃত হচ্ছে। *পোরসিলেন ও পটারি দেখুন।

সিরিয়াল আর্ট (Serial Art)

শিল্প রচনার অন্যতম সূত্র 'রিপিটিশন' বা পুনরাবৃত্তিকে ব্যবহার করে সৃষ্ট নকশা বা শিল্পকর্ম। দৃশ্যশিল্প বা চিত্রকলা-ভাস্কর্যে এটা ব্যাপক একটা বিষয় এবং ভাবগত দিক থেকে সাহিত্য, সংগীত এমনকি গণিতের সঙ্গেও এর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্বে শিল্প সৃজন প্রক্রিয়ায় পুনরাবৃত্তির পদ্ধতি স্বীকৃত হয়। মনে, সিসলে, সেজানের ছবিতে এর আভাস লক্ষ করা যায়। এই



নং ২৮৯. অ্যান্ডি ওয়ারহল। ফ্লাওয়ার্স। ১৯৬৪। ক্যানভাসের ওপর সিল্কস্ক্রিন প্রিন্ট। প্রতিটি খোপ ২৪X২৪ ইঞ্চি।

মৌলিক ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে বোঝাতে চাওয়া হয় যে, ছবির মোটিফ বা রূপাকৃতি পালটে যাচ্ছে। মনদ্রিয়ানও এর অন্তর্নিহিত ধারণাকে কাজে লাগিয়ে দৃশ্যমান সমস্ত রূপের চরম বিমূর্তকরণ পদ্ধতির সৃষ্টি করেছিলেন। সিরিয়ালিজ্‌ম বা পুনরাবৃত্তিবাদ মিনিমাল আর্টেরও অন্যতম সূত্র।

সিরিয়াল আর্টের ব্যাপক প্রয়োগ লক্ষ করা যায় পপ আর্টে। বিশেষ করে অ্যান্ডি ওয়ারহল-এর ছবিতে। ওয়ারহলের ছবিতে ধারাবাহিকতার এই রীতিতে আধুনিক সমাজের প্রাত্যহিক জীবন ও সংস্কৃতিকে চিত্রায়িত করা হয়েছে গণজ্ঞাপনের চিত্রকল্পের পুনরাবৃত্তিমূলক ব্যবহারের সাহায্যে।

সিলভার পয়েন্ট (Silver point)

রুপোর শলাকা দিয়ে কাগজের ওপর ড্রয়িং করার একটি পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে কাগজটিতে সাদা চাইনিজ হোয়াইটের প্রলেপ লাগিয়ে নেওয়া হয়। সাদা পিগমেন্টের গ্রাউন্ডের ওপর রুপোর শলাকার ছোটো ছোটো দাগ পড়ে এবং এই দাগগুলি বেশ কনট্রাস্ট হয়। সিলভার পয়েন্ট শলাকা দেওয়া দাগকে মোছা যায় না। ফলে এই ছবি আঁকার সময় যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। মধ্যযুগে ইতালিতে এর প্রথম ব্যবহার দেখা যায়। পঞ্চদশ শতাব্দীতে ফ্লান্ডার্সে সিলভার পয়েন্ট খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। অ্যালব্রেখট ডুরা ছিলেন সিলভার পয়েন্টের একজন খ্যাতনামা শিল্পী। সপ্তদশ শতাব্দীতে গ্রাফাইট আবিষ্কার হবার পর সিলভার পয়েন্ট পদ্ধতির ব্যবহার বন্ধ হয়ে যায়।

সিল্যুয়েট (Silhouette)

ছায়াচিত্র। কোনো বস্তুর পেছন দিক থেকে আলো ফেললে একটি পর্দায় যেভাবে ওই বস্তুর ছায়া পড়ে সেরকম একবর্ণ

বা (সাধারণত কালোতে টোনবিহীন ফ্ল্যাট ছবি।) অর্থাৎ সিল্যুয়েট হল সলিড ছবি। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে সিল্যুয়েট খুবই জনপ্রিয় একটি রূপ ছিল। জন মায়ারের মতো ব্রিটিশ শিল্পীরা এই মাধ্যমকে ব্যবহার করেছেন। জনৈক ফরাসি মন্ত্রীর নাম থেকে এর নামকরণ হয়। তাঁর কাজ ছিল কাগজ কেটে মূর্তি তৈরি করা।

সিল্কস্ক্রিন প্রিন্ট (Silkscreen print)

সিল্কস্ক্রিন প্রিন্ট বা স্ক্রিন প্রিন্ট স্টেনসিল পদ্ধতির একটি উন্নত ও আধুনিক রূপ। বস্তুত স্টেনসিল প্রিন্টিং পদ্ধতি বেশ প্রাচীন। জানা গেছে প্রাচীনতম স্টেনসিল তৈরি করেছিলেন ফিজি দ্বীপবাসীরা কাপড় ছাপার জন্য। তাঁরা কলাপাতায় ফুটো করে কোনো নকশার স্টেনসিল তৈরি করতেন আর ব্যবহার করতেন। জাপানিরাও স্টেনসিলে চার থেকে পাঁচ রঙা নকশা ছেপেছিলেন। মধ্যযুগে উডব্লক প্রিন্টের সঙ্গে স্টেনসিলের ব্যবহার প্রিন্ট ও খেলার তাস অলংকরণের কাজে লাগানো হত। ষোড়শ শতাব্দীতে স্টেনসিলের সাহায্যে পাণ্ডুলিপি অলংকরণ এবং ধর্মীয় কিছু ছবিতে কারুকার্য করা হত। পরবর্তীকালে স্টেনসিলে ওয়ালপেপার ছাপা হয়েছে ইংল্যান্ডে। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষের দিকে আমেরিকাতে আসবাব পত্রে স্টেনসিলের নকশা ব্যবহার করা হয়েছিল এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে হোয়াইটওয়াশ করা দেয়ালের ওপর স্টেনসিলে সরাসরি প্রিন্ট নেওয়া হত।

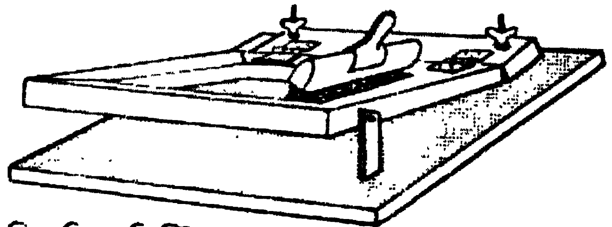
ম্যানচেস্টারের অধিবাসী স্যামুয়েল সাইমন ১৯০৭ সালে স্টেনসিল হিসাবে সিল্কস্ক্রিন পদ্ধতির পেটেন্ট পান। ১৯১৪ সালের মধ্যে সিল্কের কাপড়কে ব্যবহার করে



নং ২৯০. আদি জাপানি স্টেনসিল।

tieless বা জোড়হীন স্টেনসিলের প্রথম ব্যবহারের কৃতিত্ব তাঁকেই দেওয়া হয়। জন পিসওয়ার্থ নামে একজন আমেরিকান প্রথম সিল্কস্ক্রিনে বহুবর্ণ ছাপার অগ্রগতি ঘটান। সাইনবোর্ড লেখার দোকানগুলি আগ্রহের সঙ্গে এই পদ্ধতি গ্রহণ করে। কেন-না এই পদ্ধতিতে একটা মাত্র স্টেনসিলের সাহায্যে কয়েক হাজার ছাপ নেওয়া সম্ভব এবং তা সরাসরি যেকোনো সমতল পৃষ্ঠে ছাপানো যায়। যেকোনো মাপেই এতে ছাপ নেওয়া সম্ভব এবং বিশেষ কোনো যন্ত্রপাতিরও দরকার হয় না। এখন অবশ্য সিল্কের বদলে সিনথেটিক কাপড় ব্যবহার করা হয়। কেন-না সিল্ক একবারের বেশি ব্যবহার করা যায় না। তাই এখন সিল্কস্ক্রিন প্রিন্টের বদলে শুধু স্ক্রিনপ্রিন্ট বলাটাই যথাযথ। কারিগর এবং শিল্পীরা স্ক্রিনপ্রিন্ট নিয়ে অনেক পরীক্ষানিরীক্ষা করেছেন। পরবর্তীকালে স্ক্রিনপ্রিন্টকে চিত্রকলার অন্যতম মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে প্রিন্ট মেকিং-এর একটা পদ্ধতি হিসাবে। যা 'সেরিগ্রাফি' নামে চিহ্নিত। সেরিগ্রাফ শব্দটা এসেছে ল্যাটিন 'সেরিকাম' (সিল্ক) এবং গ্রিক 'গ্রাফিয়েন' (আঁকা বা লেখা) শব্দ দুটো মিলে। প্রথম দিকে স্ক্রিনে ফ্ল্যাট কালারে ছাপা হলেও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতির ফলে উপকরণ ও প্রক্রিয়ার উন্নতি ঘটায় এখন সূক্ষ্ম হাফটোন ছাপাও সম্ভব হচ্ছে।

সিল্ক প্রিন্ট পদ্ধতিতে একটি কাঠের ফ্রেমে নাইলন কাপড় টানটান করে খাটিয়ে নেওয়া (stretched) হয়। আগে সিল্ক ব্যবহার করা হত কিন্তু নাইলন বা টেরিলিনই এর জন্য উৎকৃষ্ট। নাইলন কাপড়ের সূক্ষ্ম জালিকার (mesh) ভেতর দিয়ে পাতলা রং চলাচল করতে পারে। কিন্তু কোনো পদার্থ দিয়ে যদি ওই জালি বা ফুটোগুলি বন্ধ কবে দেওয়া যায় তাহলে রং চলাচলকে রোধ করা যায়।



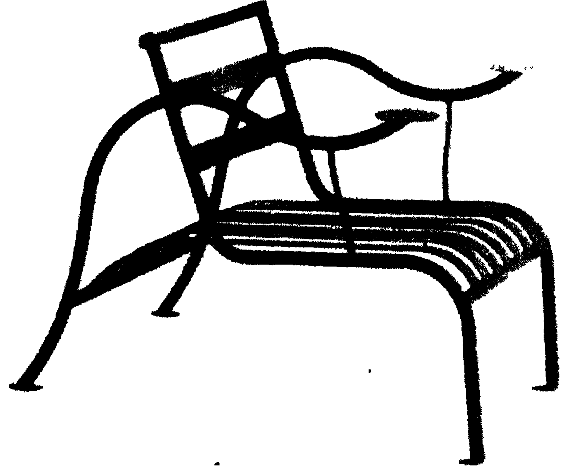
সিল্কস্ক্রিন প্রিন্টিং প্রেস

এই কৌশলকে কাজে লাগিয়ে স্ক্রিনের ওপর কোনো একটা নকশা ছকে নিয়ে নকশা বহির্ভূত অংশগুলিকে বন্ধ করে দেওয়া হয়। এরপর ফ্রেমের ভেতর দিকে পাতলা ধরনের রং রেখে একটা স্কুইজি দিয়ে টেনে রং পাস করানো হয় এবং স্ক্রিনের নীচে রাখা কোনো তলে তার ছাপ নেওয়া হয়।

স্ক্রিনের জালি বা মেশকে বন্ধ করতে ব্যবহার করা হয় লিথোগ্রাফিক ক্রেয়ন বা টাস্কি। তারপর গ্লু-এর প্রলেপ লাগিয়ে শুকিয়ে নেওয়া হয়। শুকোবার পরে সলভেন্ট দিয়ে স্ক্রিনটি ভালো করে পরিষ্কার করে নিতে হয়। যাতে নকশার ভেতর কোনো বাধা না থাকে এবং অতিরিক্ত ক্রেয়ন ধুয়ে যায়। স্ক্রিনে নকশা বা ছবিকে ট্রান্সফার করার সবচেয়ে ভালো উপায় হল ফোটোগ্রাফিক পদ্ধতির ব্যবহার করা। এক্ষেত্রে স্ট্রেচড্ করা স্ক্রিনের ওপর সুষমভাবে ফোটোসেনসেটিভ মেটিরিয়াল বা আলোক সংবেদী জিলেটিনের প্রলেপ মাখিয়ে নেওয়া হয়। বাজারে এটা পাওয়া যায় 'সোনাকোট' নামে। প্রলেপ শুকিয়ে গেলে তার ওপর নকশার ফিল্ম রেখে আলোকসম্পাত ঘটানো হয়। আলোর সংস্পর্শে এসে ফটোকেমিক্যাল স্থায়ী হয়ে মেশগুলিকে আটকে দেয়, ফলে রং বেরোবার পথ বন্ধ হয়ে যায়। আর যেখানে আলো পড়ে না সেখানকার ফোটোকেমিক্যাল জলে ধুলেই সরে যায়।

এরপর স্ক্রিনসহ ফ্রেমটিকে একটি টেবিলের ওপর কবজার সঙ্গে আটকে নেওয়া হয় মোটামুটি ৪৫ ডিগ্রি কোণ করে। একাজে একটি স্প্রিং বা ভ্যাকুয়াম টান ব্যবহার করা হয় যাতে টেনে নোয়ালে টেবিলের পৃষ্ঠতলে লেগে যায় আবার ছেড়ে দিলেই ৪৫ ডিগ্রি কোণে দাঁড়িয়ে পড়ে। স্ক্রিনের ঠিক নীচে টেবিলের পৃষ্ঠতলে এক ধরনের গাম লাগিয়ে নেওয়া হয় যাতে ছাপার কাগজ নড়ে না যায়। আজকাল অবশ্য আধুনিক ভ্যাকুয়াম টেবিল ব্যবহার করা হয়। এতে রেজিস্টারেরও ব্যবস্থা থাকে। স্ক্রিন সবসময় গ্রাউন্ড থেকে একটু উঠে থাকে। স্কুইজির চাপেই নমনীয় স্ক্রিন বসে গিয়ে কাগজে ছাপ ফেলে।

সুগেন্ডস্টাইল (Jugendstil) আর্ট ন্যুভো-এর জার্মান এবং স্ক্যান্ডেনেভীয় তরজমা। ১৮৯৬ সালে মিউনিখে শিল্প ও জীবন বিষয়ক সাময়িক পত্রিকা



নং ২৯১. জেসপার মরিশন : ক্যাপোলিনির জন্য নির্মিত চিন্তাশীল মানুষের চেয়ার। ১৯৮৬

'সুগেন্ড' প্রকাশিত হয়। সুগেন্ড শব্দটির অর্থ যুবক। ১৮৯০-এর সমকালীন সময়ে ইউরোপে 'আর্ট ন্যুভো' আন্দোলন শক্তিশালী ছিল। এক সময় এখানেই পুরানো গিল্ড প্রথা পুনরুজ্জীবনের উদ্দেশ্যে গড়ে তোলা হয়েছিল 'আর্ট অ্যান্ড ক্রাফ্টস মুভমেন্ট'। ঠিক সেরকম ভাবেই গড়ে ওঠে সুগেন্ডস্টাইল। সুগেন্ডস্টাইল শিল্পীরা তাঁদের ধারণা গ্রহণ করেছিলেন ললিতকলার বিভিন্ন ধারা যথা সিম্বলিজ্‌ম, পোস্টইম্প্রেশনিজ্‌ম, জ্যাপেনিজ্‌ম ইত্যাদি থেকে এবং এর প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন মূলত স্থাপত্য, কারুশিল্প, আলংকারিক শিল্প ও মুদ্রণ শিল্প তথা বইয়ের অলংকরণ, পোস্টার ইত্যাদিতে। সুগেন্ডস্টাইল শিল্পীরা ডিজাইন সংস্কারের উপায় হিসাবে বাস্তব রূপসমূহকে কাজে লাগানোর পক্ষে সওয়াল করতেন। আর্ট অ্যান্ড ক্রাফ্টস মুভমেন্টের মতো সারা জার্মানি জুড়ে নানা গৃহস্থালি দ্রব্য তৈরির উদ্দেশ্যে অনেকগুলি ওয়ার্কশপ গড়ে উঠেছিল যার মধ্যে ডারম্যাসট্যাড অন্যতম। অথচ সুগেন্ডস্টাইল রীতির পেশাদার শিল্পীগণ 'বিচ্ছিন্ন' গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে নিজস্ব ছাপাখানা এবং চারু ও কারুকলা স্টুডিয়ো গড়ে তোলেন। যেমন ইউনাইটেড ওয়ার্কশপ ফর আর্টিস্ট অ্যান্ড ক্রাফ্‌টস্‌ম্যানশিপ। বেশিরভাগ সুগেন্ডস্টাইল শিল্পী মিউনিখে কাজ করতেন। জাজেন্ডস্টিল শৈলীকে বিশ্বের দরবারে উপস্থিত করার জন্য আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সুগেন্ডস্টাইল দুটো নির্দিষ্ট পর্বে ভাগ করা যেতে পারে। ১৯০০ সালের আগের পর্ব এবং ১৯০০ সাল পরবর্তী পর্ব। ১৯০০ সালের

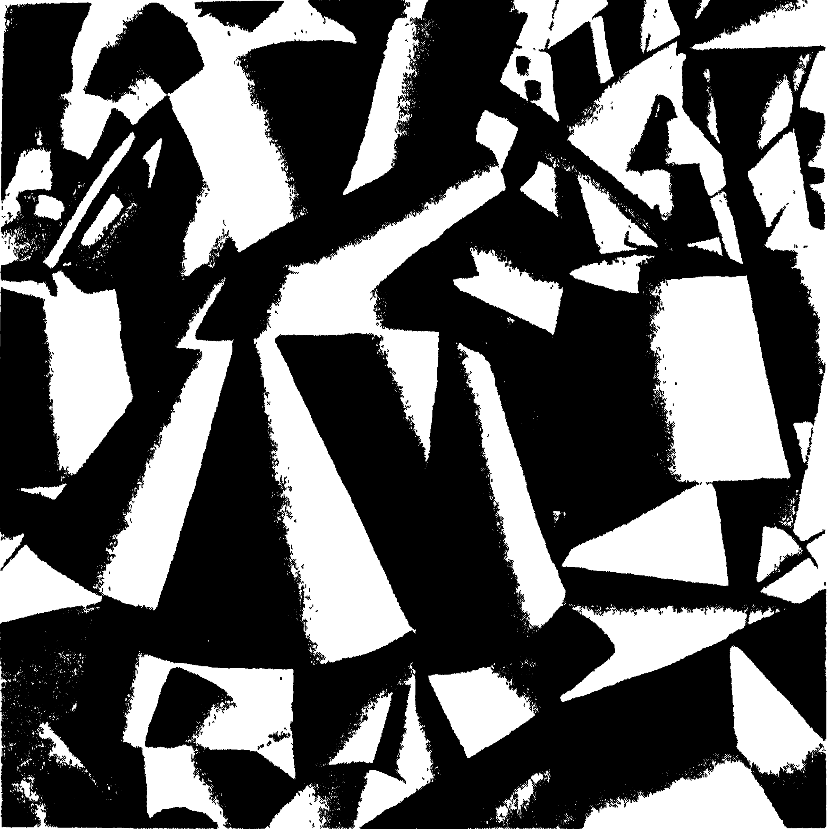
নং ২৯১.১. য়ুগেন্ড -এর প্রচ্ছদ। লুডভিগ ভন সুমবাখ। ১৮৯৭।



আগের পর্বের কাজ ব্রিটিশ আর্ট অ্যান্ড ক্রাফ্‌টস মুভমেন্টের সৃষ্ট কাজের সঙ্গে সাদৃশপূর্ণ। এর মধ্যে জোরালো ছিল ফ্লোরাল আর্ট, বাস্তববাদী এবং সমকালীন মুদ্রণ ও ব্যবহারিক শিল্পের প্রতিনিধিত্বমূলক রূপ এবং সেই সঙ্গে লোক আঙ্গিকও ছিল সাধারণ বিষয়। আর ১৯০০ সালের পরে এঁদের কাজে বিমূর্ততা ও গতিময় রূপের প্রয়োগ ঘটে বিশেষ করে বেলজিয়ান স্থপতি হেনরি ভ্যান ডি ভেলডে প্রণীত দর্শনের প্রভাবে। ভ্যান ডি ভেলডে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে জীবনের মানোন্নয়ন সহ স্থানীয় অর্থনীতির উন্নতির ক্ষেত্রে শিল্প শিক্ষা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই ধারণার ফলে ১৯০৪ সালে স্কুল অব অ্যাপ্লায়েড আর্টস গড়ে তোলায় পরিকল্পনা হয়। এই শৈলীর মুখ্য শিল্পী ছিলেন জার্মানির হারম্যান অরবিস্ট, রিচার্ড বাই মার্সস্কিমিডট্ এবং অস্ট্রিয়ার জোশেফ ম্যারিয়া

সুপ্রিম্যাটিজ্‌ম (Suprematism)

১৯১৩ সাল নাগাদ রাশিয়াতে কাশিমির মালেভিচ প্রবর্তিত নির্বস্তুক র‍্যাডিক্যাল এক চিত্ররীতি। রাশিয়াতে প্রায় একই সময়ে আরও একটি আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। যার নাম কনস্ট্রাক্টিভিজ্‌ম। সমস্ত শৈলীর থেকে আলাদা এই রীতির প্রকাশ ভিত্তি ছিল জ্যামিতিক আকার এবং রং। মালেভিচ তাঁর এই শিল্প ধারণা নিয়ে বহু প্রবন্ধ পুস্তিকা লিখেছেন। যার একটি হল 'From Cubism and Futurism to Suprematism'। সেই সঙ্গে এই ধারণা অবলম্বনে আঁকা



নং ২৯২. মালেভিচ . উইম্যান উইথ বাকেটস। ১৯১২। তেল রং। আরও ছবি ১৮৯ পৃ. ১৬৯

ছবির প্রদর্শনী করেছেন যা হল ০.১০। সুপ্রিম্যাটিজ্‌ম বিমূর্ত শিল্পের ভাবগত মূল্যের ওপর জোর দিয়েছিল। মালেভিচ বলেছিলেন, 'সুপ্রিম্যাটিজ্‌মের দ্বারা আমি বিশুদ্ধ অনুভূতি বা দৃশ্যশিল্পের উপলব্ধির উৎকর্ষকে বোঝাতে চাই।' মালেভিচের তাত্ত্বিক পুস্তিকা 'The Abstract World' প্রকাশিত হয় ১৯২৭ সালে মিউনিখে বাউহাউসের প্রকশনায়। যার ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয় ১৯৬৯ সালে। এই পুস্তিকায় মালেভিচ বলেছিলেন বিষয় ও বস্তু নিরপেক্ষভাবে শিল্পের বিমূর্তকরণ আবশ্যক। সেইসঙ্গে তিনি আগের সব শিল্পকেই নির্দেশক হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি আরও বলেছিলেন নতুন এই শিল্পরূপ শিল্পের পুরোনো আঙ্গিকের অগ্রগতি ঘটানোর জন্য নয় বরং তা শক্তির বিশুদ্ধ উপলব্ধির অভিব্যক্তি। মালেভিচের 'ব্ল্যাক স্কোয়ার অন এ হোয়াইট গ্রাউন্ড' হল সুপ্রিম্যাটিজ্‌মের প্রথম শৈল্পিক প্রকাশ। মালেভিচ মনড্রিয়ানের নিও প্লাস্টিসিজ্‌ম, গ্রপিয়াসের এবং

লা কুর্বেজোর ভাস্কর্যের মধ্যের সম্পর্ককে স্বীকার করেছেন। নতুন এই নির্বস্তুক চিত্রকলার গতিমুখ রাশিয়ার বহু শিল্পীর ওপর প্রভাব ফেলেছিল। তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য হলেন ওলগা রোজানোভা, ইভান পুনি, লিউবভ পপোভা, আলেকজান্দার রদচেঙ্কো প্রমুখ। মালেভিচ বিমূর্ত শিল্পের যে ভাবগত অধ্যাত্মিক উপরিকাঠামো তৈরি করেছিলেন তা এই শিল্পরীতির পরবর্তী কালের অগ্রগতির ওপরও জোরালো প্রভাব সৃষ্টি করেছিল।

সুমি (Sumi)
কালো রঙের স্টিক বা কেক। গাছগাছড়া পুড়িয়ে প্রাপ্ত ঝুল বা ভুসো তথা কার্বন দিয়ে এই কালো রং তৈরি করা হয়। সুমি-ই চিত্রকরগণ এই কালো রং ব্যবহার করতেন।

সুমি-ই (Sumi-e)
কালো কালি ব্যবহার আঁকা জাপানি চিত্রকলা। আদিতে এই ছবির চর্চা করতেন চিনা শিল্পীরা যা হল 'ওয়েন-জেন' শৈলী। পরবর্তীকালে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাবে এর একটা অংশই সুমি-ই শৈলীতে পরিণত হয়। এই ছবিতে কার্বন এবং গ্লু দিয়ে তৈরি চিরাচরিত সুমি স্টিক ব্যবহার করা হয়। কিছু স্টিকে সামান্য নীলচে শীতল কালি তৈরি হয় এবং কিছু স্টিকে তৈরি হয় গাঢ় ও কুচকুচে কালো কালি। এক ধরনের পাতলা অগভীর ডিশে সামান্য জলের মধ্যে বা পাথরে এই স্টিক ঘষে ঘষে শিল্পী এই কালি তৈরি করেন। কালি তৈরি হলে তা গিয়ে প্লেটের ঢালু তলে জমা হয়। কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় কালো না হওয়া পর্যন্ত শিল্পী স্টিক ঘষে থাকেন। বিভিন্ন ধরনের কাগজ সহ নানা জাতের জাপানি রাইস পেপারে সুমি-ই চিত্র আঁকা হয়। সুমি-ই চিত্রের বৈশিষ্ট্য হল এর তুলির টানের স্পষ্টতা। প্রাচ্যের অন্য কোনো ধরনের চিত্রে এই বৈশিষ্ট্য আবশ্যিক নয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে পো-মো চিত্র যাকে 'স্প্ল্যাশড্ ইংক' বা 'পোরড ইংক' টেকনিক বলা হয়। তাতে কাগজে উদ্দেশ্যমূলক ভাবে রং ঢেলে রং-কে মুক্তভাবে গড়িয়ে যেতে দেওয়া হয়। স্বভাবতই এই প্রক্রিয়ায় তুলির টানের স্পষ্টতা বজায় থাকার প্রয়োজনীয়তা নেই। অবশ্য সুমি-ইর মধ্যে পাশ্চাত্য প্রভাব পড়ার ফলে এরও রূপের পরিবর্তন ঘটেছে ধীরে ধীরে। চিরাচরিত কালো রঙের পাশাপাশি অন্যান্য রঙের ব্যবহারও যুক্ত হয়েছে। এক্ষেত্রে রঙিন কালি এবং রং দুইই ব্যবহৃত হয়েছে। এসব রঙের মধ্যে আছে খনিজ রঙ সহ প্রাচ্যদেশীয়

প্রথাগত জল রং। এতে যে তুলি ব্যবহার করা হয় তাও প্রথাগত চিনা বা জাপানি তুলি। যেমন বাঁশের হাতলের রাউন্ড ব্রাশ, 'তাই-হিটসু'রাউন্ড ব্রাশ, 'হেক' ফ্ল্যাট ব্রাশ সহ অন্যান্য সাধারণ ব্রাশ।

সুমেরিয়ান আর্ট (Sumerian Art)

দক্ষিণ মেসোপটেমিয়ার সুমেরিয়ান জনগণের শিল্পকলা। প্রাচীনকালের আদিপর্বে পশ্চিম এশিয়ায় গড়ে ওঠা দ্বিতীয় বৃহত্তম শিল্প সংস্কৃতির অংশ এই সুমেরিয়ান আর্ট কমবেশি ইজিপ্টের সমসাময়িক। পশ্চিম এশিয়ার ভৌগোলিক অবস্থান ছিল পারস্য উপসাগর থেকে কৃষ্ণসাগর আর অন্যদিকে ভূমধ্যসাগরের পূর্ব উপকূল থেকে আজকের আফগানিস্তানের সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। এখানে এক এক সময় এক একটি অঞ্চলের সভ্যতা সংস্কৃতি প্রাধান্য লাভ করে যেমন সুমেরিয়ান, আক্কাডিয়ান, ব্যাবিলনিয়ান, আসিরিয়ান, পারসিয়ান ইত্যাদি।

প্রায় তিন হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দে এই সভ্যতার মানুষেরা ছিলেন মার্জিত এবং শিক্ষিত। যাঁদের পূর্বপুরুষেরা তারও দু-হাজার বছর আগে এখানে বসবাস আরম্ভ করেন। খ্রিস্টপূর্ব চার হাজার বছরের শেষের দিকেই সুমেরিয়ানরা পাথর খোদাইয়ে সুদক্ষ হয়ে উঠেছিলেন। যার দৃষ্টান্ত উরাকে প্রাপ্ত পাথরের ভাস্কর্য 'হেড অব ইনান্না'। মোজাইকের খচিত শিল্প বা 'ইনলে'তে তাঁদের যে বিশেষ পারদর্শিতা ছিল রঙিন মাটি ব্যবহার করে তৈরি নকল পর্দায় তা প্রমাণিত। উরাকের দরবারের স্তম্ভ সজ্জা আজও তার সাক্ষ্য বহন করে। তিন হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দে সুমেরিয়ান শিল্পীরা শিল্পকলার বহু বিষয়ে দক্ষ হয়ে উঠেছিলেন। তাঁরা পাথরের তৈরি আকর্ষণীয় উপাসনা মূর্তিশিলা তৈরি করেছিলেন যেমনটি দেখা যায় টেল আসমারের আবু মন্দিরের একগুচ্ছ মূর্তিতে। তাঁরা ব্রোঞ্জের মূর্তি তৈরিতে ফাঁপা ঢালাই পদ্ধতিও ব্যবহার করতেন। সুমেরিয়ানদের পাথরের রিলিফ ভাস্কর্যের শ্রেষ্ঠ নমুনা হল রাজার যুদ্ধজয়ের দলিল হিসাবে নির্মিত প্রস্তর-ভাস্কর্য 'স্টেলা অব ভালচারস'। ১৯২০ সালে খনন করা হয় উর-এর রাজসমাধি। সবচেয়ে বিখ্যাত এই সমাধি নির্মিত হয়েছিল খ্রিস্টপূর্ব ২৬০০ সালে। এখানে পাওয়া গেছে সোনা রূপার তৈরি চমৎকার শিল্পকর্ম, একটি 'মেসকালাম-ডাগ'-এর শিরস্ত্রাণ পাওয়া গেছে। পাওয়া

ছবি নং ১৯০ পৃ. ৩৭০

গেছে কাঠের ওপর মোজাইকের খচিত শিল্প। যার নমুনা দেখা গেছে বড়ো বড়ো বীণার ওপরে, তার নিটোল সৌন্দর্য উর-এর মান সম্বন্ধে ধারণা দেয়। এসবের ওপর উৎকীর্ণ নকশার বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণই সুমেরিয়ানদের নিজস্ব সৃষ্টি। এরকম একটি বীণা রয়েছে পেনসিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রহশালায়। নিদর্শনগুলির মধ্যে স্পষ্ট যে দক্ষিণের এই পাথরহীন অঞ্চলে আমদানি করা পাথরের তৈরি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বেলনাকার সিলগুলি খুব জনপ্রিয় ছিল। মেসোপটেমিয়ানরা সুমেরীয় সভ্যতার বহু কিছুকেই হুবহু তৈরি করার চেষ্টা করেছেন কিন্তু সুমেরিয়ানদের দক্ষতা এবং শক্তিকে অতিক্রম করতে পারেননি। * মেসোপটেমিয়ান আর্ট দেখুন।

সুরিয়ালিজ্‌ম (Surrealism)

একটি ফরাসি আভঁ গার্দ শিল্প আন্দোলন। এর উৎস ছিল সাহিত্য। বাংলা পরিভাষা হিসাবে ব্যবহার করা হয় 'অধিবাস্তববাদ' শব্দটি। শব্দ হিসাবে সুরিয়ালিজ্‌ম কথাটি প্রথম ব্যবহার করেন ফরাসি কবি গিয়ম আপোলিনেয়ার। তবে এ বিষয়ে কার্যকারীভাবে সুরিয়ালিস্ট আন্দোলন গড়ে তোলেন অপর এক বিশিষ্ট ফরাসি কবি ও শিল্পতাত্ত্বিক অঁদ্রে ব্রেতোঁ। অঁদ্রে ব্রেতোঁ প্রথম দিকে ছিলেন দাদাবাদী। কিন্তু ১৯২২ সালে ব্রেতোঁ দাদাবাদী চিন্তা থেকে সরে আসেন। ব্রেতোঁ মনোরোগ বিদ্যার একজন ছাত্র ছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন অবচেতন মনের মুক্তি ঘটিয়ে শিল্প এবং জীবনকে নতুন ভাবে সৃষ্টি করা সম্ভব। এরপরই তিনি তাঁর রু ফঁতাঁই-এর স্টুডিয়ো থেকে 'মানিফেস্তো দ্যু সুরেয়ালিজ্‌ম'



নং ২৯৩. রনে মাগরিত : দি হিউম্যান কন্ডিশন। ১৯৩৩। ক্যানভাসের ওপরে তেল রং। ১০০x৮১ সেমি.। আরও ছবি নং ২১৩ পৃ. ৩৮৪

প্রকাশ করেন। এর পূর্বভিত্তি ছিল 'লা রভোল্যুসিওঁ স্যুরেয়ালিস্ত' পত্রিকা। এই স্টুডিয়োতে ব্রেতোঁর অনেক সতীর্থরাও আসেতন। ব্রেতোঁর আন্দোলনে যাঁরা যোগ দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন মাক্স্ এরন্স্ত, অঁদ্রে মাসোঁ প্রমুখ। তাঁরা মনে করেছিলেন যে চিরাচরিত পশ্চিমী সংস্কৃতির জগৎকে দেওয়ার মতো আর কিছু নেই। এর একটা নিশ্চিত ইতি হওয়া দরকার। মনে রাখা দরকার যে এর ঠিক অব্যবহিত পূর্বে ভিয়েনাতে প্রখ্যাত ডাক্তার সিগমুণ্ড ফ্রয়েড মনঃসমীক্ষণ তত্ত্ব আবিষ্কার করে সাইকোঅ্যানালিসিস আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটিয়েছিলেন। ফ্রয়েডের ব্যাখ্যা অনুযায়ী যার মূল কথা হল সচেতন মনের জোরালো প্রভাবে অনেক বিষয় বা স্মৃতি অবচেতন মনের মধ্যে অবদমিত অবস্থায় থাকে। এর স্মৃতিচারণের ক্ষতিকর এবং যন্ত্রণাময় অভিজ্ঞতাকে বলে 'ট্রমাটা'। বিপরীতভাবে যদি রোগীকে সম্মোহিত করে তাঁর পুরোনো স্মৃতিকে জাগিয়ে তোলা যায় তাহলে রোগী আরোগ্য লাভ করে।

এই আবিষ্কারকে ভিত্তি করে ব্রেতোঁ ও তাঁর সহযোগীরা বললেন, নতুন শিল্প সৃষ্টি করতে হলে পুরোনো সংস্কৃতির সঙ্গে বর্তমান সংস্কৃতির নাড়ির যোগাযোগ ছিন্ন করতে হবে জরুরি ভাবে।

যদিও তাঁদের গ্রেকো-রোমান সাংস্কৃতিক যোগসূত্র থেকে শিল্পকে মুক্ত করার প্রয়াস তাঁরাই প্রথম দেখিয়েছেন এমন নয়। দাদাবাদীরাও এমন প্রয়াস দেখিয়েছিলেন। আপোলিনেয়ার অবশ্য বাস্তবতার সীমা ছাড়িয়ে যাওয়াকেই সুরিয়ালিস্ট বলে চিহ্নিত করেছিলেন। অন্যদিকে ব্রেতোঁ তার 'সুরেয়ালিস্ত মানিফেস্তো'-তে এই নতুন আন্দোলন নিয়ে বলেছেন যে, সুরিয়ালিজ্‌মের অর্থ অভিব্যক্তির কোনো সহজ পন্থাকে হাজির করা নয়। অথবা কোনো ভাববাদী কবিতাও নয়। এটা হবে মনের এবং যাবতীয় স্মৃতির সম্পূর্ণ মুক্তির একটি উপায়। সুরিয়ালিস্ট সংজ্ঞায় ব্রেতোঁ বলেছেন— 'Thought expressed in the absence of any control exerted by reason, and outside all moral and aesthetic considerations.' (First Manifesto of Surrealism, 1924) অর্থাৎ যুক্তিনির্ভর কোনো নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই সমস্ত নান্দনিক এবং মানবিক বিবেচনার বাইরেই ভাবনার প্রকাশ ঘটবে।

সংজ্ঞার আরও গুরুত্বপূর্ণ দিক হল—'ENCYCL. *Philos* Surrealism rests on the belief in the superior reality of certain forms of association neglected until now, in the omnipotence of the dream, and in the disinterested play of thought. It aims at the definitive ruin of all other psychic mechanisms and at its substitution for them in the resolution of the principal problems of life. (First Manifesto of Surrealism, 1924)।

স্বভাবতই সুরিয়ালিস্টরা শিল্পে-সাহিত্যে মানুষের অন্তর্জগতের স্বতঃস্ফূর্ত চেতনাকে অর্থাৎ অবচেতনগত অনুভূতি উপলব্ধিকে দিবাস্বপ্নের মতো বাস্তব করে তুলতেন। যেহেতু ব্রেতোঁ একজন র‍্যাডিক্যাল বামপন্থী চিন্তাবিদ ছিলেন, এই নতুন ধারার শিল্পকে তিনি সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিলেন, শুধু সুবিধাভোগী শ্রেণিকে শিক্ষিত করার মধ্যেই আবদ্ধ রাখলেন না। যার ফলস্বরূপ একসময় সুরিয়ালিস্ট আন্দোলন কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি আন্তর্জাতিক বৈপ্লবিক আন্দোলনের রূপ পাবার চেষ্টা করেছিল।

সুরিয়ালিস্টদের মধ্যে দু-ধরনের ঝোঁক লক্ষ করা যায়। একদল যাঁরা সুরিয়ালিজ্‌মকে শুধুমাত্র ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুজগতের অভিঘাতে ব্যক্তিমানসের তাৎক্ষণিক অভিব্যক্তি হিসাবে বুঝেছিলেন, তাঁদের ছবিতে ফুটে উঠল 'স্বয়ংক্রিয়বাদ' বা অটোম্যাটিজ্‌ম। এঁদের মধ্যে আছেন মাসোঁ, মিরো প্রমুখ। আর যাঁরা সুরিয়ালিজ্‌মকে অবচেতন মনের প্রতিবিম্বিত বাস্তব জগতের রূপ হিসাবে দেখাতে চাইলেন তাঁরা হাজির করলেন অদ্ভুত সব রূপকে। এঁরা হলেন, জার্মান শিল্পী অটো ডিক্স, স্প্যানিশ শিল্পী সালভাদোর দালি, ফরাসি শিল্পী ইভ তঁগি, রনে মার্গরিত প্রমুখ।

এছাড়াও মধ্যপন্থী বহু সুরিয়ালিস্ট শিল্পী রয়েছেন। এঁদের অনেকেই সুরিয়ালিস্ট ছবিতে চেনা জগতের নানা বিষয়কে চিত্রিত করেছেন। ১৯৩০-এর পর থেকে এই ঝোঁক বেশি দেখা যায়। তবে এসব ক্ষেত্রে চেনা জগতের উপস্থাপনা ঘটেছে কিছুটা বিকৃতি ঘটিয়ে এবং অস্বাভাবিক পরিবেশের ব্যবহার করা হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত বহু শিল্পী দেশ ছেড়ে আমেরিকায় চলে যান। সেখানে আমেরিকান শিল্পী যথা আরশিলে

গোর্কি, পোলক প্রমুখদের ওপর প্রভাব সৃষ্টি করেন। বিংশ শতাব্দীর মধ্যপর্বের পর বিশ্বের ব্যাপক শিল্পীর কাছে সুরিয়ালিজ্‌ম জনপ্রিয় শিল্পভাষা হয়ে ওঠে। সুরিয়ালিজ্‌মের ব্যাপ্‌কতার মধ্যে শিল্পীরা নানাভাবে নিজেদের স্থান খুঁজে নিয়েছিলেন। পোলকের কথায় এর দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যাবে। ১৯৪৪ সালে পোলক বলেছিলেন— 'আমি বিশেষ করে এঁদের শিল্পের অবচেতনগত উৎসের ধারণার দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলাম। শিল্পীরা নির্দিষ্টভাবে যাই করুন না কেন এই ধারণাটা আমার কাছে আকর্ষণীয় মনে হয়েছিল। পিকাসো এবং মিরোর কাজে আমি সবচেয়ে বেশি মুগ্ধ যা এখনও পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত।' (মডার্ন আর্ট, ইম্প্রেশনিজ্‌ম পোস্ট মডার্নিজ্‌ম, পৃ. ২৪৯-৫০ থেকে ভাষান্তরিত)। মাতিসের সঙ্গে মাসোঁর ১৯৩২ সালে হওয়া কথোপকথন সুরিয়ালিজ্‌মের সঙ্গে অন্যান্য আধুনিক ধারার শিল্পরীতির তফাৎকে বুঝতে বেশ সাহায্য করে।

মাসোঁ : 'আমি মনের মধ্যে কোনোরকম পরিকল্পনা বা প্রতিরূপ ছাড়াই শুরু করি। কেবল আমার আবেগ থেকেই আমি অতি দ্রুত আঁকি বা রং করি। ধীরে ধীরে আমি বস্তু বা ফিগারের যে আভাস দেখতে পাই সেগুলিকে চিহ্নিত করি এবং গড়ে তুলি। আমি এগুলোকে জন্মাতে উৎসাহ দিই, তাদের অর্থ খুঁজে বের করতে চেষ্টা করি এমনকি এরপর আমি কম্পোজিশনটিতে সচেতনভাবে একটা ছন্দ আনতে চেষ্টা করি।'

মাতিস : 'সেটাই কৌতূহলের। আমার ক্ষেত্রে এটা ঠিক উলটো। আমি সবসময় কিছু একটা নিয়ে শুরু করি— একটি চেয়ার, একটি টেবিল— কিন্তু কাজটা যতই এগোতে থাকে ততই এর সম্পর্কে আমার সচেতনতা কমতে থাকে। শেষে আমি প্রায় ভুলেই যাই আমি কী দিয়ে শুরু করেছিলাম।'

আধুনিক শিল্পান্দোলনে সাধারণভাবে দুটো বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। একটার ভিত্তি হচ্ছে শৈলী অন্যটার ভিত্তি হল ধারণা। সুরিয়ালিজ্‌ম যেহেতু ধারণাকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে তাই বিভিন্ন শিল্পীর ছবির রূপকল্পে নানান চেহারা লক্ষ করা যায়।

সুরিয়ালিজ্‌মের বিশিষ্ট শিল্পীদের মধ্যে আছেন ম্যান রে, হানস আর্প (ইনি একসময় দাদাবাদী আন্দোলনে ছিলেন), পরের দিকে যুক্ত হন আঁতোন্যাঁ আরতো, ত্রিস্তান

জারা, মাত্তা, রনে মাগরিত, প্রমুখ। এছাড়াও অনেকের সুরিয়ালিস্ট কাজের ঝোঁক লক্ষ করা যায় তাঁদের মধ্যে আছেন পিকাসো, শাগাল, পল ক্লি প্রমুখ।

ভারতেও বিগত তিন চার দশক ধরে সুরিয়ালিজ্‌ম নিয়ে উল্লেখযোগ্য চর্চা হয়েছে। এক্ষেত্রে বিশিষ্ট শিল্পীরা হলেন বিকাশ ভট্টাচার্য, লক্ষ্মণ গৌড়, এ রামচন্দ্রন, শ্যামল দত্তরায়, ভূপেন খক্কর, ধর্মনারায়ণ দাশগুপ্ত, গণেশ পাইন, অনুপম সুদ, গুলাম মহম্মদ, ওয়াসিম কাপুর, প্রকাশ কর্মকার প্রমুখ।

সেকসিওঁ দ্য'র (Section d'Or) ১৯১২ সালে কিছু ফরাসি কিউবিস্ট শিল্পী প্যারিসের জাকোয়া ভিলোঁর স্টুডিয়োতে জড়ো হন শিল্পশাস্ত্র ও নন্দনতত্ত্বের নানা প্রশ্ন নিয়ে বিতর্ক করতে। এই নামটি সেরকমই একটি বিষয় যা শিল্পকর্ম গঠনের আদর্শ বিভাজনের তত্ত্বকে সূচিত করে। এর অন্তর্ভুক্ত হল শিল্পকর্মের আদলের মাপ এবং আনুপাতিক হার। ১৯১২ সালেই এই গোষ্ঠীর প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। অংশ নিয়েছিলেন মার্সেল দুঁসপ, জ্যাকোয়ে ভিলোঁ, জুঁয়া গ্রি, ফ্রঁসিস পিকাবিয়া, অঁদ্রে লোতে, জঁ মেটজিঙ্গার, অ্যালবার্ট গ্লেইজা, দ্য লা ফ্রেসনাইয়ে, ফেরনেন্দ লেজে এবং রোবের দোলোনে। দোলানে এই গোষ্ঠীতে বর্ণতত্ত্ব এবং তার চর্চা চালু করেছিলেন। এই শিল্পীরা ফিউচারিস্টদের উত্থাপিত প্রশ্ন তথা ছবিতে আন্দোলনকে উপস্থাপিত করার সম্ভাবনা নিয়েও আলোচনা করেছিলেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই গোষ্ঠীর নামের তাৎপর্য হারিয়ে যায় কেন-না এর সঙ্গে যুক্ত শিল্পীরা বেশিরভাগই ভিন্ন ভিন্ন শৈল্পিক রীতির চর্চার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন।

সেকেন্ডারি কালার (Secondary Colour) দুটো প্রাইমারি কালার সমপরিমাণে মিশে যে রং তৈরি করে। যেমন নীল এবং হলুদ মিশে তৈরি হয় সবুজ রং। সবুজ রং হল সেকেন্ডারি কালার। তেমনি লাল ও হলুদ মিলে তৈরি হয় সেকেন্ডারি কালার কমলা রং। একই ভাবে নীল ও লাল মিলে তৈরি হয় বেগুনি। পিগমেন্টের ক্ষেত্রে প্রাইমারি কালার যেমন তিনটে সেকেন্ডারি কালারও ৩টে। বর্ণচক্র দেখলে এটা ভালো করে বোঝা যায়।

সেকো (Secco) মুরাল চিত্রের একটি পদ্ধতি। এটি ট্রু ফ্রেস্কো বা বুয়োন ফ্রেস্কোর বিপরীত। সেকোতে তাজা চুনের নরম পলাস্তরার পরিবর্তে শুকনো এবং শক্ত প্লাস্টার ব্যবহার করা হয়। শক্ত ও শুকনো প্লাস্টারকে চুনজলের দ্রবণ দিয়ে ভিজিয়ে নেওয়া

হয়। তারপর এই ভিজে সারফেসের ওপর ছবি আঁকা হয়। সেকোতে ব্যবহৃত রংও ট্রু ফ্রেস্কোর চেয়ে আলাদা। ট্রু ফ্রেস্কোতে রং গোলা হয় শুধু জল দিয়ে। কিন্তু সেকোতে রং গোলা হয় বাইন্ডার মিশিয়ে। বাইন্ডার হিসাবে রঙে কেসাইন, গ্লু, ডিমের কুসুম প্রভৃতি মেশানো হয়। স্বভাবতই সেকোতে বর্ণস্তর চিত্রপটের ওপর আলাদা পর্দার মতো ভেসে থাকে যা ট্রু ফ্রেস্কোর বিপরীত। উজ্জ্বলতার দিক থেকে সেকোর রং একটু নিষ্প্রভ এবং ম্যাটধর্মী।

সেন্টার অব ইন্টারেস্ট (Centre of interest)

আকর্ষণ কেন্দ্র বা আকর্ষণ বিন্দু। ছবির ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নানান উদ্দেশ্য ও কারণেই এর ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত Contextual বা প্রসঙ্গভিত্তিক ছবির ক্ষেত্রে শিল্পীর লক্ষ্য থাকে উপস্থাপিত দৃশ্য উপাদানের মুখ্য বা গুরুত্বপূর্ণ অংশের দিকে দর্শকের মনোযোগকে টেনে আনা। এই লক্ষ্যে শিল্পী তাঁর ছবির বিভিন্ন উপাদানকে এমনভাবে সংস্থাপিত করেন যাতে সেই সব দৃশ্য-উপাদানকে অবলম্বন করে দর্শকের চোখ যেন ছবির অভিপ্রেত নির্দেশক রূপ বা সূত্রের কাছে পৌঁছে যায়। সেন্টার অব ইন্টারেস্ট অনেক সময় ছবির ভরকেন্দ্র হিসাবেও কাজ করে। সেক্ষেত্রে পয়েন্ট অব ইন্টারেস্ট সৃষ্টি করা হয় বিষয় নিরপেক্ষ ভাবে ছবির আঙ্গিকগত রূপকে ভিত্তি করে। কেন-না অ্যাবস্ট্র্যাক্ট

নং ২৯৪. ভূদৃশ্য : টাস্কি পদ্ধতিতে নেওয়া স্ক্রিন প্রিন্ট। এখানে পরিপ্রেক্ষিত ব্যবহার করে আঁকা রাস্তাটি দর্শকের দৃষ্টিকে ছবির কেন্দ্রের দিকে টেনে নিয়ে যায়।



বা নির্বস্তুক ছবির ক্ষেত্রে পয়েন্ট অব ইন্টারেস্ট বলে কিছু হতে পারে না। কিন্তু এক্ষেত্রেও গোটা ছবির পরিসরে ছড়িয়ে থাকা রং, বুনট বা অন্য উপাদানের ওপর জোর দেওয়া হয়। যাতে উপস্থাপিত নকশা বা ভিশুয়ালটির দিকে দর্শকের নজর আকৃষ্ট হয়।

বেশিরভাগ সাদৃশ্যবাদী ছবিতে একটার বেশিও সেন্টার অব ইন্টারেস্ট থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে একটি সেন্টার অব ইন্টারেস্ট মুখ্য এবং বাকিগুলি তার অধীনস্ত আকর্ষণ কেন্দ্র। শিল্পীরা এইসব সেন্টার অব ইন্টারেস্টগুলিকে এমন কৌশলীভাবে সংস্থাপন করেন যারা দর্শকের নজরকে মুখ্য সেন্টার অব ইন্টারেস্টের দিকে টেনে নিয়ে যায়। এক্ষেত্রে মুল পয়েন্ট অব ইন্টারেস্টকে বলা হয় ফোকাল পয়েন্ট।

সেরা কোলা (Cera Cola)

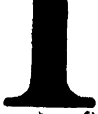
ইটালীয় পরিভাষায় এর অর্থ হল 'ওয়াক্স গ্লু' বা মোম আঠা। আসলে মোম এবং আঠার একটা মিশ্রণ। বাইজেনটাইন এবং এবং ইটালীয় প্রিমিটিভ শিল্পীরা এই মিশ্রণকে টেম্পারা রঙের মাধ্যম বা ভেহিক্ল হিসাবে ব্যবহার করতেন।

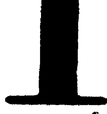
সেরিগ্রাফি (Serigraphy)

স্টেনসিল পদ্ধতিকে ভিত্তি করে সৃষ্ট মুদ্রণ প্রক্রিয়া। এতে কাপড়ের মিহি জালি বা mesh ব্যবহার করা হয়। সাধারণভাবে ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রিন্ট বোঝাতে সেরিগ্রাফ শব্দটি ব্যবহার করা হয় না। সেরিগ্রাফ শব্দটি স্পষ্টতই ব্যবহার করা হয় ফাইন আর্ট প্রিন্ট বোঝাতে। পপ আর্টের শিল্পীরা ব্যাপকভাবে সেরিগ্রাফ ব্যবহার করেছেন। পপ শিল্পী অ্যান্ডি ওয়ারহল এর 'ফ্লাওয়ার' (১৯৬০) সেরিগ্রাফ মাধ্যমের একটি দুর্দান্ত কাজ। ২৪ × ২৪ ইঞ্চি ক্যানভাসে ৪টি একই ঘাসফুলের ছবিকে রং পালটে পালটে স্ক্রিনে ছেপে নিয়ে, সেরকম ২৮টি ক্যানভাস পাশাপাশি ও ওপর নীচে সাজিয়ে একটি অ্যাসেমব্লেজে পরিণত করেছিলেন। ওয়ারহলের এরকম আর একটি সেরিগ্রাফ হল 'ম্যারিলিন মনরো'। একটি ক্যানভাসের মধ্যে এই চিত্রাভিনেত্রীর পোর্ট্রেটকে ছোটো করে পরপর স্ক্রিনে ছেপে একটি বড়ো আকার দেওয়া হয়েছিল। সেরিগ্রাফে এরকম প্রতিকৃতি ছাড়া সৃজনশীল নকশাও ছেপে নেওয়া যায়। * সিল্কস্ক্রিন প্রিন্ট দেখুন।

সেরিফ (Serif)

ইংরেজি হরফের মূল স্ট্রোকের শেষে উপরে ও নীচে উভয়দিকেই যে অনুভূমিক বা তেরচা সরু টান থাকে তাকে বলে সেরিফ। সাধারণভাবে এটা রোমান টাইপের প্রধান


ব্র্যাকেটেড সেরিফ


হেয়ারলাইন সেরিফ


ওয়েজ সেরিফ


স্ল্যাব সেরিফ

বৈশিষ্ট্য। চরিত্র বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে চার ধরনের সেরিফ আছে। যথা— ১. ব্র্যাকেটেড সেরিফ। উদাহরণ— টাইমস্ নিউ রোমান। এই টাইপের সেরিফের দুটো কোণ গোলাকার বা হাফ রাউন্ড অর্থাৎ ')(' ব্র্যাকেট যেমন হয়। ২. হেয়ার লাইন সেরিফ। যার উদাহরণ— বোদোনি। এর সেরিফ সূক্ষ্ম চুলের মতো। ৩. স্ল্যাব সেরিফ। উদাহরণ— রকওয়েল। এর সেরিফ মূল স্ট্রোকের প্রায় সমান মোটা অর্থাৎ দেখতে স্ল্যাব বা পুরু ফলকের মতো। ৪. ওয়েজ সেরিফ। এই সেরিফ দু-দিকে ঢালু। এছাড়াও আদিতে মূল রোমান হরফের সেরিফ হত ঢেউ খেলানো।

সোক-স্টেইন পেন্টিং (Soak-stain technique)

১৯৬৪ সালে এক বিশেষ ধারার চিত্ররীতিকে পোস্টপেন্টারলি অ্যাবস্ট্র্যাকশন বলে অভিহিত করেন বিশিষ্ট মার্কিন সমালোচক ক্লেমেন্ট গ্রিনবার্গ। তার এই বর্গীকরণের মধ্যে অনেক শিল্পীর ব্যক্তিগত শৈলীও অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। সোক-স্টেইন পেন্টিং-এর অন্যতম এই রীতিতে খুব পাতলা রংকে আঠা মাখানো নয় এরকম ক্যানভাসে এমনভাবে লাগানো হয় যে নরম ছোপ ধরা বা চোষ করার মতো ফলাফল তৈরি হয়। আমেরিকান শিল্পী মরিস লুই-এর কাজ এই রীতির প্রধান উদাহরণ।

সোশ্যাল রিয়ালিজ্‌ম (Social Realism)

সাধারণভাবে বলতে গেলে বাস্তববাদী চিত্রকলার একটি শাখা। অর্থাৎ যে শিল্প বাস্তবধর্মী আঙ্গিকে সামাজিক বিষয় সমূহকে উপস্থাপিত করে। কিন্তু এটা সোশ্যালিস্ট রিয়ালিজ্‌ম বা সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ নয়। সোশ্যাল রিয়ালিস্টদের প্রেরণা এসেছিল 'আসকান স্কুল' থেকে। কারণ বহু সোস্যাল রিয়েলিস্ট শিল্পীই আসকান শিল্পীদের সঙ্গে পড়াশুনা করতেন। যদিও অনেক সোশ্যাল রিয়ালিস্ট শিল্পী মার্কসবাদকেই তাঁদের আদর্শ হিসেবে তুলে ধরেছিলেন। আসলে ১৯৩০ সালের দুটো সুনির্দিষ্ট ঘটনা যথাক্রমে বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা এবং ইউরোপে ফ্যাসিবাদের উত্থান আমেরিকার বহু শিল্পীকে বিমূর্তধর্মিতা ছেড়ে বাস্তবধর্মী চিত্রচর্চার দিকে ঠেলে দেয়। 'আঞ্চলিকতাবাদী'দের কাছে এটা হয়ে উঠল আমেরিকান

নং ২৯৫. বেন শাহন : ইয়ার্স অব ডাস্ট। ১৯১৫।



অতীত কৃষি সমাজের প্রায় উগ্র স্বাদেশিকতাবাদী আদর্শরূপের সম্প্রসারণ। অন্যদিকে সোশ্যালিস্ট রিয়ালিস্টরা আরও বেশি সামাজিকভাবে সচেতন শিল্পকলার প্রয়োজন বোধ করলেন। এই শিল্পীদের অনেককেই 'আর্বান রিয়ালিস্টস' হিসাবে গণ্য করা হত। এঁদের মধ্যে ছিলেন বেন শহান, রেজিনাল্ড মার্শ, মোসেস, র‍্যাফায়েল সোয়ের, উইলিয়ম গ্রপার, ইসাবেল বিশপ প্রমুখ। তাঁরা সে সময়ের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক দুরবস্থার জনমূল্য নিয়ে দলিল তৈরি করেছিলেন। এঁদের শিল্পের বিষয়গত কারণেই তৎকালীন বিশিষ্ট আলোকচিত্রী ডরোথি ল্যাং, ওয়াকার ইভান্স, মার্গারেট বোর্কেভ প্রমুখের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপিত হয়। বেন শহ্ন তাঁর অন্যান্য সহযোগীর মতো নিজেও একজন আলোকচিত্রী ছিলেন। ফলে এই শিল্পকলার রিপোর্ট-ধর্মিতা এবং সামাজিক ধারাবিবরণীসুলভ চরিত্র মিলে একটা বলিষ্ঠ রূপ তৈরি হয়েছিল।

বিদেশিদের প্রতি আমেরিকার অহেতুক ভয়জনিত কারণে ১৯৩০-এর গোড়ায় ইতালীয় অভিবাসী নিকোলা স্যাকো এবং বার্তোলোমিয়ো ভেনজেত্তির বিচারের নামে প্রহসন, কারাবন্দি এবং ফাঁসির ছবি এঁকে বেন শহ্ন বিখ্যাত হয়ে গিয়েছিলেন। এই সমস্ত কারণেই সোশ্যাল রিয়ালিস্টসদের সঙ্গে সোশ্যালিস্ট রিয়ালিস্টদের শিল্পকর্মের একটা মিলও ছিল। তবে রাজনৈতিক কারণে তাঁরা সোভিয়েত সোশ্যালিস্টদের থেকে আলাদা মত পোষণ করতেন। যদিও জার্মানির অটো ডিক্স এবং জর্জ গ্রজ-এর কাজের সঙ্গে একটা তুলনা খুঁজে পাওয়া যাবে।

সোশ্যাল রিয়ালিস্টদের ওপর মেক্সিকান মুরাল আন্দোলনেরও প্রভাব ছিল বিশেষ করে এই কারণে যে দিয়েগো রিভেরা, জেশে ক্লেমেন্ট অরোজকো, ডেভিড সিকেরাস প্রমুখেরা আমেরিকায় সামাজিক বিষয়ভিত্তিক বহু বড়ো বড়ো মুরাল তৈরি করেছিলেন। ১৯৪০-এর গোড়ায় সোশ্যাল রিয়ালিস্টদের সৃষ্ট অ্যাবস্ট্র্যাক্ট এক্সপ্রেশনিজ্‌ম দর্শক সমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

সোশ্যালিস্ট রিয়ালিজ্‌ম (Socialist Realism)

তথাকথিত 'নিরপেক্ষ মতাবলম্বীরা' সোশ্যালিস্ট রিয়ালিজ্‌মকে ১৯২৫ সালের পরবর্তীকালে অর্থাৎ জোশেফ স্তালিনের সময়ের সোভিয়েত ইউনিয়নে সরকারিভাবে প্রবর্তিত দলীয় শিল্প (Party art) ধারা হিসাবেই চিহ্নিত করে থাকেন। এর নিন্দুকেরা একধাপ এগিয়ে আরও তীক্ষ্ণ ও তির্যক ভাষায় একে বর্ণনা করেছেন। 'Impressionism is painting what you see, Expressionism is painting what you feel, and Socialist Realism is painting what you hear' (অর্থাৎ ইম্প্রেশনিজ্‌ম যা তুমি দেখ তাই আঁকে, এক্সপ্রেশনিজ্‌ম তুমি যা অনুভব কর তাই আঁকে আর সোশ্যালিস্ট রিয়ালিজ্‌ম যা তুমি শুনতে পাও তাই আঁকে) এই উদ্ধৃতিটি ব্যবহার করেছিলেন পেঙ্গুইন আর্ট অ্যান্ড আর্টিস্টস ডিকশনারির রচয়িতা পিটার এবং লিন্ডা মারি তাঁদের বইতে। কিন্তু ত্রুটিবিচ্যুতি থাকলেও বিশ্বশিল্পে সোশ্যালিস্ট রিয়ালিজ্‌মের অবদান অসামান্য। কেন-না সাধারণ মানুষের জীবনকে শিল্পে তুলে ধরার সংগঠিত প্রচেষ্টা এই প্রথম।

প্রচারধর্মিতা সব যুগের শিল্পের অন্যতম সাধারণ



নং ২৯৬. ভেরা মুখিনা। শিল্পশ্রমিক ও সমবায় খামারের মেয়ে। ১৯৩৭। ব্রোঞ্জ। রাশিয়া। আরও ছবি নং ১৯২ পৃ. ৩৭১

লক্ষণ। প্রতিটি যুগের শিল্পকলার মূলধারার দিকে লক্ষ করলেই দেখা যাবে যে সেই যুগের সাধারণ বিশ্বাস, দর্শন, প্রধান ধর্মীয় ঝোঁক, রীতিনীতি, রাজনীতি, সামাজিক নিয়মকানুনের বার্তাগুলিই সেই শিল্পে স্থান পেয়েছে। আবার শিল্পকলার ধারকবাহক পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে অনেক সময় পরমত অসহিষ্ণুতাও লক্ষ করা গেছে যা চিরকাল নিন্দিত হয়েছে। সৃজনের ক্ষেত্রে উদারতাই সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা। ফলে সাধারণ ত্রুটি ছাড়া অন্য কোনো নিন্দাপ্রবণ সমালোচনা যুক্তিপূর্ণ নয়।

সোশ্যালিস্ট রিয়ালিজ্‌মের উৎস ছিল সোশ্যাল রিয়ালিজ্‌মের মধ্যে। তাই তত্ত্বগত দিক থেকে এটা নতুন কোনো বিষয় নয়। কিন্তু ১৯১৭ সালে নভেম্বর বিপ্লবের মধ্য দিয়ে সোভিয়েত নতুন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠিত হলে

তৎকালীন আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পরিস্থিতিতে এই শিশুরাষ্ট্রকে বাঁচিয়ে রাখা ও বিকাশ ঘটানোর ক্ষেত্রে কিছু বাধ্যবাধকতা ও দায়বদ্ধতাও সৃষ্টি হয়েছিল অবশ্যম্ভাবীভাবে। এরকম একটি পরিস্থিতিতে ১৯৩৪ সালে মস্কোতে সোভিয়েত লেখক সংঘের প্রথম কংগ্রেসে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার নীতি ঘোষণা করা হয়েছিল। এর অন্যতম স্থপতি ছিলেন আন্দ্রেই ঝানভ। এর পরে পরেই শিল্পের অন্যান্য শাখাগুলোও এধরনের মহাসম্মেলন করে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার নীতি গ্রহণ করেছিল। যার মূল কথা ছিল 'Artistic Portrayal must be in harmony with the objective of the ideological alteration and education of the workers' (Statute of the union of Soviet writers 1934) তৎকালীন সোভিয়েতে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার নীতি ও তার প্রয়োগে কড়াকড়ি নিয়ে কিছু বিতর্ক থাকতে পারে। শিল্পের ক্ষেত্রে এধরনের কড়াকড়ি সংগত কি না তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। বিশেষ করে শিল্পীর স্বাধীনতার প্রশ্নে এধরনের দৃষ্টিভঙ্গি কতখানি বাঞ্ছিত তাও তর্কের বিষয়। কিন্তু যান্ত্রিকভাবে এ নিয়ে আলোচনা করা উচিত নয়। কেন-না নবগঠিত রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং বুর্জোয়াতন্ত্রের বিরুদ্ধে সমাজতান্ত্রিক নীতির লড়াইয়ের প্রশ্নে একটা রাজনৈতিক ও আদর্শগত বাধ্যবাধকতা থাকাটা অস্বাভাবিক নয়। নতুন রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সারা পৃথিবীর সমাজতান্ত্রিক রাজনীতি ও দর্শনবিরোধী শক্তি সক্রিয় ছিল। তার নানা তথ্য রয়েছে। এসব প্রতিরোধের প্রধানতম শক্তি হতে পারে মানুষের চেতনা ও মনন। তাই নতুন রাষ্ট্রের গণমুখী নানা কাজকে প্রচারের আলোয় নিয়ে আসার জন্য শিল্পীরা তুলি ধরেছিলেন। শুধু প্রচারধর্মী শিল্পই নয়। সৃজনশীল শিল্পেও এই নতুন ব্যবস্থা ও দর্শন প্রভাব ফেলেছিল। তার দৃষ্টান্ত কিছুটা অন্তত দেখতে পাওয়া যাবে লেনিনগ্রাদের অরোরা প্রকাশনী প্রকাশিত 'Art of the October Revolution' এবং 'The Soviet Character' নামক অ্যালবাম দুটিতে।

সোশ্যালিস্ট রিয়ালিজ্‌মের শিল্পকলা ভাস্কর্য সদর্থকভাবেই বাস্তবধর্মী। এর আর একটি বৈশিষ্ট্য হল এই ধারায় বেশিরভাগ শিল্পই আয়তনের দিক থেকে মনুমেন্টাল। এর মানুষজন বেশিরভাগই বীরোচিত ভঙ্গির এবং আশাবাদী।

এসময়ের বিশিষ্ট রুশ শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন ইসাক ব্রড্স্কি, আলেক্সান্দার দেইনিকা, আলেক্সান্দার গেরাসিমভ, সেরগেই গেরাসিমভ, আলেক্সান্দার ল্যাকটিমভ, রবিস ভ্লাদিমির্স্কি, ভেরা মুখিনা প্রমুখ। ভেরা মুখিনার নির্মিতি একটি ভাস্কর্য প্রায় আইকনে পরিণত হয়েছে। সেটি হল ১৯৩৭ সালে নির্মিত 'কারখানার শ্রমিক ও সমবায় খামারের নারীকর্মী।' সোভিয়েত ইউনিয়নের বাইরেও এই আদর্শে বিশ্বাসী বহু শিল্পী কাজ করেছেন। বিশেষ করে ইউরোপের অন্যান্য দেশে যেমন ইতালি, জার্মানিতে। একথাও ঠিক যে সোভিয়েত সোশ্যালিস্ট রিয়ালিস্ট শিল্পীদের খানিকটা সংকীর্ণতা ছিল। মার্কসবাদী দর্শনের যে শ্রেণির ধারণা আছে, সেই শ্রেণির সৎ আত্মসমালোচনার প্রতিফলনও শিল্পে থাকা দরকার সামাজিক বিকাশের স্বার্থে অন্যথায় গোটা বিষয়টি একদেশ-দর্শিতায় পর্যবসিত হবার সম্ভাবনা তৈরি হয়। কিন্তু এদিক থেকে দেখলে কমিউনিস্ট আদর্শবাদী ইতালীয় শিল্পী রেনাতো গুতাসো, আর্নেস্তো ত্রিসানি, লরেঞ্জো ভেসপিগনানি, গুসেপ্পি জিগাইনা প্রমুখরা তাঁদের রুশীয় সতীর্থদের চেয়ে মৌলিক ভাবে কাজ করেছেন ঐতিহাসিক দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন থেকেই। ইতালির শিল্পীরা সোশ্যালিস্ট রিয়ালিজ্মের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য মনুমেন্টালিটি থেকে গিয়ে, শুধুমাত্র আদর্শের গূঢ়ার্থকে বর্ণনা করার পরিবর্তে প্রলেতারিয়তদের সংগ্রাম এবং বুর্জোয়া সমাজের সংকটকে তুলে ধরেছিলেন। ১৯৪৭ সালে পিয়েরো দোরাজিয়ো, গিউলিয়ো তারকাতো, কারলা আকারদি, অ্যান্তোনিয়ো সানফিলিপ্পো, লুসিয়ো ফনতানা, উগো আতারদি, কনসেত্তো মগেরি, পিয়েরো কনসেগ্রা সহ বেশ কয়েকজন শিল্পী মিলে 'Forma Uno' বা ফর্ম ওয়ান গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁরা দৃঢ়ভাবে মনে করতেন শিল্পীদের কমিটেড হতে হবে এবং সমাজ কাঠামোয় অংশ নিতে হবে। সেই সঙ্গে তাঁরা এও মনে করতেন কমিটেড হলেও শিল্পীদের নিজের ভাষা সন্ধানের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা থাকতে হবে।

আমেরিকা মহাদেশের মেক্সিকোতে ১৯১০ সালের বিপ্লবের পর নবগঠিত সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় বেশ কয়েকজন প্রতিথযশা শিল্পী সোশ্যালিস্ট রিয়ালিজ্মের ধারায় চিত্র চর্চা করতে আরম্ভ করেন। এই রীতিতে তাঁরা বড়ো বড়ো মুরালও নির্মাণ করেন। এই শিল্পীরা অনেকেই তাঁদের

উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন মেক্সিকোর প্রাচীন ইতিহাস ও সভ্যতা থেকে। এইসব শিল্পের লক্ষ্য একদিকে যেমন ছিল প্রাক্তন শাসক ভূস্বামী সম্প্রদায়ের উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে কৃষক ও সাধারণ মানুষের লড়াইকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া তেমনি নবগঠিত রাষ্ট্রের গণমুখী প্রকল্পের বিকাশের স্বার্থে সহায়তা করা। এই শিল্পীদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন রিভেরা, অরোজ্‌কো, সিকেরাস প্রমুখ।

সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্ট (Society of Oriental Art) দি ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্ট। কথ্যভাষায় ওরিয়েন্টাল আর্ট সোসাইটি। বর্তমানে পার্ক স্ট্রিটের এ পি জে হাউসের পঞ্চমতলে অবস্থিত। প্রথম যখন গড়ে ওঠে তখন এর নাম ছিল আর্ট সোসাইটি। ঠিকানা ছিল কর্পোরেশন স্ট্রিটের হিন্দুস্থান বিল্ডিংস। পরবর্তীকালে সরকারি অনুদান পেয়ে স্থানসংকুলানের জন্য কলকাতার সমবায় ম্যানসন অর্থাৎ আজকের ফুটনানি চেম্বারর্স-এ একটা অংশ নেওয়া হয়। পরে আর্থিক কারণে এই বাড়িটিও ছেড়ে দিয়ে ওয়েলিংটনে একটা ছোটো বাড়ি নিতে হয়। ভাড়া দিতে না পেরে সেটিও ছাড়তে হয়। পরে শ্রীমতী ঠাকুর (সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী) এবং শিল্পী গোপেন রায় প্রায় বন্ধ সোসাইটিকে ধীরে ধীরে পুনরুজ্জীবিত করে খ্যাতিতে ফিরিয়ে আনেন। ওয়েলিংটন স্কোয়ারের বাড়ি থেকে পার্ক স্ট্রিটের আর্টিস্ট্রি হাউস' নামে একটি বাড়িতে স্থানান্তরিত হয়। ১৯৭২ সালে এই বাড়িরই মালিকানা বদল হলে নাম পাল্টে হয় এ পি জে হাউস। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় যে নব্য ভারতীয় চিত্রকলা আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটিয়েছিলেন তার সুসংহত রূপদানের পেছনে ছিল এই মহৎ প্রতিষ্ঠানটির তিন দশক ব্যাপী বহুমুখী প্রয়াস। এর আগে ই. ভি. হ্যাভেলকে ঘিরে 'আর্ট সোসাইটি' নামে কলকাতায় ইংরেজ শিল্প রসিকদের একটা ক্লাব ছিল। এরই পাশাপাশি অবনীন্দ্রনাথ ও আরও কয়েকজন মিলে ১৯০৫ সালে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বঙ্গীয় কলা সংসদ। দুজন মুখ্য ব্যক্তিত্বের অনুপস্থিতির কারণে এই দুটো প্রতিষ্ঠানই বন্ধ হয়ে যায়। হ্যাভেল কলকাতা ত্যাগ করলে যেমন আর্ট সোসাইটি বন্ধ হয়ে যায় তেমনি বঙ্গীয় কলা সংসদ বন্ধ হয়ে যায় অবনীন্দ্রনাথ সরকারি আর্ট স্কুলের চাকুরিতে যোগ দেবার ফলে। স্বভাবতই কলকাতায় দেশি ও বিদেশি শিল্প

ছবি নং ২১২ পৃ. ৩৮৩

রসিকরা নতুন একটি আর্ট সোসাইটি গড়ার প্রয়োজন অনুভব করলেন। বিশেষ করে 'ল্যান্ড হোল্ডার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গল'-এর সভাগৃহে সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক অনুষ্ঠিত অবনীন্দ্রনাথ সহ কয়েকজনের ছবি এবং ওকাকুরার উদ্যোগে প্রাপ্ত জাপানি উডকাট-এর ছবির এক সফল প্রদর্শনীর পর। এরকম একটা পরিস্থিতিতে অবনীন্দ্রনাথের আহ্বানে তাঁরই আর্টস্কুলে ১৯০৭ সালের ৬ এপ্রিল কলকাতার বিশিষ্ট কয়েকজন শিল্পরসিক এক সভায় সমবেত হন। এইসভাতেই গঠিত হয় 'দি ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্ট'। সভাপতি নির্বাচিত হন লর্ড কিচেনার, সহসভাপতি হন বিচারপতি রবার্ট র‍্যাম্পিনি, যুগ্মসম্পাদক নির্বাচিত হন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং সিনক্লেয়ার অ্যান্ড মারে কোম্পানির সিনিয়র পার্টনার নর্মান ব্লান্ট। এছাড়াও উল্লেখযোগ্য যাঁরা যুক্ত ছিলেন তাঁরা হলেন গগনেন্দ্রনাথ, বিচারপতি উডরফ, রুবেনসন ও মোলার নামে সুইডেনের দুজন বিশিষ্ট অধিবাসী, অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় এবং একজন ইংরেজ কারিগর এডওয়ার্ড থনটন। সোসাইটি যে উদ্দেশ্য ও কর্মসূচি ঘোষণা করে তা হল— সদস্যদের সংগৃহীত প্রাচীন ও আধুনিক কালের ওরিয়েন্টাল আর্টের যেসব নিদর্শন আছে তার সাহায্যে সোসাইটির সদস্য এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে ওরিয়েন্টাল আর্টের বিষয়ে জ্ঞানসঞ্চার এবং আগ্রহ সৃষ্টি করা এবং একই লক্ষ্যে সাধারণের জন্য শিল্পকলা বিষয়ে আলোচনা সভার আয়োজন, শিল্প বিষয়ক পত্রপত্রিকা প্রকাশ, চিত্র প্রদর্শনীর উদ্যোগ নেওয়া ইত্যাদি। এই পথ ধরেই বাৎসরিক প্রদর্শনীতে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁর সতীর্থদের ছবির প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। সমকালীন দৈনিক ও অন্যান্য সাময়িক পত্রিকাতে সেসব প্রদর্শনীর সংবাদ গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশিত হতে শুরু করে। ফলে মানুষের মধ্যে অবনীন্দ্রনাথ তথা ওরিয়েন্টাল আর্ট সোসাইটির কাজকর্মের বার্তায় নব্যভারতীয় চিত্রকলার রীতিও জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এরই পাশপাশি সোসাইটি নব্যভারতীয় চিত্ররীতির শিল্পীদের উৎসাহ দেবার লক্ষ্যে বৃত্তি চালু করে। শিল্পীদের আঁকা ছবির প্রদর্শনীর সীমা কলকাতা ছাড়িয়ে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল হয়ে ক্রমে বিদেশেও প্রসারিত হয়। ১৯১৪ সালে ভারতপ্রেমী ফরাসি শিল্পী আঁদ্রে কার্পেলের উদ্যোগে প্যারিসে নব্যভারতীয় শিল্পরীতির ছবির এক পূর্ণাঙ্গ প্রদর্শনী

অনুষ্ঠিত হয়। প্যারিসের সমস্ত বিখ্যাত পত্রিকা সহ শিল্পকলা বিষয়ক পত্রিকায় এই প্রদর্শনী উচ্ছ্বসিতভাবে অভিনন্দিত হয়। যার ঢেউ এসে পড়ে কলকাতাতেও। রয়টারের সাংবাদিকের প্রেরিত যে সংবাদ 'দ্য স্টেটসম্যান' পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল তার শিরোনাম ছিল—'Exhibition of Indian Paintings in Paris— The triumph of Abanindranath.'

সোসাইটি শুধু ভারতীয় বা প্রাচ্যের শিল্পকলাতেই আবদ্ধ থাকেনি। তাই দেখা যায় ১৯২২ সালে সোসাইটির চতুর্দশ বার্ষিক প্রদর্শনীতে আধুনিক জার্মান চিত্রকলার প্রতিনিধিত্বমূলক একটি বিভাগ রাখা হয়েছিল। এখানে বাউহাউসের সঙ্গে যুক্ত শিল্পী যথা ভ্যাসিলি ক্যান্ডিন্স্কি, পল ক্লি, লিয়োনেল ফেনিনজার প্রমুখের প্রিন্ট রাখা হয়েছিল। ভারতে ইউরোপীয় শিল্পকলার প্রদর্শনী সম্ভবত এটাই প্রথম। এভাবে সোসাইটির কার্যক্রমেরও প্রসার ঘটতে থাকে। ১৯১৯ সালে বাংলার গভর্নর লর্ড রোনাল্ডসের পৃষ্ঠপোষকতায় সোসাইটি প্রায় ২০ হাজার টাকা সরকারি অনুদান পায়। অবনীন্দ্রনাথ এবং গগনেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে সোসাইটির কাজকর্মের আরও অগ্রগতি ঘটে। ধর্মতলার সমবায় ম্যানসনের বাড়িতে চালু হয় শিল্প বিদ্যালয়। শিক্ষক ছিলেন নন্দলাল বসু এবং ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার। পরে নন্দলাল বসু স্থায়ীভাবে শান্তিনিকেতনে চলে গেলে ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার প্রধান শিক্ষক হন। তাঁর কাছেই ছাত্ররা শিক্ষালাভ করেছেন পরবর্তী বছরগুলিতে। পাশাপাশি অবনীন্দ্রনাথ ও গগনেন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ্য তত্ত্বাবধান তো ছিলই। এই সময় অর্থাৎ বিশ আর ত্রিশের দশকের অবনীন্দ্ররীতির দ্বিতীয় পর্বের কৃতী ছাত্ররা ছিলেন দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরি, মুকুলচন্দ্র দে, বীরেশ্বর সেন, চিন্তামণি কর, প্রাণকৃষ্ণ পাল, চঞ্চল কুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রমোদ কুমার চট্টোপাধ্যায় ও চৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। অবনীন্দ্র রীতির ছাত্ররা ভারতের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েন এবং এই রীতির শিল্পচর্চার প্রসার ঘটে। উল্লেখ্য যে দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরি মাত্র উনিশ বছর বয়সে মাদ্রাজের সরকারি আর্ট স্কুলে সহকারী অধ্যক্ষ পদে যোগ দেন এবং কুড়ি বছর বয়সেই অধ্যক্ষপদে উন্নীত হন।

এই সময়ই অর্থাৎ ১৯১৯ সালে সোসাইটির মুখপত্র

'রূপম' আত্মপ্রকাশ করে। সম্পাদনা করেন অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়। অতুলনীয় সচিত্র ত্রৈমাসিক এই পত্রিকায় পৃথিবীর সেরা প্রাচ্যকলা বিশারদদের রচনা সংকলিত হত। এর মধ্য দিয়ে ভারত সহ অন্যান্য প্রাচ্য দেশীয় কলাশিল্পের গবেষণা ক্ষেত্রেও প্রভূত অগ্রগতি ঘটে। রূপম পত্রিকার মাধ্যমে নব্যভারতীয় শ্রৈলীর শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের সঙ্গে ছবির পৃথিবীর নানা দেশের শিল্পরসিকদের পরিচয় ঘটে এবং এই পত্রিকার সূত্র ধরেই অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের উদ্যোগে ১৯২৭ সালে ধারাবাহিকভাবে আমেরিকার ৫২টি শহরে এবং কানাডায় নব্যভারতীয় চিত্রকলার এক নির্বাচিত প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই পত্রিকায় বিশ-এর দশকে বঙ্গীয় চিত্রকলার গতিপ্রকৃতি ও বিকাশের পথ নিয়ে এক বিতর্ক উঠেছিল বিশেষ তৎকালীন বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী বিনয় সরকারের এক প্রবন্ধকে কেন্দ্র করে। ১৯২২ সালে 'রূপম'-এ বিনয় কুমার সরকারের প্রবন্ধ 'The Aesthetics of Young India'-কে কেন্দ্র করে এই বিতর্কের সূত্রপাত ঘটে। কেন-না বিনয় কুমার সরকার ছিলেন ইউরোপের আধুনিক শিল্পকলার বিভিন্ন আন্দোলনের প্রতি শ্রদ্ধাবান। তিনি মনে করতেন দেশ জাতি নিরপেক্ষে মানব জাতির শ্রেষ্ঠ নান্দনিক কীর্তিগুলোকে গ্রহণ করা কর্তব্য। কিন্তু 'সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্ট'-এর শিল্পীদের কাজে তা ছিল বিজাতীয়তাকে বরণের সমার্থক। সোসাইটির 'শিল্পীদের শিল্পকর্মে হিন্দু আধ্যাত্মিকতা ও হিন্দু জাতীয়তাবাদের আধিক্য ও প্রাবল্য' সম্পর্কে অনেক সময় অনুযোগ উঠতে দেখা গেছে। তার জন্য এর শিল্পীদের ওপর হ্যাভেল, স্যর জর্জ উডরফ এবং বিশেষ করে নিবেদিতার প্রভাব অনেকটাই দায়ী। কেন-না নিবেদিতার 'ভারতপ্রেম ও হিন্দু রক্ষণশীলতা যেন সমার্থক হয়ে গিয়েছিল।' একথা নন্দলাল বসুর নিজের লেখাতেও স্বীকৃত হয়েছে। 'Yes, the sister gave instruction to Mr. E. Havell on art. It seems me that she made Havell understand the viewpoints of the Indian Aesthetics and Philosophy of Art.' (Life & Works of Dr. Bhupendranath Dutta. page 191)

আরও লক্ষণীয় হল যে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, যিনি সে সময়ের শিল্পসাহিত্যের জগতের সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব, যিনি জোড়াসাঁকোতে ঐতিহাসিক 'বিচিত্রা আর্ট'

ক্লাব প্রতিষ্ঠায় সবরকম সাহায্য ও সহযোগিতা করেছিলেন তিনি কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে ওরিয়েন্টাল আর্ট সোসাইটির সামনের সারিতে ছিলেন না। এর কারণও হতে পারে ওরিয়েন্টাল আর্ট সোসাইটির ঘোষিত শিল্প-ভাবাদর্শ ও লক্ষ্য রবীন্দ্রনাথের পছন্দ হয়নি। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য ছিল 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির যথার্থ সমন্বয় হোক।' এসব বিতর্ক বাংলার শিল্পকলার চর্চার ওপর ভালো রকম প্রভাব সৃষ্টি করেছিল। এসবের পাশাপাশি সোসাইটির কাজকর্মও চলতে থাকে। চলতে থাকে শিল্প শিক্ষাদানের কাজও। উড়িষ্যায় পরম্পরাগত কাঠখোদাইয়ের শিল্পী গিরিধারী মহাপাত্র এখানে কাঠের ভাস্কর্য গড়ার কাজ শেখাতেন। ক্ষিতীন্দ্রনাথের পর শিক্ষকতা করতেন চিত্রশিল্পী গোপাল ঘোষ।

বর্তমানে এই সোসাইটির বয়স একশো বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। এখানে এখনও প্রতিদিন শিল্পশিক্ষার ক্লাস হয়। দূরদূরান্ত থেকে ছাত্রছাত্রীরা শিল্পশিক্ষার পাঠ নিতে আসে। অন্যান্য নিয়মিত বিষয়ের সঙ্গে এখানে পাওয়া যায় প্রাচ্য ঘরানায় শিল্পচর্চা বিশেষ সুযোগ।

সোসাইটি অব কনটেম্পোরারি আর্টিস্টস
(Society of Contemporary Artists)

সমকালীন শিল্পীদের একটি সংগঠন। শিল্পীদের প্রথম সর্বভারতীয় সংঘ ওরিয়েন্টাল আর্ট সোসাইটির কাজকর্ম স্তিমিত হয়ে আসার পরে এবং পঞ্চাশের দশকের শেষের দিকে ক্যালকাটা গ্রুপও বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তখনকার তরুণ শিল্পীদের মধ্যে এক ধরনের শূন্যতা বিরাজ করছিল। যা আরও বেশি করে অনুভূত হচ্ছিল সমকালীন পৃথিবীর যুদ্ধোত্তর সময়ের নানা জটিলতা, অর্থনৈতিক সংকট, সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, রাজনৈতিক টানাপোড়েন,জীবনবোধের ভাঙন ইত্যাদির জন্য এসমস্ত কারণে তরুণ শিল্পীদের মধ্যে যখন গোষ্ঠীবদ্ধ হবার একটা প্রবণতা তৈরি হচ্ছিল। শিল্পীদের মধ্যে যেমন এক ধরনের বিচ্ছিন্নতার উপস্থিতি ছিল তেমনি অভাব ছিল আধুনিক শিল্পচর্চার প্রয়োজনীয় পরিবেশ, ভাষা, আন্দোলনের সহায়ক শক্তির। ঐতিহ্য ও শিল্পসৃজনের অন্তরশক্তি প্রেরণায় একান্ত ঘনিষ্ঠ শিল্পীরা ছোটো ছোটো গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে নানা নামে প্রদর্শনীও করছিলেন। নিখিল বিশ্বাস, শ্যামল দত্তরায় প্রমুখদের নিয়ে তৈরি হয়েছিল 'চিত্রাংশু' বা অরুণ বোস, সনৎ কর, সুকান্ত বোস প্রমুখদের নিয়ে গড়ে উঠেছিল 'আর্টিস্ট সার্কেল'। এরকম একটি পরিস্থিতিতে

১৯৬০ সালের গোড়ার দিকে কার্টুনিস্ট ও শিল্পসমালোচক অহিভূষণ মালিক সাবেক বঙ্গসংস্কৃতি সম্মেলনে বেশ কিছু তরুণ শিল্পীর ছবি নিয়ে এক প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। প্রদর্শনীটি অভাবনীয় সাফল্য লাভ করে। তখন তিনি এই প্রদর্শনীটিকে মুম্বাইয়ের জাহাঙ্গির আর্ট গ্যালারিতে পুনঃপ্রদর্শনের ব্যবস্থা করেন। জাহাঙ্গির আর্ট গ্যালারিতে এই প্রদর্শনীর উদ্‌বোধন করেন তৎকালীন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী ওয়াই. বি. চ্যবন। মুম্বাইতেও এই প্রদর্শনী সাড়া ফেলে দেয়। তখন এই প্রদর্শনীতে অংশ গ্রহণকারী শিল্পীদের নিয়ে অন্যতম অংশগ্রহণকারী শিল্পী অনিলবরণ সাহার বাড়িতে প্রাথমিকভাবে এই সমিতি গঠিত হয়। সমিতির নামে প্রথম প্রদর্শনীটি অনুষ্ঠিত হয় অধুনা লুপ্ত 'আর্টিস্ট্রি হাউস' গ্যালারিতে ১৯৬০-এর ২০ নভেম্বর থেকে ৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত। এই প্রদর্শনীতে যোগদানকারী শিল্পীরা ছিলেন— অনিলবরণ সাহা, স্মরুণ বোস, বিজন চৌধুরী, কমলা রায়চৌধুরি, প্রকাশ কর্মকার, সনৎ কর, শৈলেন মিত্র, শ্যামল দত্তরায়, অরুণাভ দত্ত, দীপক ব্যানার্জি, নমিতা দত্ত, রেবা হোর, রঘুনাথ সিংহ, সত্যসেবক মুখার্জি, শর্বরী রায়চৌধুরি এবং সোমনাথ হোর। প্রখ্যাত শিল্প সমালোচক প্রণবরঞ্জন রায় এই দলের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। ১৯৬১ সালের এপ্রিলে কলকাতার 'আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ' গ্যালারিতে অনুষ্ঠিত হয় দ্বিতীয় প্রদর্শনী। এই প্রদর্শনীতে যোগ দেন অনিতা রায়চৌধুরি, কার্তিক পাইন এবং শ্যামশ্রী ঘোষ। যদিও এঁরা পরে আর সোসাইটির সঙ্গে থাকেননি। অবশ্য বিজন চৌধুরী, কমলা রায়চৌধুরি, প্রকাশ কর্মকার, অরুণাভ দত্ত, নমিতা দত্ত, শর্বরী রায়চৌধুরি প্রমুখরাও প্রথম প্রদর্শনীর পরে আর এই দলে ছিলেন না। এর পরে বিভিন্ন সময়ে আরও অনেকে এই দলে যোগ দেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন অজিত চক্রবর্তী, গণেশ পাইন, বিকাশ ভট্টাচার্য, মনু পারেখ, লালুপ্রসাদ সাউ, ধর্মনারায়ণ দাশগুপ্ত, মনু রাঠোর, অমিতাভ ব্যানার্জি, সুশীল গুপ্ত, বি. আর. পানেসার, মানিক তালুকদার, আদিত্য বসাক, অশোক ভৌমিক, মনোজ দত্ত, মনোজ মিত্র, সাধন চক্রবর্তী, সুনীল কুমার দাস এবং আরও অনেকে। সেই সময় অজিত চক্রবর্তীর ১৫৭বি, লেনিন সরণির স্টুডিয়োটি সোসাইটির মূল কেন্দ্র হিসাবে গড়ে ওঠে। ১৯৬২-তে এই স্টুডিয়োতে প্রিন্টমেকিং-এর ওয়ার্কশপ স্থাপিত হয়। স্বাধীনতার পরে কলকাতা তথা ভারতের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের

বাইরে ছাপাই ছবির ক্ষেত্রে এটাই এই সোসাইটির প্রথম সংগঠিত উদ্যোগ। সেই থেকে বলা যায় কলকাতা তথা ভারতে শিল্পকলা চর্চার ক্ষেত্রে শীর্ষস্থানীয় শিল্পীদের অন্যতম প্রতিষ্ঠানটি ধারাবাহিকভাবে উল্লেখযোগ্য কাজ করে যাচ্ছে।

স্যান্ড পেন্টিং (Sand painting) রঙিন বালি দিয়ে তৈরি নকশা। সাধারণ ভাবে এইসব নকশা ধর্মীয় বিষয়াশ্রয়ী। রঙিন বালির এই নকশা আসলে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের অঙ্গ। প্রাচীন যুগে উত্তর আমেরিকান আদিম উপজাতিশ্রেণির মানুষ তথা আমেরিকান ইন্ডিয়ান, তিব্বতি, জাপানি, অস্ট্রেলিয়ান আদিম অধিবাসীরা এইসব নকশা বানাতেন। এই নকশা ক্ষণস্থায়ী। প্রত্যেক বার অনুষ্ঠানের আগে আবার নতুন করে এই নকশা তৈরি করতে হয়। একে ড্রাই পেন্টিংও বলা হয়।

স্কাল্পচার (Sculpture) বাংলায় ভাস্কর্য। এর সাধারণ ব্যাখ্যা হল শক্ত (glyptic) বা নরম (plastic) পদার্থ দিয়ে গঠিত ত্রি-মাত্রিক কোনো শিল্পকর্ম। আভিধানিক ভাষায় খোদাইকার্য বিশেষ করে পাথর কেটে তৈরি শিল্প এবং আর একটু এগিয়ে যাকে মাটি বা ওই জাতীয় পদার্থ দিয়েও গড়া যেতে পারে কিংবা ঢালাই করেও তৈরি করা যেতে পারে। এটা সাদৃশ্যপূর্ণ বা বিমূর্ত এবং উপযোগিতামুলক বা অনুপযোগিতামূলক দুইই হতে পারে। সাধারণভাবে ভাস্কর্য বা স্কাল্পচার দু-রকম। মডেলিং এবং কার্ভিং। যেসব ভাস্কর্য প্লাস্টিক বা মাটি জাতীয় পদার্থ দিয়ে তৈরি তাকে বলে মডেলিং। আর গ্লিপটিক বা কাঠ, পাথর জাতীয় পদার্থকে খোদাই করে তৈরি করাকে বলে কার্ভিং। এ সত্ত্বেও স্কাল্পচারের সীমানা অনির্দিষ্ট। বিংশ শতাব্দীতে ভাস্কর্যের এই সীমা আরও বর্ধিত করা হল। যাতে ইট গেঁথে কিংবা অনেক উঁচু থেকে পর্দা ইত্যাদি ঝুলিয়েও ভাস্কর্য তৈরি হয়েছে। ফলে ভাস্কর্যের নাম ও শ্রেণি তৈরি হয়েছে; যেমন বিভিন্ন দ্রব্য জোড়া দিয়ে তৈরি স্কাল্পচারকে নাম দেওয়া হল কনস্ট্রাকশন। পিকাসোর এরকম কিছু ছোটো ছোটো ভাস্কর্যের নমুনা আমরা দেখতে পাই। স্বভাবতই ভাস্কর্য ভাবনার সঙ্গে মাধ্যমের একটা সম্পর্ক আছে। তা মূর্ত-বিমূর্ত, ফিগারেটিভ বা নন ফিগারেটিভ যাই হোক না কেন।

রোদ্যাঁ ভাস্কর্যের রূপগত মূল্যের দিকে মনযোগী ছিলেন। শিল্পের চেয়েও তিনি গুরুত্ব দিতেন প্রকৃতির সঙ্গে

চারিত্রিক অভিব্যক্তি এবং গতিকে। ভাস্কর্য বিষয়ে রোদ্যাঁর কথা ছিল 'গভীরতার মধ্যে রূপকে ধরো। প্রধান তলকে স্পষ্টভাবে প্রকাশ কর। তোমার দিকে প্রত্যক্ষ রূপগুলিকে কল্পনা কর। সমস্ত জীবনই একটি কেন্দ্র থেকে তরঙ্গের মতো উত্থিত হচ্ছে এবং তার ভেতরেই চারদিকে প্রসারিত হচ্ছে। ড্রয়িং-এ আউট লাইন-এর বদলে রিলিফকে দেখ। রিলিফ সীমারেখাকে (contour) নিশ্চিত করবে। মূল বিষয়কে নড়াতে হবে, ভালোবাসতে হবে, আশা করতে হবে, কাঁপাতে হবে, বাঁচাতে হবে। শিল্পী হওয়ার আগে একজন মানুষ হতে হবে।' (উদ্ধৃতিটি) : আর্টিস্টস ম্যানুয়াল পৃ. ২৩৪ থেকে ভাষান্তরিত)।

নির্মাণবাদী শিল্পীরা পরিসরের প্রাথমিক উপাদান, আয়তন রং এসব নিয়ে অনুসন্ধান করার সময় ভাস্কর্যের মাধ্যমের প্রকৃতি, নান্দনিকগুণ, আয়তন, রং, উপযোগিতার ক্ষমতা, এসবকে পূর্ণমাত্রায় কাজে লাগানোর মধ্য দিয়েই ভাস্কর্যের নতুন রূপকে অনুসন্ধান করেছেন। যদিও নির্মাণবাদী শিল্প বিমূর্ততার দিকে চলে যায় কিন্তু এর অন্যতম পথিকৃৎ শিল্পী ন্যাম গাবো বলেছিলেন, '... abstract is not the core of the constructive ideal. The idea means more to me it involves the whole complex of human relation to life. It is a mode of thinking, acting, perceiving and living.' (তদেব)।

এই দুটো সূত্র আলাদা করেই দেখিয়ে দেয় যে, ভাস্কর্যকে কখনোই আনুষ্ঠানিক সূত্রাবলির সংকলন হিসাবে দেখা ঠিক নয়।

তবে এটাও ঠিক বিমূর্ত ভাস্কর্যের সঙ্গে আকৃতিগত মিল থাকলেই তাকে বিমূর্ত হিসাবে চিহ্নিত করলে বিভ্রান্তি আসবে। কিছু এমন ভাস্কর্যও সাম্প্রতিক অতীতে তৈরি হয়েছে, যেমন কার্ল অ্যান্ড্রির ভাস্কর্য, যাতে সাদৃশ্যবাদী মূল্য থেকে সরে গিয়ে এমন একটা রূপ তৈরি করা হয় যেখানে বস্তুর মধ্যের তাৎপর্যকে শূন্য করে দর্শককে ভাববার সুযোগ দেওয়া হয়। আজকের যুগের ভাস্কর্য বিগত শতাব্দীগুলির ভাস্কর্য থেকে নানা কারণেই আলাদা। এর কারণ হল আজকের যুগের ভাস্কর্যে ধারণাকে প্রকাশ করার জন্য মনুষ্য শরীরকে বিষয় হিসাবে ব্যবহারের প্রবণতা হ্রাস, পূর্বাধিকার হিসাবে শিল্প পরিকল্পনার অবনমন, নির্মাণবাদী প্রক্রিয়ার



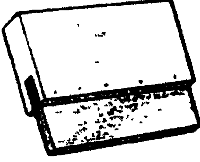
নং ২৯৭. গ্রিস : ট্যানাগ্রা ফিগার। ২০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ।

অগ্রগতি, আধুনিক পদার্থ ও কৌশলের ব্যবহার, রঙের ব্যবহার এবং শৈল্পিক সাফল্যের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন। স্বভাবতই বিংশ শতাব্দীতে ভাস্কর্যের অর্থ ও ভাষা অনেক ব্যাপকতা লাভ করেছে। এই নতুন ভাষা ও অর্থ সৃষ্টির পেছনে যাঁদের অবদান আছে তাঁরা হলেন রোদ্যাঁ, ব্রাঁকুশি, পিকাসো, গ্যাবো এবং তাৎলিন।

অনেক ধরনের মাধ্যম বা পদার্থ দিয়ে ভাস্কর্য তৈরি করা হয়। এসবের মধ্যে আছে ধাতু, পাথর, কাঠ, মাটি বা ক্লে, কাগজ, পলিয়েস্টার রেজিন, গ্লাস ফাইবার, মোম ইত্যাদি। প্রত্যেকটি মাধ্যমের প্রক্রিয়াগত সুবিধা অসুবিধা দুই-ই আছে। সেই সঙ্গে এসবের নান্দনিক বৈশিষ্ট্য এবং গুণও আলাদা। ধাতুকে যেমন কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহার করা হয় তেমনি ধাতুর নানারকম বস্তুকেও ব্যবহার করা হয়। এইসব ধাতুর মধ্যে প্রথম ব্যবহার করা হয়েছিল ব্রোঞ্জ। সেইসঙ্গে পরবর্তীকালে তামা, সোনা, রুপা, সিসা, দস্তা, অ্যালুমিনিয়াম এবং লোহার নানারকম ভাস্কর্য তৈরি করা হয়েছে। ধাতু অনেক রকম সমস্যামুক্ত যেগুলি পাথর এবং কাঠের ক্ষেত্রে আছে এবং বহুগুণবিশিষ্ট। ধাতু দিয়ে যেমন নিরালম্ব (freestanding) ভাস্কর্য তৈরি করা যায় তেমনি দেয়ালে সাঁটানো ভাস্কর্যও তৈরি করা যায়। ধাতুকে তার শক্তি বজায় রেখেও কাটা যায়, বাঁকানো যায়, ফুটো করা যায় এবং গলানো যায়। দ্রুত নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে কাগজ দিয়ে আউটডোর স্কাল্পচার না করা গেলেও সুন্দর সুন্দর ইনডোর স্কাল্পচার তৈরি করা যায়। এতে শিল্পীরা সাধারণত হ্যান্ডমেড কাগজ ব্যবহার করেন এবং অনেক ক্ষেত্রেই অভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই কাগজ থেকে ভাস্কর্য তৈরি করা হয় অর্থাৎ কাগজ তৈরির মণ্ড দিয়েই ভাস্কর্য নির্মাণ করা হয়। আবার পলিয়েস্টার রেজিন দিয়ে ধাতুর মতো ঢালাই করে ভাস্কর্য তৈরি করা হয়। এক্ষেত্রে ক্লে বা মোম দিয়ে তৈরি নির্দিষ্ট মূর্তি তৈরি করে তারপর ছাঁচ বা মোল্ড তৈরি করে নিতে হয়। পাথরের ভাস্কর্যের জন্য নানা ধরনের পাথর ব্যবহার করা হয়ে থাকে। পাথরের এই চাঁই কেটে কেটে মূর্তি তৈরি করা হয়। এজন্য যে প্রস্তরশ্রেণি ব্যবহৃত হয় তার মধ্যে আছে হালকা সচ্ছিদ্র বেলে পাথর, চুনা পাথর, শক্ত মার্বেল পাথর, গ্র্যানাইট পাথর। মূর্তি তৈরি হয়ে গেলে পাথরকে ঘষে চকচকে মসৃণ করে তোলা হয়।

কাঠের ক্ষেত্রেও পাথরের মতোই কাঠের ব্লককে বাটালি দিয়ে খোদাই করেই মূর্তি নির্মাণ করা হয়। এক্ষেত্রেও নানা ধরনের গাছ ও তার কাঠ ব্যবহার করা হয়। এক একটি কাঠের এক একরকম টেক্সচার থাকে এবং এই ভিন্নতাকে কাজে লাগিয়ে ভাস্কর্য শিল্পী নানা বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করেন। আর্থ স্কাল্পচারকে ল্যান্ড আর্টও বলে। পাশ্চাত্যে কনসেপচুয়াল আর্ট-এর আবির্ভাবের পর বহু ধরনের আভঁ গার্দ শিল্পের ক্ষেত্রে 'স্কাল্পচার' শব্দটি ব্যবহার করা হতে থাকে। বর্তমানে 'স্কাল্পচার' শব্দটা পেন্টিং বাদে অন্য সব ধরনের শৈল্পিক কাজকর্মের একটা তকমা হিসাবে পরিণত হয়েছে।

স্কুইজি (Squeege)



আয়তাকার কাঠের হাতলের সঙ্গে লাগানো রবারের পুরু একটা ব্লেড। স্ক্রিনের ওপর রাখা রং-কে ঘষে ছাপ তোলার কাজে এই যন্ত্র ব্যবহার করা হয়।

স্কুল (School)

একটা সমষ্টিবাচক শব্দ। ঘরানা। যখন কোনো একদল শিল্পী কোনো নির্দিষ্ট একজন শিল্পী বা গুরুর অনুসৃত শৈলী বা রীতিতে শিল্পচর্চা করেন সেই শৈলীকে স্কুল বা ঘরানা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। এছাড়াও কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলের বা দেশের শিল্পরীতি, রূপাকৃতিকে ব্যবহার করে পরম্পরাগতভাবে সৃষ্ট শিল্প বা কোনো একটা যুগবৈশিষ্ট্য প্রভাবিত শিল্পশৈলীকেও স্কুল বলে নির্দেশ করা হয়। যেমন জাপানের কানো স্কুল, তোসা স্কুল ইত্যাদি।

স্কুল অব ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্ট, ক্যালকাটা (School of Industrial Art, Calcutta)

কলকাতার দ্বিতীয় শিল্প বিদ্যালয়। ১৮৫১ সালে ড্রিঙ্ক ওয়টর বেথুন-এর স্মৃতিতে কলকাতার কয়েকজন ইংরেজ এবং বাঙালি মিলে বেথুন সোসাইটি নামে একটি বিদ্বজ্জনসভা স্থাপন করেন। এটি ছিল একটি আলোচনা সভা। সদস্যরা এই সভার অধিবেশন ডেকে সাহিত্য, বিজ্ঞান, সমাজ নিয়ে আলোচনা করতেন। ১৮৫৪ সালের ২ মার্চ এই সভার এক অধিবেশনে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সরকারের টেকনিশিয়ান কর্নেল ই. গুডউইন 'Union of Science, Industry and Art' নামে একটি প্রবন্ধ পাঠের মধ্য দিয়ে একটি স্কুল অব ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্ট স্থাপনের প্রস্তাব করেন। ৩১ মার্চ গুডউইনের উদ্যোগে এই প্রস্তাব রূপান্তরিত করার জন্য হজসন প্র্যাটের বাড়িতে রাজস্বসচিব অ্যালেনের সভাপতিত্বে বেথুন সোসাইটির কয়েকজন নিয়ে একটি কমিটি তৈরি হয় যার নাম ছিল 'Society for the

promotion of Industrial Art' বা শিল্পবিদ্যোৎসাহিনী সভা।

সংবাদ প্রভাকর পত্রিকায় ১৮৫৪ সালের ২৪ মে এ বিষয়ে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়। 'পরম আহ্লাদপূর্বক প্রকাশ করিতেছি যে, এতন্নগরস্থ লোকদিগকে শিল্পবিদ্যা শিক্ষা দিবার নিমিত্ত কতিপয় এতদ্দেশীয় ও ইউরোপীয় বিদ্যোৎসাহী মহানুভব একত্রিত হইয়া এক শিল্পবিদ্যালয় সংস্থাপন করিতে সংকল্প করিয়াছেন। অতএব আমরা ভরসা করি যে, সুবিজ্ঞ বিদ্যোৎসাহী মহাশয়েরা আপনাপন সন্তানদিগকে উক্ত বিদ্যালয়ে বিদ্যোপার্জ্জনার্থে প্রেরণে যথোচিত উৎসাহ প্রদান করিবেন...।' এই সংবাদ থেকে জানা যায় যে, রাজা প্রতাপনারায়ণ সিংহ এই বিদ্যালয়ের জন্য তাঁর চিৎপুর রোডের একটি সুন্দর বাড়ি দান করেছিলেন। কিন্তু মাস দুয়েক পরে এই পত্রিকাতেই একটি খবরে স্থাপিত শিল্প বিদ্যালয়টি নিয়ে সংশয় প্রকাশ করা হয়েছিল। 'শিল্পাদি বিবিধ বিদ্যার অনুশীলন নিমিত্ত এই মহানগরের মধ্যে যে এক বিদ্যালয় স্থাপনের অনুষ্ঠান হইয়াছিল, অধুনা তাহার কোনো কথা শ্রবণ করা যায় না, ওই বিদ্যালয়ের জন্য চাঁদার অনুষ্ঠান হইয়াছে। শ্রীযুত রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও শ্রীযুত রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ তাহার নিমিত্ত চিৎপুরের রাস্তার পার্শ্বভাগে এক উত্তম বাটী দিতে সম্মত হইয়াছেন, গবর্নমেন্টও তদ্বিষয়ে বিহিত উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন, অথচ কেন বিদ্যালয় স্থাপিত হইল না আমরা তাহার হেতু অবধারণে অক্ষম।' এরপর সংবাদ প্রভাকরের ১৮৫৪ সালের ১২ আগস্ট সংখ্যায় লেখা হল 'আমরা অতিশয় আহ্লাদপূর্বক প্রকাশ করিতেছি যে, সংকল্পিত শিল্প বিদ্যালয় আগামী সোমবারাবধি খোল্লা হইবেক...।' এই সংবাদ এবং প্রকাশিত বিজ্ঞাপন থেকে জানা যায় 'ক্যালকাটা স্কুল অব ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্ট' ১৮৫৪ সালের আগস্ট মাসে খোলা হয়েছিল।

স্কুল অব ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্টে যা শেখানো হবে তার উপযোগিতা সম্বন্ধে তৎকালে যে ধারণা ছিল তারও একটা দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় সংবাদ প্রভাকরে প্রকাশিত খবর থেকে, 'এক্ষণে যে বিলাতি লণ্ঠন বাজারে ১৬/২৪ টাকায় জোড়া বিক্রয় হইতেছে, এ দেশের লোকেরা লণ্ঠন প্রস্তুত করিতে পারিলে তাহার জোড়া ছয় সাত টাকায় বিক্রয় করিতে পারিবেন, এবং সামান্য কাঁচ নির্মিত আলোকাধারসকল

সামান্য মূল্যে বিক্রীত হইলে দুঃখী প্রজার পর্ণকুটির মধ্যেও তাহার ব্যবহার হইতে পারিবেক

এইরকম ধ্যান-ধারণার মধ্যেই স্কুল অব ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্টে চিত্রবিদ্যা শিক্ষার যে নিয়ম চালু হয়েছিল সংবাদ থেকে তার বিবরণ জানা যায়। সেখানে চিত্রবিদ্যাশিক্ষার শ্রেণিতে ৫০ জন এবং প্রতিমূর্তি প্রস্তুতকরণ বিদ্যাশিক্ষার শ্রেণিতে ৪৫ জনের প্রশিক্ষণের আপাত ব্যবস্থা হয়েছিল। কিন্তু পরিস্থিতি এমন ছিল যে, স্কুল চালু হবার প্রথম দিনেই এই সংখ্যা পূর্ণ হয়ে যায় এবং অবস্থা এমন হয়ে ছিল যে, আসনের অভাবে ভরতি হতে এসেও ভরতি হতে না পেরে ফিরে গেছে বহু ছাত্রছাত্রী। শিক্ষক সংখ্যা বাড়ানো গেলে ৪/৫ দিনের মধ্যেই ছাত্রসংখ্যা ৫৫০ ছাড়িয়ে যেতে পারত। ১২৯২-তে প্রকাশিত 'শিল্প-পুষ্পাঞ্জলি' পত্রিকায় শরৎচন্দ্র দেবের লেখা 'কলিকাতার ইতিহাস' থেকে জানা যায়— এই বিদ্যালয়ে (১) গঠিত দ্রব্য (Models), প্রকৃত দ্রব্য (Natural Objects), দৃষ্ট অঙ্কন ও প্রাসাদ সম্পর্কীয় অঙ্কন (Architectural Drawing) (২) এচিং (Etching) অর্থাৎ ধাতুর ওপরে খোদাই কার্য, কাষ্ঠের ওপরে খোদাই কার্য (Wood engraving), (৩) মৃন্ময় পাত্র নির্মাণ (Pottery) এবং মৃত্তিকা ও মোম প্রভৃতির বস্তু নির্মাণ—শিক্ষা দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছিল। তিনি স্পষ্টতই জানিয়েছিলেন যে, এই বিদ্যালয়ে উচ্চ অঙ্গের শিল্পশিক্ষা দেবার আদৌ উদ্দেশ্য ছিল না। অন্যদিকে উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের লেখা থেকে জানা যায় ১৮৫৫ সাল ঠিক হয় যে, এই বিদ্যালয়ে তিনটি বিভাগ হবে। (১) Modelling and Moulding Department, (২) Engraving and Lithographic Department, (৩) Department of Higher Drawing and Painting. কিন্তু ছাত্রসংখ্যার নিরিখে এবং পঠনপাঠনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের অভাব বেসরকারি উদ্যোগে এবং সংগৃহীত চাঁদায় মিটত না। সরকারি অনুদানেও সংকুলান হত না। সেই সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে পরিচালকদের অনুসৃত বিভিন্ন নীতিতে অনেক সময়ই সংগতি থাকত না। বহু ছাত্র বিদ্যালয় ছেড়ে চলেও গিয়েছিল বহু সময়ে। শেষপর্যন্ত বিদ্যালয়ের খরচ চালানো কঠিন হয়ে পড়লে সরকারিভাবে অধিগ্রহণের আর্জি জানানো হয়। বাংলার ছোটোলাট স্যার সিসিল বিডন কয়েকটি শর্তে অধিগ্রহণে

রাজি হন। তার অন্যতম শর্ত ছিল ইংল্যান্ড থেকে যোগ্য একজনকে এনে অধ্যক্ষ পদে বসাতে হবে। এই শর্তানুযায়ী সাউথ কেনসিংটন থেকে হেনরি হোভার লক এসে এর কার্যভার গ্রহণ করে সুপারিন্টেন্ডেন্ট পদে যোগ দেন ১৮৬৪ সালের ২৯ জুন। বিদ্যালয়ও ১৬৬ বৌবাজার স্ট্রিটে স্থানান্তরিত হয়। বেসরকারি পরিচালন সমিতির হাত থেকে স্কুলটি চলে আসে সরকারি পরিচালন ব্যবস্থার অধীনে। লক নতুন পাঠক্রম চালু করেন। তারপর ১৮৬৫ সালে ক্যালকাটা স্কুল অব ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্ট-এর নাম পালটে গিয়ে নতুন নাম হয় 'গভর্নমেন্ট স্কুল অব আর্টস।' * গর্ভনমেন্ট স্কুল অব আর্ট দেখুন।

স্কোয়ারিং ফর ট্রানস্‌ফার (Squaring for Transfer)

কোনো ছবি বা নকশার বড়ো প্রতিলিপিকরণের একটি পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে ছোটো বা মূল ছবির ওপরে লম্ব ও অনুভূমিক রেখার সাহায্যে নির্দিষ্ট আকারের বর্গক্ষেত্র এঁকে ছবিটিকে সমানভাবে ভাগ করে নিতে হয়। এরপর যে বড়ো তলটিতে ছবিটির প্রতিলিপি করতে হবে তার ওপরেও নির্দিষ্ট দূরত্বে সমান্তরাল লম্ব ও অনুভূমিক রেখার সাহায্যে সমসংখ্যক বর্গক্ষেত্র এঁকে নিতে হবে। স্বভাবতই বড়ো তলটির বর্গক্ষেত্রগুলির আকার বড়ো হবে। এরপর মূল ছবিটির বর্গক্ষেত্রগুলির মধ্যে বিভাজিত ছবির অংশগুলিকে অনুপাত অনুযায়ী বড়ো ছবিটির সমার্থক বর্গক্ষেত্রগুলির মধ্যে ছকতে হবে। এভাবে ছোটো ছবিটির দৃষ্ট নকশার ধরন ও গতি অনুযায়ী বড়ো বর্গক্ষেত্রগুলির মধ্যে আনুপাতিক ভাবে ড্রয়িং করলে মূল ছবিটির একটা বিবর্ধিত রূপ পাওয়া যাবে। এক্ষেত্রে ছোটো বা মূল ছবির ওপরে সরাসরি বর্গক্ষেত্র না এঁকে ছবিটির ওপরে সেলোফেন পেপার লাগিয়ে তার ওপরে পারমানেন্ট মার্কার দিয়ে খোপ কাটলে মূল ছবিটি নষ্ট হয় না। পরবর্তীকালে ডিটেল ফিনিশিং-এ সুবিধে হয়।

স্ক্রিনপ্রিন্ট (Screen Print)

সিল্কস্ক্রিন প্রিন্ট দেখুন।

স্ক্র্যাচবোর্ড (Scratchbord)

স্ক্র্যাচবোর্ড বা স্ক্র্যাপার বোর্ড আসলে একটি অপরিহার্য কালি-কৌশল। এবং স্‌'গ্রাফিতো কৌশলের একটি রূপ। স্‌'গ্রফিতো পদ্ধতিতে কোনো তলে লাগানো তেল রঙের ভিজে প্রলেপের ওপর আঁচড় কেটে নকশা তৈরি করা হয়।

আর স্ক্রাচ বোর্ড হল বস্তুত পুরু সাদা বোর্ডের ওপর বিশেষভাবে লাগানো ইন্ডিয়া ইংক বা চাইনিজ ইংকের প্রলেপ। এই প্রলেপ শুকিয়ে যাবার পর কাটার দিয়ে কাটলে বা কুঁদলে সাদা বোর্ড বেরিয়ে পড়ে। এভাবে সূক্ষ্ম মোটা নানা রকম লাইন কাটা যায়। এই কৌশলকে কাজে লাগিয়ে শিল্পীরা বিভিন্ন নকশা তৈরি করেন। এর ব্যবহার প্রধানত শুরু হয়েছিল বিংশ শতাব্দীর প্রথম অর্ধে সংবাদপত্রে ছবি ছাপার জন্য যাতে লাইনের সাহায্যে হাফটোন এফেক্ট আনা যায়। তখন সংবাদপত্র মুদ্রণের মান ও কৌশল ছিল মাঝারি ধরনের। খুব দক্ষ শিল্পীরা স্ক্র্যাচবোর্ডের ওপর চৌকশভাবে সুদৃশ্য নকশা ও ছবি তৈরি করতেন। এধরনের দক্ষতারও আজ অভাব আছে।

সাধারণভাবে সাদাকালো হলেও অনেক শিল্পী এই পদ্ধতি ব্যবহার করে রঙিন নকশাও তৈরি করেছেন। এজন্য কাগজের পরিবর্তে ক্যানভাসে অ্যাক্রিলিক রঙের প্রলেপ লাগিয়ে নেওয়া হয়। এতে ব্যবহৃত কাটার যন্ত্রগুলি অনেকটা লিনো কাটার যন্ত্রের সমতুল।

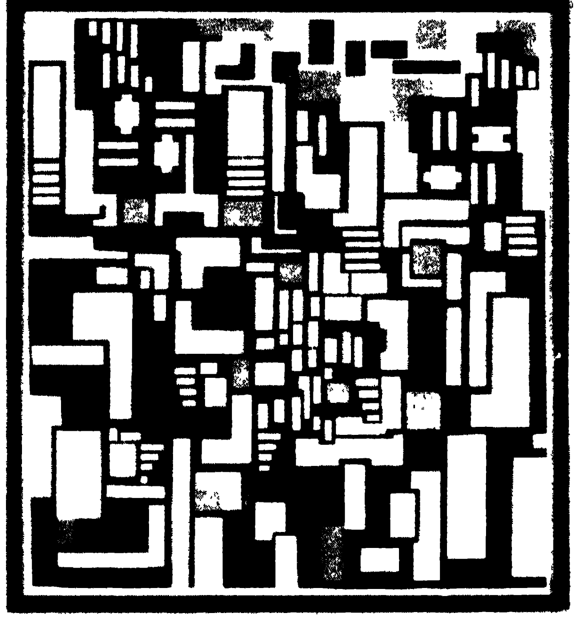
স্ক্র্যাপার বোর্ড (Scraper board)

স্ক্র্যাচবোর্ড দেখুন।

স্টাইল, দ্য (Stijl, De)

শিল্পী, স্থপতি, নকশাকারদের একটি জোট। নেদারল্যান্ডের লেইডেনে ১৯১৭ সালে এই জোট গঠিত হয় ডাচশিল্পী ও স্থপতি থিয়ো ভ্যান ডসবার্গের উদ্যোগে। সঙ্গী ছিলেন পিয়েত মন্দ্রিয়ান। এই জোটের আন্দোলন নিও প্লাস্টিসিজ্‌ম বা এলিমেন্টারিজ্‌ম নামেও পরিচিত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকা সত্ত্বেও নেদারল্যান্ডকে দুর্ভোগ সইতে হয়েছিল। তখন দ্য স্টাইল গোষ্ঠী শান্তি ও সংহতির চেতনায় নতুন এক আন্তর্জাতিক শিল্পকে গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল। খুবই প্রভাবশালী এই আন্দোলনের লক্ষ্য মৌলিকভাবে সরলীকৃত জ্যামিতিক আকারকে ব্যবহার করে চিত্রকলা, ভাস্কর্য, স্থাপত্যের নবায়ন ঘটানো।

ডসবার্গ, মন্দ্রিয়ান, ভঁতোঁজেরলু, ভ্যানভার লেক, একসঙ্গে বিমূর্ত দৃশ্য ভাষা সৃষ্টির লক্ষ্য নিয়ে আগে থেকেই কাজ করছিলেন। যা ব্যবহারিক প্রয়োজনে কাজে লাগানো যায় এবং একটা সুন্দর সময়ের জন্য তাদের আকাঙ্ক্ষাকে প্রকাশ করা যায়। লম্ব ও অনুভূমিক রেখা, সমকোণ,



নং ২৯৮. থিয়ো ভ্যান ডসবার্গ : কম্পোজিশন (কার্ড প্লেয়ার)। ১৯১৭। ক্যানভাসের ওপর তেল রং। ১১৫.৯X১০৬ সেমি.।

আয়তাকার ক্ষেত্র, এবং ফ্ল্যাট কালারের ব্যবহার তাঁদের সেই সময়ের কাজের চরিত্র নির্ধারণ করেছে। এর ফলে স্বাভাবিক ভাবেই তাঁদের বর্ণক্রমও ক্রমশ লাল, নীল, হলুদ তথা প্রাথমিক রং সমূহের সঙ্গে এবং নিরপেক্ষ সাদা, কালো ও ধূসর— এই গুটিকয়েক রং এসে পৌঁছোয়। ১৯১৭ সালে এই রীতিকে নিওপ্লাস্টিসিজ্‌ম আখ্যা দিয়ে মন্দ্রিয়ান লিখেছিলেন, 'আধুনিক চিত্রকলার সার্বিক আকৃতিগত উপায় আবিষ্কৃত হয়েছিল রূপ ও রঙের সামঞ্জস্যপূর্ণ বিমূর্তকরণের মধ্য দিয়ে। এটা আবিষ্কার হয়ে যাবার পর প্রায় নিজে নিজেই একটা বিশুদ্ধ সম্বন্ধের যথার্থ রূপের উদ্ভব হয়, যা বাস্তব সৌন্দর্যের সমস্ত ভাবের অপরিহার্য উপাদান।' (আর্ট ইন দ্য মডার্ন এরা, পৃ. ১২১)।

১৯১৮ সালে দি স্টাইল গোষ্ঠী তাঁদের আট দফা দাবি সম্বলিত ইস্তাহার প্রকাশ করে তাঁদের মুখপত্র 'দি স্টাইল'-এ। ভ্যান ডসবার্গের উদ্যোগে 'দি স্টাইল'-এর প্রথম প্রকাশ হয় ১৯১৭ সালে এবং এর শেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৯৩২ সালে। এই পত্রিকায় স্টাইল গোষ্ঠীর তাত্ত্বিক রচনা প্রকাশিত হত। এই গোষ্ঠীর মুখ্য তাত্ত্বিক ছিলেন ভ্যান ডসবার্গ এবং পিয়েত মন্দ্রিয়ান। তাঁরা বিশ্বাস করতেন বিমূর্তকরণের অগ্রগতির জন্য কিউবিজ্‌ম খুব বেশি দূর এগোয়নি।

অন্যদিকে প্রকাশবাদী শিল্পকলা অতিরিক্ত মাত্রায় ভাবগত। তবে ফিউচারিজ্‌মের প্রতি শ্রদ্ধা-প্রীতি থাকলেও যুদ্ধে ইতালি যোগ দেবার পর তাঁরা এর থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে নিয়েছিলেন।

স্টাইল গোষ্ঠী যে ইস্তাহার প্রকাশ করেছিলেন তার মূল কথা ছিল বিশ্বজনীন, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদবিরোধী, দুর্জ্ঞেয় এবং দার্শনিক প্রয়োজনে জ্যামিতিকভাবে বিমূর্ত উপায়ে বিশেষ করে লম্ব ও অনুভূমিক রেখার ব্যবহার এবং বিশুদ্ধ বা প্রাথমিক রং অর্থাৎ লাল-লীল-হলুদের ব্যবহার। জার্মানির বাউহাউস এবং নির্মাণবাদী (কনস্ট্রাক্টিভিস্ট) শিল্পীদের মতো তাঁরাও শিল্পকে সমাজ বদলের কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন। অবশ্য বাউহাউসের প্রভাব ফেলার পেছনে ডসবার্গের একটা বড়ো ভূমিকা ছিল। তিনি ১৯২০ সাল জুড়ে প্রচুর ঘুরেছেন, প্রদর্শনী করেছেন, বক্তৃতা দিয়েছেন। এই ভ্রমণের মধ্য দিয়ে ডসবার্গ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক শিল্পধারার শিল্প আন্দোলনের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন। ডসবার্গের এই নতুন চিন্তাভিমুখ স্টাইল গোষ্ঠীর শিল্পীদের ওপর প্রভাব সৃষ্টি করে। ফলে ভ্যানডার লেক, ভ্যানটনগারলু, ভ্যান্ট হফ, ওউড-এর মতো কিছু সদস্য গোষ্ঠী ত্যাগ করেন। আবার নতুন কিছু সদস্যও গোষ্ঠীতে আসেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন জার্মান দাদাবাদী হানস আর্প, ইতালীয় ফিউচারিস্ট গিনো সেভেরিনি প্রমুখ। পরে ডসবার্গ তাঁর ছবিতে তির্যক আকৃতি তথা কর্ণের (diagonal) প্রবর্তন করে তার নাম দেন 'এলিমেন্টারিজ্‌ম'। এতে মন্দ্রিয়ানের সঙ্গে ডসবার্গের চরম মতপার্থক্য হয় এবং মন্দ্রিয়ান স্টাইল গোষ্ঠী থেকে পদত্যাগ করেন। মন্দ্রিয়ান বিশুদ্ধ রং নিয়ে তাঁর নিজের ধারায় শিল্পের অভিযান চালিয়ে যেতে থাকেন। অন্যদিকে ডসবার্গ তির্যক এবং এলিমেন্টারিজ্‌ম নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা চালাতে চালাতে ১৯৩০ সালে তাঁর নতুন ইস্তাহার 'দ্য বেসিস অব কনক্রিট আর্ট' প্রকাশ করেন এবং 'কনক্রিট আর্ট' রীতির উদ্ভব ঘটান। এর বছর খানেক পরেই ডসবার্গের মৃত্যু হয়।

স্টেইন্ড গ্লাস (Stained Glass)

কাচ তৈরির সময়েই নানা ধরনের ধাতব অক্সাইড ব্যবহার করে প্রস্তুত রঙিন কাচ। এধরনের কাচ দ্বাদশ এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ব্যবহার করা হত বিশেষ করে বড়ো বড়ো ক্যাথিড্রালগুলিতে। আজকাল উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে

ছবি নং ১৯৪ পৃ. ৩৭২

আরও উন্নতমানের স্টেইন্ড গ্লাস তৈরি হচ্ছে এবং তা সব ধরনের জিনিসপত্রে, আলংকারিক বস্তু ও প্যানেলে, গহনা, টেবিলওয়্যার প্রভৃতিতে ব্যবহার করা হচ্ছে।

স্টেনসিলিং (Stenciling) কোনো একটি ছাঁচ, পর্দা, নকশা-জানলা। জাল বা স্টেন্সিলের মধ্য থেকে রং পাঠিয়ে কোনো তলে ছাপ তোলার পদ্ধতি।
* স্ক্রিনপ্রিন্ট দেখুন।

স্টেপ পিরামিড (Step Pyramid) প্রাচীন ইজিপ্টের তৃতীয় রাজ বংশের প্রথম রাজা জোসার তথা নেটজারিখেট-এর চিতার সমাধি-স্মারক। ইনি খ্রিস্টপূর্ব ২৬৫০-এ রাজত্ব করতেন। এই সমাধি-স্মারকের সন্ধান পাওয়া যায় সাক্কারাতে বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে প্রাথমিক খননের পর। পরে বিশিষ্ট ফরাসি স্থপতি জঁ-ফিলিপ লোয়ে ধ্বংসাবশেষকে পুনর্গঠিত ও সংরক্ষিত করেন। এর বৈশিষ্ট্য ছিল, এটা একই সাথে সমাধি এবং চিতাস্থলের সম্মিলিত বিষয়কে নিয়ে তৈরি রাজকীয় সমাধি যা সেসময়ের একটি মৌলিক উদ্ভাবন। এতে ছেটেকেটে সুসমান করা পাথরের চাঁই ব্যবহার করা হয়েছিল। প্রাচীনকালে যার নিদর্শন খুব কম মেলে। এর কেন্দ্রস্থলে আছে পিরামিডটি

নং ২৯৯. মেক্সিকো : শিলালিপির পিরামিড। ৭০০ খ্রিস্টাব্দ।



স্বয়ং। প্রাথমিক ভাবে এটি একটি মাস্তাবা হিসেবেই তৈরি করা হয়েছিল। পরে এতে দুটো পর্যায়ে বড়ো পরিবর্তন ঘটিয়ে প্রথমে চার ধাপের এবং তারপরে ছয় ধাপের পিরামিড নির্মাণ করা হয়। এর ভূগর্ভস্থ কক্ষগুলি নীল রঙের Faience টালি দিয়ে সাজানো। যা পাতালের অতল জলরাশির প্রতীকী রূপ। আর এতে সাজানো রিলিফ প্যানেলে দেখা যাচ্ছে রাজা অভিজাত আচার-অনুষ্ঠান পালন করছেন।

এই পিরামিড বড়ো বড়ো সব বাড়ি দিয়ে ঘেরা। যার প্রতিটিতে আছে মরণোত্তর জীবনের কার্যকলাপের দৃশ্যরূপ। এর আবেষ্টনী দেয়ালও প্রাসাদ-মুখের মতো শৈলীতে সাজানো যা বস্তুত রাজ অধিকারেরই ঘোষণা। পরবর্তী কালেও এরকম স্টেপ পিরামিড নির্মিত হয়েছে কিন্তু তার কোনোটাই আকারে ও গুণমানে একে ছাড়াতে পারেনি। উদাহরণ হিসাবে সেখেমকেট-এর স্টেপ পিরামিডের নাম উল্লেখ করা যায়।

স্টেপড পিরামিড (Stepped Pyramid)
আয়তকার ঘনকাকৃতির কাঠামো ব্যবহার করে ধাপে ধাপে ঢাল সহকারে গঠিত শীর্ষবিন্দু সম্পন্ন পিরামিড। অথবা প্রাচীন ইজিপ্টের সমাধি স্থাপত্য মাস্তাবা থেকে প্রকৃত পিরামিডের দিকে বিবর্তনের একটি মধ্যবর্তী পর্যায়।

স্ট্যান্ড অয়েল (Stand oil)
তিসির তেল বা লিনসিড অয়েলকে তাপ দিয়ে তৈরি ভারী তেল। স্ট্যান্ড অয়েল নামটির উৎপত্তি হয়েছে বহুদিন আগে। একসময় তেলকে পরিশ্রুত করতে কাঠের ট্যাঙ্কে রাখা জলের ওপর দিয়ে তেলকে প্রবাহিত করানো হত এবং কিছু সময়ের জন্য তেলকে ভাসমান অবস্থায় থামিয়ে রাখা হত। তখন তেলের গাদ বা ময়লা জলের সংস্পর্শে এসে পরিষ্কার হত। তেলকে এই 'দাঁড়' করিয়ে রাখা থেকেই স্ট্যান্ড অয়েল নামটির উৎপত্তি বলে মনে করা হয়। তবে স্ট্যান্ড অয়েল সাধারণ তিসির তেলের মতো পুরোনো হলে কালো হয়ে যায় না। তেলরং শিল্পীরা স্ট্যান্ড অয়েলকে তেল রঙের মাধ্যম হিসাবে এবং কিছু বার্নিশেও ব্যবহার করেন। স্ট্যান্ড অয়েল রঙের সঙ্গে মেশালে শুকোবার সঙ্গে সঙ্গে রংকে একটা মসৃণ পর্দায় পরিণত করতে সাহায্য করে।

স্ট্যালাকটাইট ওয়ার্ক (Stalactite Work)
ইসলামিক ছাদের ঝুলন্ত আলংকারিক নকশা। যা অসংখ্য করবেলিং গুচ্ছকে একত্র করে তৈরি। সাধারণভাবে গুহার

ছাদে চুঁইয়ে পড়া জলের সঙ্গে থাকা ক্যালসিয়ামের লবন জমে জমে যে ঝুলন্ত আকৃতি তৈরি হয় তাকে স্ট্যালকটাইট বলে। এর সঙ্গে সাদৃশ্য আছে বলেই এই নকশার এরকম নাম।

স্ট্রাকচারালিজ্‌ম (Structuralism)

বাংলা পরিভাষা অবয়ববাদ। কেউ কেউ সংগঠনবাদ, গ্রন্থনবাদ প্রভৃতি শব্দও ব্যবহার করেন। এটি একটি পোস্টমডার্ন শব্দানুষঙ্গ যা বিশেষ করে পোস্টমডার্ন শিল্পসাহিত্য এবং স্থাপত্যের আলোচনায় বেশ ব্যবহৃত হচ্ছে। এর উদ্ভব হয়েছে ফার্দিনান্দ সোস্যুরের ভাষাতত্ত্ব এবং অংশত রুশ ফর্মালিজ্‌ম বা আকারবাদ ও ভ্লাদিমির প্রোপ-এর 'মরফলজি অব্ ফোক টেল' থেকে। মরফলজি অব ফোক টেল (১৯২৮) গ্রন্থে প্রোপ লোককথার বিষয়ভিত্তিক আলোচনার পরিবর্তে কাঠামোগত বিশ্লেষণের কথা বলেছিলেন। সোস্যুর-এর মৃত্যুর পর তাঁর দুজন ছাত্র শার্লবালি এবং অ্যালবেয়র সেশহায় 'Course de Linguistique Generale' (১৯২৫) নামে একটি বইয়ে ভাষাতত্ত্বে স্ট্রাকচারালিজ্‌ম নিয়ে বিশদ আলোচনা করেন। এই বইটি তাই বিংশ শতাব্দীর সাহিত্য আলোচনার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাসঙ্গিক বই।

ভাষা বিশ্লেষণে স্ট্রাকচারালিস্ট পদ্ধতির ভিত্তি তৈরি করেন প্রাহার ভাষাবিজ্ঞান সমিতির নিকোলাই ক্রবেৎস্কয় এবং রোমান ইয়াকব্‌সন। এই তত্ত্বের ব্যাপক চর্চা ও প্রয়োগ আরম্ভ হয় ১৯৬০ সালে ফরাসি নৃতত্ত্ববিদ ক্লদ লেভি-স্ট্রাউস তাঁর 'অ্যানথ্রোপলজি স্ট্রাকচারাল' নামক বইয়ে মিথতত্ত্ব বিশ্লেষণের পর। ইয়াকব্‌সন বলেছিলেন যে সাহিত্য কখনোই সাহিত্য-বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু নয়, সাহিত্য-বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু হল সাহিত্যিকতা। তাই সাহিত্যপাঠে ভাষাবিদ্যা প্রয়োগ করাই ছিল স্ট্রাকরালিস্টদের লক্ষ্য। স্ট্রাকচারালিস্টরা জানালেন যে 'বিষয়বস্তুর চেয়ে সাহিত্যের আঙ্গিক অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ কেন-না বিষয়বস্তু হল আঙ্গিকের অনুপ্রাণক'। স্ট্রাকচারালিস্টরা বলতেন 'সাহিত্যের কলকবজা হল ছবি আওয়াজ, তাল, বিন্যাস, মাত্রা, ছন্দ, সন্দর্ভ বা ডিসকোর্সের বর্ণনাকৌশল।'

স্ট্রাকচারালিজ্‌মের প্রথম ঘরানা যা 'জেনেভা স্কুল,' নামে পরিচিত তার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সোস্যুর। সোস্যুরের

'কোর্স ইন জেনারেল লিংগুইস্টিকস্' অবয়ববাদী ভাষাতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা দেয়। সোস্যুর মনে করেন শব্দের মধ্যে দিয়ে 'ভাষা' তৈরি হয়। আর তিনি এই শব্দের নাম দেন 'সাইন' বা চিহ্ন। ফলে সোস্যুরের দৃষ্টিতে ভাষার অর্থ দাঁড়ালো 'সাইন সিস্টেম' বা চিহ্ন-প্রণালী। সোস্যুর 'সাইন'-কে দুটো বস্তুর সমন্বয়রূপে নির্দেশ করলেন। একটি হল সাউন্ড-প্যাটার্ন বা উচ্চারিত শব্দরূপ (বাচক) অন্যটি হল কনসেপ্ট বা ধারণা (বাচ্য)। সোস্যুরের মতে বাচকের মাধ্যমে বাচকের তাৎপর্য তৈরি হয় না। তৈরি হয় তাকে পৃথকীকরণের মাধ্যমে। যেমন, যদি বলা যায় 'তেল মানে তেল' তাহলে কোনো অর্থ উঠে আসে না। কিন্তু তেলকে অন্য শব্দ থেকে আলাদা করলেই এর অর্থ নির্দিষ্ট হয়। সোস্যুর ভাষার ক্ষেত্রে দু-ধরনের ধারণার কথা বলেছেন, যেমন 'লা পারোল' বা মুখের ভাষা যা ব্যক্তিমাত্রে আলাদা হয় এবং 'ল্য লাং' বা একধরনের ভাষাতন্ত্র যা কোনো ভাষা গোষ্ঠীর সাধারণ সম্পদ।

সোস্যুরের ধারণা ব্যবহার করে রোমান ইয়াকব্সন ধ্বনিমূলের ধারণার উদ্ভাবন করেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় ইংরেজির তিনটে ধ্বনি যথা 'c' 'h' 'r'- এর থেকে তৈরি তিনটে ভিন্ন ভিন্ন শব্দ তৈরি হতে পারে যেমন 'cat', 'hat', 'rat' প্রথম তিনটে ধ্বনি একটি আর একটির থেকে আলাদা। ইয়াকব্সন এই বৈপরীত্যকে বলেছেন 'ফাংশনাল কনট্রাস্ট'।

আর একজন স্ট্রাকচারালিস্ট জঁ পিজে মনে করেন স্ট্রাকচারালিজ্‌ম তিনটে মূল পয়েন্টকে নিয়ে সুসংগঠিত। তারা হল পরিপূর্ণতার ধারণা, রূপান্তরকরণের ধারণা এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের ধারণা। লক্ষ করলে দেখা যাবে শব্দের ব্যাকরণ আর বাক্যের ব্যাকরণ আলাদা। ফলে এদের সংগঠন কাঠামোও আলাদা। এই সংগঠন কাঠামোর একটি শ্রেণি উপাদানকে স্ট্রাকচারালিস্ট ভাষাবিদরা বলেছেন Pardigm বা নির্মিতি।

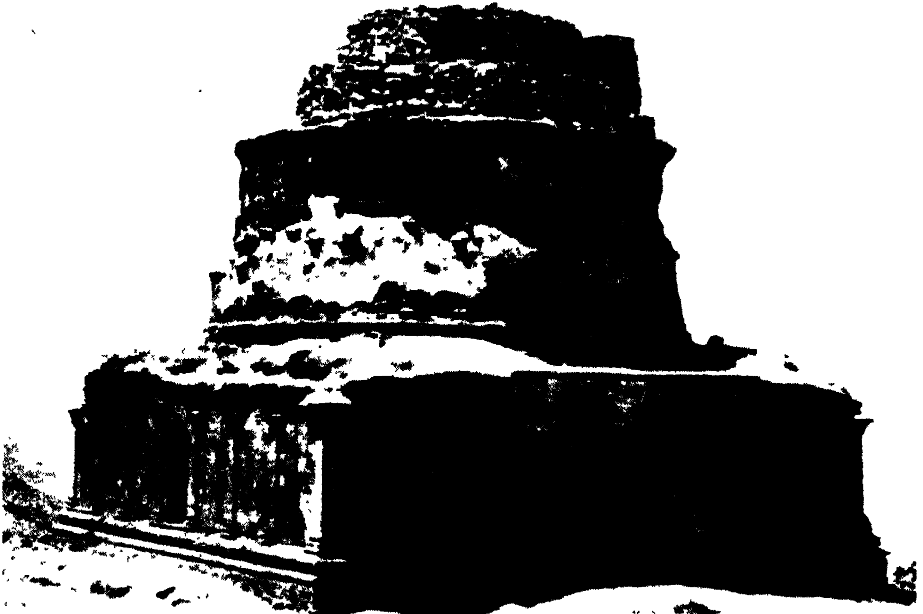
স্ট্রাকচারালিস্ট তত্ত্ব যেহেতু 'চিহ্নায়ন' প্রক্রিয়ার ফসল তাই সংশ্লিষ্ট উপাদানগুলির পারস্পরিক সম্পর্কের ওপর এই তত্ত্বের তাৎপর্য নিহিত। সেই কারণেই যোগাযোগ প্রক্রিয়ার মধ্যস্থ সমস্ত ভাব ও তথ্যের যাবতীয় চিহ্নই এর আওতায় ধরা হয়। এইসব চিহ্ন বা সংকেতরূপের উদাহরণ হল আগুন,

ধোঁয়া, ট্রাফিক সিগনাল, সাংকেতিক বর্ণমালা, নিশান, হাবভাব, অঙ্গভঙ্গি, শরীরিভাষা, পোশাকপরিচ্ছদ, শিল্পদ্রব্য, রেলওয়ে টাইমটেবিল, থামসআপ, স্টেটাস সিম্বল প্রভৃতি। পোস্টমডার্ন দার্শনিক জাক দেরিদা এইসব অনেক কিছু মেনে নিয়েও শেষ পর্যন্ত কিছু কিছু ব্যাপারে আপত্তি তোলেন তার মধ্যে প্রধান বিষয় হল প্যারাডিম, কেন-না স্ট্রাকচারালিস্টদের ব্যাখ্যায় শেষ পর্যন্ত একধরনের প্যারাডিম গড়ে ওঠে। যেমন প্রকৃত/সংস্কৃতি, যুক্তি/পাগলামি, বাম/ ডান, ভালো/মন্দ, দেরিদার মতে এই রকম ভাগ অসম্পূর্ণ ও আরোপিত। সোস্যুর ভাষার গঠনবাদী ব্যাখ্যা দিয়েও শেষ পর্যন্ত প্রথাগত অর্থবোধের ধারণাকে মেনে নিয়ে ভাষাগত শব্দরাশির দ্যোতনায় গুরুত্ব দিয়েছেন। আবার সোস্যুর ভাষার ক্ষেত্রে লিখনের ওপরে বচনকে প্রাধান্য দিয়েছেন। কিন্তু দেরিদার মতে এটা পুরোনো অপবিশ্বাস। এর মধ্য দিয়ে দেরিদার ডিকনস্ট্রাকশন হয়ে উঠল পোস্টস্ট্রাকচারাল বিকল্প।

স্তূপ

স্তূপকে পালি ভাষায় থুপ বলে। থুপের প্রকৃত অর্থ হল পাথর বা মাটির ঢিবি। স্তূপ বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধ শিল্পের একটি বিশেষ অঙ্গ এবং সবচেয়ে প্রাচীন নিদর্শন। মৌর্য সম্রাট অশোক তাঁর রাজ্যের নানা স্থানে অনেক স্তূপ এবং গুহা

নং ৩০০. গুলকার : গান্ধারণ স্তূপের ধ্বংসাবশেষ।



নির্মাণের সূচনা করেছিলেন। কিন্তু এগুলি পরিপূর্ণতা লাভ করে শুঙ্গ ও অন্ধ্রযুগে। স্তূপকে বিভিন্ন ভাষায় টোপ, দাগোবা (সিংহলীয় ভাষায়), প্যাগোডা (ব্রহ্মদেশীয় ভাষায়) বলা হয়। স্তূপের উৎপত্তি প্রাক বৌদ্ধযুগে হলেও বৌদ্ধরা প্রধানত বুদ্ধের নানা চিহ্ন যথা দাঁত, হাড়, চুল, নখ প্রভৃতি সংরক্ষণ করতে স্তূপ নির্মাণ করতেন। স্তূপের ভেতর সোনা বা স্ফটিকে তৈরি কাসকেটে এসব জিনিস রক্ষিত থাকত। সাধারণত স্তূপ দেখা যায় বৌদ্ধ বিহারগুলিতে। প্রথমে ইটের এবং তারপরে পাথরের। মনোলিথিক স্তূপও দেখা যায়। তবে তা দেখা যায় চৈত্যগুহার মধ্যে।

স্তূপ নির্মাণের কিছু রীতি আছে। সাধারণভাবে চতুষ্কোণ বেদির ওপর স্তূপ স্থাপিত হয়। মাটির ওপর নির্মিত প্রথম বেদিকে বলে 'বেদিকা'। এর ওপর যে ক্ষুদ্র বেদি নির্মাণ করা হয় তাকে বলে 'মেধী'। মেধীর ওপর অর্ধগোলাকার অংশকে বলা হয় 'অণ্ড'। 'অণ্ড' হল স্তূপের প্রধান অংশ। অণ্ডের ওপর থাকে একটি চতুষ্কোণ অংশ যার নাম 'হর্মিকা'। 'হর্মিকা'র ওপর স্থাপিত হয় সর্বোচ্চ অংশ-'ছত্র'। 'ছত্র' হল বুদ্ধের সার্বভৌম শক্তির প্রতীকী রূপ। পণ্ডিতগণ ছত্রটিকে রাজছত্রের বিকল্পরূপ বলেও মনে করেন। ছত্রের ওপরে থাকে বৃষ্টি জল ধারণের পাত্র। হিন্দু মন্দিরের ক্ষেত্রে এই ধরনের পাত্র হল কলস। স্তূপের চারদিকে থাকে বেষ্টনী বা রেলিং। প্রথম দিকে এই রেলিং কাঠেই তৈরি হত। পরে তা পাথরে তৈরি হয়েছে। প্রবেশ পথের চারদিকে চারটি তোরণ বা প্রবেশপথ থাকে। এইসব তোরণ এবং বেষ্টনীতে পাওয়া যায় বৌদ্ধ শিল্পের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। ভারতে স্তূপের মধ্যে বিখ্যাত হল ভারহুত, সাঁচী, অমরাবতী প্রভৃতি। সাঁচীস্তূপের একটি তোরণ কলকাতার জাদুঘরে রক্ষিত আছে।

স্পঞ্জ (Sponge) সচ্ছিদ্র কঙ্কাল যুক্ত বহুকোশী প্রাণী। সাধারণভাবে সমুদ্রে জন্মায়। তবে মিষ্টি জলেও পাওয়া যায়। এর প্রায় পাঁচ হাজার প্রজাতি পাওয়া যায়। বৈজ্ঞানিক নাম ফাইলাম পোরিফেরা। বেশিরভাগ স্পঞ্জ হল ফাঁপা চোঙ যার মাথার দিকে একটা বড়ো খোলা মুখ বা হাঁ থাকে। এর মধ্য দিয়ে স্পঞ্জ জল এবং বর্জ্য বের করে দেয়। এর পাতলা

বহিরাবরণের তলায় থাকে ফুটোফুটো একটা কঙ্কাল যা হল স্পঞ্জের মূল শরীর। এটা তৈরি হয় ক্যালসিয়াম কার্বোনেট, সিলিকা বা বালি দিয়ে, এবং সেই সঙ্গে প্রায় আশিভাগ স্পঞ্জেই থাকে স্পঞ্জিল তথা প্রোটিন জাতীয় এক রকম পদার্থ। স্পঞ্জের শরীর ব্যাসে বা লম্বায় ১ ইঞ্চি থেকে কয়েক গজ পর্যন্ত হতে পারে। স্পঞ্জের গড়ন আঙুলের মতো বা গাছের মতো হতে পারে কিংবা আকৃতিহীনও হতে পারে। কিছু স্পঞ্জের কাঠামো শক্ত হয়। কিন্তু নরম এবং খুব নমনীয় স্পঞ্জ স্নান এবং প্রসাধনী কাজে ব্যবহার করা হয়। শিল্পীদের কাজেও স্পঞ্জের গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার আছে। অনেক শিল্পী স্পঞ্জকে ছবির ওপর রঙের ছোপ দেওয়া বা লেপার কাজে ব্যবহার করেন বিশেষ বুনন তলসম্পন্ন এফেক্ট তৈরি করার জন্য। প্রাকৃতিক স্পঞ্জের আকার অনিয়তাকার। কিন্তু গৃহস্থালির কাজে যে চৌকো ধরনের স্পঞ্জ দেখা যায় সেগুলো সাধারণত সিনথেটিক। সিনথেটিক স্পঞ্জের বুনট অনেক বেশি সুসমান। এর দ্বারাও বুনট এফেক্ট সৃষ্টি করা যায় এবং অবশ্যই পরিষ্কার করার কাজে ব্যবহার করা যায়।



হ

হলোগ্রাফি (Holography)

হলোগ্রাফি শব্দ এসেছে গ্রিকভাষা থেকে। সাধারণভাবে যার অর্থ সামগ্রিক চিত্রণ। লেসার রশ্মিকে কাজে লাগিয়ে লেন্স ব্যবহার না করেই রেকর্ড করা বা কোনো বস্তুর ত্রিমাত্রিক প্রতিবিম্ব তৈরি করার একটি পদ্ধতি। ১৯৪৭ সালে এই পদ্ধতির উদ্ভাবন করেন হাঙ্গেরীয়-ব্রিটিশ পদার্থবিদ ডেনিশ গ্যাবর এবং এই কারণে ১৯৭১ সালে তিনি নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

এই পদ্ধতি অনুযায়ী অর্থাৎ হলোগ্রাম তৈরি করতে স্বাভাবিক লেসার রশ্মিকে দু-ভাগে বিভক্ত করে ফেলা হয়। অর্ধেক রশ্মিগুচ্ছ সরাসরি রেকর্ডিং মিডিয়াম অর্থাৎ আলোক সুবেদী তল বা ফোটোগ্রাফিক প্লেটের ওপর আপতিত হয়। বাকি অর্ধেক যে বস্তুর রেকর্ড করা হবে তার থেকে

প্রতিফলিত হয়ে ফোটোগ্রাফিক প্লেটের ওপর এসে পড়ে। এই দুই রশ্মিগুচ্ছ একত্র হয়ে প্লেটের ওপর সংঘৃষ্ট ডোরাকাটা এবং কুণ্ডলী আকারের নকশা সৃষ্টি করে। পরিস্ফুট এই প্লেটটি হচ্ছে হলোগ্রাম। এই প্রতিবিম্ব পুরোপুরি ত্রিমাত্রিক। এটা যেকোনো কোণ থেকে দেখা যাক না কেন সম্পূর্ণ সুসংগত এবং দেখতে ও উপলব্ধিতে ঠিক যেন বাস্তব জগতের মতো শুধু স্বাভাবিক রংটুকু ছাড়া। হলোগ্রামের ছবি যেন প্রতিফলিত তলের সামনে ভেসে থাকে। ফলে এই হলোগ্রাফিক প্রতিরূপ-এ বস্তুটির অনুপস্থিতি সত্ত্বেও মনে হয় যেন বস্তুটিকে সরাসরি চাক্ষুষ করা হচ্ছে।

হাই রেনেসাঁস (High Reneissance)

শীর্ষ রেনেসাঁস। এই সময়টাতেই ইউরোপীয় রেনেসাঁস শিল্পকলা চূড়ান্ত বিকাশ লাভ করেছিল। সাধারণভাবে ১৪৯৫ থেকে ১৫২০ সাল পর্যন্ত সময়কাল হল রেনেসাঁসের শীর্ষ পর্যায়। এই যুগের প্রতিমূর্তি হল র‍্যাফায়েল, মাইকেলাঞ্জেলো, দা ভিঞ্চি প্রমুখের শিল্পকর্ম।

হাইলাইট (Highlight)

কোনো বস্তুর পৃষ্ঠতলের সর্বোচ্চ মাত্রার উজ্জ্বল অংশ। চিত্র কলা চর্চায় এই বিষয়টি একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়, বিশেষ করে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে। যেকোনো বস্তুর ওপর কয়েক রকমের আলো আপতিত হয়। বস্তুর সরাসরি আলোক উৎসের দিকে থাকা অংশটি উজ্জ্বল হয়। ধীরে ধীরে বস্তুর যে অংশ আলোক উৎসের থেকে দূরে সরে যায় সেই অংশে আলোর পরিমাণও কমতে থাকে। আলোক উৎসের বিপরীত দিকে থাকা বস্তুর গায়ে সৃষ্টি হয় ছায়া। ছায়ার অংশেও যেমন ছায়ার ঘনত্বের তারতম্য ঘটে তেমনি আলোকিত অংশেও উজ্জ্বলতার তারতম্য থাকে। আলোকিত অংশের মধ্যের সর্বোচ্চ উজ্জ্বল বিন্দুই হল হাইলাইট। বস্তুর চরিত্রের ওপর হাইলাইটের কিছুটা বৈশিষ্ট্য নির্ভর করে। যেমন একটি পোরসিলেন-এর চকচকে পাত্রের গায়ের হাইলাইট পোড়ামাটির হাইলাইটের পাত্রের মতো হয় না।

হাডসন রিভার স্কুল (Hadson River School)

ছবি নং ১৯৩ পৃ. ৩৭১

১৮২০ থেকে ১৮৫০ সালের সময়কালে চর্চারত উত্তর আমেরিকার এক শিল্পীগোষ্ঠী। এঁদের চিত্রকলার বিষয় ছিল মূলত হাডসন নদী উপত্যকা এবং ক্যাটস্কিল পর্বতমালার দৃশ্যাবলি। ছবির ধরন ছিল রোমান্টিক ও বাস্তবধর্মী এবং ছবির আকারও ছিল বেশ বড়ো। গোড়ার দিকে এই গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত শিল্পীরা ছিলেন থমাস ডটি, অ্যাশের ডুরান্ড,

থমাস কোলি প্রমুখ। এঁরা প্রত্যেকেই খোলা হাওয়ায় ছবি আঁকতেন। অন্য যাঁরা এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন স্যামুয়েল এফ. বি. মোরসে, জন কেনসেট, জর্জ ইনেস, ফ্রেডারিক এডুইন চার্চ। তবে এঁদের অনেকেই আক্ষরিকভাবে হাডসন ভ্যালিতে ছবি আঁকতেন না। তাঁরা বস্তুত আমেরিকার রোমান্টিক ভূ-প্রকৃতিকে নিয়ে ছবি আঁকতেন যার সঙ্গে হাডসন স্কুলের ভাবগত মিল

হাফটোন (Halftone)

হাফটোন শব্দটি মুখ্যত মুদ্রণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত একটি বিষয়। টোন বা টোনাল ভ্যালু শব্দদুটি চিত্রকলার অত্যন্ত পরিচিত উপাদান যা ছবিতে আলোছায়াকে ব্যক্ত করে। কিন্তু এই আলোছায়াকে ছাপতে গেলে মুদ্রণ তলের যে বৈশিষ্ট্য দরকার তাই হল হাফটোন। এটা সম্পূর্ণই বাণিজ্যিক মুদ্রণ পদ্ধতির (Reproduction) একটি কৌশল (Technique) যা শুরু হয় ১৮৭৬ সাল নাগাদ। এর বৈশিষ্ট্য হল, এতে আলোছায়ার যে তারতম্য অর্থাৎ একটা টোন থেকে আর একটা টোনে যাওয়ার যে ক্রমান্বয় তাতে দৃশ্যত কোনো ছেদ থাকে না।

মুদ্রণে দু-ধরনের কর্তন বা কাট এবং এনগ্রেভিং ব্যবহৃত হয়। লাইন কাট এবং হাফটোন কাট। লাইন কাট-এ যে ধরনের নকশা ছাপা হয় তা সরাসরি সাদা এবং ঘন কালো ভাবলেখ। কিন্তু হাফটোনে যে নকশা বা ছবি ছাপা হয় তাতে সাদা এবং ঘন কালো ছাড়াও ছাই রঙের মধ্যবর্তী কিছু টোন থাকে। একাজে নকশা বা ছবিকে বিশেষ ফোটোগ্রাফিক পদ্ধতিতে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুটকিতে ভেঙে ফেলা হয়। সুষমভাবে সন্নিবদ্ধ এই ফুটকি বা ডটগুলির আকার ও আয়তনের মধ্যে ভিন্নতা থাকে। সন্নিবদ্ধ ডটগুলির ঘনত্বের নিবিড়তা টোনের তারতম্যকে ফোটাতে সাহায্য করে। অর্থাৎ যেখানে ডটগুলি সম্পূর্ণ এবং ঘন সন্নিবিষ্ট সেখানেই ছবির টোন বেশি ডার্ক। আর যেখানে ডটগুলি ছোটো এবং ফাঁকা ফাঁকা সেখানে টোনও হালকা হয়। হাফটোন পদ্ধতির ফোটোগ্রাফির জন্য ব্যবহার করা হয় বিশেষ ধরনের স্ক্রিন। যাকে বলে হাফটোন কনট্যাক্ট স্ক্রিন। এই স্ক্রিনে থাকে নিয়ত ও সুষমভাবে সন্নিবদ্ধ অসংখ্য ফুটকি। এর সাহায্যে ক্যামেরার ভেতর হাফটোন নেগেটিভ

তৈরি করা হয়। এই স্ক্রিনের নানারকম মান আছে। যেমন ৬৫ লাইন স্ক্রিন। এর অর্থ হল ১ ইঞ্চি লম্বা সারিতে ৬৫টা ফুটকি থাকে। এরকমভাবে ৩২ থেকে ২৫০ স্ক্রিন পর্যন্ত পাওয়া যায়। তবে আজকাল কম্পিউটারের সাহায্যে ক্যামেরার ব্যবহারের ফলে হাফটোন পজিটিভ তৈরির প্রক্রিয়া প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে।

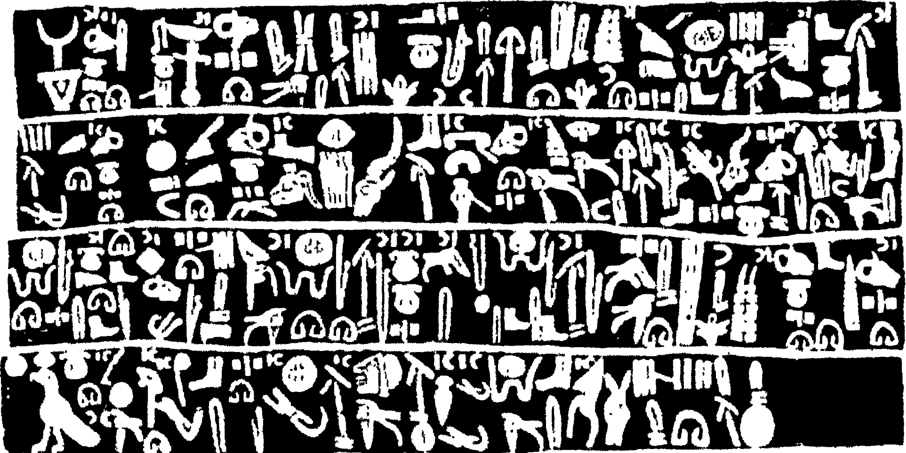
হাফ-লেংথ (Half-length)

একটি আদর্শ ছবির মাপ। মোটামুটি ৫০ × ৪০ ইঞ্চি বা ১২৭ × ১০২ সেন্টিমিটার। যা স্কেল অনুযায়ী পূর্ণাবয়বের অর্ধেক সাইজের প্রতিকৃতি। এছাড়াও স্কেল নিরপেক্ষভাবে হিউম্যান ফিগারের অর্ধেক প্রতিকৃতি চিত্রণকেও বলে হাফ-লেংথ। যেমনটি ছিল ষোড়শ শতাব্দীর মাস্টারদের হাফ-লেংথ নারী প্রতিকৃতি।

হায়ারোগ্লিফিক্‌স (Hieroglyphics)

চিত্রলেখ বা প্রতীক লিখনের প্রাচীন পদ্ধতি। গ্রিক ভাষায় এর অর্থ হল 'পবিত্র উৎকিরণ' ('Sacred Carvings')। যদিও হায়ারোগ্লিফিক্‌স শব্দটি সাধারণভাবে প্রাচীন ইজিপ্টের লিখন পদ্ধতি বোঝাতেই ব্যবহার করা হয় কিন্তু আরও অনেক প্রাচীন সভ্যতা ছিল যেমন মায়া, ক্রিটান ইত্যাদি যাতে চিত্রলেখ বা ভাবলেখ ব্যবহৃত হত। ইজিপশিয়ান হায়ারোগ্লিফিক্‌সের চূড়ান্ত পাঠোদ্ধার সম্ভব হয় বিখ্যাত 'রোসেটা স্টোন' আবিষ্কারের পর। ১৭৯৯ সালে একদল ফরাসি সৈন্য ইজিপ্টের রোসেটা নামে এক শহরে এই স্টোনের সন্ধান পায়। এই পাথরে তিনটে বর্ণমালায় যথা গ্রিক, হায়ারোগ্লিফিক এবং ডোমোটিক পদ্ধতিতে আলাদা

নং ৩০১. হিটাইট হায়ারোগ্লিফিক্‌স লিপির একটি অংশ।



আলাদাভাবে একটিমাত্র 'আদেশ' উৎকীর্ণ করা ছিল। ডেমোটিকও এক ধরনের ইজিপ্টীয় ভাষা যা ব্যবসাবাণিজ্য এবং সারস্বত সমাজে ব্যবহৃত হত। গ্রিক বর্ণমালার সঙ্গে ডেমোটিক এবং হায়ারোগ্লিফিক্‌সের তরজমাকে মিলিয়ে গবেষকেরা শেষপর্যন্ত ১৮২২ সালে হায়ারোগ্লিফিক্‌সের পাঠোদ্ধার করতে সক্ষম হন। এই সাফল্যের পিছনে দুজন মানুষের অবদান অসামান্য। এঁরা হলেন ফরাসি ইজিপ্টবিদ জঁ ফ্রঁসোয়া শঁপোইয়ঁ এবং ব্রিটিশ পদার্থবিদ থমাস ইয়ং।

হায়ারোগ্লিফিক্‌সের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন সংগৃহীত নিদর্শন হল রাজতন্ত্র পূর্ব যুগে প্রায় ৩১৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে নির্মিত আবদসে সমাধিতে প্রাপ্ত হাড়ের ওপরের তকমায়। আর শেষ হায়ারোগ্লিফিক্‌স উৎকীর্ণ করা হয়েছিল ২৪ আগস্ট ৩৯৪ খ্রিস্টাব্দে ফিলে-তে। প্রাচীন ইজিপ্টের কথ্য ভাষায় প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ঘটলেও লেখার পদ্ধতিতে বেশ কিছুটা রক্ষণশীলতা ছিল। বিশুদ্ধ হায়ারোগ্লিফিক্‌স প্রাথমিকভাবে ব্যবহৃত হয় মন্দির এবং সমাধি সৌধের। সেই কারণে গ্রিকভাষায় একে বলা হয় 'পবিত্র উৎকিরণ'। হায়ারোগ্লিকিসে শুধুমাত্র ব্যঞ্জনবর্ণকে রেকর্ড করা হয়। এর মূল তিনটি চিহ্ন হল— ফোনেটিক, যা ধ্বনিজ্ঞাপক, লোগোগ্রাফিক— যা অর্থজ্ঞাপক, ডিটারমিনেটিভ— যা সাধারণ ধারণা ও সিদ্ধান্তজ্ঞাপক। হায়ারোগ্লিফিক্‌সে দুটো শব্দের মধ্যে ফাঁক রাখা হয় না। হায়ারোগ্লিফিক্‌স অনুভূমিকভাবে বাঁ দিক থেকে ডান দিকে বা ডান দিক থেকে বাঁ দিকে কিংবা প্রয়োজনমতো ওপর থেকে নীচে লম্বভাবে লেখা যায়। লেখা এবং আঁকার উপস্থাপনার পদ্ধতি একই রকম। কখনো-কখনো ব্যক্তিগত পছন্দের কিছু সংকেতও ব্যবহার করা হত। ফ্যারাওদের যুগে হাজারখানেক চিহ্ন ব্যবহৃত হত যা টলেমিক ও রোমান যুগে বেড়ে হয়েছিল ছ'হাজারেরও বেশি।

হারমোনি (Harmony)

রচনা বা কম্পোজিশনে একই গুণ সম্পন্ন বস্তু বা বিষয়ের মধ্যের সম্পর্ক হল হারমোনি। এই সম্পর্ক সাদৃশ্যপূর্ণ হতে পারে ভাবগতও হতে পারে। যেমন নানা ধরনের হলুদ রঙের কতকগুলি বস্তুকে ব্যবহৃত করে রচিত কম্পোজিশনে যে হারমোনি সৃষ্টি হয় তা হল বর্ণগত হারমোনি। আবার কোনো ছবিতে হাঁড়ি, কড়াই, হাতা, উনুন, বাটি ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়েছে। এক্ষত্রে বস্তুগুলি পারস্পরিকভাবে

উপযোগিতার সূত্রে সম্পর্কিত অর্থাৎ এদের ব্যবহারিক গুণের মিল রয়েছে, তাই এখানেও হারমোনি সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু যদি এমন হয় গাড়ির টায়ার, কাপ, পেন, পালক সাজিয়ে কম্পোজিশন তৈরি করা হয়েছে তাহলে এখানে হারমোনি সৃষ্টি হল না। কেন-না বস্তুগুলির মধ্যে গুণগত কোনো সম্পর্ক নেই।

হারমোনিক প্রোপরশন (Harmonic proportion)
স্থাপত্যের গঠনগত অনুপাতের একটি পদ্ধতি। এর উদ্ভব ইউরোপের রেনেসাঁসের যুগের স্থপতিদের হাতে। তাঁরা তারবাদ্যের সুর সৃষ্টির প্রক্রিয়ার সঙ্গে এর সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছিলেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যদি দুটো তার, যাদের একটি লম্বায় অন্যটির দেড়গুণ, একসঙ্গে কেঁপে ওঠে, তাহলে ওদের স্বরকম্পনের (Pitch) মধ্যে তফাৎ হবে এক অষ্টক। যদি তাদের দৈর্ঘ্যের হার হয় ২:৩ তাহলে এই স্বরকম্পনের তফাৎ হবে এক পঞ্চক। যদি এই দৈর্ঘ্যের হার ৩:৪ হয়, তাহলে তফাৎ হবে এক চতুষ্ক। এর অর্থ হল এই সাংগীতিক অনুপাত অনুযায়ী যদি গৃহনির্মাণ করা যায় তাহলে তা অনিবার্যভাবেই নয়নাভিরাম হবে।

হিউ (Hue)
হিউ হল নির্দিষ্ট রঙের নাম। অর্থাৎ যা নির্দিষ্ট কোনো রংকে বোঝায়। যেমন নীল, লাল, সবুজ, হলুদ এগুলি হল হিউর উদাহরণ। ভাষাগতভাবে বাংলায় হিউর যথার্থ কোনো প্রতিশব্দ নেই। বাংলায় রং, বর্ণ, রঞ্জক এই গোটা তিনেক শব্দ প্রায় একই অর্থকে ব্যক্ত করে। কিন্তু ইংরেজিতে কালার, পেন্ট, পিগমেন্ট, কালার‍্যান্ট, হিউ, ডাই, লেক ইত্যাদি অনেকগুলি শব্দ আছে যার প্রতিটি নির্দিষ্ট কিছু গুণকে ব্যক্ত করে। যেমন 'দ্য কালার অব দ্য হিউ ইজ ক্রিমসন'। বাংলায় 'হিউ'র প্রতিশব্দ হিসাবে শব্দটিকে কেউ কেউ 'বর্ণনাম' বা 'বর্ণাভা' ব্যবহার করেছেন।

হিস্ট্রি পেন্টিং (History painting)
এক ধরনের প্রতিকৃতি চিত্রাঙ্কন। এসব ছবি হল ঐতিহাসিক ঘটনা বা কোনো কিংবদন্তির বর্ণনা। ছবিতে ইচ্ছাকৃতভাবে মহত্ত্ব ও আভিজাত্য আরোপ করে আঁকা হত। যদিও পঞ্চদশ শতাব্দীতে আলবের্তি একের বেশি ফিগারকে নিয়ে আঁকা ছবির ক্ষেত্রে 'ইস্তোরিয়া' শব্দটি ব্যবহার করেন। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর আকাদেমিক তাত্ত্বিকগণ হিস্ট্রি পেন্টিংকে ধর্মীয় চিত্রকলার পরেই উচ্চ ধরনের ছবি হিসাবে স্বীকৃতি

দিয়েছিলেন। হিস্ট্রি পেন্টিং-এর আর একটা ধরন হল 'গ্র্যান্ড ম্যানার'। অষ্টাদশ শতাব্দীর শীর্ষস্থানীয় কিছু তাত্ত্বিক ছিলেন এর প্রবক্তা। বিশেষ করে ব্রিটিশ চিত্রকর স্যার জশুয়া রেনল্ডস তাঁর তৃতীয় ও চতুর্থ 'discourse' -এ যথাক্রমে ১৮৭০, ১৮৭১ সালে এই ধরনের ছবির প্রস্তাব করেন। তিনি বলেছিলেন সমকালীন শিল্পকলাকে ইতালীয় রেনেসাঁস-এর মাস্টারদের এবং অ্যান্টিক উভয় প্রভাবকেই আত্মস্থ করার চেষ্টা করা উচিত। তাঁর এই তত্ত্বকে তিনি প্রতিকৃতি অঙ্কনের ক্ষেত্রেও প্রসারিত করেছিলেন। জশুয়ার নিজের ছবিই এর উদাহরণ। যা দেখলে বোঝা যায় তিনি অ্যাপোলে বেলভেডার-এর মতো ধ্রুপদি মূর্তির অভিজাত ভঙ্গিরূপকে গ্রহণ করেছিলেন।

হিস্টোরিসিজ্‌ম (Historicisism) — ঊনবিংশ শতাব্দীতে সংঘটিত ঐতিহাসিক শৈলীর পুনরুজ্জীবন। এই পুনরুজ্জীবন বিশেষ করে ঘটেছিল স্থাপত্যে এবং আলংকারিক শিল্পে।

হেগ স্কুল (Hague School) — ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যপর্ব থেকে শেষ অবধি সক্রিয় ডাচ শিল্পীদের একটি গোষ্ঠী। এঁদের কর্মস্থল ছিল মূলত হল্যান্ড। সপ্তদশ শতাব্দীর ডাচ ল্যান্ডস্কেপ পেন্টার জ্যাকব ভ্যান রুইসডেল, পলাস পটার, ইংরেজ ল্যান্ডস্কেপ শিল্পী জন কনস্টেবল সহ বারবিজোন স্কুল ছিল এঁদের প্রেরণার উৎস। এই দলের সদস্যদের লক্ষ্য ছিল এঁদের অঞ্চলের যথাযথ অথচ গীতিধর্মী দৃশ্যচিত্র অঙ্কন। যা উৎকর্ষের দিক দিয়ে বায়ুমণ্ডলের আলোর গুণাগুণকেও ছাপিয়ে যাবে। মজার ব্যাপার হল এঁদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত শিল্পী ছিলেন যোসেফ ইস্রায়েল। কিন্তু ল্যান্ডস্কেপ আঁকতেন না। তিনি ফরাসি শিল্পী মিলের মতো চাষিদের জীবনের দুঃখকষ্ট সংগ্রাম নিয়ে ছবি আঁকতেন। এই দলের অন্যান্য বিশিষ্ট শিল্পীরা ছিলেন জোহানেস বসবুঁ, ম্যারিস ব্রাদার্স, ভ্যান গঘের কাকা অ্যান্তন মভ, হেনড্রিক উইলেম মেসড্যাগ এবং হেনড্রিক ওয়েসেনব্রুক। হেগের দুটো বিখ্যাত মিউজিয়াম মেসড্যাগ মিউজিয়াম এবং জেমিন্‌টার মিউজিয়ামে এঁদের ছবি রাখা আছে।

হীরক সূত্র বা ডায়মন্ড সূত্র — এখনও পর্যন্ত জানা বিশ্বের প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ। কাঠের ব্লকে ছাপা বুদ্ধদেবের ধর্মোপদেশের সংকলন। পশ্চিম চিনের তুং হুয়াং-এ হাজার বুদ্ধের গুহায় এই বইটি প্রায় অক্ষত অবস্থায়



নং ৩০২. প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ -- হীরক সূত্রের প্রথম পাতার অংশ। তাং যুগ। ৮৬৮ খ্রিস্টাব্দ। মূল গ্রন্থটির মাপ ২৯X৫৩৩ সেমি.।

পাওয়া গেছে। প্রায় ৯৫০ বছর আগে বইটিকে সিল করে রাখা হয়েছিল। বইটির উন্নত মুদ্রণকৌশলের পেছনে নিশ্চিতভাবেই মুদ্রণ প্রক্রিয়ার দীর্ঘ বিবর্তনের ইতিহাসও আছে। বইটিতে ৬টি পাতায় text-এর সঙ্গে আছে একটি ছোটো পাতার উডকাট। সবকটি পাতা নিখুঁত করে জুড়ে ১৬ ফুট লম্বা রোল তৈরি করা হয়েছিল। এর পদ্ধতি কৌশল শুধু চমৎকারই নয়, এটা আদিকালে জাপানে বৌদ্ধমন্ত্র ছাপানোর ধরন থেকেও আলাদা। বইটির শেষে ছাপানো বিবরণ থেকে জানা যায় যে, জনৈক ওয়াং চেই ১১ মে ৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে তাঁর পিতামাতার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাতে এবং তাঁদের স্মৃতিকে অমর করে রাখতে বিনামূল্যে বিতরণের জন্য বইটি ছেপেছিলেন।

হেটুরে আর্ট

প্রখ্যাত শিল্পী অসিত কুমার হালদারের বই 'রূপদর্শিকা'-তে এই নামে একটি প্রবন্ধ আছে। এখানে হেটুরে আর্ট গ্রাম্য আর্টের সমার্থক। অর্থাৎ যে শিল্পকলা বাজারে পণ্য হিসাবে বিক্রির জন্য তৈরি হয় এবং পণ্যের মতোই বিক্রি করা হয়।

আনুমানিক চারশো খ্রিস্টপূর্বাব্দে প্রাচীন ব্যাকরণবিদ পাণিনি দুই ধরনের শিল্পকলার উল্লেখ করেছিলেন। ১. গ্রাম্য শিল্পকলা, ২. রাজশিল্প। গ্রাম্যশিল্পকলা হল সেই শিল্প যা পণ্য হিসাবে লোকেরা হাটবাজার থেকে ক্রয় করে ঘর সাজানো বা অন্য কোনো কাজে ব্যবহার করেন আর রাজশিল্প হল ললিতকলা বা ফাইন আর্ট যার প্রাচীন দৃষ্টান্ত হল গুপ্তযুগের অজন্তার ফ্রেস্কোমালার ছবি।

প্রাচীন মানুষের জীবনের প্রয়োজনে তাদের সংস্কৃতি জাত শিল্পের ধারা আদিবাসীদের একটি অংশের সমাজে প্রচলিত

নানা মূর্তি ও বস্তুর মধ্যে এখনও বিদ্যমান। এঁদের একটি অংশ সংঘবদ্ধ হয়ে নগর সভ্যতার মতো সমাজ গড়ে তোলে। যেখানে স্থাপিত হাটবাজারে অন্যান্য দ্রব্যাদির সঙ্গে মূর্তি, পুতুল, পটচিত্র ইত্যাদিও কেনাবেচা শুরু হয়। এই যে পণ্যধর্মী শিল্প এগুলিই হল হেটুরে আর্ট বা 'বাজার শিল্প'। গবেষক শ্রীপান্থ বটতলার ছবিকেও এ ধরনের বাজার শিল্প বলে অভিহিত করেছেন। প্রথমদিকে হেটুরে আর্ট তৈরি হয় মৃৎশিল্পী ও পটুয়াদের হাতেই। পরে এর উৎপাদন প্রক্রিয়ার যন্ত্রের প্রয়োগ ঘটে। বটতলার ছাপাই ছবি তারই নমুনা। দামও কম হত বলে সাধারণ লোক এই শিল্প কিনে শখ মেটাতে পারত। ক্রমে ক্রমে এই শিল্প আরও উন্নত হয়েছে। গুণমানেও সমৃদ্ধ হয়েছে। ছোটো হাতে তৈরি মাটির পুতুল যেমন হেটুরে আর্ট বা গ্রাম্য শিল্পের নমুনা তেমনি বলা যেতে পারে কুমারটুলির প্রতিমাও হেটুরে আর্টের উন্নত ধরনের সংস্করণ।

হেবকু (Haboku)

জাপানি ভাষায় এর অর্থ হল ছড়ানো কালি। ফ্রিব্রাশ কালিচিত্রের শৈলীর একেবারে শেষ পর্যায়ের একটি রূপ। চিনের দক্ষিণ সুং-এ ৯৬০ থেকে ১২৭৯ খ্রিস্টাব্দে এই শৈলী জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। চিনা শিল্পীদের পাশাপাশি জাপানি শিল্পীরাও এই রীতিতে ছবি এঁকেছেন। পঞ্চদশ শতাব্দীতে এই রীতির একজন বিশিষ্ট জাপানি শিল্পী ছিলেন সেশু।

হোয়াইট লাইন এনগ্রেভিং (White line Engraving)

হার্ডউড ব্লকে তৈরি এক ধরনের এনগ্রেভিং বা মুদ্রণতল। এটি রিলিফ প্রিন্টিং পদ্ধতির অঙ্গ। এতে মুদ্রণতলে নকশাকে কেটে তুলে ফেলে বাকি তলে কালি লাগিয়ে ছাপ নেওয়া হয়। ফলে কালোর মধ্যে সাদা রেখায় ছবি ফুটে ওঠে।

হ্যাচিং (Hatching)

পাশাপাশি টানা সাধারণভাবে সমান্তরাল ছোটো ছোটো রেখার সমষ্টি। হ্যাচিং ব্যবহার করা হয় বুনট বা আলো-ছায়া বা বর্তনাগুণ বোঝাতে। হ্যাচিং-এর রেখা সরুমোটা দুইই হতে পারে এবং রেখার মধ্যবর্তী ফাঁকগুলি সঙ্কীর্ণ বা চওড়া দুইই হতে পারে। যাই হোক, তার মধ্যে সামঞ্জস্য থাকা বাঞ্ছনীয়। তবে এটা সম্পূর্ণ শিল্পীর পছন্দ ও প্রয়োজন নির্ভর। যেকোনো মাধ্যমেই হ্যাচিং লাইন টানা গেলেও সাধারণভাবে চারকোল পেন্সিল এবং পেন অ্যান্ড ইংকের ক্ষেত্রেই বেশি ব্যবহৃত হয়।

একসময় এগ টেম্পারা শিল্পীরা তাঁদের চিরাচরিত প্রথায় অসংখ্য ছোটো ছোটো টানের মাধ্যমে ছবি তৈরির কাজে হ্যাচিং ব্যবহার করতেন। সম্ভবত এগ টেম্পারাতে বেশি ব্যবহৃত হত ক্রস হ্যাচিং যা হল একসারি ছোটো সমান্তরাল রেখার ওপরে ভিন্ন কোণ থেকে টানা আর একসারি তির্যক রেখা।

হ্যাপেনিং (Happening)

ঘটনা শিল্প। হ্যাপেনিং হল কার্যত একটি অনুষ্ঠান। নাটক, সংগীত এবং দৃশ্যকলা এই তিনের সমন্বয়ে শিল্পীর নির্দেশিত বা উপস্থাপিত একটি শিল্পরূপ। হ্যাপেনিংস-এর আদি লক্ষণ দেখা যায় ইতালির ফিউচারিস্ট আন্দোলনের উপস্থাপনার মধ্যে। ১৯০৯-এ ইতালির কবি ফিউচারিজ্‌মের প্রবর্তক মারিনেত্তি ঘোষণা করেছিলেন যে তাঁর লক্ষ্য হল শ্রোতাদের শক দেওয়া। তা করা হবে তাদের নির্বোধ ভোগবাদী ভূমিকাকে ধরেই। আজকের বেশির ভাগ পারফর্ম্যান্সের তত্ত্ব হল দর্শক শুধু নীরবে দেখেই যাবে না, তাকে সমগ্র অনুষ্ঠানের অংশ নিতে হবে। প্রখ্যাত জার্মান শিল্পী ও মঞ্চ রূপকার অসকার স্কেহ্‌লমারের নির্দেশে বাউহাউসের মঞ্চ অনুষ্ঠান ছিল আর এক ধরনের হ্যাপেনিংস বা ঘটনা শিল্প। যা নাটক, নৃত্য, সংগীত, চিত্রকলা এবং প্রযুক্তির প্রচলিত গণ্ডিকে ভেঙে দিয়ে নতুন ধরনের হ্যাপেনিংস-এর পথিকৃত হয়ে ওঠে এবং এসবকে আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনার মধ্যে একত্রিত করে।

একই সময়ে দাদাবাদী এবং সুরিয়ালিস্টরাও চরিত্রের দিক থেকে কাছাকাছি আরও কিছু হ্যাপেনিংসকে অনুষ্ঠিত করেছিলেন। তাঁরা প্রচলিত শৈল্পিক মূল্যবোধে বিপ্লব ঘটালেন এবং সমকালীন সামাজিক, রাজনীতিক ও সাংস্কৃতিক ধারণাকে নিয়ে নানা অকল্পনীয় ও অদ্ভুত বিবরণকে ব্যবহার করলেন। এরকম একটা পরিস্থিতিতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে এক ধরনের আর এক শিল্পধারা পরিবেশবাদী শিল্পের উদ্ভব ঘটে। সমকালীন হ্যাপেনিংস-এর কাছে যা অনেক বড়ো স্বীকৃতির বিষয়। দাদাবাদী এবং সুরিয়ালিস্টরা অনেকগুলি পরিবেশবাদী শিল্পকর্ম তৈরি করেছিলেন। যেমন ১৯০২ সালে দাদাবাদী মার্সেল দুসঁপ পাকানো সুতো দিয়ে প্যাঁচানো একটি ঘরকে প্রদর্শিত করেছিলেন। তবে ১৯৫০

সালে পপ আর্টের সূত্রপাত হওয়ার পরে বিশেষ করে ক্লেস ওলডেনবার্গ প্রমুখের কাজের ফলে পরিবেশবাদী শিল্প ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়।

হ্যাপেনিংস এবং পারফর্ম্যান্স আর্ট কখনো-কখনো সমার্থক। যদিও পারফর্ম্যান্স আর্ট অনেক বেশি নাটকীয় এবং সতর্কভাবে সংগঠিত অনুষ্ঠান যাতে দর্শকরাও কখনো-কখনো অংশগ্রহণ করে।

ফর্ম হিসাবে হ্যাপেনিংস সুনির্দিষ্ট রূপ পায় কার্যত ১৯৫৭-৫৮-তে। রাশিয়ান বংশোদ্ভূত আমেরিকান শিল্পী অ্যালান কাপ্রৌ ১৯৫৯ নিউইয়র্কে ৬ ভাগে বিভক্ত ১৮টি হ্যাপেনিংস উপস্থাপিত করেছিলেন। ১৯৫০-এ আমেরিকার ব্ল্যাক মাউনটেন কলেজে সংগীতকার জন কেজ-এর 'অনুষ্ঠান' কাপ্রৌ এবং ডাইন-এর ওপর বেশ প্রভাব ফেলেছিল। জন কেজ-এর সঙ্গে ছিলেন পপ শিল্পী রবার্ট রাসখেনবার্গ, জ্যামপার জনস প্রমুখ।

হ্যাপেনিংস-এর চেহারাটা থিয়েটারের মতো হলেও এটা থিয়েটারের থেকে আলাদা। হ্যাপেনিংস গড়ে ওঠে কতকগুলি পরিবর্তনশীল পরিকল্পনাকে (scheme) ভিত্তি করে। এতে সুযোগমতো নতুন কিছু সংযোজন করা হয় এবং তার ফলে হঠাৎ হঠাৎ নতুন পরিবর্তন ঘটে। থিয়েটারের ক্ষেত্রে নাট্য সংলাপ এবং বাচিক রীতি মেনে চলা বাধ্যতামূলক। কিন্তু হ্যাপেনিংস শুধুমাত্র লেখকের দেওয়া রূপরেখাটুকুই গ্রহণ করে বাকিটা তাৎক্ষণিক এবং কোনো পূর্ব নির্ধারিত ভাষ্য ভিত্তিক নয়। ফলে তা বারবার পালটাতে পারে। জন কেজ-এর ব্ল্যাক মাউনটেন অনুষ্ঠানের খানিকটা ছিল এরকম যে, প্রত্যেক দর্শকের আসনে একটা খালি কাপ রেখে দেওয়া হয়েছিল। সেই সঙ্গে একসাথে সংগীত. কাব্য, চলচ্চিত্র, নাচ ও উদ্ভট আওয়াজ ইত্যাদি উপস্থাপন করা হচ্ছিল। তারপর হ্যাপেনিংসের উপস্থাপকেরা সাদা পোশাকে কাপগুলিতে কফি ঢেলে ভরতি করে দিয়েছিলেন।

আমেরিকান হ্যাপেনিংস-এর অন্যতম শীর্ষস্থানীয় উপস্থাপক এবং তথ্যকার কাপ্রৌ ফিনিশড প্রোডাক্ট বা সম্পন্ন-কাজের চেয়ে কাজের আয়োজন এবং প্রক্রিয়া প্রদর্শনে আগ্রহী ছিলেন। স্বভাবতই তিনি ছবি আঁকা কিংবা কোলাজ তৈরি করা দেখতেই দর্শকদের আমন্ত্রণ জানাতেন

এবং ধ্বনি আলোর ব্যবহার করতেন। এমনকি ঘটনাক্রমে দর্শকরা সেই কাজে অংশও নিতেন।

১৯৬০-এর দশকে সারা পৃথিবীতেই হ্যাপেনিংস-এর চর্চা শুরু হয়। এই সময়ের একজন প্রখ্যাত জাপানি শিল্পী জোজোই কাজুমা নারীবাদী বিষয় নিয়ে বর্ণাঢ্য পরিবেশবাদী উপস্থাপনা করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে আরও যাঁদের নাম করা যায় তাঁরা হলেন ব্রিটিশ মালটিমিডিয়া শিল্পী জেফ নুটাল, জন লাদাম। যদিও ১৯৭০-এর পরে হ্যাপেনিংস স্তিমিত হয়ে যায় কিন্তু এর অন্তর্প্রবাহ বিভিন্ন শিল্পের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে আজও বেঁচে আছে।

নং ৩০৩. ইয়াওই কুসামা ' ব্রুকলিং ব্রিজে 'যুদ্ধ বিরোধী' হ্যাপেনিং এবং পতাকা পোড়ানো। ১৯৬৮।



সহায়ক গ্রন্থাবলি

History of Art : H. W. Jansan, Thames & Hudson, New York 1995

Asian Art : General Editor–Bernard S. Myers, Trewin Copplestone. (Hamlyn, London, 1988)

The History of Arts : General Editor–Bernard S. Myers,Trewin Copplestone, Hamlyn, London, 1988.

Art a World History : Project Editor– Jo Marceau, Dorling Kindersley, London, 2002.

A History of Modern Art : H. H. Arnason, Marla F. Prather, Thames and Hudson, London 1998.

Modern Art : Edited by David Britt, Thames and Hudson, London, 2002.

Art of the 20th Century, Vol-I, Vol-II : Edited by Lugo F. Walther, Taschen, 1998.

A History of Fine Arts in India and the West : Edith Tomory, Orient Longman, Madras, 1989.

A treasury of Impressioism : Nathaniel Harris, Optimum, London, 1979.

The Colour Library of Art– Mexican Art : Justino Fernandez, Hamlyn, London, 1969.

The Colour Library of Art– Art Nouveau : Martin Battersby, Hamlyn, London, 1969.

The Colour Library of Art– Indian Art : Margaret-Marie Deneek, Hanelyn, London, 1969.

Matisse and the Fuvs : Renata Negri, Lamplight Publishing Inc., NewYork 1975.

Modern French Masters, The Impressionists : Lamplight Publishing Inc., New York 1975

Cezanne and Post Impressionists : Lamplight Publishing Inc., New York 1975

Picasso and Cubists : Lamplight Publishing Inc., New York 1975

Concepts of Modern Arts from Fauvism to Post Modernism : Edited by Nikos Strangos, Thames and Hudson World of Art, Themes and Hudson Inc., New York 2001.

Indian Art : Roy C. Craven, Thames and Hudson, London, 1997

Art of the Twentieth Century : Loredana Parmesani, Skira editore/Gio Marconi, Italy, 1998.

The Art of Modernism : Sandro Bocolo, Prestle, Munich, London, New York, 1999.

A Concise history of Modern Painting : Herbert Read, Thames and Hudson, London, 1974

Meaning of Art : Herbert Read, Rupa & Co., Calcutta, 1992.

Abstract Art : Anna Moszynska, Thames & Hudson, London, 1995.

Graphics : A century of poster and Advertising Design, Thames & Hudson, London, 2003.

Indian Art : Partha Mitter, Oxford Uninersity Press, Oxford, 2001.
Latin American Art of the 20th Century : Edward Lucie-Smith, Thames & Hudson, London, 2003.
Digital Art : Christiane Paul, Thames & Hudson, London, 2003.
Performance Art from Futurism to the Present : Roselee Goldberd, Thames & Hudson, 2001.
How to look at Modern Art : Philip Yenawine, Harry N. Abrams, Inc., Publisher, New York, 1991.
Pop Art :Lucy R. Lippard, Thames & Hudson, London, 2001.
Exploring the Graphic Arts : Anthonny Marinaccio, D. Van Nostrand Company, Inc., Princeton, New Jersey, 1959.
This is Modern Art : Matthew Collings, Seven Dials, Cassell & Co. 2000.
Panorama of Indian Paintings : Publication Division, Govt. of India, 1992.
Designs of the Times : Lakshmi Bhaskaran, Rotovision, Switzerland, 2005.
A History of 20th Century Art : Bernard Blistene, Flammarion.
The Aritist's guide to composition : Frank Webb, Devid & Charles, UK. 1994.
Publo Picasso : Ingo F. Walther, Denedkik, Taschen, Cologne,1986.
Art in the Modern Era, A guide to styles, Schools and Movements : Amy Dempsey, Harry N. Abrams, Inc. Publishers, London, 2002.
The Story of Writing, Alphabets, Hieroglyphs & Pictograms : Andrew Robinsons, Thames & Hudson. London,1995.
Houses And Buildings : Hazel Harrison, Studio Vista, London, 1991.
Anatomy, Perspective, and Composition for the Artists ; Stan Smith. Macdonald, London, 1984.
Guler Painting : M. S. Randhawa and D. S. Randhawa, Publication Division, Govt. of India, January 1982.
Madhubani Paintings : Mulk Raj Anand, Publication Division, Govt. of India, 1984.
Colour : Edith Anderson Feisner, Laurence King Publication, London, 2001.
Woodcut Prints of Nineteenth Century Calcutta : Edited by Ashit Paul, Seagull Book, Calcutta 1983.
Japanese Gaphic Design : Richard S. Thornton, Lawrence King Publication, London, 1991.
Art of Modern India : Balraz Khanna and Aziz Kurtha, Thames and Hudson, 1998.
Made in Mexico, the Story of Country's Art and Crafts : Patrica Fent Ross, Alfred, A. Knopf., New York, 1952.
Wall Paintings of the Western Himalayas : Mira Seth, Publication Division, Govt. of India, 1976.
The Britannica Encyclopedea of Visual Art : Vol-1 to Vol-10, Encyclopedea Britannica International, Ltd. London, 1983.
The Artist's Illustrated Encyclopedea : Phil Metzger, David and Charles, Devon, 2001.
Artists and Illustrators Encyclopedia : John Quick, Me Graw-Hill Book Company, USA, 1969.
The Random House Library of Painting and Sculpture : Vol. I, II, III, IV : Stuart B. Flexner, Random House. N.Y. 1981.

The Artist's Hand Book : Ray Smith, Dorling Kinderslay, London, 1993, 2003.
The Artist's Hand Book, A complete Professional guide to materials and techniques: Pip Seymour, Grange Books Pcl. London, 2003.
The Artist's Mamnal, Equipment-Materials-Techniques : Edited by Stan Smith, Professor H. F. Ten Holt, Grange Book, London, 1997.
The Thames and Hadson Dictionary of Art Terms : Edward Lucie Smith, Thames & Hudson, London, 2000.
The Thames and Hudson Dictionary of Art and Artists : Consulting Editor– Herbert Read, Thames and Hudson, London, 1994.
Great Works of Naive Art : Doreen Ehrlich, Parragon Book Service Ltd. Bristol, 1996.
The Art of the Expressionists : Janice Anderson, Parragon Book Service Ltd., Bristol, 1995.
The Great works of Indian Art: Douglas Mannering, Parragon Book Service Ltd. Bristol, 1996.
The Art of the Surrealists : Edmund Swingle Hurst, Parragon Book Service Ltd. Bristol, 1996.
The Complete Cartoning Course : Principles, Prectices, Techniques : The ultimate guide to cartoon drawing, David & Cherles, 2001.
Larousee Dictionary of Painters : Hamlyn Publishing Group, London, 1989.
The Dictionary of Ancient Egypt : Toly Wilkinson, Thames & Hudson, London, 2001
Art of the October Revolution : Edited by Mikheil Guerman, Aurora Art Publishers, Leningrad, 1979.
The Ritual Art of the Bratas of Bengal : Sudhansu Kumar Roy, Firma K. L. Mukhopadhyay, Calcutta, 1961.
Indian Painting : C. Sivarammurti, National Book Trust, New Delhi, 1996.
Indian Child Art, A hand book for Teachers : Gay Hellier Geoffray Cumberlege, Oxford University Press, Madras. 1951.
The Prestel Dictionary of Art and Artists in the 20th Century, Prestel, Munich, London, New York, 2000.
Studying Art History : Charles R. Jansen, Prentice-Hall, New Jersey, 1986.
Marxist-Leninist Aesthetics and the Arts : Progress Publishers Moscow, 1980.
Foundations of Marxist Aesthetics : A Zis, Progress Publishers, Moscow, 1977.
The Arts, Paintings, the Graphic Arts, Sculpture and Architecture : Edited by Lord Gorel : Odhmus Press Ltd., London.
Things of Beauty, a lookat our Heritage . Vidya Delhegia, Publication Divn, New Delhi, 1979.
Britannica Ready Reference : Encyclopedia, Encyclopedia Britannica (India) Pvt. Ltd. New Delhi, 2005.
Aesthetic Theory : Theodor W. Adorno, The Athlone Press, London.
The India Magazine : Editor . Malvika Singh, Bombay, Vol. 7, Feb. 1987.
ভারতের চিত্রকলা : অশোক মিত্র, আনন্দ, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা।
বাংলার চিত্রকলা : অশোক ভট্টাচার্য, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১৯৯৪।
শিল্পে ভারত ও বহির্ভারত : মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৯৭৫।

রূপদর্শিকা : অসিতকুমার হালদার, বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৬৩।
ভারত শিল্প : নির্মলকুমার ঘোষ, ফার্মা কে. এল. এম. প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৮৩।
বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলি : অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রূপা অ্যান্ড কোম্পানি, কলকাতা, জানুয়ারি, ১৯৮৩।
দৃষ্টি ও সৃষ্টি : নন্দলাল বসু, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা ১৩৯২।
পালযুগের চিত্রকলা : সরসীকুমার সরস্বতী, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, ১৯৭৮।
স্মৃতিপটে : ধীরেনকৃষ্ণ দেববর্মা, গবেষণা-প্রকাশন বিভাগ, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন, ১৯৯১।
শিল্প শিক্ষা ও ঔপনিবেশিক ভারত : শোভন সোম, প্রকাশন বিভাগ, তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়, ভারত সরকার, নয়াদিল্লি, মে, ১৯৯৮।
ছবির রাজনীতি রাজনৈতিক ছবি : সংকলক : সন্দীপন ভট্টাচার্য, দীপায়ন, কলকাতা, ১৯৯০।
নন্দনতত্ত্ব : সুধীরকুমার নন্দী, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ডিসেম্বর, ১৯৭৯।
রূপ, রস ও সুন্দর, নন্দনতত্ত্বের ভূমিকা : দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, ঋদ্ধি-ইন্ডিয়া, কলকাতা ১৯৮১।
বাংলার কাঠের কাজ : তারাপদ সাঁতরা, সেন্টার ফর আর্কিয়োলজিক্যাল স্টাডিজ অ্যান্ড ট্রেনিং, ইস্টার্ন ইন্ডিয়া, ২০০৩।
রাঢ়ের শিল্প ডোকরা : সৈয়দ বাসিরদ্দোজা, ডি. এস. এ. বাংলা বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান, ২০০১।
সৌন্দর্য দর্শন : প্রাথমিক পরিচয় . সীতাংশু রায়, সুবর্ণ রেখা, কলকাতা, ১৪০৮।
বাংলার প্রাচীন মৃত্তিকা ভাস্কর্য : নীহার ঘোষ, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, প. ব. সরকার, মে ২০০০
শিল্প সংক্রান্ত : পূর্ণেন্দু পত্রী, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৭।
বুদ্ধিজীবীর নোটবই : সম্পাদক সুধীর চক্রবর্তী, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০০৫।
কার্টুনের ইতিবৃত্ত : চণ্ডী লাহিড়ী, গণমাধ্যম কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, প. ব. সরকার, কলকাতা, ১৯৯৫।
বঙ্গীয় শিল্পধারা ও অন্যান্য প্রবন্ধ : কমলকুমার মজুমদার, দীপয়ান, কলকাতা, ১৪০৫।
শিল্পী ও রূপকলা : চিন্তামণি কর, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ১৯৯৬।
বৌদ্ধ শিল্প ও স্থাপত্য : ড. সাধনচন্দ্র সরকার, মহাবোধি বুক এজেন্সি, কলকাতা, ১৯৯৭।
শিল্পভাবনা : সুবোধ ঘোষ, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ১৯৯৬।
চিত্রকর : বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা. ১৩৮৮।
চিত্রকথা : বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৩৯১।
কলা এবং গ্রন্থাগার সামগ্রীর সংরক্ষণ : ও. পি. অগ্রবাল, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইন্ডিয়া, দিল্লি, ১৯৯৭।
শিল্পী দর্শক সমালোচক : আবুল মনসুর, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৩৯৩।
সৌন্দর্য তত্ত্ব : আচার্য সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, চিরায়ত প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৯২।
নন্দনের নির্মাণ : অলোক মুখোপাধ্যায়, পরিবেশক, সুবর্ণরেখা, বইমেলা, ২০০২।
বাংলার সংস্কৃতিতে মার্কসবাদী চেতনার ধারা : সম্পাদনা— ধনঞ্জয় দাশ, অনুষ্টুপ, কলকাতা, ১৯৯২।
মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক (অখণ্ড): ধনঞ্জয় দাশ সম্পাদিত, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০৩।
শিল্পের স্বদেশ ও বিশ্ব : মৃণাল ঘোষ, প্রতিক্ষণ, কলকাতা, ১৯৯৩।
আলেখ্য মঞ্জরী : পরিতোষ সেন, জি. এ. ই. পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৮৪।
ভারত শিল্পে ষড়ঙ্গ : অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, ১৩৯৬।
আবু সিম্বাল, পিকাসো ও অন্যান্য তীর্থ : পরিতোষ সেন, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি.

কলকাতা, ১৯৯৬।
চিত্রভাবন : শোভন সোম, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা, কলকাতা, ১৯৮৬।
যখন ছাপাখানা এল : শ্রীপান্থ, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ১৯৭৭।
লিখন ও বর্ণমালা : এ. সি. মুরহাউস, ভাষান্তর : নিরঞ্জন গোস্বামী ও সন্দীপন ভট্টাচার্য, দীপায়ন, কলকাতা, ১৪০২।
বটতলার ছাপা ও ছবি : সুকুমার সেন, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি. কলকাতা, ১৯৮৪।
আধুনিক বিজ্ঞাপন অঙ্গ ও অনুষঙ্গ : ড. স্মরজিৎ দত্ত, অগ্রণী বুক ক্লাব, কলকাতা, ১৯৯৬।
তিন শিল্পী : শোভন সোম, বাণী শিল্প, কলকাতা, ১৯৮৫।
শিল্প ও শিল্পী ১ম খণ্ড : কৃষ্ণলাল দাস, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ১৯৭৭।
শিল্প ও শিল্পী ২য় খণ্ড : কৃষ্ণলাল দাস, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ১৯৮২।
শিল্প ও শিল্পী ৩য় খণ্ড : কৃষ্ণলাল দাস, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ১৯৮৩।
পশ্চিম ইউরোপের চিত্রকলা : অশোক মিত্র, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি. কলকাতা, ১৯৮৮।
কিউবিজ্‌ম ও অনুষঙ্গ : ম. রফিকুল আলম, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৭।
পোস্ট মডার্ন কী ও কেন? : সম্পাদনা : মলয় রায়চৌধুরী, আবিষ্কার প্রকাশনী, বাঁশদ্রোণী, কলকাতা, ২০০৩।
সংস্কৃতির জিজ্ঞাসা : সালাহউদ্দীন আইয়ুব, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, জুন, ১৯৯১।
পোস্ট মডার্নিজ্‌ম সম্ভবনা ও ভবিষ্যৎ : বিপ্লব মাজী, অঞ্জলি পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০৬।
পোস্ট মডার্ন ও উত্তর আধুনিক বাংলা কবিতা : নিতাই জানা, বাণীশিল্প, কলকাতা, ২০০১।
পোস্ট মডার্ন ও অন্যান্য ভাবনা : পার্থ প্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা, ১৯৯৭।
আরিস্টটল কাব্যতত্ত্ব : অনুবাদ : শিশির কুমার দাশ, প্যাপিরাস, কলকাতা ১৯৮৬।
অ্যারিস্টটলের পোয়েটিকস্‌ ও সাহিত্যতত্ত্ব : ড. সাধন কুমার ভট্টাচার্য, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৫।
অ্যারিস্টটলের পোয়েটিকস্‌ : ভবানী গোপাল সান্যাল, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০৫।
বিজ্ঞাপন তত্ত্বে ও প্রয়োগে : ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায়, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৬।
বিশ্বকোষ : ১-২০ খণ্ড, সংযোজনী ৩ খণ্ড , লোকশিক্ষা প্রকাশন, কলকাতা, ১৪০৫।
চালচিত্রের চিত্রলেখা : সুধীর চক্রবর্তী, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ১৯৯৩।
সমকালীন নির্বাচিত প্রবন্ধ সংকলন ১ম খণ্ড : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৪১২।
সমকালীন নির্বাচিত প্রবন্ধ সংকলন ২য় খণ্ড : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, কার্তিক ১৪১২।
সমকালীন নির্বাচিত প্রবন্ধ সংকলন ৩য় খণ্ড : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা বইমেলা ২০০৬।
সমকালীন নির্বাচিত প্রবন্ধ সংকলন ৪র্থ খণ্ড : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, আষাঢ় ১৪০৩।
শনিবারের চিঠি : শিল্প ও শিল্পী সংখ্যা, সম্পাদনা : রঞ্জনকুমার দাস, নাথ, কলকাতা ১৯৯৯।
আনন্দবাজার পত্রিকা : বার্ষিক সংখ্যা ১৩৮৭।
দেশ বিনোদন সংখ্যা : কলকাতা ৩০০, ১৯৮৯।

দেশ ২২ এপ্রিল, ১৯৯০ সংখ্যা।
দেশ ১৮ জুন, ১৯৮৩ সংখ্যা।
দেশ ৩০ জুন, ১৯৯০ সংখ্যা।
দেশ ৩১ মার্চ, ১৯৯০ সংখ্যা।
দেশ ৯ ডিসেম্বর, ১৯৮৯ সংখ্যা।
দেশ ৪ জুন, ১৯৮৩।
ধ্রুবপদ : সম্পাদক— সুধীর চক্রবর্তী, বার্ষিক সংকলন ৬, ২০০৬।
লোকশ্রুতি : ১২ সংখ্যা, লোকশ্রুতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৬।
আকাদেমি পত্রিকা ৫ : পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, মে, ১৯৯১।
লোক সংস্কৃতি গবেষণা পত্রিকা : সম্পাদক— ড. সনৎ মিত্র, 'আলপনা ও লোকসংস্কৃতি' বিশেষ সংখ্যা ১৪১২।
লোক সংস্কৃতি গবেষণা পত্রিকা : দেব পুতুল ও খেলার পুতুল, বিশেষ সংখ্যা ১৪০৩।
লোক সংস্কৃতি গবেষণা পত্রিকা : বাংলার লোকশিল্প, বিশেষ সংখ্যা বৈশাখ-আষাঢ়, ১৪০৬।
লোক সংস্কৃতি গবেষণা পত্রিকা : বাংলার মুখোশ, বিশেষ সংখ্যা মাঘ-চৈত্র, ১৪০৬।
বিষয় কার্টুন : সম্পাদনা— বিশ্বদেব গঙ্গোপাধ্যায়, পৌষ, ১৪১৪।
পশ্চিমবঙ্গ : অবনীন্দ্র সংখ্যা : সম্পাদক— দিব্যজ্যোতি মজুমদার, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, প. ব. সরকার, কলকাতা, মার্চ, ১৯৯৬।
পশ্চিমবঙ্গ : বাঁকুড়া জেলা সংখ্যা।
বিশেষ সংখ্যা : সম্পাদক— অজিত মণ্ডল, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, কলকাতা, ১৪০৯।
সাহিত্যের শব্দার্থ কোশ : সুরভী বন্দ্যোপাধ্যায়, প. ব. বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ১৯৯৯।



পরিশিষ্ট

শিল্পকলা বিষয়ে বাংলা গ্রন্থের তালিকা

রূপশিল্পী বিনোদবিহারী। অসিতকুমার দত্ত। সারস্বত। ১৩৯৪
ভারত শিল্পে ষড়ঙ্গ। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতী। বৈশাখ ১৩৫৪
ভারত শিল্পে মূর্তি। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতী। জৈষ্ঠ ১৩৫৪
শিল্পায়ন। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সিগনেট প্রেস। ১৩৬১ (পরিবর্তে আনন্দ পাবলিশার্স)
বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কলিকাতা বিশ্ববিদালয়। ১৯৪১ (পরবর্তীতে রূপা এবং আনন্দ পাবলির্শাস।
প্রিয়দর্শিকা। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কান্তিক প্রেস। ১৯২১
ভারত শিল্প। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। হিতবাদী লাইব্রেরী। কলকাতা। ১৯০৯
সহজ চিত্রশিক্ষা। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতী। ১৩৫৩
একালের শিল্পচিন্তা। অগ্নিবর্ণ ভাদুড়ী। সুবর্ণরেখা। ১৯৮৬
ছবির রাজা ওবিন ঠাকুর। অলকেন্দ্রনাথ ঠাকুর। রূপা। ১৯৬৪
ভারত শিল্পের কথা। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়। সাহিত্যলোক। অগ্রহায়ন ১৩৮৯
ভারতের শিল্প ও আমার কথা। অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়। এ মুখার্জি অ্যান্ড কোং। ১৯৬৯
য়ুরোপে আধুনিক চিত্রকলার প্রগতি। অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়। রত্নসাগর গ্রন্থমালা-১০
রূপশিল্প। অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়। ১৩৪৬
শিল্পপরিচয়। অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়। ১৩৪৬
বাঘ গুহা ও রামগড়। অসিতকুমার হালদার। ইন্ডিয়ান প্রেস লি:। এলাহাবাদ। ১৯২১
রূপদর্শিকা। অসিতকুমার হালদার। বুকল্যান্ড প্রা: লি:।
রূপরুচি। অসিতকুমার হালদার। জেনারেল বুক্স। ১৩৫৪
অজন্তা। অসিতকুমার হালদার। ১৩২০
ভারতের শিল্পকথা। অসিতকুমার হালদার। ১৯৩৯
য়ুরোপের শিল্পকথা। অসিতকুমার হালদার। ১৯৪০
ছবির কথা। অহিভূষণ মালিক। কলামন্দির।
পশ্চিম ইওরোপের চিত্রকলা। অশোক মিত্র। স্বাক্ষর (পবর্তীতে আনন্দ পাবলিশার্স)
ভারতের চিত্রকলা। অশোক মিত্র। বেঙ্গল পাবলিশার্স। (পরবর্তীতে দুই খণ্ডে আনন্দ পাবলিশার্স)
ছবি কাকে বলে। অশোক মিত্র। আনন্দ পাবলিশার্স। ১৯৮৩
ইওরোপের ভাস্কর্য। অশোক মিত্র। আনন্দ পাবলিশার্স। ১৯৯২
পাবলো পিকাসো। অশোক ভট্টাচার্য। সারস্বত। ১৯৮২
কলকাতার চিত্রকলা। অশোক ভট্টাচার্য। তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার। ১৯৯৩
বাংলার চিত্রকলা। অশোক ভট্টাচার্য। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। ১৯৯৪

পিকাসো : জীবন ও শিল্প। অঞ্জলি চৌধুরী। শরৎ পাবলিশিং হাউস। ১৩৮৭
বঙ্গলক্ষ্মীর ঝাঁপি। অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। আনন্দ পাবলিশার্স। ১৩৮৬
শিল্পচর্চা। অতুল বসু। চতুষ্কোণ। ১৯৮৭
বাংলায় চিত্রকলা ও রাজনীতির একশ বছর। অতুল বসু। আনন্দ পাবলিশার্স। ১৯৯৩
রবীন্দ্রসৃষ্টির অলংকরণ। অভীকুমার দে। পুস্তক বিপণি।
অবনীন্দ্রনাথ। অনির্বাণ রায়। প্যাপিরাস।
যোগেন চৌধুরীর ছবি। অরুণ সেন। প্রতিক্ষণ। ১৯৯৬
যামিনী রায় বিষ্ণু দে : বিনিময়। অরুণ সেন। প্রতিক্ষণ। ১৯৮৯
চিত্রবিদ্যা। আদীশ্বর ঘটক। ১৩১৮
চিত্রদর্শন। কানাই সামন্ত। বিদ্যোদয় লাইব্রেরী
শ্রীনন্দলাল বসু। কানাই সামন্ত। কথাশিল্প। ১৯৬২
বাংলার লোকশিল্প। কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়। পুরোগামী প্রকাশনী। ১৩৬৮
বাংলার ভাস্কর্য। কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়। সুবর্ণরেখা। ১৯৮৬
শিল্প ও শিল্পী। কৃষ্ণলাল দাস। ৩ খণ্ডে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ। প্রথম খন্ড ১৯৯০। দ্বিতীয় খণ্ড ১৯৮২। তৃতীয় খণ্ড ১৯৮৩
শিল্পী সপ্তক। কমল সরকার। ১৯৭৭
ভারতের ভাস্কর ও চিত্রশিল্পী। কমল সরকার। যোগমায়া প্রকাশনী। ১৯৮৪
রূপদক্ষ গগনেন্দ্রনাথ। কমল সরকার। রবীন্দ্র ভারতী সোসাইটি। ১৯৮৬
সেকালের কার্টুন। কুমারেশ ঘোষ। গ্রন্থগৃহ
বাংলার মনোলোক ও অন্যান্য লোকচিত্র। কমলকুমার মজুমদার। দীপায়ন ১৯৯৮
বঙ্গীয় শিল্পধারা ও অন্যান্য প্রবন্ধ। কমলকুমার মজুমদার। দীপায়ন। বৈশাখ ১৪০৫
কেতকী কুশারী ডাইসন। সুশোভন অধিকারী। রঙের রবীন্দ্রনাথ। আনন্দ পাবলিশার্স। ১৯৯৭
চিত্রবিজ্ঞান। গিরীন্দ্রকুমার দত্ত।
প্রাচীন শিল্প পরিচয়। গিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ। সুবর্ণরেখা।
স্মৃতিচিহ্নিত। চিন্তামণি কর। চিরায়ত প্রদর্শনী। ১৯৮৩
ফরাসী শিল্পী ও সমাজ। চিন্তামণি কর। ১৩৪৯
সান্নিধ্য। চিন্তামণি কর। ১৯৬১
চিত্রাঙ্কনে বাংলার মেয়ে। জানকীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল।
বাংলার দারু ভাস্কর্য। তারাপদ সাঁতরা। সুবর্ণরেখা।
আর্টিস্ট রবীন্দ্রনাথ। দিলীপ মালাকার। অনন্য প্রকাশনী।
বাঘ ও অজন্তা। দেবব্রত মুখোপাধ্যায়। সারস্বত
বীরভূমের যমপট ও পটুয়া। দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়। সুবর্ণরেখা। ১৯৭২
রূপ-রস-সুন্দর : নন্দনতত্ত্বের ভূমিকা।দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। ঋদ্ধি ইন্ডিয়া। (২য় সং) ১৯৮৯
রূপতাপস রামকিঙ্কর। নমিতা মণ্ডল। বাঁকুড়া লোক-সংস্কৃতি একাদেমি। ১৯৯৩
অজন্তা অপরূপা। নারায়ণ সান্যাল। ভারতী বুক স্টল। (৭ম সং) ১৯৯৮
শিল্পচর্চা। নন্দলাল বসু। বিশ্বভারতী। ১৩৬৩

শিল্পকথা। নন্দলাল বসু। বিশ্বভারতী। ১৩৫১
পুনশ্চ পারী। নীরদ মজুমদার। আনন্দ পাবলিশার্স। ১৯৮৩
শিল্পচেতনা। নির্মাল্য নাগ। দীপায়ন। ১৯৮৭
ভারত শিল্প। নির্মলকুমার ঘোষ। ফার্মা কে. এল। (৩য় সং) ১৯৯৫
দায়। নিখিল সরকার শ্রীপান্থ। পুনশ্চ। ১৯৯৪
অবনীন্দ্র চরিতম্। প্রবোধেন্দু নাথ ঠাকুর। ইন্ডিয়ান এসোসিয়েটেড
কোম্পানী আমলে বিদেশী চিত্রকর। প্রদ্যোত গুহ। অয়ন
যুগে যুগে ভারত শিল্প। পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী। সাহিত্য সংসদ। ১৩৭৩
ভারত শিল্পী নন্দলাল (১-৪ খন্ড)। পঞ্চানন মন্ডল। ১৯৮২
রূপতাপস যামিনী রায়। প্রশান্ত দাঁ সম্পাদিত। প্রতিভাস। ১৯৮৮
সুনীলমাধব সেনের রূপলোক। প্রশান্ত দাঁ। ভারবি। ১৯৯৭
নৈরাজ্যের নীলিমা। প্রকাশ কর্মকার ও সন্দীপ সরকার। প্রতিক্ষণ। ১৯৯৫
রামকিঙ্করের ড্রইং। প্রকাশ দাস সম্পাদিত। এ মুখার্জী। ১৯৯৩
রামকিঙ্কর। প্রকাশ দাস সম্পাদিত। এ মুখার্জী। ১৯৯১
স্মৃতিকথা শিল্প কথা। প্রদোষ দাশগুপ্ত। প্রতিক্ষণ। ১৯৮৬
শিল্প সংক্রান্ত পরিতোষ সেন। আনন্দ পাবলিশার্স।
আবু সিম্বাল, পিকাসো ও অন্যান্য তীর্থ। পূর্ণেন্দু পত্রী। দেজ পাবলিশিং। ১৯৯৭
মোনালিসা। পূর্ণেন্দু পত্রী। প্রতিক্ষণ। ১৯৯৬
রোদ্যাঁ পূর্ণেন্দু পত্রী। প্রতিক্ষণ। ১৯৮৮
তুলি কালির কলকাতা। পূর্ণেন্দু পত্রী। পুনশ্চ। ১৯৯২
আধুনিক শিল্পশিক্ষা। বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়। বিশ্বভারতী ১৩৭৯
চিত্রকর। বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়। অরুণা প্রকাশনী। (৪র্থ সং) ১৯৮৬
চিত্রকথা। বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়। অরুণা প্রকাশনী। ১৯৮৪
পাশ্চাত্য চিত্রশিল্পের কাহিনী। বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়। এম. সি. সরকার
বাংলার লোকসংস্কৃতির সমাজতত্ত্ব। বিনয় ঘোষ। অরুণা প্রকাশনী। ১৩৮৬
ভারত শিল্প। বিমলকুমার দত্ত। বিদ্যাভারতী।
যামিনী রায়। বিষ্ণু দে। আশা প্রকাশনী। ১৩৮৪
শিল্পজিজ্ঞাসায় শিল্পী দীপঙ্কর নন্দলাল। বরেন্দ্রনাথ নিয়োগী। মহেন্দ্র পাবলিশিং কমিটি। ১৩৬৮
তিন শিল্পী। শোভন সোম। বাণী শিল্প। ১৯৮৫
নন্দলাল বসু। দিনকর কৌশিক। ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট। ১৯৯৫
দরবারি শিল্পের স্বরূপ : মুঘল চিত্রকলা। রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায়। থীমা। ১৯৯৯
নানা রঙে দেবীপ্রসাদ। প্রশান্ত দাঁ। ১৩৮০
কারুতীর্থ কলিঙ্গ। নারায়ণ সান্যাল। ভারতী বুক স্টল। ১৯৯৩
নন্দনতত্ত্ব। সুধীরকুমার নন্দী। রাজপুস্তক পর্ষদ। ১৯৭৯
বৌদ্ধশিল্প ও স্থাপত্য। ড. সাধনচন্দ্র সরকার। মহাবোধি বুক এজেন্সি। ১৩৯৮
চিত্রদর্শন। অলোক মুখোপাধ্যায়। ১৩৯৪

অনিতা রায় চৌধুরীর চিত্রকলা। শান্তি নাথ। ২০০৬
শিল্পী ও রূপকলা। চিন্তামণি কর। প. ব. বাংলা আকাদেমি। ১৯৯৬
রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলা। আহমদ রফিক। ১৯৯৬
চিত্রভাষা। নির্মাল্য নাগ। দীপায়ণ। ১৪০৭
রামকিঙ্কর। সঞ্জীব মিত্র। ঝাড়গ্রাম আর্ট অ্যাকাডেমি। ২০০৬
রবীন মণ্ডলের ছবি। শান্তি নাগ। সপ্তর্ষি প্রকাশন ২০০৫
পাশ্চাত্য শিল্পের ইতিহাস। রফিকুল আলম। ১৪০৭
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়। ১৯৪৪
রবীন্দ্র শিল্পতত্ত্ব। হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৩৭৭
ভারতশিল্পে দেহজ শ্রম ও অন্যান্য প্রবন্ধ। সন্তোষকুমার বসু। দীপায়ন। ১৯৯০
সৌন্দর্যদর্শন। প্রবাসজীবন চৌধুরী। বিশ্বভারতী। ১৩৬১
শিল্পভাবনা। সুবোধ ঘোষ। প.ব.বাংলা আকাদেমি। ১৯৯৬
লোকায়ত বাংলার চিত্রশিল্পী ও চিত্রকলা। বিমলেন্দু চক্রবর্তী। স্ট্যান্ডার্ড পাবলিশার্স। ১৪০৩
কিছু স্মৃতিকথা কিছু শিল্প ভাবনা। সুনীল কুমার পাল। রাজ্যচারুকলা পর্ষদ। ১৯৯৮
হুগলী জেলার পুরাকীর্তি। নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। প্রত্নতত্ত্ব অধিকার প: ব: সরকার। ১৯৯৩
কলা ও গ্রন্থাগার সামগ্রীর সংরক্ষণ। ও. পি. অগ্রবাল। ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট। ১৯৯৩
আধুনিক বিজ্ঞাপন অঙ্গ ও অনুষঙ্গ। ড. স্মরজিৎ দত্ত। অগ্রনী বুক ক্লাব। ১৯৯৬
যখন ছাপাখানা এল। শ্রীপান্থ। প. ব. বাংলা আকাদেমি। ১৯৭৭
ব্যাঙ্গচিত্র শিল্পী যতীন্দ্র কুমার সেন রচনা সংগ্রহ। বারিদবরণ ঘোষ। আনন্দ। ২০০১
কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্প ও মৃৎশিল্পী সমাজ। সুধীর চক্রবর্তী। কে.পি. বাকচি অ্যান্ড কো:।১৯৮৫
রাঢ়ের শিল্প ডোকরা। সৈয়দ বসিরুদ্দোজা। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়। ২০০১
লোকশিল্প বনাম 'উচ্চ'মার্গীয় শিল্প। ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। ১৯৯৯
চিত্রক্রম : চিত্রকর গনেশ পাইনের চিত্রকৃতি। অঞ্জন সেন। দে বুক সেন্টার। ১৯৯৩
বাংলার প্রাচীন মৃত্তিকা ভাস্কর্য। নীহার ঘোষ। লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র। ২০০০
পশ্চিমবঙ্গের পুরাসম্পদ। বিজয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। জেনারেল। ১৯৮২
মুর্শিদাবাদ। অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
পুরাকীর্তি সমীক্ষা মেদিনীপুর। তারাপদ সাঁতরা। প্রত্নতত্ত্ব অধিকার। ১৯৮৭
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। অমিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর। সাহিত্য অকাদেমি। ১৯৯৯
জয়নুল আবেদিনের শিল্প জিজ্ঞাসা। বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গির। বাংলাদেশ শিল্পকলা আকাদেমি ১৯৯৬
শরৎচন্দ্রের ছবির কথা কথার ছবি। প্রতাপ চন্দ্র চন্দ্র। শরৎসমিতি ১৩৯৫
স্মৃতিপটে। ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মা। বিশ্বভারতী। ১৯৯১
বাংলার কাঠের কাজ। তারাপদ সাঁতরা। ২০০৩
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : শিক্ষা এবং চিত্র শিল্প। দেবীপ্রসাদ। এন. বি. টি ২০০২
শিল্প শিক্ষা ও ঔপনিবেসিক ভারত। শোভন সোম। প্রকাশন বিভাগ। ভারত সরকার। ১৯৯৮
আলেখ্য মঞ্জরী। পরিতোষ সেন। জি. এ. ই. পাবলিশার্স। ১৯৮৪

মহাশয় আমি চাক্ষিক রূপকার মাত্র। রামকিঙ্কর বেইজ্। মনচাষা?
বাংলার কুটির। অশোককুমার কুণ্ডু ও ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী সম্পাদিতা সেন্টার ফর আর্কিয়োলজিক্যাল স্টাডিজ অ্যান্ড ট্রেনিং। ২০০১
শনিবারের চিঠি : শিল্পী। ও শিল্পী সংখ্যা। রঞ্জনকুমার দাস। নাথ ব্রাদার্স। ১৯৯৯
চিত্রকলা। মহেন্দ্রনাথ দত্ত। ১৪০৩
আমার চিত্রভাবনা। সোমনাথ হোর । সিগাল বুকস্। ১৯৯২
রাষ্ট্রনায়কদের আঁকাআঁকি। দেবদত্ত গুপ্ত। ১৪০৮
তেভাগার ডায়েরি। সোমনাথ হোর। ১৯৯১
শিল্পতত্ত্ব পরিচয়। সাধনকুমার ভট্টাচার্য। জাতীয় সাহিত্য পরিষদ। ১৩৭৫
শিল্প সংস্কৃতি ও সমাজ। বিনয় ঘোষ। অরুণা প্রকাশনী। ১৯৪০
গোপাল সান্যালের জীবনচর্চা ও রেখাচিত্র। প্রদীপ ভট্টাচার্য। ২০০১
মালদহ জেলার পুরাকীর্তি। প্রদ্যোৎ ঘোষ। প্রত্নতত্ত্ব ও সংগ্রহালয় অধিকার। প. ব. সরকার। ১৯৯৫
সমকালীন শিল্প ও শিল্পী। নজরুল ইসলাম।
মেদিনীপুর জেলার প্রত্নসম্পদ। প্রণব রায়। প্রত্নতত্ত্ব অধিকার। ১৯৯৬
চারুকলা। চিন্তামণি কর। রাজ্য চারুকলা পর্ষদ। ১৪০৩
দক্ষিণের বারান্দা। মোহনলালগঙ্গোপাধ্যায়। বিশ্বভারতী। ১৩৮৮
চিত্রকর ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ। শ্যামল চক্রবর্তী। অক্ষর পাবলিকেশন, ত্রিপুরা। ২০০৩
আর্ট। অন্নদাশঙ্কর রায়। পুনশ্চ। ১৯৮৯
বাংলা মুদ্রণের দুশো বছর। শ্রী অতুল শূর। জিজ্ঞাসা পাবলিকেশন প্রা: লি:। ১৯৭৮
ক্রোচের ইসথেটিক ও এসেন্স অব ইসথেটিক। সাধনকুমার ভট্টাচার্য। ১৩৭০
পাবলো পিকাসো। অশোক ভট্টাচার্য। ১৯৮২
নন্দনের নির্মাণ। অলোক মুখোপাধ্যায়। প্রয়াস। ২০০২
রোদ্যাঁ। নারায়ণ সান্যাল। দে'জ পাবলিশিং। ১৩৯০
লিয়োনার্দো দা ভিঞ্চি। মোবাশের আলী। ১৯৯৫
সৌন্দর্য দর্শন : প্রাথমিক পরিচয়। সিতাংশু রায়। সুবর্ণরেখা। ১৪০৮
কার্টুনের ইতিবৃত্ত। চণ্ডী লাহিড়ী। গণমাধ্যনম কেন্দ্র। ১৯৯৫
কিউবিজ্ম ও অনুষঙ্গ। ড. ম. রফিকুল আলম। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি। ২০০০
গগণেন্দ্রনাথ : স্কেচ কার্টুন। চণ্ডী লাহিড়ী। সাহিত্য সংসদ।
শিল্পধারা। প্রভাতকুমার দত্ত।
প্রাকৃত শিল্পের স্বরূপ সন্ধানে। ড. আব্দুস সাত্তার। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি। ২০০৩
নিকোলাই রোয়েরিখ। প. বেলিকভ। ড. কনিয়াজেভা। প্রগতি প্রকাশন। মস্কো। ১৯৭৯
কালচেতনার শিল্প। অশোক ভট্টাচার্য। সারস্বত লাইব্রেরি। ২০০৩
বাংলাদেশের শিল্প আন্দোলনের পঞ্চাশবছর। আমিনুল ইসলাম। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী। ২০০৩
পশ্চিমবঙ্গের পটচিত্র। অশোক ভট্টাচার্য সম্পাদিত। লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী লোকসংস্কৃতি কেন্দ্র। ২০০১

ভারতের গুহাচিত্র। বিমলেন্দু চক্রবর্তী। উদয় প্রকাশন। ১৯৮৫
চিত্রশিল্পী হেমেন মজুমদার। বারিদবরণ ঘোষ। আনন্দ পাবলিশার্স।
গগনেন্দ্রনাথ। মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়। মিত্র ও ঘোষ।
রবীন্দ্র চিত্রকলা। মনোরঞ্জন গুপ্ত। সাহিত্য সংসদ।
শিল্প প্রসঙ্গ। মহেন্দ্রনাথ দত্ত।
শিল্পে ভারত ও বহির্ভারত। মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত। বিশ্বভারতী। (পরবর্তীতে আনন্দ পাবলিশার্স) ১৩৮২
সিংহলের শিল্প ও সভ্যতা। মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত। বিশ্বভারতী। ১৩৬১
বিশ্বকর্মার সন্ধানে। মীরা মুখোপাধ্যায়। দীপায়ন।
রূপদক্ষ রবীন্দ্রনাথ। মৃণাল ঘোষ। ১৯৬০
এই সময়ের ছবি। মৃণাল ঘোষ। প্রতিক্ষণ। ১৯৮৯
গণেশ পাইনের ছবি। মৃণাল ঘোষ। প্রতিক্ষণ। ১৯৯২
শিল্পের স্বদেশ ও বিশ্ব। মৃণাল ঘোষ। প্রতিক্ষণ। ১৯৯৪
সমকালীন ভাস্কর্য। মৃণাল ঘোষ। প্রতিক্ষণ। ১৯৯৫
আর্ট ও আহিতাগ্নি। যামিনীকান্ত সেন। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যান্ড সন্স। ১৩৫৯
বাংলার রূপরস সাধনা। যামিনীকান্ত সেন। মিত্রবিহার প্রাইভেট লিমিটেড অগ্রহায়ন, ১৩৬৭
বাংলার রূপরস সাধনা। যামিনীকান্ত সেন। রীডার্স কর্ণার।
মডেলের সন্ধানে : প্রসঙ্গ ক্যালকাটা গ্রুপ। প্রদোষ দাশগুপ্ত। প্রতিক্ষণ, ১৯৯২
প্রকাশ কর্মকার। সন্দীপ সরকার। প্রতিক্ষণ।
বাংলার লোকশিল্প। রবীন্দ্র মজুমদার। রত্নসাগর গ্রন্থমালা।
শিল্পীগুরু অবনীন্দ্রনাথ। রাণী চন্দ। বিশ্বভারতী।
শিল্পী মানুষ যামিনী রায়। রবীন্দ্রনাথ সামন্ত। পুস্তক বিপণি। ১৯৮০
আর্যজাতির শিল্পচাতুরী। শ্যামাচরণ শ্রীমানী।
রূপকার নন্দলাল। শান্তিদেব ঘোষ। রত্নসাগর গ্রন্থমালা।
শিল্পকলা চিত্রে ও গল্পে। শিশিরকুমার মিত্র। শিশির পাবলিশিং হাউস।
বাংলা শিল্প সমালোচনার ধারা অনুষ্টুপ। শোভন সোম ও অনিল ভট্টাচার্য সম্পাদিত। ১৯৮৬
চিত্রভাবন। শোভন সোম। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৮৬
নন্দলাল বসু : ভারত শিল্পের পথিকৃৎ। শোভন সোম। ন্যাশন্যাল বুক ট্রাস্ট।
ওপেনটি বাইস্কোপ। শোভন সোম। ক্যাম্প। ১৯৯৩
বটতলা। শ্রীপান্থ। আনন্দ পাবলিশার্স। ১৯৯৭
ছোটদের ছবি আঁকা (সংকলন)। শিবাদিত্য সেন, নমিতা চৌধুরী। নান্দীমুখ সংসদ
অবনীন্দ্র নন্দনতত্ত্ব। সত্যজিৎ চৌধুরী। সান্যাল প্রকাশনী। ১৯৭৭
নন্দলাল। সত্যজিৎ চৌধুরী। অরুণা প্রকাশনী। ১৯৮৮
অবনীন্দ্র শিষ্য সুরেন্দ্রনাথ। সুধা বসু। বাক্‌সাহিত্য।
ইউরোপের শিল্পীকথা। সুধা বসু। বাক্‌সাহিত্য।
রূপশিল্পী রবীন্দ্রনাথ। সুধা বসু। বাক্‌সাহিত্য।
শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ। সুধা বসু। বাক্‌সাহিত্য।

পালযুগের চিত্রকলা। সরসীকুমার সরস্বতী। আনন্দপাবলিশার্স। ১৯৭৮
রবীন্দ্র চিত্রকলা : রবীন্দ্র সাহিত্যের পটভূমিকা। সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। দে'জ পাবলিশিং।১৯৮২
আলাপচারি। শিল্পী রামকিঙ্কর : সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। দে'জ পাবলিশিং।১৯৯৪
চালচিত্রের চিত্রলেখা। সুধীর চক্রবর্তী। দে'জ পাবলিশিং। ১৯৯৩
বাংলা ১৩৫০ : চিত্রসংকলন। সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ। ইন্দ্র গুপ্ত। ১৯৪৬
বটতলার ছাপা ও ছবি। সুকুমার সেন। আনন্দ পাবলিশার্স। ১৯৮৯
ছবির রাজনীতি : রাজনৈতিক ছবি। সন্দীপন ভট্টাচার্য সম্পাদিত। দীপায়ন। ১৯৯০
প্রতিকৃতি। সত্যজিৎ রায়। আনন্দ পাবলিশার্স। ১৯৯৭
সংস্কৃতি শিল্প ইতিহাস। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। জিজ্ঞাসা। ১৩৮৩
মিকেলাঞ্জেলো। সমীর সেনগুপ্ত। প্যাপিরাস।
পঞ্চাশের মন্বন্তর শিল্পে সাহিত্যে। সমীর ঘোষ। প্রতিক্ষণ। ১৯৯৪
নিজের মুখের ছবি। সমীর ঘোষ। প্রতিক্ষণ। ১৯৯৫
রবীন্দ্র প্রতিকৃতি : চিত্রে ভাস্কর্যে। প্রতিক্ষণ। ১৯৯৬
ছবির চশমা। হেমেন্দ্রনাথ মজুমদার। আনন্দ পাবলিশার্স। ১৯৯১
অপরূপা আগ্রা। নারায়ণ সান্যাল। ভারতী ১৯৮২
শিল্পী সমালোচক দর্শক। আবুল মনসুর। মুক্তধারা (বাংলাদেশ) ১৩৯১
লোকসংস্কৃতির নন্দন তত্ত্ব। পবিত্র সরকার। লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র ১৯৯৬
ললিতকলা ও জনমানস। আরুইন এডম্যান (অনু : সুধীরকুমার নন্দী) সাহিত্যায়ন ১৩৭৩
শিল্পের স্বরূপ। লিও তলস্তয় (অনু: দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ)। রাজ্যপুস্তক পর্ষদ্ ১৯৮১
সৌন্দর্যতত্ত্ব। আচার্য সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। চিরায়ত প্রকাশন ১৩৫৭
আজকালের কুট্টি। পি. কে. এস. কুট্টি। আজকাল ১৯৯৩

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত শিল্প বিষয়ক বাংলা প্রবন্ধ

ভারতবর্ষ

প্রতীচ্যের পুরাতন ভাস্কর্য। অশ্বিনীকুমার বর্মন। আশ্বিন, ১৩২০
অনন্তরূপিণী প্রকৃতি। অশ্বিনীকুমার বর্মন। মাঘ, ১৩২০
চিত্রশিল্পে মহিলার সাধনা। পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী। ভাদ্র, ১৩৫৪
তরুণ শিল্পী কিশোরী রায়। মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত। আশ্বিন, ১৩৫০
শ্রীমান চিন্তামণি করের চিত্র। সুরেন্দ্রনাথ সেন। কার্তিক, ১৩৪১
শ্রীমান চিন্তামণি করের ভাস্কর্য। উসাব। চৈত্র, ১৩৬০
ধীরেন্দ্রনাথের ভিত্তিচিত্র ও ভারতশিল্পের নতুন ধারা। অসিতকুমার হালদার। আশ্বিন, ১৩৪১
উডকাট ও শিল্পী নরেন্দ্র কেশরী। গোপাললাল সান্যাল। আষাঢ়, ১৩৪১
শিল্পাচার্য যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়। পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী। আষাঢ়, ১৩৬০
শিল্পী পূর্ণচন্দ্রের শিল্প প্রদর্শনী। সন্তোষকুমার দে। মাঘ, ১৩৬২
আধুনিক ভাস্কর্য ও তরুণ ভাস্কর প্রদোষ দাশগুপ্ত। মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত। ভাদ্র, ১৩৪৩

যতীন্দ্রকুমারের চিত্রকলা। শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা। শ্রাবণ, ১৩৩৫
মৃৎশিল্পী যদুনাথ পাল। প্রফুল্লকুমার সরকার। চৈত্র, ১৩২৩
নবীন ভাস্করের শিল্পসাধনা (রমেশ পাল)। নরেন্দ্রনাথ বসু। আশ্বিন, ১৩৬৩
শিল্পী হেমেন্দ্রনাথ। পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী। কার্তিক, ১৩৫৫
ভাস্কর শ্রীযুক্ত ভি. পি. কারমারকার। মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত। আশ্বিন, ১৩৩৮
চিত্রবিদ্যা ও প্রকৃতি-জ্ঞান। বরদাকান্ত দত্ত। মাঘ, ১৩২২
বিপিন দা। আদিনাথ মুখোপাধ্যায়। শ্রাবণ, ১৩৪
বঙ্গের সুকুমার শিল্পকলা। ননীগোপাল চক্রবর্তী। চিত্রকলা বিনোদন। শ্রাবণ, ১৩২৫
ভাস্কর গণপাত্র কাশীনাথ মহাত্রে। পান্নালাল বন্দ্যোপাধ্যায়। মাঘ, ১৩২১
শিল্পী হরেন্দ্রনাথ গুপ্ত। ভাদ্র, ১৩৫০
ভারত শিল্পচর্চার নববিধান। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়। ফাল্গুন, ১৩১৯, ২য় খণ্ড দশম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা।
ভারত চিত্রচর্চা। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়। আশ্বিন, ১৩২৯ ১০ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা।
বঙ্গভাস্কর্য নিদর্শন। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়। চৈত্র, ১৩২৯, ২য় খণ্ড ১০ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা।

ভারতী

দেশী ছবির মেলা। হেমেন্দ্রকুমার রায়। ফাল্গুন, ১৩২৪
প্রাচ্য শিল্পসভার ষষ্ঠবার্ষিকী প্রদর্শনী। চৈত্র, ১৩১৯
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ভারতীয় চিত্রাঙ্কন পদ্ধতি। অসিতকুমার হালদার। জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৮
চিত্রকর যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়। কার্তিক, ১৩১৯
সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। উমাচরণ শাস্ত্রী। মাঘ, ১৩১৬
দিল্লীর চিত্রশালিকা। বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর। বৈশাখ, ১৩০৫
কি ও কেন। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ফাল্গুন, ১৩১৫
স্পষ্টকথা। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ফাল্গুন, ১৩১৫
পরিচয়। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। চৈত্র, ১৩১৫
শিল্পে ভক্তিমন্ত্র। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৭
ভাবসাধন। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। অগ্রহায়ণ, ১৩১৭
কালোর আলো। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বৈশাখ, ১৩১৮
স্বর্গগত শ্রীমদ্ ওকাকুরা। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। জ্যৈষ্ঠ, ১৩২১
চিত্রে ছন্দ ও রস। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কার্তিক, ১৩২০
ভারত ষড়ঙ্গ। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। আষাঢ়, ১৩২১
ষড়ঙ্গ দর্শন। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। শ্রাবণ, ১৩২১
পথে পথে। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। জ্যৈষ্ঠ, ১৩২২
আদ্যিকালের ছবি। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কার্তিক, ১৩২২
ভারতীয় ছবি। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বৈশাখ, ১৩২৩
রূপরেখা। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বৈশাখ, ১৩২৫
শিল্প ও শিল্পী। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৫
বাংলার ব্রত। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কার্তিক-ফাল্গুন, ১৩২৫

বিচিত্রা

চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত অতুল বসু। প্রবোধ বসু। চৈত্র, ১৩৩৬
শিল্পগুরু শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। অসিতকুমার হালদার। আশ্বিন, ১৩৩৪
বিলাতে বাঙ্গালী শিল্পী। অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়। আষাঢ়, ১৩৩৭
ভাস্কর-শিল্পী গোপেশ্বর পাল। পরমানন্দ দত্ত। আশ্বিন, ১৩৩৯
শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের শিষ্য ও নাতি শিষ্যবর্গ। অসিতকুমার হালদার। অগ্রহায়ণ, ১৩৩৫
অন্ধ্রশিল্পী চিত্রবীর ও আধুনিক বাঙলার শিল্পকথা। অসিতকুমার হালদার। অগ্রহায়ণ, ১৩৩৫ ফাল্গুন, ১৩৪০
শিল্পী চৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায়। উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। শ্রাবণ, ১৩৩৯
চিত্রশিল্পী এ ডি টমাস ও ভারতের খ্রীষ্টীয় আর্ট। অসিতকুমার হালদার। ভাদ্র, ১৩৩৬
শিল্পী শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত মজুমদার। উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। ফাল্গুন, ১৩৩৮
ভারতবর্ষের শোভন-শিল্প। জগদ্ধাত্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। কার্তিক, ১৩৩৭
শিল্পী শ্রীযুক্ত প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়। উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। শ্রাবণ, ১৩৩৮
চিত্রশিল্পী শ্রীব্রতীন্দ্রনাথ ঠাকুর। উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। পৌষ, ১৩৩৮
শিল্পী মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত ও তাঁর চিত্রকলা। মণিলাল সেনশর্মা। কার্তিক, ১৩৪০
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁহার চিত্রকলা। যামিনীকান্ত সেন। বৈশাখ, ১৩৩৮
শিল্পী রবীন্দ্রনাথ। লক্ষ্মীশ্বর সিংহ। বৈশাখ, ১৩৩৯
রবীন্দ্রনাথের চিত্রশিল্প। ডা: সরসীলাল সরকার। পৌষ, ১৩৩৯
শিল্পী শ্রীমতী রানী দে। উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। চৈত্র, ১৩৩৮
বাঙলার রঙ ও রূপ। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। অগ্রহায়ণ, ১৩৩৯
শিল্পী শ্রীমান নন্দলাল বসু। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। অগ্রহায়ণ, ১৩৩৯
বাঙলার রঙ ও রূপ। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পৌষ, ১৩৩৫
বর্ণিকাভঙ্গম। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পৌষ, ১৩৩৫
মূক-বধির চিত্রশিল্পী ও বিপিনবিহারী চৌধুরী। সুশীলকুমার দেব। বৈশাখ, ১৩৪৩
শিল্পী শ্রীমণিমোহন রায়চৌধুরী। উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। ভাদ্র, ১৩৩৯
চিত্রশিল্পী শ্রীমনীষী দে। উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। আশ্বিন, ১৩৩৯
শিল্পী ললিতমোহন সেন এ. আর. সি. এ. (লন্ডন)। অসিতকুমার হালদার। আশ্বিন, ১৩৩৬
শিল্পী শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বিশী। উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। বৈশাখ, ১৩৩৯
শিল্পী শ্রীসুধাংশুকুমার রায়। উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। পৌষ ১৩৩৯
শিল্পী শ্রীমতী সুনয়নীদেবী। শ্রীমতী নোরা পুরসার উইনডেন ব্র্যাক। চৈত্র, ১৩৩৪
বঙ্গীয় কলাপদ্ধতির আধুনিক রূপ। মণিলাল সেনশর্মা। ১৩৪০

প্রবাসী

শিল্পী অর্ধেন্দুপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়। নীহাররঞ্জন রায়। ফাল্গুন, ১৩৩৮।
চিত্রকলাবিদ্যা ও মি: উইলিয়াম রদেনস্টাইনের চিত্রাবলী। অশ্বিনীকুমার বর্মন। অগ্রহায়ণ, ১৩১৭
ভাস্কর্যে শিশুচিত্র। অশ্বিনীকুমার বর্মন। অগ্রহায়ণ, ১৩২০
বিলাত-প্রবাসী বাঙ্গালী ভাস্কর। বৈশাখ, ১৩৩৪
বাঙলার কৃতি ভাস্কর। নলিনীকুমার ভদ্র। প্রবাসী ষষ্টিবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থ। ১৩৬৭

বঙ্গের বাহিরে নব্য-বঙ্গীয় কলাশিল্পী শ্রীঅসিতকুমার হালদার। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস। আশ্বিন, ১৩৩৩
বাণিজ্য সহায় চিত্রশিল্প। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস। আষাঢ়, ১৩৩৫
একজন অন্তরীণের চিত্রচর্চা। অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়। পৌষ, ১৩৫১
বাঙলার নূতন শিল্পী। শ্রাবণ, ১৩২৪
সৌন্দর্য্যতত্ত্বে নন্দলাল বসু। সুধীরচন্দ্র কর। বৈশাখ, ১৩৩৬
আচার্য্য নন্দলাল বসু ও তাঁহার চিত্রকলা। মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত। জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১
নন্দলাল বসুর শিক্ষাপদ্ধতি। কাননবিহারী মুখোপাধ্যায়। আশ্বিন, ১৩৪৭
বোম্বাই প্রবাসী বাঙালী। ইন্দুভূষণ সেন। জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮
একটি বাঙ্গালী ভাস্কর। প্রেমাঙ্কুর আতর্থী। শ্রাবণ, ১৩২৯
নব দিল্লীর চিত্রপ্রদর্শনী। যামিনীকান্ত সোম। বৈশাখ, ১৩৪২
রাজা রবি বর্মা। বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর। অগ্রহায়ণ-পৌষ, ১৩০৮
স্বর্গীয় রবি বর্মা। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পৌষ, ১৩১৩
বাঙলার প্রাচীন ধাতু খোদাই চিত্র। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রাবণ, ১৩৫৩
সে-যুগের ধাতু খোদাই ও কাঠ খোদাই শিল্প। যোগেশচন্দ্র বাগল। বৈশাখ, ১৩৬১
চিত্রশিল্পী মুকুলচন্দ্র দে। সজনীকান্ত দাস। ফাল্গুন, ১৩৩৪
শিল্পী শ্রীযুক্ত যামিনীরঞ্জন রায়ের প্রদর্শনী। শান্তাদেবী। বৈশাখ, ১৩৩৯
লন্ডনে ইন্ডিয়া হাউসের দেওয়াল চিত্র। ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মা। কার্তিক, ১৩৩৯
বাঙলার আধুনিক চিত্রকলা ও চিত্রশিল্পী রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। মণিন্দ্রভূষণ গুপ্ত। জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৫
ভারতীয় চিত্রকলা ও কাষ্ঠ খোদন পদ্ধতি। কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়। আশ্বিন, ১৩৩৬
একজন আধুনিক বাঙালী শিল্পীর কথা। পুলিনবিহারী সেন। আশ্বিন, ১৩৪৫
আমার এপথ। সুধীররঞ্জন খাস্তগীর। শ্রাবণ, ১৩৭৩
শিল্পী হীরাচাঁদ দুগার ও তাঁর চিত্রকলা। দ্বিজেন মৈত্র। চৈত্র, ১৩৫৬
চিত্রকর রামেশ্বরপ্রসাদ বর্মা। পৌষ, ১৩৪২
প্রবাসী বাঙালীর কথা (শিল্পী বামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়)। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস। ভাদ্র, ১৩৩৩
শিল্পী মহীতোষ বিশ্বাসের চিত্রকলা। রতনমণি চট্টোপাধ্যায়। জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৩
মর্মর প্রস্তরে লক্ষ্মীমূর্তি। দীনেশচন্দ্র সেন। কার্তিক, ১৩১১
দিল্লী-প্রবাসী নব্যবঙ্গীয় চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত সারদাচরণ উকীল। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস। অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪
স্বতঃস্ফূর্তি। স্টেলা ক্র্যামরিশ। শ্রাবণ, ১৩২৯
ভারতীয় চিত্রকলা প্রচারে রামানন্দ। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পৌষ, ১৩৫০
ভারতীয় চিত্রশিল্প। সুকুমার রায়। শ্রাবণ, ১৩১৭
বহড়ু গ্রামের কয়েকটি পুরাতন ভিত্তিচিত্র। কালিদাস দত্ত। চৈত্র, ১৩৩৯
ভারতীয় চিত্রকলা। সুকুমার রায়। অগ্রহায়ণ, ১৩১৭
শিল্পে অত্যুক্তি। সুকুমার রায়। আশ্বিন, ১৩২১
ভারতশিল্পের অন্তপ্রকৃতি। অসিতকুমার হালদার। আষাঢ় ১৩২১
ভারতের প্রাচীন চিত্রকলা। রমাপ্রসাদ চন্দ। অগ্রহায়ণ ১৩২০
ভারতশিল্পের অধ্যাত্মতা। প্রফুল্লকুমার সরকার। জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৮
বেঙ্গল স্কুল ও অবনীন্দ্রনাথ। বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়। ষষ্ঠদশ-পূর্তি সংখ্যা।

ভারতবর্ষের শিল্প। সম্পাদকীয় প্রবন্ধ। শ্রাবণ, ১৩০৮
শিল্পের দেবতা। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কার্তিক, ১৩১৬
মূর্ত্তি। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। মাঘ, ১৩২০
শেষ বোঝা, চিত্রপরিচয়। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ফাল্গুন, ১৩২০
রূপরেখার রূপকথা। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বৈশাখ, ১৩৩২
সাদৃশ্য। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। চৈত্র, ১৩৩৪
ই. বি. হ্যাভেল। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। চৈত্র, ১৩৩৪
আমার ছবি ও বই লিখতে শেখা এবং আমার মাস্টারি। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বৈশাখ, ১৩৪৮
দেশীয় তাসে শিল্পকলা। শ্রীমহাদেব রায় এম. এ। ফাল্গুন, ১৩৪৮
রাফেল ও মাদোনা চিত্র। অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়। কার্তিক, ১৩০১
ভারতের কলাশিল্পের পুনরুদ্ধার। মাদাম হলবেক। অগ্রহায়ণ, ১৩২৫ (অনুবাদক : শ্রীমতী প্রমীলা চৌধুরী)
ভারত শিল্পসম্ভার। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়। বৈশাখ, ১৩০৯। ১ম সংখ্যা।
আধুনিক কাঠ খোদাই চিত্র। নীরদচন্দ্র চৌধুরী ও সজনীকান্ত দাস। ২৭ আশ্বিন, ১৩৩৪

বসুমতী

বাঙালী ভাস্কর। সাময়িক প্রসঙ্গ। মাসিক বসুমতী। শ্রাবণ, ১৩৩৫
চিত্রশিল্পী হেমেন্দ্রনাথ মজুমদার। প্রেমেশচন্দ্র সোম। মাসিক বসুমতী। আশ্বিন, ১৩২৯
শিল্পের 'ক' ও 'খ' অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বার্ষিক বসুমতী। ১৩৩২
পি. ঘোষ : শিল্প প্রচারিণী। মাসিক বসুমতী। মাঘ, ১৩৫৬
রথীন মৈত্র। মাসিক বসুমতী। মাঘ, ১৩৭০
কালচেতনার শিল্পী চিত্তপ্রসাদ। অশোক ভট্টাচার্য। শারদীয় বসুমতী। ১৩৯৯
মুদ্রণবিদ্যায় শিল্পীদের অবদান। শ্রীদীপঙ্কর। দৈনিক বসুমতী। ৫ পৌষ, ১৩৭৬

সুন্দরম

অসিতকুমার হালদারের সংক্ষিপ্ত জীবনী। ১ম সংখ্যা ৭ম বর্ষ ১৩৬৯
ভাস্কর পরিচিতি—প্রমথ মল্লিক। রাণা বসু। ১ম সংখ্যা ৭ম বর্ষ ১৩৬৯
শশীকুমার হেশ। হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। ভাদ্র-আশ্বিন, ১৩৬৩
শিল্পী হেমেন্দ্রনাথ। কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত। ভাদ্র-আশ্বিন, ১৩৬৪
ভাস্কর কারমারকার। ৭ম বর্ষ ১ম সংখ্যা ১৩৬৯
শিল্পী হেমন্ত মিশ্র। দ্বিজেন মৈত্র। ৪র্থ বর্ষ ২য় সংখ্যা ১৩৬৬
রবীন রায়ের শিল্প বৈচিত্র্য। কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত। ভাদ্র-আশ্বিন, ১৩৬৩
সুভো ঠাকুর। ২য় বর্ষ ১৩ সংখ্যা ১৩৬৫
পিকাসো। কল্যাণ ভট্টাচার্য। ৩য় বর্ষ ১ম সংখ্যা ১৩৬৫
ভারত শিল্পে আধুনিকতার বিপর্যয়। অসিত হালদার। আষাঢ়-শ্রাবণ, ১৩৬৪
পাটনা কলম। চিত্তপ্রসাদ গুপ্ত। আষাঢ়-শ্রাবণ, ১৩৬৪
চিত্রে রসবিচার। অশোক মিত্র। আষাঢ়-শ্রাবণ, ১৩৬৪
শিল্পী পূর্ণ চক্রবর্তী। রঘুনাথ গোস্বামী। আষাঢ়-শ্রাবণ, ১৩৬৪

মেদিনীপুরের শিল্প। দিবাকর ঘোষ। আষাঢ়-শ্রাবণ, ১৩৬৪
রথীন্দ্র মৈত্র। কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত। আষাঢ়-শ্রাবণ, ১৩৬৪
বাঁকুড়ার হস্তশিল্প। জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। আষাঢ়-শ্রাবণ, ১৩৬৪
বাংলার কারিগর। সুধাংশু রায়। ভাদ্র-আশ্বিন, ১৩৬৪
শিল্পী সুনীলমাধব। কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত। কার্তিক-অগ্রহায়ণ, ১৩৬৩
প্রচারশিল্পী মাখনলাল দত্তগুপ্ত। রঘুনাথ গোস্বামী। কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৩৬৩
শিল্পী সুনয়নী দেবী। মালবী ঠাকুর। পৌষ-জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৩-৬৪

ললিতা

শিল্পী পি. ঘোষ স্মরণে। মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত। ৬ষ্ঠ বর্ষ ৩য় সংখ্যা
শিল্পী প্রহ্লাদ কর্মকারের স্মৃতি। মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত। চতুর্থ খণ্ড ৩য় সংখ্যা।
শিল্পীর পরিচয় (মাখন দত্তগুপ্ত)। মুরারী দত্ত। ৩য় সংখ্যা চতুর্থ খণ্ড, ৪র্থ বর্ষ।

পরিচয়

রবীন্দ্রচিত্রে আধুনিকতা ও ঐতিহ্য। সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়। মাঘ, ১৩৬৭
রবীন্দ্রনাথের ছবি। অশোক মিত্র। আশ্বিন-কার্তিক, ১৩৬২
রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলা প্রসঙ্গে। রবীন্দ্র মজুমদার। বৈশাখ, ১৩৬৯
রবীন্দ্রনাথের ছবি। সোমনাথ হোর। জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়, ১৩৯৩
গগনেন্দ্রনাথ। বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়। শারদীয়া ১৩৭৯
ভাস্কর্যের নানা প্রকরণ প্রসঙ্গে। মীরা মুখোপাধ্যায়। শারদীয়া ১৯৮৩
পিকাসোর শিল্পকৃতি বিষয়ক নানা রচনা: চিন্তামণি কর, মীরা মুখোপাধ্যায়,
কে. জি. সুব্রহ্মণ্যাম, যুধাজিৎ সেনগুপ্ত। জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি, ১৯৮২
রামকিঙ্কর ও তাঁর কাজকর্ম। কে. জি. সুব্রহ্মণিয়ম (অনুঃ শিবশম্ভু পাল)। ডিসেম্বর, ১৯৮০
চিত্রসাধনা যামিনী রায়। বিষ্ণু দে। শারদীয়, ১৯৭৬
আমার শিল্পী জীবন। গোপাল ঘোষ। পরিচয়, ১৯৭৬
যামিনী রায়। অশোক মিত্র। সেপ্টেম্বর, ১৯৫৫
জর্জ ব্রাক। রঞ্জন রুদ্র। ডিসেম্বর, ১৯৬৩ .
মুঘল চিত্রকলা। নীহাররঞ্জন রায়। শারদীয়, ১৩৮২
শিল্পী চিত্তপ্রসাদের চিঠি। আগস্ট-অক্টোবর, ১৯৮১
দুই চিত্রকর। অজিতকুমার দত্ত। আগস্ট-অক্টোবর, ১৯৮১
কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পী। সুধীর চক্রবর্তী। আগস্ট-অক্টোবর, ১৯৮১
পোড়ামাটির মূর্তি শিল্প। হিতেশরঞ্জন সান্যাল। আগস্ট-অক্টোবর, ১৯৮১
যামিনী রায় : আধুনিক সংশয়?। সমীর ঘোষ। শারদীয়, ১৩৮৯

বঙ্গবাণী

শিল্পের অধিকার। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। চৈত্র, ১৩২৮
দৃষ্টি ও সৃষ্টি। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯
শিল্পী ও ভাষা। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। আষাঢ়, ১৩২৯
শিল্পের সচলতা ও অচলতা। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। শ্রাবণ, ১৩২৯

সৌন্দর্যের সন্ধান। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কার্তিক, ১৩২৯
শিল্প ও দেহতত্ত্ব। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। অগ্রহায়ণ, ১৩২৯
অন্তর ও বাহির। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ফাল্গুন, ১৩২৯
মত ও মন্ত্র। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। চৈত্র, ১৩২৯
সন্ধ্যার উৎসব। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বৈশাখ, ১৩৩০
শিল্পশাস্ত্রের ক্রিয়াকাণ্ড। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। আশ্বিন, ১৩৩০
শিল্পীর ক্রিয়াকাণ্ড। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। অগ্রহায়ণ, ১৩৩০
শিল্পের ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার ভালোমন্দ। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। মাঘ, ১৩৩০
রস ও রচনার ধারা। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ফাল্গুন, ১৩৩০
শিল্পবৃত্তি। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। অগ্রহায়ণ, ১৩৩১
সুন্দর। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ফাল্গুন, ১৩৩১
অসুন্দর। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। চৈত্র, ১৩৩১
জাতি ও শিল্প। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩২
অরূপ না রূপ। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কার্তিক, ১৩৩২
রূপবিদ্যা। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। অগ্রহায়ণ, ১৩৩২
রূপরেখা। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পৌষ, ১৩৩২
স্মৃতি ও শক্তি। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ফাল্গুন, ১৩৩২
আর্য্য ও অনার্য্য শিল্প। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। চৈত্র, ১৩৩২
আর্য্য শিল্পের ক্রম। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বৈশাখ, ১৩৩৩
রূপ। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। অগ্রহায়ণ, ১৩৩৩
খেলার পুতুল। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পৌষ, ১৩৩৩
রূপের মান ও পরিমাণ। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। চৈত্র, ১৩৩৩
ভাব। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৪
লাবণ্য। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কার্তিক, ১৩৩৪
দৌলতপুর খুলনা আর্ট স্কুলের ক্রমোন্নতি। পল্লীবার্তা। (দৈনিক) ১০ নভেম্বর, ১৯৩১

বিশ্বভারতী পত্রিকা

প্রাচীন গোষ্ঠলীলার পট। অজিত ঘোষ। ১৪।২, কার্তিক-পৌষ, ১৩৬৩
বাংলা প্রাচীন লোকচিত্র। অজিত ঘোষ। ৫।১, শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৫৩
রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলা। অনুপম গুপ্ত। ২৫। ৩, মাঘ-চৈত্র, ১৩৭৫
আর্ট প্রসঙ্গ। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১।১, শ্রাবণ, ১৩৪৯
আলিপনা। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৪।১ শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৫২
ভারত-শিল্পচর্চা। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ২৯।২-৩, কার্তিক-চৈত্র, ১৩৮৩
মানব ও শিল্পচর্চা। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ২৯।২-৩, কার্তিক-চৈত্র, ১৩৮৩
রবীন্দ্রনাথ ও আর্ট। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৬।২-৩, কার্তিক-চৈত্র, ১৩৮৩
নন্দলাল বসু। অর্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায়। নন্দলাল বসু সংখ্যা ১৩৭৩
অলঙ্করণ। আর্যকুমার সেন। ৫।৪, বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৫৪
ভারতে শিল্পশিক্ষা। কল্লাতি গণপতি সুব্রহ্মণ্যম। ২৯।৪, বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৮৪

শিল্পী উইলিয়ম ব্রেক। বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়। ১৪।৩, মাঘ-চৈত্র, ১৩৬৪
শিল্পী নন্দলাল। বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়। ৩।১, শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৫১
শিশুদের ছবি-আঁকা। বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়। ৭।৩, মাঘ-চৈত্র, ১৩৫৫
বিদ্যায়তনে শিল্পকলা। বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়।
বিমলকুমার দত্ত। ২৬।৪, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭৭
ভারতের লোকায়ত শিল্প। বিমলকুমার দত্ত। ২৯।৪, বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৮৪
বিশ্বভারতীর স্মৃতি ও আচার্য নন্দলাল বসু। মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত। নন্দলাল বসু-সংখ্যা ১৩৭৩
আলোচনা সংস্কৃত সাহিত্য ও চিত্রকলার আদর্শ। মনোমোহন ঘোষ। ৩।১, শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৫১
ছবির কথা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ২।৪, বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৫১
নন্দলাল বসু। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৩।১, শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৫১ (নন্দলাল-সংখ্যা, ১৩৭৩)
ওকাকুরা তেনশিন ও অবনীন্দ্রনাথ। সত্যজিৎ চৌধুরী। ২৯।২-৩, কার্তিক-চৈত্র, ১৩৮৩
অবনীন্দ্রনাথের শিল্পতত্ত্ব। সত্যেন্দ্রনাথ রায়। ২৯।২-৩, কার্তিক-চৈত্র, ১৩৮৩
গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। সমর ভৌমিক। ২৪।২, কার্তিক-পৌষ, ১৩৭৪
বটতলার বেসাতি। সুকুমার সেন। ৭।১, শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৫৫
শিল্পাচার্য নন্দলাল। সুরেন্দ্রনাথ কর। নন্দলাল বসু-সংখ্যা, ১৩৭৩
শিল্প ও শিক্ষাব্যবস্থা। স্টেলা ক্র্যাম্‌রিশ। ৭।৩ মাঘ-চৈত্র, ১৩৫৫
সুনয়নী দেবী। স্টেলা ক্রামরিশ। ৬।২, কার্তিক-পৌষ, ১৩৫৪
আচার্য নন্দলাল ও শান্তিনিকেতন। হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। নন্দলাল সংখ্যা ১৩৭৩
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর : শিল্পী ও সাহিত্যিক। লীলা মজুমদার। ২২।১, শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৭২
আলোচনা : চিত্রশিল্পী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুব। ১১।২, কার্তিক-পৌষ, ১৩৫৯
নবপর্যায় ১-৪। শ্রাবণ, ১৪০১ আষাঢ়, ১৪০২। (নবপর্যায় ১-৬ পর্যন্ত) কল্পাতি গণপতি সুব্রহ্মণ্যম।
শান্তিনিকেতনে শিল্পকলার ভূমিকা। অনুঃ সৌমিক নন্দী মজুমদার। ১
বিনোদবিহারীর স্কেচ প্রসঙ্গে। ২, দেবাশিস ভট্টাচার্য।
সুব্রহ্মণ্যমের সাম্প্রতিকতম ম্যুরাল। অনুঃ সৌমিক নন্দী মজুমদার। ৩ রামন শিবকুমার।
অবনীন্দ্রনাথের চিত্রকলার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য। অনুপম গুপ্ত। ৬, কার্তিক-পৌষ, ১৪০৩

এক্ষণ

বঙ্গীয় শিল্পধারা। কমলকুমার মজুমদার। ৫।৬, কার্তিক-অগ্রহায়ণ, ১৩৭৪ ক্রোড়পত্র
বঙ্গীয় গ্রন্থ-চিত্রণ। ১০।৪-৫, কার্তিক-মাঘ, ১৩৭৯
প্রতিমা : নন্দলালের নূতন রূপকৃতি। কানাই সামন্ত। ২।৩ শারদীয়, ১৩৬৯
বাংলাদেশে হিন্দু-মুসলিম শিল্পরীতির ধারাবাহিকতা। ডেভিড ম্যাক্‌কাচিয়ন। ৬।৫, কার্তিক-মাঘ। ১৩৭৫
কলাভবনের কিছু স্মৃতি। দিনকর কৌশিক। ১৯।৩-৪ শারদীয়, ১৩৯৮
মৃৎশিল্প ও মৃৎশিল্পী। পূর্ণচন্দ্র দাস। ৮।৬, ফাল্গুন-চৈত্র, ১৩৭৭
শিল্পী চিত্তপ্রসাদ। প্রভাস সেন। ৩।১, কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৩৭১
টেরাকোটা কাজের বৈশিষ্ট্য। বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়। ১১।৫-৬, শারদীয়, ১৩৮২
প্রাণকৃষ্ণ পাল : শিল্পী জীবনের রূপরেখা। রথীন মিত্র। ১৬।৫, গ্রীষ্ম, ১৩৯১
ঐতিহ্য ও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সতজিৎ চৌধুরী। ৬।৪, শারদীয়, ১৩৭৫
বাংলার লোকশিল্প সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ। সন্তোষ বসু। ৪।৪, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৩

বাংলা চালচিত্রে পট (সচিত্র) সুধীর চক্রবর্তী। ১৮।৫-৬, শারদীয়, ১৩৯৬
শিল্পী বিনোদবিহারীর সংক্ষিপ্ত চিত্রপঞ্জি। দিনকর কৌশিক। ১৪।৫, শীত-বসন্ত, ১৩৮৭
দাদুর চিঠি। শিল্পী বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের পত্রগুচ্ছ। দেবাশিস ভট্টাচার্য। ২০।১-২, শারদীয়। ১৪০০
অ্যানাটমি। শিল্প-বিষয়ক আলোচনা। দেবাশিস ভট্টাচার্য। ২০।৩-৪, শারদীয়, ১৪০১
আমরা ও জ্যঁ দমিনিক অ্যাঁগ। নীরদ মজুমদার। ৫।৪-৫, শারদীয় ১৩৭৪
ছক ও ছন্দ। পরিতোষ সেন। ১৩।৫-৬, শারদীয় ১৩৮৫
কিষাণগড়ের রাধা। পরিতোষ সেন। ১৫।১-২, শারদীয়, ১৩৮৮
টেরাকোটা কাজের বৈশিষ্ট্য। বিনোদবিহারী। ১১।৫-৬, শারদীয়, ১৩৮২
শিল্পজিজ্ঞাসা। বিনোদবিহারী। ১২।১-২, ১৩৮৩
শিল্পজিজ্ঞাসা। বিনোদবিহারী। ১২।৩-৪, শারদীয়, ১৩৮৩
চিত্রকর। বিনোদবিহারী। ১৩।১-২ শারদীয় ১৩৮৪
মহাভারত ও ভারতশিল্প। বিনোদবিহারী। ১৪।১-২, শারদীয়, ১৩৮৬
কথায় কথায়। বিনোদবিহারী। ১৪।৫, শীত-বসন্ত, ১৩৮৭
চিত্রদর্শকের ভূমিকা। মণি জানা। ২।৫, আষাঢ়-শ্রাবণ, ১৩৭১
চিত্রকলা-বিষয়ক আলোচনা। রঞ্জন রুদ্র। ৪।৩, ফাল্গুন-চৈত্র, ১৩৭২
স্মরণ : নিখিল বিশ্বাস। রণবীর রায়। ৫।১, কার্তিক-মাঘ, ১৩৭৩
আধুনিক চিত্রকলার সমস্যা। সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়। ১।৪, কার্তিক-অগ্রহায়ণ, ১৩৬৮
মনে পড়ে মনে পড়ে না। সোমনাথ হোর। ১৭।৩-৪, শারদীয়, ১৩৯২
কোলাজ। পরিতোষ সেন। ১৪।১-২, শারদীয়, ১৩৮৬
গ্রাফিক্স। পরিতোষ সেন। ১৪।৩-৪, শারদীয়, ১৩৮৭
টেরাকোটা। সন্তোষকুমার বসু। ১৬।৬, শারদীয়, ১৩৯১
শিল্প-বিষয়ক আলাপ। সত্যজিৎ রায় ও পৃথ্বীশ নিয়োগী। ১১।৫-৬, শারদীয়, ১৩৮২

দেশ

ভারতীর প্রচ্ছদ। কমল সরকার। ৬, অক্টোবর, ১৯৭৯
চিত্রশিল্পী গগনেন্দ্রনাথ। কানাই সামন্ত। ২২, ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৮
ব্যঙ্গ চিত্রশিল্পী, গগনেন্দ্রনাথ। কমল সরকার। ২৭, মে, ১৯৬১
বাঙলার বিংশ শতাব্দীর চিত্র প্রদর্শনী। মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত। ৩, জানুয়ারি, ১৯৪২
রূপদক্ষ দুই রূপকার। কমল সরকার। ১১ ও ১৮, জুলাই, ১৯৮১
চিত্রশিল্পে বাঙালী পরিচালকগণ। সুশীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। শারদীয়, ২৮, সেপ্টেম্বর, ১৯৩৫
ভারতের শিল্পকীর্তি বিকল্পের অন্বেষণে। অজিতকুমার দত্ত। ২০, আগস্ট, ১৯৭৭
অর্ধশত বর্ষে অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস। কমল সরকার। ৪, জুন, ১৯৮৩
ভাস্কর প্রমথ মল্লিক। কমল সরকার। ১২, জানুয়ারি, ১৯৭৪
চিত্রশিল্পী স্বর্গীয় বামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়। বীণাপাণি মুখোপাধ্যায়, লতিকা চট্টোপাধ্যায়। ৫ জুলাই, ১৯৫২
বিনোদবিহারীর চিত্রকলা। শুভময় ঘোষ। শারদীয়, ১৩৬৫
রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলা। যামিনী রায়। (অনুলেখক : সুবোধ ঘোষ)। ১০ মে, ১৯৪১
শিল্পী রামকিঙ্কর। শুভময় ঘোষ। শারদীয় ১৩৬২
রূপসাগরে ডুব দিয়েছি (ভাস্কর শঙ্খ চৌধুরী)। অজিতকুমার দত্ত। ১৬, অক্টোবর, ১৯৭১
স্মরণ শতবর্ষে শ্যামাচরণ শ্রীমানী। কমল সরকার। ১, মে, ১৯৭৬

শিল্পী ভাস্কর সুধীররঞ্জন। কমল সরকার। ২২, জুন, ১৭৭৪
শিল্পী সুরেন্দ্রনাথ দাস। কমল সরকার। ৩, জানুয়ারি, ১৯৮১
শিল্পী-পত্নী। কমল সরকার। ১৪, জুলাই, ১৯৭৩
কলকাতার প্রথম চিত্রপ্রদর্শনী। কমল সরকার। ১০ জুলাই ১৯৮২
শিল্পী অবনী সেন। চিত্রপ্রদর্শনী। ২২, মার্চ, ১৯৫২
পঞ্চাশের বাঙলা : (শিল্পী ইন্দু গুপ্তের পঞ্চাশের মন্বন্তর বিষয়ক চিত্র সংকলনের আলোচনা)। ৬, জুলাই, ১৯৪৬।
শিল্পী গোপাল ঘোষ। ১, মার্চ ১৯৪৭
শ্রীহীরাচাঁদ দুগারের চিত্রপ্রদর্শনী। অসিতকুমার হালদার। ৪, ফেব্রুয়ারি, ১৯৫০
চিত্রকলা : বিনায়ক শিবরাম মসৌজি। কমল সরকার। ১৮, জুন, ১৯৭৭
কিঙ্করদা ও বিমূর্ত শিল্প। দিনকর কৌশিক। ৩, জানুয়ারি, ১৯৮৭
নিবেদিতা ও ভারতের শিল্প আন্দোলন। শঙ্করীপ্রসাদ বসু।
মুসলিম চিত্রকলার আদিপর্ব। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ। ২৯, মার্চ, ১৯৮৬
পৃথিবীর বৃহত্তম ভাস্কর্য। যামিনীকান্ত সেন। ১৯৩৪
শ্রীশ্রী চৈতন্যের জন্ম (শিল্পী : নন্দলাল বসু) : চিত্রপরিচয়। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। ৩, মার্চ, ১৯৩৪
এশিয়ার শিল্পে যাযাবর জাতির দান। কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়। শারদীয়, ৬ অক্টোবর, ১৯৩৪।
ভারতীয় চিত্রকলার নতুন রূপ উডকাট। মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত। শারদীয়, ১৯৩৪
শিল্পীর চোখে শিবশক্তি। নলিনীকান্ত ভট্টশালী। শারদীয়, ১৯৩৪
শিল্পীর চরম আদর্শ। অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়। প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মিলনের দ্বাদশ অধিবেশনে পঠিত এবং দেশ-এ মুদ্রিত।
মুর্শিদাবাদের গজদন্তশিল্প। শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ১৯৩৫
রূপের পাত্রে মানব ও প্রকৃতি। যামিনীকান্ত সেন। ২৩, মার্চ, ১৯৩৫
সরস্বতী কাব্যে চিত্রে ও ভাস্কর্যে। যামিনীকান্ত সেন। ৯, ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৫
প্রস্তর যুগের চিত্রকলা। সুবোধ ঘোষ। ৪, মে, ১৯৪০
চিত্র সমালোচনা। পুলিনবিহারী সেন। ১৩, জানুয়ারি, ১৯৪০
বাংলা শিশুগ্রন্থ সজ্জার একশ বছর। নিখিল সরকার। ৬, নভেম্বর, ১৯৫৪
শিল্পী বিনোদবিহারী। প্রভাস সেন। ২০, অগ্রহায়ণ, ১৩৮৭
অবসিত শিল্পী। শ্যামল চক্রবর্তী। ২০, অগ্রহায়ণ, ১৩৮৭
বিনোদদা। রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়। ঐ
'দেশ'-এর ব্যঙ্গ চিত্রকলা। কমল সরকার। সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যা ১৩৪০-৯০
শিল্পের বোধোদয়ে পঞ্চাশ বছরের দেশ। পুর্ণেন্দু পত্রী। ঐ
রবীন্দ্রনাথের ছবি। নির্মলকুমার বসু। ১১, মে, ১৯৪০। ৭ বর্ষ। ১৬ সংখ্যা।
রবীন্দ্রনাথের ছবি। নির্মলকুমার বসু। ৮ বর্ষ ০০ সংখ্যা।
শিল্পী রবীন্দ্রনাথ : নন্দলাল বসু। ৯ বর্ষ। ১৪ সংখ্যা।
রবীন্দ্রনাথের ছবি। মুলকরাজ আনন্দ। ১৫ বর্ষ। ২৭ সংখ্যা।
রবীন্দ্রনাথের আর্ট কী। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। ১৬ বর্ষ ২৭ সংখ্যা।
রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলা। দ্বিজেন্দ্র মৈত্র। ১৮ বর্ষ ২৭ সংখ্যা।

অবনীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৯ বর্ষ ৭ সংখ্যা।
নন্দলাল বসু। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ২০ বর্ষ ৬ সংখ্যা।
রবীন্দ্রনাথের ছবি। বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়। ২০ বর্ষ ১৬ সংখ্যা।
রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলা। দ্বিজেন মৈত্র। ২০ বর্ষ ১৬ সংখ্যা।
রবীন্দ্রনাথের চিত্রলিপি। বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়। ২০ বর্ষ ৩৫ সংখ্যা।
চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথ। শিবনারায়ণ রায়। ২২ বর্ষ ২৭ সংখ্যা (সাহিত্য সংখ্যা ১৯৫৫)।
রবীন্দ্রনাথের চিত্রশিল্প। মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত। ২২ বর্ষ ৩৪ সংখ্যা।
এঁরা লিখতেন এবং আঁকতেন। নিখিল সরকার। ২৬ বর্ষ ১৭ সংখ্যা।
রবীন্দ্রচিত্রকলা প্রসঙ্গে। দেবব্রত মুখোপাধ্যায়। ২৮ বর্ষ ২৭ সংখ্যা (রবীন্দ্র শতবার্ষিকী-সংখ্যা)।
বিশ্বব্যঙ্গচিত্রে রবীন্দ্রনাথ। কমল সরকার। ২৮ বর্ষ ৫১ সংখ্যা (২৮, অক্টোবর ১৯৬১)।
রবীন্দ্রচিত্রকলায় শিল্পপ্রেরণা। বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়। ২৯ বর্ষ ২৭ সংখ্যা। রবীন্দ্র শতবর্ষপূর্তি সংখ্যা ৫, মে, ১৯৬২
রামকিঙ্করের চোখে রবীন্দ্রচিত্রকলা। সত্য সাঁই। ২৯ বর্ষ ৩১ সংখ্যা। জুন, ১৯৬২
দিল্লীতে রবীন্দ্রচিত্রের প্রদর্শনী। ২১ বর্ষ ১৯ সংখ্যা, ১৩, মার্চ, ১৯৫৪
রবীন্দ্রনাথের চিত্রপ্রদর্শনী। অশোককুমার নিয়োগী। ৩৪ বর্ষ ৫১ সংখ্যা।
রবীন্দ্ররচনার প্রথম চিত্রকর। কমল সরকার। ৪০ বর্ষ ৫ সংখ্যা। ২, ডিসেম্বর, ১৯৭২
রবীন্দ্র চিত্রকলা। সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ৪৩ বর্ষ ২৮ সংখ্যা।
রবীন্দ্রনাথের ছবি ও সাহিত্য : সম্বন্ধ বিচার। সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ৪৪ বর্ষ ৩৮ সংখ্যা।
রামকিঙ্করের রবীন্দ্রনাথ। প্রভাস সেন (৪৭ বর্ষ ৮ সংখ্যা)। ২২, ডিসেম্বর, ১৯৭৯
রবীন্দ্রনাথের 'ডিজাইন' ভাবনা। অরুণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। ২৬, জুলাই, ১৯৯৭
মীরা মুখোপাধ্যায়। সন্দীপ সরকার। ১০, নভেম্বর, ১৯৯০
মায়াবী পটুয়া গণেশ পাইন। যোগেন চৌধুরী। ১৮, এপ্রিল, ১৯৯৮
বাক্‌পটুয়ার জগৎ। সুধীর চক্রবর্তী। ২০, এপ্রিল, ১৯৯১
টোটেমপোলের দেশের শিল্প। সুতপা সেনগুপ্ত। ১৬, মার্চ, ১৯৯১
ওয়ারলি আদিবাসী চিত্রকলা। সলিল ঘোষ। ৩০, জুন, ১৯৯০
একশো কোটি টাকার ছবি। মদনগোপাল মুখোপাধ্যায়। ৩০, জুন, ১৯৯০
চিত্রশিল্প ও প্রকৃতিপ্রেমিক জাহাঙ্গীর। অশোককুমার দাস। ৯, ডিসেম্বর, ১৯৮৯
ছবির ডাক্তারি। সন্দীপ সরকার। ৩১, মার্চ, ১৯৯০
যান্ত্রিক চিত্রমালা। সমরজিৎ কর। ৩, মার্চ, ১৯৭০
শুশুনিয়ার পাথর শিল্প। ত্রিপুরা বসু। ৯, সেপ্টেম্বর, ১৯৮৯
শিল্পস্রস্টা ও সমালোচক। অশোক মিত্র। ৮, জুন, ১৯৯১
পটুয়ার নতুন মূল্যায়ন। জ্যোতীন্দ্র জৈন। ৮, আগস্ট, ১৯৯৮
অন্য বিষাদসিন্ধু (হুসেনের ছবি)। সন্দীপ সরকার। ৮, জুন, ১৯৯১
পিকাসোর মুখোমুখী। পরিতোষ সেন। ২৭, আগস্ট, ১৯৯৪
কী আঁকছি কেন আঁকছি। যোগেন চৌধুরী। ১৫, জানুয়ারি, ১৯৯৪
নৃত্যমগ্ন ভারত ভাস্কর্য। শ্যামল কান্তি চক্রবর্তী। ১, এপ্রিল, ২০০০
শিল্প সংস্কৃতি-সৃজনের মানবিক অঙ্গীকার। শুভরঞ্জন দাশগুপ্ত। ১০, জুলাই, ১৯৯১
শিল্পীহ খনন করে যুদ্ধের কবর। দীপঙ্কর চক্রবর্তী। ১১, জুলাই, ১৯৯৮

শিল্পাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ ঃ অসামান্য তুলির হাত অনন্য শিক্ষক। জয়ন্ত চক্রবর্তী। ১৬, ডিসেম্বর ১৯৯৭
সাহাবুদ্দিনের ছবি। প্রণবরঞ্জন রায়। ১৯, নভেম্বর, ১৯৯৪
প্রাক্ গুপ্তবঙ্গের শিল্পকলা। ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। ২২, অক্টোবর, ১৯৯৪
সমুদ্রমন্থনের শিল্পকলা। সন্দীপ সরকার। ১৫, জুলাই, ১৯৮৯
এক নিঃসঙ্গ শিল্পী (হরেন দাশ)। পরাগ রায়। ২, জুলাই, ১৯৯৪
চারুকলার মুখ্য নির্ঝর : এখনও কলকাতাই, কিন্তু আর কতদিন? পরিতোষ সেন। ১০, জানুয়ারি ১৯৯৮
বাংলার ক্যানভাসেই জন্ম নবীন ভারত চিত্রকলা। স্বাতী ভট্টাচার্য। ১৯৯৮
আধুনিক পাঁচ দশকের বঙ্গ চিত্রকলা। অরুণ ঘোষ। ১৯৯৮
শিল্পের স্বর্গ রোম ও ভাটিক্যান। আদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়। ৩, আগস্ট, ১৯৯১
একটি প্রদর্শনীর পথে। অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত। ২২, সেপ্টেম্বর, ১৯৯০
একটি উজ্জ্বল প্রদর্শনী (হুসেন)। প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত। ১৭, মে, ১৯৮৬
ভারত ভাস্কর্যে নারীর যৌবন সৌন্দর্য। চিত্রা দেব। ৮, নভেম্বর, ১৯৮৬
খড়ুইয়ের গালাপুতুল। কিন্নর রায়। ৬, ডিসেম্বর, ১৯৮৬
নীলাচলের পটচিত্র। সোমনাথ চক্রবর্তী। ১৬, ডিসেম্বর, ১৯৮৬
কৃষ্ণনগরের পুতুলের পাঁচালি। সুপ্রিয় ভট্টাচার্য। ২৫, জুলাই, '৮৭
বাংলার পুতুলশিল্প ও তার শিল্পীরা। প্রবীর সেন। ৫, সেপ্টেম্বর, ১৯৮৭
গিলগিটের বৌদ্ধ স্তূপ ও ভারতের প্রাচীনতম অণুচিত্র। ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। ২৪, আগস্ট, '৮৭
চণ্ডীপুরের পুতুল ও পটুয়া সমাজ। তপন কর। ৫, ডিসেম্বর, ১৯৮৭
কলকাতার স্থাপত্য। রাধাপ্রসাদ গুপ্ত। ১৩, ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৮
সোভিয়েত দেশে চিত্রকলা ও ভাস্কর্যের সত্তর বছর। প্রণবরঞ্জন রায়। ২৩, এপ্রিল, ১৯৮৮
কাঠ খোদাইয়ের ভাস্কর। অঞ্জন সিকদার। ২১, মে, ১৯৮৮
পুঁথির অলঙ্করণ। অনিমা মুখোপাধ্যায়। ৪, জুন, ১৯৮৮
পটের গ্রাম: নয়া গ্রাম। সুজাতা পাষ্টী সরকার। ১৮, জুন, ১৯৮৮
ফোটোগ্রাফি : একটি ঐতিহাসিক রূপরেখা। সিদ্ধার্থ ঘোষ। ২, জুলাই, ১৯৮৮
নিউজ ফোটোগ্রাফির এক শতাব্দী। প্রদ্যোৎ দে। ২, জুলাই, ১৯৯৮
ভারতে ইংরেজদের আদিপর্ব ও হুসেনের সচিত্র রাজদর্শন। রাধাপ্রসাদ গুপ্ত। ১৭, মে, ১৯৮৬
আদি মানবের আনন্দে ছবি আঁকি। হুসেন। ১৭, মে; ১৯৮৬
কৌতুকচিত্রী নন্দলাল। রবি পাল। ২৮, নভেম্বর, '৮৭
অ্যারিজোনার সেই মহাকাশ শিল্পী। সমরজিৎ কর। ২ জানুয়ারি ১৯৮৮
শিল্পী বিকাশ। মনসিজ মজুমদার। ২৩ এপ্রিল ১৯৮৮
অবিরত দিকবদল (শিল্পী বিকাশ ভট্টাচার্য)। অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়। ২৩ এপ্রিল ১৯৮৮
বাংলা প্রকাশনী : একাল সেকাল। জগমোহন মুখোপাধ্যায়। ৩০ জানুয়ারি '৮৮
বাংলা বইয়ের বিজ্ঞাপন : গত শতকে। অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য। ৩০ জানুয়ারি '৮৮
আর্মিতাজ প্রদর্শনী। সন্দীপ সরকার। ৩০ জানুয়ারি '৮৮
বাল্মামনস্বিতার একশো বছর। প্রণবরঞ্জন রায়। ৪, মার্চ, ২০০০
আধুনিকতাকে আমি যে-ভাবে দেখি। যোগেন চৌধুরী। ৪, মার্চ, ২০০০

একজন গণেশ পাইনই যথেষ্ট। মকবুল ফিদা হুসেন। ৪, মার্চ, ২০০০
রবির 'সর্ব্ব প্রথমোদ্যম'। অশোককুমার মুখোপাধ্যায়। ৫, আগস্ট, ১৯৮৯
অনাবিষ্কৃত দুটি ছবি (রবীন্দ্রনাথের ছবি)। দিনকর কৌশিক।
রবীন্দ্রনাথের নুতন দুটি আবিষ্কৃত ছবি। দিনকর কৌশিক। ২৪, ডিসেম্বর, ১৯৮৮
পটুয়া রবি ঠাকুর ও চিত্রবিপ্লব। শিবনারায়ণ রায়। ১০, মে, ১৯৮৬
বিশ শতকের ভারতীয় চিত্রকলা ও রবীন্দ্রনাথ। অশোক মিত্র।
রবীন্দ্র চিত্রকলা ও পশ্চিমী জগৎ। কে. জি. সুব্রহ্মণ্যাম। ৯, মে, ১৯৮৭
রবীন্দ্র প্রতিকৃতিতে রামকিঙ্করের ভাবনাক্রম। রবি পাল। ৭, মে, ১৯৮৩
সাহিত্য ও ছবির দুই রবীন্দ্রনাথ। সুশোভন অধিকারী। ২৬, জুলাই, ১৯৯৭।
চিত্রপ্রদর্শনী। নন্দলাল বসু। ২৭ বর্ষ ৪৭ সংখ্যা।
কিছু মনে পড়ে। রামকিঙ্কর বেইজ (৪৭ বর্ষ ৪৯ সংখ্যা)। ৪, অক্টোবর, ১৯৮০
শান্তিনিকেতনে নন্দলাল শতবার্ষিকী। সন্দীপ সরকার। ৫০ বর্ষ ১৩ সংখ্যা।
নন্দলাল। বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়। ১৪, মে, ১৯৬৬
জ্যোতিরিন্দ্রনাথের চিত্রসংকলন। কমল সরকার। শারদীয়, ১৪৩১
রামকিঙ্করের ভূমণ্ডল। পূর্ণেন্দু পত্রী।
কিঙ্করদা। প্রভাস সেন। ১৬, আগস্ট, ১৯৮০
একটি প্রতিকৃতি ও রামকিঙ্কর। রবি পাল। ২৪, এপ্রিল, ১৯৮২
মুকুলচন্দ্র দে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (বিশ্বভারতী)। মার্চ, ১৯৮৯
মুকুলচন্দ্র দে। জয়তী ঘোষ। ৫, জানুয়ারি, ১৯৮৫
ওস্তাদ মনসুর। অশোককুমার দাস। ২৫ আগস্ট—১০, অক্টোবর, ১৯৯০
আটাশি বছরের কর্মঠ যুবা। অজিতকুমার দত্ত। ৮, এপ্রিল, ১৯৮৯
শিল্পস্রস্টা ও সমালোচক। অশোক মিত্র। ৮, জুন, ১৯৯১
প্রসঙ্গ ছাপাই ছবি। অজিতকুমার দত্ত। ৫, জুন, ১৯৮২
মুখর মৌন (অগুস্ত রোদাঁ)। সন্দীপ সরকার। ২৬, ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৩
মধুবনী চিত্রকলা। রামচন্দ্র রায়।
সমন্বয়-সন্ধানী ব্রাকুঁসি। অজিতকুমার দত্ত। ১৭, পৌষ, ১৩৮৩
ভারতের শিল্পকীর্তি বিকল্পের সন্ধানে। অজিতকুমার দত্ত।
আধুনিক ফরাসী চিত্রকলার প্রথম প্রদর্শনী। সন্দীপ সরকার।
সমকালীন ভারতীয় চিত্রকলার স্তম্ভ। অহিভূষণ মালিক।
প্রসঙ্গ : চৌষট্টি কলা এবং ভারতীয় ঐতিহ্য। অরণি বন্দ্যোপাধ্যায়। ২, জুলাই, ১৯৮৩
স্বাধীনোত্তর কলকাতার পৌরমূর্তির বিভীষিকা। চিন্তামণি কর। ১০, জুলাই, ১৯৮৩
কার্বুসিয়ের শহরের ভাস্কর্য। দীপক ভট্টাচার্য। ১৫, অক্টোবর, ১৯৮৩
ভাস্কর্যে আচার্য শঙ্খ চৌধুরী। সন্দীপ সরকার। ২৮, জুন, ১৯৮৬
রাজপুত-চিত্রমালা। সোমনাথ চক্রবর্তী।
পটের ভাষা। দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়।
ভাস্কর্যে আধুনিকতা ও হেনরি মুর। প্রণবরঞ্জন রায়। ৩০, জুলাই, ১৯৮৮
মার্ক শাগাল। অহিভূষণ মালিক।

শিল্পী হীরাচাঁদ দুগার : একটি বিস্তৃত নাম। দ্বিজেন মৈত্র। ২৭, জুন, ১৯৮৭
কিছু জিজ্ঞাসা এবং চিন্তামণি কর। রতন জানা। ২১, জুন, ১৯৮৬
বিস্মৃত হিরণ্ময়। উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।
মাস্টার মশাই। শঙ্খ চৌধুরী।
বাণিজ্যিক সংস্কৃতির কবলে চিত্রকলা। সলিল ঘোষ। ১৬, সেপ্টেম্বর, ১৯৮৯
চিত্রবিচিত্র চিত্রশালা। সন্দীপ সরকার। ১৬, সেপ্টেম্বর, ১৯৮৯
বৌদ্ধগুহা অজন্তা। দেবব্রত মুখোপাধ্যায়। শারদীয়, ১৯৫৪
বৌদ্ধ শিল্পীরা। দেবব্রত মুখোপাধ্যায়। ২৬, মে, ১৯৫৬
যামিনী রায়ের চিত্রকলা। পরিতোষ সেন। ১১, এপ্রিল, ১৯৮৭
শিল্পী যামিনী রায়। বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়। ১১, এপ্রিল, ১৯৮৭
যামিনী রায়ের শিল্পের উৎস সন্ধানে। রাধাপ্রসাদ গুপ্ত। ১১, এপ্রিল, ১৯৮৭
যামিনী রায়ের ছবির ঠিকানা। প্রণবরঞ্জন রায়। ১১, এপ্রিল, ১৯৮৭
নিখিল বিশ্বাস ও দুই দশকের বাঙালী শিল্পীসমাজ। প্রণবরঞ্জন রায়। ৩৭ বর্ষ ৭ সংখ্যা, ১৯৬৬
শিল্পসৃষ্টিতে লিথোগ্রাফ। নিরাময় রায়। ১৩, ভাদ্র, ১৩৭১
বাংলার অক্ষরশিল্প। দ্বারেশচন্দ্র শর্মাচার্য। ৩০, ডিসেম্বর, ১৯৩৯
কুমোরটুলির চারশো বছরের বিবর্তন। জয়ন্ত দাস। ১৯, সেপ্টেম্বর, ১৯৯৮
শিল্পাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ : অসামান্য তুলির হাত অনন্য শিক্ষক। জয়ন্ত চক্রবর্তী। ১৩, ডিসেম্বর, ১৯৯৭
শততম বছরে মুকুলচন্দ্র দে। প্রণবরঞ্জন রায়। ১০, সেপ্টেম্বর, ১৯৯৪
কালীঘাটের পটুয়াদের নূতন মূল্যায়ন শুরু হয়েছে। জ্যোতিন্দ্র জৈন। ৮, আগস্ট, ১৯৯৮
রঙের রবীন্দ্রনাথ ঃ গ্রন্থের আলোচনা। শোভন সোম। ২৬, জুলাই, ১৯৯৭
রঙের রবীন্দ্রনাথ। লেখকদের প্রথম প্রতিবাদপত্র, ২০, সেপ্টেম্বর, ১৯৯৭। শ্রী সোম-এর প্রত্যুত্তর: দেশ ৪, অক্টোবর, ১৯৯৭। লেখকের সমাপনী পত্র এবং সন্দীপ সরকারের সামগ্রিক বিশ্লেষণী মন্তব্য। ১০, জানুয়ারি, ১৯৯৮
বাংলার ক্যানভাসেই জন্ম নবীন ভারত চিত্রকলার। স্বাতী ভট্টাচার্য। ১০, জানুয়ারি, ১৯৯৮
আধুনিক চিত্রকলার বঙ্গ চিত্রকল্পনা। অরুণ ঘোষ। ১০, জানুয়ারি, ১৯৯৭
ভারতীয় চিত্রকলার বর্তমান অবস্থা। অরুণ ঘোষ। ১২, জুলাই, ১৯৯৭
অন্তর্মগ্ন গুরু কিন্তু তাঁর তুলিতে ত্রিমাত্রিক মায়াজাল। যোগেন চৌধুরী। ১৮, এপ্রিল, ১৯৯৮
বাঙালি পটুয়ার হাতে বিস্ময়ভরা অতিপ্রাকৃতের আধুনিক ইশারা। অরুণ ঘোষ। ১৮, এপ্রিল, ১৯৯৮
স্বাধীনতা : চিত্রকলা। পরিতোষ সেন। স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যা-৯ আগস্ট, ১৯৯৭
ঠাকুরবাড়ির ছবি। শুভরঞ্জন দাশগুপ্ত। ৩১, অক্টোবর, ১৯৯৮
গ্রাফিক্ শিল্পী সত্যজিৎ রায়। রঘুনাথ গোস্বামী। ২৮, মার্চ, ১৯৯২
আধুনিক চিত্রকলা। শুদ্ধশীল বসু। ৬, ২২ সংখ্যা। ১৩৭৩। ৩১, ৩২ সংখ্যা ১৩৭৪
বাংলার পট, পটুয়া ও পটগীতি। জয়ন্ত চক্রবর্তী। ৮, মাঘ, ১৩৭২
খেয়াল রসের ছবি। প্রণবরঞ্জন রায়। সুকুমার রায় স্মরণ সংখ্যা, ৬, সেপ্টেম্বর, ১৯৮৬
নন্দলালের রেখাচিত্র। শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র। শারদীয় সংখ্যা ১৩৫৭
বঙ্গীয় মৃৎশিল্পের বর্ণপ্রকরণ। তপন কর। ১২, মার্চ, ১৯৮৩
শাপভ্রষ্ট দেবশিশুদের কথা। সন্দীপ সরকার। বিনোদন ১৩৮৫

শিল্পী রামকিঙ্কর। শুভময় ঘোষ। বিনোদন ১৩৮২
আধুনিক ইউরোপীয় বিচিত্র চিত্রধারা। নীরদ মজুমদার। বিনোদন ১৩৮০
ভারতীয় শিল্পশিক্ষায় কলাভবন। ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মা। বিনোদন ১৩৮৬
ব্রাঁকুসি। পরিতোষ সেন। ৩০, ডিসেম্বর, ১৯৯৫
যে নামেই ডাকুন। মনসিজ মজুমদার। ১৮, মে, ১৯৯৬
প্রাক্-গুপ্তবঙ্গের শিল্পকলা। ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। ২২, অক্টোবর, ১৯৯৪
মুঘল চিত্রশিল্পী দাসোয়ান্ত। অশোককুমার দাস। ১৫, জুলাই, ১৯৯৫
শিল্পী পিকাসোর মুখোমুখি। পরিতোষ সেন। ২৭, আগস্ট, ১৯৯৪
আর্তি ও বিপন্নতার শিল্পী ভ্যান গখ। মনসিজ মজুমদার। ১৫, ডিসেম্বর, ১৯৯০
পরিতোষ সেন। সন্দীপ সরকার। ১৫, ডিসেম্বর, ১৯৫০
কল্পরাজ্যের শিল্পী। গণেশ পাইন। অহিভূষণ মালিক। সাপ্তাহিক।
ভারতের চিত্রকলা (১৯৩৭-৮৭)। অশোক মিত্র। ২, জানুয়ারি, ১৯৮৮
নতুন প্রজন্মের শিল্পীরা। মনসিজ মজুমদার। ২, জানুয়ারি, ১৯৮৮
বিকাশ ভট্টাচার্যের সঙ্গে কিছুক্ষণ। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। ২, জানুয়ারি, ১৯৮৮
গোধূলির নিঃসঙ্গতা। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়। ২, জানুয়ারি, ১৯৮৮
তবু এই সহজ জীবন যাপন আমার ভালো লাগে। রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়।
চার শিল্পী। প্রণবরঞ্জন রায়। ২৩, আগস্ট ১৯৮৬
বাঙালীর শিল্পচর্চার উত্তরাধিকার। কমল সরকার। ২৩ আগস্ট ১৯৮৬
প্রদর্শনী প্রসঙ্গে। রঘুনাথ গোস্বামী। ২৩, নভেম্বর ১৯৮৩
গগ্যাঁ ও এ কোল দ্য পঁতাভঁ। অহিভূষণ মালিক। ৩৮ বর্ষ ৪২ সংখ্যা।
পত্রচিত্রণে নন্দলাল। রবি পাল। ২৬, নভেম্বর, ১৯৮৩
নন্দলালের চিত্রপ্রদর্শনী। রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়। ২৮, এপ্রিল, ১৯৮৪
নির্বাক কবিতা ও উচ্চারিত ছবি। মনসিজ মজুমদার। ১১, মার্চ, ১৯৯৫
চন্দ্রকেতুগড় : প্রাচীন বঙ্গের সংস্কৃতি। অলোকশংকর মৈত্র। সাপ্তাহিক।
যক্ষ-যক্ষী : শিলা-ভাস্কর্যে রামকিঙ্কর। রবি পাল। শারদীয়, ১৩৯৭
রামকিঙ্করের ভাস্কর্য। শঙ্খ চৌধুরী। ৩, জানুয়ারি, ১৯৮৭
মানুষ রামকিঙ্কর। প্রভাস সেন। ৩, জানুয়ারি, ১৯৮৭

দেশ প্রিয়দর্শী

কলাক্ষেত্রে নবাগত অর্থশক্তি। এলা দত্ত। দেশ প্রিয়দর্শী, ১২, ডিসেম্বর, '৯৮
কলাদেবী গেলেন সওদাগরের ঘরে। দেশ প্রিয়দর্শী, ১২, ডিসেম্বর, '৯৮
গ্যালারির দাপটে শিল্পী নিঃসঙ্গ। গায়ত্রী সিংহ। ১২, ডিসেম্বর, '৯৮
শিল্পে সমাজের সহায়তা : প্রাচীন ভারতে যেমন ছিল। কুনাল চক্রবর্তী। ১২, ডিসেম্বর, '৯৮
চিত্রের নগ্নিকা কি বাস্তবের মানবী। মনসিজ মজুমদার। ১২, ডিসেম্বর, '৯৮

দেশ বিনোদন সংখ্যা ১৯৮৩

রবীন্দ্রনাথের ছবি আঁকার সময় সম্পর্কিত কিছু কথা। সুশোভন অধিকারী।
কাঠ খোদাই : আদি কথা ও হরেন দাশ। প্রদীপ পাল।

অ. লা. চৌ-এর ছবি লেখা। ড. দেবাশিস ভট্টাচার্য।
শানু লাহিড়ী এবং তাঁর ছবি। এলা দত্ত।
অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায় : দ্বীপান্বিত চেতনা। মনসিজ মজুমদার।
ক্যানভাসের ভাস্কর। পূর্ণেন্দু পত্রী।
সলিল ভট্টাচার্য : জীবন ও শিল্প। শুদ্ধশীল বসু।
আদিম এবং আধুনিক রবীন মণ্ডল। অহিভূষণ মালিক।
গোপাল সান্যাল ও তাঁর ছবির জগৎ। পার্বতী মুখোপাধ্যায়।
নৈরাজ্যের নীলিমা। সন্দীপ সরকার।
ঈশা মহম্মদ ঃ চিত্রকলার তৃতীয় ভাবনা। পবিত্র মুখোপাধ্যায়।
অরুণ বসুর চরিতমানস। সুশীল মুখোপাধ্যায়।
শ্যামল দত্তরায়ের শিল্পীমানস। তরুণ মিত্র।
সনৎ করের ছবি : অন্তহীন অন্বেষণ। অশোক চট্টোপাধ্যায়।
আত্মনিষ্ঠ আশ্রমিক শিল্পী। কমল সরকার।
বেদনা থেকে শিল্পের শুদ্ধতায় : চিত্রকর গণেশ হালুই। শিবনারায়ণ রায়।
ধীরাজ চৌধুরীর রূপ তন্ময়তা। শঙ্কর ভট্টাচার্য।
শিল্পী জীবনের পাঁচটি পর্যায়। অরুণ নাগ।
গণেশ পাইনের ছবির ভুবন। প্রণবরঞ্জন রায়।
'পাপের মূর্তিগুলি উঠে আসে'। অজিতকুমার দত্ত।
সুনীল দাসের পৃথিবী। প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত।
বিকাশ ভট্টাচার্যের ছবি। অরণি বন্দ্যোপাধ্যায়।

দেশ বিনোদন সংখ্যা ১৯৮৯ — কলকাতা ৩০০

কলকাতার সাহেব শিল্পীরা। চিন্তামণি কর।
রাজমূর্তি। কমল সরকার।
কত ভেনাস। দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়
স্থাপত্যের ক্রমবিকাশ। চির দত্ত।

দেশ বিনোদন সংখ্যা ১৩৮৯ : নন্দলাল বসু শতবর্ষ

শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু। ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মন।
আমার দৃষ্টিতে নন্দলাল। নীরদচন্দ্র চৌধুরী।
রূপকার নন্দলাল। শান্তিদেব ঘোষ।
নন্দলাল বসুর শিল্পীজীবনের গোড়ার দিকের তিনটি ছবি। জয়া আপ্পাস্বামী।
নন্দলাল : কারুসংঘ ও জাতীয় আন্দোলন। প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।
ফুলকারী। নন্দলাল বসু।
মানুষ নন্দলাল। রাণী চন্দ।
নন্দলালের জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর পরিমণ্ডল। রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়।
নিবেদিতার সান্নিধ্যে নন্দলাল। কমল সরকার।
জাপানের প্রেরণা ঃ নন্দলাল বসু। সত্যজিৎ চৌধুরী।

অবনীন্দ্রনাথ ও নন্দলাল। পঞ্চানন মণ্ডল।
ছবি ও ছন্দ। অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য।
গান্ধীজি ও নন্দলাল। মনোরঞ্জন গুহ।
নন্দলাল বসুর সান্নিধ্যের কিছু স্মৃতি। চিন্তামণি কর।
নন্দলাল বসু। নীরদ মজুমদার।
উত্তরসূরীর চোখে নন্দলাল। বিজন চৌধুরী।
মাস্টারমশাই : শিক্ষক নন্দলাল। জয়া আপ্পাস্বামী।
আচার্য নন্দলাল ও তাঁর ছাত্রছাত্রীরা। প্রভাস সেন।
শিল্পক্ষেত্রে নন্দলাল বসুর ছাত্রীদের ভূমিকা। চিত্রা দেব।
নন্দলাল বসুর গ্রন্থচিত্রণ। পূর্ণেন্দু পত্রী।
নন্দলালের ছাপাই ছবি। কাঞ্চন চক্রবর্তী।
পোস্টারশিল্প ও নন্দলাল। রাধাপ্রসাদ গুপ্ত।
দক্ষিণী শিল্পীদের ওপর নন্দলালের প্রভাব। সুশীল মুখোপাধ্যায়।
নন্দলালের সময়। সন্দীপ সরকার।
প্রাচ্য সফরে নন্দলালের ভাবনা। রবি পাল।
শান্তিনিকেতনের শ্রী ও সৌন্দর্যের রূপকার নন্দলাল। দেবীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়।
সংবাদে নন্দলাল। কমল সরকার সংকলিত।
নন্দলালের জীবন ও রচনাপঞ্জী। সন্দীপ সরকার সংকলিত।

দেশ সাহিত্য সংখ্যা ১৩৯৯

আমার ছবি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সংকলন ও ভূমিকা : শোভন সোম।
জীবনের অপরাহ্ণে। চিন্তামণি কর।
স্মৃতিচিত্র। পরিতোষ সেন।
আত্মজীবনীর অন্যদিক। সোমনাথ হোর।
স্পন্দন। মীরা মুখোপাধ্যায়।
পিছনে তাকিয়ে। কে. জি. সুব্রহ্মণ্যাম।
স্মৃতি সুখের মালা। অজিত চক্রবর্তী।
নিজের কিছু কথা। বিজন চৌধুরী।
আমার কথা। রবীন মণ্ডল।
আমার নিজের কথা। মাধব ভট্টাচার্য।
কিছুইতো হল না। শর্বরী রায়চৌধুরী।
জীবন ও শিল্পচর্চা। ফুলচাঁদ পাইন।
আত্মকথা ও কাহিনী। প্রকাশ কর্মকার।
বিচিত্র এই জীবন। বিপিন গোস্বামী।
বলার মতো কিছু না। সনৎ কর।
আমার কথা। শ্যামল দত্তরায়।
আপন কথা। সুহাস রায়।
জীবন পাত্রের মাধুরী। গণেশ পাইন।

আমার ছবি ও আমি। যোগেন চৌধুরী।
জীবনকে ছুঁয়ে। সুনীল দাস।
লড়াই। ধর্মনারায়ণ দাশগুপ্ত।
সুখ-দুঃখ স্মৃতিকথা। বীণা ভার্গব।
আমি, আমার ছবি। বিকাশ ভট্টাচার্য।
জীবনের জলছবি। ওয়াসিম রিয়াজ কাপুর।

সানন্দা

আফগানিস্তান : ইতিহাসের সরণীতে শ্রান্ত সরাইখানা। শোভন সোম। পার্বণী, ২০০২
নগ্ন নির্জননারী তুমি। পরিতোষ সেন।

চতুষ্কোণ

বাংলার বাস্তববাদী শিল্পধারা ও অতুল বসু। পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী। পৌষ, ১৩৮১, ভাদ্র, ১৩৮২
শিল্পীজীবন পরিক্রমা : 'অথ আলু, আপেল, কৎবেল কাহিনী। অতুল বসু। কার্তিক, ১৩৬৯
শিল্পী ও শান্তি। অতুল বসু। ১৩৬১ নববর্ষ-সংখ্যা।
চিত্রকলা প্রসঙ্গে। অতুল বসু। কার্তিক, ১৩৬৮
শিল্পকলায় জাতীয়তাবাদ। অতুল বসু। শারদীয়, ১৩৬৩
যামিনীপ্রকাশ ও সমসাময়িক বাঙালী শিল্প। অতুল বসু। চৈত্র-বৈশাখ, ১৩৫৯-৬০
চিত্রে ষড়ঙ্গ। অতুল বসু। শারদীয়, ১৩৫৯
অতুল বসু। যামিনী রায়। শারদীয়, ১৩৯৪
বাংলাদেশের বাস্তবধর্মী শিল্পধারা ও শিল্পী অতুল বসু। পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী।
বিমূর্ত-শিল্প। জয়ন্ত চক্রবর্তী। শারদীয়, ১৯৬৪
আধুনিক বাংলার চিত্রকলার উৎস সন্ধানে। অশোক মিত্র। শারদীয়, ১৩৬৯

শনিবারের চিঠি

শিল্পচিন্তা : অতুল বসু। আশ্বিন, ১৩৬৪
গগনেন্দ্রনাথ : অতুল বসু। বৈশাখ-শ্রাবণ, ১৩৭৬

অনুষ্টুপ

ইয়ং আর্টিস্ট ইউনিয়ন (১৯৩১) ও আর্ট বিরেল সেন্টার। গোবর্ধন আশ। শীতসংখ্যা ১৯৮৪
ক্যালকাটা গ্রুপের সংস্পর্শে এলাম। গোবর্ধন আশ। শারদীয়, ১৩৯১
ঔপনিবেশিক ভারতে শিল্পশিক্ষা, ১৮৩৯-১৯৪৭। শোভন সোম। শারদীয়, ১৯৮৬
ক্যালকাটা গ্রুপ (১৯৪৩-১৯৫৩) : উদ্দেশ্য, কর্মপন্থা ও পরিণাম। শোভন সোম। শারদীয়, ১৩৯০

প্রমা

সর্বজনীন শিল্পকলা। যোগেন চৌধুরী। এপ্রিল-জুন, ১৯৯৩
এক আলিঙ্গনে ছবি আর কবিতা। পূর্ণেন্দু পত্রী। এপ্রিল-জুন, ১৯৯৩
আমার ছবি প্রসঙ্গে। বিজন চৌধুরী। এপ্রিল-জুন, ১৯৯৩
যামিনী রায় এক আধুনিক চিত্রকর। নরেশ গুহ। এপ্রিল-জুন ১৯৯৫
রামকিঙ্কর : 'পলাশের সর্বাঙ্গে আগুন'। সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিপজ্জনক দুই শিখর, ব্যক্তি ও রচয়িতা। টুডবার্টা দাশগুপ্ত এবং অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত। এপ্রিল-জুন, ১৯৯৫
শিল্পের পরিধিকে বিস্তৃত করাই লক্ষ্য। কলপাতি গণপতি সুব্রহ্মণ্যম। এপ্রিল-জুন, ১৯৯৫
সংগীত থেকে ভাস্কর্য। শর্বরী রায়চৌধুরী। এপ্রিল-জুন, ১৯৯৫

বারোমাস

বিস্মৃত এক মৃৎশিল্পী। কমল সরকার। শারদীয়, ১৯৭৯
যামিনী রায় প্রসঙ্গে। কমল সরকার। মার্চ-এপ্রিল, ১৯৭৯
ইউরোপে প্রথম বাঙালী শিল্পী রোহিনীকান্ত নাগ। কমল সরকার। আগস্ট, ১৯৭৮
জাতীয় আন্দোলনের কার্টুন। কমল সরকার। ডিসেম্বর, ১৯৭৮
রবীন্দ্রচিত্রে মুখ ও মুখোশ। জয়ন্ত চক্রবর্তী। শারদীয়, ১৯৮৭, ৯ বর্ষ ১ সংখ্যা।

সচিত্র শিশির

শিল্পী যতীন্দ্রকুমার। জলধর সেন। শারদীয়, ২ বর্ষ ১৩৩২
শিল্পী হেমেন্দ্রনাথ। বিজয়রত্ন মজুমদার। ৯, আশ্বিন, ১৩৩১
শিল্পী সতীশচন্দ্র। বড়দিন-সংখ্যা ১৩৩২

শিল্প ও সাহিত্য

বিবিধ প্রসঙ্গ। বঙ্গীয় কলা সংসদ। আশ্বিন, ১৩১২
যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় এক অনন্যকর্মা শিল্পী। কমল সরকার। শারদীয়, ১৩৮৮

সমকালীন

সাবেকী কথা। অসিতকুমার হালদার। জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬২ এবং কার্তিক, ১৩৬২
রবীন্দ্রনাথের চিত্রাবলী। অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়। রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ১৩৬৮
রঙ ও রেখার নটনলেখা। রবীন্দ্র সামন্ত। শ্রাবণ, ১৩৭৯
নব্য ভারতীয় চিত্রকলা ও ইন্ডিয়া সোসাইটির জন্ম। সোমেন্দ্রনাথ বসু। আশ্বিন, ১৩৮৩
স্থাপত্য ও ভাস্কর্যে পাথর। কনককান্তি বসু। আশ্বিন, ১৩৮৩
সূত্রধরের আঁকা দুর্গাপট। গীতিকা গুহ। আশ্বিন, ১৩৮৩
ক্ষুদ্রাকার চিত্রে গীতিময়তার সূত্রপাত। ভোলানাথ ভট্টাচার্য। আশ্বিন, ১৩৮৩
ভারতীয় প্রেক্ষিতে বাঙলা-কলম। ভোলানাথ ভট্টাচার্য। মাঘ, ১৩৮১
বাংলার লোকশিল্প। আদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়। কার্তিক, ১৩৭৮
বাংলার মন্দির অলংকরণে পাশ্চাত্য প্রভাব। সোমনাথ ভট্টাচার্য। পৌষ, ১৩৭৮
অবনীন্দ্রনাথের শিল্পচিন্তা : পটভূমিকা। পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়। পৌষ, ১৩৭৮
প্রাক্-মুঘল ও আকবরী যুগের প্রারম্ভে চিত্রকলা। অশোককুমার দাস। শ্রাবণ, ১৩৭৯
পট। বিমলেন্দু চক্রবর্তী। আষাঢ়, ১৩৮০
লোকায়ত শিল্পকলা : ছৌনাচের মুখোশ। শিবেন্দু মান্না। অগ্রহায়ণ, ১৩৮০
লোকচিত্রের ভাষা। অজিতকুমার মিত্র। পৌষ, ১৩৮০
শিল্পী বামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়। বিমলেন্দু চক্রবর্তী। মাঘ, ১৩৮০
মুর্শিদাবাদ-চিত্রকলার উদ্ভব প্রসঙ্গে। আদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়। জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৩
সামাজিক দৃষ্টিকোণে শিল্প ও শিল্পী। সন্তোষকুমার বসু। জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৩

সারস্বত

শিল্পী প্রাণকৃষ্ণ পাল। অশোক ভট্টাচার্য। কার্তিক-পৌষ ১৩৭৬
শিল্পী ক্ষিতীন্দ্রনাথ। অশোক ভট্টাচার্য। শারদীয়, ১৩৮৭

লোকচিত্রকলা

সংগ্রামী শিল্পী চিত্তপ্রসাদ। স্বাতী চন্দ। লোকচিত্রকলা, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা ১৩৮৬
শিল্পী সূর্য রায়। সুধী প্রধান। নবপর্যায় ১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা, ১৩৮৬
অরণি (প্রথম প্রকাশ : ১৯৪১, ২২, আগস্ট)
ছবির সংকট। চিত্তপ্রসাদ ভট্টাচার্য। শারদীয়-সংখ্যা, ১৩৫০
দেশরক্ষায় বিভিন্ন প্রচেষ্টা ও চিত্রশিল্প। পরেশ লাহিড়ী। ৩।১৯
শিল্পী রবীন্দ্রনাথ। বিনয় ঘোষ। ১।১
চিত্রপ্রদর্শনী। রমাংশুশেখর দাস। ৩।৩
পিকাসো ও আর্টের ভবিষ্যৎ। ডেরেক কার্টুন। ৫।৩৯ (অনুবাদ)।
সিকেরাসের ইস্তেহার। কল্যাণী ঘোষ। নবপর্যায় প্রথম সংখ্যা ১৩৯৫
গুয়ের্ণিকা : যুদ্ধের অমানুষিকতার এক চিরন্তন প্রতিচ্ছবি। জোশেপ পলই ফেবার। অনুবাদ ইন্দ্রাণী সেনগুপ্ত।
বাংলার ফ্যাসিবাদ বিরোধী শিল্প আন্দোলন। রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায়। অনুবাদ ইন্দ্রাণী সেনগুপ্ত।
চল্লিশের দশকের প্রতিবাদী শিল্পী রথীন মৈত্র (সাক্ষাৎকার)। অনুবাদ ইন্দ্রাণী সেনগুপ্ত।
কলকাতার সাম্প্রতিক সোভিয়েত শিল্প প্রদর্শনী। নির্মাল্য নাগ। নবপর্যায় প্রথম সংখ্যা ১৯৯৫।
কলকাতায় প্রদর্শনী গৃহ ১ : অ্যাকাদেমি অফ ফাইন আর্টস। কমল আইচ। নবপর্যায় প্রথম সংখ্যা ১৯৯৫।

উত্তরসূরি

রবীন্দ্রনাথের ছবি। বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়। রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষ ১৩৬৮
রবীন্দ্র চিত্রকলার ভূমিকা। জীবেন্দ্রকুমার গুহ। রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষ ১৩৬৮
চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথ। জনি ওবোইয়ার।
রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষ ১৩৬৮
চিত্রশিল্পী : রবীন্দ্রনাথ। অসীমকুমার ঘোষ। বৈশাখ-আশ্বিন, ১৩৮২

ষড়ঙ্গ

অজিতকৃষ্ণ গুপ্তকে যা দেখেছি যা জেনেছি। প্রবীর ঘোষ। শারদীয়, ১৩৮২
বিশ্বনাথ সোম। সমর সোম। মার্চ-এপ্রিল, ১৯৭১

অমৃত

আমার কথা ও ভারতের শিল্পকলা। অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়। ৩১, আষাঢ়, ১৩৭২
অমৃতবাজারের কার্টুন। কমল সরকার। ১২, নভেম্বর, ১৯৭১
আলেখ্য-দর্শন : সতীশচন্দ্র সিংহ। নিজস্ব প্রতিনিধি। ১২, জুন, ১৯৬৪
সুধাংশুকুমার রায়। উৎপল চট্টোপাধ্যায়। ২৬, আগস্ট, ১৯৭৭

জাদুপট ও জাদু পটুয়া। সুধাংশুকুমার রায়। ২৭, মে, ১৯৭৭
চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথ। দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী। ৩১, অক্টোবর, ১৯৭৫
রূপকথার নেপথ্যে। প্রশান্ত দাঁ।
একালের চিত্রশিল্পী : করুণা সাহা। প্রশান্ত দাঁ। ২৮, আশ্বিন, ১৩৮৩
শানু লাহিড়ী। প্রশান্ত দাঁ। ৩, অগ্রহায়ণ, ১৩৮৩
অশোক মিত্র। প্রশান্ত দাঁ। ১৭, অগ্রহায়ণ, ১৩৮৩
চিন্তামণি কর। প্রশান্ত দাঁ। ১১, আষাঢ়, ১৩৮৩
শ্যামল দত্তরায়। প্রশান্ত দাঁ। ৫, কার্তিক, ১৩৮৩
সুনীল পাল। প্রশান্ত দাঁ। ১৮, আষাঢ়, ১৩৮৩
সুনীল দাস। প্রশান্ত দাঁ। ৩, ভাদ্র, ১৩৮৩
সত্যজিৎ রায়। প্রশান্ত দাঁ। ২৪, ভাদ্র, ১৩৮৩
গণেশ হালুই। প্রশান্ত দাঁ। ২১, শ্রাবণ, ১৩৮৩
রামকিঙ্কর বেইজ। প্রশান্ত দাঁ। ৭, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৩
বিকাশ ভট্টাচার্য। প্রশান্ত দাঁ। ১০, ভাদ্র, ১৩৮৩
ইন্দ্র দুগার। প্রশান্ত দাঁ। ১৪, শ্রাবণ, ১৩৮৩
বি. আর পানেসর। প্রশান্ত দাঁ। ১৬ বর্ষ ৩১ সংখ্যা ১৩৮৩
রথীন মৈত্র। প্রশান্ত দাঁ। ২৮, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৩
সত্যেন্দ্র ঘোষাল। প্রশান্ত দাঁ। ১৬ বর্ষ ২১ সংখ্যা।
সুভো ঠাকুর। প্রশান্ত দাঁ। ১৬ বর্ষ ৩০ সংখ্যা।
ঈশা মহম্মদ। প্রশান্ত দাঁ। ১৬ বর্ষ ৩২ সংখ্যা।
পরিতোষ সেন। প্রশান্ত দাঁ। ৪, আষাঢ়, ১৩৮৩
নীরদ মজুমদার। প্রশান্ত দাঁ। ১৪, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৩
প্রদোষ দাশগুপ্ত। প্রশান্ত দাঁ। ২৬, কার্তিক, ১৩৮৩
প্রাণকৃষ্ণ পাল। প্রশান্ত দাঁ। ১৬ বর্ষ ২১ সংখ্যা।
অতুল বসু। প্রশান্ত দাঁ। ২৮, শ্রাবণ, ১৩৮৩
গোপাল ঘোষ। প্রশান্ত দাঁ। ২১, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৩
বিপিন গোস্বামী। প্রশান্ত দাঁ। ১৬ বর্ষ ২৪ সংখ্যা
সুনীলমাধব সেন। প্রশান্ত দাঁ। ২৫, আষাঢ়, ১৩৮৩
গণেশ পাইন। প্রশান্ত দাঁ। ১৬ বর্ষ ১০ সংখ্যা।
প্রকাশ কর্মকার। প্রশান্ত দাঁ। ১৬ বর্ষ ২৫ সংখ্যা।
দ্বিতীয় মন—নীরদ মজুমদার। শাণ্ডিল্য চতুর্বেদী। ১৭, অগ্রহায়ণ, ১৩৮৩
গণেশ পাইনের দুটি ড্রইং। প্রণবরঞ্জন রায়। নববর্ষ সংখ্যা ১৩৮৫
বাংলাদেশে রাজনীতি ও চিত্রকলার একশ বছর। অতুল বসু। ৯, ১৬, ২৩, শ্রাবণ, ১৩৮১

প্রবর্তক

বর্তমান ও ভবিষ্যৎ আর্ট। চৈত্র, ১৩২৯
শিল্পের অন্ধকার যুগ। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। মাঘ, ১৩২৮
শিল্পের অনধিকার। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ফাল্গুন-চৈত্র, ১৩২৮

বাণী ও বীণা। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ফাল্গুন, ১৩২৮
শিল্পী যামিনী রায়। রাধারমণ চৌধুরী। চৈত্র, ১৩৫১

ভাণ্ডার

প্রশ্নোত্তর : অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। জ্যৈষ্ঠ, ১৩১২

সৌরভ (ময়মনসিংহ)

• অশ্বিনীকুমার বর্মন। পৌষ, ১৩২০
শিল্পী হেমেন্দ্রনাথ। মাঘ, ১৩৩৪

প্রাচী

শিল্প। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। আষাঢ়, ১৩৩০

অয়ন

কারুছত্র। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। শ্রাবণ, ১৩৩০

তরুণ

রীতিমতো শিল্পশিক্ষা। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ভাদ্র, ১৩৩০

মহিলা

উন্নতি ও পরিণতি। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। জ্যৈষ্ঠ ২, ১৩৩১

উত্তরা

দোতারা। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। চৈত্র, ১৩৩২
শিল্প ও জীবনের যোগসূত্র। অসিতকুমার হালদার। প্রথম বর্ষ ১ম সংখ্যা আশ্বিন ১৩৩২

উদয়ন

নূতনে পুরাতনে। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। আষাঢ় ১৩৪০

কল্লোল

এম. এ. আর্টিস্টের প্রশ্নমালা। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৩৩৪

সুলভ সমাচার

কলিকাতার চিত্রবিদ্যা প্রদর্শন। মাঘ ১৪, ১২৮১

সাপ্তাহিক বিজলী

পণ্ডিতের লাগে ধন্দ। বারীন্দ্রকুমার ঘোষ। ২৮, এপ্রিল, ১৯২২

মানসী ও মর্মবাণী

বাঙ্গালার ভাস্কররাজ ফণীন্দ্রনাথ বসু। রাজেন্দ্রলাল আচার্য। অগ্রহায়ণ, ১৩৩৩

মানসী

ভারতশিল্পের বর্ণপরিচয়। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়। চৈত্র, ১৩১৯, ২য় সংখ্যা।

সুবর্ণবণিক সমাচার

বাঙালী শিল্পীর ইতালীয় বৃত্তিলাভ (শিল্পী ক্ষিতিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়)। আষাঢ়, ১৩৪১
অক্ষরশিল্পী কৃষ্ণচন্দ্র মিস্ত্রী। নরেন্দ্রনাথ লাহা। ভাদ্র, ১৩৪২

বঙ্গদর্শন

আর্যজাতির সূক্ষ্মশিল্প। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ভাদ্র, ১২৮১

মধ্যস্থ

আর্যজাতির সূক্ষ্মশিল্প ঃ গ্রন্থ সমালোচনা। চৈত্র, ১২৮০

বঙ্গদর্শন (নবপর্যায়)

মানসচর্চা। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কার্তিক, ১৩১৪
নামকরণ রহস্য। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বৈশাখ, ১৩১৬
ভারতশিল্পের মূলসূত্র। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়। জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৯

সঞ্জীবনী

হেনরি হোভার লক। পৌষ ১৯, ১২৯২

জাহ্নবী

ভারতীয় প্রাচীন শিল্পের আদর না অনাদর। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বৈশাখ, ১৩১৩

অলকা

কলিকাতা কলা-পরিষদের প্রদর্শনী। যামিনীকান্ত সেন। মাঘ, ১৩৪৫

বেতার জগৎ

আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলা। ভবেশ সান্যাল। ৩৯ বর্ষ ১৮শ সংখ্যা।
চিত্রকলা এবং ভারতের জনসাধারণ। নগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। ৩৯ বর্ষ ১৮শ সংখ্যা।

রসশ্রী

সুনয়নী দেবীর চিত্রকলা। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। অগ্রহায়ণ, ১৩৪১

সংস্কৃতি

বাংলার চিত্রশিল্প। অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়। ৩য় সংখ্যা অক্টোবর, ১৯৬৪

প্রতিক্ষণ

প্যারিস প্রদর্শনীর দিন। শঙ্খ ঘোষ। ২ মে ১৯৮৬
আধুনিক পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় শিল্প। কে. জি. সুব্রহ্মণ্যাম (অনু: শিবশম্ভু পাল)। ১৭, ডিসেম্বর,১৯৮৩
চিত্রকলা, দর্শক এবং কমিউনিকেশন। যোগেন চৌধুরী। ১৭, জুলাই, ১৯৮৫

রথীন মৈত্র। বাংলা চিত্রকলার পালাবদল। অতনু বসু। ২, আগস্ট, ১৯৮৩
কলকাতার কাঠখোদাই ছবি। সুধানাথ চক্রবর্তী। ২, মার্চ, ১৯৮৫
ছবিতে ভাস্কর্যে হেনরি মুর : পোড়ে প্রান্তরে আলোর প্রতিমা। মৃণাল ঘোষ। ১৭, এপ্রিল, ১৯৮৮
স্বদেশ ভাবনা। চিত্রকলা—রেখার রঙের ধ্যান স্বদেশের। সত্যজিৎ চৌধুরী। ২, জুলাই, ১৯৮৭
আধুনিকতার ধারাবাহিকতায় এই দশকের তরুণ শিল্পীরা। মৃণাল ঘোষ। ২, ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৯
চালচিত্রের চিত্রলেখা। সুধীর চক্রবর্তী। শারদীয়, ১৩৯৮
দৃষ্টির দ্বিতীয় ভুবনে। সমীর ঘোষ। শারদীয়, ১৩৯৯
আত্মকথা। গোপাল ঘোষ। শারদীয়, ১৩৯৭
শিল্পীদের কলকাতা (গোলটেবিল)। শারদীয়, ১৩৯৪
গুরুশিষ্য সংলাপ : নন্দলাল বসু, বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়। শারদীয়, ১৩৯১
মডেলের সন্ধানে। প্রদোষ দাশগুপ্ত। শারদীয়, ১৩৯২
শিল্পের বৃক্ষ ও বীজ। সিদ্ধার্থ রায়। সংস্কৃতি সংখ্যা ১৩৯৩
আমি ও আমার সময়। শর্বরী রায়চৌধুরী। সংস্কৃতি সংখ্যা ১৩৯৩
ভারতের হস্তশিল্প। অশোক মিত্র। সংস্কৃতি সংখ্যা ১৩৯৫
মানবতার জয়যাত্রা : সোভিয়েট উৎসবের ছবি ও ভাস্কর্য। মৃণাল ঘোষ। সংস্কৃতি সংখ্যা ১৩৯৫
রোদ্যাঁ : নটরাজ— অনুবাদ। প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্য। সংস্কৃতি সংখ্যা ১৩৯৪
ছবি দেখে ফেরা। বিজন চৌধুরী। সংস্কৃতি সংখ্যা ১৩৯৪
চিত্রকরের ভাবনাচিন্তা। যোগেন চৌধুরী। সংস্কৃতি সংখ্যা ১৩৯৬
আধুনিকতার শিল্পধারা : ফরাসি প্রদর্শনী। মৃণাল ঘোষ।
ছবি ও ভাস্কর্যে সোমনাথ হোর। মৃণাল ঘোষ। এপ্রিল, ১৯৯২
নন্দলাল বসু : রেখা রচনা প্রসঙ্গে। অজিত চক্রবর্তী। ১৭, এপ্রিল, ১৯৮৪
রামকিঙ্কর : ভাস্কর্যের মুক্তি। মৃণাল ঘোষ। সেপ্টেম্বর, ১৯৯২
উনিশ শতকি কলকাতার নগরচিত্র ও কাঠখোদাই ছবি। সোমশঙ্কর রায়। সেপ্টেম্বর, ১৯৯২
প্রকাশ কর্মকারের ছবি। মৃণাল ঘোষ। সেপ্টেম্বর, ১৯৯৮
গণেশ পাইনের ছবি। ১৯৯১-৯৮। মৃণাল ঘোষ। জুলাই, ১৯৯৮
নব্য ভারতীয় চিত্রভাবনার প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের দ্বন্দ্ব। সমীর ঘোষ। এপ্রিল, ১৯৯৪, জুন, ১৯৯৪
চিত্রকলা বনাম সাংস্কৃতিক দারিদ্র্য। সমীর ঘোষ। প্রথম বর্ষ শারদীয় সংখ্যা ১৩৯০
শিল্পকলার জোয়ার। অতনু বসু। ১ম বর্ষ ১৫ সংখ্যা।
শিল্পকলার পাঁচ নায়িকা। অতনু বসু। ১ম বর্ষ ৭ সংখ্যা।
ছবি আঁকার টানে। দেবব্রত মুখোপাধ্যায়। ১ম বর্ষ ৬ সংখ্যা।
অনন্ত রোদ্যাঁ। পরিতোষ সেন। ১ম বর্ষ ১ সংখ্যা।
মার্ক সাগাল : স্বপ্ন বাস্তবের চিত্রকর। পূর্ণেন্দু পত্রী। ২ বর্ষ ২০ সংখ্যা।
শিল্পের মানুষ রামকিঙ্কর। বাসুদেব চন্দ্র। ২ বর্ষ ৪-৫ সংখ্যা।
ভাস্কর্যের প্রথম প্রজন্ম। মৃণাল ঘোষ। আগস্ট, ১৯৯৪
অখণ্ড বাংলায় শিল্পীর তুলিতে-স্মৃতিতে পঞ্চাশের মন্বন্তর। সমীর ঘোষ। নভেম্বর ১৯৯৩
পুস্তক অলংকরণ শিল্পের অন্যধারায় বাংলার চারুশিল্পীর ভূমিকা। সমীর ঘোষ। সেপ্টেম্বর, ১৯৯৩
রবীন্দ্রনাথ : পাণ্ডুলিপি, ছবি এবং ওকাম্পো। সমীর ঘোষ। অক্টোবর, ১৯৯৬

শহর কলকাতা : শিল্পীর সৃজনে-সত্তায়। সমীর ঘোষ। মে, ১৯৯৭
ছবির প্রতীক : বৈচিত্র্যের বিস্তার। সমীর ঘোষ। জুলাই, ১৯৯৭

বঙ্গশ্রী

শিল্পী অতুল বসু। সজনীকান্ত দাস। ফাল্গুন, ১৩৪০
শিল্পী দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী। সজনীকান্ত দাস। জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০
আমার শিল্পসাধনা। সুনীলমাধব সেন। অগ্রহায়ণ, ১৩৫৯

যুগান্তর পত্রিকা

মানুষ কালীকিঙ্কর শিল্পী কালীকিঙ্কর। পরিমল গোস্বামী। সাময়িকী, ৮, অক্টোবর, ১৯৭২
ইলাস্ট্রেশনের জগতে তিন যুগ! শুভেন্দু ঘোষ। ১৮, এপ্রিল, ১৯৭৪
শিল্পী বসন্ত গাঙ্গুলী। অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়। সাময়িকী, ১৩, অক্টোবর, ১৯৬৮
শিল্পী নীরদ মজুমদার। তপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। ১, জুন, ১৯৭৩
শিল্পী পরিতোষ সেন। ১৫, জুন, ১৯৭৩
শিল্পী সুনীল পাল। ১, জুন, ১৯৭৩
শিবনাথ শাস্ত্রী শশী হেশ। অবন্তী দেবী। শারদীয়, ১৩৬৭
রবীন্দ্রনাথের ছবি : গণেশ পাইন ও বিকাশ ভট্টাচার্যের মতামত। সাময়িকী, ৮, মে, ১৯৮৩
রবীন্দ্রচিত্রকলায় নারী। শানু লাহিড়ী। ৭, মে, ১৯৮৭
শিল্পাচার্য নন্দলাল। গণেশ পাইন। সাময়িকী, ৫, ডিসেম্বর, ১৯৮২

আনন্দবাজার পত্রিকা

আদিনাথ মুখোপাধ্যায়ের চিত্রকলা। ৯, জানুয়ারি, ১৯৬২
গগন ঠাকুরের কার্টুন। কমল সরকার। ১৮, সেপ্টেম্বর, ১৯৬৭
নন্দলালের সাধনার জগৎ। বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়। শারদীয়া, ১৩৫২
বাংলার কাঠখোদাই শিল্প-রঙ্গীন। মন্দার মল্লিক। শারদীয়া, ১৯৩৩
রবীন্দ্রনাথের চিত্রাবলী। অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়। বার্ষিক সংখ্যা ১৩৪৮
শিল্পী হেমেন্দ্রনাথ ও তাঁর চিত্রকলা। যামিনীকান্ত সেন। শারদীয়া, ১৩৫৬
ভারতীয় চিত্রকলা প্রদর্শনী। ২৪, আগস্ট, ১৯৩৫
শিল্পী হীরাচাঁদ দুগারের চিত্রকলা। বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়। ২২, জানুয়ারি, ১৯৫০
শিল্পী পরিচয় (প্রিয়নাথ সিংহ)। বার্ষিক সংখ্যা ১৯৪৪
শিল্পী ভবেশ সান্যাল। ১০, ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৫
বাঙ্গালার কাঠ খোদাই শিল্প। পবিত্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়। শারদীয়া, আশ্বিন, ১৩৪০
ডেভিড হেয়ারের স্ট্যাচু। কমল সরকার। রবিবাসরীয়। ১৮, জুলাই, ১৯৭৬
হেনরিয়েটার ফোটোগ্রাফ। কমল সরকার। ১৮, নভেম্বর, ১৯৭৯
কবির হস্তাক্ষর থেকে ছাপার অক্ষর। পরিতোষ সেন। ৯, মে, ১৯৭৬
কবির ছবি। পরিতোষ সেন। ৯, মে, ১৯৮৬ (রবীন্দ্র ক্রোড়পত্র)।
আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলা। একটি পুরানো বিতর্ক। রবিবাসরীয়। ১৪, মে, ১৯৮৯
(লন্ডনে ভারতীয় চিত্রপ্রদর্শনী : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)।
কবির ছবি : কয়েকটি ভাবনা । পরিতোষ সেন। ১৫, এপ্রিল, ১৯৮৩

অভিনব রূপের সন্ধানে (রবীন্দ্র চিত্রকলা প্রসঙ্গে শিল্পী গণেশ পাইন), রবিবাসরীয়, ৪, আগস্ট ১৯৯১।
নিছক শিল্পের ইতিহাস বলে কিছু হয় না, পরিতোষ সেন (গ্রন্থ সমালোচনা)। রবিবাসরীয়, ৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৩
আমাদের এই তসবির মহল। পরিতোষ সেন। রবিবাসরীয়, ১৭, মে, ১৯৮৭
স্বদেশিয়ানার যুগে শিল্পে বিদেশিয়ানা। অতুল বসু। রবিবাসরীয়, ১৭, মে, ১৯৮৭
কলকাতার প্রথম স্ট্যাচু। কমল সরকার। রবিবাসরীয়, ১৮, এপ্রিল, ১৯৮২
ডেভিড হেয়ারের স্ট্যাচু। কমল সরকার। রবিবাসরীয়, ১৮, এপ্রিল, ১৯৮২
সেদিনের শিল্পে পুবের হাওয়া পশ্চিমের হাওয়া। অতুল বসু। রবিবাসরীয়, ২৪, মে, ১৯৮৭
ভাস্কর্যের বাঙালী পিছিয়ে নেই। সন্দীপ সরকার। রবিবাসরীয়, ১৪, এপ্রিল, ১৯৯১
সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের শিল্পীরা কতটা গুরুত্ব পান। মৃণাল ঘোষ। রবিবাসরীয়, ৮, নভেম্বর, ১৯৯২
ছবি কেনা আর ছবি বোঝা। যোগেন চৌধুরী। রবিবাসরীয় ২২, ডিসেম্বর, ১৯৯১
বিক্রির নেশা এখন নতুন শিল্পীদেরও। গণেশ হালুই। রবিবাসরীয়, ২২, ডিসেম্বর, ১৯৯১
শুনতে পাই মানুষের হৃৎস্পন্দন। যোগেন চৌধুরী। ১৪, এপ্রিল, ১৯৯২
ভারতীয় শিল্পকলার বিদেশি বাজারে এখনও ভাটার টান। সন্দীপ সরকার। ২২, সেপ্টেম্বর, ১৯৯৩
চিত্রকলা : জাতীয় না আন্তর্জাতিক। মৃণাল ঘোষ। রবিবাসরীয়। ২৮ নভেম্বর ১৯৯৩
চিত্রকলা ও ভাস্কর্যে তরুণ প্রজন্মও পিছিয়ে নেই। মৃণাল ঘোষ। রবিবাসরীয়, ৩, সেপ্টেম্বর ১৯৮৯
আমাদের শিল্পকলা। পরিতোষ সেন। রবিবাসরীয় ১১, এপ্রিল, ১৯৯৩
কলকাতার চাই একজন কালাপাহাড়। পরিতোষ সেন। রবিবাসরীয়, ৩, সেপ্টেম্বর, ১৯৮৯
মূর্তিমান কলকাতা : রামকিঙ্করের চোখে। পূর্ণেন্দু পত্রী। ৫-৬, জুন, ১৯৭৫
মেকি শিল্প। হেমেন্দ্রনাথ মজুমদার। রবিবাসরীয়। ১৮, অক্টোবর, ১৯৮১
লাইট অ্যান্ড শেড বা আলো ও ছায়া। হেমেন্দ্রনাথ মজুমদার। রবিবাসরীয়, ১, নভেম্বর, ১৯৮১
গণেশ পাইনের ছবি। মৃণাল ঘোষ। রবিবাসরীয় ২, ফেব্রুয়ারি, ১৯৯২
ছবির কলকাতা আজ রঙিন। সন্দীপ সরকার। রবিবাসীয়, ১৯, ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৯
ছবিতে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ কৌতুক। পরিতোষ সেন। রবিবাসরীয়, ১৭, জুলাই, ১৯৮৮
কালীঘাটের ছবি বনাম আর্চার সাহেব। পূর্ণেন্দু পত্রী। বার্ষিক সংখ্যা ১৩৮৭
মধুবনী। তথাগত চক্রবর্তী। বার্ষিক সংখ্যা। ১৭, জুলাই, ১৩৮৭
নিখিল বিশ্বাসের ছবি। সন্দীপ সরকার। বার্ষিক সংখ্যা ১৭, জুলাই, ১৩৮৪
পিকাসো তথা সমকালীন শিল্প। পরিতোষ সেন। বার্ষিক সংখ্যা ১৩৮০
আনন্দবাজার পত্রিকা ও বিগত দিনের কার্টুনিস্ট। নকুল চট্টোপাধ্যায়। বার্ষিক সংখ্যা ১৩৮০
নগরের শোভাবর্ধনে আধুনিক কলকাতা। চিন্তামণি কর। সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যা ১৩৮৭
নিলামের ক্যানভাস। গণেশ পাইন (অনুলিখন : শুভরঞ্জন দাশগুপ্ত)। রবিবাসরীয়, ৪, আগস্ট, ১৯৯৬
শতবর্ষের শ্রদ্ধাঞ্জলি : নন্দলাল বসু। অশোক মিত্র। ১৭ ডিসেম্বর ১৯৮২
শিল্পী যামিনী রায়। বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়। ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫
শিকড়ের সন্ধানে। যোগেন চৌধুরী। স্বাধীনতা-৫০, ১৫, আগস্ট, ১৯৯৭
কিছুটা শিল্প, বাকিটা বাজার। গণেশ হালুই। স্বাধীনতা-৫০, ১৫, আগস্ট, ১৯৯৭

আন্তর্জাতিক পরিপূর্ণতার দিকে যাবে চিত্রকলা। মৃণাল ঘোষ। বাঙালি—নতুন শতকে, ১৫ এপ্রিল ১৯৯৪
বিজ্ঞাপনে যাঁরা এনেছিলেন বাঙালিয়ানা। অংশুমান বন্দ্যোপাধ্যায়। ৩০ জুন ১৯৯৭
শিল্পের ভাষা। হেমেন্দ্রনাথ মজুমদার। রবিবাসরীয়। ২৯ নভেম্বর। ১৯৮১
তরুণ শিল্পীর রেখাচিত্র। হেমেন্দ্রনাথ মজুমদার। রবিবাসরীয়, ১৭, জানুয়ারি, ১৯৮২
শিক্ষার পথ। হেমেন্দ্রনাথ মজুমদার। রবিবাসরীয়, ৩, জানুয়ারি, ১৯৮২

আজকাল

পাই মাটির গন্ধ। বিপিন গোস্বামী। ৩১, জুলাই, ১৯৮৮
বিপরীত রামকিঙ্কর। বিজন চৌধুরী। ৩১, জুলাই, ১৯৮৮
এবার তিনিই প্রশ্নকর্তা। পূর্ণেন্দু পত্রী। ৩১, জুলাই, ১৯৮৮
খররৌদ্রে একা। রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়। ৩১, জুলাই, ১৯৮৮
তিনি ছিলেন শিল্পীদের শিল্পী। প্রভাস সেন। ৩১, জুলাই, ১৯৮৮
ইতি রামকিঙ্কর। প্রকাশ দাস। ৩১, জুলাই, ১৯৮৮
অতীতের শৃঙ্খল মোচনে রবীন্দ্রনাথ, অমৃতা। অশোক মিত্র। রবিবাসরীয়, ৮, মে, ১৯৯৪
চিত্রকর রবীন্দ্রনাথ। সত্যজিৎ চৌধুরী। ৯, আগস্ট, ১৯৮৮
রবীন্দ্রনাথের ছবি : একটি নাটকীয় মুহূর্ত। শিবনারায়ণ রায়। ৮, মে, ১৯৮৯
এক্সপ্রেশনিস্ট রবীন্দ্রনাথ। পূর্ণেন্দু পত্রী। ৮, মে, ১৯৮৯
অতীতের ক্ষতগুলি। সোমনাথ হোর। রবিবাসরীয়, ২৩, জানুয়ারি, ১৯৯৪
সত্যজিৎ রায়। ও সি গাঙ্গুলি। শারদীয়, ১৩৯৯

চতুরঙ্গ

পদ্মাপারের ছবি : সমীর ঘোষ। মে, ১৯৮৯
নানা প্রেক্ষিতে চিত্রকলা : সম্ভাবনার সীমা ও সীমাবদ্ধতা। সমীর ঘোষ। সেপ্টেম্বর, ১৯৯১
শিল্প রচনার কলাকৌশল ও নন্দলাল : ইন্দ্র দুগার। জানুয়ারি, ১৯৯৫
উডকাট : একটি লুপ্ত শিল্পকর্ম। জয়ন্ত বাকচি। জুলাই, ১৯৯২

ধ্রুপদি

বাংলা বইয়ের প্রচ্ছদ বৃত্তান্ত। সৌমেন পাল। বার্ষিক সংকলন ২০০৬
কার্টুনিস্টের চোখে দেখা। চন্ডী লাহিড়ী। বার্ষিক সংকলন ২০০৬
সুন্দরের অভিসার। সোমনাথ ঘোষ। বার্ষিক সংকলন ২০০৬
দেখার অপেক্ষায়। শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়। বার্ষিক সংকলন ২০০৬
অমর চিত্রকথা : ইতিহাস বিস্মৃতি, গপ্পো। সায়ন্তন দাশগুপ্ত। বার্ষিক সংকলন ২০০৬
রূপে তোমায় ভোলাব। সোয়েশ্বর ভৌমিক। বার্ষিক সংকলন ২০০৬
আমার বিচিত্র শিল্পজাতের চৌহদ্দি। দেবাশীষ দেব। বার্ষিক সংকলন ২০০৬
রবীন্দ্রনাথের নিজের লেখায় নিজের অঙ্কন। সুশোভন অধিকারী। বার্ষিক সংকলন ২০০৬
পথ চাওয়াতেই আনন্দ। শোভন তরফদার। বার্ষিক সংকলন ২০০৬
লেখাঙ্কন থেকে হরফ সজ্জা। শুভেন্দু দাশমুন্সী। বার্ষিক সংকলন ২০০৬
রূপময় শান্তিনিকেতন। রমাপ্রসাদ দত্ত। বার্ষিক সংকলন ২০০৬

সত্যরায়ের সঙ্গে কদিন। সত্যেন মণ্ডল। বার্ষিক সংকলন ২০০৬
ছবি লেখেন সত্যজিৎ। দেবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়। বার্ষিক সংকলন ২০০৬
সত্যজিতের ফিল্ম ও সিনেমায় পুস্তিকা। দেবাশীষ মুখোপাধ্যায়। বার্ষিক সংকলন ২০০৬

পরশপাথর

কার্টুনিস্টরা কোথায় গেলেন? চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। জুলাই, ২০০৭ সংখ্যা।
টাকা ঢালো কার্টুন নাও। চণ্ডী লাহিড়ী। জুলাই, ২০০৭ সংখ্যা।
কার্টুন ছাড়া সভ্যসমাজ ভাবা যায় না। রেবতীভূষণ ঘোষ। জুলাই, ২০০৭ সংখ্যা।
দুই চক্রবর্তী। শৈবাল চক্রবর্তী। জুলাই, ২০০৭ সংখ্যা।
দুঃখের কথা, তবে করার কিছু নেই। অশোক দাশগুপ্ত। জুলাই, ২০০৭ সংখ্যা।
ভালো কার্টুন হল কাগজের বিবেক। অমল চক্রবর্তী। জুলাই, ২০০৭ সংখ্যা।
যুগ পালটেছে তাই কার্টুনিস্টদেরও পাল্টাতে হবে। দেবাশীষ দেব। জুলাই ২০০৭ সংখ্যা।
কার্টুনিস্টদের উৎসাহ নেই। হিমানীশ গোস্বামী। জুলাই, ২০০৭ সংখ্যা।
এটা একটা ধারা, শুরু হয়েছে বন্ধ হবে না। নারায়ণ দেবনাথ। জুলাই, ২০০৭ সংখ্যা।

বিতর্কিকা

বাঙালীর চিত্রকলা এবং প্রবর্তক। সমীর ঘোষ। শ্রাবণ, ১৪০৬

প্রতর্ক

ছবির কথা। শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়। নভেম্বর, ১৯৯৪, জানুয়ারি, ১৯৯৫
শিল্পমুক্তি এবং পঞ্চাশের মম্বন্তর। সত্যজিৎ চৌধুরী। নভেম্বর, ১৯৯৪, জানুয়ারি, ১৯৯৫
পরিতোষ সেনের প্রিয় অপ্রিয় দু-একটি প্রসঙ্গ। শিলাদিত্য সেন। নভেম্বর, ১৯৯৪,
গণনাট্যের কাল ও চিত্রকলা। সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। নভেম্বর, ১৯৯৪, জানুয়ারি, ১৯৯৫
সমকালীনতার চিত্র বা চিত্রকলার সমকালীনতা। শুভাপ্রসন্ন। নভেম্বর, ১৯৯৪, জানুয়ারি, ১৯৯৫
চিত্রকলা ও চলচ্চিত্র। ধীমান দাশগুপ্ত। নভেম্বর, ১৯৯৪, জানুয়ারি, ১৯৯৫
সংস্কৃত সাহিত্য : নাট্যকলায় চিত্রশিল্প। রত্না বসু। নভেম্বর, ১৯৯৪, জানুয়ারি, ১৯৯৫
ভ্যানগঘ কি আঁকবেন আমাদের পোর্ট্রেট? মানস বাগচি। নভেম্বর, ১৯৯৪, জানুয়ারি, ১৯৯৫
চিত্রকলা · শিল্পরুচির হিসেব নিকেশ। দেবাশীস সেনগুপ্ত। নভেম্বর, ১৯৯৪, জানুয়ারি, ১৯৯৫
শিল্পে জাতীয়তাবাদ, শিল্পীরা ও স্যার আশুতোষ। রীণা ভাদুড়ী। ফেব্রুয়ারি, ২০০৬
চিত্রকলা—ডিজিটাল আর্ট। মানস বাগচি। ফেব্রুয়ারি, ২০০৬
অলঙ্করণ নিয়ে দুচার কথা। দেবাশীস দেব। ফেব্রুয়ারি, ২০০৬
থিয়েটার ও চিত্রকলা। শুভ্র মজুমদার। ফেব্রুয়ারি, ২০০৬
তুলিকলমের সমবায়। সুমিতা চক্রবর্তী। ফেব্রুয়ারি, ২০০৬
আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলার ভূমিকা। চিত্তপ্রসাদ। ফেব্রুয়ারি, ২০০৬
ছবির সংকট। চিত্তপ্রসাদ। ফেব্রুয়ারি, ২০০৬
চিত্তপ্রসাদের নিজের কথায়। শিল্পী চিত্তপ্রসাদ। প্রভাস সেন। ফেব্রুয়ারি, ২০০৬
চিত্তপ্রসাদ। রণজিৎ সিংহ। ফেব্রুয়ারি, ২০০৬

কালি ও কলম

বাঙাল শিল্পীর সৃজন-উদ্যম : রূপ ও রূপান্তরের ছয় দশক। আবুল মনসুর। পঞ্চম বর্ষ : তৃতীয় সংখ্যা বৈশাখ, ১৪১৫: এপ্রিল, ২০০৮

পঞ্চাশের দশক : আধুনিকতার বিবিধার্থ। মইনুদ্দীন খালেদ। ”

জয়নুল : আধুনিক ও প্রান্ত অনুরাগী। সৈয়দ আজিজুল হক ”

সফিউদ্দিন আহমেদ। মাহমুদ আল জামান। ”

মানুষ ও মানবের শিল্পী এস এম সুলতান। নাজমা আক্তার। ”

মানুষের মনে প্রকৃতির ঐক্য তৈরি করা। বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর। পঞ্চম বর্ষ : তৃতীয় সংখ্যা

শিল্পী মোহাম্মদ কিবরিয়া। নাহীদ আখতার। ”

আমিনুল ইসলাম ওসমান জামাল। অনুবাদ : মেহবুব আহমেদ। ”

বর্ণের কবি মুর্তজা বশীর। হারিসুল হক। ”

কাইয়ুম চৌধুরীর শিল্প সূচনা। মফিদুল হক। ”

চিত্রে বর্তমান সময়, বস্তুবিশ্ব ও প্রকাশের গতিপ্রকৃতি। মোস্তফা জামান। ”

উত্তরাধিকার : শিল্পকলার শিকড়-অন্বেষণের আরেক পরিপ্রেক্ষিত। আমিনুল ইসলাম। ”

একটি প্রদর্শনী এবং আমি। রফিকুল নবী। ”

বাংলার লোকশিল্প। বুলবন ওসমান। ”

বাংলাদেশের সমকালীন চিত্রকলার বিষয় বিবেচনা। ”

প্রসঙ্গ মানুষ। নজরুল ইসলাম। ”

চিত্রশিল্পে মুক্তিযুদ্ধ। রবিউল হুসাইন। ”

আমাদের চিত্রকলায় নারীভাবনা। সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম। ”

বাংলাদেশের চিত্রকলা: পটচিত্র। ইব্রাহিম ফাত্তাহ্। ”

চট্টগ্রামে চারুকলা-চর্চা। ফয়েজুল আজিম। ”

শিল্পের স্থাপত্য: স্থাপত্যের শিল্প রনি আহম্মেদ। ”

বাংলাদেশের নারীশিল্পী। রফিকুল ইসলাম। ”

মনিরুল ইসলাম: সংবেদনশীলতা মূর্ত যার ক্যানভাসে। নাসিমা হক। ”

ধ্রুপদী গতির শাহাবুদ্দিন। জাহিদ মুস্তাফা। ”

বিজন চৌধুরীর সঙ্গে কিছুক্ষণ। শরীফ আতিক-উজ-জামান। ”

বিষয় কার্টুন

টিনটিন ও তার স্রষ্টার সঙ্গে আমরা। ঋতুপর্ণ বসু। তৃতীয় সংখ্যা, ২য় বর্ষ, ১৪১৪

দীর্ঘ সফরে টিনটিনের সাথে হার্জ। ঋতুপর্ণ বসু। তৃতীয় সংখ্যা, ২য় বর্ষ, ১৪১৪

টিনটিন বনাম হার্জ। অনিন্দ্য বসু। তৃতীয় সংখ্যা, ২য় বর্ষ, ১৪১৪

টারজান থেকে টিনটিন। মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃতীয় সংখ্যা, ২য় বর্ষ, ১৪১৪

চিত্র পরিচালকের চোখে হার্জ। সাক্ষাৎকার : সন্দীপ রায়। তৃতীয় সংখ্যা, ২য় বর্ষ, ১৪১৪

অলংকরণ শিল্পীর চোখে হার্জ। সাক্ষাৎকার : দেবাশীষ দেব। তৃতীয় সংখ্যা, ২য় বর্ষ, ১৪১৪

কমিক্স শিল্পীর চোখে হার্জ। সাক্ষাৎকার:অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায়। তৃতীয় সংখ্যা, ২য় বর্ষ, ১৪১৪

নানা নামে টিনটিন। বিশ্বদেব গঙ্গোপাধ্যায়। তৃতীয় সংখ্যা, ২য় বর্ষ, ১৪১৪

টিনটিন কমিক্সে বাস্তবের এক খলনায়ক। ঋতুপর্ণ বসু। তৃতীয় সংখ্যা, ২য় বর্ষ, ১৪১৪

টিনটিন কমিক্‌সে বিভিন্ন চরিত্রের উৎস। তৃতীয় সংখ্যা, ২য় বর্ষ, ১৪১৪
টিনটিনকে নিয়ে গবেষণা ও বিতর্ক। তৃতীয় সংখ্যা, ২য় বর্ষ, ১৪১৪
অন্য মাধ্যমে। টিনটিন তৃতীয় সংখ্যা, ২য় বর্ষ, ১৪১৪
জাতিবিদ্বেষের কাঠগড়ায় টিনটিন। ত্রিগুণা ব্রহ্ম। তৃতীয় সংখ্যা, ২য় বর্ষ, ১৪১৪
একটি ভুলের ফলে। দেবাশীষ সেন। তৃতীয় সংখ্যা, ২য় বর্ষ, ১৪১৪
টিনটিনের বই। তৃতীয় সংখ্যা, ২য় বর্ষ, ১৪১৪
হার্জের অন্য চরিত্র। দেবাশীষ সেন। তৃতীয় সংখ্যা, ২য় বর্ষ, ১৪১৪
নকল টিনটিন। তৃতীয় সংখ্যা, ২য় বর্ষ, ১৪১৪
টিনটিনকে নিয়ে টুকরো খবর। তৃতীয় সংখ্যা, ২য় বর্ষ, ১৪১৪
টিনটিনকে নিয়ে প্রদর্শনী। তৃতীয় সংখ্যা, ২য় বর্ষ, ১৪১৪
টিনটিন ও কমিক্‌স মিউজিয়াম। তৃতীয় সংখ্যা, ২য় বর্ষ, ১৪১৪
টিনটিনকে নিয়ে নানা স্মারক। তৃতীয় সংখ্যা, ২য় বর্ষ, ১৪১৪
আড়চোখে (নিয়মিত কার্টুন বিভাগ)। ঋতুপর্ণ বসু। তৃতীয় সংখ্যা, ২য় বর্ষ, ১৪১৪